অচিন্ত্য গ্রন্থাবলী

(১ম খণ্ড)

(১ম খণ্ড)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আনন্দধারা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
১৩৩৫

মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
সুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট
কলিকাতা-৪

ভূমিকা

"বেদে" আমার প্রথম উপন্যাস। কল্লোল-পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই এ বই নিয়ে সমালোচক-মহলে নিন্দার ঝড় ওঠে, বিষয়বস্তুতে, আঙ্গিকে ও লিখনরীতিতে গতানুগতিকের পরিপন্থী বলে। উপন্যাসের প্রথম ছত্র—'ন পেরিয়েছি কিন্তু আহ্লাদিকে দেখেই আমার ভালো লাগল—' এ পড়ে প্রকাশকও ঘাবড়ে গেলেন। ন বছর বয়স থেকে একুশ-বাইশ বছরের একটি ছন্নছাড়া মানুষের জীবনই এই উপন্যাসের পরিধি। এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে—রহস্যঘন তটরেখা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে নদীর মত প্রবাহিত যার জীবন সেই তো বেদে। এমনি ছয়টি ঘাটে—জীবনে যেমন ছয়টি রস, অম্ল মধুর লবণ কটু কষায় ও তিক্ত, তেমনি পথপ্রান্তে ছয়টি নায়িকা, আহ্লাদি, আসমানি, বাতাসি, মুক্তা, বনজ্যোৎস্না ও মৈত্রেয়ী—ক্ষণকালের বিশ্রাম নিতে চেয়ে নায়ক আবার সম্মুখের টানে এগিয়ে চলেছে। সমস্ত প্রাপ্তিই তৃপ্তিহীন, সমস্ত তৃপ্তিই প্রাপ্তিহীন। যেন আরো কোনো রস আছে আরো কোনো অন্বেষণ। "বেদে"-তে সেই পরম অন্বেষণের প্রথম সূচনা।

সেদিনের সেই মুহূর্তটি মনে অক্ষয় হয়ে আছে যখন রবীন্দ্রনাথের চিঠি আমার হাতে এসে পৌঁছুল। "বেদে" বই হয়ে বেরুলে তাঁকে স্পর্ধিত শ্রদ্ধায় পাঠিয়েছিলাম এক কপি। কল্পনাও করিনি প্রাপ্তি-সংবাদের বাইরে দুয়েকটি সুন্দর কথা ছাড়া আর কিছু লিখবেন। কিন্তু যা পেলাম তা শুধু উদার সংবর্ধনা নয়, নির্ভীক আশীর্বাদ।

সেই চিঠি গ্রন্থাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হল।

"বিবাহের চেয়ে বড়" বিজলী-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সে বই নিয়েও ঝড় উঠেছিল—প্রবলতর ঝড়—সমালোচকের দপ্তর পেরিয়ে একেবারে রাজপুরুষের দরবারে। বিশেষ কোনো বর্ণনা নয়, সংলাপ নয়, শব্দ বা শব্দসমষ্টি নয়, মোট বক্তব্যটাই অশাস্ত্রীয় মনে হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী না হয়েও নর-নারী বন্ধুরূপে সহাবস্থান করতে

বেদে

॥ আহ্লাদি ॥

ন পেরিয়েছি, কিন্তু আহ্লাদিকে দেখেই আমার ভালো লাগল।

জীবনারম্ভে সেই প্রথম ভালো-লাগাটি আজকের বিষণ্ন অপরাহ্ণে ঠিক ধরতে পারছি না। সেটা ভৈরবী না ভূপালির সুর তাও বা কে বলবে?

—কাদায় পড়ে গিয়েছিলে বুঝি?

কথা বলতে পারছিলাম না। কাঁদছিলাম।

ইস্! কপাল কেটে যে রক্ত বেরিয়েছে।

চারটি আঙুল আমার কপালে এসে লাগল। দেখলাম ওর চারটি আঙুলের ডগা রক্তে টুকটুক করছে।

কোমরে কাপড় জড়ানো একটি ছেলে, খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, এসে বললে—তোকে মাস্টারমশাই ডাকছে, আহ্লাদি।

—কেন রে? বল গে আমি পারব না এখন উঠোন লেপতে। বামনি উনুনে আগুন দিক।

পাশের দেবদারু গাছটায় কচি পাতার জন্মোৎসব চলেছে। ভোরের বাতাস ঝিরঝির করছিল।

ছেলেটি বললে—আমি ফিরে গিয়ে যদি বলি যে আহ্লাদি আসবে না, আমার পিঠেই তো বেত ভাঙবে। তোকে তো আর ছোঁবে না। কিন্তু উঠোন লেপতে তোকে ডাকেনি। বামনিই লেপছে।

আহ্লাদি ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—আমি এখুনি আসছি ভাই।

ছেলেটি আমার হাত ধরে ফেললে। বললে—বড্ড লেগেছে বুঝি? কেমন করে লাগল?

—গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ির কোনায় লেগে। পিছলে পড়ে গেছলাম।

—কলকাতায় এই বুঝি প্রথম এসেছিস? বাড়ি থেকে পালিয়ে না পথ ভুলে?

আহ্লাদি ছুটতে-ছুটতে এল। হাতে একটা গেরুয়া রঙের কাপড়। ওর ছোট্ট তর্জনীটি হেলিয়ে বললে—এবার যাও তুমি মাস্টারমশাইর কাছে, বসন্ত বলে দিয়েছে তুমি কাল লুকিয়ে মাস্টারমশাইর হুঁকোতে টান মেরেছ। মাস্টারমশাই তাঁর পায়ের খড়ম উঁচিয়ে বসে আছেন, নটরুর পিঠ ভাঙবেন তবে হুঁকোয় টান দেবেন। যাও এবার!

নটরু কোমরের কাপড়টা আরো একটু কষে বেঁধে একেবারে ক্ষেপে উঠল —বসন্ত বলুক দেখি তো আমার মুখের ওপর! জোচ্চোর কোথাকার! দেব থাবড়া মেরে শুয়োরের মুখ ভেঙে। আমি হুঁকো কোথায় তাই জানি না। যাবই তো মাস্টারের কাছে। আমি কেয়ার করি কিনা! কিন্তু আগে বসন্তর দাঁত বত্রিশটা থেঁতলে না দিলেই নয়।

আহ্লাদি ওর হাতটা চেপে ধরে বললে—সক্কালবেলাই মারামারি করতে ছুটিসনি নটরু!

আহ্লাদির মুঠি ভারি কোমল কিন্তু। নটরু তাতে বাঁধা পড়ে না।

আমার হাত ধরে ও বললে—এস ভাই।

প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ, ছায়া পড়েছে। মা'র কোলের মতো! একটা ডোবা, ঘাট বাঁধানো নয়, পানায় জল নীলচে হয়ে এসেছে, কলমিলতা ভাসছে, দুটো হাঁস পাঁক খুঁড়ছে।

আহ্লাদি আমার কপালে জল দিয়ে দিতে লাগল।

—এখানে কি করে এলে ভাই?

—মামার সঙ্গে কলকাতায় আজ ভোরেই পৌছেছি।

—মামা? তিনি কোথায়?

—তিনি আমাকে গঙ্গার ঘাটে ফেলে রেখে কোথায় যে চলে গেলেন, পাত্তা পেলাম না।

ছেলেরা নামতা মুখস্থ করছে। বেতের আওয়াজ আর আর্তধ্বনিও কানে ভেসে আসছিল।

—তাঁর নাম কি? কোথায় তোমাদের গাঁ?

—তা বলব না। সেখানে আর ফিরে যেতে চাই না।

—কেন ভাই?

চোখে জল এসে পড়েছিল।

—আমাকে ওরা মারে। মামী একদিন একটা বঁটি ছুঁড়ে মেরেছিল।

পিঠের কাপড়টা তুলে দেখালাম।

আহ্লাদি আমার পিঠের উপর ঝুঁকে পড়ল দুই হাত রেখে। ওর দুটি হাতই ভেজা। চুলগুলিও খোঁপায় জড়ানো ছিল না।

আহ্লাদির তখন কত বয়সই বা হবে? এগারোর বেশি?

—কিন্তু মামা যদি একদিন নিতে আসে?

—তা হলে বুঝি লুকিয়ে গঙ্গার ঘাটে ভিড়ের মধ্যে হাত ছেড়ে পালিয়ে যায়?

—মাস্টারমশাই যদি তোমাকে বাড়িতে রেখে দিয়ে আসেন?

—তিনি যখন গঙ্গাস্নান করে ফিরছিলেন; আমাকে কাঁদতে দেখে ডেকে নিলেন সঙ্গে। তাঁকে সব বলেছি, তিনি আমাকে এখানে রাখবেন বলেছেন।

—সত্যি?—আহ্লাদির দুটি চোখ ছেপে খুশি উছলে উঠেছে।—বেশ হবে কিন্তু তা হলে। তোমার নাম কি ভাই?

—পচা।

—ধ্যেৎ! আহ্লাদি ভুরু কুঁচকেছে।—তোমার নাম কাঁচা। এই নাও, ভেজা কাপড়টা ছেড়ে এই আলখাল্লাটা পর।

কাপড়টার রঙ গেরুয়া।

মাস্টারমশাই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

এটাকে ইস্কুল না বলে আস্তাবল বলতে কারুর বাধবে না হয়তো।

নটরু মাস্টারের কাছে বাইরে যাবার অনুমতি চাইল।

—না।

—থাকতে পারছি না স্যর, কল্ড্ বাই নেচার—

—পাজি, নচ্ছার—মাস্টার মেহেদির ভাঙা ডাল দিয়ে নটরুর ঘাড়ের উপর সপাং করলে। কিন্তু নটরু প্রকৃতির আহ্বান অবহেলা করতে শেখেনি—

আর যায় কোথা! সমস্ত ইস্কুলঘরে যেন আগুন লেগে গেছে। নটরুর নাক কেটে গেছে তবু মাস্টার ক্ষান্ত হয় না।

নটরুকে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। সে দুই হাতে চোখের জল কানের দিকে ঠেলে দিয়ে বইয়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ভেঙচে নিচ্ছে।

আহ্লাদি ছুটতে-ছুটতে এল। হাতে একটা গেরুয়া রঙের কাপড়। ওর ছোট্ট তর্জনীটি হেলিয়ে বললে—এবার যাও তুমি মাস্টারমশাইর কাছে, বসন্ত বলে দিয়েছে তুমি কাল লুকিয়ে মাস্টারমশাইর হুঁকোতে টান মেরেছ। মাস্টারমশাই তাঁর পায়ের খড়ম উঁচিয়ে বসে আছেন, নটরুর পিঠ ভাঙবেন তবে হুঁকোয় টান দেবেন। যাও এবার!

নটরু কোমরের কাপড়টা আরো একটু কষে বেঁধে একেবারে ক্ষেপে উঠল —বসন্ত বলুক দেখি তো আমার মুখের ওপর! জোচ্চোর কোথাকার! দেব থাবড়া মেরে শুয়োরের মুখ ভেঙে। আমি হুঁকো কোথায় তাই জানি না। যাবই তো মাস্টারের কাছে। আমি কেয়ার করি কিনা! কিন্তু আগে বসন্তর দাঁত বত্রিশটা থেঁতলে না দিলেই নয়।

আহ্লাদি ওর হাতটা চেপে ধরে বললে—সক্কালবেলাই মারামারি করতে ছুটিসনি নটরু!

আহ্লাদির মুঠি ভারি কোমল কিন্তু। নটরু তাতে বাঁধা পড়ে না।

আমার হাত ধরে ও বললে—এস ভাই।

প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ, ছায়া পড়েছে। মা'র কোলের মতো! একটা ডোবা, ঘাট বাঁধানো নয়, পানায় জল নীলচে হয়ে এসেছে, কলমিলতা ভাসছে, দুটো হাঁস পাঁক খুঁড়ছে।

আহ্লাদি আমার কপালে জল দিয়ে দিতে লাগল।

—এখানে কি করে এলে ভাই?

—মামার সঙ্গে কলকাতায় আজ ভোরেই পৌছেচি।

—মামা? তিনি কোথায়?

—তিনি আমাকে গঙ্গার ঘাটে ফেলে রেখে কোথায় যে চলে গেলেন, পাত্তা পেলাম না।

ছেলেরা নামতা মুখস্থ করছে। বেতের আওয়াজ আর আর্তধ্বনিও কানে ভেসে আসছিল।

—তাঁর নাম কি? কোথায় তোমাদের গাঁ?

—তা বলব না। সেখানে আর ফিরে যেতে চাই না।

—কেন ভাই?

চোখে জল এসে পড়েছিল।

—আমাকে ওরা মারে। মামী একদিন একটা বঁটি ছুঁড়ে মেরেছিল।

পিঠের কাপড়টা তুলে দেখালাম।

আহ্লাদি আমার পিঠের উপর ঝুঁকে পড়ল দুই হাত রেখে। ওর দুটি হাতই ভেজা। চুলগুলিও খোঁপায় জড়ানো ছিল না।

আহ্লাদির তখন কত বয়সই বা হবে? এগারোর বেশি?

—কিন্তু মামা যদি একদিন নিতে আসে?

—তা হলে বুঝি লুকিয়ে গঙ্গার ঘাটে ভিড়ের মধ্যে হাত ছেড়ে পালিয়ে যায়?

—মাস্টারমশাই যদি তোমাকে বাড়িতে রেখে দিয়ে আসেন?

—তিনি যখন গঙ্গাস্নান করে ফিরছিলেন, আমাকে কাঁদতে দেখে ডেকে নিলেন সঙ্গে। তাঁকে সব বলেছি, তিনি আমাকে এখানে রাখবেন বলেছেন।

—সত্যি?—আহ্লাদির দুটি চোখ ছেপে খুশি উছলে উঠেছে।—বেশ হবে কিন্তু তা হলে। তোমার নাম কি ভাই?

—পচা।

—ধ্যেৎ! আহ্লাদি ভুরু কুঁচকেছে।—তোমার নাম কাঁচা। এই নাও, ভেজা কাপড়টা ছেড়ে এই আলখাল্লাটা পর।

কাপড়টার রঙ গেরুয়া।

মাস্টারমশাই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

এটাকে ইস্কুল না বলে আস্তাবল বলতে কারুর বাধবে না হয়তো।

নটরু মাস্টারের কাছে বাইরে যাবার অনুমতি চাইল।

—না।

—থাকতে পারছি না স্যর, কল্ড্ বাই নেচার—

—পাজি, নচ্ছার—মাস্টার মেহেদির ভাঙা ডাল দিয়ে নটরুর ঘাড়ের উপর সপাং করলে। কিন্তু নটরু প্রকৃতির আহ্বান অবহেলা করতে শেখেনি—

আর যায় কোথা! সমস্ত ইস্কুলঘরে যেন আগুন লেগে গেছে। নটরুর নাক কেটে গেছে তবু মাস্টার ক্ষান্ত হয় না।

নটরুকে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। সে দুই হাতে চোখের জল কানের দিকে ঠেলে দিয়ে বইয়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ভেঙচে নিচ্ছে।

আহ্লাদি গোলমাল শুনে দরজা পর্যন্ত এসেছিল। নটরুর মুখ-ভেঙচানো দেখে মুচকে একটু হেসে গেল। নটরু কি ওর হাসিকেও ভেঙচায় ?

—লেখাপড়া কিছু জানিস, না একেবারে স্বরে-অ ?

—গাঁয়ের ইস্কুলের সিক্‌সথ্ ক্লাশ সারা হয়েছে, এবার—

—বেশ, অঙ্ক কদ্দূর ?

—জি সি এম।

সব ছেলেগুলি হাঁ হয়ে গেছে দেখছি। নটরুর মুখে ইংরিজিটা তা হলে নিতান্ত অকেজো, তুচ্ছ। ওটা ওদের বুলি শেখানো হয়েছে। কেন না একটি পাঁচ বছরের ছেলে মুখখানি কাঁচুমাচু করে এসে বললে—আই এম কল বাই নেচার স্যর ! নটরু তো হেসেই খুন !

আমাকে একটা ভাগ দিয়ে বললে—পাঁচ মিনিটে—

দুমিনিট বেশি লেগে গেল বুঝি। মাস্টার তো সপাং করে বেতের বাড়ি মেরে দিল। অঙ্কটা শুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু। তাতে কি যায় আসে ? ডিসিপ্লিন্ ! ছেলেগুলো কিন্তু গুণও জানে না।

গঙ্গার ধারে যে-লোকটি আমার হাত ধরেছিল তার দুটি উদাস চোখের করুণা দেখেছিলাম, এখন দেখি লোকটির সারা মুখে বসন্তের দাগ, নাকের নিচে প্রকাণ্ড একটা ঘা হয়ে শুকিয়ে কদর্য একটা দাগ হয়ে আছে !

কেরোসিনের বাক্স সাজিয়ে বেঞ্চি। আশ্রমের কর্তা যথেষ্ট টাকা দিচ্ছে না বলে এখনো কিছুই তৈরি হল না—এ-কথা মাস্টার এরই মধ্যে বার পাঁচসাত উল্লেখ করলে। সেটাকে বোর্ড বলা চলে না। তক্তা। একটা অঙ্ক লিখতে-লিখতে মাস্টার বলতে লাগল—অনাথ আশ্রমটা যেন দেশোদ্ধারের তালিকায় কিছুই না।

একটা যোগ অঙ্ক লিখতে না লিখতেই মাস্টার হেঁকে উঠল—সাত মিনিট—সমস্ত ছেলে চঞ্চল হয়ে উঠল। আমাকে মাস্টার আবার ভাঙা শ্লেট আর কড়ে আঙুলের আধখানা একটা পেন্সিল দিলে। টপাটপ অঙ্কটা কষে ফেললুম একেবারে।

আমাকে শ্লেটটা মাস্টারের হাতের কাছে বাড়িয়ে দিতে দেখেই সব ছেলে-গুলো যেন উন্মাদ হয়ে উঠল। অঙ্ক যে করে হোক শেষ করে সব একেবারে ভিড় করে এসে দাঁড়াল। নটরু কিন্তু দেয়ালে ঠেস দিয়ে তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে। নির্বিকার !

শুধু আমার অঙ্কটাই রাইট হয়েছে। মাস্টার আর সবাইকে ঠেলে দিল। ছেলেগুলি যে যার জায়গায় গিয়ে হাত মেলে দাঁড়িয়েছে। কেন রে? মাস্টার বেতটাকে শূন্যে দুবার রিহার্সাল দিইয়ে নিয়ে গুনে-গুনে ছেলেগুলির কচি-কচি হাতে পাঁচ-সাত নয়-বারো যেমন খুশি সপাং করতে লাগল। নটরুর কাছে এসে হাঁকলে—তেইশ!

নটরু চেঁচিয়ে উঠল—দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অঙ্ক কি করে হয়?

মাস্টারের কথার নড়চড় হয়নি। একটি-একটি করে দুকুড়ি তিন হল তো হল। মারাই মাস্টারের পেশা।

আমার অঙ্ক রাইট হওয়াটা প্রকাণ্ড একটা অপরাধের মতো মনে হচ্ছিল।

ইস্কুল ভেঙে গেল।

রোজ এমনি করেই ভাঙে। মাস্টারের হাতের ও জিভের ব্যায়াম হয় খুব, আর নটরুর মাড়ির আর দাঁতের।

অশ্বত্থের পাতায় রোদ পিছলে পড়ে—ছেলেরা শ্লেটখাতা বগলে নিয়ে বানের জলের মতো বেরিয়ে আসে। আটটায় ইস্কুল শেষ করে এবার আমাদের মাটি কোপাবার পালা। এটা আশ্রমকর্তার ইস্কুল-পরিচালনার নতুন রুটিন। ছেলেরা খাপরার ঘরে তাদের ছেঁড়া খাতাবই ছড়িয়ে রেখে এসে কোদাল নিয়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যায়। নটরু এখানে 'ফার্স্ট বয়'। আমার হাতে একটা কোদাল দিয়ে বললে—কোপা।

মাটির গন্ধে বুক ভরে আসে। হাঁটু পর্যন্ত মাটি, মাথায় মাটি—যেন এতগুলি ছেলের কোন একটি মা তাঁর স্নেহ বেঁটে দিচ্ছেন। মাস্টার একটা দেবদারুর চারা-গাছের তলায় বসে দেখে আর হুকুম করে। মাঝে-মাঝে আহ্লাদি ছুটে এসে ছুটে চলে যায়। যেন গেরুয়া মাটির দেশে তরতর করে একটি রজতলেখা নদী বয়ে গেল।

গঙ্গা গাং নয়—খাল। তখন তা শিটিয়ে এসেছে।

নটরু ছেলের দলের পাণ্ডা হয়ে গঙ্গাস্নান করতে নিয়ে আসে। মাস্টার সাঁইত্রিশ মিনিট কবুল করে দেয়—অথচ লোহার ঘড়িটা নিজের ট্যাঁকেই

রাখে। আমাদের সাঁইত্রিশ মিনিট তাই সাতান্নতে গিয়ে ঠেকে। ভাত খাবার আগে পেট ভরে আর একবার মার খেয়ে নিই।

নটরু ট্যাঁক থেকে বিড়ি আর দেশলাই বার করলে।—খাবি?

মতামত দেবার আগেই নটরু ধরিয়ে ধোঁয়া দিতে শুরু করেছে। কৌতূহল যে হচ্ছিল না তা নয়। বললাম—মাস্টারকে যদি ওরা বলে দেয়—

নটরু একগাল হেসে বললে— তোরা বলে দিবি নাকিরে বসন্ত?

—পাগল! কোনোদিন বলেছি?

বললাম—তুই যে মাস্টারের হুঁকোয় টান দিয়েছিলি সে-কথা তো বসন্তই বলে দিয়েছিল! আহ্লাদি বললে।

—আহ্লাদি বললে?—বসন্ত রুখে উঠেছে।—ছুঁড়ি ভারি মিথ্যুক তো! হাঁরে, বলেছি নটরু? তা হলে আমারই কি দাঁত কটা আস্ত থাকত?

বললাম—না, না, আহ্লাদি মিথ্যে বলেনি, ঠাট্টা করেছে।

বিড়িতে টান দিতে হল বৈকি! কিন্তু পাঁজরা দু'খানা খসে পড়তে চাইল। বসন্তটা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। লজ্জা ঢাকতে গিয়ে আমিও হাসছি, আরো টানছি, আরো পাঁজরা চিমটে যাচ্ছে। বিড়িটা নিবে গেল। যেন বাঁচলাম।

নদীর পাড় বেশ ঢালু। পলি মাটির কোমল কাদায় সমস্তটা পাড় পিছল হয়ে নেমেছে। ছেলেগুলি পাড়ের ধারে বসে হাত ছেড়ে দিয়ে ছরছর করতে-করতে জলের মধ্যে এসে পড়ছে। বেজায় ফুর্তি। নটরুর পর্যন্ত। একহাঁটু জলের মধ্যে খলবল করছে। ওরা সাঁতার জানে না। তবু নটরুই ওদের পাণ্ডা!

সাঁতার কাটতে-কাটতে মনে হল আহ্লাদি এলে বেশ হত! কত মেয়েরাই তো আসছে, নাইছে, চুল ধুচ্ছে, গাল ফুলিয়ে জল কুলকুচো করছে। মাস্টার না আসে—না আসুক! কিন্তু আহ্লাদি যদি আসত, আমি ডুব সাঁতার দিয়ে ওর পা ছুঁয়ে যেতাম। ছুঁয়েই সাঁতরে—হোই দূরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতাম। ভাবত, মাছে ঠোকর দিয়ে পালিয়েছে বুঝি।

আহ্লাদি আসে না।

—এবার ফিরে চল নটরু। দেরি হয়ে যাবে।

নটরু কেয়ার করে না। বলে—দেরি না হলেও বরাতে মার আছেই আছে। মাস্টারের ট্যাঁক থেকে ঘড়ি আর কে ছিনিয়ে দেখতে যাচ্ছে? ঘড়ি দেখতে জানিস তুই?

হারান বললে—ঘড়ি আজ তিনদিন বন্ধ। ষাট গুনে-গুনে ওর মিনিট।

মারকে ওরা ডরায় না। ওটা ওদের দৈনন্দিন বরাদ্দের মতো। নটরু ওর দল নিয়ে পাড় বেয়ে বেয়ে জলে ঝাঁপাতেই থাকে। পাল্লা দেয়—লাইন বাঁধে—যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলে ; নদীটা ওদের বিপক্ষ, ওকে এক সঙ্গে আক্রমণ করা হচ্ছে—এমনি।

আমি উঠে আসি। আহ্লাদি হয় তো সেই ডোবাটায় গা ডোবায়। ইস!

ডিমওলা ট্যাংরামাছটা আমার পাতে পড়তেই নটরু খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভাবলাম, ঠাট্টা করছে বুঝি। আহ্লাদি মাছের বাসনটা হাত থেকে মাটিতে নাবিয়ে শুধোল—কি হল রে নটরু?

বললাম—ডিমটা চাস, না খালি মাছটা?

আহ্লাদি হেসে উঠল। নটরুর মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

—নে, নে, গোটা মাছটাই নে।

পাত থেকে মাছটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নটরু বললে—তোর পাতেরটা আমি খাই কিনা!

ছুটে যাচ্ছিল, আহ্লাদি ওর হাত ফের ধরে ফেললে।

—ছাড়, আমার খিদে নেই আহ্লাদি।

আমরা এঁটো কুড়িয়ে পাতাগুলি আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে আসি। আহ্লাদি গোবর দিয়ে মাটি লেপে, কোমরে কাপড় জড়ায়।

তারপর আমাদের দু'তিন ঘণ্টা ছুটি। যা খুশি তাই করি। যার খুশি ডাংগুলি, যার খুশি গাব্বুগুলি, যার খুশি দোলনা-দোলনা।

গত রাতের বৃষ্টিতে কাঁচা পেয়ারাগুলি বুঝি ডাঁসিয়েছে।

নটরু আগডালেতে চড়ে বেছে-বেছে পেয়ারা নিচে আহ্লাদির ছোট্ট কোঁচড়টিতে ছুঁড়ে মারছে। ওর কোঁচড় ভরে গেল।

—আমায় একটা দিবি রে নটরু?—তলায় এসে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ নটরুর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে গেল। একনাগাড়ে তিন-চারটে পেয়ারা আহ্লাদির কোঁচড়ে না পড়ে একেবারে আমার কপালে মাথায় এসে লাগতে লাগল।

ওর হাতের টিপ-এর এ হেন ভুল দেখে আহ্লাদি ব্যস্ত হয়ে আমার মাথাটা

দু'হাতে ধরে ফেলে বুকের কাছে টেনে এনে বললে—ওকি, ওকে মারছিস যে? কোঁচড়ের আশ্রিত সমস্তগুলি পেয়ারাই কিন্তু তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

নটরু একেবারে তরতর করে নেমে এল।

—তুই আমার সব পেয়ারা মাটিতে ফেলে দিলি যে! বলেই আহ্লাদির গালে সাঁ করে এক চড়।

ন বছরের কাঁচা মাংসে পাতলা রক্ত টগবগ করে উঠল বুঝি। ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

পেয়ারা আমাদের বন্দুকের গোলা, মরা ডাল আমাদের সঙিন আর তলোয়ার।

যুদ্ধে হেরে যাই। পুরনো ঘায়ে আঁচড় লেগে রক্ত ফিনিক দিয়ে ছোটে।

আহ্লাদির চোখে জল, তবু গাঁদার পাতা থেঁতলে ঘায়ের মুখে চেপে ধরছে আমার।

নটরু কোমরে কাপড়টা কষে বাঁধতে-বাঁধতে বললে—মাস্টারকে যদি বলিস যে মেরেছি, তা'লে তোর নাকটা চেপটে দেব। বলে রাখছি আহ্লাদি।

আহ্লাদি মাস্টারকে বলে না বটে।

দুপুরের ইস্কুল জমে না কোনো দিন। মাস্টার হুঁকো নিয়ে আসে, ঝিমোয়। বেত মারার উৎসাহ তখন মিইয়ে আসে, অতিকষ্টে হাত বাড়িয়ে শুধু চিমটি, কি বড় জোর পা বাড়িয়ে বেঞ্চির তলা দিয়ে লাথি। ছেলেদের কড়াকিয়া বলতে হুকুম দেয়। ছেলেরা কলরব করে। মাস্টারের তাতে ঘুম আসে। হুঁকোর জ্বলন্ত কলকেটা কোলের উপর পড়ে যায় হয়তো। মাস্টার বিকট চেঁচিয়ে ওঠে। ছেলেরা হাসে। মাস্টার একজনকে মেহেদির ডাল ভেঙে আনতে বলে। তার পিঠে আগে পঁচিশ ঘা মেরে মাস্টারের বউনি হয়। যেদিন কলকে পড়ে না, সেদিনটা নিশ্চিন্তে কাটে। নটরু কতদিন আলগোছে কলকেটা হুঁকোর মুখ থেকে তুলে সরিয়ে রেখেছে। নিমগাছের ছায়া ছড়িয়ে পড়তেই বুঝি চারটে বেজেছে। একসঙ্গে আমরা দুপদাপ করে উঠি। মাস্টারের ঘুম ভেঙে যায়। ট্যাঁকের ঘড়িটা লুকিয়ে একবার দেখে ছুটি দিয়ে দেয়। পরে ফের জিগগেস করে—নিমগাছের ছায়া পড়েছে তো রে?—বলে জানলার দিকে এগিয়ে আসে।

বিকেলে যেদিন ভিক্ষার মিছিল নিয়ে বেরুতে না হয় সেদিন ফের মাটি

কোপাই। বেগুনের চারাগুলি মাটির অবগুণ্ঠন খুলে আকাশকে একটুখানি দেখে নিচ্ছে। মিছিলে এবারও আহ্লাদি আসে না, ঘর নিকোয়, ঝাঁট দেয়, মাস্টারের জন্যে তামাক সাজে।

মাথার ঘা তখনো টনটন করলে কি হবে, নটরুর সঙ্গে ভাব করে ফেললাম ফের। খালি চাটাইটার উপর শুয়ে লাগছিল। নটরু ওর বিছানায় নিশ্চয়ই ভাগ দিত না। কে-ই বা চায়? আমারও বিছানা আসবে। দু'একদিনেরই মধ্যে—মাস্টার তো বললে।

—চিড়িয়াখানা দেখিসনি?

—কি করে দেখব? দেখাবি?

—ওরে বাবা, পঞ্চাশটা হাতি বাহাত্তরটা গণ্ডারের সঙ্গে শুঁড় দিয়ে লড়ে।

—কটার ভাগে কটা করে পড়ে তা'লে?

—তা কে জানে? সিংহগুলো সার বেঁধে দাঁড়ায়, বনমানুষের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ভীষণ জায়গা। ঢুকতে মোটে সাত পয়সা। আছে তোর কাছে?

—আহ্লাদি যে বললে এক আনা করে লোকপিছু, বাকি তিন পয়সার বিড়ি কিনবি বুঝি?

নটরু চটে উঠেছে।—আহ্লাদি তো সবই জানে! রাস্তাই চেনে না, এক আনা! হেঁ!

বেড়ার একটা দিক মেরামত সারা হয়নি এখনো। অশ্বত্থ গাছের গোড়া থেকে আগাগোড়া অন্ধকারে আমাদের ঘর ভরা।

বললাম—আহ্লাদি এখানে কি করে এল রে?

—কে জানে? আহ্লাদিকেই শুধোস!

—এতগুলো ছেলের মধ্যে ও কোত্থেকে ভেসে এল? ষোলোঘরের নামতা পড়তে-পড়তে ও যেন হঠাৎ একঘরের নামতা—ভারি সোজা।—ঘুমুচ্ছিস নটরু?

নটরু পাশ ফিরেছে।—মাস্টারকে জিগগেস করলেও খবর পেতে পারিস।

—তার মানে মাথার ঘা-টা আর না শুকোক এই তোর ইচ্ছে!

—রাখ, ঘুমো। রাত ঢের হল। সাঁঝের তারাটা কতদূর উঠে এসেছে দেখেছিস?

নন্তটা বেজায় কাশছে। একবার এ-পাশ আরবার ও-পাশ। খুকখুক

খুকখুক—ঠায় শুতে পাচ্ছে না। বালিশটায় মাথা গুঁজে হামাগুড়ি দেবার মতো করে একটু শুল।

•—ওর কি হল? নন্তুর?

—হাঁপানি। রোজ কাশে। বেচারা ঘুমুতে পারে না চোখ ভরে কোনো রাতে। কিন্তু গা-সওয়া।

—না রে, দেখছিস না কেমন হাঁসফাঁস করছে।

—থাক, আমাকে ঘুমুতে দে বলছি। আর বকবক করলে মুখে থুতু দেব। নটরুটা একটুতেই চটে।

নিঝুম। চোখ বুজে পড়ে ছিলাম হাতের উপর মাথা রেখে, হঠাৎ যেন কে এল। চোখ চেয়ে দেখি—আহ্লাদি।

—চাটায়ে শুয়ে ঘুম আসছে না, না রে?

—আসবেখন।

—এই আমার বালিশটা নে। পরশু থেকেই কাঁথা পাবি। আহ্লাদি আমার মাথাটা দুই হাতে তুলে বালিশটা ঘাড়ের তলায় গুঁজে দিয়ে চলে গেল।

বালিশটায় সোঁদাল গন্ধ ভুরভুর করছে। মামা একদিন আমার দু'হাত কড়িকাঠে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল, মামীর বঁটির দাগ আজও মেরুদণ্ডের কাছে ধনুকের মতো বেঁকে আছে ভুলে গেলাম, ভুলে গেলাম মাথায় আমার এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জ্বালা করছিল।

সকালবেলা চেয়ে দেখি বালিশটা আশ্চর্যরকম স্থান পরিবর্তন করেছে কিন্তু। আমার ঘাড়ের তলা থেকে একেবারে কখন যে নটরুর বুকের তলায় পৌঁছেচে আবিষ্কার করা কঠিন। তাড়াতাড়ি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ভোরবেলাকার ঘুমে মানুষকে কি সুন্দর দেখায় সেদিন নটরুর মুখের দিকে চেয়ে বুঝেছিলাম। সেদিন নটরুর আর ঘুম ভাঙিনি।

আমাতে বসন্তে দারুণ খোঁজাখুঁজি। সুতোয় মাঞ্জা হল, লাটাই এল, ঘুড়ি তৈরি—নটরু নেই। পিটালি গাছের তলায় নটরু বসে। এগিয়ে দেখি পা ছড়িয়ে বসে ও পুঁতির মালা গাঁথছে।

—কিরে, ঘুড়ি ওড়াবি আয়!

—আজ আর নয় ভাই, কাজ আছে।

হাসি পায়, নটরুর কাজ ! বসন্ত পুঁতিগুলি ছড়িয়ে দিয়ে বললে—ঘোড়ার ডিম ! নটরু সোজা দাঁড়িয়ে উঠেই বসন্তের পেটে এক লাথি।

—শিগগির গুছিয়ে দে বলছি, নইলে পিলে ফাঁক করে দেব, রাস্‌কেল্‌।

বসন্ত গুছিয়ে দিলে। নটরু ফের পা ছড়িয়ে মালা গাঁথতে বসল। অথচ কাল সারা দুপুরের ছুটিতে ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে কত তোড়-জোড়। চড়কপুকুরের ছোঁড়াদের ঘুড়ি শুধু কাটবে না, লটকাবে।

—পুঁতি কোত্থেকে যোগাড় করল রে বসন্ত ? কিনল ?

—হ্যাঁ।

বসন্তর খুব লেগেছে।

—পয়সা কোথায় পেল ? জানিস ?

—তোকে বলব, কিন্তু ওকে বলিস নে, খবরদার। বলবি না তো ?

—কক্ষনো না, কক্ষনো না।

—বললে এবার তা'হলে পাঁজরা চুর হবে ভাই ! শুনবি কি করে পয়সা পেল ? পরশু মিছিল করে যাবার সময়—তুই, মাস্টার সব এগিয়ে ছিলি—একটা অন্ধ ভিখিরী লোহার পুলের কাছে বসে ভিক্ষে করছিল। পাশে তার একটা টিনের বাটি, বাটিটা নটরু খপ করে তুলে নিয়ে পয়সাগুলি মুঠিতে চেপে বাটিটা ড্রেনে ছুঁড়ে দিলে ; সাত আনা—আটাশটা পয়সা ভাই। বললাম—এক পয়সার ঝালচানা কিনে দে নটরু। দিলে না। ঐ আটাশটা পয়সা দিয়েই পুঁতি কিনলে।

—পুঁতি ? কি করবে ও দিয়ে ?

—কে জানে ?

সন্ধ্যার দিকে সবাই জানলাম। সে পুঁতির মালা আহ্লাদির গলায় দুলছে। সে-রাত্রে নটরুর পাতে আস্ত কৈ মাছ পড়ল, দু'খানা বেগুন ভাজা, দু'হাতা টক।

আমার খালি চাটাই-ই ভালো। কিছু না বলে বালিশটা নটরুর গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বালিশটা তেমনি ওর বুকের তলায় গিয়ে সেঁধোল। নন্তুর কাশি থামে না। ওর পাশে বসে বুকে একটু হাত বুলিয়ে কে দেবে।

বামনিকে বললাম—বামনি, আমাকে সাতআনা পয়সা দিতে পারিস ?

বামনি দাঁত বার করে হাসে।—পয়সা দিয়ে কি করবি রে পচা ?

বামনি আমাদের বাজার আর রান্না করে। পরিবেশন করে আহ্লাদি

বললাম—ধারই না হয় দে।

—কি করে শুধবি ?

আমার গালটা টিপে দেয়।

—মাস্টারের এতগুলো দোক্তা তোকে দেব বামনি।

—চুরি করে নাকি রে ?

আমার ঠোঁট দুটো আবার টিপে দেয়।

বাটনা বেটে-বেটে বামনির আঙুলে কড়া পড়েছে।

ইস্কুল যেই ভাঙল, পথে বেরিয়ে এলাম। ধুলোর চিঠিতে ডাক পড়েছে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—পথের পর পথ ভাংছি। গাছের ছায়া গাছের তলায় গুটিয়ে এসেছে।

—আমাকে একটা টাকা দেবেন ?

জুড়ি-গাড়ির মেয়ে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। সঙ্গিনীর পানে চেয়ে মুচকে হেসে বলে—টাকা ? টাকা দিয়ে কি করবে ?

ঢোঁক গিলে বললাম—আমার মা আজ তিনদিন উপোসী—আমরা ভারি গরিব, আমার মা'র বড্ড অসুখ, পেটে ভীষণ ব্যথা।

চোখে জল এসে পড়েছিল। মা'র কথা বললেই চোখে জল আসে।

সঙ্গিনী বলে—কি আস্পর্ধা ভিখারী-ছেলেটার! টাকা চায়!

একটি ছেলে দোকান থেকে একটা এসেন্স কিনে এনে পথের পাশে দাঁড়ানো গাড়ির পা-দানিতে পা রাখতে যেতেই এই কথাটি শুনলে।

—যা-যা বেরো, টাকা চাস, টাকায় কপয়সা জানিস ?

আমি দূরে দাঁড়িয়ে মেয়েটির পানে চেয়ে বলি—আমার মা কাল রাতে অনেকগুলি বমি করেছিল, তাতে রক্ত উঠেছে। টাকা নেই বলে ওষুধ নেই। আমার মা খুব যে কাঁদে।

ছেলেটি এসেন্সের ছিপি খুলে মেয়েটির চুলে, বুকের কাছের কাপড়গুলিতে লাগিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটির গালে চিবুকে ঠোঁটে চোখের কোলে হাসির হাসনুহানা! এসেন্সের গন্ধে সমস্ত রাস্তা মাতোয়ারা।

একটা এসেন্সের শিশির দাম কত? এক টাকারও বেশি?

পথের পাশে বসে পড়েছি। যে-হাত মাস্টারের বেতের জন্য মেলে ধরতে অভ্যস্ত হয়েছিল তা এখন পয়সার জন্য প্রসারিত হচ্ছে। বেত পড়তে পারে, পয়সা পড়ে না।

—বিকেলে বাড়ি গিয়ে আমার মাকে হয়তো আর দেখতে পাব না। ওরা নিশ্চয়ই টেনে ছেঁচড়াতে-ছেঁচড়াতে মাকে কেওড়াতলায় নিয়ে যাবে। বাবু, একটা পয়সা দিয়ে যান।

দুঘণ্টায় দুটি পয়সা রোজগার হয়।

একটা চীনাবাদামওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিল।

তখন পথের কাঁকরগুলিও চিবিয়ে খেতে পারি। ডাকলাম—এক পয়সার মিশিয়ে দে।

না, থাক। হয়তো যা কিনতে যাব, তা দু'পয়সা কম পড়বে বলেই কেনা যাবে না। এ-রাস্তার মোড়টা ভারি অপয়া নিশ্চয়। আবার পথ! তার শেষ আছে?

আরো বাষট্টি পয়সা।

প্রকাণ্ড মাঠ; বেজায় ভিড়। একদিনে সবাই যেন ঘর ছেড়েছে জোট বেঁধে!

—কি মশাই এখানে?

—খেলা; ফুটবল।

চেঁচামেচিতে আকাশের কানে তালা লেগেছে। মাঝে-মাঝে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে মাথা গলাতে চাই, কনুইয়ের গুঁতো খাওয়ায় মাথা তখনো অভ্যস্ত হয়নি।

ভদ্রলোক খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেললে। চারপাশে লোকারণ্য জমে গেল।

—এই টুকুন ছোঁড়া, আমার পকেটের মধ্যে হাত চালিয়ে একটা টাকা সরিয়েছে। দে শিগগির!

চাঁটির পর চাঁটি, চড়ের পর চড়, চুল ধরে দারুণ ঝাঁকুনি! টাকাটা তখন আমার মুখের মধ্যে জিভের তলায়।

আর একজন বললে—পুলিশে দিন মশায়, সায়েস্তা হোক।

—পুলিশ কি হবে? আমরা আছি কি করতে?

আমার দুটো গাল কে একজন ভীষণ জোরে চেপে ধরল, দাঁতগুলো মড়মড় করে উঠেছে। টাকা তবু ছাড়ি না।

পুলিশকে খবর না দিলেও আসে। লাল-পাগড়ি দেখে সমস্ত গা কালিয়ে এল। ভিড় হালকা হয়ে গেল। পুলিশ আমার কাছে এসে বললে—দে-দো। টাকাটা মুখ থেকে বার করে কাপড় দিয়ে মুছে ওর চকচকে মুখখানির পানে একবার চেয়ে পুলিশের হাতে দিয়ে দিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য বলতে হবে। পুলিশ আমার হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে গেল না। টাকাটা হাতে করে বেমালুম সোজাই চলেছে—এতবড় রাজত্বে সর্বত্রই শান্তি ও শৃঙ্খলা, ওর মুখে সেই ভাব স্পষ্ট আঁকা।

কিন্তু পিছনে ওর ভিড় লেগে গেল।—টাকা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

পুলিশ সে-কথায় কোনো কানও পাতে না। আপন মনে এঁকে-বেঁকে চলে।

ভিড়ের সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশের পিছু-পিছু আমিও চলি। পুলিশের পিছু নিয়ে আমাকে সবাই ভুলে গেছে।

ছেলেটিকে ভারী সাহসী বলতে হবে—পুলিশের রুলশুদ্ধু হাতটা ধরে ফেলে বললে—টাকা নিয়ে কোথায় ভাগছিস ?

—কিসের টাকা ?

পুলিশ বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ায়।

কে একজন খাপ্পা হয়ে তার সমুখের লোকটিকে পুলিশের গায়ে ঠেলে ফেললে। পুলিশ ধাক্কা খেয়ে মাটিতে একেবারে উপুড় হয়ে পড়ল, তার পাগড়ি গড়িয়ে গেল। মার! মার শালাকে।

একটা হুলুস্থুল ব্যাপার। ভিড় পিছন হটে দাঁড়াল। আমিও সরে যাচ্ছিলাম, দেখি পায়ের কাছে কি একটা গড়াতে-গড়াতে এসে ঠেকেছে। তুলে নিয়েই ছুট। তখন সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। কেননা—

পুলিশ ওর রুল বাগিয়ে নিয়ে মরিয়া হয়ে ভিড়ের মধ্যে অন্ধের মতো চালাতে শুরু করেছে। একটি ছেলের মাথা ফেটে রক্তের ফোয়ারা, আরেকজন অজ্ঞান। লাল-পাগড়ির জোয়ার ডেকে এল—একটা প্রকাণ্ড হৈচৈ।

হাঁপাতে-হাঁপাতে একটা গাছতলায় এসে নেতিয়ে পড়লাম। কাপড়ে ফের মুছে নিয়ে ওর চকচকে মুখখানা দেখতেই বুকটার মধ্যে ঝিরঝির করে বাতাস

বয়ে গেল। যেন আমার মা কোন দূর দেশ থেকে আমার হাতের তালুতে ছোট্ট একটি চুমু পাঠিয়ে দিয়েছে।

শুয়ে পড়ি। ইচ্ছে করে ফের আহ্লাদি ওর দুই হাতে ঘাড়টা তুলে তলায় ওর ময়লা গন্ধওয়ালা বালিশটা গুঁজে দিক।

মাঠ শুধু প্রকাণ্ড নয়, বাজারও প্রকাণ্ড—আলোয়-আলোয় ঝলমল করছে। ঢুকতে গা ছমছমায়। কি কিনি? দিশা পাই না।

সামনেই একটা পুতুলের দোকান। এগিয়ে গিয়ে শুধোলাম—আমাকে একটা ডল দেবে?

দোকানী হাসে, ঠাট্টা করে বলে—মাগনা?

—না, না; কম দামের মধ্যে। আমার ছোট বোনটি তিনদিন ধরে একটা পুতুলের জন্য কাঁদছে, দুধের বাটি ফেলে দিচ্ছে, কাঁদতে-কাঁদতে তার জ্বর হয়ে গেল। তার জন্য একটা ভালো দেখে ডল দাও। এটার দাম কত?

—বহুত। এটা নাও। দাম দু'আনা।

দোকানী আমাকে ভেবেছে কি? বলি—এটা?

—পাঁচসিকে।

—আর কিছু কমিয়ে দাও না! বোনটির যে-পুতুলটা ভেঙে গিয়েছিল সেটা ঠিক এমনিই দেখতে—এমনি নীল চোখ, এমনিই ঘাঘরাটা। এক টাকা দি, কেমন?

টাকাটার চকচকে মুখখানি আবার, শেষবার দেখে নিয়ে দোকানীর হাতে দিলাম। দোকানী আপত্তি করল না, চুপ করে রইল।

দু'পয়সায় এবার চীনেবাদাম খাওয়া যেতে পারে। কিম্বা বিড়ি।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে একটি ভিক্ষুক দেখে মনে হয়, কত ঘণ্টা ধরেই না জানি ও এমনি নিষ্ফল কাকুতি করছে! পয়সা দুটো ওর পেটেই যাক।

এই পুতুলটার মা হবে আহ্লাদি—বেশ হবে। খুকির নাম কী রাখব?

পথ চিনে-চিনে ইস্কুলে যখন এসে পৌঁছি তখনো বাইরে তুলসীতলায় আহ্লাদির-দেওয়া তেলের বাতিটি নেবেনি।

দোরে পা দিতেই সমস্বরে সম্বর্ধনা এল—এই যে পচা। এই তো এসেছে। কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

—এসেছে?

আর্তনাদ করে মাস্টার তেড়ে বেরিয়ে এল। লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এল আহ্লাদি। পুতুলটা তাড়াতাড়ি কাপড়ের তলায় লুকিয়ে ফেললাম।

অন্ধকার হলেও মাস্টারের মুখ দেখে হৃৎপিণ্ড অসাড় হয়ে গেল। কাউকে পাঠিয়ে মেহেদির ডাল ভেঙে আনবার ধৈর্য মাস্টারের ছিল না। ডান পায়ের খড়ম তুলে নিয়ে হাঁকলে—চৌত্রিশ।

সব সরে দাঁড়াল।

আমার পিঠের হাড় কখানা চূর্ণ হয়ে গেল! চিৎকার করে উঠলাম—আমি পথ হারিয়ে গেছলাম, এত বড় কলকাতা শহর, কত কষ্টে এসেছি, কিছু খাইনি, আমাকে ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেছল।

মাথায় ছাব্বিশের বাড়িটা পড়তেই মাথাটা দু'হাতে চেপে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। পুতুলটাও আমার সঙ্গে ধুলিশয্যা নিতেই মাস্টারের বাঁ পায়ে খড়মের চাপে—চেঁচিয়ে উঠলাম—আমার পুতুল, আহ্লাদি—খুকি খুকি—অনেক অবান্তর কথা কয়ে ককিয়েছি, ও-কথার অর্থও কেউ বোঝেনি।

আহ্লাদি আমার কান্না শুনে কাপড় দিয়ে মুখ ঠাসছে। কিন্তু গলায় যে ওর নটরুর-দেওয়া পুঁতির মালাটা!

সমস্ত বুকে পিঠে ব্যথা, কিন্তু বুকের মধ্যে ব্যথা পুতুলটার জন্যে।

চাটায়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। খাওয়া বন্ধ—মাস্টারের হুকুম। নটরুটা বেজায় খুশি; বালিশটা আজও ওর বুকের তলায়।

পা টিপে-টিপে যেমন চলা, তেমনি আস্তে-আস্তে ঘুম ভেঙে গেল।

মাঝরাত, ঝিল্লি ডাকছে। হঠাৎ আহ্লাদির ঘর থেকে আর্ত চীৎকার উঠল—চোর, চোর!

ঘুম ছেড়ে সবাই হল্লা শুরু করেছে। মাস্টার লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল। সবাই আহ্লাদির ঘরে। ভয়ে কেউ একটা লণ্ঠন জ্বালাতে পর্যন্ত পারে না। শেষকালে আমিই জ্বালালাম।

আহ্লাদি তখনো থরথর করে কাঁপছে। মাস্টার বললে—কোথায় চোর?

আহ্লাদি বললে—হ্যাঁ, দরজা ঠেলে ভেতরে এসে আমার বিছানার ধারে বসল।

—তারপর?

সবাই চেঁচিয়ে উঠেছে।

—আমার গলাটা টিপে ধরে মালাটা ছিঁড়ে ছিনিয়ে নিল।

সত্যি-সত্যিই দেখলাম ওর সারা বিছানায় পুঁতিগুলি ঝরে পড়েছে—সোনালি পুঁতি।

—তারপর চোর বলে চেঁচাতেই দরজা খুলে বাঁশ-ঝোপের আড়াল দিয়ে পালিয়েছে—

—চল, চল, সবাই চল।

মাস্টারের হুকুমে বাঁশ-ঝোপের আনাচে-কানাচে খুঁজতে লাগলাম সবাই, লণ্ঠন নিয়ে।

নটরু বললে—সোনালি পুঁতি কিনা, চোর ভেবেছে বুঝি সোনার হার। ব্যেটা ভারি জব্দ হয়েছে তো।

আহ্লাদি ঠোঁট ফাঁক করে হাসে। বলে—বুক আমার এখনো কাঁপছে ভাই! বেটা কি জোয়ান, সিংহের থাবার মতো হাত, আর একটু হলে গলা টিপেই মারছিল আর কি।

নটরু গলা খাটো করে বললে—তোমাকে আমি সোনার হার দেব আহ্লাদি। তুই ভাবিসনে।

আহ্লাদি মিথ্যে কথা বলে। চোর কক্ষনো ওর গলা টিপে ধরেনি।

কত দিন পরে মনে নেই, ঘুম ভেঙে মনে হল আহ্লাদির সমস্ত গা আহ্লাদে ভরে গেছে। ওর গায়ে একটা ব্লাউজ।

জিগগেস করে ফেলি—কোথায় পেলি রে এ-জামাটা?

আহ্লাদি মুচকে হাসে, কথা যেন বেরোয় না—মাস্টার।

নটরু এসে বলে—কত দাম নিল রে আহ্লাদি?

এ কি অন্ধ ভিখিরীর ডালার আটাশ পয়সা? ঢের-ঢের দাম। উমির একরত্তি একটা ফ্রক-এর দাম নিয়েছিল সাড়ে-পাঁচটাকা। এমনি তার রঙ।

সাড়ে-পাঁচটাকা নটরু দেখেছে?

উমি আমার পাঁচ বছরের ছোট মামাতো বোন—ঠোঁটের কিনারে ছোট্ট একটি তিল। মনে পড়ে।

বাতিটায় তেল নেই, বইয়ের আখর ঝাপসা হয়ে আসছে। বলি—নন্তু, আহ্লাদির কাছ থেকে একটু তেল চেয়ে আনবি ? পড়াটা তৈরি করে ফেলি।

—তুই যা না। কেশে-কেশে আমার দম আটকে আসছে—আমি উঠতে পারছি না। তুমি কোন নবাবপুত্তুর।

ভুগে-ভুগে নন্তুর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে।

একটা মোটে বাতি। বাতিটা নিভে গেল।

হারান বললে—আহ্লাদি কি করেই বা তেল দেবে ? ওর তো জ্বর।

—জ্বর ? কে বললে ? বিকেলেও তো পেড়ে-পেড়ে কুল খাচ্ছিল।

—তাতে কি ? মাস্টার ডাক্তার পর্যন্ত ডাকতে গেছে।

কেষ্ট খুব কম কথা কয়। হঠাৎ বলে উঠল—মাস্টারের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। জ্বর আসতে না আসতেই ডাক্তার। আর নন্তু আজ পুরো একটা বছর কাশছে।

বাতি নিবতেই নটকু শুয়ে পড়েছিল। মাস্টারের খড়মের আওয়াজ দোরের কাছে আসতেই চেঁচিয়ে উঠল—পচা আলো নিবিয়ে দিয়েছে, পড়া করতে পারছি না।

আমিও চেঁচিয়ে বলি—তোর বালিশের তলায় তো বিড়ি ধরাবার দেশলাই আছে, দে না।

অন্ধকারে তারপর ভীষণ মারামারি শুরু হয়। লাভ হয় না কিছুই। মাস্টার বেত নিয়ে হাঁকে—একুশ।

আহ্লাদির জ্বরটা জোরেই এল বলতে হবে।

সাঁঝ সাতটা থেকে ভোর সাতটা পর্যন্ত বারো ঘণ্টা ভাগ করে তিনজন করে ডিউটি পড়ে।

সবার ভাগে চার চার ঘণ্টা। মাস্টার ঘুমোয়। তার ডিউটি দিনের বেলা। ইস্কুল আর বসে না।

ইস্কুলের খাতায় সব শেষে নাম বলে ডিউটিও পড়ল সব শেষে। সাতটা থেকে এগারোটা—ডিউটি পড়ুক আশা করিনি। ঐ টুকুন রাত তো প্রায় রোজই জাগি। এগারোটা থেকে তিনটে—ভারি সুন্দর সময় ! বরাতে নেই।

ঘরে ঢুকেই বললাম—ডোবায় নাইবি আর আহ্লাদি ?

আহ্লাদি দুটো হাত ধরে একেবারে বুকের কাছে টেনে বসিয়ে দেয়।

হঠাৎ শুধোই—তোর মাকে মনে পড়ে?

আহ্লাদি কি বলেছিল তার তাৎপর্য বুঝিনি। বলেছিল—ওর মা যখন চড়কতলায় খোলার ঘর ভাড়া নিলে তখন ও সাত বছরের। মাস্টারের পয়সায় ওদের দিন চলত। হঠাৎ ওর মা যখন মারা পড়ে, মাস্টার তখন ওর হাত ধরে শ্মশান থেকে বরাবর এই আশ্রমে নিয়ে আসে।

বলি—মাস্টার তোর কে হয়?

আহ্লাদি শুধু বলে—মাস্টার।

পাখা করতে-করতে আমার হাতে ব্যথা ধরে। ঘুম পায়। কাঁহাতক ঠায় বসে থাকা যায় চুপ করে?

—কি রে, ঢুলছিস? ঘুমোবি?

আবার পাখা চলে।

—আয়, ঘুমো।

আহ্লাদি আমার মুখটা একেবারে ওর বুকের উপর চেপে ধরে।

—কতক্ষণ আর! এগারোটা বাজতেই তো মাস্টার চুলের ঝুঁটি ধরে তুলে নিয়ে যাবে।

—যাক, এখনো তো এগারোটা হয়নি। বলে গুনে-গুনে আহ্লাদি আমার গালে ঠোঁটে এগারোটা চুমু দেয়। শব্দগুলি যেন আজও শুনতে পাচ্ছি।

দক্ষিণের জানলাটা খোলা ছিল।

নটরু একেবারে মারমুখো—কোমর কেছে এসে বলে—তুই আহ্লাদিকে চুমু দিয়েছিস?

প্রশ্ন শুনে তাক লেগে যায়।—দিয়েছি তো দিয়েছি, তোর কী?

—আমার কী? বলে সাঁ করে গালে এক চড় কষিয়ে দিলে।

কিন্তু যুদ্ধে সেদিন হারলাম না। আহ্লাদির চুমো আমার গায়ের সমস্ত রক্ত পাগল করে দিয়েছে।

নটরু কেঁদে ফেলেছে। বললে—মাস্টারকে আমি এখুনি বলতে যাচ্ছি।

যা না! এও বলিস আহ্লাদির চুমু না পেলেও পচার পঁচিশটা লাথি পেয়েছিস।

নটরু মাস্টারকে বলে না বটে কিন্তু নন্তর মাঝরাতের ডিউটি কেড়ে নেয়। বললে—খানিক বাদেই তো তোর ঘড়ঘড় শুরু হবে। তুই যা, বালিশে মাথা গুঁজে উবু হয়ে শুয়ে থাক গে যা। হেঁপোরুগী, ডিউটি দেয় না, যা।

নন্ত আপত্তি করে না। কিন্তু আমার মাথাটা যেন কেমন করে ওঠে।

নটরু দরজা ভেজিয়ে দেয়। আমি দক্ষিণের খোলা জানলার তলায় মাটির দেয়ালে পিঠ রেখে ঘুপটি মেরে বসে থাকি।

তেমনিই আহ্লাদি ওকে বুকের মধ্যে মুখ রেখে শুতে বলে। তেমনি একের পর এক ঘনঘন শব্দ হয়।

মাস্টার তখন ছিলিমে বসে ঝিমুচ্ছিল। ছুটে গিয়ে বলি—শিগগির আসুন, আহ্লাদির—

মাস্টার হুঁকো ফেলে দৌড়ে আসে। বলে—কী ?

—জানালা দিয়ে দেখুন।

মাস্টারের সঙ্গে আমিও মুখ বাড়াই। নটরুর মুখটা তখনো আহ্লাদির মুখের উপর। ওর খালি এগারো নয়, ওর বুঝি একশো-এগারো।

যা ভেবেছিলাম, তা কিছুই হয় না কিন্তু। মাস্টার শুধু নটরুর কান ধরে আলগোছে তুলে নিয়ে আসে। মাস্টারের পায়ে কি আজ খড়ম নেই ?

পরদিন আশ্রমকর্তা এসে নটরুকে আশ্রম থেকে নির্বাসিত করে দিলে।

মাস্টারকে বললে—এতগুলো ছেলের মধ্যে এত বড় মেয়ে রাখা উচিত হবে না। ওকে সরাও।

নটরুর যে একটা প্যাটরা ছিল, জানতাম না। যাবার বেলায় সেটা খুলল দেখলাম। নানান জিনিসে ভরা—লাট্টু, গুলি, আয়না, চিরুনি, এমন কি আহ্লাদির ভাঙা কাঁচের চুড়ি পর্যন্ত।

বলি—কোথায় যাবি এবার ?

—কোথায় আবার! পথে।

প্যাটরাটা গুছোতে-গুছোতে হঠাৎ থেমে বলে—এটা ঘাড়ে করে কোথায় বা নিয়ে যাব ? এটা থাক। আহ্লাদি ভালো হলে এটা আহ্লাদিকে দিয়ে দিস। ওর ব্লাউজ কাপড় রাখবে। দিবি তো পচা ?—বলে আমার হাত ধরে। প্রথম দিনও ও আমার হাত ধরেছিল।

আমার চোখ ছলছল করে ওঠে।

নটরু বললে—আমার কিন্তু একাই বেরুবার কথা নয়। তুই মাস্টারকে কেন বলতে গেলি? আমার মতো ডিউটি বদলে নিলেই তো পারতিস।

মাস্টার এসে হুকুম দেয়—পৌনে ছ'টার আগেই আশ্রম ছাড়তে হবে।

সবারই কাছ থেকে বিদায় নিতে-নিতে দেরি হয়ে যায়। মাস্টার পিছন থেকে ছুটে এসে নটরুর পিঠে সপাং করে একটা বেত আছড়ে বলে—দু'মিনিট দেরি হয়ে গেছে, দু'মিনিটে আঠারো।

কেষ্ট রেগে বলে—দেখি কেমন দুমিনিট বেশি হয়েছে! বার করুন ঘড়ি—আবার বেত পড়তেই নটরু 'মাগো' বলে ছুটে পথে বেরিয়ে গেল। বাকি বেতগুলি এবার নিশ্চয়ই কেষ্টর পিঠে পড়বে।

ডাক্তারের বাড়ি থেকে মাস্টার খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এল।

মাস্টার নটরুকে পুলিশে দেবে প্রতিজ্ঞা করলে। পথের পাশে অন্ধকারে গা ঢেকে মাস্টারের পায়ে বাঁশ চালিয়েছে।

ঘরে এসে বলি—বেশ হয়েছে। পা দুটো গুঁড়িয়ে গেল না রে!

বালিশ থেকে মুখ তুলে নন্তু উবু শরীরটা একটু দুলিয়ে হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে বলে—মাথাতেই তাক করে মারতে গেছলাম, কিন্তু ফসকে গিয়ে লাগল মাস্টারের পায়ে। ভয় করছিল বুকের সাঁই-সাঁই আওয়াজ পেয়ে চিনে ফেলে। বেটা এমন চোঁচা ছুটলে ভাই, শেষে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

আজ সমস্ত রাত নন্তুর পাশে বসে ওর বুকে হাত বুলিয়ে দেব। আহ্লাদির ডিউটি মাস্টার দিক গে।

আহ্লাদিকে কিন্তু মাস্টার সরাল না। ডোবার ধারে ছোট্ট একটি ঘরে আহ্লাদির কোয়ার্টার হল—বেড়া দিয়ে চারধার ঘেরা। হুকুম হল—যে ছেলে ঐ ধারে যাবে তার শাস্তি নির্বাসন।

তারপর—ভাবতে অবাক লাগে—দু'বছর কেটে গেল, তিন বছরও প্রায় ভরে এল—আহ্লাদিকে দেখি না। ঐ বেড়ায় ঘেরা ছোট্ট বাড়িটি ভোরের শুকতারার মতো দূর আর সুন্দর মনে হয়।

ঐ বাড়িতে কখন মিটমিট করে বাতি জ্বলে, কখন নিবে যায়, সব চেনা

হয়ে গেছে। বেড়ার ঢাকনি দেওয়া ঘাটে বসে গা ধুলে কখন ডোবার নীলচে জল চঞ্চল হয়ে ওঠে, জানি। ঘুড়ি ওড়াবার সময় ইচ্ছে করে ওর উঠোনে ঘুড়ি গোঁত মেরে ফেলে দিই, ও ঘুড়ি ছিঁড়ে রাখে—নীল সবজে বেগনী। তাতে লেখা থাকে আহ্লাদি, আহ্লাদি, আহ্লাদি!

আমি এখন সকল ছেলের পাণ্ডা—ইস্কুলে, সাঁতারে, খেজুর গাছে, মাটি চষায়, তামাকে আর বিড়িতে। দুপুরের ইস্কুল ছুটি হতেই মাস্টার আমাকে বললে—তিনদিনের জন্য তোকে আশ্রমের ভার দিয়ে যেতে চাই, পারবি? তুই তো এখন বেশ ওস্তাদ হয়েছিস।

—খুব পারব। আপনি কোথায় যাবেন?

—আমি আজ সন্ধ্যার গাড়িতে আহ্লাদিকে নিয়ে দেশে যাব। ওকে আর এখানে রাখব না, ওর পিসির কাছেই থাকবে।

আহ্লাদির আবার পিসি কে? এতদিন কোথায় ছিল? চুলোয়?

যাবার বেলায় আহ্লাদিকে একবার দেখতে পাই না? সন্ধ্যা উতরে গেল। গাড়ি নিশ্চয়ই কত বন নদী পেরিয়ে ছুটেছে। আহ্লাদি ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। যদি যাবার আগে দূর থেকে বেড়ার ফাঁকে একটুখানির জন্যেও ওর চোখ দুটি রাখত!

চেয়ে দেখি বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাতি দেখা যাচ্ছে। যাবার বেলায় আহ্লাদি তার বাতির স্মৃতিচিহ্নটি আমাদের জন্য রেখে গেছে। বাতিটা যদি বেড়ায় লেগে একটা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়ে সমস্ত আশ্রম পুড়ে যায়, বেশ হয়।

বারো বছরের ছেলের চোখে ঘুম আসে না। শেয়াল ডাকে, ঝরা পাতার উপর দিয়ে সাপ হেঁটে যায়, ন্যাড়া খেজুর গাছ অন্ধকারে প্রকাণ্ড ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে—বারো বছরের ছেলের ভয় নেই, ডোবার ধারে পায়চারি করে বেড়ায়।

হঠাৎ একটা চীৎকার শুনতে পেলাম। তিন বছর পর হলেও আহ্লাদির কান্না চিনতে দেরি হল না। তবে কি আহ্লাদিরা যায়নি? ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে?

ছুটে মাস্টারকে জাগাতে গেলাম। কেউ নেই। দেয়ালের কোণে হুঁকোটি পর্যন্ত নেই। তার মানে?

—কেষ্ট, কেষ্ট, কে কাঁদছে শুনতে পাচ্ছিস? আহ্লাদি?

—আহ্লাদি? আহ্লাদি?

ঘুম ভেঙে সব উঠে দাঁড়াল আতঙ্কে! নন্তু পর্যন্ত।—কোথায়?

আমরা সব সজ্জিত হয়ে নিলাম। বাঁশের লাঠি, দরজার খিল, ভাঙা ছাতা, লোহার ডাণ্ডা, পকেট ভরে ঢিল ছুরি দেশলাই নিয়ে এগোলাম। বললাম—আস্তে-আস্তে আয়, হল্লা করিস নে, হৈচৈ করলেই চোর পালিয়ে যাবে কিন্তু। বসন্ত বললে—আজ নটরু থাকলে কোনো ভাবনা ছিল না।

বললাম—তোরা চারপাশ ঘিরে থাকবি, আমি লোহার ডাণ্ডাটা নিয়ে সটান ঢুকে যাব ঘরে। চেঁচালেই সব হুড়মুড় করে এসে পড়বি।

কান্নার বিরাম নেই, বাতাস চিরছে।

—আর যদি ভূত হয় আমাদের এতগুলোর চেঁচামেচিতে পাত্তাড়ি গুটোবে। রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কি?

সবাই বেড়ার চারধারে বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নটরুর চেয়ে আমি যে কিছুই কম নই দেখাবার জন্য লোহার ডাণ্ডা নিয়ে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

বসন্ত বললে—জোরসে চেঁচাস কিন্তু। আমরা সব হুড়মুড় করে পড়ব।

বাতিটা উসকে দিয়ে, দেখলাম, আহ্লাদি মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে গোঙাচ্ছে; ভালো করে চেয়ে দেখি, ওর পায়ের কাছে একটা মেয়ে; মরা। মাটি রক্তে ভেজা—

আহ্লাদির গা ঠেলা দিয়ে ডাকি—আহ্লাদি! আহ্লাদি!—

ওর গা ঠাণ্ডা!

চীৎকার শুনে বাইরে থেকে সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—মার, মার, মাথা ফাটিয়ে দে—

খোলা দরজা দিয়ে সবাই হুড়মুড় করে তেড়ে এসে পড়েছে। দু'হাতে ওদের ঠেলে দিয়ে বলি—সরে দাঁড়া।

ওরা সব স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে। কারো মুখে রা নেই।

আমার পুতুল মাস্টার খড়মের চাপে চেপটে দিয়েছিল, নিজের পুতুল সে নিজেই ভাঙল।

বাতি নিবে যায়।

পথে বেরিয়ে আসি—অনাথ। হঠাৎ সমস্ত শাসন যেন শিথিল হয়ে গেছে। নৌকোর যেন আর নোঙর নেই—ভেসেছে এবার।

তরিতরকারির বাজার। একজনকে বলি—মুটে লাগবে?

—কত নিবি? মোড়ের ঐ যে দোকান চুল ছাঁটবার—

—যা দেন—

মুন্সি আমাকে ওর দোকানে নিয়ে আসে। বলে—কোথায় থাকিস? কে আছে তোর?

—এখন থেকে কোথায় থাকব জানি না। নেই কেউ।

—কি নাম তোর?

—কাঁচা, কাঞ্চন।

—আচ্ছা, এখেনে থাকবি? শুধু খোরাকি আর আস্তানা।

উৎফুল্ল হয়ে উঠি—হ্যাঁ—

মুন্সি বললে—কিন্তু নাম বদলাতে হবে, ভোল বিলকুল ফেরাতে হবে, কেউ যখন নেই, ভাবনা কি?

ভয় পেলেও মুখে বলি—তাই সই।

॥ আসমানি ॥

মুন্সি ডাকে—এ মকবুল !

বললে—কিচ্ছু ভাবিস নে তু। পথে-পথে তো ঘুত্তিস, এবারে একটা হিল্লে হয়ে গেল। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে—আমার ভাজির সাথে তুর সাদি দেব।

একটি ভদ্রলোক এসে ঢুকল।

—মকবুল !

চেয়ার এগিয়ে দি, কাঁচি ক্ষুর ক্লিপ পাউডারের বাটি গুছোই, ভদ্রলোকের গায়ে একটা শাদা কাপড় জড়াই, হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করি।

ভদ্রলোক তার মোটা চশমাটা তাকের উপর ফেলে রাখে, মুখের আধা সিগরেটটা রাস্তায় ছুঁড়ে মারে, গ্যাঁট হয়ে পা মেলে মুন্সিকে বললে—ধারগুলি সব প্লেন।

পাখা করতে-করতে এক ফাঁকে আজিজ মিঞার পাশে বসে ওর বিড়িটায় একটা টান দিয়ে শুধোলাম—মুন্সির ভাজির নাম জানিস ?

আজিজ ফট করে বলে বসল—আমিনা। খাসা !

নামটা যেন ওর জিভের ডগায়।

বললাম—বয়েস ?

আজিজ কালো দাঁতগুলি বার করে ফেলল। বললে—তেত্রিশ।

মুন্সি আবার ডাকে—মকবুল !

ভদ্রলোকের ঘাড়ের উপর বুরুশ ঘষি, কাপড়টা চট করে সরিয়ে পিছনের দিকে কাত করে আয়না ধরি !

ভদ্রলোক বললে—বেশ।

মাথায় জল ঢেলে মাথা টিপে দি।

ভদ্রলোক বললে—আর একটু।

আমার হাত দুটো টেনে এনে চোখের উপর রাখে, আঙুলগুলি বাবুর চোখের পাতার উপর বুলিয়ে দি। মুন্সিকে দাম চুকিয়ে চশমাটা এঁটে পকেট

থেকে সিগরেট বার করে ধরিয়ে পথে নামবার আগে আমার হাতটা টেনে মুঠোর মধ্যে কি একটা গুঁজে দিল।

আজিজ হাঁ হয়ে গেছে। বললে—মুন্সি আধঘণ্টা ক্লিপ ঘষে যা পেল না, দু'মিনিট বুরুশ ঘষে তুই তার দুনো কামালি। লে, বিড়ি আনি গে।

—ইস ?

করকরে আধুলিটা ট্যাঁকে গুঁজে রাখি।

আমি কিন্তু আমিনার বয়স এগারোর বেশি বলে কিছুতেই ভাবতে পারি না। ওর পরনে নিশ্চয়ই ঘাঘরা নেই, কলমিফুলি শাড়ি। দু'টি হাতের তালু মেহেদির পাতায় রাঙা; ওদের উঠোনের ধারে নিশ্চয়ই পানায় ভরা পুকুর, নীলচে জল, দুটো হাঁস পাক খোঁড়ে। পুকুরের পাড়ে পেয়ারা গাছ, কচি পাতার তলায়-তলায় কড়া পেয়ারা।

ভদ্রলোক দুদিন অন্তর আসে—পকেটে ক্ষুর সাবান স্ট্রপ নিয়ে। বলে—দাড়িটা কামিয়ে দাও মকবুল মিঞা।

দাড়ি কামিয়ে ড্রেস করি, তেমনি করে চোখের পাতায় আঙুল বুলোই। অনেকক্ষণ। মুন্সির দোকানের প্যাটরার ফাঁকে দুআনি পড়ে, আমার গাঁটে ঢোকে দুনো।

সেদিন আজিজ মিঞা এগিয়ে গেল। ভদ্রলোক বললে—তুই-ই আয় মকবুল!

আজিজ বললে—ওর গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে।

—দাড়ি কামানো যায় না? তাতে কি রে?

অল্প একটু হাসলাম। আজিজ ক্ষুর-টুর ছড়িয়ে রেখে মুখ ভার করে বেঞ্চিটার উপর বসল।

আজিজকে গিয়ে বললাম—আজকের আধুলিটা তুই-ই নে।

আমার হাতটা ও ছুঁড়ে দিল; বললে—তোর রোজগার আমি নিতে যাব কেন? পরে কি একটা কথা বিড়বিড় করে বললে—স্পষ্ট বোঝা গেল না। সেদিন ভদ্রলোকের আসবার সময়-সময় বেরিয়ে পড়লাম।

আজকে আজিজই দাড়ি চাঁছুক। ঘণ্টাখানেক টহলদারি করে ফিরে এসে শুধোই—বাবু এসেছিল রে আজিজ?

আজিজের গাল দুটো গুম হয়ে আছে। বললে—তোকে খোঁজ করলে—

—কামাল না? কত দিলে তোকে?

—প্রায় দশ মিনিট ধরে ড্রেস করলাম—শালা একটা পয়সাও দিয়ে গেল না।

—মুখ খারাপ করিসনে আজিজ, খবরদার।

—মারবি নাকি?

এক হাতে লুঙ্গির খানিকটা তুলে ধরে ও তেড়ে এল।

মুন্সি মাঝখানে এসে পড়ল। ওকে ঠেসে ধমকালে, আমাকে টুঁও বললে না।

ও বিড়-বিড় করে বললে—কোন শালা এমনি করে—

দোকান ছেড়ে চলে গেল। মুন্সি বললে—হোটেলে খেতে গেল।

বললাম—আমার সাত পয়সা?

মুন্সি হাসল, বললে—তুই তো কত কামাচ্ছিস—

—বা, ও তো আমার উপরি পাওনা। আমার বরাদ্দ খাবার পয়সা আমি ছাড়ব কেন?

—আচ্ছা, এই নে। উপরি পাওনা দিয়ে কি কববি?

চট করে মুখে আসে না। কিন্তু মনে-মনে দেখি আমার সব সিকি আধুলি সোনার ফুল হয়ে গেছে; পুঁতির মালা নয়—আমিনার গলায় পুষ্পহার।

আজিজ গামছা ফেলে গেছল। বললাম— খাওয়া হয়ে গেল?

আমার কথায় রা করলে না।

—আর জন্মে ঠোঁটের কাছের আঁচিলগুলি সব চেঁছে রঙটা আর একটু মেজে আসতে পারিস, এ-দিক ও-দিক দু'চার পয়সা ট্যাঁকে গুঁজতেও পাবি আর আমিনাও কপালে লাগ-লাগ লেগে যেতে পারে। এজন্মে—

আজিজ নিজে কথা কয় না বটে, কিন্তু ওর পাঁচটা আঙুল একসঙ্গে কথা কয় আমার পাঁজরার উপর।

খিলখিল করে হেসে উঠি। তার কারণ আছে—আজিজ মিঞার ঘুষির ওজন বিরিশি সিকে।

মাথায় গামছা বেঁধে বেরুতে যাচ্ছি, মুন্সি বললে—আগাম হপ্তায় দরগায় যেতে হবে রে মকবুল। মোল্লা বলে পাঠিয়েছে। সেইদিনই কলমা পড়তে হবে রে।

গা-টা ছমছমায়।

দরগায় যেতে হল না কিন্তু। সেদিন ভদ্রলোক ক্ষুর সাবান নিয়ে এসে নিশ্চয়ই ঘুরে চলে গেছে।

দোকানের ঝাঁপ পড়েছে।

টাঁলিগঞ্জে মুন্সির বাড়ি। রোদে টো-টো—লুঙ্গি ফটফট করতে-করতে এক হাঁটু ধুলো নিয়ে মাটির ঘরের ভাঙা কবাটের কড়া নাড়ি।

মুচি-পটির এঁদো রোগা গলিটা চামড়ার গন্ধে সমসম করছে।

দরজাটা একটু ফাঁক করে কে খুললে। ভাবলাম এই বুঝি তার মেহেদি-পাতায় রাঙা হাতের তালু—ছোট-ছোট নখের ধারে আবছা হয়ে এসেছে।

সমস্ত হাত পা ঝিঁ-ঝিঁ করে উঠল।

মুন্সি বেরিয়ে এসে বললে—কে, মকবুল ?

বললাম—আমার প্যাটরাটা মুন্সি—

—হ্যাঁ, কি হবে প্যাটরা দিয়ে ?

—নিয়ে যাব।

—তু ক্ষেপেছিস মকবুল মিঞা ! প্যাটরাটা মাথায় করে সারা শহর ঢুঁড়বি নাকি ? যদি কোথাও জিরোবার জায়গা পাস, নিয়ে যাবি। এখন থাক না হেতা !

—কোথা আছে ওটা ?

—আমিনার ঘরে। খোলবার কিছু দরকার আছে ?

একটা প্যাচপেচে ঘরে মুন্সি আমাকে নিয়ে এল। চট করে চারদিক একবার চেয়ে নিলাম। একটা তক্তাপোশের উপর চিটচিটে বিছানায় গুটি কয়েক বেড়ালের বাচ্ছা চোখ মিটমিট করছে। এটাকে আমিনার ঘর ভাববার কোনো জো নেই কিন্তু। পাতলা তক্তাপোশের নিচে একজোড়া মেয়েলি চটি ; কিন্তু আমিনার বয়স কি এগারো নয় ?

মুন্সি বললে—তোর ওপর ভাজির কিন্তু ভারি টান পড়েছে রে মকবুল। একদিন আমাকে না বলে ক'য়ে প্যাটরা থেকে তোর বইগুলি খুলে সে কি মনোযোগে পড়া। যেন বুকে আঁকড়াতে চায়।

আমার বুকটা চিতোয়। বললাম—পড়তে জানে নাকি ও ?

—জানে না আবার ! রাতদিন তো বইয়ের মধ্যেই ডুবে থাকে—

ভারি খুশি লাগল।—ওর ভালো লাগলে আমার বইগুলি যেন ও রেখে দেয়।

মুন্সি আহ্লাদে ডেকে উঠল—আমিনা! আমিনা!

ভাবলাম, এই বুঝি ওর ছুটে আসার পায়ের ছোঁয়ায় সমস্ত ঘরটার অদলবদল হয়ে যাবে। কিন্তু আমিনার সাড়া নেই। মুন্সি বললে—বেটির ভারি সরম।

প্যাটরাটা খুলে দেখি, কে যেন সব ঘেঁটেছে। আমিনার হাতের ছোঁয়া কি ঘাঁটা পুঁথি-খাতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে?

গেঞ্জির ও-পিঠে একটা ছিটের তালি লাগিয়ে পকেট করেছিলাম; তার থেকে পাচটা টাকা বার করে বললাম—এই টাকা কটা প্যাটরায় এই টিনের কৌটোর ভেতরে রাখি মুন্সি। আজিজ মিঞার আস্তানায় ছোঁড়াগুলি সুবিধের নয়।

মুন্সি ঘাড় কাত করে তাড়াতাড়ি বললে—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই ভালো। আজিজেরা তো গাঁটকাট। এখানেই থাক। তোর ভাবনা নেই মকবুল।

—তালা নেই কিনা, আমিনা যেন একটু চোখ রাখে। ওর ঘরেই যখন রইল।

—তোর জিনিসের ওপর বেটির ভারি চোখা চোখ।

—আর যদি ওর খুব দরকার হয় এক-আধ আনা খরচও যেন করে।

আমিনা জেনে নিশ্চয়ই গর্ব বোধ করবে যে তার দুলহা ফকির নয়।

মুন্সি ফের আহ্লাদে ডেকে উঠল—আমিনা! আমিনা!

আমিনার সরমের মাত্রাটা একটু বেশি বলতে হবে।

যাবার আগে মুন্সি বললে—দরগায় কবে যাবি রে মকবুল? ভাজি তো দিনের পর দিন ডাগর হতে চলল।

—কামাতে পারি না এক পয়সা, সাদি কি মানায় মুন্সি?

—কি যে বলিস! মোছলমানটা হয়ে নে, তোকে আমি ডিপটি করে ছাড়ব। অঙ্কে তোর এমন মাথা! মোল্লা কালও লোক পাঠিয়েছিল রে।

—আচ্ছা এ-হপ্তাটাও যাক। একটা হিল্লে করে নি।

মুন্সি কিছু বলবার আগেই পথে নেমে পড়লাম। নিজেকে আর একটুও ঢিলে লাগে না। সাঁ-সাঁ করে চলি। গেঞ্জির পকেটে এখনো ন'সিকে—একটা দোকানে গিয়ে বালির কাগজ আর পেনসিল কিনি।

আস্তানায় খালি-খালি বিড়ি পাকাতে ভালো লাগে না। ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে পচা ইয়ার্কি দিই, ছপ্পুর সাত বারের বার নিকে করা ছুঁড়ি-বৌটাকে নিয়ে ওরা গান বানায়, আমিও সুর ভাঁজি। তারপর রাত অনেক হয়ে গেলে বাড়ি

ঘর দোর আঁধিয়ার আকাশ—সব যেন কেমন করে ওঠে। ঘুম আসে না। কুপিটা জালিয়ে পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি আঁচড় কাটি, কি যেন বলে বোঝাতে চাই, পারি না।

কুপির ছিপিটা খুলে খানিকটা কেরোসিন আজিজ মিঞার নাকের মধ্যে ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে। ওর নাকের কল বিগড়েছে।

ভাদ্রের গঙ্গা—শান দেওয়া ছুরির মত ধার!

শান বাঁধানো পিছল ঘাটের সব শেষের সিঁড়িটায় বসে জলে পা ডুবিয়ে চেয়ে থাকি। ইচ্ছে করে ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে সাঁ করে ছুটে যাই ফেরি বোটের চাকার মতো! ঐ বাঘা জাহাজটার চোঙার আওয়াজের মতো জলে হুসহুস করি!

বাঁধানো ঘাটে নানা বামুনের দল কেরোসিনের বাক্স সাজিয়ে চন্দনের বাটি নিয়ে বসেছে। সমুখে দলে-দলে মেয়ের ভিড়—কারুর মাথায় ঘোমটা, কারু বা পিঠের উপর চুল মেলা। বামুন আমার লুঙ্গি দেখে কিড়মিড় করে উঠল। মেয়েরা একটু সরে বসল, কেউ বা একটু তাকাল, বা তাকাল না। বললাম—ঘণ্টাখানেক বাদে লুঙ্গিটা ছেড়ে গলায় একগাছা ধোলাই পৈতে ঝুলিয়ে এলেই এগোতে দেবে তো বামুন ঠাকুর?

একটি মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

পরের দিন গলায় শুধু পৈতে নয়—একেবারে বাক্স জল-চৌকি কোশাকুশি ধূপ চন্দনের বাটি নিয়ে বাঁধানো ঘাটের ধারে অশ্বত্থ গাছের তলায় এসে বসলাম। আজিজ মিঞাকে রোজগারের থেকে কিছু বকশিস দিতে হবে। বেচারা মাথায় করে জিনিসগুলি পৌছে দিয়েছে কিন্তু।

বামুনের ঘুম তা হলে খুব ভোরে ভাঙে না। বামুন যখন ঢিকোতে-ঢিকোতে আসে নদীর জলে রোদ তখন চটচট করছে। আমাকে দেখে তেড়ে এল, বলে কিনা, মোছলমান!

হেসে বললাম—আড়াই হাত গামছা যেমন তোমার, তেমনি ডোরাকাটা লুঙ্গি হাল-বাবুদের ফ্যাশান।

মেয়েদের বললে—ও আস্ত মোছলমানের বাচ্চা, ওর থেকে ফোঁটা নেবেন না।

—না মা, আমি খাঁটি বামুনের ছেলে, কোন্নগরের চাটুজ্জে আমরা—অবস্থার দোষে—

আরো বললাম—ও লোকটা ভারি পাজি, মিথ্যেমিথ্যি যা তা বলে ; পরনে লুঙ্গি থাকলেই যদি মোছলমান, তবে সমস্ত বর্মা দেশটাই পীরের মুলুক।

বুড়ি মেয়েমানুষটি বললে—না বাবা, কাত্তিকের মতো মুখ, এক্কেবারে আমার ছেনাথের মতো ! ওলাবিবি ছেনাথকে গেরাস করলে বাবা, বাছা আমার কাটা পাঁঠার মতো—

বুড়ি হাপুস কাঁদছে। শ্রীনাথ কবে বঁড়শিতে বেলে-মাছ ধরেছিল, কবে চিনি চুরি করে খেতে গিয়ে নুন খেয়ে ফেলেছিল, বুড়ি সে-কথা উল্লেখ করতেও ভুললে না।

চোখের জল মুছে ফেলতেও দেরি হল না কিন্তু। বললে—ভালো করে ললাটে চন্দন চর্চিত করে দাও তো কাত্তিক। রোদ চড়া হতেই মাথার রগ দুটো দপদপ করতে শুরু করে। বেশ করে লেপে দাও তো ছেলে !

থুতনিটা ধরে আদর করতে চায়। কিন্তু পয়সা দেবার বেলায় সেই একটাই।

রোজগেরে সাড়ে চারআনা পয়সা বামুনের হাতে দিয়ে বললাম—একটুখানি ঠাঁই করে নিতে দাও বামুনঠাকুর। তোমার ব্যবসার ক্ষেতি হবে না।

পয়সা পেয়ে বামুন হাসে।

ভারিক্কি কছমের মেয়েরা বললে—এ চুনোপুঁটি বামুনঠাকুরটি আবার কোত্থেকে জুটল ? ছেলেবয়েস থেকেই মন্দ ব্যবসা ফাঁদেনি।

বামুন বললে—সাক্ষাৎ গণেশঠাকুর মা। গোটা মহাভারতটা কণ্ঠস্থ। ওর হাতের ফোঁটা বিষ্টুর চন্নামৃতেরই তুল্য।

এক ফাঁকে বললে—সংস্কৃত শ্লোকটা মুখস্থ করে ফ্যাল্। দুটো লাইন আওড়ায়—অনুস্বার বিসর্গে ভরতি। বার কতক শুনে কোনো রকমে নকল করে কড়মড় করি। ও বললে—এতেই হবে।

ওর কাছে মা, আমার কাছে মেয়ে।

বাঁ হাত দিয়ে চিবুকটা লেপটে ধরি, ডান হাত দিয়ে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা কাটি। অশ্বত্থের কচি পাতার মতো মুখ বাতাসে তুলতুল করছে। দুটি ফুরফুরে ঠোঁট ফুঁয়েই যেন উড়ে যাবে।

বললাম—তোমার নাম কি ?

লজ্জায় চোখের পাতা দুটি নামায়—কথা কয় না।

—কোথায় থাকো?

এবারও না।

—গঙ্গায় নাইতে তোমার খুব ভালো লাগে?

ঘাড় কাত করে চুলবুল করে। একটু হাসে। রা কাড়ে না, সরম খালি একলা আমিনাবিবিরই নয়!

বললাম—পড়তে জানো?

এবার মেয়েটির ঘাড় অনেকখানি হেলে। আওয়াজও একটু বেরোয়—হ্যাঁ।

—বাড়ি গিয়ে আয়না দিয়ে মুখ দেখো, কেমন?

আবার ঘাড় বাঁকায়।

ওর কপালে চন্দন দিয়ে উলটো করে লিখে দিয়েছি—কালকে আবার এসো।

কিন্তু কালকে আর মেয়েটি আসে না।

ছপ্পুর বউ হাতছানি দিয়ে ডাকে।

আজিজ বললে—আমাকেই। বলে বিড়ির কুলোটা ফেলে হনহন করে ছুটে গেল। মাঝের ডাস্টবিনটা এক লাফেই ডিঙিয়ে ফেললে। কিন্তু জানলা বন্ধ হয়ে গেল যে। আজিজ শিস দিতে-দিতে ফিরে এসে জিভটা ভারি করে বললে—বেটি ভারি লাজুক তো!

খানিক বাদে আবার জানলা খোলে—আবার হাতছানি।

হামিদ উঠে পড়ল এবার। ছপ্পুর বউ দুই হাত দিয়ে না করে উঠল। তবু হামিদ তেড়ে গেল দেখে জানলা দুটো বন্ধ করে দিলে। হামিদ মাঝ পথ থেকে ফিরে এল।

তেমনি আবার আঙুল নেড়ে-নেড়ে ডাকা।

এবার আমি উঠলাম—শেষবার। জানলা বন্ধ হল না। বন্ধ তো হলই না, জানলার ফাঁকে ডিবেটা জ্বালিয়ে ধরল। আমাকে পথ দেখায়।

সরাসর দাওয়ায় উঠে এলাম। ভিতর থেকে ডাক এল—ঘরে আয় মকবুল।

ছপ্পুর বউ নাম জানে তা হলে।

মাথাটা চনচন করে উঠল। বললে—ছপ্পু গেছে কামারপোলে কোন বিয়ে বাড়ির ছাপ্পর তুলতে, রাত করে ফিরতে পায়নি। তোর আজ এখানে শুতে হবে।

ও আরো পরিষ্কার করে বললে—রহমৎ দারোগার চাউনি ভারি তেরছা, মকবুল। তা ছাড়া ঐ আজিজ হারামজাদা, আমাকে একলা পেয়ে যদি ব্যাটারা আজ দরজা ধাক্কায় ?

বললাম—আর আমিই কি ওদের লাঠি ঠেকাতে পারব ?

—তবু তুই একটা ভর, মকবুল।

—আমার পাঁকাটির মতো হাত ওদের কটা ঘুষির সঙ্গে লড়বে ? একটা জোয়ান লোককে পাহারা দিতে ডাকলেই ভালো হত।

—তা হলে রহমৎকেই ডাকব নাকি রে ? বলে কি রকম করে জানি হাসে। হাসিটাও নিশ্চয়ই সিধে নয়, তেরছা।

রাত তখন পেকে এসেছে। বিবি বললে—খাবি ? গোস্ত ছিল টাট্‌কা।

বললাম—না। ঘুম পাচ্ছে বেজায়।

উঁচু তক্তাপোশটায় বিবি বিছানা করে দিলে। বললে—শো।

—আর তুই ?

মাটির উপর মাদুর বিছিয়ে বললে—হেতা, মাটিতে।

—দোরটা ভালো করে এঁটেছিস তো বিবি ? দেখিস।

বিবি ডিবেটা নিবিয়ে দিলে। বললে—হ্যাঁ রে হ্যাঁ ! আমার চেয়ে যে তোর বেশি ভয় !

আজিজ মিঞা কি ভাবছে ? এখনো বিড়ি পাকাচ্ছে বুঝি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বিবি ডাকল—মকবুল।

বিবির বুঝি ঘুম আসছে না। বললাম—মাটিতে শুলে ব্যায়রাম হবে বিবি, খাটে উঠে আয় !

বিবি কিৎকিৎ করে হাসে ; বললে—তোর পাশে ?

—কেন, আমি তো আর রহমৎ নই।

বিবির মাটিতে শুয়েই ঘুম আসে কিন্তু।

অনেক রাতে সত্যিসত্যিই কে দরজা ধাক্কায়।

বিবি চেঁচিয়ে উঠে আমাকে জাপটে ধরলে, বললে—রহমৎ দারোগা এল বুঝি ! কি হবে মকবুল ?

আমাদের হল্লা যতই চড়ে, ধাক্কা ততই বেখাপ্পা হয়।

দরজাটা ভেঙে ফেলেছে। ধুপ করে মাটিতে নেমে দেশলাইটা জ্বালিয়ে দেখি—রহমৎ নয়, আজিজ মিঞা। পিছনে হামিদ আর আলি।

ওরা যার জন্যে গান তৈরি করে এতদিন সুরের কসরত করল তার দিকে একটিবার ফিরেও চাইল না। আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমারই জন্য যেন ওরা ওৎ পেতে ছিল—এমনি।

আমার চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকি দিতে-দিতে আজিজ বললে—এত রাত হয়ে গেল, আস্তানায় ফেরবার নাম নেই।

হামিদ লাথি মেরে বললে—পরের বাড়ি আসনাই?

ওরা আমার অভিভাবক—শাসন করছে!

রহমৎকে না দেখে বিবির বোধ হয় মন ওঠেনি। আর চেঁচামেচি নেই—প্রতিবাদ নেই, কড়ে আঙুলটিও তুলল না। আস্তে-আস্তে ডিবেটা জ্বালিয়ে দোরের পাশে রাখল।

ওরা আমাকে ঠেলে পথের কাদায় ফেলে দিলে। বিবির আর ভয় নেই। এবার ওর তিনজনই রক্ষক। রহমৎ আর ডরে আসবে না।

বাকি রাত আস্তানায় নয়, কাটাই ফুটপাতের উপর। ময়লা গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে পথ চলা শুরু হয়। সকাল থেকে দুপুর—দুপুর থেকে রাতের তারার চোখ চাওয়া তক। খালি রাস্তার জলের কল টিপে-টিপে পথ ভাঙা।

যেখানটায় ভির্মি দিয়ে পড়লাম চোখ চেয়ে দেখি বাড়িটার গায়ে লেখা—মহেশ্বরী ইটিং হাউস।

লুঙ্গি পরনে থাকলে কি হবে, গেঞ্জির তলায় পৈতে দেখে সবাই আশ্বস্ত হল। কর্তা বললে—সারাদিন কিছু খাসনি? এই বিশে, একটা রুটি এনে দে তো।

কর্তা বললে—বাড়ি কোথা?

রুটি খেতে-খেতে একটা দুঃখের কথা বানিয়ে বললাম। বললাম—এখানে একটা কাজ দিন।

—বেশ, থাক, চায়ের কাপ টেবিল সাফ করবি, থেকে যা।

মাইনের কথা কিছুই বলে না।

বিশে বললে—কি নাম তোর?

একটুখানি ভেবে নিতে হল। বললাম—কাঁচা।

বিশেটা হাসে। বললে—ঐ বাবুরা এসেছে। টেবিল পুঁছে দে গে যা।

আবার টালিগঞ্জের পথে।

কড়া নাড়তে হয় না, দরজা খোলাই আছে; আমিনার ঘরও খোলা, বিছানাপত্র কিছুই নেই কিন্তু। ডাকি—মুন্সি! সাড়া পাই না। ডাকি—আমিনা!—আমিনার যে সরম!

আমার প্যাটরাটা এক কোণে পড়ে আছে বটে। খোলা সেটাও। হাটকাই, টিনের কৌটোটা নাড়ি-চাড়ি কিন্তু ভিতর থেকে কিছুই বাজে না।

মুন্সি যে বলেছিল আমিনা দিনরাত্রি বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল না। শেষকালে বইগুলি প্যাটরায় করে মাথায় নিয়ে টালিগঞ্জের পথ ভাঙতে হয়।

বিশে টেবিলে পা তুলে দিয়ে বললে—পা টিপে দে।

কর্তা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। অগত্যা টিপেই দিতে হয়। কিন্তু বিশেরই জামার পকেট থেকে দু'পয়সা সরিয়ে এক টুকরো সাবান কিনে আনতে হবে দেখছি।

চেয়ারের পায়াগুলো অমরত্ব লাভ করেছে এ-কথায় কোনো সন্দেহ নেই। বিশে তো নয়, হাতি! তে-থাঁজ একটি পৈতৃক ভুঁড়ি রোজ প্রায় এক পো তেল খায়—প্রথম থাঁজে সারিসারি বিড়ি রাখে, দ্বিতীয় থাঁজে দেশলাইর কাঠি। বিশের ঘাড় লাট্টুর আল্-এর মতো এইটুকুন!

বললে—ঘাড়টা ডল।

বিশে দোকানের হিসেব রাখে। ওর দোর্দণ্ড প্রতাপ, যখন খুশি থাবড়ায়, যখন খুশি উপোস করিয়ে রাখে।

বিশে কর্তার শালা।

'রেস্'-এর দিন। সাঁঝের শেষে বেজায় ভিড়। এইখানে ফাউল কাটলেট, ঐ ওখানে আবার ছোট কাপ। ছুটে-ছুটে হা-ক্লান্ত। বিশেটা খালি বাঁ হাতে বিড়ি টানে, আর হাতে পয়সা গোনে।

—এ মকবুল।

হাতের উপর চায়ের কাপটা কাত হয়ে পড়ে গেল। চমকে উঠলাম—বাবু! বাবু বললে—এখানে কবে থেকে? গলায় যে একেবারে পৈতে ঝুলিয়েছিস! ব্যাপার কি ?

বাবু হাসে।

—সে অনেক কথা।

—আচ্ছা, চার ডিস কারি এনে দে, ফাউল।

অনেক কথা আর বলা হয় না। যাবার সময় বাবু তেমনি হাতের মধ্যে কি একটা গুঁজে দিলে। বাবুর একজন সঙ্গী বললে—আমাদেরও কনট্রিবিউশন আছে হে!

বিশে নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছিল। সাইনবোর্ডের মাথার আলো নিবতেই দৌড়ে থপথপ করতে-করতে পাশের ঘরে এসে হাঁকলে—ট্যাঁকে কি গুঁজেছিলি রে তখন ?

—কখন আবার গুঁজতে গেলাম ?

—হেই তখন, চশমাচোখো বাবুর ঠেঙে?

—কোথায় চশমাচোখো ? কত এল গেল, কে কাকে মনে করে রেখেছে!

—যা-যা ফাজলামো নয়। ছাখা, কত দিলে—বলে ট্যাঁকে হাত দিতে চায়।

—ট্যাঁকে হাত দিস নে বিশে, খবরদার!

রাগে বিশের ভুঁড়িটা হাঁপায়।—কী? বলে তেড়ে এসে আমাকে একেবারে ওর ভুঁড়ির ওপর আছড়ে ফেললে। বাকি খাঁজটায় এবার আমাকেই গোঁজে আর কি! আধুলিটা ছিনিয়ে নিয়ে বললে—আমার আদ্দেক।

রুখে, লাফিয়ে উঠলাম।—ইঃ? আমার রোজগেরে পয়সা। তোর কি পাওনা আছে এতে?

—আমি দোকানের ক্যাশিয়ার না?

—তাতেই তো তোর অনেক পয়সা রোজগার। এর ওপর আবার চোখ কেন?

—কী?

রাগে বিশের পা-টা ধাঁই করে আমাব বুকের উপর এসে লাগল। কেঁদে ফেললাম। কর্তা কিন্তু বাকি মাংসটা শেষ করতে-করতে হাসছে।

চোখের জল মুছতে-মুছতে বললাম—বিশে আমার পয়সা নিয়েছে।

—তা তো নেবেই।—কর্তা বলে।

—বাঃ, আদ্দেকই ও নেবে? এ কেমন কথা!

—সবটাই যে নিতে চায়নি এ তোর চোদ্দ-পুরুষের ভাগ্যি।

বিশে ঘোঁত-ঘোঁত করতে-করতে এসে বললে—চার আনা ক্যাশিয়ার, দুআনা তোর বেয়াদবির জন্যে ফাইন—সেটা জেনারেল-ফাণ্ড—আর এই নে! একটা দুআনি ছুঁড়ে মারল।

কর্তা বললে—এই দুআনা দিয়ে তোর এক ছিলিম বড়-তামাক হত রে বিশে।

বিশে একটা চোখ বুজে বললে—না, ও নিক। ওর খপছুরত চেহারাটার জন্যেই না রোজগার—ওর ওই দুটো কুচকুচে চোখের জন্য!

বিশের অসীম দয়া। কর্তা হাসে। এটা নিশ্চয় ঠিক, ইটিং হাউসের মূলধন কর্তার নয়, বিশের দিদির।

বাবুকে বললাম—খুচরো দিন।

বাবু আধুলি না দিয়ে দুটো সিকি দেয়। একটা জিভের তলায় লুকিয়ে রাখি, আরেকটা যেমন-কে তেমন ট্যাঁকেই থাকে।

বিশে কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করলে না। বললে—রোজ-রোজ যে আধুলি দেয়, হঠাৎ তার পয়সার এমনি কমতি হয়ে গেল?

—বাবুর ট্রাম ভাড়ারই পয়সা নেই, পায়ে হেঁটে যাবে ভবানীপুরে, জানিস? কথা বলতে-বলতে জিভটা জড়িয়ে এল। বিশে গাল দুটো দুমড়ে দিতেই সিকিটা টুপ করে বেরিয়ে পড়ল।

কর্তা বললে—বেরিয়ে যে যাচ্ছিস, ভালো হচ্ছে না কাঁচা।

বাবু তেড়ে বললে—আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি, তোমার কী?

—তোমার কী রাইট আছে?

—তোমাদের মারবারই বা কী রাইট ছিল? এইটুকুন ছেলে—মা-বাপ-হারা—কাজ করতে এসেছে বলেই কি গাধার সামিল হয়ে গেছে যে তাকে যাচ্ছে-তাই করে পিটবে, তার মাথা থেঁতলে রক্ত বার করে দেবে?

—আলবত দেব।

বাবু বললে—তোর প্যাটরাটা নিয়ে চল তো মকবুল—এক্কেবারে থানায় ; বেটাদের নামে আমি 'কেস' করব।

'বিশে ভয় পেয়ে গেছে। বললে—তোর মাইনেটা ?

বললাম—হিসেব করে তোর দিদিকে ফিরিয়ে দিস।

থানায় নয়—প্রকাণ্ড বাড়ি। লাগোয়া মাঠটায় কে ছুটোছুটি খেলা করছিল।

—দাদা, আমাদের গরু এসেছে। দেখবে এস ! ধবধবে শাদা, গলাটা কেমন তুলতুলে—তুলোর মতো !—বলে ছুটে চলে গেল।

বাবু ডাকলে—আসমানি, শোন—

আসমানির শোনবার সময় নেই।

মা বললেন—নাম মকবুল, গলায় পৈতে—এ ভারি মজা তো !

বাবু বললে—মাথায় ঝুলিয়ে দেব টিকি, দাড়িতে খোদার নুর !

চাকর-ঠাকুরদের আলাদা ঘর ছিল, তারই ছোট্ট একটা কুঠরিতে আস্তানা গাড়লাম। চাকর পছনকে দিয়ে বাবু একটা হৈচৈ বাধিয়ে তুললে—জল ঢেলে ঝাঁট দেওয়ালে, একটা তক্তাপোশ এনে ফেললে, বিছানা পাতালে, দেয়ালে একটা ব্র্যাকেট টাঙালে পর্যন্ত। পছন বিড়বিড় করে বলছিল—নবাবের নাতি এসেছে।

ঘনিয়ে ঘুম আসবার কথা, কিন্তু আসছিল না। টালিগঞ্জের মুচিপটির পনেরো নম্বরের বাড়ির দরজাটা থাকুকই না খোলা ! আরো অনেক বন্ধ কবাট খুলে গেছে।

কিন্তু আমি আসামাত্রই যে প্রাণীবিশেষের শুভাগমন সংবাদটি ঘোষিত হয়েছিল তার দেখা তো কোথাও পেলাম না। মনটা খট করে উঠল। গোয়াল-ঘর তা হলে কোনটা ? আমার গলার চামড়াটা তুলতুলে বটে, রঙটা তো ধবধবে শাদা নয়। কে জানে ?

গঙ্গার ঘাটে যে মেয়েটির কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটেছিলাম তার নাম জানি না। হয়তো আসমানিই।

রান্নাঘরে নয়—একেবারে কলতলায়ও নয়—মাঝামাঝি।

বাবুদের জুতো বুরুশ করি, কাপড় কোঁচাই, ঘর ঝাঁটাই, ফুট-ফরমাজ করি—দিদিমণিরও।

নটার সময় গাড়ি আসে। খাওয়া হয় কি না হয়—আসমানি ছুটে বেরোয়। সাজগোজ হয় ঘুম থেকে উঠেই। চামড়ার ব্যাগটা হাতে করে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিই। পা-দানিতে ওঠবার সময় আমার হাত থেকে তুলে নেয়। আঙুলে আঙুল ঠেকে কি না ঠেকে।

চারটে যেন আর বাজতে চায় না। ঘোড়া দুটো যেন জিরিয়ে-জিরিয়ে চলে। আসমানি নেমে আসে, মুখ শুকনো, খিদে পেয়েছে। মাকে ডাকাডাকি করে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। কোনো-কোনো দিন খাবার সময় বলে—এই ছোঁড়া, পাখাটা খুলে দে তো।

যে-ছেলেটি সকালবেলা আসমানির মাস্টারি করে সে বিকেলে সাইকেলে আসমানিকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। সব মেয়েদের নামিয়ে গাড়িটা একা আসমানিকে নিয়ে আসে ঐ পাঁচটা গ্যাসপোস্ট ছাড়িয়ে লাল বাড়িটা থেকে। এইটুকুন পথ—কোথা থেকে কে জানে—সাইকেলে আসতে-আসতে ছেলেটি আসমানির সঙ্গে কথা কয়। হয়তো লেখাপড়ারই কথা!

উঠোনে মস্ত খুঁটিতে গরুটা বাঁধা। আসমানি যতই ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ততই ও ওর বড়-বড় চোখ দুটি স্নেহে ভিজিয়ে মাথাটা আকাশের দিকে তুলছে। সামনে একটা মোড়ায় বসে আসমানির মাস্টার-ছেলেটি। একটা রুমাল নিয়ে লোফালুফি খেলছে।

সবে ভোর। মাস্টারের পড়াতে আসার কথা সাতটায়। মাস্টারের ঘড়িটা নিশ্চয়ই দু-একঘণ্টা ফাস্ট চলে।

আসমানি বললে—এই ছোঁড়া, গরুর দুধ দুইবি? গয়লা আসেনি। জানিস দুইতে?

অক্ষমতার অপযশ বিনা পরীক্ষাতেই কিনতে যাই কেন? একেবারে ভাঁড় নিয়ে এসে বসে গেলাম। বাঁটে সবে দু-তিন টান মেরেছি, আসমানির মাস্টার গরুর মুখে রুমাল দিয়ে বাড়ি মারতে লাগল।

গরুটা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চাইলে সমুখের শিঙ দিয়ে নয়, পিছনের ঠ্যাং তুলে। ভাঁড় শুদ্ধু চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলাম।

কি হাসি আসমানির ! যেন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। আসমানির মাস্টারটার হাসি বিকট ! হাসছে না তো কাশছে !

গয়লা কিন্তু এসেছিল। বললে—এ সব কি আনাড়ির কাজ ? যা যা গোবর খা গে যা !

আসমানির হাসি কিছুতেই থামতে চায় না।

মাস্টার বললে—ঠ্যাং দুটো ছড়িয়ে ব্যাঙের মতো কেমন পড়ল দেখেছ ?

অথচ এই ছেলেটাই দাদাবাবুর হোটেলে খাওয়ার সঙ্গী ছিল। যাবার সময় রোজ বলত—আমাদেরও কন্‌ট্রিবিউশন আছে হে !

রাতে সেদিন ফিরে দাদাবাবু চিৎকার করে উঠল—আমার বাইকের এমন দুর্দশা কে করলে ?

চিৎকার তো নয়, কান্না।

আসমানি বললে—একটা সিরিয়াস কলিশন হয়েছে দাদা—

—কি করে ? আমার বাইক—

—টিমুদার সঙ্গে মকবুল-মিঞার।

—মকবুল ? কোথায় ? কি করে আমার বাইক পেল ?

—হ্যাঁ দাদা, আচ্ছা করে ওকে হুইপ করা উচিত। ও কেন না বলে তোমার বাইক নিয়ে যায় ! ওকে পুলিশে দেওয়া যায় পর্যন্ত। টিমুদা আমার গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে আসছিল, ও হঠাৎ পিছন থেকে একেবারে টিমুদার বাইকের সঙ্গে ক্ল্যাশ করলে। ক্ল্যাশ করেই দু'জনে হুড়মুড় করে প্রায় গাড়ির তলায় পড়ে গেছল আর কি !

দাদাবাবু আঁতকে উঠে বললে—বলিস কি রে ?

—ভাগ্যিস কোচমানটা গাড়ি বাগিয়ে ফেলল। তখুনি সহিস কোচমান ধরাধরি করে টিমুদাকে বাড়ি নিয়ে এল। ডাক্তার বোসকে মা ফোন করে আনালেন। তেমন কিছু ডেনজেরাস উনড হয়নি বললেন তো ডাক্তারবাবু। ড্রেস করে ওঁরই মোটরে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন। ভাগ্যিস গাড়ির চাকাটা আর একটু— ওরে বাবা !

—আর মকবুল ?

দাদাবাবু প্রশ্ন করলেন।

—কি জানি ! ওটাকে ফ্লগ করা উচিত।

শুয়েছিলাম। দাদাবাবু ঘরে ঢুকে ডাকলে—মকবুল।

—দাদাবাবু!

দাদাবাবু নিজে কুপিটা জ্বালাল। বললে—ডাক্তার তোকে কি বললে?

—ডাক্তার? কৈ, জানি না তো!

—সেকি রে? মাথায় কে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে?

—পছন।

—পছন কিরে? মা! মা! ওমা!

মা এসে হাজির, সঙ্গে আসমানিও। দাদাবাবু বললেন—ডাক্তার একে দেখেনি কেন? এর ব্যাণ্ডেজ ভিজে রক্ত গড়াচ্ছে—

মা বললেন—ও মা, মকবুলের আবার কখন মাথা ফাটল। খানিক আগে টিমুর মাথা ফাটল মেয়ে ইস্কুলের গাড়ির চাকায় সাইকেল আটকে। এ আবার কখন বিদঘুটে কাণ্ড বাধালে? ডাব পাড়তে গিয়ে নাকি রে? যা, যা, শিগগির ডাক্তারবাবুকে ফের একটা কল দে ফোনে। আসমানি, ঠাকুরকে গরম জল চড়িয়ে দিতে বল!

আসমানি যেতে-যেতে বললে—ডাক্তার দেখাবে না আর কিছু। উচিত ল্যাশ করা—

জুতো বুরুশ করছিলাম।

টিমুদার মাথার ঘা শুকোয়নি বলে পড়াতে আসেনি। আসমানি একটা অঙ্ক নিয়ে মহা ভাবনায় পড়েছে। শুকনো বেণীর চুলগুলি যেন ছিঁড়ছে।

এরি মধ্যে বললে—বেশ চকচকে করে দিস কিন্তু রে ছোঁড়া।

বললাম—তোমার গাড়ি এখুনিই এসে পড়বে দিদিমণি—

—যা, তোর এত ভাবনা কিসের রে ছোঁড়া। এই অঙ্কটা না করে কিছুতেই আমি উঠছি না। না হয় টিমুদার সঙ্গে হেঁটেই যাব স্কুলে।

টিমুদা পড়াতে পারে না, ইস্কুল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে পারে।

টেবিলের কাছে মুখটা এনে বললাম—কি আঁকটা?

আসমানি একেবারে তেড়ে উঠল—ফাজলামো করিস নাকি? যা, জুতোটা আরো চকচকে কর। অঙ্ক দেখতে এসেছেন!—বলে আপন মনে হাসতে লাগল। বেচারির মুখখানি বিরক্তিতে ভরা, নোয়ানো ঘাড়টি ঘামে ভিজে

উঠেছে। অঙ্কের নম্বরটা দেখে ফেলেছিলাম—রেকারিং ডেসিমাল। নিজের ঘরে এসে পাটিগণিত খুলে বসলাম। কতক্ষণই বা লাগে?

—তোমার অঙ্কের রেজাল্ট কত দিদিমণি? ওয়ান পয়েণ্ট ফোর ফোর—

আসমানি অবাক হয়ে মুখের পানে তাকাল।

বললে—কি করে জানলি?

—করে এনেছি। এই দেখ।

বালি-কাগজটা মেলে ধরলাম।

আসমানি তাড়াতাড়ি কাগজটা টেনে নিয়ে আঁকটা নিজের খাতায় টপাটপ তুলে ফেললে। বললে—ইউনিটারি মেথড জানিস? রাতে ফরটি টু এক-জাম্পলের প্রথম দশটা আঁক করে রাখিস তো। বুঝলি?

রাত করে আমার ঘরে এসে হাজির। বললে—বাবাঃ, এত টাস্ক করা যায় না। ভালগার ফ্র্যাকশান-এর সামগুলো কাল ভোরেই চাই।

বই খাতা ছুঁড়ে দিলে।

বললাম—এখানে বোসো। টপাটপ কষে ফেললাম বলে।

—এখানে বসব কিরে?

আসমানি ভুরু কুঁচকোল।

—তবে চল, তোমার ঘরে যাই—

—হ্যাঁ, লোকে জানুক চাকরের কাছ থেকে আঁক শিখছে! কাল ভোরেই চাই কিন্তু, মনে থাকে যেন।

আশ্চর্য! আসমানি একবারও জিগগেস করে না. কোথা থেকে আঁক শিখলাম! তা জানবার ওর এতটুকু প্রয়োজন নেই।

বুঝতাম, টিমুদা ওর ইংরিজির মাস্টার। বলতাম—অঙ্কের তা হলে একটা আলাদা মাস্টার রাখলেই হয়! বলত—আমরা তো অ্যাডিশ্যানাল নেই।

আসমানি অঙ্কের জন্য মাস্টার রাখে না, চাকর রাখে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আসমানি একটা হুলুস্থুল বাধিয়েছে! দেবদারু আর খেজুর পাতায় ঘরের দেয়াল সাজাচ্ছে—পছন জল ঢেলে ঝাঁট দিচ্ছে মেঝেয়—মেয়ের দল কোমরে আঁচল টেনে ছুটোছুটি করছে। আসমানি বললে —মকবুল কিছু দিশি ফুল কোথা থেকে যোগাড় করে আনতে পারিস

লক্ষ্মীটি ? টিমুদা গেছে মার্কেটে—সেখানে তো বাহার বিলিতি ফুলের ! পারবি ভাই ?

লক্ষ্মী ! ভাই ! আসমানির কী আজ ? টাটকা জুঁইয়ের মতো দেখতে। পা দুখানি যেন পদ্মের পাপড়ির মতো !

—পারব।

টালিগঞ্জের পথে আবার। ফুল তো দূরের কথা, একটা সিগরেট কেনবার পয়সা নেই। তবু যোগাড় করে দিতেই হবে। আসমানির হুকুম ! কোথায় ফুল ফুটেছে কে জানে ?

সেদিন রোদে বহুক্ষণ অন্যমনস্কের মতো টহলদারি করেছিলাম মনে আছে। কোথাও ফুল পাইনি। সে-ফুল কোথাও পাওয়া যায় না।

বাড়ি যখন এলাম, আসমানি একবার শুধোল না কত ফুল আনলাম। ফুলের আর এসেন্সের গন্ধে ঘর আর মেয়েদের শাড়ি ভুরভুর করছে। টিমুদার গরদের পাঞ্জাবিটাও। কত রকমের গান, কত রকমের বাজনা, কত রকমের হাসি। কোনো মেয়ে টিমুদার পাঞ্জাবির বোতামের গর্তে ফুল গোঁজে, ফেরাফিরতি ধুপের কাঠি জ্বালিয়ে টিমুদা মেয়েদের চুলের মধ্যে গুঁজে দেয়। বেজায় ফুর্তি।

আসমানি আমাকে ডেকে নিয়ে বললে—এই ছোঁড়া, আমার মখমলের চটিটা দেখেছিস—যেটা টিমুদা প্রেজেণ্ট দিয়েছিল—

—আমি কি জানি ?

—তা হলে কে আর জানবে ? তুই তো সাফ করতিস। বল শিগগির কোথায় আছে ? খোঁজ।

পাতি পাতি করে খুঁজলেও পাওয়া যায় না।

আসমানি একেবারে কান্না জুড়ে দিলে আর কি ! মখমলের চটিটা না হলে ড্রেসের সঙ্গে স্যুটই করবে না। এক মাসও হয়নি টিমুদা কিনে দিয়েছে। ও টিমুদা, জুতো পাচ্ছি না।

টিমুদা হাসতে-হাসতে বললে—কাকে মারতে ?

—এই মকবুল ছোঁড়াটাকে।

সমস্ত বাড়ি সজাগ হয়ে উঠলো জুতো খুঁজতে। দাদাবাবু বললে—ইস্কুলে কোথায় ফেলে এসেছিস, কিম্বা টিমুদাকেই হয়তো উলটো প্রেজেণ্ট দিয়েছিস কে জানে ? কি হে টিমু ?

হঠাৎ আসমানি ঘোষণা করলে—যে পাবে তাকে ছুটো টাকা দেব। ওরে মকবুল, ওরে পছন, খোঁজ, ছুটাকা।

টিমুদা পকেট থেকে ছুটো টাকা তুলে বাজিয়ে বললে—এই ছ্যাখ।

টাকার ভারি টানাটানি। ছুটো টাকা মন্দ কি! কতদিন একটু ধোঁয়া পর্যন্ত গিলতে পারিনি।

পছনটা একেবারে কোমর কেছে খুঁজতে লেগেছে—আঁস্তাকুড় পর্যন্ত। হাসি পায়।

ঘরে এসে প্যাটরাটা খুলে ফেললাম। বইগুলির তলায় জুতো জোড়া।

ছুটতে-ছুটতে এসে বললাম—তোমার জুতো পেয়েছি দিদিমণি, দাও টাকা।

—কই? কোথায় পেলি?

আমতা-আমতা করে বললাম—ঐ ওখানে আলনার তলায়—

একটি মেয়ে বললে—কক্ষনো না। আমি আর শুচিদি ওখানটায় পাঁচ বার খুঁজে এসেছি।

টিমুদা বললে—আমিও। তুই মিথ্যে কথা বলছিস। তুই চুরি করেছিলি।

টিমুদার আক্রোশ ছিল। তক্ষুনিই কানটা ধরে ফেললে।

—কান ধরবেন না বলছি, খবরদার।

—কী? এই জুতো দিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ব। বলেই টিমুদা আসমানির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলে।

—ছিঃ, একি হচ্ছে টিমু? বলে দাদাবাবু টিমুদার হাত থেকে জুতোটা ছিনিয়ে নিলে।

টিমুদা বললে—ওকে তাড়াও। ও ব্যাটা চোট্টা, জুতো চুরি করে—

দাদাবাবু বললে—সে বিষয়ে তোমার কোশ্চেন করবার রাইট নেই। জুতো পাওয়া গেলে ছুটো টাকা দেবে এই তোমার কনট্র্যাক্ট। আর যে এই জুতো চুরি করবে সে কি জানে না এটার দাম ছ'টাকার ঢের বেশি?

টিমুদার সত্যবাদিতা এতে একটুও পীড়িত হয় না। দাদাবাবু আসমানির হয়ে টাকা দিতে চায়।

বলি—কি হবে টাকা নিয়ে?

আসমানির জন্মদিনের সন্ধ্যাটা আমার অপমানের অশ্রুতে করুণ হয়ে

উঠেছিল—সে কি কেউ জানে? সেইদিনই আমার চোখের জলের সত্যিকারের জন্মদিন।

কদিন থেকে দাদাবাবুর যেন কি হয়েছে।—ঘুর-ঘুর ঘুর-ঘুর—কেউ একটু খোঁজও করে না।

দাদাবাবু বললে—কলকাতা থেকে পালাই চল, মকবুল।

মা বাবা কেউ বারণ করেন না, বলেন—যা ভালো বোঝ কর! যে যা ভালো বোঝে, সে তাই করে। আসমানি যদি বলে চুল বাঁধবো না, চুল বাঁধেই না; যদি বলে, ইস্কুল কামাই করবই, কে ওকে কামাই না করায়? দুদিনের মধ্যেই সব গোছগাছ হয়ে গেল।—সঙ্গে পাড়েজি আর আমি। ট্যাক্সিটা কদ্দূর এগোতেই দাদাবাবু নেমে বললে—আদত জিনিসটাই ফেলে এসেছি।—বন্দুকটা।

পিছনের ছ্যাকড়া গাড়িতে মাল আর পাড়েজি।

মা বলে দিয়েছিলেন—যে-যে জায়গায়ই যাস সব সময় চিঠি দিস। তুইও দিস মকবুল।

মুঙ্গেরে আসতেই পাঁড়েজি দাদাবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে খাবার কিনতে সেই যে গেল আর ফিরল না।

বললাম—গাড়ি যে ছেড়ে দিলে দাদাবাবু—

—দিক। মুঙ্গেরের কাছাকাছি ওর বাড়ি। অনেকদিন বাড়ি আসেনি।

—কি হবে তা হলে?

—একটা কুকার কিনে নেব।

দাদাবাবু কর্ক-স্ক্রু দিয়ে বোতল খোলে। তারপর শুয়ে ঘুমোয়। আমি এই ফাঁকে সিগারেটের টিন থেকে গোটা দুই-তিন টানি।

কোনো জায়গায়ই দাদাবাবু দু-তিনদিনের বেশি জিরোতে পারে না। তিন-দিনের দিনই বলে—তল্পিতল্পা গুটো, মকবুল। এ-জায়গাটায় ভারি ধুলো। অন্য জায়গা আবার বেশি ঘিঞ্জি, কোথাও বা লোক বেশি নেই বলে ভালো লাগে না—বড্ড বেশি ফাঁকা।

কিন্তু সে-ফাঁকায় ফাঁকা মন ভরে ওঠে একদম। দাদাবাবু বললে—চমৎকার জায়গা। এখানে কোনো বাড়িতে গেস্ট নয়, একেবারে তাঁবু ফেলব।

দাদাবাবু সত্যি-সত্যিই তাঁবু ফেললে।

চারদিকে পাহাড়—ধারে নদী তো নয়, মাটির একটা রগ। যেন মৃত্যুশয্যায় পড়ে আছে। আহ্লাদির কথা মনে পড়ে।

দাদাবাবু কাঁধে বন্দুক ফেলে অনেক দূরে যায় পাখি মারতে। কোনো-কোনো দিন আমিও যাই। মরা পাখিগুলি রাঁধে না, পাহাড়ী মেয়েদের দিয়ে দেয়। কিন্তু সবাইকে তো সমান দেয় না দাদাবাবু! যে-মেয়েটা বেশি পায়, রাত করে চুপিচুপি আসে পয়সা চাইতে, বোতলের লাল পানি চাইতে।

আমি কত রাতে দূরে ঐ মরা নদীটার পাড়ে শুয়ে ঘুমিয়েছি। আমার পাশে পাহাড়ী মেয়ে নয়—আহ্লাদি।

প্রচুর জ্যোৎস্না—বালির মাঝে ছুঁচ চেনা যায়। জ্যোৎস্নায় বসে চিঠি লিখছিলাম। মাকে নয় অবিশ্যি। লিখছিলাম—কত জায়গা দেখলাম—তারই একটা ফর্দ; পাড়েজি কেমন টাকা নিয়ে ভাগল; দাদাবাবুর শরীর তেমন সারছে না; আমি বেশ টনকো হচ্ছি—এই সব। আমাকে রোজ ভোরবেলা দাদাবাবু পড়ায়—পাখি শিকার করি, একদিন একটা হরিণ পর্যন্ত মরেছিল আমারই গুলিতে। পরে লিখি—আমার কলকাতা ফিরে যেতেই ইচ্ছে করে এখন। তোমার চিঠি পেলে খুব খুশি হব। টিমুদা কেমন আছে?

দাদাবাবু বললে—কোথায় গেছলি?

—ইস্টিশানে চিঠি ফেলতে।

আমাদের তাঁবু থেকে ইস্টিশান মাইল তিনেকের পথ। গেঞ্জির উপর দিয়ে কাপড়ের বাঁধ—গেঞ্জির তলায় পোস্টকার্ডটা ফেলে দৌড়ে যাই সাঁ-সাঁ করে। যখন হাঁপাই, আস্তে-আস্তে চলি।

নদীর পাড়ে বালির উপর শুই—ঘুম আসে না। দূরে গাছের পাতাগুলি আকাশের তারার সঙ্গে দুলে-দুলে কথা কইতে চায়। আকাশের তারারাও কথা কইতে চায় নদীর জলের সঙ্গে। কি কথা কইতে চায় ওরা? আমি শোনবার জন্য কান পেতে থাকি।

আসমানির চিঠি আসে না।

এই রাতে তাঁবু ছেড়ে দাদাবাবু কোথায় পালাল? ল্যাম্পটা জ্বলছে, গ্লাসটা

পুরো খাওয়া হয়নি, বোতলের ছিপি খোলা—কোথায় দাদাবাবু? রাতে কি শিকারে বেরুল? বন্দুকটা তো বাক্সেই আছে।

দাদাবাবু পাহাড়ের ধারে-ধারে পায়চারি করছে। যাক, বাকি গ্লাশটা আমারই জন্য রেখে গেছে বুঝি!

ঘুম ভাঙতেই দাদাবাবু বললে—কাল রাতে কি খেয়েছিলি রে পাজি?

—তুমি যা খাও তেষ্টা পেলে।

—খবরদার খাবি না আর।

দাদাবাবুর উপর খবরদারি করবার কেউ নেই।

দাদাবাবু বললে—ইষ্টিশানে যেতে হবে রে কলকাতার গাড়ি ধরতে।

—আজই যাব নাকি?—লাফিয়ে উঠলাম।

—যাওয়া নয়। এস্‌কর্‌ট করতে।

কাকে? আসমানিরাই আসবে বুঝি! কাল রাতে যে নতুন আরেকটা চিঠি লিখেছিলাম, ছিঁড়ে ফেললাম। কি দরকার?

আসমানি নয়—লম্বায় দাদাবাবুর মতোই ঢ্যাঙা, মাথায় একটুখানি কাপড় তোলা, সর্বাঙ্গে শীর্ণতা ও ক্লান্তি। কে এ?

কেউ কারুর মুখের দিকে চেয়ে প্রথম সন্দর্শনের পরিচিত হাসিটুকু হাসলে না, একটি সম্ভাষণ পর্যন্ত না। মেয়েটি ধীরে-ধীরে দাদাবাবুর পিছনে আসতে লাগল। দাদাবাবু বললে—মকবুল, একটা টাঙা ঠিক কর।

গাড়োয়ানের পাশে আমি—পিছনে দাদাবাবু আর মেয়েটি।

—কিছু মালপত্র আনোনি যে?

—ফিরতি বিকেলের গাড়িতেই চলে যাব।

—ফিরতি গাড়ি তো কাল ভোরে।

—তবে কাল ভোরেই।

আর কথা নেই। শুধু দাদাবাবুর হাতের উপর মেয়েটির শিথিল হাতখানি আলগোছে রাখা। টাঙা ঢিমিয়ে চলেছে।

—কিং করে জানলে আমার ঠিকানা? এলে যে বড়!

—কলকাতার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

—কি করবে এখন?

—সারাটা পথ তাই ভাবতে-ভাবতে আসছি।

—চাকরি ছাড়লে কেন?

—ভালো লাগল না।

আবার চুপচাপ। এক মাইল পথ শেষ হল ঐ বালিয়াড়ির পর থেকে।

—মাধু।

—আমার নাম তোমার এখনো মনে আছে?

—কেন এলে তবে এখানে?

—তাই ভাবছি এখন। সত্যি বলছ বিকেলে গাড়ি নেই?

—থাকতে কি তোমার খুব কষ্ট হবে?

—ভীষণ!

তাঁবুতে এসে পৌঁছুলাম। বললাম—কে ইনি দাদাবাবু?

তারপর ফিসফিস করে বললাম—বৌদি?

—দূর! আসমানিদের মিসট্রেস।

তা হলে এর কাছ থেকে আসমানির খবর পাওয়া যেতে পারে—কেন সে আমার চিঠির জবাব দিচ্ছে না!

দাদাবাবু বললে—নদীতে নাইতে যাবে মাধু? আমার একটা কাপড় দি—সেটা পরে চান করবে খন।

মেয়েটি বললে—না।

বললাম—সে ভারি মজা দিদিমণি। জলে ছ'দিক থেকে কাপড় মেলে ধরলেই মাছ আটকে যায়। আমি আর দাদাবাবু কতদিন ধরেছি। ধরাই সার, রাঁধা আর হয়নি।

দাদাবাবু বললে—তবে মকবুল বালতি করে জল এনে দিক, মাথাটা ধুয়ে ফেল।

তিন বালতি জল এনে ফেললাম। দাদাবাবু জল ঢেলে দিতে লাগল। তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মুছতে যেতেই দাদাবাবু বলে উঠল—তোমার জ্বর মাধু?

—হ্যাঁ, একটু-একটু হয়।

চুলটা মেয়েটিই মুছলে তারপর।

মেয়েটি বললে—আজকে আর কুকার নয়, ভালো করে আমিই দুটো রেঁধে দিই।

দাদাবাবু বললে—তোমার শরীর ভালো নেই।

—না হয় আর একটু খারাপ হল—মকবুল!

এমন সুন্দর করে আমাকে যেন কেউ ডাকেনি।—কি দিদিমণি?

দিদিমণি টাকা দেয়—ডিম মাংস কত কি আনতে বলে, গরম মশলা লঙ্কা তেজপাতা পর্যন্ত।

দাদাবাবু বললে—তোমার জ্বর, তুমি কী খাবে?

—একটু সাবু জ্বাল দিয়ে নেব। তা ছাড়া আজ তো এমনিই আমার উপোস।

—কেন?

—নিজের জন্মদিনের তারিখটাও বুঝি মনে নেই, এত ভুলো হয়েছ!

—মকবুল! মকবুল! দাদাবাবু গলা ফাটিয়ে ডাকতে লেগেছে। ফিরে এলাম। দাদাবাবু বললে—বাজার হবে না আজকে।

বাজার সত্যিই হল না। জন্মদিনের উৎসব উপবাসের মধ্যে দিয়ে কাটল।

এ কেমনতর? বেচারা আমিও না খেয়ে থাকব নাকি?

দিদিমণি বললে—যা পারো পয়সা দিয়ে কিনে খেয়ো।

বাজারে পাহাড়ী মেয়েটার সঙ্গে দেখা। তাকে বলে দিলাম—আজ পয়সা নিতে তাঁবুতে যাসনে ছুঁড়ি। বুঝলি?

মেয়েটা বোঝে, হাসেও।

তাঁবুর বাইরে শুলাম, ভিতরে দু'কোণে দুটো ক্যাম্প খাট—দাদাবাবু আর দিদিমণির! ল্যাম্প নিবনো হয় না—কান পেতে থাকি—কথাও শোনা যায় না একটি।

জ্যোৎস্না রাত কালো হয়ে আসছে। চেয়ে দেখি তাঁবু থেকে কে বেরুল—দাদাবাবু। চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আবার গেল ভিতরে। তন্দ্রা এসেছিল, কিসের আওয়াজে ঘুম ভাঙল। দিদিমণি বেরিয়ে এসেছে। ওরও ঘুম আসছে না।

সকালবেলা টাঙায় করে ফের এলাম ইষ্টিশানে।

—তোমার জ্বর এখনো আছে?

—সকালবেলাই তো হয়।

তেমনি হাতের উপর হাত। তেমনি কথা কইতে না-পারার অপরূপ অস্থিরতা।

ট্রেনে উঠে দিদিমণি বললে—তোমার জন্মদিন কবে, মকবুল?

—আজই।

—তাই নাকি?—দিদিমণি হাসল।—তবে বাজারের বাকি পয়সাগুলো সব তোমার।

দাদাবাবু বললে—আর যদি দেখা না হয়!

—না হবে! দেখা হওয়াটাই তো মিথ্যে।

—তবে আমার জন্মদিনের সম্মান করো কেন?

—তুমিও আমার মরণের দিনটির সম্মান রেখো।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

তারপর শুধু শক্ত কালো লোহার অচল কঠিন দুটো লাইন!

এক হপ্তাও যায়নি। দাদাবাবু একটা টেলি নিয়ে হুড়মুড় করে এসে পড়ল—কালই কলকাতা-মুখো রে মকবুল। নে, নে সব গুছিয়ে ফেল।

—কলকাতা? বাঁচলাম যেন।

সন্ধ্যা উতরে যেতেই হাওড়ায় এসে নামলাম। কলকাতা নয়.তো আসমান। বাড়িতে কি যেন একটা গোলমাল—দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি। কাছে এসেই একেবারে হকচকিয়ে গেলাম। আলোয়-আলোয় ঝলমল, ফুলে-ফুলে আমের পাতায় গেট সাজানো, ছাতের উপর হোগলার ছাউনি। সানাই বাজছে।

—কোথায় এলাম দাদাবাবু?

—কেন, বাড়িতে!

মা বললেন—ঠিক সময়ে এসেছিস যা হোক। আমি তো ভেবে মরছি। এখুনি বর এসে পড়বে। ওলো পটলি, ওঁকে খবর দে, খোকা এসেছে।

মেয়ের দল কি ভেবে উলু দিয়ে উঠল।

আমাকে বললে—এ কে! মকবুল? বাঃ, দু'বছরে খাসা চেহারা হয়েছে তো! চেনাই যাচ্ছে না। মাকে মনে আছে রে মকবুল?

মাকে প্রণাম করলাম। বাবা এলেন—বাবাকেও।

খানিক বাদে একটা তুমুল উল্লাস উঠল—বর এসেছে, বর এসেছে। শাঁখ, উলু, চিৎকার, গান—কত কি!

রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। এত চাকর থাকতে অতিথি-চাকরকে হয়তো আজ দরকার হবে না। ছাই কলকাতা! আমার সেই পাহাড়তলির শুকনো মাঠ ঢের ভালো—সেই কুয়োর ধার, সেই হিজল গাছের তলা, সেই মরা আহ্লাদি-নদীটা!—আর সেই পাহাড়ী মেয়েটাও।

বাসি বিয়ের দুপুর।

চাকরদের ব্যারাকে কোণের ঘরটা আজকাল পছনের। প্যাটরাটা তেমনি আছে—সেই পাটিগণিতটা যার তলায় মখমলের চটি লুকানো ছিল—টিনের কৌটোটা, যেটা আমিনার কাছে জিম্মা রেখেছিলাম। তখনো বাড়িটা গিজ-গিজ করছিল।

তবু কেন যে বারান্দায় এলাম ঘুরতে-ঘুরতে। মোটা থামটার আড়াল দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছিল বুঝি!

হঠাৎ কে যেন ছুটে এল। ছুটে মোটেই হয়তো নয়। না হোক এমন অসম্ভব কথা কে কবে ভেবেছে?

ওর সর্বাঙ্গে নববধূর নবারুণ লজ্জা—দুটি চোখে সেই পাহাড়দেশের মায়া!

থামের পিছনে দাঁড়িয়ে বললে—কেমন আছ মকবুল?

—ভালো আছি।

ভাবি, আসমানির কোনো অঙ্ক ফের ভুল হয়ে গেল নাকি? না, সেই ফুল তুলে আনার হুকুম?

বললে—আজকে সবাই আমাকে প্রেজেণ্ট দেবে। তুমি কিছুই দেবে না মকবুল?

—আমি কি দেব? কিই বা আছে—ছাড়া প্যাটরাটা?

আসমানি একটু হাসলে। পরে আঁচলের তলা থেকে একটা সোনার হার বার করে বললে—তুমি যদি এটা দাও, তা হলে ওরা একেবারে অবাক হয়ে যাবে। এটা আমারই জিনিস, তোমাকে দিলাম—তুমি এটা আবার আমাকে প্রেজেণ্ট দিও। তুমি যদি কিছু না দাও তা হলে ওরা ঠাট্টা করবে।

কেন ঠাট্টা করবে বুঝি না। আমি তো সামান্য একটা চাকর!

বললাম—দাও।

মনে কোনো দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল বুঝি। তাই হাত বাড়ালাম না।

আসমানি হারটা আমার পকেটের মধ্যে গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

নিজের ঘরে এসে পড়েছি।

পিছন থেকে পছন এসে বললে—কি রে, প্যাটরা গুছোচ্ছিস যে! চললি?

চকচকে সোনার হারটা বুঝি দেখে ফেলেছে।

—ওটা কি রে?

—সোনার হার, কিনবি?

—কোথায় পেলি? চুরি করেছিস?

—যে করেই পাই না, নিবি কিনা বল্।

হারটা হাতে তুলে নিয়ে পছন বললে—কতোতে ছাড়বি?

—এই গোটা পঞ্চাশ—

—ইঃ? পনেরোটা টাকা আছে, ত্মাখ—যদি হয়।

—দে, তাই। পনেরো টাকাই সই।

দ্বিধা করবার সময় নেই।

পাহাড়তলির রেল-ভাড়া পনেরো টাকায় হবে? কে জানে? বেরিয়ে তো পড়ি!

তখনো সানাই বেজে চলেছে—ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে।

একটা কথা না বললেও চলে—বর অবশ্যি টিমুদাই।

দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কি অজস্র বর্ষণ সেদিন! পশ্চিমের একটা খুদে ইষ্টিশানে দেখা—গাড়ি তখনো এসে ভেড়েনি, দাঁড়িয়ে ভিজছে।

প্রথম তো চিনতেই পারিনি। তারপর বললে—তুই এখানে?

শেড-এর তলায় ওঁকে টেনে এনে বললাম—তোমারই মতো বেরিয়েছি। কিন্তু ট্যাঁক একেবারে ফাঁক—

সহসা দাদাবাবু বললে—এ-গাড়িতে নয়, শেষরাত্রে কলকাতার গাড়িতেই ফিরে চল।

বলে উঠি—না।

দাদাবাবু বললে—যেতেই হবে।

তখনো বৃষ্টি ধরেনি। রাত গড়িয়ে চলেছে। গাড়িতে উঠে মদের বোতল বার করে দাদাবাবু বললে—খাবি একটু?

বললাম—কোথায় যাচ্ছিলে, কেনই বা ফিরে চললে? আমাকে কয়েকটা টাকা দিলেই তো পারতে, বেরিয়ে পড়তাম—

—কোথায় যেতিস? কি রে কোথায়?

—কোথাও না। তুমিই বা কোথায় যাচ্ছিলে?

—জানি না। শুধু যাচ্ছিলাম—

কলকাতায় এসে দাদাবাবু একেবারে ক্ষেপে গেল। বললাম—এ-সব কি হচ্ছে দাদাবাবু?

—তোকে আমার মানুষ করতে হবে—মানুষের মতো মানুষ। দুঃখে নিচু হবি না, ধারালো হবি—উন্মুক্ত, উদার, বেগবান!

ইস্কুলের উঁচু ক্লাশে ভরতি করিয়ে দিলে। বললে—যাতে ফেল না করিস ততটুকুন মনোযোগ দিলেই চলবে। মাসে-মাসে টাকা পাবি, হস্টেলেই থাক। চিঠি দিস বরাবর। আমি চললাম—গাড়ি ছাড়বার আর মিনিট তেরো—

—সে কি, বাড়ি যাবে না?

—কোথায় বাড়ি?—দাদাবাবু বোঁ করে বেরিয়ে গেল।

পিছু নিলাম। ইষ্টিশানে যখন এসে পৌছুলাম, পশ্চিমের গাড়ি এই একটা ছাড়ল। জোরে পা ফেলে গাড়ির পিছনে চলতে চাইলাম হয়তো—কাউকে দেখা গেল না।

শুধু একটি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক সত্যবিয়োগব্যথায় আকুল হয়ে কাঁদছে—ওর স্বামী নাকি এই গাড়িতেই পালালো।

একতলা হস্টেলের কোণের ঘরটায় তক্তাপোশের উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকি—কতক্ষণ বাদে কে এসে ঘরে বাতি জ্বালায়।

খানিক বাদে কাছে এসে ভীরু গলায় বলে—বাড়ির জন্য মন কেমন করছে ভাই?

বাড়িই তো বটে?—দাদাবাবুর হৃদয়!

পাশে বসে বলে—নতুন এলে বুঝি?

চোখ তুলে তাকাই। তাকিয়েই যেন স্নেহসম্ভাষণ করি।

বলে—এই ঘরে আমরা দু'জনে থাকব। এস, তোমার বিছানাটা পাতি।

বাড়ি থেকে মশারি এনেছ তো ? আনোনি ? তাহলে ? তাহলে আমারটাই আজকে নিয়ো। ভারি মশা এখন।—ও আমার সহ্য হয়ে গেছে—

' বলি—কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

—পড়াতে গেছলাম। একটি খোকাকে অ-আ পড়াই। দুটি টাকা দেয় মাসে। বাবাকে দিই।—ও নিজেই বলে চলে—বাবাকে দেখনি ? ঘণ্টাখানেক আগে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল—

চমকে উঠি—ঐ তোমার বাবা ?

—হ্যাঁ।

—কি করেন ?

—ভিক্ষে করেন।

ওর দিকে ভালো করে তাকালাম। টুকরো করে ছেঁড়া কাপড়ের একটি ফালি পরনে, গায়ে নোংরা একটা কোট, বোতাম নেই—যে-মশারি নিয়ে এত গর্ব, তার ভিতরে আসতে পারে না এমন জানোয়ার নেই কিছু পৃথিবীতে।

ফের বলে—বাবা পয়সা চাইতে এসেছিলেন। মাইনে পাইনি।

—কি করে চলে তোমার তা হলে ?

—ইস্কুলে তো ফ্রী-ই, খাওয়ার খরচ একজন মাস্টার দয়া করে দেন—আর কিছু লাগে না। তুমি এলে ভাই, খুব ভালো হল। এই ঘরটায় একলা-একলা থাকতে ভারি ভয় করত—যেন মাকে দেখি, বাবা যেন হাত পেতে ভিক্ষে করতে আসে।

—কই তোমার মা ?

—নেই। একটি বোন ছিল ছোট, বাবা বিক্রি করে দিয়েছেন। কোথায় আছে জানি না। এত দেখতে ইচ্ছে করে। ওর মুখ যেন আর একটুও মনে করতে পারি না।

ঐ বিকাশ। দুঃখের দুরপনেয় অন্ধকার—তবু আনন্দের অনিন্দ্য কমনীয়তা !

বিকাশের সঙ্গে পাচ বছর এক নৌকায় এসেছি, ও টাঙিয়েছে পাল আমি টেনেছি দাঁড়।

ওর বাবা মারা গেল।

এক মাড়োয়ারি পুণ্য করতে কালীঘাট এসেছিলেন, তাঁর চলন্ত গাড়ির সঙ্গে

একটি পয়সার জন্য ছুটতে-ছুটতে ওর বাবা ভিরমি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। খালি খানিকটা রক্ত বমি করবার শক্তিই ছিল তারপর।

বিকাশ এসে বললে—খুঁজতে গেছলাম। শুনলাম হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তারা বললে—বেঁচে নেই, দু'দিন আগেই সাবাড় হয়েছে; মরার ঘরে আছে। গেলাম সেখানে—

—গেলি?

—হ্যাঁ, অন্ধকার এঁদো ঘর, পচা ভোটকা গন্ধে দম বন্ধ হয়ে নতুন আরেকটা মৃত্যুই হয় আর কি! দেশলাই জ্বালালাম—টেবিলের উপর সব গাদি করে ফেলা হয়েছে—আমাকে দেখে সবাই যেন একসঙ্গে লাফিয়ে উঠতে চায়—বাবাকে খুঁজে পেলাম না।

বললে—চলে আসবার সময় মনে হল ওরা যেন লক্ষ-লক্ষ হাত বাড়িয়ে আমার কাছে কি ভিক্ষে চাইছে—হয়তো আমার জীবন। না রে?

পাঁচ বছর কাটিয়ে দিলাম ওর সঙ্গে—দেয়ালের আড়ালে—পুঁথির পোকার মতো!

এক সঙ্গে বি-এ পাশ করলাম—ঠেলেঠুলে, টায়েটুয়ে।

ও বললে—বেরুই আয় চাকরির খোঁজে।

দু'জনে বেরুলাম।

বন্ধ দরজা। বললাম—ফিরে চল ভাই। ফিরে চলাই আমাদের আগে চলা—

ও বলে—না। বন্ধ দরজায় মাথা ঠুকতে হবে। মৃত্যুর দরজা অন্তত খুলবে। তোর মতো গায়ে জোর থাকত, মোট বইতাম। শরীরটা পর্যন্ত ভাঙাকুলো—তারপর—মনের মধ্যে এত ঘুণ। যাক গে, চল সেই কম্পোজিটারির জন্য দাঁড়াই গে, যত দিন না শিখি মাইনে নেব না।

ও অন্য রাস্তা ধরে। আমি বরাবর ইস্টিশানে এসে ট্রেন ধরি।

বিস্তীর্ণ মাঠ—লাঙল লাগিয়েছে।

বলি—জন-মজুরের দরকার আছে তোমার? এই গাঁয়ে নতুন এসেছি, একটা কাজ চাই। আর পাতার একটা কুঁড়েঘর।

মোড়ল আমার চওড়া চিতোনো বুকটার দিকে তাকিয়ে বলে—ঐ আমার

বাড়ি। একটা ঘরও আলগা আছে বটে। থেকে যেতে পারিস। বাজারে নিয়ে যেতে পারবি শাকসবজি মাথায় করে? মাটি নিড়োতে পারবি?

• —খুব পারব। পয়সা চাই না, শুধু দু'বেলা দু'মুঠো ভাত। পরে যদি দয়া করে দু-চার পয়সা দাও—

থেকে গেলাম।

॥ বাতাসি ॥

যার যা খুশি, সে তাই বলে ডাকে—শ্যাম্‌লী, ডবকা—কেউ-কেউ বা—আখখুটে।

ওর নব-নব রূপ। কেউই মিথ্যে বলে না। যখন গা মেলে দিয়ে জিরোয়, সাঁঝের হাওয়া বয়, ওপারের খেজুরগাছের আড়ালে দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে, ওকে শ্যাম্‌লী বললে বেমানান হয় না মোটেই। মাঝে মাঝে ভর-দুপুরে জোয়ার আসে, ও তখন যেন কৈশোর পেরিয়েছে মনে হয়—ওর সর্বাঙ্গ তখন উৎসুক লুব্ধ হয়ে ওঠে! তারপর ঝড়ের রাতে মা-হারা দুষ্টু খুকির মতো সে কি গোঙানি, যেন মাথা কুটছে।

নদীটি রঙ্গিণী।

ওপারে ভাঙন ধরেছে ; এপারে মাঠ, ঐ বহুদূরের আকাশ ছুঁতে দৌড়ে ছুটেছে যেন।—বিস্তীর্ণ, বিশাল! কলাগাছের ঝোপে-ঝোপে পাতার কুঁড়ে, মাঝে-মাঝে মাদারের পাহারা। দূরের বেঁটে বটগাছটা মাঠের মধ্যিখানে সাক্ষীগোপালের মতো। সমস্ত মাঠটার কোলভরা ক্ষেত আনাজ-তরকারির, যখন যা ফসল ধরে তা-ই—কপি মটর আলু মূলো—কাঁচালঙ্কা ধনেশাক পর্যন্ত। মাটির সবুজ ছেলেপিলে সব।

ওপারের মাটি ভেঙে পড়ার আওয়াজ এপার থেকে শোনা যায়। শোনা যায় জলের নাচের নূপুর।

মাটি নিড়োতে-নিড়োতে মোড়ল বলে—যাক রসাতলে ওপারের বস্তি, এপার আমার শ্রীমন্ত হয়ে উঠুক!

ওপারে পাটের কারখানা। সারাদিন ধোঁয়া ছাড়ে। ওপারের আকাশ-টুকুর মুখ গোমড়া, যেন মনে সুখ নেই। এপারের আকাশ একেবারে মাটির বুকের কাছে নেমে এসেছে মিতালি পাতাতে, চোখে ওর বন্ধুতার হাসি মাখা—দেখনহাসি।

আলুর চারাগুলি সবে মাথা চাড়া দিয়েছে—কড়ে আঙুলের মতো। ডগাটি দুলিয়ে-দুলিয়ে আকাশকে ডাকে!

আরেক চাপ মাটি পড়ে।

মোড়ল বলে—যাক লোপাট হয়ে। যত জোচ্চুরি-করা পয়সা।—দড়ি দিয়ে কড়িবাঁধা হুঁকোটায় একটা সুখটান দিয়ে বলে—আমার এই বিশ বিঘে জমির উপর মা-লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো পড়ুক, এই মাটি নিংড়েই সমস্ত গাঁয়ের মুখে ভাত দেব।

ধানের শীষগুলি হেলেদুলে যেন সায় দেয়।

আরো বলে—জমির আরো বন্দোবস্ত নেব, শুধু রাঙা আলু নয়, মাটির কৌটো থেকে সোনা বেরুবে—সোনা।

বলে চোখ বোজে। স্বপ্ন দেখে হয়তো—পাকা ধানের স্বপ্ন!

এই ফাঁকা মাঠটায় খালি নুলোটাকেই বেখাপ্পা লাগে। ওর বাঁ অঙ্গ যেন আকাশকে ব্যঙ্গ করছে। ও বলে, কোন মারাত্মক জ্বরে দেহের আধখানা কাবু হয়ে পড়েছে। নইলে—বাকি ইঙ্গিতটুকু ওর ডানদিকের অংশটা বেশ জোর করেই জাহির করে। সেদিকটা যেমন টনকো তেমনি জোয়ান, মাংস তো নয় লোহা, টিপলে আঙুলেই টোল পড়ে। তার জন্যেই ও এই ক্ষেত নদী আকাশ মাঠকে বেশি করে উপহাস করছে মনে হয়। ওর দিকে চাইলেই ওর খোঁড়া পা আর নুলো হাতটাই চোখে পড়ে।

ওর বাপ কিন্তু বলে উলটো কথা। জন্ম থেকেই নাকি বাঁ দিকটা বরাবর অসাড়—মোড়ল বলে। ওর মা'র দোষেই নাকি। ওর মা মরেছে, তাতে খালি মোড়লেরই হাড় জুড়োয়নি—তার অনাগত বংশধরদেরও। আরো বলে—ওটাকে মানায় ঐ কালো ধোঁয়ার কুণ্ডুলির মধ্যে, ঐ কারখানায়—ওর ঐ থেঁতলানো হাত-পা দুটোকে।

বাপ ছেলেকে দেখতে পারে না।

খুব সকালবেলা জাহাজ আসে। সামনে একটা ইস্টিশান—এখান দিয়ে যাবার সময় ফুঁ দিয়ে যায়। আকাশের বুক যেন ব্যথা করে ওঠে।

মোড়ল বলে—ওর ফুঁ, তক্ষুনি ঘুম ভাঙা চাই। মাঠে যাবার ডাক।

ভালোই হল।

জাহাজটার ডাকের নড়চড় হয় না। যেন অভ্যেস হয়ে গেছে।

আপত্তি করে খালি ভূষণের বৌ। ভূষণকে উঠতে দিতে চায় না, কাঠটার

উপর চেপে ধরে রাখবার চেষ্টা করে বলে—ভোরবেলায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় কই গা-টা একটু জিরোবে, না, জন খাটতে যাওয়া—এখুনি। এ কি আবদার!

ভূষণ বলে—মোড়লের হুকুম। মজুর খাটতে এসে ভোরবেলায় বালিশ পোষায় না। তুই আর একটু না হয় গড়া।

উঠে পড়ে—জোর করেই। বৌ বড় ছেলেটাকে একটা থাবড়া মারে, ছোটটাকে লাথি। দুটো চেঁচাতে থাকে কাকের মতো। আরেকটা কান্নার শব্দ শোনা যায়। কেউ-কেউ প্রশ্ন করে, ভূষণের তৃতীয় শিশু কবে জন্মাল ফের? উঁকি মেরে দেখি, বৌটার নাক ডাকছে।

মোড়ল বলে—বেগুনের চাঙারিটা তুই-ই নে, কাঁচা। তুই কোনটে নিবি বাতাসি? পুঁইশাকের ঝুড়িটা?

বাতাসি হেসে বলে—আমার মাথাটা কি এতই পটকা যে মচকে যাবে? আমার মাথায় একটা বিড়ে পর্যন্ত লাগে না—খোঁপাই আমার বিড়ে। ঝিঙে কাঁকুড়ের ঝুড়ি আমার।

দেড় ক্রোশ দূরে শহরতলির বাজার। বালির রাস্তা ধূ-ধূ করে। এক-দমকে পার হয়ে যাই।

নুলোটা বাড়িতে থাকে, এক হাতে বেত চাঁছে। বুড়ি কাঁথা সেলায়, চাল ঝাড়ে, শুকনো পাতা গুছিয়ে জ্বালানি করে। আর সময়ে-অসময়ে আমাদের মাথা কোলের উপর টেনে নিয়ে উকুন বাছে।

বাতাসিকে বলে—এক গা বয়েস হল, বলি, চল শহরে, একটা ঘর বেঁধে তোকে রেখে আসি। এখানে কি সোয়াদটা আছে, বয়েস ভাঙিয়ে চড়া রোদে মাটি মলে?

বাতাসি ক্ষেপে ওঠে, বলে—তুই মর মাগী, তুই তো মা নস, রাক্ষুসী। বুড়ি হয়ে—

বুড়ি বললেই বুড়ি প্যাচার মতো মরাকান্না শুরু করে। সে যে বুড়ি নয় তাই শুধু অস্বীকার করতে চায়। যৌবনের অনেক অপরিজ্ঞাত রহস্যকথা উদ্ঘাটিত হয়—এখনো তার কি-কি যোগ্যতা আছে মেয়েকে তারও একটা ফিরিস্তি দিতে ভোলে না।

মেয়েকে শাপ দেয়।—তুইও একদিন বুড়ি হবি হারামজাদি। তোর দাঁত থাকবে না, নাল গড়াবে।

হপ্তায় দু'দিন করে হাট বসে। সে দু'দিন গরুর গাড়িটা বোঝাই হয়। নুলো হাঁকায়, পাচন চালাতে শিখেছে এক হাতে। হুঁকোটা খালি হস্তান্তরিত হতে থাকে। বাতাসি শেষ টান দিয়ে হুঁকোটা নামিয়ে রাখতে চায় মুছে। বলি—আমাকে দে, আর একটু খাই।

ওকে মুছতে দিই না। বাতাসি হুঁকো টানছে মনে হয় না, চুম্বন করছে। মুখে লাগিয়ে আরো খানিকক্ষণ ফুঁকতে থাকি।

ফিরতে-ফিরতে প্রায় রাত হয়ে যায়। মাঝামাঝি পথে শ্মশান। চিতা জ্বলছিল। নুলোটা এক হাত তুলে নমস্কার করলে। দেখাদেখি বাতাসিও।

হেসে বললাম—দুগগো পুজো বুঝি ওখানে ?

নুলো কিছুই বলে না। বাতাসি বললে—কালীপুজো। আগুনের জিভ মেলেছে। বাস্‌রে—

বললাম—শ্মশান থেকে মড়ার হাড় নিয়ে আসব, দেখবি বাতাসি ?

ভূষণ বাধা দিতে চায়, মোড়ল বলে—যাক না দেখি কেমন !

বাতাসি বললে—ইঃ ? মড়ার হাড় ! আন তো দেখি।

গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লাম।

নুলো বললে—আর কিছু ছাই আনিস ভাই—

—ছাই ? কি হবে ? তোর ডালিম গাছটার সার করতে ?

—মরা মানুষের ছাই—

শুধু ঐ টুকুন। আর কিছু ব্যাখ্যা করে বলতে পারে না।

দৌড়ে গাড়িটা ধরলাম। বেশি দূর এগোয়নি।

—এই দেখ, হাড় এনেছি বাতাসি। চোয়ালের। নিবি ?

বাতাসি শিউরে উঠল—না, না, দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছে আমার।

মোড়ল বললে—ফেলে দে ওটা। ফেলে দিলাম।

—ছাই আনতিস তো কপালে মাখতাম।

বাতাসির কি ভয় ! যেন দুটি বুক ওর থরথর করে কাঁপছে।

বাতাসির লেড়ি কুত্তাটাকে সবাই দূর-দূর করে। বুড়ির তো দু'চোখের ঝাল। বাতাসির কাছে কিন্তু ও-ই সাত রাজার ধন এক মানিক। ওর মুখটা বুকের উপর নিয়ে বাতাসি ওর আঁটুল বাছে, সাবান দিয়ে নাওয়ায়, নিজের

কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে ওর গলায় ফিতে বেঁধে দেয়। মার খায় বেশি ভূষণের বৌয়ের হাতে। বৌটার দিশে থাকে না, পোড়া কাঠটা দিয়েই মারে।

বাতাসিও তার প্রতিশোধ নেয় ভূষণের ছোট্টটাকে থাবড়ার পর থাবড়া মেরে। মাঝে-মাঝে মাদারের ডাল দিয়েও। বলে—বুঝুক, পরের ছেলেকে মারলে কেমন লাগে—

ভূষণের বৌ তেড়ে এসে বলে—তাই হবে লো, পেটে কুত্তাই ধরবি—

বাতাসি জবাব দেয় না। কুকুরটাকে কোলে নিয়ে পোড়া জায়গায় তেল-পটি লাগায়। কুকুরটা জিভ বার করে ল্যাজ নাড়তে থাকে।

নোংরা হলেও ওকে আদর করতে ইচ্ছে হয় মাঝে-মাঝে। গায়ে একটুখানি হাত বুলিয়ে দিই। রাতে নদীর গর্জন শুনে ও যখন চেঁচাতে থাকে, ওর ঘেউ-ঘেউ শুনতে খুব ভালো লাগে আমার। নদীর যে ভাষার মানে আমরা এতদিন বুঝিনি, ও অবোলা কুকুরটা যেন তা বুঝে ফেলেছে। নদীর আর কুকুরের নিভৃত আলাপ শোনবার আশায় কান পেতে থাকি।

বটের তলায় চাটায়ে শুই। নুলো বলে—দাওয়ায় উঠে আয়।

বলি—ঠাণ্ডা সইবার মুরোদ আমার আছে। এক জ্বরেই বাত ধরে না গায়। অকারণে নিষ্ঠুর হয়ে উঠি।

চার পাশে গা-ঢেলে-দেওয়া মাঠের মধ্যিখানে শুয়ে মনে হয়, সমস্ত শূন্য মাটি অফুরন্ত কথায় ভবে উঠেছে। মাঝে-মাঝে অর্ধস্ফুট, কখনো বা নিঃশব্দ—তাই মানুষের কাছে অর্থহীন! ধানের খেতের পোকা থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত এই কথার বেতার চলেছে!

আলুর খেত থেকে বেগুনের খেতে কথা চলে। পুঁইয়ের লতা ঝিঙের লতাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, হাওয়ায় দুলে-দুলে কথা কয়।

কথা চলে মাটির সঙ্গে মেঘের।

ভোরবেলা গা মুড়ি দিয়ে উঠেই কুকুরটা গোয়াল ঘরে গিয়ে ঢোকে। একটু ঘেউ করে গরুগুলোকে সম্ভাষণ জানায়। গরু ল্যাজ নাড়ে—ও ওর কান দুটো। গরু পা-টা একটু নাড়ে, ও পাশেই গুটি মেরে বসে। খানিক বাদে উঠে আবার একটু ঘেউ করে বিদায় জানিয়ে আসে।

যেন দুই অচেনা দেশের রাখীবন্ধন।

এই খোলা আকাশের তলায় সব চেয়ে ভালো মানায় কিন্তু বাতাসির

যৌবন। মিতালি ওর বাতাসের সঙ্গে—সব সময়েই দুষ্টুমি লেগে আছে। দু'টি হাত তুলে ও যখন ভেজা কাপড়টা মেলে বেড়ার গায়ে গোঁজে, বাতাস ওকে ভারি ব্যতিব্যস্ত করে কিন্তু। মাঝে-মাঝে বাতাসের বেয়াদবিকে শাসন পর্যন্ত করে না।

ও যেন পূর্ণতা। নদীটাকে কখনো-কখনো বাতাসি বলেও ডাকা যায়।

বাজার থেকে ফেরবার সময় রোজ পোস্টাপিসে গিয়ে শুধোই—বেলেপাড়ার মাঠের কোনো চিঠি আছে—কাঁচার নামে?

কে চিঠি লিখবে? তবু—

পাগড়ি মাথায় কাকে বেলেপাড়ার মাঠ ভেঙে আসতে দেখা গেল—পিওন! মোড়লের নামে মনি-অর্ডার। কিছু-কিছু মহাজনি কারবার আছে ওর। আঙুলের ছাপ নয়—পিওনের কাছ থেকে টুকরো পেনসিলটা নিয়ে হিজিবিজি কি লিখলে। চেষ্টা করলে পড়া যায়।

মোড়ল বলে—কোন গাঁয়ের মাইনর ইস্কুলে নাকি খানিক পড়েছিল ও—অনেক আগে। পড়তে ভুলে গেলেও দস্তখতটা মুখস্ত হয়েই আছে—

আরেক দিন। এবারও মোড়ল এগিয়ে গেল। মনি-অর্ডার নয়, চিঠি—কাঁচার নামে।

বাতাসি বললে—বাঃ, সুন্দর ছাপ মারা তো, দেখি! কার ঠেঙে পড়িয়ে নিবি?

—বাজারে কত বাবুই তো আসে—

দাদাবাবুর চিঠি।—জাপান থেকে লেখা। লিখেছে, পড়া কেন ছেড়ে দিলি মকবুল? যা টাকা পাঠাতাম, তাতে কি চলত না? চাষবাসের মতলব মন্দ নয়, কিন্তু এম-এ ডিগ্রিটা নিয়ে নে, তোকে আমি বিদেশে আনব।

পরে আরো লিখেছে—এখান থেকে আমি ইউরোপ পাড়ি দেব মাস দুয়েকের মধ্যে। টাকার দরকার হলে লিখবি। ইচ্ছে করে বয়ে যাসনে। কেমন আছিস?

বটের একটা ডালের সঙ্গে মোড়লের বেতো টাট্টুটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। ঝিমোয় আর ল্যাজ নেড়ে-নেড়ে মশা তাড়ায়।

ওর জীর্ণ পাঁজরের তলায় কত দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জিত হয়ে আছে জানতে ইচ্ছে করে। ওর সারা গায়ে ঘা, ঘাড়ের লোমগুলি সব খসে পড়েছে, মাঝে-মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে—বাতাসে কান্নার মতো শোনায়।

শয়ন-ঘরে ও-ই আমার দোসর, কিন্তু কত অচেনা !

ওর দিকে চাইলে আর একটি ছবি মনে পড়ে—সেই শিক্ষয়িত্রী মেয়েটির বিষণ্ণ বিরস মুখ ! সেই দাদাবাবুর হাতের উপর হাত রাখা, সেই কথা কইতে না-পারার অকথিত কান্না !

চষা মাটির গন্ধ এসে লাগছে—আলুর খোসার। তারার অস্পষ্ট আলো ধানের শীষের উপর এসে পড়েছে, বেগুনের পাতায়। ঘোড়াটার ঘোলাটে দুই চোখে।

দাদাবাবুকে একটা চিঠি লিখতে হবে। চাষবাসই করব এমন ইচ্ছাই পরম নয়—না-ও করতে পারি। নানান ভাবে জীবনটাকে বাজিয়ে যাই। একটা-একটা করে তার ছিঁড়ুক !

ঘরের ছাঁচে পিঁড়ের ওপর বসে হুঁকো টানতে-টানতে মোড়ল বললে—তামাক ভরে দেবে এমন একটি প্রাণী পর্যন্ত নেই।

ঝাঁকার থেকে ধুঁতুল তুলতে-তুলতে বুড়ি বললে—একটিকে রাখলেই হয় !

হুঁকোটা নামিয়ে রেখে, নিবন্ত কলকেটা উপুড় করে পিড়ের গায়ে ঠুকতে ঠুকতে মোড়ল বললে—তোর বাতাসিকেই দে না। বেশ তো ডাগর হল।

কোঁচড়ে ধুঁতুলগুলি রাখতে-রাখতে বুড়ি বললে—তোর বয়েস কত হল ? বুড়ির ঠোঁটের কোণে ঠাট্টা।

মোড়ল নিজের বুকের ছাতির দিকে চাইল। বললে—ইয়া বুকের পাটা, এই দেখ হাতের থাবা, মাটি দলে এই পায়ের গাঁথনি—বয়েস ? বাতাসি তোর সুখে থাকবে।

কোঁচড়টা বেঁধে বুড়ি মোড়লের কাছে বসে একটা টিকে ধরিয়ে ফুঁ দিতে লাগল। নতুন করে আর এক ছিলিম তামাক সেজে দিতে চায়।

বললে—তোর এই বয়েসে বাতাসির মাকে নিলেই মানায় ভালো। বলে খিকখিক করে হাসতে লাগল।

মোড়ল বললে—খালি-খালি তামাক সাজতেই নাকি রে ?

হুঁকোটা মোড়লের মুখের কাছে তুলে ধরে বুড়ি গম্ভীর হয়ে বললে—দেখিস—

যেন ওর সারা গায়ে ভোলা যৌবনের আমেজ এসে লাগল—ভাবখানা এমনি করলে।

মোড়ল বুঝি বুড়ির প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছে! বুড়ি উঠে চলল—একটা টান দিয়ে যাবার প্রলোভন পর্যন্ত ত্যাগ করে।

বিড়বিড় করে বলছে—গালের হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়েছে, চুল অকালেই পেকে গেল—তা আমি কি করব? নইলে বাতাসি তো সেদিন হল—

মোড়লের হাত থেকে হুঁকোটা টেনে নিয়ে বললাম—বাতাসি তো আমার, বুড়ি-মা।

বুড়ি মুখ ঝামটা দিয়ে বললে—মর ছুঁচো, চালচুলো নেই, জন্মের ঠিক নেই—বাতাসি!

পরে বলে—বাতাসির সারা গায়ে হীরে-জহরত। তখন চাষার ছেলে? অপিসের বাবু—কাতারে-কাতারে।

বুড়ির কথায় রাগি না। বটগাছটার তলায় বসে নিজের চওড়া বুকটা ফুলিয়ে চেয়ে থাকি। হাতের 'মাস্‌ল' শক্ত করে টিপে-টিপে দেখি। দেখি—

আশ্চর্য! নিজেকে বলে নিজেকে চমকে দিই।

চট করে বিকাশের কথা মনে পড়ে যায়। কলেজে সেদিন আমাকে ও বলেছিল—আশ্চর্য! দুঃখ যা লাগে তার চেয়ে আশ্চর্য বেশি লাগে, কাঞ্চন। যাকে সাত-সাত বছর ধরে ভালোবাসতাম, সে মাথায় সলজ্জ ঘোমটা টেনে—কথাটা শেষ করতে পারে না, বলে ওঠে—আশ্চর্য!

যেন বিশ্বাস করতে চায় না। যেন নিজে নিজের ভূত দেখছে।

বি-এ ক্লাশের লাস্ট বেঞ্চিতে বসে ও আমাকে ওর প্রেমের গল্প বলত রোজ। বলত—হাত পাতলেই যা পাওয়া যায় হাত উপুড় করলে তা কতক্ষণ?

আশ্চর্য!

চেয়ে দেখি, ডালিম গাছটার তলায় নুলো বসে, আর তার কাছ ঘেঁষে বাতাসি।

এগিয়ে যাই। কোলের উপর নুলোর খোঁড়া পা-টা তুলে নিয়ে বাতাসি তাতে কি খানিকটা মাখছে।

—কি করছিস বাতাসি?

—ওর পায়ে একটা তেল মাখছি। কবরেজ বলে দিয়েছে, অব্যর্থ ওষুধ। এইটুকুন শিশি ভাই, দাম নিলে সাড়ে ন-আনা।

—কোন কবরেজ?

—তেলিবাজারের অন্নদা কবরেজ। সেই যে রে—

—বুঝেছি।

বাতাসি শহরে গিয়ে নুলোর জন্যে তেল কিনে এনেছে।

বললাম—মোড়ল বুঝি পয়সা দিয়েছিল?

বাতাসি হাতের তেলোয় আরো খানিকটা তেল ঢালতে-ঢালতে বললে—হ্যাঁ, মোড়ল দেবে! জানিস, ওর এই খোঁড়া পা-টায় লাঠির বাড়ি মারে। বাপ তো না সুমুন্দি।

পরে নুলোকে বললে—তুই তোর এই জ্যাঁতা পা-টা ওর মুখের ওপর তুলে দিতে পারিস না?

—তবে কোথায় পেলি?

বাতাসি হাসল, বললে—ট্যাঁড়সের দর আজ চড়িয়ে দিয়েছি। মোড়লকে বলিসনি যেন।

কাছে মাটির ঢিবিটার উপর বসলাম।

আমার মুখে হাসি দেখে নুলো বললে—কিচ্ছু হবে না এতে। তুই বাজে চেষ্টা করছিস।

বাতাসি ধমক দিয়ে বললে—না, হবে না? কালু ধোপার বৌটার সেদিন কি বমি, নাড়িভুঁড়ি উলটে পড়ল। অন্নদা কবরেজ একটা বড়ি দাঁত দিয়ে কেটে আদ্দেক খাইয়ে দিলে মাগীটাকে। বমিকে যেন যমে গিলে খেল। দেখিস না তোর পা দু'দিনেই টনকো হয়ে ওঠে। এই হাত দিয়েই মারবি কুড়ুল, এই পা দিয়েই তোর বাপের মুখে লাথি। বলে জোরে জোরে মালিশ করতে লাগল।

নুলোর চোখে ঘোর লেগেছে। ছোট্ট ডালিম গাছটার ডগায় একটা ছোট্ট ফুল ফুটেছে—তার দিকেই চেয়ে আছে। গাছটা ওর নিজের হাতে পোঁতা। দুদিন পর-পরই সন্ধ্যাবেলা একটা বাঁশের কাঠি দিয়ে মাপে—এ দু'দিনে কতটুকুন বড় হল। গাছটা প্রথম যেদিন সরু কাঙাল দুটি ডাল আকাশের দিকে মেলে ধরল, নুলো আনন্দে গাছটার চার পাশে খোঁড়া পা-টা নিয়ে খুব নেচেছে। দুটি আঙুলে অতি আলগোছে, যেন অতি কষ্টে, সবে-গজানো

কচি পাতাগুলি ছুঁয়ে বেড়িয়েছে—যেন ওদের চোখে ব্যথা লেগে যাবে, এই ভয়। কত ডাগরটি তারপর হল, কত পাতার ঘোমটা টেনে দিল—আজ বুঝি অরুণিমার আশীর্বাদ লেগে এতদিনে ফুল ফুটেছে।

বহু দিনের আলাপী বন্ধুর মতো গাছটা নুলোর দিকে চেয়ে আছে যেন।

শুধোলাম—আরাম লাগছে রে নুলো ?

বাতাসি ধমক দিয়ে বলে উঠলো—একদিনে কি ? দিন দুত্তিন যাক।

মনে হয়, নুলোর অসাড় পঙ্গু হাত-পা দুটো যেন সহসা জল-তরঙ্গের বাদ্য হয়ে উঠেছে ! এখুনি যেন অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠবে।

তেলে-ভেজা হাত বাতাসির।

মালিশ শেষ করে বাতাসি নুলোর উপরের ঠোঁটের উপর আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। তাতে মৌমাছির কালো কচি পাখার মতো গোঁফের রেখা উঠেছে।

চলে যাবার সময় বললাম—এই অসাধ্য সাধন কেন করছিস বাতাসি ? মায়ের পেট থেকে যে তে-ব্যাঁকা হয়ে জন্মাল, সে আর সিধে হয় না। যতই তেল মেখে হাত লাল কর না।

বাতাসি এমন করে তাকাল, যেন ওর ধারালো নখ দিয়ে এখুনি এসে মুখের উপর খামচি বসিয়ে দেবে।

বকের ঠ্যাঙের মতো কাহিল পা দু'টি ফেলে ছুটতে-ছুটতে হাবা এল।

ওর জ্বর ছেড়েছে। সারা বছরে এই একবার ওর জ্বর ছাড়ে। যখন প্রথম দখিনের হাওয়া দেয়।

ছেলেটা ন্যাবায় ভোগে। রোগা বড়-বড় চোখ দুটো পাশুটে। আকাশের দিকে চাইতেই খুশিতে উপচে গেল। আকাশের সঙ্গে ওর যেন আজ প্রথম শুভদৃষ্টি।

ফাঁকা খেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ও ফ্যালফ্যাল করে তাকায় চার পাশে। সরু গলাটা ঘোরাতে থাকে। শালিক ধরতে হাত বাড়িয়ে ছোটে, রোগা পা নেতিয়ে আসে। শিশির-ভেজা কপির পাতায় পাতলা হাতখানি ধীরে ধীরে রাখে, বুলোয়।

মোড়ল খেত থেকে কপি তুলে ঝুড়ি ভরে। হাবা রোদে পিঠ দিয়ে পাশে এসে বসে। দু'হাতে মাটি ছানতে-ছানতে বলে—এবারে কত কপি হল মোড়ল-

কাকা ? সবাইর ঘরে যাবে তো একটা করে ? আমাকে একটা দাও—ফাউ। আজ জ্বরটা ছাড়ল। মাকে বলব কপি রাঁধতে। দুটো হলে বেশি করে—

মোড়ল ওর কথায় কান দেয় না। আপন মনে বলে—নাই বা রইল কেউ পাশে। বাঁ হাতটা কেটেই বা নিক না কেন। এই এক হাতেই লাঙল চষে সোনা ফলাব।

—মোড়ল-কাকা, ধলি-গরুটা ক-সের দুধ দেয় এখন ? ওর বাছুরটার রঙ কি করে লালচে হল ? কেমন ঢুঁ দিচ্ছে দেখ। বাঃ, ফড়িং ধরব।

আঙুলগুলি বাড়ায়, ফড়িংটা একটু উড়ে গিয়ে সরে বসে—হাবা আর আঙুল বাড়ায় না। দেখে।

মোড়ল আপন মনে বলে—সোনার খেতের লক্ষ্মী হয়ে থাকত !—তা নয় ! যাবে যখন লুঠ করে লাঠিয়াল, বা খোলার ঘরে কাতরাবে যখন ব্যামোয় পড়ে ! সেই বুঝি ভালো হবে ? যাক, আমার কি ? আমি এই খেতে বুক দিয়ে পড়ে থাকব।

হাবা আমার কাছে এসে বললে—আমাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দাও না, কাঁচাদা ! কোনোদিন ঘোড়ায় চড়িনি আমি।

বললাম—ওর সারা পিঠে যে ঘা।

ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে এসে বললে—কই ঘা ? ও কিছু না, দাও না চড়িয়ে।

একটা কলাপাতা ছিঁড়ে এনে ঘোড়ার পিঠে পেতে দিয়ে আস্তে-আস্তে কোলে করে তুলে দিলাম। ঘোড়াটার দু'পাশে দু'পা ঝুলিয়ে দিয়ে ও এমন ভাবে বসল, যেন ও রাজা—সিংহাসনে বসেছে। নীল আকাশ যেন ওর রাজ-ছত্র। দড়ির লাগামটা একটু টেনে কঞ্চির মতো পা দু'টি একটু দুলিয়ে ঘোড়াটাকে চালাতে চাইল জিভ দিয়ে শব্দ করে। ঘোড়াটা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, পরে আস্তে-আস্তে একটু-একটু করে হাঁটতে লাগল—যেন হাঁটতে পারছে না, ঘাগুলো টন্‌টন্ করছে।

হাবা আর ঘোড়াটা যেন বন্ধু। দৌড়ে যাবার জন্যে ঘোড়াকে একটুও খোঁচাচ্ছে না কিন্তু। ঘোড়াটাও আস্তে চলেছে ! ওরা যেন পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলেছে।

ওকে কোলে করে নামিয়ে দিলাম। ঘোড়ার পিঠটা একটু চাপড়াল। পরে একদৃষ্টে নদীর দিকে চেয়ে রইল—জেলে-নৌকোরা পাল তুলে দিচ্ছে।

ওর এই বাঁশপাতার মতো কাঁপুনে অথচ টলমলে দেহটিকে খাপছাড়া লাগে না। ও যেন মেঘলা আকাশের বুক-চেরা তৃতীয়া-চাঁদের এক টুকরো ঘোলাটে মলিন হাসি।

বললে—কাঁচাদা, নদীতে নাইতে যাব আজ।

—চড়ুই পাখির ডালনা খাওয়াবে—রাঙা আলুর সঙ্গে?

—বুড়ির মাথায় মারব এই·ঢিলটা?

—নদীর মধ্যে তিমি মাছ হয়ে নৌকোগুলো গিললে কেমন হয়?

শেষে হাত পেতে বললে—আজ আমার জ্বর ছাড়ল, কিছু বকশিশ দাও না কাঁচাদা। বলে হলদে দাঁতগুলি বার করে হাসতে লাগল।

কোন পাড়া থেকে একটা ভেড়ার ছানা এ-পাড়ায় চলে এসেছে পথ ভুলে।

চষা মাটির উপর ছোট-ছোট দাগ।

বাতাসি ওর মুখটা বুকে চেপে ধরে বললে—বা, বাঃ, দেখ এসে নুলো, কেমন সুন্দর বাচ্চাটা!

হাবা দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—আমার কোলে একটু দাও না বাতাসি-দিদি!

সমস্তটা দিন বাতাসি ভেড়াটাকে বুকে-বুকে রাখলে। ওকে আর কুকুরটাকে একসঙ্গে নাওয়ালে, চেনা করিয়ে দিলে। কুকুরটা জিভ বার করে ভেড়ার পা-টা একটু চাটল।

বিকেলবেলা দু'হাঁটু ধুলো নিয়ে ও-পাড়ার দুলাল এসে হাজির। বললে—পথ ভুলে হেতায় পালিয়ে এসেছে বুঝি? আমি সারা শহর তন্নতন্ন—

বললাম—তুই না এসে পড়লে রাত্রে বাতাসি আমাদের মাংস রেঁধে খাওয়াত। দেরি করে এলে নেমন্তন্ন খেয়ে যেতে পারতিস।

বাতাসি রুখে উঠল—ককৃক্ষনো না। মিথ্যে বলছিস কেন? ওর গায়ে কে বঁটি তুলবে?—ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ওর গালে একটা চুমু খেয়ে বললে—দুষ্টুমি কোরো না। বাড়িতে থেকো—মাঠে।

ভেড়াটা চলে গেলে কুকুরটাকে কোলে টেনে নিয়ে আঁটুল বাছতে বসল।

হাট বার। মোড়ল দু'দিন বাড়ি ফেরেনি। ভূষণেরও কাল রাতে জ্বর হয়েছে।

বললাম—মোড়ল বউ আনতে গেছে বুঝি ?

বুড়ি ধনেশাক তুলতে-তুলতে বললে—দেখি না কেমন বউ আনে। চল্লিশ বছর ছাড়া কে রাজি হয় দেখি।

এ দু'দিন হুলোকে বাতাসিই রেঁধে দিয়েছে। খাইয়েও দিয়েছে এক-আধ গরস।

আমি যদি বলি—আমাকে আর রাঁধাস কেন ? ঐ সঙ্গেই আর দু'মুঠো চাল নে না! বাতাসি কঠিন হয়ে বলে—তোর সমত্থ দুটো হাতের তো কত বড়াই করিস! এক হাতে কাঠ ঠেলবি, আর হাতে হাতা দিয়ে ভাত নাড়বি।

বললাম—কিন্তু ও কি ভাত মাখতেও পারে না ?

বাতাসি ক্ষেপে উঠত। বলত—না। খাইয়ে দিলে খেতে জানে।

—আমি খাইয়ে দিই তবে ?

—দে না। আঙুলে ঘ্যাচ করে কামড়ে দেবে—বলে কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে হেসে উঠত।

গরুর গাড়িটা বোঝাই করছিলাম। বিকেল হয়ে এসেছে। বললাম—আজ শশার ঝুড়িটায় খুব হাঁক দেওয়া যাবে, কি বলিস বাতাসি ?

হাবা ছুটতে-ছুটতে এসে বললে—আমি হাটে যাব কাঁচাদা।

—চল্।

হুলোই গাড়ি হাঁকায়। যত বলি—বাতাসি, একটা কথা শোন। ও শুধু ঘাড়টা একটু কাত করে বলে—বল্। একটুও সরে আসে না।

অগত্যা হাবার সঙ্গেই গল্প করি।

—গাঙশালিকের ঝাঁক চলেছে।

—কাঁথার তলায় আর শুতে হবে না, ভারি মজা!

—আলু তুমি মেপে দেবে আর আমি গুনে-গুনে পয়সা থাক করে সাজাব! কেমন ?

বাতাসি যে একেবারে শুয়ে পড়ল। শুয়ে-শুয়ে বাতাসি বলছে মুলোকে—রাতে একলা শুতে কাল তোর খুব ভয় করছিল, না ?

মুলো বললে—কাঁচাকে আজ শুতে বলব খন।

—দূর !

হাট থেকে ফিরবার মুখে বললাম—তোরা একটুখানি গাড়িটা নিয়ে দাঁড়া। আমি হাবাকে একটু শহর দেখিয়ে আনছি।

হাবা যা দেখে তাই অবাক হয়ে দেখে। বলে—খাবারের দোকান! কত বোলতা ঘুরছে চারপাশে। আচ্ছা, ময়রাদের খিদে পায় না কাঁচাদা ?

—পায় বৈকি। দোকানে ঢুকলাম।

পরে একটা দর্জির দোকানে। বললাম—এর একটা কোটের মাপ নিন তো।

হাবা আনন্দে তার গা থেকে ছেঁড়া চিটচিটে গেঞ্জিটা একটানে খুলে ফেললে। এক, দুই, তিন—আট, পাঁজর গোনা যায়। ষোলো ইঞ্চি ছাতি। দোকানের সুমুখে কতগুলি মেথরের ছেলের ভিড় জমে গেছে। হাবা ওদের দিকে এমন করে চাইছে—ওরা যেন ভিক্ষুক।

—কবে কোটটা হবে কাঁচাদা ?

—দু-তিন দিনের মধ্যে।

হাততালি দিয়ে বলে ওঠে—মাকে জানতেই দেব না, কাপড়টা গায়ে দিয়ে থাকব। হঠাৎ কাপড়টা খুলে নিলেই জামাটা দেখে ও চমকে যাবে। গোলাপফুল-তোলা ছিট। সব বেছে ওটাই ওর পছন্দ! বলে—কোটটায় ক'টা ফুল পড়বে ? গোটা কুড়ি নিশ্চয়ই।

পরে বলে—গাবার জন্য একটা ঝুমঝুমি কেনো না কাঁচাদা।

গাবা ওর ছোট ভাই।

রাস্তার পারে একটা আম গাছ—কচি আম ধরেছে।

বললে—আমাকে দুটো আম পেড়ে দাও না!

বললাম—টক আম খেলে ফের জ্বর হবে।

—এমনি না খেলেও হবে। আমার তো মোটে এ ক'টা দিন ছুটি। পরে তো ফের কাঁথার তলায় শোবই। দাও না।

উঠলাম। নামবার সময় পা পিছলে পড়ে গেলাম মাটিতে। হাঁটুটা যেন

একটু মচকে গেল। এসে দেখি, ফাঁকা রাস্তা—গাড়ি নেই। ওরা একলা-একলা চলে গেছে।

হাবা বললে—কি হবে তবে ?

—হেঁটেই যেতে হবে।

খোঁড়াচ্ছিলাম। হাবাও আস্তে-আস্তে যাচ্ছিল। তখন অন্ধকার তার ডানা মেলেছে।

হাবা হাঁপ নিয়ে বললে—ঘোড়াটা থাকলেও বেশ হত, তুমি হাঁকাতে আর আমি তোমার পিঠ আঁকড়ে বসে থাকতাম।

বললাম—তুই আমার কাঁধে চড়।

—তোমার পায়ে যে লাগবে।

—লাগুক। কাঁধে তুলে নিলাম।

আমার চুলগুলো দু'হাতে আঙুল দিয়ে টেনে ধরে হাবা বললে—ওখানে অত আগুন কিসের কাঁচাদা ?

—মড়া পুড়ছে! যাবি ?

—চল না। একটু জিরিয়ে নেবে।

শ্মশানে এসে নদীর ধারটায় একটু বসলাম।

হাবা বললে—আমার ভারি ভয় করছে কাঁচাদা।

—কেন ?

—ঐ তালগাছটার ওপরে কে ? দুই লম্বা ঠ্যাং মেলে ? এখান থেকে চল—চল।

—কোথায় লম্বা ঠ্যাং ? দ্যুৎ।

না, না। প্রকাণ্ড হাঁ-টা, লাল চোখ। চল কাঁচাদা। শিগগির। এই দিকেই যে আসছে।

কাঁধের উপর তুলে নিলাম ফের। আমার চুলগুলি ভীষণ জোরে টেনে রইল।

বলে—আর কতদূর ?

বাতাসিকে গিয়ে বললাম—গাছ থেকে নামতে গিয়ে হাঁটুটা মচকে গেল, বাতাসি। তোর তেলটা দে না একটু মালিশ করে।

বাতাসি বললে—মচকেছে তো নিশুন্দি পাতা বেঁধে রাখ না। ও তো বাতের তেল।

—তবু দে না একটু মালিশ করে। সেরেও যেতে পারে শিগগির।

—কক্ষনো সারবে না এতে।

—একবার মেখেই দেখ না। একদিনেই কি আর ফল হয়?

বাতাসি আমতা-আমতা করে বললে—তেল আর নেইও, ফুরিয়ে গেছে!

—সাড়ে-ন-আনা পয়সা দিলে কাল কিনে এনে মেখে দিবি?

বাতাসি ক্ষেপে উঠল।—কেন, তুই কিনে আনতে পারিস না? তোর হাত দুটো এমন কি অথব্ব হয়েছে যে একেবারে চাকরানি চাই তেল মেখে দিতে?

—চাকরানি কেন? ঐ যে কোণে ইটের পাজার কাছে শিশিটা, ঐ তো আছে খানিকটা তেল।

এগিয়ে আসতে দেখে বাতাসি তাড়াতাড়ি শিশিটা দু'মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠল—যা, যাঃ, পালা! অল্প একটুখানি মাত্র আছে। কাল ভোরে ওকে মেখে দিতে হবে না?

চলে গেলাম।

বাতাসি বললে—বেশ হয়েছে। খুব খুশি হয়েছি। আর ক্ষ্যাপাবি খোঁড়া বলে?

মোড়ল ফিরে এসেছে—বউ নিয়ে নয়, কতগুলি টাকা নিয়ে।

আমাদের মাইনে দিলে। ঝুলোকে পর্যন্ত, গাড়ি হাঁকাবার জন্যে। বাতাসির কাছে রাখতে দিল।

বুড়ি বললে—বউ রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে কি না! পাকা দাড়ি দেখে আগুন নিয়ে আসত।

মোড়ল ধান ভানতে-ভানতে বললে—জমিদার আরো জমির বন্দোবস্ত দেবে। বাগিচা করব—লিচুর। খেতের এধারে খালি সবুজ, ওধারে সোনা। টিকে থাক এখানে। হুঁকো টানবি আর সুখে থাকবি। গায়ে মাটি মেখে কত সুখ। পরে মাটি চষতে-চষতে বললে—চাই না কাউকে। এই খেতটাই আমার বউ।

ঝুলো এসে বললে—বাবা, বাতাসিকে একটা নাকছাবি কিনে দাও না। ও চাইছিল।

বাপ বললে—তোর টাকার থেকেই দিস।

ওরা হাট থেকে আগেই ফিরেছে। হাবার কোটটা নিয়ে যাবার কথা আছে। তাই আমার যেতে দেরি হবে।

হাবার আবার কাল থেকে জ্বর এসেছে।

ফিরে এসে বাতাসিকে শুধোলাম—কি হয়েছে রে বাতাসি? কে কাঁদছে?

ভূষণের বৌ।—বাতাসির চোখ মুখ ফোলা, ঝাপসা।

—হাবার হয়ে গেছে।

—কখন? কি করে?

—ঘণ্টাখানেক আগে। জ্বরের মধ্যে শুঁটকি মাছের ঘণ্ট চুরি করে খেয়েছিল বলে ওর মা সেই যে দরজার খিলটা দিয়ে ওর মাথায় বাড়ি মারল, সেই বাড়িতেই—

অথচ নদীর গোঙানির সঙ্গে ভূষণের বৌর মরা-কান্নার পাল্লা চলেছে।

ওপাড়া থেকে দুলাল এল কাঁধ দিতে। আমাকে বললে—মাদার ফেড়ে ফেলি, আয়!

মাদার গাছটার পাজরায়-পাঁজরায় যেন কান্না। হয়তো হাবার জন্যেই—রোগা বেতো ঘোড়াটা পর্যন্ত দড়ি খুলে অস্থির হয়ে বটগাছটার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গরুগুলি গলা তুলে গাঢ় চোখে চেয়ে আছে—জাবর কাটছে না।

বুড়ি আঁচলে চোখ মুছতে-মুছতে হাপুরে গলায় ভূষণের বৌকে বললে—অত কাঁদছিস কেন লো লুটিয়ে-লুটিয়ে?—এক ছেলে গেছে কত আবার হবে—

ভূষণের বৌ বুড়িকে খন্তা নিয়ে তাড়া করে এল।—হারামজাদি বুড়ি, শুকনি—তোর শাপেই তো আমার হাবা—আমার হাবারে—

তারপরে নদীর ককানির সঙ্গে তাল রেখে কান্না, বিনিয়ে-বিনিয়ে।

ফুলো মিনতি করে বললে আমাকে—তুই এবার কাঁধটা বদলা, অনেকক্ষণ নিয়ে আছিস। আমাকে দে এবার।

—তুই এতটা কাঁধই পাবি না। তুই পারবি ওদের সঙ্গে চলতে?

মোড়ল বললে—হ্যাঁ, আমরাও ওর সঙ্গে ঠুকে-ঠুকে চলি আর কি!

বাতাসি ডাক দিলে—চলে আয় হুলো, আমরা পিছেপিছে চলি আস্তে-আস্তে।

• কাঁধটা বদলালে পারতাম!

চিতায় তোলবার আগে ওর গায়ে কোটটা পরিয়ে দিলাম। হুলো পাশের সজনে গাছ থেকে কতগুলি ফুল ছিঁড়ে ওর মুখে বুকে ছুঁড়তে লাগল।

যেন কোটটা পরে ও হাসছে।

মাটির উপর মুখ থুবড়ে বাতাসির সে কি বুক-ভাঙা কান্না! হাবা যেন ওর কে! হাবা তো পুড়ছে না, ওর গায়েই যেন আগুন লেগেছে—ওর বুকে।

তালগাছের মাথা পর্যন্ত আগুনের শীষ ওঠে—যেন দূরের তারাকে ছুঁতে চায়।

পোড়া শেষ হয়ে গেলে হুলো কতগুলো ছাই নিয়ে মুখে বুকে পায়ে সর্বত্র মাখতে লাগল। দেখাদেখি বাতাসিও।

বললাম—তোরা একরাতেই সন্নেসী হয়ে গেলি নাকি?

হুলো তেমনি বললে—মরা মানুষের ছাই—

তারপর মাটির উপর গড় করে প্রণাম। বাতাসি একেবারে সাষ্টাঙ্গ।

ফিরে এসে বাতাসি কুকুরটাকে বুকে নিয়ে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। কুকুরটা যেন ওর খোকা!

হুলো ওর ডালিম গাছের পাশে চুপ করে বসে রইল।

মোড়ল ভূষণকে ডেকে বললে—মন খারাপ করিসনে ভূষণ! কত আসে যায়। সেই তো সেবার এক খেত মূলোর চারা হয়ে বৃষ্টিতে সব মারা গেল। এও তেমনি।

ভূষণ বললে—নাঃ। গেছে হাড় ক'খানা জুড়িয়েছে। রাত্তিরে ঘুমুতে দিত না। ঝঞ্ঝাট—মুখে বলে বটে কিন্তু চোখের জল মোছে।

মোড়ল বললে—আমারও মনটা সেবার ভারি দমে গেছল। অত ছোট-খাটো দুঃখ নিয়ে থাকলে কিছুই চলে না ভাই। এই প্রকাণ্ড মাঠের প্রতিটি ঘাস আমাদের ছেলে—মাঠটা ওদের মা।

মোড়লের মনও ঠিক নেই। রাতে খেতের আল বেয়ে-বেয়ে চলে, ঘুমুতে যায় না।

ঘোড়াটা মাঝে-মাঝে বিকৃত শব্দ করে ওঠে—ঘায়ের যন্ত্রণায় হয়তো।

সমস্ত মাঠটা যেন খাঁ-খাঁ করছে।

সে-রাতে হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এল, আকাশ ভেঙে। সঙ্গে ঝড়ের দুরন্তপনা। মেঘের কালো ঝুঁটি ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে।

কলাগাছগুলি পড়ে গেল—

নদীর জল ফুলে উঠেছে, ঝড়ে মাটির ঢেলা উড়ছে, ধুলোয় সব দিক একাকার।

তার মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি—অন্ধকার চিরে-চিরে তলোয়ারের ঝিলিক দিচ্ছে। মড়-মড় করে একটা মাদার গাছও পড়ল।

শুধু কুকুরটা নদীর সর্বনাশা ডাক শুনে প্রতিধ্বনি করছে। যেন কাকে কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে দেবে।

বাইরে বেরিয়ে এলাম—নদীর পাড়ে। নদী দুর্দমনীয়, আমার পায়ের নিচের মাটিতে চিড় ধরল। সরে এলাম—হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটির চাপটা।

নদী তা হলে এদিকেও মাথা কুটতে লেগেছে।

পিছনে চেয়ে দেখি—বাতাসি। সব কাপড়-চোপড় ভেজা, দুরন্ত ঝড় ওর সঙ্গে ফাজলামো লাগিয়েছে।

—উঠে এলি যে জলে ?

—নুলোকে খুঁজে পাচ্ছি না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

দু'জনে খুঁজতে লাগলাম। ধুলোয় কিছুই দেখা যায় না. চোখের উপর জলের ঝাপটা লাগে।

বললাম—আমার হাতটা ধর বাতাসি। নইলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবি।

বাতাসি আমার হাত চেপে ধরে—ভেজা হাত, কিন্তু ভিতরের রক্ত যেন ফুটছে।

—ঐ যে, ঐ যে নুলো। একটা বিদ্যুতের ধাঁধালো আলোয় আচমকা দেখতে পেয়ে বাতাসি চেঁচিয়ে উঠল।

এগিয়ে গিয়ে দেখি নুলোর ডালিম গাছটা ঝড়ের বাড়ি খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেছে। নুলো সেটাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ফের মাটিতে পোঁতবার চেষ্টা করছে।

বললাম—ও কি আর বাঁচে ? ফেলে রেখে ঘরে যা। ঠাণ্ডায় এবার ডান দিকটাই বুঝি টুঁটো করতে চাস ?

তুলো কেমন করে যেন চোখের দিকে চায়—
অমনি করে বিকাশও একদিন চেয়েছিল!

পরের দিনও বৃষ্টি। সমান তালে চলেছে। বুড়ি বললে—কালবোশেখী!

মোড়ল বললে—ঝড়টাই সর্বনেশে। ঝাঁকাগুলি সব পড়ে গেল। নইলে বৃষ্টিটা তো ভালোই। মাটি মেতে উঠবে।

বাজারে আজ আর কারু যাওয়া নেই। মাঠে জল থইথই করছে।

মোড়লের ঘরে আজ সব্বাইর খিচুড়ির নেমন্তন্ন।

রাতেও জল ধরল না। বরং আরো বেগে এল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হাত-পা ছোঁড়া!

মাঝরাতে আবার উঠে এসেছি নদীর পাড়ে। ফেনিল নদী পাক খাচ্ছে—যেন নিজে নিজের চুল ছিঁড়ছে।

পিছনে ফের বাতাসি। তেমনি ভেজা গা, তেমনি বাতাসের ইয়ার্কি ওর সঙ্গে।

বললে—নদী তো নয়, মা-কালী। বলে হাত জোড় করে প্রণাম করলে।

ওপারের পাটের কারখানার খানিকটা ঝুপ করে পড়ে গেল। নদীটা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বললাম—উঠে এলি যে আজও? অসুখ করতে চাস বুঝি?

আমার কাছে সরে এসে বললে—ভারি ভয় করছে, কাঁচা।

হাতটা বুঝি একটু বাড়িয়ে দিলে। জোরে চেপে ধরলাম।

—ঐ দেখ, ঐ কাঁচা, একটা নৌকো ডুবছে।

একটা ডিঙি উলটে গেল প্রায় পাড়ের কিনারে এসে। কোন লক্ষ্মীছাড়ার নৌকো? ঝড়ের তাড়নার মধ্যে আর্তধ্বনি মিলিয়ে গেল হয়তো।

—ওকি, কাপড় কাছছিস যে। ঝাঁপাবি নাকি?

—হাঁ, দেখছিস না, মেয়েলোক—

—ক্ষেপেছিস, কাঁচা? বলে পিছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরে বাধা দিতে চাইল।

বাতাসির আলিঙ্গন থেকে নদীর বাহুবন্ধন বুঝি বেশি লুব্ধ করেছে। দুই হাত মেলে ঝাঁপ দিলাম। বাতাসি চিৎকার করে উঠল।

আমার হাতে বুকের সন্তানটিকে ফেলে মা তলিয়ে গেলেন, জলে—অন্ধকারে।

পাড়ে যখন উঠে এলাম, শিশুটি আর নেই। আগেই হয়ে গেছে।

—দেখি, দেখি। বলে বাতাসি শিশুটিকে কেড়ে নিয়ে নিজের ভেজা বুকের উপর চেপে ধরল। যেন ওকে গরম করতে চায়। ওর মুখে চুমোর পর চুমো দিতে লাগল। ও-ই যেন ওর মা, হারা-ছেলে ফিরে পেয়েছে।

—চল-চল ঘরে, কাঁচা। সেঁক দিলে এখনো বাঁচতে পারে। বলে আর অপেক্ষা না করেই মরা শিশু বুকে নিয়ে ঘরের দিকে ছুটল। ঊর্ধ্বশ্বাসে। যেন পাগলী হয়ে গেছে।

কিন্তু বৃথা!

তৃতীয় দিনে ঝড়বৃষ্টির মাতলামি আর বুঝি সইল না। রাক্ষসী নদীটা তার দুই পাড়ের বন্ধন ভেঙে হুড়মুড় করে ডাঙায় এসে পড়েছে কোটি-কোটি ফণা তুলে।

ঢেউয়ের পর ঢেউ—যেন মহাসমুদ্র।

সব ভেসে গেল—মোড়লের স্বপ্নভরা খেত মাঠ জোত জমি, বাড়ি ঘর দোর সব। দিগন্তসীমা পর্যন্ত জলস্রোত। মধ্যরাত্রির হৃৎপিণ্ডে দুর্বার তরঙ্গতর্জন—সমস্ত মানুষের দুর্বল আর্তকণ্ঠ ছাপিয়ে।

খানিকক্ষণ বাদে আর কিছু শোনা যায় না। কুকুরটাও ভেসেছে।

সবাই ভাসমান, ভেসে চললাম নদীর অতর্কিত নিমন্ত্রণে—আমি, মোড়ল, ভূষণ, ভূষণের বৌ, বুকের উপরে গাবা, নুলো, নুলোর হাত ধরে বাতাসি, আর বুড়ি। ও-পাড়ার দুলালও। এ-পাড়া ও-পাড়া—সব। গরু, বেতো টাট্টুটাও। আরো কত! হিসেব নেই, পাত্তাও নেই। বটগাছটা পর্যন্ত।

ভোর হয়নি, নদীর তড়কা তখনো থামেনি—তখনো ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মিছিল।

বুকের কাছে কি একটা এসে ঠেকল। যেন খানিক ভর পেলাম। ওকে সাপটে ধরে খানিকক্ষণ আরো ভাসা যাবে। আর যদি মরতে হয়, তো ওকে নিয়েই—তলিয়ে গিয়ে!

—কে, বাতাসি ?   আয়—

ও কোনো জবাব দেয় না। আঠার মতো অন্ধকারে সমস্ত আকাশ আর জল যেন আটকে গেছে।

ওকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অবশিষ্ট শক্তিটুকু প্রয়োগ করে ওর মুখে নিবিড় চুম্বন দিলাম।

আর একটা ঢেউয়ের হেঁচকা ধাক্কায় দুর্বল হাতের বন্ধন থেকে ও খসে ভেসে গেল।

হয়তো বানের জলে শ্মশান থেকে একটা পোড়া গাছের গুঁড়িই ভেসে এসেছিল।

॥ মুক্তা ॥

আবার কলকাতা। সকালে কুয়াশা, দুপুরে ধুলো, বিকেলে ধোঁয়া।
বস্তি, না আঁস্তাকুড়! সমাজের তলানিদের অতল সমুদ্র।—ভিড়ে গেছি।
সমস্তই সস্তা এখানে—প্রেম আনন্দ মৃত্যু।
একটা চাকরি পেয়ে গেছি। ট্র্যামের পয়সা কুড়োই।
জাঁতা ঘুপসি বস্তির বাসিন্দাদের সঙ্গে বন্ধুতা পাতাই—বেনোজলের জোয়ার!

দরজাটা খোলাই ছিল। তবু সে-ঘরে আলোকের পলকটিও পড়ে না। জমিদার-বাড়ির উঁচু পাঁচিলটা ডিঙিয়ে আসতে-আসতেই রোদের হাঁপ ধরে যেন, ঝিমোয়। তারপর মাড়োয়ারিদের বেঢপ ভুঁড়িরই মতো হাসপাতালের মোটা গম্বুজটা রোদকে শুধু আড়াল করে আটকেই রাখে না, চেপটে ওর টুঁটিটা যেন চেপে ধরে। ওটার কবল এড়িয়ে এসেই ও একেবারে ভীতু রোগা ছেলের মতো সন্ধ্যার বুকে মুখ রেখে জিরোয়—অন্ধকারের চোখের জলে গলে-গলে পড়ে তারপর।

কিন্তু ঐ ঘরে ওর চিরকালের কবর—

মরা মানুষের বোজা চোখ দুটো জোর করে টেনে খোলাও যেমনি, তেমনিই ঐ ঘরের জানলা খোলা।

রোদ আসে না। যে-রোদে শুকনো বনে আগুন লাগে আচমকা, মজুররা যে-রোদে উপুড় হয়ে পিঠ পেতে রাস্তা খুঁড়তে-খুঁড়তে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। একটি ছিটেও না।

ডাকলাম—দীনবন্ধু! পাইপ নিয়ে বেরোলি না যে এখনো?

ভোর হয়ে গেল, এখনো দীনবন্ধু ঘুমুচ্ছে, কি রকম? বহু কষ্টের টিমটিমে চাকরিটাও খোয়াতে চায় বুঝি?

তক্ষুনিই চিৎকার করে উঠতে হল—পুতলি, ও পুতলি, শিগগির আয়—শিগগির।

হাতে একটা জলন্ত কুপি নিয়ে পুতলি দৌড়ে এল।—কি, কি?

কটা কুপি একসঙ্গে জ্বালিয়ে আকাশের সূর্য—কে তার হিসেব রাখে?

পুতলি হাতের কুপিটা মাটির উপর উল্‌টে ছুঁড়ে ফেলে, গলার সমস্ত রগগুলি চিরে-চিরে ছিঁড়ে, বুকের পাজরাগুলি চৌচির করে ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। মানুষের অভিধানে সে-চিৎকারের ভাষা নেই। যেমন নেই সমুদ্রের অগাধ বন্যার, যেমন নেই কালবোশেখীর।

অকালে ঘুম ভেঙে সবাই হুড়মুড় করে ছুটে এল ভয় পেয়ে, লাঠিসোটা যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে—হাবুল গণেশ ভজুলাল; ময়লা ছেঁড়া কাপড়টা গায়ের উপর গুছোতে-গুছোতে ও-বস্তি থেকে নির্মলা পর্যন্ত, হাতে একটা কালি-পড়া টিনের লণ্ঠন। ঘুম ভেঙে কেবল এল না কোনো ফাঁকে কৃপণ আকাশের এক বিন্দু রোদ—এক চিলতে।

ঘরের লম্বালম্বি বাঁশটায় একটা নারকেলের দড়ি খাটিয়ে তাতে গলাটা এঁটে বেঁধে দীনবন্ধু ঝুলছে। ওর কোমরের ছেঁড়া পিঁজে-যাওয়া পচা কাপড়ের টুকরোটায় বেড় তো হতই না, ভারও সইত না—তাই বুঝি নারকেলের দড়ি কিনে এনেছে। দড়িটা নতুন।

সবাই ধরাধরি করে নামালাম। নেই।

নির্মলা লণ্ঠনটা ওর মুখের কাছে এনে ধরল। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা বেরিয়ে পড়েছে। যেন লজ্জায় জিভ কাটছে ও।—কাপুরুষতার লজ্জায়, না-খেতে-পাওয়ার লজ্জায়।

মাথার একরাশ জট-পাকানো রুক্ষ চুলের মধ্যে উকুনগুলি পর্যন্ত বেঁচে আছে।—ওরাও বাড়ি বদল করবে এবার। পোড়ো-বাড়ি ছেড়ে ভালো বাড়িতে।

সবার আগে, আগে ছিল জল; বিধাতা একলা বসে-বসে যত কেঁদেছিলেন—সেই কান্নার সমুদ্র। তারপর সেই কান্নার মর্ম ছেনে সুশীতল সান্ত্বনার মতো মাটি জন্মালো—সুকোমল, সহিষ্ণু।

সেই মাটি আজ কঠিন, পাষাণ হয়ে গেছে। ওরা মাটিকে বেঁধেছে। পিটছে, বিঁধছে, চাবকাচ্ছে—নিরহঙ্কার, নিরলঙ্কার, নির্বাক মাটি।

ঝুড়ি করে মাটি বিক্রি হয়। এক ঝুড়ি এক পয়সা। মাটির দরে আরও অনেক কিছু—মনুষ্যত্বও।

ট্র্যাম চলে।

বিধাতার বিদ্যুৎকে ওরা লোহার তার দিয়ে বেঁধেছে—বিনা মেঘের বিদ্যুৎ।

যে-বিদ্যুৎ বিধাতার অকারণ অভিসম্পাতের মতো গরিবের খড়ের ঘরেই পড়ে, যে-বিদ্যুতে সোনাপুকুরের ধারের খেজুর গাছের সারগুলি পুড়ে খাখ হয়ে গিয়েছিল—মহান গয়লা সারা বছর ফ্যা-ফ্যা করেছে।

ট্র্যাম চলে। লোহার লাইনের উপর দিয়ে লোহার চাকা ঘষড়ে-ঘষড়ে—মাটির বুকে এই লোহার ভার। সব লাল লোহু যেন জমে-জমে কালো লোহা হয়ে গেছে।

ডিপো থেকে লাস্ট নাম্বার লিখিয়ে নিয়ে—ছুটো ঘণ্টা দিই। ট্র্যাম চলে। 'টালি' ধরে চেয়ে থাকি। আর ভাবি।

সবাই ওকে খেপাত, বলত—কি সারা দিন-রাত্তির খালি নিজের নাম আওড়াস!

দীনবন্ধু ছাতা-পড়া দাঁতগুলি বার করে বলত—যে বেছে আমার এমন নাম রেখেছে তার খুরে পেন্নাম হই, বাবা। পরের দোরে আর ধন্না দিতে হয় না, নিজেকে নিজেই ডাকি। তোমরাও আমাকে নাম ধরে ডাক, কাজ হবে।

সবাই ওকে ভেংচাত, নাকি স্বরে বলত—দীনবন্ধু রে আমার!—নানান দিক থেকে, নানান রকম স্বরে।

ও তেমনই কোদালের মতো দাঁত মেলে বলত—আমি সাড়া দিই না।

সত্যিই। সাড়া দেয় না সে। হয়তো এই দীনবন্ধুর মতোই দাঁত বার করে হাসে। আর—

দীনবন্ধুর একটি মাত্র ছেলে—সমস্ত জীবনের পুঁজি, মারা পড়ল মোটরের চাকার তলায়।

দীনবন্ধু সারাক্ষণ মরা থেঁতলানো ছেলেটাকে বুকের মধ্যে সাপটে রইল, একটু কাঁদলে না পর্যন্ত। অনেকক্ষণ বাদে খালি বললে—আমার ছেলে সারা দিন খাবারের জন্য রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষে করে ফের আমারই কোলে ফিরে এসেছে। আর ওকে রাস্তায় ভিক্ষে করতে পাঠাব না।

পুতলিকে কাঁদতে দেখে বললে—কাঁদিস কেন? আরে, এ যে দীনবন্ধুরই ছেলে—

ছেলেকে চিতায় শুইয়ে বুড়ো আমাকে বললে—জানিস, আমি সেই মোটরটাকে চিনে রেখেছি। রাস্তায় জল দেবার সময় ঠিক মতো যদি পাই, তো জল ছিটিয়ে বেটাকে নাকাল করে ছাড়ব—

যে গরিব, সে এর চেয়ে আর কি বেশি প্রতিশোধ নেবে? যা বলা উচিত, বলতে পারে না। হয়তো বলা উচিত—আমিও আমার ছেলেরই মতো ঐ মোটরের তলায় বুক পেতে দেব।

তা, প্রতিশোধ তো ও নিলই। পয়সা দিয়ে দড়ি কিনে গলায় বেঁধে।

ঐ পয়সায় যে ওর এক বেলা একমুঠি জুটত, সে-কথাটা ও ভুললে কেমন করে?

পুতলি বললে—তখন কত রাত হবে কে জানে? আমার দরজাটার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ও, আব বিড়বিড় করে কি বকছিল!

—কি বকছিল?

—কি আবার? নিজের নামটাই বোধ হয়।

ভজুলাল বললে—আমি ওকে ডাকনু পর্যন্ত। ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন রে দীনা? ও খালি বললে—কত রাতেই তো ঘুমোই—

নির্মলা বললে—মাঝ রাতে আমার কপাটে টোকা পড়তেই ধড়মড় করে উঠনু। বললাম—কে? খিলখিল করে হেসে ও বললে—আমি দীনবন্ধু রে, তোর ঘরে শুতে দিবি?—দূর-দূর ঝাড়ু মার মুখে! এক হপ্তার ওপর একটা আধলার মুখ দেখিনি—ছোঃ! টোকা পেয়ে সমস্ত গা এমন করে উঠেছিল ভাই—

ট্র্যাম চলে, লোহার লাইন দুটো চাকার তলায় পিষে-পিষে—

টিকিটের জন্য হাত পাতলাম।

বন্ধু অবাক হয়ে খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—চিনতে দেরি হচ্ছে। পরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—আরে কাঞ্চন যে! তুমি? এখানে?

—এই, ঘুরতে-ঘুরতে—

—এত ভালো পাশ করে এম-এ পড়তে গেলে না? শেষে এই? এ কি?

বললাম—চাকরি জোটে কই ?

—না, তোমার আবার চাকরি জুটত না এ ছাড়া ? তুমি পড়তে যাও। আমাদের না হয়—হাতটা ধরে ফেলে বললে—কি হে, লাগবে নাকি টিকিট ?

—এই লাইনটা ভারি কড়াকড়ি ভাই। কয়েক স্টপ পরেই ইনস্পেক্টর উঠবে—

ও বুক-পকেটের উপর হাতটা চেপে ধরে বললে—উঠুকই না ইনস্পেক্টর, তখন কেনা যাবে। বুঝলে না, তুমি হলে বন্ধু, সাতটা পয়সা বেঁচে যায় ভাই।

কিন্তু ইনস্পেক্টর উঠলই।

ওর সমস্ত মুখ সহসা যেন ভয় পেয়ে কালিয়ে এল।—সাতটা পয়সার জন্যেই।

তাড়াতাড়ি একটা টিকিট কেটে ওর হাতে দিলাম। ও বললে—পুরোনো টিকিট বুঝি ? আমি নম্বরটা আঙুল দিয়ে চেপে রেখেই দেখাব—

বললাম—কোনো দরকার নেই।

নিজের জামার পকেট থেকে সাতটা পয়সা চামড়ার ব্যাগটার মধ্যে রাখলাম।

নেমে যাবার মুখে ও বললে—আপিস যাবার সময় এমনি তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ভালোই হবে, ভাই। পুরনো টিকিট দিয়েই এমনি করে পার করে দিও। সাতটা করে পয়সা বাঁচবে—সে কি যে-সে কথা ? আসবার সময় তো সেই মাঠ চষেই আসব। তবু সাতটা পয়সা—ইপিকাক থারটি—এক ড্রাম পাঁচ পয়সায়। ছেলেটার জন্য ওষুধ কেনা যাবে। বুঝলে না ভাই—ত্রিশ টাকার কেরানী—

মনে-মনে বলি—তবে ট্র্যাম কণ্ডাক্টারই রইলাম—তোমার সাতটা করে পয়সা বাঁচুক !

একটি মেয়ে উঠল—এমন পাতলা, হাত দিয়ে আলগোছে একটু টেনে তুললে হয় !

ভাবলাম, মেয়েটি কুৎসিত হোক।

কুঁজো হয়ে মুখ গুঁজে বই পড়তে লেগেছে, কোলের উপর এক গাদা বই। বইয়ের ফাঁক থেকে পয়সা বার করে হাতের মধ্যে রেখে দিয়েছে। অল্পতোলা ঘোমটার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ অন্ধকারের মতো কালো চুলের আভাস পাচ্ছি।

দীনবন্ধুর কথা মনে পড়ে। দুই হাতের উপর জটওলা উকুনের ঢিপি মাথাটা মেলে রেখে চিত হয়ে শুয়ে থাকত চুপ করে। নিশ্বাস নিচ্ছে—এই যেন ওর পরম সুখ!

মুখ না তুলেই পয়সাগুলি হাতের উপর ফেলে দিল। পয়সাগুলি ভেজা—ঘামে। ফের জামার পকেট থেকে সাতটা পয়সা চামড়ার ব্যাগে রাখলাম। এ কটা থাক।

আশ্চর্য!

ভজুলালকে পুলিশে ধরেছে।

পুতলি বললে—গলায় দড়ি জুটল না রে তোর? আর কিছু না, আস্তাবলে ঢুকে শেষকালে ঘোড়ার গাড়ির চাকার রবার চুরি করলি?

ভজুলাল বললে—আমি কি দীনবন্ধুর মতো বোকা যে, গলায় দড়ি দিতে যাব?

মাজায় একটা দড়ি বাঁধা—পুলিশের হাতে। কিন্তু মুখে লজ্জার কালিমা নেই—এতটুকুও নয়। বরং চোখ দুটো যেন খুশিতে ফুলে উঠেছে।

পুলিশকে বললাম—মিছিমিছি কেন হাঙ্গামা করছ বাপু? কত চাও?

ভজুলাল বাধা দিয়ে বললে—তুই খেপেছিস কণ্ডাক্টার? নিক ও ধরে। বেশ মাগনা খেতে পাওয়া যাবে জেলে!

—কেন, এখানেও তো খাওয়া যেত গতর খাটিয়ে। এত বড় দেহটা—দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলাম।

ও বললে—ঘুণ ধরেছে দেহে। দেখলি তো দীনবন্ধুকে।

—ছাড়া পেলে ফের কি করবি?

পোকা-কাটা দাঁত বার করে বললে—তখন দেখা যাবে। তখন হয়তো ধরা পড়ব না।

সত্যিই তো—ছট্টুলালের কি দোষ? ও বললে—আমি সেই কখন থেকেই ঘণ্টি দিচ্ছি—

দোষ ছাগলটারই—ঘুমোবার আর জায়গা পায়নি! একেবারে লোহার লাইনে মাথা রেখে! পাঁঠা তো নয়, বাদশাজাদা।

ট্র্যামটা দাঁড়িয়ে পড়ল। অকারণেই। এ তো দীনবন্ধুর ছেলেও নয়।

একটি বাবু বললে—চালাও না। বেলা হয়ে যাবে আপিসের।

আরেকজন বললে—ভারি তো—

বইর পাঁজা নিয়ে মেয়েটি নেমে গেছে। হয়তো ওরও কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছিল।

না-ও হতে পারে। হয়তো এই করুণ দৃশ্য ও ওর ঐ দুটি করুণ চোখ মেলে দেখতে পারে না। ওর চোখের জল বুঝি টলটল করে উঠেছে। তাই।

ঝুপঝুপিয়ে এক দমক বৃষ্টি হয়ে গেল। যেন যেতে-যেতে পথের মাঝে মেঘ তার ব্যথার ঘড়াটা উপুড় উজাড় করে ঢেলে দিলে।

কলাপাতা করে রাঁধা-মাছ হাতে নিয়ে পুতলি এসে বললে—মাছ-পাতুরি করনু তোর জন্যে। কিরে, রাঁধিসনি আজ ?

বললাম—গায়ে কাপড় টেনে দে পুতলি, জ্বর হবে।

—নে, কি খাবি আজ ?

—উপোস করব।

—কেন ?

এ-কথার কি উত্তর দেওয়া যায় ? বলা যেতে পারে—খিদে নেই, পেটটা ভার। দাদাবাবু কেন উপোস করেছিল ?

গায়ে চারখানার চাদরটা জড়িয়ে নিলাম।

পুতলি বললে—কোথা চললি ? খেয়ে যা।

ঘাসের উপর কে যেন বসে-বসে কেঁদে গেছে; ভেজা। আমাদের ন্যাড়া বেলগাছটা বাউলের মতো ওর কাহিল কাতর ডালগুলি উঁচিয়ে রয়েছে। যেন গান গাইছে—তাইরে নাইরে নাইরে না।

তাই। নাই, নাই—সে নাই।

মনে হয়, আকাশ তার ললাটে নীলের স্বচ্ছ স্বল্প একটুখানি অবগুণ্ঠন তুলে ধরে কত রহস্যময়! গৈরিক বৈরাগী পৃথিবী শ্যামলিমার স্নেহাঞ্চলখানি দেহের উপর গুটিয়ে টেনে কত মহিমাপূর্ণ! জ্যোতির অবগুণ্ঠন টেনে রাত্রির নক্ষত্র আর মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড কত দূর, ধরা-ছোঁয়ার কত বাইরে, কি অনির্বচনীয়!

জমিদার-বাড়ির আলিশান গম্বুজটার কিনারে শুক্ল প্রতিপদের তন্বী পাণ্ডু ইন্দুলেখার অবগুণ্ঠনের তলায় কি সুদূর ইশারা!

—প্যাটরা খুলছিস যে? পুতলি বললে।

—বাজারে যাব।

—এই রাতে! কেন রে?

আকাশে একটি তারার মণিকা ফুটে উঠেছে। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুঁড়তে ভালো লাগে—রাস্তারও একটা সুগোপন রহস্য আছে যেন। ও-ও কথা কয় না, বুক পেতে পড়ে চেয়ে থাকে।

উৎসুক কণ্ঠে পুতলি বললে—বগলের তলায় কী এই পুঁটলিটা, কি আনলি?

—তোরই জন্য।

পুতলি তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে মোড়কটা। দেখে একেবারে অবাক, স্তম্ভিত হয়ে গেছে! শেমিজ শাড়ি জ্যাকেট—পুতলি বিস্ময়ে চক্ষু ডাগর করে চেয়ে বললে—আমার?

—হ্যাঁ, তোর। পর এগুলো।

—কেন দিলি ভাই এ-সব?

যদি বলি: এগুলো তোর নতুন জন্মদিনের উপহার—ও তার অর্থ বুঝবে না। বললাম—অমনি। তোর ভালো কাপড় নেই একটাও। গায়ে জামা না থাকলে কখন ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে—

চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু। আবরণের বিচিত্র বর্ণ ওকে অবর্ণনীয় করেছে। বললাম—মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে দে। কপালটা একটুখানি শুধু ছোঁবে।

সত্যাই। অবগুণ্ঠনের নিচে ওর দু'টি কালো চোখ সত্যিই অপার রহস্যে ভরে উঠেছে। ও হাসল—ঐ হাসির স্থূল ব্যাখ্যা যেন কিছু নেই। ঐ দূর তারকার হাসির মানে যা, যেন তাই।

ও বললে—এবার গাবের আঠায় কালো-করা গন্ধ-ওলা জালটা কাঁধে নিয়ে ডোবায় যাই, বাজারে যাই মাছ বেচতে?

বললাম—আজ তো আর বাঁধিনি। কি দিয়ে খাব তোর মাছ-পাতুরি! শুধু-শুধু?

পুতলি খুশি হয়ে বললে—খাবি? কেন, আমার ভাত তোকে বেড়ে দিচ্ছি। আমি না হয় পরে দুটো ফুটিয়ে নেব।

পিতলের থালায় ও পরিপাটি করে ভাত গুছিয়ে জায়গাটা নিকিয়ে আসন পাতলে। ওর হাতে গড়ানো জল ও থালের ধারে নুনের ছোট স্তূপটি পর্যন্ত মিষ্টি লাগছে আজ। বললে—খা। লজ্জা করিসনে, পেট ভরেই খা। দেব আরো এনে মাছ-পাতুরি?

ওর এই সেবা পেয়ে খিদে যেন বেড়ে গেছে। বললাম—দে। কিন্তু তোর জন্য যে আর রইল না।

সবটা আমার পাতে ঢেলে দিয়ে আনন্দে বললে—না থাক। তুই-ই খা। আমিই না হয় উপোস করলাম।

খাওয়া হয়ে গেলে ঘটি করে জল ভরে দিলে আঁচাবার জন্যে। বিছানাটা টান করে পাতলে, বালিশের কোণের ছারপোকাগুলো দু'টি আঙুল দিয়ে ধরে মেঝেয় ফেলে পায়ের আঙুল দিয়ে টিপে-টিপে মারলে।

বলল—শো। ঘুমো। এই জানালাটা বন্ধ করে দি, ঠাণ্ডা লাগবে।

শুলাম। ও ওর ছেঁড়া মশারিটা তুলে এনে আমার বিছানার উপর কোনো রকমে খাটিয়ে দিলে। ছেঁড়া জায়গাটার উপর একটা কাপড় মেলে দিলে। পাখা করে-করে মশা তাড়িয়ে মশারি ফেলে ধারগুলো বিছানার চারপাশে গুঁজে দিলে পর্যন্ত।

আবার বললে—চুপটি করে ঘুমো।

চলে গেল।

একটি কথা কইলাম না। একটি আঙুল ছুঁলাম না। বাইরে রেখে, ওকে কত সামনে মনে হচ্ছে। ওর দেহের একটি বিস্তীর্ণ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে যেন বিদেশিনী বিদেহিনী প্রিয়াকে আবিষ্কার করছি।

মশারিটা তুলে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলুম। পুতলি সেই সব জামা কাপড় সুদ্ধুই পাটির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে আছে—না খেয়েই!

বাইরে এসে পড়েছি, সন্ন্যাসী বেলগাছটার তলায়। একাকিনী তারার মণিকাটি এখনো জ্বলছে, ডোবেনি। খালি বলতে ইচ্ছে করছে ওকে—তুমি দূর বটে, কিন্তু পর নও।

একাকিনী নয়।

পিতলের হাতলটা জোরে চেপে ধরে সমস্ত শরীরটায় একটা ঘূর্ণি দিয়ে চলন্ত ট্র্যামটায় কে উঠল—বাঙালী সাহেব। চোখে প্যাশনে।

মাটির বাতির স্তিমিত শিখার মতো ম্লানাভ কার আর একটি দেহেও সহসা তরঙ্গ জেগে উঠল যেন, হিল্লোল। একটা ঠাসা তুবড়ি যেন ফেটে গেল, বা একটা ডাঁশা ডালিম!

—তুমি অরুণ, আরে! কলম্বো থেকে ডিরেক্ট, না ম্যাড্রাস হয়ে?

মেয়েটি লেলিহান দীপশিখার মতো ওর দেহ দীর্ঘতর করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—তুমি মুক্তা, সারপ্রাইজ! চমৎকার!

আমাকে ঘণ্টা দিতে ইশারা করে। গাড়িটা দাঁড়ায়।

ওরা হাত ধরাধরি করে নেমে যায় তারপর। তক্ষুনি ট্যাক্সি ডেকে লাফিয়ে ওঠে। দেখি। আবার ঘণ্টা দিই—জুটো। ট্র্যাম চলে।

পথিক মেঘ আসে—অভিসারিক। সন্ধ্যাতারাকে শুধু আড়াল করে রাখে না, ডুবিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

অবগুণ্ঠনেরই নিচে।

পুতলি ওর জামার গলাটা দেখিয়ে বললে—ছিঁড়ে যাচ্ছে।

বললাম—ছিঁড়ুক। টেনে-টেনে ছিঁড়ে ফ্যাল। কাপড়টাও। আর কেন?

—আমাকে আর একটা কিনে দিতে হবে কিন্তু, গোলাপী দেখে—

—দোকানীরা সব আমার সুমুন্দি কিনা—

দান যেমন অযাচিত, প্রত্যাখ্যানও। ও খালি বলতে পারল—বোঁচকা বাঁধছিস যে?

—চললাম কাঁধে ফেলে।

—এই রাতে? কোথায়?

—তা কে জানে?

ও আমার হাত ধরে বললে—পাগলামো করিসনে। থাম।

হাত ছাড়িয়ে নিলাম ওকে আঘাত দিয়েই। ফের বললে—কেন যাচ্ছিস?

—ছোঃ! এই ঘিনঘিনে মশারির তলায় কারু ঘুম হয়—এই এঁদো খোলার ঘরে? পিতলের থালায় খেয়ে-খেয়ে আমার পিলে হয়েছে। তারপর ঢেপসি

ঘুটঘুটি কালো একটা মেয়েমানুষ, সারা দিনরাত কানের কাছে ব্যাঙের মতো ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ করছে, জামার জন্যে বায়না, কোনোদিন বা জুতোর জন্যেই হবে —কে আর তিষ্ঠোয় হেতা ?

—কিন্তু চাকরি ?

—তোর ভাতারের জন্যে খালি রেখে যাচ্ছি—দেখা হলে বলিস। নে, ছাড় দরজা।

দরজা ছেড়ে দেয়। পিছন থেকে একবার শুধু বলে—একটা কথা শুনে যা—মাথা খাস, পায়ে পড়ি তোর—

কে কথা শোনে ? বোঁচকাটা পিঠের উপর ভালো করে ফেলি খালি।

পথ চলি।

অন্ধকার যেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে—

মোটর সুরথ সিং-এর। চালাই আমি।

অবগুণ্ঠন শুধু উন্মোচন নয়, ছিন্ন করব, টুকরো-টুকরো করে। মনে এই সাধ জাগে। যেমন দীনবন্ধু অবগুণ্ঠন ছিন্ন করেছিল—

মোটর তো নয়, বাদ্যযন্ত্র একটা। নিজে তো বাজেই, আমাকেও বাজায়। বা, ও যেন ময়দানবের বুড়ো বয়সের ছোট্ট ছেলে—দামাল।

ইচ্ছে করে কোনো দুর্দান্ত বিপক্ষের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এই বাদ্যযন্ত্র চুরমার হয়ে যাক, সঙ্গে-সঙ্গে ওর কাপালিক কালোয়াং-ও। কিন্তু কেউই সামনে আসে না, আমিও এগোই না হয়তো।

খালি পাশ কাটিয়ে চলা—খালি ঔদাসীন্য !

বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বললে—চাকরিটা কেন ছাড়লে ভাই ?

বললাম—আস্তে চলে বলে, থেমে-থেমে।

—কি করবে এখন ?

—রেল ইস্টিশানে গিয়ে বস্তার নিচে পিঠ দেব।

ও ঝাপসা চোখ ছোট করে বললে—ঝগড়া করে ছাড়লে বুঝি ? যেমন আমারটা গেল।

—গেছে ?

ঘাড় কাত করে আস্তে বললে—গেছে। ছেলেটা মরন্ত, তবু ছুটি দেবে না, দু'ঘণ্টাও না—ছেলেটার দাম যেন তিরিশ টাকারও কম।

পরে থেমে ঢোক গিলে বললে—হয়তো তাই। ছেলেটাও গেছে।

শুধু অন্ধকার নয়, দিনের রৌদ্রও কাঁদে, তেমনি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

পরের দিনও দেখা হল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নয়, সঙ্গে মোটর ছিল সেদিন।

—এই করছ বল, তা বেশ।

—চড়বে ?

চড়ল। বললে—এ-চড়ায় আর কি ? শুধু-শুধু—

—তোমার কাজ তো কিছু নেই। মন্দ কি, হাওয়া খেয়ে নাও একটু ! হাওয়াও তো পেট ভরে খেতে পায় না সবাই।

হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসতে যেন ওর সঙ্কোচ হচ্ছে। এক কোণে একটুখানি জায়গা নিয়ে ও বললে—আপিস থাকলে না হয় বলতাম পৌঁছে দিয়ে আসতে। সাতটা পয়সা বাঁচত।

পরে ব্যর্থ পরিহাসের চেষ্টায় ফিকে লজ্জিত হাসি হেসে বললে—ছেলে আবার হবে, কিন্তু চাকরি কবে হবে তা যমও জানে না।

পাটের কারখানায় আগুন লাগে, খোলার বস্তিতে লাগে বসন্ত। সাবাড়, উজাড় হয়ে যায়। ভাঙা থুত্থুড়ো বাড়ি হঠাৎ একদিন বেচারী পথচারীদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পাগলা ঘোড়া গাড়ি উলটিয়ে দেয়। ছাতের উপর গায়ে কেরোসিন লাগিয়ে অবোলা বৌ ছটফট করে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে মরে। রাস্তার উপরে গরু জবাই হয়, আর দেবীর দুয়ারে পাঁঠা ! কসাইয়ের ছুরি চক্‌চক করে।

একটা অনন্ত দীর্ঘশ্বাসের মতো মোটর চলে—একটা অফুরন্ত হাউই।

বেটি আর একটু হলেই মোটরের তলায় পড়ে গিয়েছিল আর কি ; ব্রেক টিপে ধরি। রাস্তা যেন বেটির ফুল-বাগিচা ; হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে রাস্তা পার হচ্ছে ! ধমক দিয়ে উঠলাম। ও তক্ষুনিই অভ্যেস মতো হাত মেলে ভিক্ষা চেয়ে বসল।

খানিকক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থেকে উঁচু মাড়িগুলি খুলে বললে—তুই যে রে—

বললাম—তুই আজকাল ভিক্ষে করছিস নাকি? তোর চোখের পাতায় কিসের ঘা ও? একি, গলায়, হাতে, বুকে—সবখানে? কী এ-সব?

—তাইতেই তো ভিক্ষে করছি। এ-ঘা নিয়ে তো আর রাস্তায় বেরুনো যায় না, আর ঢাকাও যায় না কিছুতে।

—হাসপাতালে যাসনি কেন?

—নিলে না। ভরতি।

—চল দেখি তো আমার সঙ্গে, কেমন নেয় না।—দরজা খুলে দিলাম।

বন্ধুকে বললাম—তবু ওর নাম ছিল নির্মলা!

বন্ধু বললে—এখনো আছে।

ওকে বললে—বোস। আমার পাশেই!

মোটর চলতে থাকে।

বললাম—পুতলি কি করছে রে নির্মলা?

—সেবারে বসন্ত হয়েছিল, বাঁ চোখটা কানা হয়ে গেছে।

—আর? মুখটা পাচিয়ে যায়নি?

—গলি-বদল করবার সময় কাদি ওর ফালতু বেটপকা ছেলেটা ওকে দিয়ে গেছে। সেটা পালছে।

—আর কিছু নয়?

—আর আবার কি? বাজারে তেমনি মাছ বেচে, চালের আড়তে ধান ঝাড়ে।

—ভজুলাল ফিরেছে জেল থেকে?

—হ্যাঁ, সে তো কবে। আবার জেলে গেছে জানিস না বুঝি!

—এবার কী চুরি করেছিল?

নির্মলা তেমনি মাড়ি বার করে বললে—মেয়েমানুষ।

অগোচরে গ্রহে-গ্রহে সঙ্ঘর্ষ লাগে, ধুমকেতু তার পুচ্ছ ছোঁয়ায়! বাসুকি ঠাট্টা করে গা-মোড়া দিলে লজ্জিতা মাটি হয়রান হয়ে ওঠে। শাদা মানুষ আর কালো মানুষ পরস্পরের টুঁটি আঁকড়ে কামড়া-কামড়ি করে, শেষকালে দু'জনের লাল রক্তে-রক্তে কোলাকুলি হয়। রাজা সমস্ত দেশে আগুন লাগিয়ে হাততালি দিয়ে নাচে, মা শহরের গলিতে আঁচলের তলায় নিয়ে মেয়ে ফিরি করে বেড়ায়।

সাহারা হাহাকার করে—মোড়লের সবুজ খেতের উপর দিয়ে গর্জমানা ভৈরবী নদী তার গাত্রবাস উড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল। তারপর—

স্বরথ সিং পাশে বসে বললে—এবার ডিপোয়। তাই যাচ্ছিলাম। কে একটা লোক এসে বললে—হাওড়ায় যেতে হবে। সামনেই সোয়ারি ছ'পা।

—এই কিরায়াটা নিই। শেষ।

আরও দুটো ট্যাক্সি এসে জমেছে। তাতে মালপত্র বিছানা বাক্স। আমারটাতেই ওরা উঠল।

দুয়ারের পাশে পুরনারীরা শঙ্খ বাজাচ্ছে. ওদের কপালে চন্দন লেপে দিচ্ছে, আশীর্বাদ করছে। আঁচলের গেরোটা ভালো করে এঁটে বেঁধে দিচ্ছে। একটি মেয়ে বললে—রাস্তায় খুলে ফেলবে জানি. শুধু কাপড়ের গেরোটা। মনেরটা—

মোটরের চিৎকারে বাকিটা শোনা যায় না। মেয়েটির কণ্ঠস্বর কেন জানি কানে ভারি করুণ লাগে।

মুক্তার কলরব মোটরের আর্তনাদকে লজ্জা দিচ্ছে। মোটরটা থামিয়ে কান পেতে শুনতে ইচ্ছা করে।

মুক্তা খালি বলছে— ছুটি, ছুটি, আকাশে আজ ছুটির ঘণ্টা বাজল।

অরুণ বলছে—পাশে তুমি, পকেটে টাকা। গোঁফটা নেই, থাকলে তা দিতাম।

অরুণ যেন শৌখিন দখিন হাওয়া, আর মুক্তা যেন চাঁপার পেয়ালা।

ইস্টিশানে পৌছে স্বরথ সিংকে বললাম—বোস একটু, এই আসছি, এলাম বলে।—মোটর থেকে লাফিয়ে পড়লাম।

স্বরথ সিং সেদিন মোটরটা নিয়ে একলাই ডিপোয় ফিরেছে। আমার জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল, কে জানে?

ট্রেন চলে।

ভীষণ ভিড়। দরজার ধারে খালি দাঁড়াতে পাই একটু। মুখ বাড়িয়ে চেয়ে থাকি বাইরে—অন্ধকার দেখি। দূরে চাষার ঘরে মাটির বাতি জলে, বাঁশের বনে ঝিঁঝিঁ ডাকে, জোনাকিরা হলদে পলকা পাখা মেলে নেচে-নেচে নিবে যায়।

কোথায় চলেছি জানি না। সারা দিনের রোজগার স্বরথ সিং-এর পাওনা অনেকগুলি টাকা পকেটে আছে। যতদূর নিয়ে যেতে পারে—

একটা ইষ্টিশানে সেই চাকরটার সঙ্গে ভাব করলাম। ওর নাম, সুন্দর। বললাম—কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

—সে অনেক দূরে। পাঞ্জাবে। তুমি কোথায়?

—সেইখানেই।

এবার খোঁজ নিলাম। ওরা যেখানে যাবে ততদূর আমার টাকা টানবে না। তার সাতাশ মাইল এদিকে নেমে হাঁ করে বাতাস খেতে হবে। যাক গে, তাই সই।

নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ালে নখ ভিজে ওঠে না—বাঙলার মাটির মতো সান্ত্বনায় ভেজা, নরম নয়—রুক্ষ, তামাটে। গায়ে সবুজ নয়, গেরুয়া।

সুদূরপ্রসারিত মাঠের মধ্যে একা চুপ করে বসে আছি।

দূরে রেল-ইষ্টিশানের ভাঙাচোরা কোলাহল আকাশের তন্দ্রালুতায় ব্যাঘাত করছে। ওরা আমাকে সাতাশ মাইল পিছনে ফেলে গেল।

পকেটে কানাকড়িও নেই। দাদাবাবু আর চিঠি লেখেনি, বহুদিন। কোথায় ভেসে গেছে—কিছুই জানি না।

দাঁড়াই। তারপর পা ফেলে-ফেলে চলি, রেল-লাইন ধরে, সামনে খাল পড়লে সাঁতরে পার হয়ে যাই।

মুহূর্তের শোভাযাত্রা চলেছে, ঋতুর মিছিল, তৃণের অভিযান, তারার নৃত্য, প্রাণবুদ্‌বুদের স্রোত। আমি চলতে চাই, আমার বুকে অগাধের সাধ জেগেছে—অবাধ। পা যখনই তুমড়ে পড়তে চায়, তখন দৌড়ে চলতে চেষ্টা করি। পরিশ্রান্ত হয়ে যেতে ইচ্ছা করে।

কার সন্ধানে চলেছি। নীল পাখির, নীল ফুলের, নীল আকাশের।

পৌঁছনো গেল। কিন্তু পয়সা নেই। জীবনে সব চেয়ে প্রকাণ্ড 'নেই'। কিম্বা হয়তো সব চেয়ে প্রকাণ্ড 'থাকা,' এই অসীম ক্ষুধা, এই রিক্ত নগ্ন উদার দারিদ্র্য—অসহায় নিদারুণ মৃত্যু!

সত্যিসত্যিই বস্তা বইব। এক বাবুকে বললাম—কেন মিছিমিছি গাড়ি করছেন? মাইল দুয়েকের মধ্যে বাড়ি হয় তো বলুন, কাঁধে করে নিয়ে যাই।

সঙ্গে তো জেনানা নেই—এটুকু হাঁটতে আপনার কষ্ট হওয়া উচিত নয়। ভদ্রলোক মুখের দিকে চেয়ে খুশি হয়ে বললেন—বেশ তো, পারবে বইতে এত সব ?

—বহুৎ খুব। দিন এটা কাঁধের ওপর দিয়ে গলিয়ে। ব্যস। চলুন—

ঘাম মুছে রাস্তায় বেরোতেই সুন্দরের সঙ্গে দেখা।

—বাকি পথটা পাওদলেই এলাম। কিন্তু ভাই, একটাও আধলা নেই। মোট বয়ে মোটে এই দুটো আনি পাওয়া গেল—ঢের। একটা কোথাও কাজ-টাজের সুবিধে হতে পারে, জানো ?

—আরে! আমি যে লোকের খোঁজেই বেরিয়েছি। মাঠ সাফ করতে পারবে—গাছ-গাছাড়ি কেটে ? বাবুরা টেনিস খেলবেন।

—নিশ্চয় পারব। পুকুর কাটতে বল, গাছ ফাড়তে বল—সব।

—লঙ্কা ডিঙোতে ?

—তা-ও।

সন্ধ্যাসন্ধিতে টেনিস-কোর্ট তৈরি হয়ে গেল। অরুণই সব তদারক করলে।

মুক্তার সারা দেহে ফুর্তি যেন আর ধরে না, সাগরের মতো অতল, ডাগর চোখের কোণ বেয়ে উপচে-উপচে পড়ে। নতুন দেশের আবহাওয়ায় ওর গালে এত সকালেই লাল ফুটেছে।

ও যেন একটি গীতিকবিতা, ভাটার টানের ভাটিয়াল সুর। ও যেন মধ্য-দিনের অলস তপ্ত শ্রান্তিকর দু'পহরে ভ্রমরের চপল অস্ফুট গুনগুনানি।

আমি আর সুন্দর দু'দিক থেকে বল কুড়োই।

মুক্তা পারে না, আর হাসে। বলে—তুমি খালি-খালি প্রত্যেকবার জিতবে, এ হবে না। 'নভিস'-এর সঙ্গে খেলে আমিও জিততে পারি।

অরুণ ইচ্ছে করে এদিকে-ওদিকে ভুল করে মারে, তারপর।

একটা বল আচমকা এসে মুক্তার কপালের উপর লাগল। মুক্তা কপালে হাত চেপে উহু করে, আর খিল-খিল করে হাসে—লুটিয়ে-লুটিয়ে। তারপর হাঁপায়।

খেলা সাঙ্গ হয়। সুন্দর পর্দা আর নেট গুছোয়। ওরা পাশাপাশি র‍্যাকেট দুলিয়ে-দুলিয়ে বেড়ায় মাঠে-মাঠে। আমি ফিরে যাই, ইষ্টিশানের কাছে কুলির বস্তিতে।

মুহূর্তের ঠেলায় কতদূরে এসে ঠেকেছি। ইচ্ছে হল, ফিরে যাব। নীল আকাশ খালি পঞ্চনদীর তীরেই নয়, যেখানে দাঁড়াই, সেখানেই, মাথার উপর। আঠা দিয়ে অসীমের অবগুণ্ঠন চারদিক থেকে আটকানো। তাকে তোলা যায় না, খোলা যায় না, ভোলাও যায় না যে—

এ কার বেগার খাটছি? ঘাড়ে ব্যথা ধরেছে। চাইছি আহ্লাদির সেই বালিশটা, কোনো মা'র সুকোমল একখানি কোল।

ভোঁতা ভুটিয়া কুলি-মেয়েটা বে-আক্কেল, ওর মধ্যে একটুও ভান নেই। তাই ভালো লাগে না।

সুন্দরের সঙ্গে দেখা করে যাব। ওর টালির ঘরে বসে তামাক টানছে।

—কি হে, টেনিস-কোর্টে যে আবার চোরকাঁটা গজিয়েছে। দেব নাকি সাফ করে?

—দরকার নেই। বাবুরা খেলে না আর।

—কেন?

—বাবু আজ দিন দশেক হল দিল্লি যাবার নাম করে যে বেরিয়েছেন, আর পাত্তা নেই। গিন্নীমা যে একলাটি আছেন, সেদিকে হুঁসই নেই যেন। খালি একটা খোট্টা-ঝি।

আমার হাতে হুঁকোটা চালান করে গলার স্বর নামিয়ে বললে তারপর—এমন পরীর মতো বৌ ছেড়ে ফুরফুরির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে কিনা—

—বাবু কি করে রে?

—কোথায় নাকি খনি পেয়েছে আভের, তাইতেই দেদার পয়সা। বেবাক ঢালল বলে—

—যা-তা কি বলছিস, সুন্দর? যাক, আমি কালই চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

—কেন? কোথায়?

হেসে বলি—দিল্লিতেই।

ও মুখ ভার করে বলে—আমারও টিকছে না মন। বিষম দায়।

—যাই, গিন্নীমা'র পায়ের ধুলো নিয়ে আসি।

সুন্দর অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকায়। কিছু বলবার আগেই পা ফেলি ঘরের দিকে—

দূর থেকে মুক্তাকে দেখা যাচ্ছে, হেমন্তের ধূসর উদাস সন্ধ্যার মতো। জানলার কাছে বসে ফ্যাকাশে আলোয় বই পড়ছে। তাই ওকে বেশি নিঃসঙ্গ, বেশি বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। আর কিছু নয়, দূরে একটা চেয়ারে বসব শুধু, তারপর সাহিত্য, দেশ, ধর্ম, রাজনীতি—এই নিয়ে তর্ক আর আলোচনা। ভিক্টর হিউগো, বায়রন, ডষ্টয়ভস্কি থেকে যতদূর খুশি—এ-ই ইয়েটস পর্যন্ত। প্রতিভার দীপ্তিতে দু'জনের চক্ষু উজ্জ্বল, নতুন-নতুন অসাধারণ তথ্য আবিষ্কারে দু'জনের বুক উৎফুল্ল। মন কি রকম জোয়ান হয়ে ওঠে! বিজ্ঞানের বিদ্রোহ, সঙ্গীতের স্বর—যা ওর ভালো লাগে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। পায়ের শব্দ শুনে সচকিতে সতর্ক প্রশ্ন এল—কে?

—আমি।

যেন কত পরমাত্মীয়! শুধু ঐটুকুতেই সবটুকু পরিচয়।

—কে তুমি? কি চাও এখানে?

—সুন্দরকে খুঁজতে এসেছিলাম।

—তার মানে? সুন্দর কি দোতলায়—এই বাড়িতে থাকে নাকি? কে তুমি? যাও বেরিয়ে! এই সুন্দর!

চলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কি ভেবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে পিছু থেকে ডাকলে—শোনো। তুমি—আপনি—আপনি কি অসিতার দাদা? যে আমাদের সঙ্গে পড়ত?—কেমন চেনা-চেনা লাগছে। না, না, তুমি আমার সেই ছেলেবেলাকার মণ্টুদা, নয় কি? হ্যাঁ, তুমি এখানে কি করে এলে, কবে? বোস—তোমার কথা—

বাধা দিয়ে বলি—না, আমি কেউ নই।

মুক্তার ভুল ভাঙে। চেঁচিয়ে বলে—কে তবে তুমি?

—আমি পিয়াদা, মুসাফির। বাঙালীই বটে। ভাগ্যের সঙ্গে কুস্তি করতে-করতে এখানে এসে ঠিকরে পড়েছি।

বইটা মুড়ে রেখে বলে—সুন্দরের কাছে কেন এসেছিলে?

—যদি একটা কাজ-টাজ যোগাড় করে দিতে পারে। বিরানা মানুষ।

—এতদিন কি করতে?

—পিঠ পেতে বস্তা বইতাম, না পেলে টহল করি, আর কি। নিজে তো

উপোসীই, পকেট দুটোও হাঁ করে আছে। পয়সা না পাই তো হেঁটেই পাড়ি দেব বাঙলাদেশ।—সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকটা ফুলিয়ে কথা কই।

মুক্তা ওর মোহে-মাখা দু'টি চোখ কমনীয় করে বলে—সত্যি যদি মণ্টুদা হও তো বল। তোমাকে যে আমার ভারি চেনা লাগছে। ঘুড়ি ওড়াতে ছাত থেকে পড়ে গেছলে তুমি, সেই রাতটা কত কেঁদেছিলাম! এতদিন হয়ে গেল, তবু—

—না, না, কেউ নই আমি। আমি ইষ্টিশানের কুলি একটা।

নেমে যাই সিঁড়ি বেয়ে। ও জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে—আমাদের শিগগিরই একটা শাম্পানি আসবে, আর দুটো গরু। তুমি হাঁকাতে পারবে?

—হ্যাঁ।

—খানায় ফেলে দেবে না?

—না।

—তবে থেকে যাও। পায়ে হেঁটে বাঙলাদেশে গিয়ে কাজ নেই।

আচ্ছা, নমস্কার।—হাত জোড় করে কপালে ঠেকালাম।

ও ওর তর্জনীটি হেলিয়ে বললে হেসে—তুমি মণ্টুদাই। নিশ্চয়।

শাম্পানি এল, দুটো বয়েলও এল, আমিই লাগাম লাগালাম।

ল্যাজ তুলে জাঁদরেল গরু দুটো বেতোয়াক্কা হয়ে ছোটে। মুক্তা আবার ওদের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছে, দেহাতি বালির রাস্তা ধুলোয়-ধুলোয় ধু-ধু করে।

কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটে, কুয়ো থেকে গেঁয়ো মেয়েরা ঘড়ায় করে জল তুলে কাঁকালে করে বয়।

মুক্তা সেই অকারণ ভুলের ভেলা ফেলে দিয়েছে। আমাকে বইলম্যান বলেই চিনেছে, এর বেশি কিছু নয়।

ভোরবেলা শিশির না শুকোতেই গাড়ি জুততে বলে, ওর নিজের চোখের পাতায় তখনো ঘুমের শিশির ঢোলে, হয়তো বা অনিদ্রার কুয়াশা।

আকাশে ফিনফিনে পাতলা মেঘ পায়চারি করে বেড়ায়।

কোনো কথা কয় না। খালি গরুর গলায় ঘণ্টা বাজে—ভোরের উদাস, বিভোর ভৈরবীর মতো। আমার মাঝে কি যেন আবিষ্কার করবার আশায়

মাঝে-মাঝে অতল অপলক চোখে খানিক তাকায়। ঘনশ্যাম নিবিড় বনানীর চাহনি।

এক-একদিন বলে—তোমার দেশের গল্প বল, পদ্মার।

গল্পটা জোড়াতালি দিয়ে শেষ করি। সে কি বিপুল বন্যা, কি উত্তাল ফেনিল জলস্রোত, ভালোবাসার মতো। খেত-খামার, গোলা-আড়ত সব ভেসে গেল; চোখ মুখ বুক—জীবন মরণ ইহকাল পরকাল।

ওর চোখ দুটি একটু কাঁপে।

বলে—কেন দেশ ছাড়লে? কোন দুঃখে?

—আকাশকে আড়াল করবার জন্য যে-দুঃখে মানুষ ঘর বাঁধে, সেই সমান দুঃখেই পথ নিয়েছি!

গাড়িটা ফেরে। চঞ্চল পাখির অস্ফুট কূজনের সঙ্গে তাল রেখে মৃদু-মৃদু ঘণ্টা বাজে।

মুক্তা আবার প্রশ্ন করে—কে তোমার আছে?

—দুটো পা, আর পথ, পৃথিবী। আর হাত ধরে-ধরে চলেছে আমার সহোদর ভাই—মৃত্যু।

আবার ভুল করে। কাঁপা, কুণ্ঠিত গলায় বলে—তুমি কে?

মনে-মনে বলি, হয়তো তোমার ছেলেবেলার মণ্টুদাই। আমি নিজেকেই হয়তো ভুলে গেছি, চিনতে পারছি না।

সন্ধ্যাবেলায় অরুণ হাঁকে—গাড়ি হাঁকাও জলদি। পৌনে-আটটার মধ্যে পৌঁছে দিতে পারলে বকশিশ একটাকা।—বলে একটাকা ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে বার করে ছুঁড়ে দিলে আমার দিকে। টাকাটা গড়িয়ে পড়ে গেল পথে। কুড়িয়ে নিতে কেয়ার করি না। যেন একটা মুসাফির ভিক্ষুক ঐ টাকাটা পায়—গরুর গলায় ঘণ্টা যেন এই কথাই বলতে-বলতে চলে।

সাহেবি ক্লাবের সমুখে গাড়ি দাঁড়ায়! অরুণ নেমে বলে—বারোটার সময় নিয়ে এস গাড়ি।

বারোটার সময় গাড়ি নিয়ে যাই। কোনো-কোনো দিন ভোরবেলাতেই বাবুর বারোটা বাজে।

সুন্দরকে বললাম—আজ তোমার পালা, ভাই।

সুন্দর গাড়ির মধ্যে বিছানা পেতে পা ছড়িয়ে বসে গরুর ল্যাজ মলে দেয়। রুনুঠুনু ঘণ্টা বাজিয়ে টিমিয়ে-টিমিয়ে গাড়ি চলে ঘুম পাড়িয়ে-পাড়িয়ে!

কখন মুক্তার ঘরের আলো নিভে গেল, টের পাই। নিশুতি রাতের স্তিমিত অন্ধকারে খালি একটি মুখ মনে পড়ে—তার একটা চোখ কানা, ঐ ক্ষীণ পাংশু চাঁদের টুকরোটার মতো! তার মুখে সংখ্যাতীত বসন্তের দাগ—যেন নক্ষত্রখচিত কুৎসিত ঐ আকাশটা!

সুন্দরের কাঁধ জড়িয়ে টলতে-টলতে অরুণ এল—রাত আঁধিয়ারা। সুন্দর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল যা হোক।

এসে বললে—ভীষণ গিলেছে আজ। নাও, বিছানাটা পাত শিগগির। বাবা—বলেই চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা চিৎকারের চাকু অন্ধকারকে যেন চিরে গেল। এগোলাম। দরজাটা দু'ফাঁক। দুরন্ত দস্যুর মতো দখিন হাওয়া ঘরের মধ্যে লুটের লাট্টু ঘুরিয়ে দিয়েছে। ল্যাম্পটা চৌচির হয়ে মেঝের উপর ফাটা, কাদাটে চাঁদের আলোয় চিকমিক করছে।

আবার প্রশ্ন এল—কে?

দেশলাই জ্বালালাম। খাটের উপর অরুণ শোয়া—গোঙাচ্ছে। আমাকে দেখে মুক্তা সোফা থেকে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বললে—কি চাও?

বললাম—আপনার ভুরুর ওপর থেকে কেটে গিয়ে রক্ত গলছে, জায়গাটা বেঁধে ফেলুন।

ও একটা পাখা নিয়ে অরুণকে হাওয়া করতে-করতে বললে—তোমার তাতে কি?

—পাখা পরে করলেও চলবে, কিন্তু কোথায় আইডিন আছে বলুন, বেঁধে দিই।

ও পাখাটা দিয়ে দরজা দেখিয়ে বললে—কে তোমাকে মাথা ঘামাতে বলেছে? যাও এখান থেকে—বলে ফের পাখা চালাতে লাগল। অরুণের চুলে আঙুলও বুলোতে লাগল খানিক।

মদ খেলে দাদাবাবুকে দেখাত গরিব, দুঃখী—যেন বুকের ভিতরটা ফাঁকা, খাঁ-খাঁ করছে। আর একে দেখাচ্ছে—বীভৎস, বিকট। কিন্তু, কে জানে?

হয়তো ওরও মনের মরুতে মেঘের মমতা মাখা নেই, হয়তো ও-ও একলা, পিয়াসী!

বললাম—তাই যদি হয়, তবে শুধু ঐ টুকুন পাখা-চালানোয় কি হবে? যে মদ খায়, তাকে আরো ভালোবাসুন, ভাসিয়ে নিয়ে যান। সব চেয়ে ভালো-বাসার দরকার তারই যার কান্না শুকিয়ে গেছে—

ও পাখাটা আস্তে-আস্তে পাশে রেখে সোফাটার উপর বসে পড়ল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে—যেন বিষাদে ভরা, গোধূলিতে মন্থরচারী গরুর গলার ঘণ্টার মতো উদাস। যেন বলছে—ফুরিয়ে গেছে, মণ্টুদা। ওর ঘা-টা আস্তে-আস্তে বেঁধে দিলাম।

বললাম—ওখানে মেঝের ওপর বিছানা পেতে দিই। এবার ঘুমোন।

ও শুধু বললে—দাও। পুবের জানলার ধারে, নিচেরটাও খুলে দিয়ো।

বিছানা পেতে দিলাম।

বললে—ঐ লাল-বইটা বালিশের তলায় রাখ, আর এই নীলটা পাশে। আর বাকিগুলো চারপাশে ছড়িয়ে দাও—এলোমেলো করে। তুমি—

দরজাটা ভেজিয়ে বেরিয়ে যাই। মাঠের মধ্যে গিয়ে দূর থেকে ম্লান জ্যোৎস্নায় দেখি, বিছানা শূন্য—এখনো শুতে আসেনি। কি করছে মুক্তা? হয়তো অরুণের পাশে বসে পাখাই চালাচ্ছে সারারাত।

অরুণ পেণ্টালুনের পকেট হাতড়ে একটা চাবি বার করে মুক্তাকে বললে—ক্যাশবাক্সের চাবিটা রাখ। ওর মধ্যে প্রায় সাড়ে-তিনশো টাকা রইল তোমার এ-কদিনের খরচের জন্য। এবার অনেকগুলি রুপোর চাকতি হাতড়ানো গেছে। এবার অন্তত একটা খোকা-মোটরকার কিনতেই হবে।

মুক্তা শুধু বললে—এবার কি ফিরে আসতে খুব দেরি হবে?

—হয়তো হবে একটু। দরকার হলেই আমাকে তার করবে, আমি যেখানেই যাই তোমাকে জানাব। তুমি কলকাতায় বিজনকেও লিখতে পার, সে না-হয় ক্লাইভ স্ট্রিটে চাকরির জন্য কপাল কুটে-কুটে হয়রান না হয়ে এখানে দিন কতক বসে-বসে গিলে চেহারার ভোল ফিরিয়ে নিক। যদি ইচ্ছে হয়, ওর সঙ্গে কলকাতায় ফিরেও যেতে পার।—যা তোমার খুশি।

বলে ছুটে নেমে গাড়িটায় এসে বসল। গরু দুটোর ল্যাজ মলে দিলাম।

মুক্তা নীল-বইটা হাতে নিয়ে একান্ত মনোযোগে পড়ছে। একবার তাকিয়েও দেখলে না। ও যেন একটা ফুরোনো ফোয়ারা—উজাড়-করা উদ্‌লা একটা ঘট।

যেতে-যেতে প্রশ্ন করলাম—কোথায় যাচ্ছেন ?

—দিল্লি।

—উদ্দেশ্য ?

—ব্যবসা। সেখান থেকে আগ্রায় যাব, তাজ দেখতে। এবার দেখব অমাবস্যায়—

গরুর গলার করুণ ঘণ্টার কাতর কাকুতি শুনে আপন মনেই বলে—অন্ধকারে পাষাণের পুঞ্জিত দীর্ঘশ্বাস শুনব। তারপর রাজপুতানার ওপর দিয়ে ছুটে যাব—লু-র মতো—

—কবে ফিরবেন ?

—ফিরব ? ড্যাম্‌। হ্যাঁ, ফিরতে হবে বৈকি। যখন ডানা বুজে আসবে, ঘুম পাবে যখন।

মরা, নিশুতি রাত, ঘুমন্ত মনের সঙ্গে আকাশের তারা কানে-কানে কথা কয়, স্বপ্নের স্বরে। যেন কি অকূল চেনাচিনি, চোখের জলের সঙ্গে চাঁদের, ভালোবাসার সঙ্গে অন্ধকারের !

কথা কইতে না-পারার সঙ্গে এই ব্যর্থ বিস্তীর্ণ বিদীর্ণ শূন্যতার।

পা টিপে-টিপে শিয়রের কাছের চেয়ারটায় বসলাম।

আবার সেই সুগভীর অতল জিজ্ঞাসা—কে তুমি ?

—আমি।

মুক্তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। থেমে বললে—তুমি পুরুষ ?

চেয়ারের হাতলটা মুঠির মধ্যে সজোরে চেপে ধরে বললাম—হ্যাঁ।

—ও !—একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—কুৎসিত, বিচ্ছিরি, ভেজাল। আর আমি কে, জানো ?

—তুমি মুক্তা। তাই তো তোমাকে জানি না !

—আচ্ছা, তোমার সঙ্গে মণ্টুদার কোনোদিন দেখা হবে ? তুমি তো পায়ে-পায়েই নাকি পাড়ি দেবে এ-পৃথিবী। যদি দেখা হয়—আমার কিছু ভালো

করে মনেও নেই। তেরো বছরের আগেকার একটি দশ বছরের দুষ্টু ছেলে, তার জামার ওপর খুদে কাপড়টি বাঁধা, তার লাল পাড়টা আমার কপালের সিঁদুরের মতোই ডগডগে—এখনো মনে পড়ে। আর মনে পড়ে সেই আমের শাখায় দোলনা, দোলায়-দোলায় বউল ঝরে পড়ত। তাকে তো ভুলেই ছিলাম, তার ভালো নামও মনে নেই। হঠাৎ—

—যেদিন তোমার ঘোমটা খুলে গেল, সেদিন। যেদিন আকাশের তারা মাটির বাতি হয়ে বাদলা-পোকার পাখা পোড়াতে লাগল! দেখা হলে কি বলব তাকে?

—কিই বা বলবে? বলো—

—তার চেয়ে কলকাতার বিজনকে তার করি। সে আসুক, তোমাকে নিয়ে যাক। তোমার স্বামী এখন কোথায়, জানো?

—নাইনিতাল।

—তাঁকেই তার করি।

—দরকার নেই। একা মরতে আমার কষ্ট হবে না। মরণও ভারি একা—

অরুণ একদিন একেবারে হুড়মুড় করে এসে পড়ল—রাজ্যসুদ্ধ যত ডাক্তার কবরেজ হাতুড়ে ওঝা নিয়ে—এক এলাহি ব্যাপার। এক রাতেই ওর যত বাক্স ছিল, সব হাঁ হয়ে গেল।

মুক্তা নিশ্বাস ফেলে বললে—মুক্তি!

সেই থেকেই মুক্তার মেয়ের নাম—মুক্তি।

অরুণের সেদিনকার উন্মত্ততা বিধাতার জানা আছে—যেদিন এ-কন্যা পৃথিবী জন্ম নিয়েছিল!

দুদিন বাদেই আবার তল্পিতল্পা বাঁধলে। আবার অনেকগুলি টাকা জিম্মা রাখলে, চাবি দিলে, আরো একটা ঝি বাহাল করলে, একটা নার্সও। খুব সাবধানে থাকতে বললে, বললে—এবার ইচ্ছা হলে বিজনকে চিঠি লিখো, তোমাকে যেন নিয়ে যায়।

বললাম—কোথায় যাচ্ছেন এবার?

—দক্ষিণে। এরপর জলের ওপর পাল তুলে দেব ভাবছি—লোনা জলের।

সেদিন মুক্তা আমাকে বলছিল—ওর নাম মুক্তি। ও আমাদের মুক্তি দিলে—ভালোবাসার ভার থেকে।

নার্সই মেয়েটাকে নাড়ে-চাড়ে, নাওয়ায়-খাওয়ায়, ঝাড়ে-পোঁছে। ও শুধু সেই নীল-বইটা কোলের উপর চেপে চুপ করে চেয়ে থাকে। আর, কথার অতীত স্বর শোনে। মেয়েটাকে ছুঁতেও যেন ওর ঘেন্না হয়—এমনি।

ভালোবাসার মতো রাত নেমে এসেছে—ভালোবাসার মতোই বৃষ্টি।

হাওয়ায় যেন কে শুধোল—তুমি জেগে আছ?

—হ্যাঁ, আছি বৈকি।

অবাক হয়ে তাকালাম—সামনে মুক্তা। বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজছে—চোখের পাতায়, ঠোঁটে, ললাটে বৃষ্টিবিন্দু, গলার স্বরও যেন বৃষ্টিতে ভেজা।

বললে—গাড়িটা ঠিক করো।

—কোথায় যাবে? এত রাতে, বৃষ্টিতে?

—যেখানে তোমার খুশি, নিয়ে চল।

ওকে ভারি একা, শীর্ণ, পাণ্ডুর দেখাচ্ছে।

বললাম—খুকি?

—ও তো মুক্তি!

গাড়িটায় চাপল।

বললাম—তোমার গায়ে যে জড়াবার একটা চাদরও নেই।

—কোনো দরকার নেই। তুমি যে বাইরে বসে-বসে খালি ভিজবে।

—তাতে কি? চারদিকের ঝাঁপগুলো বন্ধ করে দিই?

দিলাম।

সমানতালে বৃষ্টি চলেছে, তার সঙ্গে গরুর গলার ঘণ্টা—করুণ কান্নায় ভরা।

চরাচরব্যাপী অন্ধকার—এও ভালোবাসারই মতো!

সামনে একটা নিচু মাঠ, জলে থৈথৈ করছে।

বললাম—সামনে যে জল!

ভারি গলায় বললে—জলের ওপর দিয়েই চল।

বৃষ্টিতে স্নান করছি—ভালোবাসায়ই। জলের নূপুর বেজে চলেছে—

ও বললে—গাড়িটা থামল যে?

—গরু চলতে চাইছে না। আর কতদূর যাবে? এবার ফের।

—ফিরতে হলে তুমি ফের। লাগামটা আমার হাতে দাও!

নিজের গায়ের কম্বলটা চিপে কাজলার উপর চাপিয়ে দিলাম, খানিক বাদে আবার শ্যামলার উপর চাপাই।

অবোলা গরু দুটো নিজের গলার ঘণ্টা শুনতে-শুনতে চলে, জিরিয়ে-জিরিয়ে।

মাঠ পেরিয়ে আবার পথ পেয়েছি। কিন্তু অচেনা! কোথায় চলেছি, কেউ জানি না।

আবার বলি—হয়তো খুকি জেগে উঠে তোমার জন্যে কাঁদছে। এবার গাড়িটা ফেরাই।

ও কিছু বলে না। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

বৃষ্টির বিরাম নেই—একটু ধরে আবার দমকে-দমকে আসে—সমস্ত আকাশ যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

গাড়িও চলে—এবড়ো পথ, থেমে-থেমে, ঘুমিয়ে। ঘন অন্ধকার, মাঠ বাট সব মুছে গেছে—

বলি—আর আমাকে কতদূর নিয়ে যাবে?

কোনো জবাব নেই—চারদিকের ঝাঁপ বন্ধ। খুলতে হাত ওঠে না। লাগামটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটুর উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকি—বৃষ্টির ঝাপটায় সমস্ত শরীর ক্লান্ত, অবশ হয়ে এসেছে।

হঠাৎ একটা উঁচু পাথরের ঢিবির সঙ্গে গাড়ির চাকার ধাক্কা লেগে গাড়িটা কাত হয়ে পড়ল।

চমকে লাফিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—মুক্তা!

ঝাঁপ খুলে দিলাম—মুক্তা গাড়ির মধ্যে নেই!

সামনে পিছনে চারপাশে ঘুটঘুটি অন্ধকার, আঠার মতো। গলা টিপে ধরছে। গরু দুটো মুখ থুবড়ে পড়ে শীতে কাঁপছে।

চেঁচিয়ে, অন্ধকার টুকরো-টুকরো করে চিরে ফেলে ডাকতে ইচ্ছে করছে—মুক্তা, মুক্তি! কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

হয়তো ও গাড়ি থেকে কখন নেমে বাড়িই ফিরে গেছে। হয়তো ওর মেয়েরই ডাক শুনেছে—এই চপল বৃষ্টির উছল কলতান শুনে—গরুর গলার উদাস ঘণ্টারব শুনে—

॥ বনজ্যোৎস্না ॥

বেকার হয়ে পথে বেরিয়েছি, যেন কোথায় কবে কারবার করেছিলাম, ফতুর হয়ে গেছি।

একটা মেসে এসে দেখি—বিকাশ! একেবারে বদলে গেছে, কি রকম রুক্ষ চোয়াড়ে হয়ে গেছে, চোখে নিষ্ঠুর অবিশ্বাস। হাত দুটো ধরে বললে—খুব ঘুরতে বেরিয়েছিলি যা হোক, একটা খবর নেই। পায়ে কতগুলি কাঁটা ফুটল?

চাকরি করে। বিয়ে করেনি। বললাম—তোর মাইনেতে আপাতত কিছু ভাগ বসাব। যদ্দিন না একটা কিছু জোটে—

মেসে নানা রকমের জন্তু ভিড়েছে আগে থেকেই। তবে ভয় নেই।

বিনোদের আর যাই থাক, একখানা গলা ছিল। যেমন জোরালো তেমনি খোনা। তিন রকম আওয়াজ বেরুত—হেঁড়ে, হাপুরে, আর খনখনে।

কিন্তু খুব সকালবেলা, অন্ধকার তখনো ডুবে উবে যায় না, যখন বালিশের থেকে মুখ বার করে বলে ওঠে—সাত ভাই চম্পা জাগ রে—

আর যখন ঘুমন্ত কারুরই কোনো সাড়া না পেয়ে হঠাৎ গলার স্বরটা খাদে নামিয়ে ধীরে উচ্চারণ করে—কেন বোন পারুল ডাক রে—

মনে হয় অপরূপ, অপরিচিত সে-কণ্ঠস্বর।

শুনি, আর মনে হয়, যেন ভোরের তারা যাবার আগে ভোরের আলোর কানে-কানে কি কথা কয়ে যাচ্ছে।

রোজ!

খুব মনে পড়ে সেদিনটা। বিকাশের পিছু-পিছু যে-লোকটা মাথা খাড়া করে আসতে গিয়ে চিপা দরজার চৌকাঠে বিরাট একটা ঢুঁ খেয়ে টুঁ-টি না করে বেকুবের মতো ঘরে এসে ঢুকল—সেদিন তার অনেক কিছু দেখেই আশ্চর্য হওয়া যেত হয়তো—কিন্তু আমি দেখেছিলাম তার নাকের উপর ত্রিশূলের মতো কাটার দাগ একটা—আর তার দু'পাশে দুই চোখের আর্দ্র ও অবসন্ন বিষণ্ণতা!

অখিলবাবু গাড়ুতে সবে জল ভরছিলেন—সন্ন্যাসী দেখে সেই জলে চোখ দুটো তাড়াতাড়ি কচলে নিয়ে ছুটে এসে বললেন—পেন্নাম, সন্নেসী ঠাকুর। কি মনে করে এই গরিবদের আস্তানায় ?

বিকাশ বললে—আস্তাবলে বলুন, অখিলদা !

অখিলবাবু যদ্দুর পারেন ঠোঁট দুটো প্রাণপণে টেনে দাঁত বত্রিশটা দেখিয়ে বললেন—হঠাৎ পায়ের ধুলো পড়ল ?—

বিকাশ বললে—আপনাদের আপিসে যদি একে একটা ভাঁওতা করে ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তো বেচারার একটা হিল্লে হয়। একটা নাপিত ডাকি বিনোদ, দাড়িগুলি কামা।

অখিলবাবু কথায় কোনো কান না পেতেই যেতে-যেতে বললেন—আমি এখুনি আসছি, ঠাকুর। গরিবের হাতটা একবার দেখে দিতে হবে।

বললাম—কোথা পেলি বাবাজীকে ?

—এক মন্দ ফিকির করেনি ভাই—বিকাশ বললে—মাস দুয়েক কষ্ট সয়ে চুল আর দাড়িগুলি দিব্যি গজিয়ে ফেলেছে, ব্যবসা ফ্যালাও-এর দিব্যি ক্যাপিটাল। তুই তো পুরো ছটা মাস পা-টমটমে টো টো করেও কোনো আপিসে একটা ঠোকর পর্যন্ত মারতে পারলি না। ও বেড়ে এক গোছা দাড়ি বাগিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একেবারে পাগলা ঘোড়ার মতো হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাতে শুরু করলে। ভিক্ষাও না, বক্তৃতাও না—একটা ইংরিজি কবিতার আবৃত্তি। নারকেলহীন নারকেলডাঙার গোবরগণেশরা এই নাগা সন্নেসীর অদ্ভুত প্যাঁচে একেবারে বে-কায়দা হয়ে পড়েছে দেখলাম। ভিড় সরিয়ে দেখি—আরে বিনদা না ?

—চিনতে পারলি ?

—ঐ আধখানা কানটা দেখেই চিনে ফেললাম। তুই তখনো আসিসনি। ইস্কুলে পড়াতে-পড়াতে রামহরি মাস্টারের মুখ দিয়ে নাল গড়াত। তাই দেখে আমি আর বিনদা জোট বেঁধে বেঞ্চির তলা দিয়ে বুড়ো-আঙুল বাড়িয়ে চেঁচিয়েই বলে ফেলেছিলাম—ও বুড়ো, হুতুম-খুড়ো, লবেনচুস খাবি ? হাবলা বুড়ো তো চটে-মটে একাকার হয়ে সামনের ছমু মুদির দোকান থেকে দুটো তালপাতার বড়-বড় ঠোঙা নিয়ে এসে গাধার টুপি বানিয়ে আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিলে।

মাথা দুটো দোহাত্তা ঠুকে দিয়ে টুলে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললে—কান মল দু'জনেরটা, জোরসে! পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে সে কি কানমলা ভাই—কাছি-টানাটানি। বিনদার ছিল বেড়ালের মতো নোখ, রক্ত বার করে ছাড়লে। আমি একেবারে ক্ষেপে গিয়ে খপাস করে ওর কানে কামড় বসিয়ে দিলাম, আধখানা মুখের মধ্যে বেমালুম চলে এল। তাইতেই। এখন ঐ কাটা কানটা মনে হচ্ছে যেন নেংটি ইঁদুরের ছা।

বিনোদ খোনা গলায় বললে—খিদের খোরাকের জন্যেই এই ফিকির নয়, ভাই। যেমন গৌতম—

জিভ উলটে বিকাশ বললে—থাক! গৌতম নয়, গো-তম—গরুশ্রেষ্ঠ।

বললাম—ঐ অখিলবাবু এসে পড়ছেন—

বিকাশ বললে আস্তে-আস্তে—হাত পাতলেই এক নিশ্বাসে বলে যাবি বিনদা—তৃতীয় পক্ষ আপনার, আগে নাম ছিল গজেন্দ্রবালা, বদলে রেখেছেন গজমোতি—প্রথম পক্ষে সাতটি, দ্বিতীয় কোঠায় চারটি, আর তিন নম্বরে আধখানা।

—তার মানে?

—তার মানে যমজ হয়েছিল, একটা পটল তুলেছে। বলিস, আপনিই পাশ ফিরতে গিয়ে ভুঁড়ির তলায় ফেলে চেপটে দিয়েছিলেন।

—আর?

—বলিস, আপনি সাড়ে-চৌত্রিশ টাকায় পাটের গুদামে পাটের বস্তা গুনে দিন কাটান, খান থাকি সিগারেট, শোন গামছা পরে, দু'মাস বাদে আপনার আট আনা মাইনে বাড়বে। ভুঁড়িটি ভোম্বল হলেও ভোগেন অম্বলে, সেদিন বিকাশের পাল্লায় বায়স্কোপে গিয়ে শেষ হবার জায়গায় সিটি মেরেছিলেন, রবিবার সকালবেলা ঘুষি মারলেও আপনার ঘুম ভাঙে না—কেরানীর ঘুম।

বলতে-বলতে বিনোদ বেফাঁস বলে ফেললে—আপনার তৃতীয় পক্ষটিও টিকলে হয়!

—বলেন কি মশাই?—অখিলবাবু কিল খেয়ে আঁতকে উঠলেন যেন!

সামলে নিয়ে বিনোদ বললে—তবে চতুর্থ পক্ষ আপনার বাঁধা একেবারে। চেলি পরে জ্বলজ্বল করছে।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন অখিলবাবু—যাক, দমটা ফিরে পেলাম। কোনো বিঘ্ন হবে না তো বাবাজী ?

—কিঞ্চিৎ ! তা, টাক আপনার বেশ টনকো আছে।

বললাম—তা হলে এখন থেকেই জীইয়ে তোয়াজে রাখুন অখিলবাবু।

বিকাশ বললে—আমার জিম্মাতেও রাখতে পারেন—

বিনোদ গায়ের আলখাল্লাটা খুলে ফেললে। আমাদের পুরোনো হোঁচট-খাওয়া মুখ-থুবড়ে-পড়া মেসটা যেন হঠাৎ কথা কয়ে উঠল—যেন মিতা মিলেছে।

এতদিন কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল। একটা পা যেন ছিল না—যেন ঠেকো দিয়ে ছিল এতদিন—সহসা সব ভরাট হয়ে উঠেছে। কবিতার চমৎকার মিল একটা।

একটা জীর্ণ থুত্থুড়ো বুড়ো বাড়ির সঙ্গে যে একটা জ্যান্ত মানুষের এমন সামঞ্জস্য থাকতে পারে, ভাবিনি। যে ছেঁড়া আলখাল্লাটা ও ছেড়ে ছুঁড়ে ফেললে, তার রঙ এককালে গেরুয়া ছিল, এখন তা মরে-মরে মেটে কাদাটে হয়ে এসেছে—সেই আলখাল্লাটার সঙ্গে পর্যন্ত।

বুকের একটা দিক একেবারে চাপা, বসা, যেন একটা ফুসফুস কে চুষে নিয়েছে। নাকটা থেঁতলানো, কানের আধখানা খোয়া গেছে, গলাটা হাড়গিলের মতো, মাথায় বাবুইপাখি বাসা বেঁধেছে বুঝি।

কিন্তু এই কুৎসিত হতচ্ছাড়া দেহটার আবরণ উন্মোচন করার নির্লজ্জতার মধ্যে যেন সুদূর একটি ব্যথা আছে।

শ্যাওলা-পড়া দেয়াল ফুঁড়ে বটের চারা বেরিয়েছে—ওরা ওকে সম্ভাষণ জানায়। ফাটা ইঁটগুলি ওর ভাঙা পাঁজরার দিকে চেয়ে থাকে।

দাঁত-বের-করা রাস্তা—পায়ে খোয়া শুধু ফোটে না, কামড়ায়। মনে হয় ওর মেজাজ যেন সব সময়েই খিটখিটে। রোগা পটকা গলি, কেশে-কেশে যেন ধুঁকছে, এমনি মনে হয়।—তালপাতার সেপাই।

পাশেই বুড়ো বাড়িটা জুজুবুড়ির মতো ঘুপটি মেরে বসে—যেন ফোকলা দাঁতে হাসছে।

বাড়ি আর রাস্তা—দুই ভাই বোন যেন। সমবয়সী। শীতের হাওয়ায় জবুথবু হয়ে বসে আপন মনে খোশগল্প করে।

নিচের তলায় এক খোপরিতে কিন্থ-উড়ে বাদামী তেলে ফুলুরি ভাজে, কপাল বেয়ে টসটস করে ঘাম ঝরে কড়ার উপর, আরেকটাতে রাখহরিরা আগুনে টিন তাতিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পেটায় সারাদিন, তৃতীয়টায় এক বুড়ো কবরেজ—দিন প্রায় কাবার করে এনেছে—মাটির উপর ময়লা চাদর বিছিয়ে শুয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে, বার্ধক্য ওকে শুষে-শুষে একেবারে আমসি করে ফেলেছে। রাস্তার যে-লোক ভুল করে এই কাঁকড়ার মতো বুড়োর দিকে একবার তাকায়, তাকেই ও ডাকে। বলে—কেন শুধু-শুধু পিত্তশূলে ভুগছ সোনার চাঁদ, সাড়ে চার-আনা পয়সা দিয়ে এক হপ্তার বড়ি নিয়ে যাও, অনুপান শুধু দুটো উচ্ছেপাতা।

এই বুড়োর মুখে যেন এই বোবা বন্দী ব্যাজার গলিটার কাতর কাকুতি!

পকেটে দশটা পয়সা। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম—ছেলে-পড়ানো থেকে বাজার-করা তক এমনি একজন বেকার চেয়েছে। আপিস-খাম আর টিকিট কিনতে হবে। আর, জামা কাপড়ের এমন ছিরি হয়েছে যে, একটা মেটে সাবান না হলেই নয়, জামার বোতামগুলো ছেঁড়া, কিছু আলপিন-এরও দরকার!—মনে-মনে দশ পয়সার হিসেব কষি।

গ্যাসপোস্টে, এখানে-সেখানে তাকিয়ে-তাকিয়ে চলি, যদি একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। যদিও কালে-ভদ্রে দু'একটা পড়ে—তার আর ঠিকানা খুঁজে পাই না, কে আগেভাগেই লুফে নিয়েছে। লটপটে চটি দুটো টেনে-টেনে পথ ভাঙি। একটা বড় বাড়ির দরজার সামনে ভোরবেলাই অজস্র লোকের ভিড়। জিগগেস করি—ব্যাপার কি এখানে?

একজন বলে—সকালের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, জুতোর দোকানের এক বিক্রিদার চাই। চোদ্দ ঘণ্টা ফাটক—চোদ্দ টাকা মাইনে। ভিড় জুটেছে প্রায় চুয়াল্লিশ। বাবু এখনো নামেননি বলে দরোয়ান দরজা খুলছে না। দেখছেন কি রকম ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে!

সবার পিছনে দাঁড়িয়ে লোকটি করুণ করে একটু হাসে—হাতের কাগজটা মোচড়ায়—অথচ ফিরে যায় না।

চলি। মোড়ের মুচিটা ছেঁড়া হাঁ-করা চটিজুতোর পানে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—মাছের উপর বেড়ালের দৃষ্টির মতো; গাড়ির আড্ডার গাড়োয়ান

ডেকে জিগগেস করে—কোথায় যেতে হবে? ডিসপেনসারিতে বসে নতুন লবডঙ্গ ডাক্তার আমার দিকে চেয়ে ভাবে—আমাকে দিয়েই বুঝি ওর বউনি হবে আজ, যদি নাড়ীটা দয়া করে ওকে দেখাই! বেশ একটু সচেতন হয়ে ওঠে। ভিখিরী ভিক্ষা চায়, ভিক্ষা না-দিলেও আশীর্বাদ করে—মাগনা।

গঙ্গা বলে ডাকতে দুঃখ হয়—একটা বড় নর্দমা! পাড়ে অতিকায় কারখানা একটা—যেন হিক্কা উঠেছে। ফুসফুসটা এই ফাটলো বলে।—সপাসপ ঢুকে গেলাম, বললাম—সাহেবের ঘর কোনটা?

শিরদাঁড়াটা খাড়া করে সাহেবের ঘরে ঢুকে সেলাম না-ঠুকেই বললাম—একটা চাকরি দাও।

গুণপনা কি, জিগগেস করায় বললাম যে, চৌকো একটা লেফাফায় চওড়া একটা কাগজ আর এই চওড়া বুকটা।

বি-এ পাশ-কে কলের কুলিগিরিতে বহাল করতে পারে না—সাহেব বললে। বললাম—ড্যাম। দেখ এই ড্যানাটা।

জামার হাতাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে মজবুত বাহুটা ওকে দেখাই।

কিছু হয় না। সাহেব দরজা দেখিয়ে দেয়। এদিক-ওদিক ঘুরে-ঘুরে পেটুক কারখানাটা দেখি—বেশ লাগে। ওর কবিতায় নিজের হাতে হাতুড়ি ঠুকে-ঠুকে ছন্দ মেলাতে ইচ্ছে করে।

দুটো লোক করাত দিয়ে একটা লোহার 'বিম' কাটছে। বলি—কতক্ষণে ফুরোবে?

—ঘণ্টা আষ্টেক তো বটেই—সেই কখন থেকে বসেছি। ড্যানা দুটো ছিঁড়বে এবার।

আবার গঙ্গার পাড় বেয়ে হাঁটি। ওর টুঁটি সহস্র মুঠিতে কারা টিপে ধরেছে—বাতাসের জন্যে হাঁপানি রোগীর মতো গলা বাড়িয়ে রয়েছে যেন। ঐ দুটো অসহায় মজুরের কথা ভাবি—আর কতক্ষণ করাত চালাবে ওরা?

ছবির নিচে নাম লেখা তিলোত্তমা, বাজানই বা না কেন ডুগি-তবলা, দেবী তো বটেন। অখিলবাবু তাই যত্ন করে মাথার পাশে টাঙিয়ে রেখেছেন। বিকাশের ঘর থেকে আধপোড়া সিগরেটের টুকরোগুলি কুড়িয়ে এনে পিন ফুটিয়ে-ফুটিয়ে খান, খুকি-বউয়ের জন্যে স্প্রিং-এর নাগরদোলা থেকে শুরু করে মৃগীরোগের

ওষুধ কেনেন লুকিয়ে-লুকিয়ে। আগে-আগে গাঁড়োয়ানি ইয়ার্কিতে ভরা এক পয়সার চোথা কাগজ কিনে সপ্তাহ ভরে তাই তুইয়ে-তুইয়ে পড়তেন। এগুলো দিয়ে ঠোঙা হবে না, দাম এর আধলার আধপয়সা বেশি নয়—কাগজওলা এই কথা বলাতে আর কাগজ কেনেন না। এতদিন ধরে যা পুঁজি করে রেখেছিলেন, পুঁটলি বেঁধে বাড়ি নিয়ে গেলেন এক সময়, শেষ আধখানা বাচ্চাটার দুধ গরম হবে।

এখন আপিস থেকে এসে ভেজা গামছা বুকের উপর ফেলে ছাতের ধারে বিনোদের মুখে দেশ-বিদেশের গল্প শোনেন।

তাই জানতাম।

সেদিন বিকাশ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—গল্প শুনে যা কাঞ্চন, বিনোদ-বাবাজীর আশনাইর কেচ্ছা।

এক পাশে শুয়ে পড়লাম। বিকাশ বললে—আপনার ভুঁড়িটি একটু এগিয়ে দিন অখিলদা, তাকিয়া করি। তাকিয়ায় ঠেস না-দিয়ে কি প্রেমের গল্প শোনা যায়, না সহ্য হয়?

একদিকে বিকাশের হাসি, যেমন প্রচণ্ড, তেমনি নিষ্ঠুর। তবুও অন্যদিকে বিনোদের সেই উদাসীন উচাটন কণ্ঠস্বর—হোক না হেঁড়ে, হোক না স্যাঁতসেঁতে, কিন্তু করুণ, মন্থর—যেন সমস্ত ঠাট্টাকেই উপেক্ষা করছে।

বিকাশ বলবে, অখিলদা ঝিমুচ্ছেন, কিন্তু এ তাঁর তন্ময়তা, যেমন তন্ময়তা এই ধ্বসে-পড়া অন্ধকার নিসাড় বাড়িটার।

বিনোদ একমনে নিজের দাড়ি হাতায়, আর কোনো কুণ্ঠা না করেই বলে চলে খোনা গলায় অথচ আস্তে—সে কি রোদ ভাই, চোখে কান্না জড়িয়ে আসে। বড় ইষ্টিশান থেকে আট ক্রোশ দূরে আমার সেই পারুল-ফোটার গাঁ। চলি-চলি আর তার সজল সস্নেহ চোখ দুটি ভাবি—আর দুপুরের রোদ যেন জুড়িয়ে আসে। সমস্ত দেহ অবশ—অথচ ক্লান্তির মধ্যে এমন একটি শান্তি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সন্ধ্যা ডানা মেলেছে—তখন পৌছুলাম।

বিকাশ বললে—তারপর তো ঘরে ঢোকা মাত্রই পারুলের বাপ ঠ্যাঙা উঁচিয়ে তেড়ে এসে তোকে তাড়িয়ে দিলেন, তুই উলটে একটা চড়ও মারতে পারলি না, না? কি করলি তখন?

—প্রকাণ্ড অশ্বত্থের তলায় পারুল আমারই জন্যে ছায়া মেলে রেখেছে।

দেখা কি এত সহজেই মেলে ? আমারই জন্যে পারুল পাঠিয়ে দিলে বাতাসের স্নেহস্পর্শ, আমারই জন্যে জ্বালিয়ে রাখল সন্ধ্যার প্রথম তারাটি !

বিকাশ বললে—তারপর গাছতলায় শুয়ে ভেউ-ভেউ করে খুব খানিকটা কাঁদলি—যেমন পরীক্ষায় ফেল করে কেঁদেছিলি বোকার মতো ? ট্যাঁকে যা পয়সা ছিল, তা দিয়ে আফিং বা কার্বলিক অ্যাসিড কেনবার মতো মুরোদ ছিল না বলেই বুঝি কতগুলো শুকনো চিঁড়ে আর নারকেলের মালায় করে খানিকটা ঝোলা গুড় কিনে এনে চিবোতে বসলি ? যা খিদে পেয়েছিল ! নয় কি ? কি বলিস রে, কাঞ্চন ?

অখিলবাবু রুখে বললেন—সব সময় ইয়ার্কি করো না, বিকাশ। আমার বেড়ে লাগছে শুনতে।

বিনোদ এবার যেন অখিলবাবুকে লক্ষ্য করে-করে বলতে লাগল—সন্ধ্যায় যখন বিদায় নিয়ে যেতাম, পারুল বিষাদিতা গোধূলি-বেলাটিরই মতো ছাদে এসে দাঁড়াত।

বিকাশ বললে—শুকোতে দেওয়া কাপড়-জামাগুলি ঘরে নিয়ে যেতে। তোরই জন্যে নয় রে, হতভাগা।

—ওর চারধারে এমন একটি পবিত্র বৈরাগ্য !

—সেদিন নিশ্চয়ই ওর জ্বর-ভাব ছিল, কিছু খায়নি, মুখ শুকনো, গা শিথিল, পরনের কাপড় ময়লা—তাই সেটাকে বৈরাগ্য বলে ভুল করেছিলি। বোকা !

হঠাৎ বিকাশ প্রশ্ন করলে—যাক। বেচারীর নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেছে তো ? কটি ছেলেপুলে হল ?

বিনোদ বললে—সে চিরকুমারী। আমার জন্যে দুঃখের তপস্যা করছে।

—মৃগীরোগ আছে বুঝি ? বাপ বুঝি বিয়ে দিচ্ছে না ? তাই ?

—আমাদের মিলন দেহকে ডিঙিয়ে—

—যেমন লঙ্কা ডিঙিয়েই অযোধ্যা। পথটুকু না পেরিয়েই পথের মোড়।

পরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বিকাশ বললে—পৃথিবীতে তিনটে সুন্দর অশ্লীলতা আছে, ভাই—জন্ম, প্রেম আর ভগবান ! আর সব চেয়ে ঘৃণা করি—বিবাহ আর মৃত্যু। এমন কুৎসিত জিনিস দুনিয়াতে বুঝি নেই।

অখিলবাবু অতিষ্ঠ হয়ে চেঁচিয়ে অতঃপর ঝিকে ডাকেন এক ছিলিম তামাক সেজে দিতে।

সাতাত্তর টাকা মাইনে পায়, সাতদিনও লাগে না ফুঁকে দিতে। তারপর বাকি তেইশ দিন বসে-বসে হাঁপায় আর বিনোদের আষাঢ়ের গল্প শোনে। আজগুবি কথা বলে সব—যে-মেয়ে কবিতা বোঝে বলে সে সব চেয়ে মিথ্যাবাদী।

নিজেকে পর্যন্ত ঠাট্টা করে। বলে—বিকাশ বোস, একটা মাগী-প্যাটার্নের চেহারা, হেলে-পড়া হাসনুহানার শাখাটি, বুকের ভিতর ধোঁয়া না-সেঁধোয় সেই ভয়ে ধীরে-ধীরে চুরুট ফোঁকেন, ডান দিকে সিঁথি কাটেন, গাল পর্যন্ত আমেরিকান জুলপি রাখেন—দেখতে পারি না। ঘেন্না লাগে। মেয়েমানুষের চুলের গন্ধ শুঁকে বমি আসার মতো। ছো!

বিনোদ আর আমি এক ঘরেই শুই, আর শোয় ঝুলে-ঝুলে জাল ঝুলিয়ে বেকার মাকড়সারা।

দেয়ালের সঙ্গে বিনোদ কথা বলে। বলে—এমনি কতটুকুই বা তুমি? ঠুনকো কাঁচের পেয়ালার চেয়েও সস্তা। তোমাকে তোমার চেয়ে কত বড় করে দেখলাম—সে শুধু আমারই কৃতিত্ব, আমার একার গর্ব সে। যেখানে তুমি বাস্তব, স্থূল, জাজ্বল্যমান, সেখানে তুমি কত কদর্য, কিন্তু তোমার চতুষ্পার্শ্বে আমার সাধনার কল্পনার জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করেছি বলেই না আমি আজ অতসীর শাখা হয়ে দূর তারকার জন্য আঁকুপাঁকু করছি। তুমি তো শুধু একটা প্রতিমা নও, তুমি—

ঈশ্বরের নামটা মুখে আসতে দেরি লাগে। যেন ঐ দেরি করে উচ্চারণ করার মধ্যে কত অভিমান!

সেই বিনোদই সকালবেলায় বিকাশকে বললে—দুটো টাকা দে। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিই চাকরি চেয়ে।

বিকাশ বললে—তার চেয়ে কিছু ন্যাংড়া আম আর পানতুয়া আনলে কাজ হত।

—তুই ভাবছিস, কিছু হবে না ওতে? আমি সোজা কথা স্পষ্ট করে জানাব যে, আমি খেতে পাচ্ছি না, বাড়িতে আমার বিধবা মা'র মরণাপন্ন অসুখ—গেল-বছরের ঝড়ে আমাদের ঘর একেবারে ন্যাংটো হয়ে গেছে—

বিকাশ বললে—দু'টাকায় অত কুলুলে হয়! একটু কম-সম করেই লিখে দিস, ভাই।

রাস্তার বাঁক নিতেই প্রবোধের সঙ্গে দেখা—নতুন উকিল। গোটা বাজারটাই যেন কাঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

বললাম—এত ঘটা যে? নতুন ছেলের ভাত বুঝি? না, সাধ দেওয়া হবে ফের।

ও হেসে বললে—কাল একটা মোকদ্দমা জিতেছি, ভাই। তাতেই একটু,—তুই চল না আমাদের বাড়ি। একেবারে খেয়ে যাবি খন।

তথাস্তু!

কান্নিক খেয়ে গলির পর গলি পেরিয়ে যে-সুড়ঙটায় আমাকে ও নিয়ে এল, সেখানে মরণেরও পথ চিনে আসতে দস্তুরমতো বেগ পেতে হবে। বললাম—এ-গলিতে মক্কেল আসে? মোটা হলে তো ঢুকতেই পাবে না। ও বললে—কেন, গলির মোড়ে একটা আঙুল-দেখানো সাইন-বোর্ড টাঙিয়েছি তো! সন্ধ্যা থেকে রাত পৌনে-এগারোটা পর্যন্ত বৈঠকখানার দরজার কাছে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখি।

বললাম—ঐ কেরোসিনটা খামোকা গরচা দিস। বৃথা।

রান্নাঘরের দোরে সমস্ত বাজারটা নামিয়ে ও আমাকে একেবারে ভিতরে নিয়ে এল, অবিশ্যি রান্নাঘরের দোর থেকে ভিতরটা দু'পার দু'ইঞ্চিও বেশি নয়। একটি মেয়ে টেবিলের কাছে বসে কি লিখছে।

প্রবোধ বললে—জ্যোৎস্না, ইনি আমার বন্ধু, ডন কুইকসট। আর, তুই বুঝতে তো পারছিস, ইনি—

—আমার বউদিদি।

কথা একটা বলা উচিত বলেই বললাম।

মেয়েটি লিখেই চলেছে। যেন ওর আচরণে একটি অবহেলা, জায়গাটা ছেড়ে উঠল না পর্যন্ত। কিন্তু কেন যে অসন্তুষ্ট হতে পারলাম না জানি না। ওকে একটুখানি দেখলাম, যেমন এক ফাঁকে ঝড়ের রাতে বিদ্যুল্লতা দেখি। শীর্ণমলিন চেহারা, ভোরের সূর্যমুখী যেন বিকেলের আলোয় নেতিয়ে পড়েছে, ঘাড়ের উপর চুলের ফাঁসটার কাছে ঘোমটাটা একটু শিথিল হয়ে খসেছে, ললাটে দুটি ঘামের বিন্দুর উপর রোদের চিকণ চিকিমিকি, ওর শাড়ির আঁচলটা এমন সুন্দর করে পায়ের কাছে লুটিয়ে না পড়লে সত্যিই যেন সব কিছু ভারি বেমানান হত।

প্রবোধ একটু বিরক্ত হয়েই বললে—কি লিখছ ওটা ?

মেয়েটিও একটু চটেই উত্তর দিলে—গয়লার হিসেব মেলাতে হবে তো? তখন তো আবার বকবে। পরশু দিয়েছে মোটে দেড়-পো, লিখেছে—দেড় সের। বলেই বেরিয়ে গেল। আঁচলটা লুটোতে-লুটোতে যাচ্ছিল।

প্রবোধ তার মোকদ্দমা-জেতার গল্প শুরু করলে। কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'ল-পয়েণ্ট'-এর খোঁচা মেরে জজকে ঘায়েল করলে, ওর বক্তৃতায় বিপক্ষের উকিল কেমন ভেবড়ে গেল, জজ-সাহেব কেমন ওর সওয়াল-জবাবের তারিফ করলেন—তারই এক ঝুড়ি বক্তৃতা। আমি যে ওর বিপক্ষ দলের উকিল নই, আমাকে এমনি বসিয়ে নাস্তানাবুদ করে যে ওর কিছুমাত্র লাভ নেই, কে ওকে বোঝাবে ? ভালো লাগছে না শুনতে, তবু ওর বলতে ভালো লাগছে বলেই শুনছি।

রাঁধুনে বামুন নেই, একটা ঠিকে-ঝি খালি। তেত্রিশ টাকা বাড়ি ভাড়া, লাইব্রেরির চাঁদা, ট্যাক্স, ল-জার্নালের খরচ—গাউনটা এমন ছিঁড়েছে যে আর সেলাই চলে না! এমনি অফুরন্ত বেদনার কথা—কিন্তু একবার যদি নাম ফাটে! বাড়ি, গাড়ি আর লাইব্রেরি—চাই কি একটা বাগানবাড়ি পর্যন্ত।

মুখ ম্লান করে বলে—দুটো ছেলে মারা গেল, ভাই। শেষেরটাও যাবে।

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে রাঁধাবাড়ার কাজ করে চলে অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায়, ঝিকে বকে, নিজেই বাসন দুটো মেজে নেয়, পেঁয়াজগুলো কেটে ফেলে, ঝাঁটা দিয়ে বারান্দার নোংরাগুলো সাফ করে, রোগা মরন্ত ছেলে আচমকা কেঁদে উঠলে এক ফাঁকে ওকে শান্ত করে আসে।

আবার চাবির রিং-এ শব্দ করে ছুটোছুটি করে, বাজার থেকে কাঁচা লঙ্কা ভুলে আনেনি বলে রাগ করে আপন মনে কি বলে, বোঝা যায় না। খুন্তি নেড়ে মাছ ভাজে, ঠিক টের পাই, জমাদার এসেছে বলে ঝিকে আগে নর্দমায় জল ঢেলে দিতে বলে, মাছখেকো বেড়ালটাকে শাসায়।

বসে-বসে তাই শুনি—একটা হালকা কবিতা। অমিত্রাক্ষর নয়।

পরে এক ফাঁকে একটা ছোট বাটি করে খানিকটা তেল ও একখানা ফরসা চুল-পাড়-কাপড় এনে আমাকে বললে—কলে জল থাকতে-থাকতে স্নান করে নিন।

প্রবোধকে বললে—তোমারও তো কোর্টের বেলা হল। আমার এদিকে সব হয়ে গেছে।

দুটি হাতে একটি করে শুধু সোনার চুড়ি, কাপড়ের পাডটায় কচু পাতার রঙ, ঘোমটাটি তেমনি আধেক-খসা।

খাওয়া সেরে প্রবোধ ঢিলে পেণ্টালুনটা পরলে। গায়ে দিলে জলে-যাওয়া আলপাকার চাপকানটা, তিনটে বোতাম ছেঁড়া—মেয়েটি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বোতামগুলো লাগিয়ে দিলে। জুতোর পিছন থেকে ছেঁড়া-মোজার ফুটো দুটো উঁকি মারে—ওর জুতোর দিকে নিশ্চয়ই রাস্তার মুচি আজ লোলুপ চোখে চেয়ে থাকবে।

বললে—তুই বেরোবি নাকি, কাঞ্চন?

মেয়েটি একটু চড়া গলাতেই বললে—ওঁকে তো আর আক্কেল-দাঁতের মতো মক্কেলে পায়নি! উনি জিরিয়ে যাবেন একটু।

প্রবোধ পান চিবোতে-চিবোতে ছাতা মাথায় দিয়ে চলে যায় তারপর।

বললাম—আপনি এবার খেয়ে নিন।

—আমি? আমার সব পাট সেরে খেতে-খেতে প্রায় তিনটে।

—তিনটে?

—হ্যাঁ, ঠাকুরপোই আসেন একটার সময়—কনট্রাক্টারি করেন কিনা। ঝিকে বিদায় করে ওঁর ভাত আগলে বসে থাকি। উনি এসে পৌছুলে তবে নিশ্চিন্তি।

পাশে নিচু একটা তক্তাপোশের উপর একটি মাস দশেকের শিশু, ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে—সেই লোহার কারখানাটা মনে পড়ে—তেমনি ক্লিষ্ট, তেমনি অস্থির।

আদর করে ওকে ছুঁতে যাচ্ছি একটু, মেয়েটি বললে—ওর ভারি অসুখ—

বললাম—কি অসুখ ওর?

—দেখুন না চেয়ে।

শিশুর দিকে তাকিয়ে যা না বুঝি তার চেয়ে ঢের বেশি বুঝি ওর দিকে চেয়ে—দুটি চোখে বেদনার কি নির্মল আভা! তারপর আরেকবার শিশুর দিকে তাকাই—একটা ঝড়ে-পড়া পালক-খসা শালিকের ছা—মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, চোখের উপর একটা ব্যাণ্ডেজ—দাঁতের মাড়িতে ঘা—যে-শিশু আকাশের জ্যোৎস্না হয়ে আসে, যে-শিশুর কামনা সুগন্ধের মতো নববধূর সমস্ত যৌবন ঢেকে মেখে রাখে—

বললাম—কি নাম এর?

—মুসোলিনি। এর দুই দাদা ছিল—লেনিন আর ম্যাকস্থইনি। বিদায় নিয়েছে।

—লেনিন কিসে গেল?

—তড়কায়। জন্মের মাস দুয়েক পরে হঠাৎ একদিন বিষের মতো নীল হয়ে।

—আর ম্যাকস্থইনি?

—প্রায় প্রায়োপবেশনেই।

পরে একটু থেমে বললে—আর একটি যখন হবে, নাম রাখব আব্‌দুল ক্রিম। এরা সব যাবে, শুধু ভাগ্যের লোহার দ্বারে কপাল ঠুকে—ওদের মাকে ঠাট্টা করে—আর, আমার নাম কি জানেন?

—কি?

—বনজ্যোৎস্না। প্রাকৃতে বলে—বনজ্যোষিনী।

তাই। আমি হলে কক্‌খনো ওকে জ্যোৎস্না বলে ডাকতাম না—বন বলে ডাকতাম। ওর মধ্যে যেন আমি অরণ্যের ব্যাকুল মর্মর শুনতে পাচ্ছি—অরণ্যের সেই ব্যাকুল ও বিস্তৃত স্তব্ধতা।

দরজার কে কড়া নাড়লে। বন বললে—ঠাকুরপো এসেছেন। কড়া-নাড়া শুনেই চিনতে পারি।

চলে যায়—আঁচলটা তেমনি লুটোতে-লুটোতে চলে।

একটা নীল খাম নিয়ে বিনোদ লাফালাফি লাগিয়েছে—ওর বিজ্ঞাপনের জবাব এসেছে একটা। বিনোদ খামটা না-খুলেই খুশি, বলে—কোনো মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারিই হয়তো। কিম্বা কোনো সাহেব হয়তো বাংলা পড়ানোর জন্যে মাস্টার চায়। কেয়াবাৎ!

অখিলবাবু ঈর্ষায় ওর দিকে একটু তাকান। বলেন—বাংলার মাস্টারকে আর কত মাইনেই বা দেবে? ত্রিশ টাকার বেশি?

—তিনশোও হতে পারে। বিনোদ বলে।

বিকাশ বলে—দেখিস, তোর পারুলের শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্র না হলে হয়।

বিনোদ একটু নেড়েচেড়ে অনেক দেরি করে খামটা খুলে ফেললে। পড়েই সারা মুখ যেন এতটুকু হয়ে গেল। সবাই উৎসুক হয়ে তাকালাম—ব্যাপার কি ?

কিছুই না তেমন—আরেকটা ইংরিজি দৈনিক কাগজ বিনোদকে জানিয়েছে যে, তাদের কাগজে বিজ্ঞাপনের দর ঢের কম—এক ইঞ্চি মোটে দশ আনা, তিন ইঞ্চি দেড়টাকা—সেখানে বিজ্ঞাপন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে পারে।

বিনোদ তারপর ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ অস্থির হয়ে হাঁটে, আর দাড়ি হাতায়। পরে ফের বিকাশের কাছে হাত পেতে বলে—আমাকে আর দুটো টাকা দে।

—কেন ? এই নতুন কাগজটায় আরেকটা বিজ্ঞাপন ছাড়বি নাকি ?

—না। ছিপ সুতো আর বঁড়শি কিনব। ঐ ডোবার ধারে বসে-বসে মাছ ধরব এবার।

বিনোদ খেজুর গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পচা ডোবার নীলচে জলে ছিপ ফেলে চুপ করে ঠায় বসে থাকে—আর চোখ বুজে-বুজে বুঝি পারুলের কথাই ভাবে—সেই জ্যৈষ্ঠের রোদে ষোলো মাইল পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দেবার কথা—পারুলের সঙ্গে একটি বার দেখাও হল না।

বিকাশ খেপায়। বলে—একটা পুঁটিমাছও আটকাতে পারলি না এতদিনে ? তোর পারুলকে একটা প্রেমপত্র পাঠা না, গয়না বেচে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিক।

বিনোদ ছিপ ছেড়ে দিলে। এবারে বসে-বসে টিনের তার দিয়ে নানান রকম আজগুবি জন্তু বানায়। টিয়া, আরশুলা, মোষ, পাখির খাঁচা বানায়, দালান, ইজিচেয়ার। বলে—এই খাঁচার থেকে পাখিটাকে বার করতে পারিস তো দাড়িগুলো কামিয়ে ফেলব এবার।

বহু কসরত করেও কেউ পারি না। ও কিন্তু হঠাৎ একটা কায়দা করে খাঁচার দরজা দুটো খুলে পাখিটাকে বার করে দিলে। মন্দ কৌশল তো নয়—খুব সহজ, কিন্তু কারুর মাথায় আসে না।

একদিন দেখলাম বিনোদকে—গায়ে সেই রঙ-চটা আলখাল্লাটা, মাথায় জটা বাঁধা, দাড়িগুলোতে উকুন পড়েছে—রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সেই তারের

খেলনাগুলো বিক্রি করছে। ইস্কুলের ছেলেরা চারদিক ছেঁকে ধরেছে—পয়সা দিয়ে কিনছেও, বাড়ি গিয়ে পড়শী বন্ধু ও বোনদের তাক লাগিয়ে দেবে।

সমস্ত রাস্তার বিপুল জনতার এক কোণে ও একটুও খাপ খায় না, ছন্দপতন হয়েছে, কিন্তু রাত্রে ট্যাঁকে পয়সা আর গাঁজা নিয়ে যখন মেস-এ ফিরে আসে—তখন একটা কবিতা আপনা থেকেই দুলে ওঠে যেন।

তবু বিনোদ বলে, কিছুই হয় না নাকি ওতে। বলে—আবার সরে পড়ব। কপালে আছেই দুঃখ। দাড়িগুলিও আরো কতকটা বেড়েছে, ভালোই হল।

বিকাশ বলে—খা, খা, আরো খা খানিকটা প্রেমের কুইনিন। এবারে ঠেলা বোঝ।

বিনোদের বিষণ্ণ অথচ সুকোমল মুখ দেখে মনে হয়—কি মনে হয় জানি না—শুধু ওর সজল চোখ দুটি দেখলে কি যেন মনে হয়—

প্রবোধের বাড়ির দরজায় লণ্ঠনটা যেন আমারই জন্যে জ্বালানো—লণ্ঠনটার দিকে চেয়ে মনে হল। মনে হল, ওকে রাত্রে একবার দেখে আসি!

সব নিঝুম লাগছে—এরই মধ্যে ঘুমিয়ে গেছে নাকি সব? সদর দরজা খোলাই ছিল—ঝি এখনো যায়নি। রান্নাঘর ধোয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। যাবার সময় লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিয়ে যাবে।

বৈঠকখানা ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। প্রবোধের মুখেই 'ল-পয়েন্ট' সম্বন্ধে খানিকক্ষণ বক্তৃতা শুনে আসা যাক। ঢুকে পড়লাম।

প্রবোধ নয়, বনজ্যোৎস্না। লণ্ঠনের আলোয় টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কি লিখছে। ওর চারদিকে তেমনি একটি নিস্তব্ধ উপেক্ষা—মধুর ঔদাসীন্য। লেখাটা হাত দিয়ে ঢেকে শুধু একটু হাসল। কিন্তু আমি তো ওর লেখা দেখতে আসিনি।

বললাম—কি লিখছেন?

—শুনলে হাসবেন, আমাকে বোকা ভাববেন।

—না, না।

—হ্যামলেটকে একটা চিঠি লিখছি।

—হ্যামলেটকে ?

—হাঁ, ঐ তো ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কাল কীটসের ফ্যানিকে একটা চিঠি লিখেছি—পারি তো ডন জুয়ানকেও লিখতে হবে একটা !

ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাই—বিকাশ হলে হয়তো বলত ন্যাকামি—কিন্তু ওর ঐ অমন করে বসা থেকে শুরু করে অমন করে কথা কওয়াটি পর্যন্ত মেঘদূতের মতো করুণ লাগে ! মনে হয়, বিনোদের মুখের সঙ্গে এর মুখের কোথায় যেন একটা মিল আছে।

বললে—এই দেখুন কালি-কলম দিয়ে হ্যামলেটের একটা ছবি এঁকেছি।

কিছুই না—ইজি চেয়ারে শুয়ে একটি লোক সিগারেট টানছে।

তারপর হঠাৎ উঠে ঘরের মধ্যে চলে যায়। বলে—বসুন, খোকাটা উঠেছে, আর ওঁর মশারিটা ফেলে দিয়ে আসি।

খানিক বাদে আবার আসে—এবার আর আঁচলটা লুটোয় না। বললে—লেনিন যখন মরেছিল তখন খুব কেঁদেছিলাম, ম্যাকস্যুইনি যখন মরে তখনো খুব কষ্ট হয়েছিল—বেচারার কি যে হল আটাশ দিন ধরে কিছুই মুখে নিলে না, বুকের দুধ পর্যন্ত না—যেন কি অভিমান ! আর ও যখন মরবে, মনে হচ্ছে, একটুও কাঁদতে পারব না। কাঁদতে ভুলে গেছি।

আবার চলে যায়, ঠাকুরপোর জন্যে ভাত-চাপা দিয়ে রেখে আসে, নেবু, জল, মিছরি বিছানার কাছে টুলের উপর রাখে, বিছানাটা পাতে—চটিজুতো পর্যন্ত এগিয়ে রেখে দেয়, পা ধুয়ে এসে পরবে।

আবার এসে বসে, বলে—যে-ঘট ভরলও না, ভাঙলও না, তাকে নিয়ে কি করব ? ভাসিয়ে দিয়েছি।

জিগগেস করলে—এত রাতে এখনো বাড়ি ফেরেননি ?

—বাড়ি নেই বলে।

ও হঠাৎ ম্লান স্বরে বললে—দেখুন, আমার খালি জানতে ইচ্ছে করে—কত কথা। কিন্তু যত জানব, ততই তো দুঃখ। যাই, কালকের তরকারিগুলি কুটে রাখি গে।

ঝি চলে গেছে। বাইরের লণ্ঠনটা নেবানো। ও আবার এসে বসে। দু'জনেই চুপ করে থাকি। পাশের ঘর থেকে প্রবোধের জোরে নিশ্বাস ফেলার শব্দ শুনি। তারপর কোনো কথা না বলেই আস্তে-আস্তে বেরিয়ে যাই। ও আস্তে-আস্তে

এসে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। আবার ওর ঠাকুরপো যখন আসবে, উঠে খুলে দেবে।

তাশ খেলা হচ্ছে।

বিকাশ বললে—ইস্কাবনের বিবিটা এবারে অখিলদার কাঁধেই চাপিয়ে দিতে হবে।

অখিলবাবু বললেন—চারটেই দাও না কেন, নারাজ নই।

রাতের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে—মেসের ও-পাড়া নাক ডাকাচ্ছে—নিঃসাড়। বারান্দায় কার পায়ের হালকা আওয়াজ পাওয়া গেল। বললাম—ঝি এখনো বাড়ি যায়নি?

দরজার কাছে কে এসে বললে—বিকাশবাবু আছেন?

সুদূর থেকে যেন কথা এল—ঘুমে-পাওয়া হাওয়ার ককানির মতো।

দেহ তো নয় দীপশিখা! জ্বলছে অথচ বাতাসে কাঁপছে। এখুনি যেন নিবে যাবে।

বিকাশের গলা দিয়ে বেরুল—কে, বেণু? এস, বোসো এসে।

যেন এতে এতটুকু বিস্মিত হবার নেই। বেণু আসবে এ-যেন ওর জানা কথা। যেমন জানা কথা সকালবেলা গয়লা আসবে, বিকেলে আপিসফেরত অখিলবাবু আসবেন। আশ্চর্য!

আমরা সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

মেয়েটি মাথা হেঁট করে রেখে বললে—যদি দয়া করে একটা কথা শোনো—ভারি বিপদে পড়ে এসেছি।

বিকাশ রূঢ় গলায় বললে—এখানেই বল, এরা শুনলে কিছু ক্ষতি হবে না।

বললাম—আমরা চললাম অখিলদার ঘরে।

বিকাশ বললে—না। বল, কি চাই?

মেয়েটি সংকোচ করে যেন কথা কইতে পারছে না, ওর চোখে জল এসে পড়েছে, গলাটা বুজে আসছে। থেমে-থেমে বললে—ওঁর খুব অসুখ, অবস্থা ভালো নয়—তুমি যদি একটিবার আমার সঙ্গে আসো।

মনে হচ্ছে আমরা যদি এখানে না থাকতাম, ও নিশ্চয়ই বিকাশের পা দুটো জড়িয়ে ধরত। যেন ঐ পায়ে কত অপরাধ করেছে—

বিকাশ নির্দয়ের মতো বললে—কার? তোমার স্বামীর? কেন, ছশো টাকা যার মাইনে—মোটরকার, তেতলা বাড়ি—তার কি আর ডাক্তারের অভাব হয়? আমি তো ডাক্তার নই।

—কিন্তু তুমি সেবার আমার অসুখের সময় কি প্রাণপণ সেবা করে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলে। তেমনি করে যদি ওঁকে বাঁচাও—

যেন ভিক্ষা চাইছে। বিকাশ যেন বিধাতা।

বিকাশ ব্যঙ্গ করে বললে—তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে আমার লাভ?

কি নিষ্ঠুর এই বিকাশটা! ওর বুকটা যেন আগাগোড়া ইস্পাত দিয়ে তৈরি। বেণু এবার সত্যিই কেঁদে ফেললে। মনে হল, এখুনিই যেন বিকাশের পায়ের তলায় মাথা লুটিয়ে দিয়ে কপাল কুটে মরবে। কাঁদতে-কাঁদতে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে একলা নেমে চলে গেল।

বিকাশ বারান্দায় উঠে এল। রেলিঙটায় ভর দিয়ে দাঁড়াল একটু।

বললাম—একি করলি বিকাশ? শিগগির চল তুই—

বিকাশ বললে—কেন, আমি ভাড়াটে নার্স নাকি যে যার-তার অসুখ হলেই ছুটে যেতে হবে—রাত জেগে?

—যার-তার অসুখে নাই বা গেলি। এ যে বেণুর স্বামীর—

—কক্‌খনো না।—এমন ভাবে হাত ঘুরাল যে লেগে কাঠের রেলিঙটা ঝেঁকে উঠল।

—তবে শিগগির আমাকে ঠিকানা দে—আমি যাচ্ছি। একলা পথে—

—নম্বর জানি না, তবে বাড়িটা চিনি। নাম 'বেণুকুঞ্জ!'

পথ চিনে-চিনে যখন এলাম, রাস্তায় মোটরের ভিড় লেগে গেছে। ভিতর থেকে কান্নার তুমুল রোল উঠেছে। বুঝলাম—নেই; হয়ে গেছে। ভিতরে ঢুকে গেলাম। মৃতের মন্দিরে কারুরই জন্যে নিষেধ নেই। সবাই ভাবলে—আমি বেণুর স্বামীর বন্ধু, হয়তো বা বেণুরই।

বেণুর সে কি কান্না! অনেকদিন এমন কান্না শুনিনি। শুধু শুনেছিলাম পদ্মার সেই অকূল বন্যাস্রোত—শুনেছিলাম উন্মুক্ত প্রান্তরের পারে সেই উদ্দাম বৃষ্টিজলধারা। বুকটা জুড়োয় কান্না শুনে।

সমস্ত সান্ত্বনা, সহানুভূতি, উপদেশ,—গীতা, উপনিষৎ—সব ভাসিয়ে ছারখার

করে দিচ্ছে। প্রলয়ের কালে সাগর যেমন কাঁদে। মা'র গলা জড়িয়ে একটি ছোট কৃশ সুশ্রী ছেলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে—মা কাঁদছে বলে।

সবার সঙ্গে শ্মশানে গেলাম। ফিরে এসে বাকি রাতটা সে বাড়িতেই কাটালাম। আর জেগে খালি বেণুর কান্না শুনলাম।

শুধু প্রচুর নয়, অবিশ্রান্ত!

সকালবেলা পা যেন আর চলছে না—বিকাশকে খবর দিতে হবে। হয়তো নিষ্ঠুরের মতো বলবে—ভাবনা কি? স্বামীর লাইফ ইন্‌সিওরেন্সে দেদার টাকা আছে—প্রকাণ্ড বাড়ি। দেখিস, ঠিক মোটা হয়ে যাবে এবার নিরামিষ খেয়ে-খেয়ে। তারপর কাশী যাবে।

রাস্তায়-রাস্তায় করতাল বাজিয়ে কে এক বুড়ো হরিনাম করে ভিক্ষা করছে—কাঁধে একটা ঝুলি।

চমকে উঠি—আরে কবরেজমশাই যে! যিনি আমাদের মেস-এর নিচের তলায় পিত্তশূলের বড়ি বেচেন।

ফোকলা মাড়ি দুটো বার করে কবরেজমশাই বললেন—আর কটা দিনই বা আছি বাবা, হরির নাম করে যাই।

ট্র্যাম কণ্ডাক্টারের সঙ্গে চেনা ছিল—ডাকলে। উঠে বসলাম।

কতদূর এগিয়েছি, পিছন থেকে কে বললে—যদি কিছু দেন। চেয়ে দেখি—লোকটার হাতে একটা জাপানী-বাক্স—চারদিক আটকানো পেরেক দিয়ে, মাঝখানে পয়সা ফেলবার ফুটো। ধারে আঠা দিয়ে একটা কাগজ মারা—তাতে ইংরিজিতে লেখা: 'গরিব ছাত্রদের ফণ্ড।'

মাথার চুলগুলি সব কেটে ফেলেছে—দাড়ি-গোঁফ কামানো, তেমনি খালি পা, পরনে ও গায়ে ছেঁড়া কাপড় জামা—কোত্থেকে যোগাড় করেছে কে জানে—বিনোদ এ আরেকটা মন্দ ফিকির করেনি। পকেটে যা কয়েকটা পয়সা ছিল বাক্সে ফেলে দিলাম। আরও অনেকে দিলে।

এর পর বিনোদের বেজায় অসুখ করে বসল—ভেদ বমি, জ্বর, সব কিছু। দু'দিনেই যাবার দশা।

বললাম—তোমার পারুলকে একটা খবর পাঠাই। ও আসুক।

ও আমার হাতটা কপালের উপর রেখে বললে—বাড়িতে একটা তার

আর কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে বল বিকাশকে।—আমার মা আর বউ চলে আসুক।

—বউ ?

—হ্যাঁ। নাম নগবালা।

ওর মা আর বউ এল দু'দিন বাদেই। অবস্থা বেশ সঙিন হয়ে আসছে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, আপিস নেই—অখিলবাবুরও না।

ওর মা খালি কাঁদে, কিন্তু ওর বউ একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করে না। খালি চুপ করে বসে থাকে।

বিকাশ বলে—আমার হাত থেকে কোনো রুগীকেই যম ছিনিয়ে নিতে পারেনি। এবার বোধ হয় প্রথম নেবে। বোধ হয় বেণুর অভিশাপ লেগেছে।

সকালবেলা আশ্চর্য রকম অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেল। বিনোদ জ্ঞান পেয়ে ওর মা আর বউকে চিনতে পারলে।

একলা পেয়ে বিকাশকে বললাম—এ কেমনতর বউ, ভাই ? মরতে চলেছে দেখে একটুও কাঁদলে না, ভালোর দিকে দেখে একটু খুশিও হল না। একটি কথা কইল না পর্যন্ত !

বিকাশ বললে—ও যে বোবা।

—বোবা ? বলিস কি ?

—হ্যাঁ।

—তবে পারুল ?

—দূর বোকা। তাও বুঝি বুঝতে পারিসনি ? পারুল বলে কেউ নেই তাকে ও মনে-মনে রচনা করেছে। তাই তো পারুল বিয়ে করেনি। তাই তো ওর সঙ্গে মিলনের জন্যে চিরন্তন কাল দুঃখের তপস্যা করছে।

প্রবোধের বাড়ির লণ্ঠনটা—আবার।

বৈঠকখানায় ঢুকলাম, বনজ্যোৎস্না টেবিলের কাছে চুপচাপ বসে আছে। কি লিখবে তাই ভাবছে যেন। আঁচলটা তেমনি পায়ের কাছে লুটোনো। বললাম—মুসোলিনি কেমন আছে ?

বনজ্যোৎস্না লেখার থেকে চোখ না তুলেই বললে—এইমাত্র ওঁরা ওকে শ্মশানে নিয়ে গেলেন। ভালোই আছে।

॥ মৈত্রেয়ী ॥

তারপর ইউনিভার্সিটিতে এসে গেলাম। ঠিক পড়তে কি?—না কোনো কাজ ছিল না বলে?

মনে হয়, ওর সঙ্গে দেখা হবার যেন দারুণ দরকার ছিল। নিরালা কোণে লাস্ট বেঞ্চিতে দেখা। যে মোটা বইটা নিবিষ্টমনে পড়ছে সেটা সাহিত্যিক জমাদারদের মতে নোংরা। আমার হাতের উপর ওর শির-ওঠা শীর্ণ হাতখানি তুলে দিয়ে বললে—কত জ্বর আছে বলতে পারেন?

—ঐ বিতিকিচ্ছি বইটা পড়ার দরুন হয়তো। চলুন বাইরে—

ভুঁচা প্রোফেসার তার ওঁচানো গোঁফ ফুলিয়ে তাকায় একবার। মৈত্রেয়ীও তাকায় হয়তো। ঠিক তাকানো নয়, একটু যেন সজাগ হয়ে ওঠা। লাস্ট বেঞ্চিটা গরিব, কানা হয়ে গেছে।

আমরা বেরিয়ে যাই।

বলি—আপনাকে আমি দেখেছি আগে, ঠিক ভালো জায়গায় নয়।

সৌম্য একটু হাসে, বলে—অভিযোগ করছেন না নিশ্চয়ই। কেন না—

—কেন না আমিও সেই পাড়ারই বাসিন্দা। এত সস্তায় আর কোথাও ঘর পেলাম না বলে।

—কি করে চালান?

—আগে এক জায়গায় টিউশনি করতাম—সংস্কৃত। ইস্কুলের ছেলে। তিন মাস যায়, মাইনে দেবার নাম নেই—বলে, পুজোটা এসে গেলেই পুরোদমে তিন মাসেরটাই পাওয়া যাবে। তাও যখন পেরিয়ে যাচ্ছে, তখন কোমরে কাপড় কেছে বসে গেলাম ভুল শেখাতে! এতদিন ধরে যা সব শিখিয়েছিলাম, সব বেমালুম বাতিল করে আঠারো দিনে এইসা ভুল শিখিয়ে দিয়ে এসেছি ভাই, যে বেচারা ছেলে ছমাসেও তা ভুলতে পারবে না। এখন একটা পানের দোকান খুলেছি। চলুন না আমার দোকানে। পান খান?

—প্রচুর। শুধু খাই না, করিও।

পরে বলি, আস্তে—আগে মাঝি ছিলাম। একটা ডিঙি ছিল—স্রোতের শ্যাওলা। ফুরফুরে ফড়িং।

সৌম্য হঠাৎ কৌতুহলী হয়ে বললে—তার আগে?

—রাস্তা খুঁড়েছি, বস্তা টেনেছি, মোটরে-মোটরে টক্কর লাগিয়েছি, চাকরির উমেদার হয়ে পথে জিরিয়ে-জিরিয়ে পায়চারি করেছি। একবার লাঙলও ধরেছিলাম বাগিয়ে।

—তবু পেলেন না তো তাকে?

—কাকে?

—নোফালিস্‌-এর নীলফুল, বোয়ার্‌-এর শ্বেতহংস। চলুন, পকেটে সাড়ে-তিনটে টাকা আছে—একটা বই কিনি গে। টাকা তিনের মধ্যে—রাতের খাওয়ার জন্যে গণ্ডা আষ্টেক না রাখলেই নয়। সমস্ত দিনটা কিছু যায়নি পেটে।

কেমনতর যেন। সোজা চলতে গিয়ে ডান পাশে হেলে, পায়ের চটিটা পিছনে ফেলে এসেছে, সামনে অনেকদূর হেঁটে এসে তবে টের পায়, সোজা রাস্তায় না গিয়ে ঘুর-পথে বেঁকে-বেঁকে চলে—কোথাও যেন যাবার নেই—বুকের উপর জামার সমস্তগুলি বোতাম খুলে রাখে।

চেনা দোকানদার। মুখ খুশি করে বলে ওঠে—আজকের ডাকে এই বইটা এল। আপনার জন্য রেখে দিয়েছি—

প্রিয়ার লতানো পেলব হাতখানি যেমন করে ছোঁয়, নামিয়ে রেখে দিতে ইচ্ছে করে না। দুঃখী যেমন মদের বোতলটা বুকের কাছে টেনে নেয়।—সৌম্যর দুই চোখ সুখে ফুলে উঠল।

পকেটটা উজাড় করে ঢেলে দিয়ে বললে—বাকি দামটা দু'একদিনেই দিয়ে দেবার চেষ্টা করব। আর নেই।

দোকানদার হয়তো একটু আপত্তি করে। আমি দিয়ে দিই বাকিটা।

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে কোন পুরোনো চেনা বন্ধু যেন ওকে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। তেপান্তরের মাঠের পারের কার যেন স্নেহস্পর্শ—বহুদূরের কোন তুষারাবৃত আকাশের সুস্নিগ্ধ অভিবাদন! কার যেন করুণ একটি দীর্ঘশ্বাস—ওর কাছে সহানুভূতি চায়—অতি দূর থেকে কে যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

পথে নেমে বলি—রাত্রে কি খাবেন তা হলে?

ও বলে—আজ রাত্রে বিধাতা যেমন অন্ধকারে তাঁর হৃদয় মেলে দেবেন তারার অক্ষরে, তেমনি আমার এই বন্ধু তার হৃদয় মেলে ধরবে আমার আতুর চোখের সামনে। হয়তো বা আলো নিবিয়ে দেব। হয়তো বা আর পড়তে পারব না। কিন্তু সমস্ত প্রাণে কি প্রগাঢ় উত্তাপ, কি অকূল পরিচয়, কি সুদূর ভালোবাসা! কত রাত আমার এমনি কেটে গেছে।

আবার সেই চলা, এঁকেবেঁকে, তেরছা টিকটিকির মতো, পথের কুকুরকে অকারণে একটা লাথি মারে, ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে কোনো দিকে লক্ষ্য না করে ছুঁড়ে মারে, ইচ্ছে করে জামাটা টেনে একটু ছিঁড়ে দেয়। আমাকে হঠাৎ বলে—তুমি ভারি দরাজ, দিলদার। তুমি আমার এই খুশখতের পিওন। বলে আমার কাঁধে ওর লিকলিকে বাহুটি তুলে দেয়।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এ যেন ওর বিবাহ-গোধূলি! ওর হাতের সবুজ রঙের বইটি যেন ঐ সন্ধ্যাতারার মতোই আপন, অপরূপ। এ ওর বই নয়, যেন বউ! সোনা বউ!

আমার পানের দোকানে ওকে নিয়ে এলাম।

পুতলিকে বললাম—এক নতুন বাবু ধরে এনেছি, দেখ, এবার পছন্দ হচ্ছে?

সেই পুতলি—একটা চোখ কানা, আরেকটায় সেই আগেকার তন্দ্রালুতা। সেই চোখে অস্ফুট ভৎর্সনা পুরে বললে—কলেজ তো কখন কাবার হয়ে গেছে, এত দেরি হল যে? আমি কখন থেকে খাবার নিয়ে বসে আছি।

বললাম—মাতব্বরের মতো বকিসনি আর। দুটো থালায় দিস।

ছোট্ট পানের দোকান—কলেজের সামনেই। কলেজ থেকে পাড়াটা অনেক দূর, তাই পুতলি দুপুরে খাবার তৈরি করে এনে দোকানে রেখে দেয়। গিলে নিয়ে ঢিলে মেজাজটা বেশ শরিফ করে সফর শুরু করি—এই বরাদ্দ।

ভুল করে আমাদের গোঁফওলা প্রোফেসারটি—তাঁর ও-পাড়ায় নিয়মিতই গতিবিধি আছে—পুতলির দোরে টোকা মেরেছিল একদিন। ধুসো গোঁফ দেখে পুতলি ওর খসা খ্যাংরাটা নিয়েই তেড়ে এসেছিল। প্রোফেসারকে একটা নমস্কার ঠুকে দিয়েছিলাম।

মাচার উপর পুতলি আমাদের জন্যে একটু জায়গা করে দেয়। পা ঝুলিয়ে

বসি দু'জনে। বললাম—সিংহাসনে বসে বেড়ে কারবার করছিস্! বেশ! কজনের মুখ পোড়ালি ?

থালাটা থেকে তুলে সৌম্য একটু খায় কি না-খায়, নিবন্ত দিনের আলোয় বইটার উপর বুক দিয়ে রয়েছে—মাঝখানটা খোলা, যেন বইয়ের হৃৎপিণ্ডের উপর কান পেতে আছে।

বলি—তখন আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করি, সৌম্য। বড়লোকের ছেলে নতুন বিয়ে করেছে—তাই তার প্রেমগুঞ্জনের জন্যে দোতলার ছাদে চিলে-কোঠা উঠবে। আমরা বাঁশ বেঁধে কাঁধে বালি-সুরকির ঝুড়ি নিয়ে প্রায় একুশজন লেগে গেছি। যে-দরজা দিয়ে দক্ষিণ থেকে হাওয়া এসে নববধূর খোঁপা এলো করে দেবে—সে দরজা আমরাই বানালাম। পুবের জানলাটা এমনি করে বসালাম, যাতে শুয়ে-শুয়েই বর-বধূ ভোরের ডুবন্ত শুকতারাটি দেখতে পায়, ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি করে দিলাম উত্তরের দেয়ালে, ভীতু দুটি চোখ রেখে লাজুক বউ ওর স্বামীকে দেখবে কখন ঘরে ফিরে আসে—বুকের ঘাম ঢেলে-ঢেলে শ্বেত পাথরের মেঝে শীতলপাটির মতো শীতল করে দিলাম।—তোর লখিয়াকে মনে আছে, পুতলি ?

পানের উপর চুনের কাঠিটা বুলোতে-বুলোতে পুতলি বলে—তা নেই আবার!

—লখিয়ার তখন সবে বিয়ে হয়েছে, তাই ওর প্রাণ সব চেয়ে টাটকা। মেঝের ওপর এনে ইঁট গাদা করে, আর ফিসফিসিয়ে সখী সুখীকে বলে— টমরুর চুমুর মতো মিষ্টি কি ওদেরও? পরে লখিয়ার কি হয়েছিল, জানো সৌম্য ? একটা আধ-মনি ইঁটের পাঁজা তুলে আনতে গিয়ে ঘামে ভেজা বাঁশ পিছলে সটান মাটিতে পড়ে গেল—আর উঠল না। টমরুর চোখের জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওর মাথা ফেটে রক্ত ছুটল—ওর সিঁথির সিঁদুরের মতোই ডগডগে।—সেই, কাজে ইস্তফা দিয়ে এলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল খানিকটা সদ্য রক্ত মেঝেটার ওপর মেখে দিয়ে আসি। ও তো নববধূটির এক হিসেবে সখী, ও-ও নববধূ। বড়লোকের ঘরের নতুন বউটি যেন এই ছোটলোকের ঘরের মজুর-বউটির জন্যে একটু অন্তত চোখের জল ফেলে। গামছা দিয়ে গায়ের বালি মুছে ফেলে রাস্তায় নেমেই পুতলির সঙ্গে দেখা। কানা পুতলি। আমার হাতটা ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বললে —এতদিন কোথায় ছিলি? আমি

তোর জন্যে এ দু'বছর ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরেছি—কলকাতার কোনো গলি, কোনো কারখানা বাকি রাখিনি।— এমন কথা কোনোদিন শুনেছ, সৌম্য ? টমরুর ঐ বুক-ফাটা আর্তনাদের মতোই কি বিস্ময়কর নয় ?

সৌম্যর এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই, কৌতূহল নেই—কোলের কাছে যেটুকুন গ্যাসের আলো পড়েছে তাইতেই ও দূর নরওয়ের সুনীল ফেনিল জলতরঙ্গের স্বপ্ন দেখছে—আফ্রিকার সেই গৈরিক তাপসী বন্ধ্যা মাটির স্বপ্ন—সাইবেরিয়ার নির্বাসিত নির্যাতিত বন্দী-বীরের—

পুতলি বললে—তা নয় তো কি ? মনে প্রাণে তোমাকে চেয়েছিলাম বলেই তো একদিন হঠাৎ দেখা পেয়ে গেলাম। সেদিন টমরুর কান্না আমার কানেও সেঁধোয়নি। সেবার বারো বচ্ছর পর গাঁয়ে গিয়ে দেখি পলাশপুকুরের পাড়ে এক পিটুলি গাছ দাঁড়িয়েছে—সবাই গোড়ায় তেল সিঁদুর মাখে, ডাব নারকেল দেয়—বলে কিনা, যা-কিছু মনে করেই ওর ডালে সুতো বেঁধে দেবে, তা যাবে অব্যর্থ ফলে। কাপড়ের সুতো ছিঁড়ে তক্ষুনি বেঁধে দিলাম, চট করে মনে পড়ে গেল, হে দেবতা, সেই বাবুটির যেন আবার দেখা পাই—যে আমাকে গোলাপী জামা কিনে দিয়েছিল। সেই জামা আজও আমার বাক্সে আছে—ধুইনি।

হাসতে পারি না, ঠাট্টা করতেও মন ওঠে না। ও-ই আমার পড়া চালায়, তারই জন্য বোধ হয়।

বলে—এবার আর পায়ের জুতো হয়ে নয় যে, ইচ্ছে করে ফিতে খুলে পালাবে। পায়ের ধুলো হয়ে লেগে থাকব।

—ধুলো ধুয়ে ফেলতে কতক্ষণ ? কিন্তু বলি না।

বললাম—ঘরে যাবে না, সৌম্য ?

ও চমকে উঠল।—রাত হয়ে গেল ঢের। একটা মোমবাতি কিনে দাও ভাই। তিনটে, ঘুম তো শিগগির আসবে না। চল আমার ঘরে।

ঘর তো নয়, ছোটখাটো পৃথিবী ! তেমনি এঁদো, তেমনি ভ্যাপসা।

হতচ্ছাড়া ঘরটা—দেয়ালে নোনা ধরেছে, চারদিকে অতিকায় কতগুলি আলমারি—কাঁচগুলি প্রায়ই সব ভাঙা, সারি-সারি রাশি-রাশি বই সাজানো এলোমেলো করে—মেঝের উপর এক গাদা বই টাল করে ফেলা—হিজিবিজি।

কোণে ক্যানভাসের একটা ইজি-চেয়ার, চটটা ছিঁড়ে গেছে, তারই উপর মোটা একটা নীল পেন্সিল।

মোমবাতি জ্বালাই।

ও বললে—রুশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের কোলাকুলি দেখ, ফ্রান্সের সঙ্গে ইটালির—আর ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের, নরওয়ের সঙ্গে স্পেনের কি অপার বন্ধুতা! অদ্ভুত!

চোখ ফেরানো যায় না—ওর ভাঙা ঘরে অলকানন্দা যেন মুখর, উদ্বেল হয়ে উঠেছে—কান পেতে শুনতে হয়, প্রাণ পেতে।

তাকের বইগুলি অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের করতলের মতো সস্নেহে স্পর্শ করে ও বলে বিভোরের মতো—বাঙলার কোণে বসে বিপুল জগতের সঙ্গে কথা কই, টলস্টয় মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে—ডষ্টয়ভস্কি কাঁধের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে মধুর করে হাসে, রাতের খাবারটুকু গোর্কির সঙ্গে একত্র খাই ; হামস্থন হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে বন্ধুর মতো গল্প করে যায়—জ্বরো কপালে বোয়ার তার কোমল হাতখানি বুলিয়ে দেয়—নীল সাগরের কল্লোলিত মায়া তার চোখে, ফ্রাঁন্স কতদিন আমার এই ঘরে বসে জিরিয়ে গেছে। সেদিন তো কালো ঝড়ো মেঘের মতো ব্রাউনিঙ্ এসেছিল—সঙ্গে ব্যারেট, রুখু মাথা, রোগা চোখে অপূর্ব বিষণ্ণতা! ঘরে ঢুকেই বললে—আমাদের একটু জায়গা দিতে পার এখানে? কত দূর থেকে পালিয়ে এসেছি। তিনজনে মেঝের ওপর বসে কত গল্প করলাম—আমার ঘর যেন ইটালি! সব স্বপ্ন!

পরে চেয়ারের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বলে—জ্বরটা জোরেই এল কিন্তু। মেঝের ওপর কোনো রকমে শোবার ব্যবস্থা করে দেবে ভাই? আলোটা শিয়রেই জ্বলুক।

বলি—কাদের বাড়ি এ? কি করে চলে তোমার?

কতগুলি বইয়ের উপর মাথাটা রেখে বলে—বাড়ি অন্যের, ভাড়া নিয়েছি এ ঘরটা, হোটেলে পয়সা দিয়ে খাই। চলে কি করে? দিদি মাসে ত্রিশ টাকা পাঠান—তাইতেই—উনত্রিশ টাকার বই কিনি, ধার করি, ফের বই বেচে ধার শুধি।

গোঙাতে-গোঙাতে বলে—বাড়িতে মা আর ছোট বোন, আট পহর মৃত্যুর মুখের দিকে চেয়ে আছে। ঝড়ে আটচালাখানা লোপাট হয়ে গেছে, নিজের

জন্যে দুটো ফুটিয়ে নিতে গিয়ে মা দু'হাত আর পা পুড়িয়ে ফেলেছে—ছোট বোনটা আজ চিঠি লিখেছে।

থেমে বলে—ফুঁ দিয়ে সব পুঁজিপাটা উড়িয়ে দিয়ে বাবা চলে গেলেন—রেখে তাঁর রিক্তিতা, রোগ আর লালসা। রোগ গচ্ছিত রেখে গেলেন আমার বুকে, আর লালসা দিদির। ছিঃ, তাকে কি সত্যিই লালসা বলে ?

—জ্বরটা যদি এসেই গেল, তবে আলোটা নিবিয়ে দিই, এবার ঘুমোও।

—পুড়ে-পুড়ে আপনিই নিবে যাবে। এখনো মাথা তেমন ধরেনি, খানিকক্ষণ পড়া যাবে। এই জানলা দিয়েই হয়তো কোনো ব্যথিত সমুদ্রের নিঃশ্বাস ভেসে আসবে—কোনো একটি মেঠো মেয়ে তার মিঠে দুই চোখে আমার দিকে চাইবে— অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না বাতিটা নেবে। তারপর—

হঠাৎ বললে—ফ্রেঞ্চ শিখছিলাম ভাই। ইচ্ছে করে রাশিয়ান শিখি। এদেশে পাওয়া যায় না মাস্টার ?—আমি রাশিয়ায় যাব, বরফের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাব মাইলের পর মাইল, তারপর আমাকে কেউ বাঁচাবে।

যেন ক্ষেপে ওঠে। ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো চক্ষু ধারালো বিষাক্ত হয়ে ওঠে। মনে হয়, ও যেন বন্দী প্রমিথিউস।

পচা পাড়া, বেজাত—সামনেই অভিজাত রাস্তা। একই মায়ের পেটের দুই ছেলে-মেয়ের কি অসম্ভব অপরিচয়—যেন কত কালের আখোটি !

এ একেবারে আলাদা রকমের জগৎ। নতুন আইন-কানুন সব—নতুন ধরনের নীতিজ্ঞান, নতুন নমুনার কুসংস্কার। সব কিছুর পরেই উদাসীন, নির্লিপ্ত—বৈরাগী, নিঃসম্বল !

বড় রাস্তা তার সদর দরজা দিয়েই জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে জড়ো করে এই চিপা গলিতে জাঁকজমক করে ভর-দুপুরে—আবার এই গলিটা থেকেই জঞ্জাল কুড়িয়ে নিয়ে যায় মাঝরাতে, লুকিয়ে—খিড়কির দোর দিয়ে।

কিন্তু সৌম্য এখানে কেন ? ও-ও কি সদাগর, অন্তত ও কি রাজপুত্র নয় ? ঐ যে শোভনাঙ্গী মেয়েটি রাত দুটো পর্যন্ত গ্যাসের তলায় বসে থাকে উদাসিনীর মতো—ওকে এসে ও কি জিগগেস করে ? হয়তো শুধোয়—তুমি কেমন আছ ? দোর পেরিয়ে পর্যন্ত ঘরে ঢোকে না।

মেয়েটি সারা রাত জেগেই বসে থাকে কোনোদিন। যেন দেয়াশিনী ও।

রাত প্রায় দশটায় ঝাঁপ বুজিয়ে পুতলি আসে, আঁচল দিয়ে বাতাস করতে করতে বলে—ভাত তো গামলার নিচেই ছিল, খেয়ে নিলে পারতে—

—তোর জন্যে বসে ছিলাম।

—বেশ লোক যা হোক, তুমি খেলে পরে তো আমার খাওয়া। এই নাও আজকের বিক্রি নিয়ে একুশ টাকা হয়েছে। পড়ার যা কিছু দরকারি, এবারে কিনে নাও কতক। হ্যাঁ গো, আজও সেই মুখপোড়া মাস্টারটা এক পয়সার পান কেনবার অজুহাতে ঘেঁষেছিল—বেহায়ার বেহদ্দ। ইচ্ছে হচ্ছিল দিই চুনকাঠিটা গালে বুলিয়ে।

মাচার উপর শুলে পুতলি পায়ের তলায় হাত বুলিয়ে দেয়, কখনো-কখনো লম্বা চুলে, ঘুমিয়ে গেলে ভেজা মুখটায়ও হয়তো।

বলি—এ-রকম ভাবে আর কতদিন, পুতুল ?

—তোমার ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মতো একটি বউ হবে, আমি তার দাসী হব, সেইদিন।

মাটিতে আঁচল পেতে ঘুমোয় মাদুর বিছিয়ে। বলে—কোনো গয়নাপত্র চাই না—না কোঠাবাড়ি, না-বা নাকের একটা নথ—শুধু তোমার বাঁ পাশে সর্ষে ফুলের মতো টাটকা, টুকটুকে একটি বউ হোক !—পরে আমি না হয় বউ-কথা-কও পাখি হব।

এ যেন খেলো পানওয়ালির কথা নয়।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠি—ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কে কাঁদে রে, পুতুল ?

—ঐ বামুন-দিদি—তিন রাত ঠায় বসে আছে দোর গোড়ায়।

কে ? যার দাওয়ায় সৌম্য একদিন উঠে এসেছিল ভুল করে ? কেন ?

মৈত্রেয়ীর সঙ্গেও কি দেখা হবার দরকার ছিল ? হয়তো নয় ! কিন্তু আজকের এই আনমিত হঠাৎ-ঝাপসা-করে-আসা আকাশ দেখে কেন ও মেঘ-রঙের শাড়ি পরে এসেছে ?

ও যেন বাঙলার মাটি—শ্যামল, সুশীতল।

নমস্কার করে বসলাম। একেবারে ঘাবড়ে গেল। পাশের দেয়ালের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে যেতে লাগল—যেন আমি প্রকৃতিস্থ নই।

ভাগ্যিস জিভের ডগায় কথা জুয়ালো—ঢোক গিলে বললাম—আপনি বনজ্যোৎস্নাকে চেনেন ?

ওর চোখ দুটির দিকে যত তাকাই, ততই ওর দৃষ্টি শ্লথ, শীতল হয়ে আসে। বললে—কে বনজ্যোৎস্না ? বনজ্যোৎস্না মিত্র ?

—হ্যাঁ, মিত্র। আমারও।

—চিনি। কবে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে ?—কোথায় ?

—পদ্মার ওপরে—নৌকোতে।

আরও বললাম—আপনি ওর ডুমুরের ফুল ছিলেন—ঈদের চাঁদ। বোর্ডিঙে যখন একসঙ্গে থাকতেন তখনকার অনেক গল্পও শুনেছি আপনাদের—

—কেমন আছে ও ? এখনো ঐ পদ্মার পারেই আছে ? ওর সঙ্গে কিন্তু আমার ভারি দেখা করতে ইচ্ছে করে—যাওয়া যায় না ওখানে ? ওর স্বামী নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দেবেন না। আমার নৌকোয় বেড়াতে খুব ইচ্ছে করে—মাঝ-নদীতে।

অনেকগুলি কথা বলে ফেলে একটু হাঁপায়, জামার তলা থেকে সোনার সরু সুতলিটি বার করে অনামিকায় জড়ায়—হাতের তালুটি ভেজা—দু'টি চোখে সমস্তটি হৃদয় যেন টলটল করে।

হঠাৎ বললে—আপনি রোজ-রোজ ক্লাশ থেকে পালিয়ে যান কেন ? একটুও স্থির হয়ে বসতে পারেন না ?

শ্যামল ঘনপল্লব অরণ্যের মধ্যে ঘনবল্লীর মতো ওর তনুলতা, পরনে মেঘ-ডুম্বুর শাড়ি—দু'টি চোখ দুরবগাহ !

—কেন, খুব নিঃশব্দেই তো যাই—টের পাওয়া উচিত নয় কারুর।

—প্রোফেসার পান না বটে, কিন্তু আমি বুঝি। লাইব্রেরিতে পড়েন বুঝি গিয়ে ?

—লাইব্রেরি ? কোন তলায় তাও জানি না—এমনি ঘুরে আসি একটু।

ও একটু হাসে, সে তো হাসি নয়, সম্বোধন ! আকাশের মেঘ যেমন মাটির দুর্বল দূর্বার পানে চেয়ে হাসে। আজকে এ-রকম মেঘ করে না এলে কখনও ওর স্ফুরিত ঠোঁটের কোণে হাসি ভেসে উঠত না, তার অর্থও থাকত না কোনো।

ওর দুটি চোখ যেন সাগরের দু-চামচে নীল জল !

একটি ভদ্রলোক—গায়ে মুসলমানি ছিটের পাঞ্জাবি, একচল্লিশ ইঞ্চি ঝুল, পরনের কাপড় কিন্তু প্রায় আট-হাতি—ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি লোলুপ নয়—কাতর, ভারি অসহায়! ঐ ঘুমন্ত মেঘের সঙ্গে ওরও চোখের আদল আছে। দরিদ্রতায় ভরা।

করিডোর দিয়ে যে-ই হেঁটে যায়, সে-ই উৎসুক হয়ে আমাদের দেখতে থাকে, কেউই নির্বিকার নয়—সামনে দিয়ে দু-তিনবার করে টহল দিয়ে যায়।

মৈত্রেয়ী একা ওদের যত না চঞ্চল করেছে—ওর পাশে আমাকে দেখে সবাই একেবারে উদ্ব্যস্ত, অস্থির হয়ে উঠেছে। গোবিন্দ পর্যন্ত ভাবছে—ঐ আট-হাতি খদ্দরের থান পরে ওরই দাঁড়াবার কথা মৈত্রেয়ীর পাশে—ক্লাশে প্রোফেসারের সঙ্গে অকারণ তর্ক করে বিদ্যে ফলিয়ে ও তো নিজের বিজ্ঞাপন আর কম দেয়নি। ডান হাতের আঙুল দিয়ে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি খোঁটে, চোখের পাতা পিটপিট করে, এমন ভাবে তাকায়—আমি যেন রোডস-এর পিত্তলমূর্তি : কলোসাস।

প্রোফেসারও একটু ঘেঁষে। মৈত্রেয়ীকে বলে যায়—শনিবারে আমার কাছে আপনার টিউটোরিয়্যাল। এই নিন নোটটা—হাতছাড়া করবেন না। খুব স্কেয়ার্স।

চলে গেলে বললাম—টিউটোরিয়্যাল-এ আপনি একাই পড়বেন বুঝি ওঁর কাছে। একা হলে খুব যত্ন নিয়েই পড়াবেন নিশ্চয়।

ও ফট করে বললে—আপনিও আসুন না ওঁর ক্লাশে। হ্যাঁ, খুব নেবেন। কেন নেবেন না? না, আপনাদের দরকার হয় না ও-সব কিছু।

সত্যিই। সেদিন মৈত্রেয়ী ক্লাশে আসেনি, প্রোফেসারের পড়া ভালো মতো জমলই না, সব ছেলেই কেমন উস্কখুস্কু, কোথায় যেন তাল কেটে গেছে— সব মিউনো, ম্যাজমেজে। তাই যতক্ষণ না মৈত্রেয়ীকে বারান্দায় পা ফেলতে দেখে—লঘু দু'টি পা—ততক্ষণ প্রোফেসার পায়চারি করে বেড়ায়। ক্লাশে ঢুকলেই ছেলেদের গোমড়া মুখ এক মুহূর্তে কোমল হয়ে আসে।

ভাব ভাষা পায়—কবিতার প্রথম লাইনটা থাপছাড়ার মতো খানিকটা শূন্যে ঝুলে দ্বিতীয় লাইনে ছন্দের সঙ্গতি পায়, সম্পূর্ণতা পায়।

যে-সব বিদ্যের বাহাদুরি দেখাবে বলে গোবিন্দ বাড়ি থেকে তৈরি হয়ে

আসে, সেগুলো খইয়ের মতো ফুটিয়ে-ফুটিয়ে ছুঁড়ে মারে, মাস্টারও বিদ্যে ফলাবার সুবিধে পায়। ওরা যেন আগে থেকে সল্লা করে এসেছে।

মৈত্রেয়ী তাই অবাক হয়ে শোনে—খাতায় কিছু-কিছু টুকেও নেয় হয়তো।

ছুটি হয়ে গেল, গোবিন্দ এখনও বাড়ি যাচ্ছে না কি রকম! ওর কি পড়ার আর জায়গা নেই যে একেবারে করিডোরের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই নিজেকে জাহির করতে হবে? মনে হয়, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কি যেন একটি কথা কইতে চায়।

কিন্তু কি কথা কইবে? বলবে কি, মিকাল-এঞ্জেলোর 'মালা ও মেখলা' কবিতাটি ভারি সুন্দর, ল্যাম্ ভারি দুঃখী ছিল—আপনিই শেলির 'উইচ অফ অ্যাটলাস!' কি কথা কইবে?

বললাম—আপনি তো এবার বাড়ি যাবেন। ট্র্যামে?

—হ্যাঁ। আপনি? পায়ে হেঁটেই নিশ্চয়।

ওকে রাস্তায় এগিয়ে দিই। হাত দেখিয়ে ট্রাম থামাই, ও ওঠে।

বলি—বনজ্যোৎস্নাকে ভুলবেন না।

ও শুনতে পায় না, চেয়ে থাকে। এবার আর নমস্কার করি না।

পানের দোকানের আয়নাটার দিকে চেয়ে থাকি একদৃষ্টে।

পুতলি কৌতূহলী হয়ে শুধোয়—কি দেখছ?

—নিজেকে। এই তেজী দেহটাকে। আর কিছুই চাই না পুতলি, চলতে পাই যেন—নিজেকে যেন টেনে নিয়ে যেতে পারি। নাই বা হলাম বেনে, নাই বা আড়তদার।

সৌম্যের বিষণ্ণ বিবর্ণ মুখ চোখে ভাসে—ও যেন ভাগ্যের বাজে রসিকতা। ও যেন অকারণ।

বলি—আর যেন এমনি প্রাণ থাকে—লেলিহান। আমি সমস্ত রুদ্ধদ্বারের শক্তি পরীক্ষা করব, সমস্ত অবগুণ্ঠনের শুচিতা—পা ফেলে যাব সকলের বুকে করাঘাত করে, করস্পর্শ করে।

ভুলে যাই যে পান বেচছে, সে মৈত্রেয়ী নয়।

মাঝে কিসের লম্বা ছুটি।

গতানুগতিক ভাবে একটা চিঠি এল—মৈত্রেয়ী চসার-এর নোট চেয়ে পাঠিয়েছে আমার কাছে! ঐটুকুই আব্রু, ঐটুকুই কৃত্রিমতা। পরে লিখেছে—বনজ্যোৎস্নার কথা সেদিন সমস্ত শোনা হয়নি। দয়া করে আসবেন একদিন। কালই আসুন না। না এলে কিন্তু ভারি দুঃখিত হব।

না এলে কিন্তু—এর পরে কি লিখে যেন কেটেছে কালি দিয়ে—আলোয় ধরে দেখি, লিখেছে—না এলে কিন্তু ভারি রাগ করব।

বেলা যেন ভাদুরে কুঁড়ে, কাটতে চায় না। কিন্তু সন্ধ্যা কাবার করেই গেলাম। চসার-এর নোট কোথায় পাব—গোবিন্দের কাছে চেয়েও লাভ নেই—সমস্ত হৃদয় বনজ্যোৎস্নায় ভরে নিলাম।

শাদাসিধে দোতলা বাড়ি, দোরের গোড়ায় আর সন্ধ্যাদীপ নয়—মৈত্রেয়ী নিজে।

মৈত্রেয়ী খুশি হয়ে বললে—সেই কখন থেকে আশা করে আছি। তবু এসেছেন যা হোক। ভাবলাম, চিঠিই পাননি হয়তো। আসুন ভিতরে।

নোটের কথা জিজ্ঞাসাও করে না।

আজকে ওর খালি দু'টি পা—আটপৌরে একখানা শাড়ি, গরিবের ঘরের মেয়ের মতোই নম্র, সলজ্জ। মাথার কাপড়টা শিথিল, চুলের সঙ্গে সেফটিপিন দিয়ে আঁটা নয়—গায়ে শাদা সেমিজ, মনিবন্ধ পর্যন্ত নামিয়ে দেওয়া ফুলহাতা ব্লাউজ নয়—ওর হাত দুটি দেখি, হাত দিয়ে নয়, চোখ দিয়ে ছুঁয়ে শীতল হই।

ওর পড়ার ঘরে আসি, ফিটফাট—ওরই মতো লক্ষ্মী ঘরখানা। বসতে দেয়। মা আসেন। বলে দিতে হয় না, উঠে প্রণাম করি। গল্প চলে। ছোট বোন খাবার নিয়ে আসে—গন্ধমাদন পর্বতের মতোই ভারি।

বলি—কে কোথায় আছে ডাকুন সবাইকে, সারা রাত বসে খাওয়া যাবে। মৈত্রেয়ীও আমার সঙ্গে মুখ নেড়ে-নেড়ে খায়।

কত কথা চলে—গ্রীক ট্রাজেডি, জোকাস্টা—পরে ওফিলিয়া, আরও পরে গ্রেচেন্।

মা মৈত্রেয়ীর কথা উল্লেখ করে বলেন—ও একেবারে একা পড়ে গেছে। ওকে তোমরা একটু সাহায্য করো কি পড়তে হবে না-হবে।

মৈত্রেয়ীর বাবা বুড়ো মানুষ—দরাজ হাসি—এমন চমৎকার মিশতে জানেন। আমি যেন কোথাও পেরেক হয়ে ফুটে রইনি—জলস্রোতের মতো

মিশে গেছি। উনি ঘাড় চাপড়ে বললেন—এই তো চাই, কলম যদি না বাগাতে পার হাতে হাতুড়ি তুলে নিও—লাঙল, লাগাম, লাঠি—যা হাত চায়। আমি তাই মনে করেই আমেরিকায় পালিয়েছিলাম।

বললাম—কিন্তু আপনি তো হাত ভরে টাকার থলে নিয়ে এসেছিলেন—কি তাঁর হাসি, জোয়ারের জলধ্বনির মতো—যেন তাঁর টাকার থলেটা মেঝের উপর উজাড় করে ঢেলে দিলেন।

মৈত্রেয়ী বললে—চলুন, ছাদে যাই। এ-ঘরে বনজ্যোৎস্না কক্‌খনো আসবে না।

ওর বাবা বৈঠকখানায় যেতে-যেতে শুধু বললেন—রাতে ওঁকে ভাত খাইয়ে তবে ছেড়ো। পড়া-পত্রের সব খোঁজখবর নিয়ে রেখো, মা। হ্যাঁ, কাঞ্চন, বিশেষ কোনো কাজ না থাকলে এখানে তো থেকেও যেতে পার আজ। তোমার সঙ্গে ওয়ালটার পেটার সম্বন্ধে কিছুক্ষণ না হয় বিতণ্ডা করা যেত এর পরে। তুমি যে-রকম ভক্ত পেটারের!

মৈত্রেয়ী আমাকে ছাদে নিয়ে আসে, চেয়ার না এনে একটা পাটি বিছিয়ে দেয় শুধু। আলিসায় একটি সলজ্জা রজনীগন্ধা মৃদু কটাক্ষ করে, তারারা পরস্পরের কানে ফিসফিস করে কি কথা কয়, সবাই কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে পড়ে আমাদের দেখে।

মৈত্রেয়ী একটু দূরে বসে—ওর সোনার দুটি চুড়ি হাত নড়ার সঙ্গে একটু-একটু বাজে—তাই শুনে বাতাস একটু সচকিত হয়। হঠাৎ ছাদে এসে রজনীগন্ধার কানে কি ইঙ্গিত করে যায়। মৈত্রেয়ী বলে—বলুন।

—আমি তখন মাঝি ছিলাম—

—মাঝি ছিলেন? তার মানে?

—তার মানে একটা ডিঙি ছিল, আমি বৈঠা টেনে-টেনে পদ্মা ধলেশ্বরী মেঘনা শীতললক্ষ্যা পাড়ি দিতাম।

—খুব চমৎকার তো? ভয় করত না?

—করত না আবার! ভয় করত বলেই তো ভালো লাগত।

—কেন মাঝি ছিলেন? কেন? বলুন না।—যেন কান্নার সুর!

বলে চলি—নদীর ওপরেই থাকতাম, নৌকোয়। নিজেই রাঁধতাম, নৌকো জলে ভাসিয়ে দিয়ে হুঁকো নিয়ে বসে থাকতাম। সেবার পুরো তিনদিন

নৌকো নিয়ে টো-টো করেছি, একটাও জুৎসই কিরায়া পাইনি, সাহানার স্বরের মতো আমার না' ভেসে চলেছে। ঝড় উঠবে বলে বন্দরে এত্তেলা দিয়েছিল, তাই ভীতু বৌটির মতো নৌকোকে পাড় ঘেঁষিয়ে নিয়ে চলছি। বৈঠা টানি আর চারদিকের অপূর্ব তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখে মনে-মনে মেতে উঠি, গ্রহ তারা আকাশ অন্ধকার তরু লতা সবাইকে সম্বোধন করে ধন্যবাদ জানাই এই স্বাস্থ্য এই পরমায়ু পেলাম বলে, নদীস্রোতকে নমস্কার করি—প্রাণে এই চলার বেগ এসেছে বলে। শঙ্খচিল ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়—তাই দেখি।

অনেক দূর চলে এসেছি নিশ্চয়ই—পুব কোণে কালো মেঘের তাল পাকাচ্ছে কে—ঘুমন্ত করুণ গ্রামখানি, অবগুণ্ঠিতা বধূটির মতো, বিরহরাতের নেবানো বাতিটির মতো! পাড় থেকে কারা আমাকে ডাকলে—সারা রাত তাদের আজ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে—এদিকে ওদিকে, জল যেদিকে ঠেলে, তল যেদিকে ডাকে।

বললাম—ঝড় উঠবে যে, ইস্টিশানে লাল বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

মেয়েটির আবাঁধা চুলের সঙ্গে শাড়ি ওড়ে, বলে—উঠুক ঝড়। ঝড়কে কি ডরাই?

না, ও যেন ঝড়কে ভালোবাসে—সেই ভরসায়ই নৌকোয় উঠল। কিন্তু ঝড় এল না। পুঞ্জিত নিঃশব্দ প্রশান্ত দুঃখের মতো সান্দ্র স্থনিবিড় অন্ধকার।

মৈত্রেয়ী বললে—বেশ আস্তে-আস্তে বলুন, এখানেই থেকে যাবেন না হয়।

বলি—কলকাতায় ভালো প্র্যাকটিস জমল না প্রবোধের। গাঁয়ের একটা হেডমাস্টারি নিয়ে চলে এসেছে। সঙ্গে ওর খুড়তুতো ভাইটি—যিনি আগে এই শহরেরই একজন কণ্ট্রাক্টার ছিলেন—হঠাৎ সেই গাঁয়েই এক কবিরাজি ডিসপেন্সারি খুলে বসল। প্রবোধের আরও দুটি ছেলে হয়েছিল—ক্রিম আর সানইয়াৎ—বনজ্যোৎস্নাই নাম দিয়েছে। ওরাও মারা গেছে।

—মারা গেছে? কিসে?

মৈত্রেয়ীর বুকে মাতৃব্যথা উদ্বেল হয়ে ওঠে যেন।

—সেই একই ব্যারামে। তেমনি—চোখে ঘা হয়ে, পচে নীল হয়ে। সেদিনকার অন্ধকার নিরালা রাতে নৌকো থেকে উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ে বনজ্যোৎস্না অস্ফুটস্বরে পদ্মার কাছে হয়তো একটি সুস্থ নিষ্কলঙ্ক সন্তান কামনা

করছিল। বললাম—কি দেখছেন নিচু হয়ে? ও শুধু বললে—নিজের মুখ!

মৈত্রেয়ী অস্থির হয়ে বললে—প্রবোধবাবুরও খুব অসুখ বুঝি? তাই ওঁকে নিয়ে রাত্রে নৌকো করে হাওয়া খেতে এসেছিল?

—যাকে নিয়ে এসেছিল সে অসুস্থ বটে, কিন্তু সে প্রবোধ নয়। প্রবোধ তো ওকে জ্যোৎস্না বলে ডাকে, কিন্তু এ ওকে বন বলেই ডাকছিল। এ ওর ঠাকুরপো—সেই কণ্ট্রাক্টার।

মৈত্রেয়ী একেবারে অবাক হয়ে যায়, চেঁচিয়ে ওঠে—বলেন কি?

—আমি তো বলেছি কিন্তু ওরা সারা রাত একটি কথাও বলতে পারল না। কত বাজে গল্প করল—অন্ধকারে ঘুমন্ত গ্রামগুলিকে কি অপূর্বভাবে অপরিচিত লাগছে, কয়টি তারা একসঙ্গে গোনা যায়, এখানে ডুবলে কোথায় কতদূরে মৃতদেহটা গিয়ে ভেসে ওঠে, ঝড় উঠবে না অথচ এমনি লাল বাতি জ্বেলে ভয় দেখাবার কি মানে—এই সব নিয়েই যত কথা। কিন্তু এই অন্ধকারে নদীতরঙ্গের ওপর ওরা তো এই সব কথাই বলতে আসেনি। বনজ্যোৎস্না একবার জলের মধ্যে দু'খানি পা ডুবিয়ে বসেছিল, ছেলেটি বললে—অসুখ করবে, পা তোল। বনজ্যোৎস্না বললে—করুক। কিন্তু ঐ কথাটিই ওরা অন্য কি ভাষায় যেন ব্যক্ত করতে চায়, বলা যায় না। বনজ্যোৎস্না বলে—তোমার এবার ঘুমোনো উচিত, ঘুমোও। তার উত্তরে ছেলেটি বলে—অন্ধকারে নদীকে কি আশ্চর্য দেখায়! এই কি ঐ কথার উত্তর? নৌকোর দোলায় ছেলেটি ঘুমিয়েই পড়ে—পাটাতনের ওপর, বনজ্যোৎস্না বাইরে চেয়ে থাকে। একটু ছোঁয় পর্যন্ত না। আমাকে বলে—ভোর না হতেই কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ো, যেখান থেকে তুলে এনেছিলে আমাদের—

মৈত্রেয়ীর হাতের সঙ্গে আমার হাতের কখন যে চেনা হয়ে গেছে, জানি না। বললে—তারপর?

—তারপর বনজ্যোৎস্নাকে ওর বাড়ি পৌছে দিয়ে এলাম, আর ছেলেটি ওর খড়ের ঘরের ডিসপেন্সারিতে গিয়ে উঠল।

—তারপর?

—তারপর—এবার বাড়ি যাব।

—না, এখানেই থেকে যান, এত রাত্রে কোথায় যাবেন? শেষ করে যান গল্পটা—বনজ্যোৎস্না কেমন আছে?

—না, যেতেই হবে আমাকে।—মানুষ আবার কেমন থাকে? এই-এক রকম।

করিডোর-এ আলাপ করার সুবিধে হয় না সব সময়—তাই লিফটম্যানের সঙ্গে ঠিক করা গেছে। ক্লাশ-ঘণ্টার মধ্যে দু'জনে লিফটে সোফাটার ওপর বসে কথা কই—লিফটম্যান তিন-তলা আর চার-তলার ফাঁকে লিফট বন্ধ করে আমাদের লুকিয়ে রাখে একটু। কেউ ঘণ্টা দিলে এমন বেমালুম ভাবে উঠে আসি বা নামি যেন হঠাৎ আমাদের দেখা হয়ে গেছে। মৈত্রেয়ীর সঙ্গে এতটা বোঝাপড়া—এতটা জানাশোনা।

সেদিন বারান্দায় দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল ছুটির পর।

মৈত্রেয়ী বললে—ঐ ভদ্রলোকটিকে চেনেন, ঐ নীল র‍্যাপার গায়ে—

—কেন?

—লোকটি ভালো নন।

—তার মানে? ভালো নন, কি করে বুঝলেন? খুব মনীষা আছে তো আপনার?

ও বললে—আলাপ-সালাপ কিছু নেই, চিনি না শুনি না—আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম চুপ করে, হঠাৎ কাছে এসে বললে—কাঞ্চনবাবুকে ডেকে দেব? কি অন্যায় বলুন তো?

—কেন, কিসের জন্যে অন্যায়? ও আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, ওর তো কোনো রকমেরই ইনট্রোডাকশান নেই—ও তো আমার মতো সৌভাগ্য-ক্রমে বনজ্যোৎস্নার সঙ্গে পরিচিত নয়। ও যদি আপনার সঙ্গে কথা কইতে চায় —তার যদি কোনো সুন্দর ও সহজ সুযোগ না মেলে—তবে কি করে আপনার কাছে এসে দাঁড়াবে শুনি?

—কথা কইবার কিই বা দরকার?

—আপনার হয়তো নেই, কিন্তু ওর দরকার আছে নিশ্চয়ই। আমি ওর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।

মৈত্রেয়ী অস্ফুটস্বরে বললে—না, না। কি নাম ওঁর?

—গোবিন্দ।

মৈত্রেয়ী হেসে উঠল, নামটা ওর পছন্দ হয়নি।

—নিশ্চয়ই আলাপ করিয়ে দেব। শুধু নাম শুনেই এত বিতৃষ্ণা, গল্পের এক লাইন পড়েই ভালো হয়নি? তবে যাদের নাম সজনীকান্ত, হেরম্বচন্দ্র, রমণী মোহন—তাদের সঙ্গে আপনাদের মতো কোনো শিক্ষিতা আলোকপ্রাপ্তা মেয়ে কথাই কইবে না? অন্যায় যত, সব বুঝি ওরই—আপনার আর কিছু নয়। ডাকি গোবিন্দকে।

গোবিন্দ এসে দাঁড়াল—দুই চোখে অভূতপূর্ব বিস্ময়, অথচ নম্রতা—সহসা ও যেন অত্যন্ত সুন্দর হয়ে গেল। ওর অদ্ভুত বেশভূষা, অদ্ভুত মুদ্রাদোষ—সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে ওর মুখে হঠাৎ অনিন্দ্য কান্তি এসে গেছে। সমস্ত মুখে আর কোনো কাঠিন্য নেই, হাসি। গোবিন্দ যে হাসতে জানে, জানতাম না।

বললাম—এঁকে তোমার নোটগুলো দিতে পারবে, গোবিন্দ?

গোবিন্দ খুশি হয়ে বললে—কেন পারব না? বা রে, খুব পারব। আজ সমস্ত দিন দান্তের সম্বন্ধে একটা খুব ভালো নোট টুকেছি—নিন, পড়তে পারবেন তো হাতের লেখা?

মৈত্রেয়ী খাতাটা নেয়, দু'চারখানি পাতা উল্টোয়, বলে—কেমন সুন্দর হাতের লেখা আপনার—আপনি খুব পড়েন। দান্তে তো এখনো শুরু হয়নি ক্লাশে।

মৈত্রেয়ীর চোখের ছোঁয়াচ লেগে গোবিন্দের চোখও অগাধ রহস্যে ভরে উঠেছে। বললে—না, কি আর পড়ি, বারো ঘণ্টাও হয় না। রোমান্টিক কবিদের সম্বন্ধে একটা নতুন বই এসেছে লাইব্রেরিতে—দেখবেন পড়ে, অদ্ভুত রকমের লেখবার কায়দা।

এমন সুন্দর করে গোবিন্দ কথা কইতে পারে, কে জানত আগে? কপালের থেকে চুলগুলি মাথার উপর তুলে দেয়, তাও অতি সুন্দর করে। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গীটিও আজ হঠাৎ সুন্দর হয়ে গেছে। ওর মুখ লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে—দুই চোখে তৃপ্তির অগাধ সুখ যেন।

পড়া-শোনার বিষয় আরও অনেক কথা হয়।

ট্র্যামে করে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে বাড়ি যাচ্ছি, দেখি—ফুটপাথে গোবিন্দ। বলি —এস, এস, গোবিন্দ।

গোবিন্দ ছুটল চলন্ত ট্র্যাম ধরতে, কিন্তু খানিকদূর ছুটে নাগাল না পেয়ে থেমে গেল। তাই দেখে মৈত্রেয়ীর মুচকে-মুচকে হাসি।

ট্র্যাম থেকে নেমে গেলাম।

উবু হয়ে পড়েছে এমনি বাড়ি—রোয়াকের উপর দাঁড়িয়ে ডাকি—গোবিন্দ। হাঁটুর উপর কাপড় তোলা, সারা গায়ে ঘাম, হাতে একটা ঝাঁটা—গোবিন্দ বেরিয়ে আসে। বলে—কে, কাঞ্চন? এস, ঘরটা সাফ করছি।

ঘরে ঢুকে একটা দারুণ দুর্গন্ধ পাই—তক্তাপোশের তলায় ইঁদুর মরেছে, সমস্ত দেয়ালে থুতু সিকনি ছিটানো—কোণে-কোণে আবর্জনার স্তূপ, যাচ্ছেতাই নোংরা ঘর।

সেই ঘরের কথা হঠাৎ আজ ওর মনে পড়ে গেছে। একে ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলতে না পারলে ওর যেন স্বস্তি নেই।

আমিও ওর সঙ্গে ঘর পরিষ্কার করতে লেগে যাই। বলি—এই ঘরেই বারো ঘণ্টা করে পড়? এই ঘরে শোও—ঘুম আসে? গায়ের ওপর দিয়ে ইঁদুররা হার্ডল-রেস করে না? টেবিলটা এই কোণে রাখ—একটা পায়া নেই আবার, দুটো পেরেক এনে দাও। দেয়ালের এ-জায়গায় একটা সুন্দর ছবি টাঙালে ভারি মানাবে।

গোবিন্দের প্রাণে যেন চৈত্র-রাত্রির চাঞ্চল্য এসেছে—অরণ্যের আনন্দ, ও মর্মরিত হচ্ছে, শুনতে চাইলেই শোনা যায়। বলে—একটা খুব জোরালো নোট টুকছি—বায়রনের। সেটাও মৈত্রেয়ীকে দিয়ে এস।

—তুমিই দিয়ে এস। ও তোমার কথা বলছিল সেদিন।

—সত্যিই ভাই, আমি তেমন পড়ি না, আরও ভালো করে পড়তে হবে।

নোংরা ঘর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গোবিন্দের মনের আনন্দ যেন ওর কদর্য দেহের উপর মূর্চ্ছিত, বিচ্ছুরিত হয়।

নোট নিয়ে গোবিন্দ নিজেই গেল। আমি বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ও খানিকক্ষণ একলা কথা বলুক।

অনেক পরে ও আসে, ততক্ষণ ফুটপাতেই পায়চারি করি। ও এসে একেবারে ঘাড়টা জড়িয়ে ধরে বললে—কি চমৎকার লোক ওরা সব! সুইনবার্ন-এর একটা খুব ভালো সমালোচনা বেরিয়েছিল, সেটা ও চেয়েছে।

সব টুকতে হবে—ছ'বার করেই। এই যাঃ, তুমি যে এসেছিলে এ-কথা বলতে ভুলেই গেছলাম। চল, ফিরে যাই।

বলি—পরে। এখন যদি কোনো কথা মনে হয়ে থাকে তোমার, তবে তুমি একলাই ফিরে যাও—আমার যাবার দরকার নেই।

সারা রাস্তা ও মুখর করে চলেছে, কত গল্প যে করছে তার অন্ত নেই, মৈত্রেয়ীর মুখ দা ভিঞ্চির আঁকবার মতো, ট্র্যাম ভারি আস্তে চলে, আজকে বৃষ্টি নামলে ও নিশ্চয়ই ভিজবে—এমনি যত আজগুবি কথা। ক্লাশে যখন ও তর্ক করে, তখন কথার মধ্যে কি কর্কশতা ছিল, সে তর্ক ছিল পুঁথি নিয়ে—আর এখনকার কথাগুলি কি কোমল, অথচ কি উচ্ছ্বসিত!

সব চেয়ে আশ্চর্য—ও সুন্দর করে বসে, সব চেয়ে আশ্চর্য—ও আর দাড়ি খোঁটে না।

—এখনো আলো জ্বালিসনি, সৌম্য?

—মদ খাচ্ছি।

ভিতর থেকে কথা আসে। চাপা, চুপসো।

আবার আসে—দোরটা শুধু ভেজানো আছে, ঠেলা দে।

ঘরে ঢুকে দেশলাই বার করে জ্বালাতে যাই, সৌম্য বাধা দিয়ে বলে—না, থাক।

পরে কোণের দিক লক্ষ্য করে বলে—বেশ। তুমি এবার যেতে পার।

অন্ধকার কোণ থেকে কে যেন উঠে দাঁড়ায়। মাথায় ঘোমটা। ঘোমটাটা অকারণে একটু টানে। মুখ দেখা যায় না। খোলা দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

বলি—কে ও?

—আমার দিদি।

—কোন দিদি? যিনি টাকা পাঠান?

—হ্যাঁ। ওর মুখের দিকে তাকাতে পারি না, তাই আলোটা নিবিয়ে দিয়েছি। দেরাজের থেকে বোতলটা টেনে আন তো, আর একটু ঢালি।

বলি—দিদির সামনেই?

—দিদি জানে, মদ না হলে আমার চলে না। যেমন আমি জানি—

থেমে যায়। ফের বলে—দিদি আর ভাই।

বলি—কেমন আছিস? জ্বর কত?

—জ্বর একটু আছে। আজও ওষুধ কেনা হল না, কাঞ্চন। তুই কেন তখন খবরের কাগজটা রেখে গেলি? একটা নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। সাড়ে-সাতটাকা।

আলোটা জ্বালাই। ওর কোলের উপর টকটকে লাল রঙের মোটা বই একটা। ও বলে—আগাগোড়া রক্ত দিয়ে মাখা।

বলি—আর ওগুলো গিলিসনে। এমন করলে আর কদিন বাঁচবি?

—আমিও তাই এতক্ষণ ভাবছিলাম। স্বস্তিতে শুধু দুটো নিশ্বাস ফেলবার জন্যে সবাই সমস্ত দুঃখকে উপেক্ষা করছে—খালি প্রাণটুকু ধরে রাখবার চেষ্টায়। মোড়ের ঐ দুটো-পা-খসা ঠুঁটো ভিখিরীটা পর্যন্ত। আমার দিদি পর্যন্ত! কেউই মরতে চায় না, কেন বাঁচবে, তাও পর্যন্ত প্রশ্ন করবার সময় নেই। বাঁচাটা যেন বহুযুগের সংস্কার।—বাকি মদটা কোণের ঐ মেঝের ওপর ঢেলে দে, ওখানে বসে দিদি অনেকক্ষণ কেঁদে গেছে। মদ দিয়ে চোখের জল ধুই।

—কি খাবি রাত্রে?

—সবাইকে বিয়ে করতে হবে এ যেমন সত্য নয়, সবাইকে বাঁচতে হবে—এও ততখানি মিথ্যে। কারু-কারু পক্ষে তাড়াতাড়ি মরাটা সত্যিসত্যিই উচিত। কেন এসেছি—এ-কথা কেউ প্রশ্ন করে না, কিন্তু যদি কেউ করত তো উত্তর পেত—মরতে এসেছি। আমিও তাই মরতে চাই—মৃত্যুকে আবিষ্কার করবার জন্য আমার মন অস্থির হয়ে উঠেছে, মৃত্যু কতখানি কদর্য, কতখানি নিষ্ঠুর, একবার দেখে নিই! আজ সমস্ত দিন ভরে কি স্বপ্ন দেখেছি, জানিস? হঠাৎ সৌরজগৎ থেকে বাতাস যেন লুপ্ত হয়ে গেছে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী—মানুষ জীব জন্তু পোকা পতঙ্গ গাছ লতা সব অসহ্য যন্ত্রণায় নিঃশব্দে ধুঁকছে, বাতাসের জন্য কাড়াকাড়ি, কামড়াকামড়ি লাগিয়েছে, দাঁত নখ দিয়ে চিরে-চিরে আকাশকে রক্তাক্ত করে ফেলছে—উঃ, তুই তা ভাবতেও পারবি না। নিশ্বাস, নিশ্বাস, সবাই শুধু নিশ্বাসটুকু নিতে চায়।

পরে বললে—ঐ দিকের তাকটা প্রায় ফাঁক করে ফেলেছি, সব বইগুলি পুরোনো বইয়ের দোকানে কাল বেচে টাকাটা দিদিকে দিয়ে আসতে হবে, কাঞ্চন। ও কাল কোথায় যেন যাবে। পারবি তো ভাই?

—কোথায় যাবেন ?

—যার জন্যে বেরিয়ে এসেছিল সে ছ'বছর জেল ভুগে বেরিয়ে এসে ওকে চিঠি দিয়েছে, বেচারার নাকি সাংঘাতিক অসুখ। তার কাছেই যাবে, টাকা চাইতে এসেছিল।

—কি ব্যাপার ?

—সে একটা খুব পচা পুরোনো গল্প, নাই শুনলি। বিয়ে হবার পর দিদিকে ওর স্বামী আর শাশুড়ী ঘরে ঝুলিয়ে রেখে লোহা পুড়িয়ে গায়ে ছ্যাঁকা দিত। স্বামী একটু আধুনিক ছিল, হাণ্টারের বাড়ি মারত। শাশুড়ী ছিল সাবেকি, দিদির হাতটা মেঝের ওপর রেখে নোড়া দিয়ে ছেঁচত, ইত্যাদি। তোর মুখ এত বিমর্ষ হচ্ছে কেন ? এ-সব কিসের শাস্তি, জানিস ?—ভালোবাসার। আমার তো এ-কথা ভাবতে আজও হাসি পায়। লোকে কেন ভালোবাসে ? খুব মজার ব্যাপার আগাগোড়া।

—তারপর ?

—তারপর দিদি পাগল হয়ে যায়, বেরিয়ে আসে। পাগলা গারদে বছর তিনেক থেকে ভেসে পড়ে। বছর খানেক আগে আমার সঙ্গে দেখা হল, সে ভারি করুণ, আমি তা ভাবতেও পারি না, কাঞ্চন। দিদি তার পিঠের ঘায়ের বীভৎস চিহ্নগুলি রাজপথে সবার চোখের সামনে উন্মুক্ত করে ভিক্ষা করছে। তাতে জীবনধারণ করবার পক্ষে যথেষ্ট রোজগার হত না নিশ্চয়ই। তাই—

—আর ছেলেটি ?

—দিদির স্বামী খুন হয়। সেই সন্দেহে ছেলেটিকে জেলে ঠেলে। ওর মরণাপন্ন অবস্থা নাকি—ও যেন সেরে ওঠে, দিদি যেন ওকে গিয়ে দেখতে পায়—মনে-মনে এই কামনা করি। বিধাতার কাছে আমরা খুব বেশি প্রার্থনা তো করি না, কাঞ্চন। তুই কালই যাস কিন্তু সকালে, বইগুলি বেচে আনা চাই। যদি কিছু বেশি থাকে, দু'একটা নতুন বই আনিস।

সারা রাত সৌম্যর শিয়রে বসেই কাটাতে হয়। ওর অবস্থা ভালো নয়।

সকালবেলা বইগুলি ধামায় করে নিয়ে যাই দোকানে। বেশি দাম দেয় না। নিজের থেকে কিছু দিয়ে টাকার সংখ্যাটা যথেষ্ট রকম ভদ্র করে যাই দিদির সন্ধানে।

দিদি নেই। কাল রাতেই চলে গেছে। এক কাপড়ে। হতভাগ্য শিশুর

মতো ঘরটা কাঁদছে। ওর একটুও তর সয়নি, রাতের অন্ধকার ওকে ডাক দিয়েছে। ছ'বছর পরে ওদের এবার প্রথম মিলন হবে, যা ওরা এত কালের জীবন ধরে চেয়ে এসেছে, নিজেদের সমস্ত লাঞ্ছনার বদলে বিধাতার কাছে বর চেয়েছে—কিন্তু এতদিনের তপস্যার পর মিলনের এ কি বেশ! এর জন্য এত প্রতীক্ষা!

ছেলেটি যেন বেঁচে ওঠে, দিদি যেন ওকে গিয়ে দেখতে পায়—মনে-মনে বললাম। আকাশের তারা সেই কথা শুনল।

কিন্তু মাঝরাতে দোরের গোড়ায় তেমনি কান্না শুনি কেন? পুতলিকে শুধোই—পুতলি, দিদি কি ফিরে এল? ছেলেটির দেখা কি পেল না? ও কি নেই? না, আবার ওকে তাড়িয়ে দিলে ওরা?

দু'জনে লণ্ঠন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি। কিন্তু কই, কেউ নেই তো! মনে হয়, এ যেন এই বিরহী পাড়াটার কান্না! যাবার সময় এখানকার আকাশে দিদি তার কান্নাটি রেখে গেছে।

ছেলেটি যেন বেঁচে ওঠে, দিদি যেন ওকে গিয়ে দেখতে পায়—আবার প্রার্থনা করি।

পুতলিকে বলি—এক্‌জামিন খুব কাছে এসে পড়ছে। আমি মেসে যাচ্ছি, এবারে অনেকগুলি টাকা দরকার। কি বল্ দিয়ে ফেলি এক্‌জামিনটা?

ও বলে—নিশ্চয়ই! টাকার জন্য ভেবো না, সে হয়ে যাবেখন। মেসে যাও, কিন্তু জলখাবারটা দোকানে এসেই খেয়ে যেও। আমি না হয় কোনো বাড়িতে বাড়তি সময় ঝি-গিরি করব।

মৈত্রেয়ীদের বাড়ি যাই। মৈত্রেয়ী পা দুলিয়ে-দুলিয়ে গুনগুন করে পড়ছে।

আমাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে উৎফুল্ল হয়ে বললে—এসেছ? কি ঘেমে এসেছ একেবারে, মুখ একেবারে মাটির মতো হয়ে গেছে। এখন জল চাও এক গ্লাশ!—বাস্তবিক, তোমাকে এবার থেকে দস্তুরমতো শাসন করতে হবে। কি শাসন? পিঠে চড় মারব, কথা কইব না, বেরিয়ে যাবার সময় দরজার দু'ধারে দু'হাত মেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব।

বলে, আর ওর শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার মুখের ঘাম মোছে।

আমার হাত ধরে ওর চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলে—এবার লক্ষ্মী হাবা ছেলেটির মতো জিরোও খানিক—বাস্তবিক, তোমাকে নিয়ে আর পারি না—আমি হাওয়া করছি। তারপর স্নান করে খেয়ে-দেয়ে পাটি বিছিয়ে মেঝের ওপর দু'জনে মিলে পড়া যাবে, দান্তেটা আজই তৈরি করে ফেলব।

বলি—আমি কি খেয়ে-দেয়ে তোমার সঙ্গে পড়তে এসেছি নাকি?

—আচ্ছা, না হয় গল্পই করা যাবে সমস্তক্ষণ। যদি ঘুম পায়! বেশ, ঘুমিয়ে পড়ব—পাটি তো পাতাই থাকবে। আমার ঘুম পেতে দেখে তোমারও তখুনি ঘুম পাবে না আশা করি। তুমি গল্পই বলে চল—আমি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে গল্প শুনব।

বলি—এইমাত্র গোবিন্দের কাছ থেকে আসছি। ওর পড়া শুনে এলাম।

ও আমার চুলে আঙুল বুলোতে-বুলোতে বলে—হ্যাঁ, উনি প্রায় রোজ সন্ধ্যাবেলাই এখানে আসেন—প্রায় দু'হাজার পাতা নোট টুকেছেন—আমি ওঁর থেকে চারশো পাতা টুকে নিয়েছি। কি অসাধারণ মুখস্থ করতে পারেন, আর কি সুন্দর হাতের লেখা! অনেক প্রোফেসারের থেকে ওঁর পাণ্ডিত্য বেশি—এ-কথা আমি জোর করেই বলতে পারি। তারিখগুলি পর্যন্ত সব মুখস্থ! কবে, কে, কোথায়, কি, কেন—কিছুই যেন ওঁর অজানা নেই। সত্যি, তুমি আমাকে মাপ করো, আমি ওঁকে ভুল বুঝেছিলাম প্রথমে। কিন্তু তোমাকে দেখেই চিনে ফেলেছিলাম সব, প্রথম দিনেই তুমি পালিয়ে গেলে। তুমি পালিয়ে যাবারই ওস্তাদ।

মুখে বলে বটে, কিন্তু যেন বিশ্বাস করে না—এমনি ভাবে গলার কাছে হাত রাখে। ওর হাতখানা গালের কাছে টেনে আনি।

বলি—গোবিন্দের পড়া শুনে এলাম—সে কি পড়া! চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে ফেলেছে, ও যেন কণ্ঠস্বর নিয়েই দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে, কানে আঙুল দিলে পর্যন্ত সেঁধোয়। আর, কি খাটতেই যে পারে—বিকেলে বেড়াতে যাবে, তাও হাতে বই নিয়ে, ওর চোখ দুটো আর নেই। আমি শুধু-শুধু পড়তে এসেছিলাম—কিছু হল না।

—আমারও না। আমার ভারি ভয় করে।

—তোমার আবার কি ভয়? কোনো রকমে আটটা দিন অন্তত লিখে

এসে প্রোফেসারদের বাড়িতে গিয়ে-গিয়ে তাঁদের চেয়ারে দিন কতক দয়া করে বসে এলেই হল—ফার্স্ট ক্লাশ। তোমার আবার কি ভয়! সেদিন তো বোস বলছিলেন যে, তাঁর এত বৎসরের টিউটোরিয়্যাল-এ তোমার মতো এমন চোস্ত কাগজ দেখেননি। তোমার টিউটোরিয়্যাল নেবার দিন থেকেই উনি গোঁফ কামিয়েছেন। তোমার কিসের ভাবনা?—হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি গোবিন্দকে তোমার কনভোকেশান-এর ফোটোটা দিয়েছ?

—হ্যাঁ, এত করে চাইছিলেন।

—বেশ করেছ। ও সেই ফোটোটা ওর টেবিলের সামনে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে। ও একটা ডুবো গাধাবোট ছিল, তুমি এসে তাতে পাল লাগিয়ে দিলে; ও একটা ঝুনো বাঁশ ছিল, তুমি ওকে বাঁশি বানালে।

—কি যে বল যা-তা, কক্‌খনো কথা কইব না। তুমি ভারি—একি, উঠছ যে?

—সত্যি। ও যেন কি একটা অসাধ্য সাধন করবে, তুমি কোনো দিন আগ্নেয়গিরি দেখনি, না? ও তাই। আমি এবার যাই, তুমি লক্ষ্মীমেয়ের মতো পা তুলিয়ে-তুলিয়ে আরও খানিকক্ষণ পড়।

—না-না-না, যেও না কিন্তু, তা'হলে ভারি রাগ করব। কেন যাবে শুনি এই রোদ্দুরে? শরীরটাকে মাটি করলেই হল? যেও না বলছি, আমি সব নোট ছিঁড়ে ফেলব তা'হলে।

—নোট ছিঁড়ে ফেলবে মানে? গোবিন্দ তোমার জন্যে যা স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করছে, তার জন্যে ওর কাছে তোমার চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। উচিত ঐ নোটগুলো পুজো করা। বোকা মেয়ে। বোসো, পড়ো গুন-গুন করে।

বেরিয়ে যাই, ও রাগ করে দরজাটা ঝনাৎ করে বন্ধ করে দেয়।

পরের দিন ফের কেঁদে-কেটে এক চিঠি লেখে। লেখে—নোট পুজো করছি বটে, কিন্তু তুমি এস।

বিরাট গৃহতল—চারশো ছেলে ডেস্ক-এর উপর মুখ গুঁজে পরীক্ষা দিচ্ছে—বিস্তীর্ণ প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। এ যেন প্রকাণ্ড একটা কারখানা, এ যেন ভাষার মঞ্জরীতে বিকশিত হবার জন্য কোটি-কোটি ভাব-ভ্রূণের অসহ্য নিদারুণ সংগ্রাম!

কি লিখব, ভেবে কিছুই কিনারা পাই না—চেয়ে-চেয়ে দেখি—একটা ঘুমন্ত পুরীতে এতগুলি ছেলে মশাল হাতে কি যেন অনুসন্ধান করছে, পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে, কি চায়, কেই বা জানে। হয়তো একটি সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন—পুত্রপরিবার, শোক, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু !

গোবিন্দ একটা দেখবার জিনিস, ও একটা বয়লার, ভূমিকম্পের সময়কার পৃথিবী, তারা ফোটাবার আগেকার আকাশ। পাতার পর পাতা মুহূর্তে লিখে ফেলছে, ওর কলম পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে ছুটেছে—বেদুইনের ঘোড়া !

ওর টেবিলের সামনে মৈত্রেয়ীর যে ফোটো টাঙানো আছে, সে-কথাও হয়তো এখন আর ওর মনে পড়ছে না—কে জানে, হয়তো বা বেশি করেই পড়ছে।

আরেকজনের কথা মনে পড়ে—ভাঙা ক্যানভাসের ইজিচেয়ারটায় শুয়ে মৃত্যুকে ডাকছে।

মৈত্রেয়ী ঐ দূরে বসে আছে, চাদরটা পিঠের উপর দিয়ে এমন ভাবে জড়িয়ে নিয়েছে যেন ভয় পেয়ে গেছে।

ফাঁকা খাতাটা সাবমিট করে মৈত্রেয়ীর পাশ দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেলাম বাইরে।

বারান্দায় আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কে বললে—একটা ট্যাক্সি ডাক।

ট্যাক্সি ডাকলাম। মৈত্রেয়ী আমার গা ঘেঁষে বসে বললে—ছাই একজামিন। কি হবে আমাদের পাশ করে? বাবাঃ, পড়ে-পড়ে বুড়ো হয়ে গেলেও আমার সাধ্যি নয়, তোমারও নয় হয়তো। আমাদের ওরা সব কি রকম দেখছিল—যেন আমরা—

কথা শেষ করবার আগেই হেসে ওঠে। গায়ের থেকে চাদরটা সরিয়ে নেয়। বলে—আজ পাঁচটা পর্যন্ত ট্যাক্সিতে ঘুরে আমাকে নিয়ে তোমার বাড়ি যেতে হবে। আজ রাত্রেই বাবাকে বলতে হবে কিন্তু।

—কি বলতে হবে? বিয়ের কথা?

আমার কাঁধের উপর মুখ রেখে বললে—আরও। দান্তের যেমন বিয়াত্রিচে, পেত্রার্কের যেমন লরা, কাতুল্লুসের যেমন লেসবিয়া, মিকাল এঞ্জেলোর যেমন ভিটোরিয়া কলোনা—তেমনি আমি তোমার।. তোমার।

অবগাঢ় দু'টি চোখ, দ্রাক্ষালতার মতো দেহ, কথায় কি করুণা!

ওই যেন আমার নীল ফুল, নীল পাখি, নীল নভতল!

সামনে যে ফাঁকা পথ দেখে, সেই পথেই ট্যাক্সি ছোটে, ও ওর দু'টি ব্রততী-পেলব বাহু আমার গলায় জড়িয়ে দিয়ে ওর বুকের কাছে আকর্ষণ করে বলে—সত্যি বল, বলবে আজ? তার জন্যেই তো তোমাকে দেখে হল্ থেকে পালিয়ে এলাম। আমার পাশ করে কোনো কাজ হবে না। তুমি মুখ ওরকম করে রয়েছ কেন? আজ হাসতে বুঝি ভুলে গেলে একেবারে—তোমার এত কাছে আমি—

বলি—তুমি কি হঠাৎ ক্ষেপে গেলে মৈত্রেয়ী? একজামিন দিতে এসে তোমার মাথার ঠিক নেই।

—ঠিক নেই? মাথার ঠিক না থাকলে তোমার বুকের ওপর কক্খনো এমনি করে মাথা রাখতাম না। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি—তোমার দু'টি পা আমাকে দাও। তুমি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নমালার মতোই নিষ্ঠুর, নিরুত্তর?

—কিন্তু মৈত্রেয়ী, বিয়াত্রিচেকে কি দান্তে বিয়ে করেছিল?

—নাই বা করুক, কিন্তু আমি তোমার ব্যারেট, তোমার মেরি, তোমার ডার্ক-লেডি।

—এ অসম্ভব প্রলাপ বোকো না, মৈত্রেয়ী। কি চাও তুমি আমার কাছে?

—কিই বা না চাই? তোমার কাছে চাই প্রেম, সন্তান, সংসারজীবন—তোমার পায়ের ওপর মাথা রেখে উদার মৃত্যু। আরও চাই, আরও চাই—কি চাই, সত্যি বলতে পারছি না।

—গ্রেচেনের বুকে বুক রেখে ফাউস্টের ক্ষুধা মেটেনি, মৈত্রেয়ী, তা তো তুমি জানো। আমাকে ও-রকম ভাবে সত্যি ডেকো না। আমার কত কাজ, আমার বিশ্রাম করবার সময় নেই এতটুকুও।

মৈত্রেয়ী মুখ বিবর্ণ করে বলে—কি কাজ শুনি?

—ধর, এই দেশের কাজ—

—কেন, আমি তোমাকে সাহায্য করব, তুমি যদি বেদে হও আমি বেদেনী, তুমি যদি দাঁড় টানো আমি হাল ধরে থাকব, তুমি লাঙল চালাও আমি মাটি নিড়োব, তুমি যদি কামার হয়ে লোহা পেট, আমি আঁচল ভিজিয়ে তোমার পিঠের ঘাম মুছে দেব—

—লাভের মধ্যে তা'হলে কোনো কাজই এগোবেনা। এবার বাড়ি ফিরে চল, মৈত্রেয়ী। তুমি বৃথা দুঃখিত হয়ো না। আজ রাতটা ভালো করে ঘুমিয়ে কাল সকালে উঠেই তোমার বোকামি বুঝতে পেরে তুমি হাসবে। আমি একটা কি? চালচুলো নেই, মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই, আমার মধ্যে স্থিরতা নেই, সামঞ্জস্য নেই। আমি কাউকে এত ভালোবাসতে শিখিনি মৈত্রেয়ী, যে, সারাজীবন তাকেই ভালোবাসব।

মৈত্রেয়ী আর কোনো কথা কয় না, চাদরটা তেমনি গায়ে এঁটে দেয়, হাঁটুর ফাঁকে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদে।

ট্যাক্সি ফিরে চলে।

বাবা বলেন—একজামিন দিতে পারিসনি, তাতেই এত কান্না? তুই হলি কি, মা? ভালোই তো হল, আরও মাস ছয়েক নিশ্চিন্ত থাকতে পারবি,—খুব কদিন এখন ফুর্তি করে নে না।

মৈত্রেয়ী বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদে। ও চায় প্রেম, ও চায় সন্তান, ও চায় সংসারজীবন।

তারপরে একদিন রেজাল্ট বেরোয়। গোবিন্দ একেবারে ডগায় এসে উঠেছে—ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট। সবাই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে—একটা পুঁচকে, খোট্টা-মাফিক ছেলে, বই মুখস্থ-করা পড়ুয়া—সে কিনা সবাইকে ডিঙিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে গেল! অদ্ভুত না?

গোবিন্দর সঙ্গে দেখা। বললে—মৈত্রেয়ী নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে। পাশ করতে না করতেই ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে গেলাম, ভাই। খুব ভালো স্টার্ট, কয়েক বছরেই হাজারে দাঁড়িয়ে যাবে—একের পিঠে তিন শূন্য।

উৎফুল্ল হয়ে বলি—বেশ। খুব খুশি হলাম, গোবিন্দ। বিয়ে-থা করছ তো?

ও বলে—এই মাসেই জয়েন করতে হবে, পাটনায় ঠেলেছে প্রথম। সব গোছগাছ করে নিতে হবে এরই মধ্যে। কিছু টাকা জমাতে পারলেই ভবানীপুরের দিকে ছোটখাটো একটা বাড়ি করে ফেলব—তোমার তো খুব ভালো আইডিয়া আছে এ-সম্বন্ধে—মৈত্রেয়ী বলেছে একতলার ওপর ছোট্ট একটি ঘর তৈরি করতে—এমনি বলেছে। চাকরিটা পেলাম বলে ছোট ভাইটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দিতে পারব।

ওর কথাগুলি যেন ফুলঝুরি। ও যেন দৌড়ে চলে—ওকে সত্যিই কত সুন্দর, সাবলীল, সমৃদ্ধ দেখাচ্ছে। গায়ে তসরের পাঞ্জাবি—তাঁতের কাপড়—হাতে একটা স্টিক পর্যন্ত। ও যেন রূপকথার রাজপুত্র। রাক্ষসপুরী থেকে বেরিয়ে এসেছে। চমৎকার ওর চলা।

সকালবেলাও সৌম্য বলছিল—ঐ নতুন বইটা থেকে কয়েক পাতা পড়ে শোনা, কাঞ্চন। বড্ড অস্থির লাগছে।

ডাক্তার এসে আশা নেই বলে গেছে। যেটুকু ওরা বলতে পারে।

দুপুর বারোটা থেকে প্রলাপ শুরু হয়েছে। সমস্ত বাড়িটাতে কেউ নেই যে আমাকে সাহায্য করে, কেউ আপিস কেউ দালালি করতে বেরিয়েছে। শুধু চুপ করে চেয়ে থাকার চেয়ে বেশি কি আর করা যাবে? কিছু একটা না করলে স্বস্তি পাই না বলে মাঝে-মাঝে চামচে করে একটু-একটু ওষুধ, গরম দুধ ওর দাঁতের ফাঁক দিয়ে ঢেলে দিই, গিলতে পারে না। হাতে পায়ে গরম জলের ফোমেণ্ট করি—একেবারে একা।

নিচে মেঝের উপর অনেকক্ষণ বিছানা করে রেখেছি, কিন্তু শোয়াবার উপায় নেই। ও ওর অনেক দিনকার পুরোনো ভাঙা চট-ছেঁড়া ইজিচেয়ারটায় শুয়েই মরণকে আলিঙ্গন করবে।

ও হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে ওরা সবাই নিতে এসেছে, কাঞ্চন। পাজিটা, চুপ করে আছিস কেন, সবাইকে ডাক, শাঁখ বাজাক, ওদের বসবার জায়গা করে দে, হতভাগা। কত যুগের কত কবি, কত লেখক, কত উপোসী—মিছিল করে এসেছে। অনেকের মুখ চিনি না, কিন্তু সবাই আমাকে বলছে আত্মীয়, বন্ধু, ভাই। আমার হাত ধরে একটুখানি এগিয়ে নিয়ে যা, ওদের হাতের সঙ্গে হাত মেলাতে দে—

খানিক বাদে আবার বলে—মা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে স্বপ্ন দেখি। ঐ যাঃ, ছোট বোনটা জলে পড়ে গেল, লাফিয়ে পড়, কাঞ্চন। আমার একটি মাত্র নিষ্পাপ বোন—ওর পিঠেও ওরা চাবুক মারছে? সত্যি করে বল, কাঞ্চন, সেই ছেলেটি সেরে উঠেছে তো? দিদি ওর দেখা পেয়েছে?

—পেয়েছে বৈকি। তুই দেখতে পাচ্ছিস না?

—না। আমার সব অন্ধকার হয়ে আসছে, আমি কোথায় যেন চলেছি,

কত দূরে। সেখানে একটি তারার কণিকাও নেই। আমাকে জোরে টেনে ধর, কাঞ্চন, যেতে দিস না।

ওকে আর রাখা যাবে না। গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

কোলাহল ও আর্তনাদ শুনে দোতলার নববধূটি দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে—সলজ্জ প্রতিমার মতো। মৃত্যুর মতো।

সৌম্য শেষবার বলে উঠল—চিতায় শোয়াবার সময় আমার মাথার তলায় এই লাল বইটা দিস, কাঞ্চন। আর এই লাইব্রেরিটা—তুই তো একে ঘাড়ে করে বেড়াতে পারবি না, কাউকে দিয়ে দিস আমার নাম করে—

চেঁচিয়ে উঠি—সৌম্য, সৌম্য!

সৌম্যর জবাব কানে এসে পৌঁছয় না। শুধু খোলা জানালা দিয়ে সন্ধ্যা-তারা মাটির বুকে ওর ক্ষীণ সান্ত্বনাটি পাঠিয়ে দেয়। বিকেলের হাওয়া ব্যাকুল হয়ে ফেরে।

সৌম্যর কথা রাখলাম।

গোবিন্দ ও মৈত্রেয়ীর বিয়েতে ওর লাইব্রেরিটা গোবিন্দকে দিয়ে এসেছি।

'বেদে' অচিন্ত্যকুমারের প্রথম প্রকাশিত রচনা

রবীন্দ্রনাথ

'বেদে' পাঠ করে লিখেছিলেন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার প্রতিভা আমি স্বীকার করি। তোমার শক্তির বিশিষ্টতা আছে। সেই শক্তি যদি কিছু পরিমাণে আত্মবিস্মৃত হ'ত তবে ভালো হ'ত। রচনার যে বিশিষ্টতা বাহ্যিক, তোমার পক্ষে তার প্রয়োজন ছিল না। যারা অল্পশক্তি তারাই রচনায় নূতনত্ব ঘটাতে চায়—চোখ ভোলাবার জন্যে। কিন্তু যখন তোমার প্রতিভা আছে তখন তুমি চোখ ভোলাবে কেন, মন ভোলাবে।

তোমার কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র্য দেখে আমি মনে-মনে তোমার প্রশংসা করেছি। সেই কারণে এই দুঃখ বোধ করেছি কোনোকোনো বিষয়ে তোমার অত্যন্ত পৌনঃপুন্য আছে—বুঝতে পারি সেইখানে তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মিথুনপ্রবৃত্তি। সে প্রবৃত্তি মানুষের নেই, বা তা প্রবল নয় এমন কথা কেউ বলে না। কিন্তু সাহিত্যে সকল বিষয়েই যেমন সংযম আবশ্যক এক্ষেত্রেও। ঘুরে ফিরে কেবলি একটা জিনিষকেই প্রকাশ করার দ্বারা দুর্বলতাজনিত প্রমত্ততার প্রমাণ হয়—তাতে রচনার সামঞ্জস্য নষ্ট করে।

যে মানুষ মাটির কাছাকাছি আছে তাকেই তুমি নানা দিক থেকে দেখাতে গিয়েছ। কিন্তু আমার বিশ্বাস মিথুনাসক্তি সম্বন্ধে তারা এত অধিক বুভুক্ষু নয় —অন্তত আমাদের দেশের হিন্দুজনসাধারণ। এসম্বন্ধে উগ্রতা নরোয়ে প্রভৃতি দেশের সাহিত্যে দেখেছি। দেখে আমি এই মনে করেই বিস্মিত হয়েছি যে আমাদের দেশের মানুষের এই ব্যাপারে এমনতর নিত্যজাগ্রত লালসা নেই। (পল্লিগ্রামের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে।) আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই প্রবৃত্তির উৎসুকতা অনেকের মধ্যে আজকাল দেখা যায়—

তার প্রধান কারণ মানুষের জীবনক্ষেত্রের বিচিত্রব্যাপারে তাদের ঔৎসুক্য নেই —সেই কারণেই এই এক নেশা নিয়েই তারা নিজেকে ভোলাতে চায়। নরোয়ে প্রভৃতি দেশের লোকের বলিষ্ঠ প্রাণশক্তির মধ্যে প্রবৃত্তির যে সহজ উত্তাপ আছে, এদের তা নেই—এদের আধমরা দেহমনের এই একটিমাত্র উত্তেজনার উপকরণ আছে—আর কিছুতেই যেন এদের সম্পূর্ণ জাগাতে চায় না। এই কারণে আমাদের সাহিত্যে যখন এই মিথুনাসক্তির লীলা বর্ণিত দেখি তখন তার সঙ্গে-সঙ্গে দুর্দাম বলিষ্ঠতার পরিচয় পাইনে—সেইজন্যে ওটাকে অশুচি রোগের মতই বোধ হয়। রোগ জিনিষটা দুর্বল চিত্তের পক্ষে সংক্রামক—বিকারমাত্রই অবলীলাক্রমেই শক্তিহীনকে জীর্ণ করে। এই কারণে উত্তর য়ুরোপে দানবতুল্য দেহে মদের পিপাসা সহজেই সহ্য হয়, অর্থাৎ তাকে অতিক্রম করেও তাদের মনুষ্যত্ব অবিচলিত থাকে। আমাদের ক্ষীণজীবীর দেশে মদ খেতে গেলেই মানুষ একান্ত মাৎলামিতে গিয়ে পৌঁছয়—এই জন্যে নরোয়েতে যেটা দৃষ্টিকটু নয় আমাদের দেশে সেটা কুৎসিত। অন্যান্য বিচার সম্বন্ধেও তাই। আমাদের সাহিত্যে বারে-বারেই কেবলি দুর্বল রুগ্ন মুমূর্ষুদের লালায়িত লালসার অতি-বর্ণনায় আমরা মানুষের যে মূর্তি দেখি সেটা বীভৎস—তার আনুষঙ্গিক ভাবে প্রবল-প্রবৃত্তিশালী চিত্তের প্রচণ্ডতা দেখতে পাইনে বলে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হয়। এরকম রোগবিকারের বর্ণনাস্থান সাহিত্যে নয়, এটা ডাক্তারি শাস্ত্রে শোভা পায়।

তোমার বর্ণনীয় চরিত্রে মাটির সকল প্রকার সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষের অনুরাগ তুমি উজ্জ্বল করে দেখাতে চেষ্টা পেয়েছ। এটা ভালোই। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়েছে এটা তুমি বিশেষ চেষ্টা করে করেছ। বোধ হয়েচে তুমি আধুনিক কোনো কোনো বিখ্যাত লেখকের রচনায় মাটির প্রতি মানুষের প্রবল আকর্ষণের বর্ণনা দেখেচ, সেইটের প্রভাব ভুলতে পারনি। এ কথা মনে হবার কারণ এই যে, যে শ্রেণীর লোক মাটি নিয়েই চিরজীবন কাটায় তারা মাটিকে প্রাণপণে ভালবাসে—সেই ভালবাসা আসক্তি—তার সঙ্গে-সঙ্গে সৌন্দর্য্যভোগ যদি বা থাকে তবে সেটা অর্দ্ধসচেতন, সেটা মূক। কিন্তু তোমার বর্ণিত চরিত্র মাঝে মাঝে যে রকম করে এ সম্বন্ধে ভাব প্রকাশ করেচে তাতে মনে হয়েচে তুমি যেন নিজে গায়ে পড়ে তাদের উপর এই জিনিষটা আরোপ করেচ—মনে করেচ এটা শোনাবে ভালো। এদের মধ্যে যেটা অবচেতন ভাবেই আছে তাকে

যদি সেই ভাবেই তুমি আভাসে প্রকাশ করতে পারতে তবে তাতে তোমার প্রতিভা সার্থক হ'ত। রুষীয় লেখক চেকভের রচনায় এই রকম অনতিব্যক্ত আভাসের আশ্চর্য্য জাদু আমরা দেখেচি।

তোমার শক্তি এখনো যে আত্মপ্রতিষ্ঠ পরিণতিতে পৌছয়নি তার প্রমাণ তোমার ভাষায় উপমার সদাসচেষ্ট প্রয়াস। তোমার উপমা অনেক স্থলেই খুবই ভালো, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় তারা স্বস্থানে এসে পৌছতে যেন হাঁপিয়ে পড়েচে। তাদের অনেক সময়েই তুমি টেনে এনেছ।

তবু সব সত্বেও তোমার প্রতিভা আমি স্বীকার করি। তার স্বকীয়তা আছে—অজস্রতা আছে—আত্মশক্তির প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রেখে প্রশস্ত পটভূমিকার উপরে নানা চরিত্র ও বিচিত্র ঘটনা নিয়ে যে বৃহৎ চিত্র তুমি এঁকেছ তাতে তোমার লেখনীর আশ্চর্য্য বলশালিতা প্রকাশ পেয়েচে। একদিন পরিণতি সহকারে যখন তোমার প্রতিভা সরলতার ভঙ্গী ছেড়ে দিয়ে যথার্থ সরল হয়ে উঠবে, যখন সে বলিষ্ঠ তুলি দিয়ে মানুষকে বড়ো করে আঁকবে, সাহিত্যে চিরজীবী মনুষ্যত্বকে চিরন্তন আকার দেবে সেই দিন তুমি ধন্য হবে—বাংলা সাহিত্যে ভারতীর তুমি নূতন আসন রচনা করবে। সে দিন তোমার আসবে, এই আমি কামনা করি ও বিশ্বাস করি। এই পত্র থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে বিজ্ঞাপনের কাজে লাগিয়ো না এই আমার অনুরোধ। ইতি ৩১ আশ্বিন ১৩৩৫—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রচ্ছদপট

এক

আজ দু'মাস ধরে শ্রীপর্ণা ভাবছে—ভুগছে ভাবনার পৌনঃপুনিক অসহ-মানতা থেকে। এক মুহূর্তও তার স্বস্তি নেই। উঠতে-বসতে খেতে-শুতে চলতে-ফিরতে সব সময় সে ভাবছে: করা কি না-করা, হওয়া কি না-হওয়া—মানুষের সেই আদিম, অনধিগম্য জিজ্ঞাসা। মেঘলা করে আছে তার সমস্ত মন চিন্তার ঘোলাটে কুয়াশায়, মুখেচোখে স্বাভাবিকতার আভা থাকলেও অন্তরের অগোচর অন্ধকারে সে পুড়ছে, পুড়ছে তার ভয়াবহ নির্জনতায়। পায়ের নীচে যেন আর তার সমতল মাটি নেই, দুলছে সে সন্দেহে, হোঁচট খেয়ে পড়ছে প্রতি মুহূর্তের চূড়ায়, চলে এসেছে তার চেতনার একটা আতঙ্কিত অস্পষ্টতার মধ্যে। দৈনন্দিন কাজের অবিরমমাণ স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সে তার শরীর—যেন রাশীভূত নির্জীবতার ভার, কিন্তু মন তার অনুপস্থিত। দিনের প্রায় সমস্তটা কাটে তার স্কুলে, একটানা কাজের লাইন ধরে, এবং প্রতিক্ষণেই মনে হয় কতোক্ষণে সে বাড়ি ফিরতে পাবে তার নির্মল কর্মহীনতায়, সম্পূর্ণ দেখতে পাবে নিজেকে নিজের বিশাল পরিব্যাপ্ত প্রশান্তিতে; কিন্তু বাড়ি ফিরে এসেই সে হাঁপিয়ে ওঠে তার এই ভয়ঙ্কর আলস্যে, দেয়ালের পরিধি দিয়ে ঘেরা ছোট ঘরটা একটা ঠাণ্ডা, পরিত্যক্ত গুহার মত মনে হয়—টিকতে পারে না সে নিজেকে নিয়ে নিজের এই উন্মুক্ত উদ্ঘাটনে। কাজ, আবার কোনো কাজের জন্যে, কাজের মাঝে নিজেকে টুকরো-টুকরো করে ভেঙে দেবার জন্যে—আবার সে পাহাড়ের কোটরে বন্দী ঝর্ণার জলের মতো ফেনিয়ে উঠতে থাকে। সইতে পারে না সে তার এই অব্যাহত সম্পূর্ণতা। তার আত্মার আতীব্র নগ্নতার সামনে দাঁড়াবার যেন তার সাহস নেই। তাই সে কাজের মাঝে আশ্রয় খোঁজে, কাজের আঘাতে নিজেকে খণ্ড-খণ্ড করে দিতে, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে কাজের নিষ্ঠুর নিশ্ছিদ্রতায়। কিন্তু কাজ এসে ফের সমাপ্তি খোঁজে অসহায় ক্লান্তির অন্ধকারে, সমস্ত খণ্ড-খণ্ড, হারানো ব্যক্তিত্ব তখন, সে-অন্ধকারে,

একে-একে আবার স্বষীমায় সাবয়ব হয়ে ওঠে। শ্রীপর্ণার মুক্তি নেই নিজের অখণ্ডতার থেকে। রাতগুলিই শ্রীপর্ণা বইতে পারে না, সইতে পারে না নিজের কাছে নিজের এই ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা। সে-লজ্জা ঢেকে দেবার জন্যে শরীরের উপর নিয়ে আসে সে ঘুম, ঘুমের জড়িমা, কিন্তু ঘুমেরো শেষ আছে রূঢ় জাগরণে : রৌদ্রে শোনা যায় রাতের হাহাকার। দিনের পর দিন শ্রীপর্ণা এমনি একটা অব্যবস্থার মধ্যে বাস করছে, কী যে করা যায় কিছুই সে ঠিক করতে পারছে না। এমন কেউ নেই যে তার থেকে সে একটা পরামর্শেরো সান্ত্বনা পেতে পারে—এরা তার নৈকট্য পেতে পারে, কিন্তু সান্নিধ্য কেউই নয় —তা ছাড়া এ-সমস্যাটা পরের পরামর্শে সমাধেয় নয় মোটেই—এ তার নিজের হওয়া বা না-হওয়া নিজের নিভৃত একাকীত্বে। এ তার নিজের মাঝে নিজের ফুটে-ওঠা, নিজের নিগূঢ় অন্ধকারে, শাখায় নয়, শিকড়ে, উৎসারে নয়, গভীরতায়। জনতার মুখের দিকে চেয়ে অরণ্যে পুষ্পোদ্রেক হয় না।

আসলে ঠিক করবার কিছুই নেই, শ্রীপর্ণার সাধ্য কী সে নিজে ঠিক করে? সে বাহিত হয়ে চলেছে তার অশরীরী আত্মদৈত্যের দুর্লঙ্ঘ্য ইঙ্গিতে, তাকে অতিক্রম করবার তার শক্তি কোথায়, কী-বা তার অধিকার? তাকে যেতেই হবে তার পরিপূর্ণতার সন্ধানে, অলক্ষ্য মৃত্যুর আশ্চর্য ক্রমসন্নিহিততায় : সময়ের পরিপ্রবাহের কাছে তার ইচ্ছা আর কতটুকু? সে প্রেরিত, নির্বাচিত, উৎসর্গীকৃত : যেতেই হবে তাকে তার পরমতম প্রশ্নের প্রণিধানে, দু'হাত ভরে নিতেই হবে তাকে তার বাঁচবার দায়িত্ব, তার সম্পূর্ণ হবার ভার, জীবনের ঐশ্বর্যের প্রচুরতা। বিচার করবার কিছু নেই, জীবন মৃত্যুর চেয়েও দুর্ধর্ষ, মৃত্যুর চেয়েও অপ্রতিরোধ্য, অবশ্যম্ভাবী অবসানের চেয়েও অনস্বীকার্য। মৃত্যু যদি আমরা বাছতে পারি না, জীবনকেও করতে পারি না নির্বাচন, তাকে দিতে পারি না খর্বিত একটা সীমা, নিয়ে আসতে পারি না নির্দিষ্ট কোনো নমুনায়। তার কাছে বিনিঃশেষ সমর্পণই আমাদের বাঁচা, ইচ্ছাটা সেখানে ক্ষতের মতোই গ্লানিকর, কী তোমার ইচ্ছে আছে কেমন করে তুমি মরবে? যেমন তোমার পরিপার্শ্ব, তেমনি তোমার প্রতিক্রিয়া : যেমন তোমার আলো, তেমনি তোমার প্রসারণ। ভেবে কী তুমি ঠিক করবে—ঠিক করবার আছে কী? আকাশে যদি সূর্য উঠে থাকে, তবে তোমার ঘরের দুয়ার-জানলা খুলে দাও; যখন সূর্য আবার অস্তমিত, বন্ধ করে দাও একে-একে, ঘন তপ্ত করে

তোলো তোমার বিগলিত অন্ধকার। স্বীকার করো, গ্রহণ করো, আহরণ করো জীবনের মর্যাদা, তপ্ত, সংক্ষিপ্ত ক'টি মুহূর্তে। শ্রীপর্ণাও কিছু ঠিক করতে পারলে না। নিরঞ্জনের কাছ থেকে বৃথাই সে আরো ক'টা দিন সময় চেয়েছে।

নির্জন, নির্জন—প্রতি নিশ্বাসে শ্রীপর্ণা নিঃসঙ্গ। শীতের শুকনো, ধারালো রাতে বারান্দায় চেয়ার টেনে শ্রীপর্ণা একা বসে ছিলো। তীক্ষ্ণ তারায় কালো আকাশ ইস্পাতের পাতের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। হাওয়া নেই, কুয়াশা নেই, একটা নিরবয়ব, প্রেতায়িত ঠাণ্ডা। দূরে-দূরে সাদাটে ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভিজছে, ছাইয়ের একটা ফোঁটার মতো দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের একটা টিপি। শালগাছের শুকনো পাতা ঝরছে স্তব্ধতার নিশ্বাসের মতো। সমস্ত রাত্রি সমর্পিত, প্রশান্ত, অনুভূতিহীন বিরাট শূন্যতায় প্রক্ষিপ্ত। আকাশ গলে পড়ছে শিশিরে, সুকোমল ঘুমের মতো অন্ধকার—শীতে কুঁকড়ে, হাঁটু দু'টো নিবিড় বুকের কাছে গুটিয়ে শ্রীপর্ণা যেন তার অস্তিত্বের সঙ্কীর্ণতা মুছে ফেলতে চাইছিলো। তার ভয় করছে আকাশের ঐ বিশাল উন্মোচনে, রাতের এই শব্দময় স্তব্ধতায়। কিন্তু সত্যি কিসের ভয়, এই ভয়ই তো সকল বিস্ময়ের স্বাদ, আলোর পিছনে ছায়ার মতো ভালোবাসায় এই ভয়ই তো আনে সম্পূর্ণতা, জীবনের শেষে মৃত্যুর সান্ত্বনার মতোই তো এই ভয়ের রহস্য—কিসের তার ভয়, যতোক্ষণ আকাশে আছে এতো তারা, পৃথিবীতে এতো জায়গা, যতোক্ষণ নিরাপদ আশ্রয়ের মতো দূরে ঐ বন আছে দাঁড়িয়ে। শ্রীপর্ণা চঞ্চলতায় ঝলমল করে উঠে দাঁড়ালো ধূসর পাহাড়ের চূড়ায় চাঁদের চকিত উন্মীলনের মতো। হ্যাঁ, কিসের তার ভয়, সত্যি এতোদিন সে কিসের ভয় করছিলো? শ্রীপর্ণা হাতড়ে বেড়াতে লাগলো মনের অন্ধকার। এক—আদিত্য,—ও! তার জন্যেই সে এতো ভয় করছে নাকি? শ্রীপর্ণা অন্ধকারে নিজের মনে হেসে উঠলো। আর? আবার কী? লঘুতায় শ্রীপর্ণার সমস্ত শরীর যেন কুয়াশার মতো উড়ে চলেছে। আদিত্য,—আদিত্যর জন্যে তার আবার কিসের ভাবনা?

দুই

শ্রীপর্ণার বিয়ে হয় চোদ্দ বছর বয়সে, একমুঠো মেয়ে তখন শ্রীপর্ণা, স্তিমিত মোমের আলোর মতো নরম, মিঠে তার শরীর, গোধূলির প্রথম তারাটির মতো গা ভরে তার কৈশোরের নতুন ধূসরতা, দু'টি বড়ো-বড়ো চোখ নিরীহ নির্মলতায় সব সময়েই একটু সজল, সমস্ত মুখখানি গ্রামের দুপুরের মতো কেমন যেন একটু উদাস ছায়াভরা। শরীর বেয়ে কৃশতার ধারাটি বালির বিছানায় পাহাড়ি নদীর মতো আঁকাবাঁকা রেখায় ঝিরঝির্ করে বয়ে চলেছে। ঘুঘুর পাখার মতো লঘু, নরম দু'খানি পায়ে সব সময়েই সে উড়ে বেড়াচ্ছে। হাতের উপর যেমন জল ধরে রাখা যায় না, তেমনি সে আঁটছে না তার শরীরে, থেকে-থেকে উছলে পড়ছে পিছল চঞ্চলতায়। খুশিতে তখন সে প্রায় একটি ঝিঁঝিঁ পোকা, অকারণ খুশিতে। শ্রীপর্ণার যখন বিয়ে হয়, তখন সে ধানের শীষের মতো সবুজ, নতুন বৃষ্টির মতো নির্মল, ঘরের কোণে মাটির বাতির মতো মিটিমিটি।

বিয়ে হয় তার ভালো ঘরে, বংশ ও অর্থের গৌরবে যে-ঘর ভালো। প্রিয়লালবাবু সে-বছর সব্জজি থেকে রিটায়ার করে বাড়ি ফেঁদেছেন কল্‌কাতায়, তাঁর কনিষ্ঠ ছেলে ক্ষীরোদ সে-বছর গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরিয়ে ল-তে ঢুকেছে। তার আর-আর দাদারা মোটা মাইনেতে ঝক্‌ঝক্ করছে, কেউ কল্‌কাতায়, কেউ বরোদায়, কেউ-বা কুচবিহারে। শ্রীপর্ণার বাবা পশুপতি ঘোষ নীলফামারিতে টিম্‌টিম্ করে ওকালতি করে, একদিন তারই বৈঠকখানায় শ্রীপর্ণাকে প্রিয়লালবাবু খামোকা দেখে ফেললেন। শ্রীপর্ণা তখন ফ্রক ছেড়ে নতুন শাড়ি ধরেছে, কিন্তু গা ভরে তখনো তার বহুলীকৃত বিশৃঙ্খলাকে শাসন করতে শেখেনি। এলোমেলো আঁচলের ভারে মেয়েটি যেন ঘন বনের আড়ালে সূর্যের অস্ত যাওয়ার মতো করুণ। পৌষের নতুন আমের বোলের মতো কচি, মিঠে তার মুখখানা প্রিয়বাবু অনেক দিন ভুলতে পারেননি। তাঁর রিটায়ার করে কল্‌কাতায় এসে থিতিয়ে বসা পর্যন্ত। তারপর ক্ষীরোদের বিয়ে করার

সময় হলে—সময়টা অবিশ্যি প্রিয়বাবুরই সূক্ষ্ম চোখে ধরা পড়লো—বলা-কওয়া-নেই হঠাৎ তিনি পশুপতিকে স্মরণ করলেন। সম্মান-পুরঃসর, সবিনয়ে লিখলেন, যদি বাধা বা কোন আপত্তি না থাকে, শ্রীপর্ণাকে তিনি নিজের খরচায় প্রথামতো একবার দেখে আসবেন, এই আসছে ইস্টারে। পশুপতি ঢেউয়ের মতো লাফিয়ে উঠলো। শ্রীপর্ণার মা মারা যাবার পর সে আবার বিয়ে করেছিলো বটে, কিন্তু তার প্রথম প্রেমের পরিপূর্ণতম পরম-পরিণাম হিসেবে শ্রীপর্ণাই ছিলো তার কাছে বেশি মূল্যবান। এ-পক্ষপাতিতা তার শ্রীপর্ণাকে ততো নয়, যতো তার যৌবনের প্রথম শিহরায়মানতাকে। শ্রীপর্ণা তার জীবনে প্রথম ভোর হওয়া, তার প্রথম উত্তরণ: তাকে যে সে অনাহূত এতো খুশি করতে পারবে এ-কথা সে ভাবতেও পারতো না। ইস্টারের ছুটিতে প্রিয়বাবু দেখতে এলেন শ্রীপর্ণাকে—লেফাফা-দুরস্ত দেখা। শ্রীপর্ণা এসে দাঁড়ালো ঠাণ্ডা, সাদা একখানি শাড়িতে, শাড়ি এবার তার গায়ে সঙ্কীর্ণ, সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে, একমেটে প্রতিমার মতো নির্বাপিত, প্রশান্ত সেই শ্রীপর্ণা—কিন্তু এক্ষুনি সেখান থেকে পালাতে পারলেই যেন সে বাঁচে, ঘন বনের মাঝে হাওয়ার কাতরতার মতো তার সর্বাঙ্গে দ্রুততা ফেলছে দীর্ঘশ্বাস। আগের চেয়ে অনেক সে সুন্দর হয়ে উঠেছে, জল পেয়েছে স্রোত, রূপ পেয়েছে রেখা, কোণে-কোণে কৃশতা উঠেছে ধারালো হয়ে। এক-কথায় প্রিয়বাবু মত দিয়ে ফেললেন, শুকনো গলায় পশুপতি দীর্ঘ একটা ঢোঁক গিললো। তার মনে হলো আগেই সে ভেবে রেখেছিলো, অভ্রান্ত ভেবে রেখেছিলো, শ্রীপর্ণা তার সঙ্গে করে ভাগ্যের দক্ষিণ মুখের প্রসন্নতা নিয়ে এসেছে, জীবনে এক দিকে যে ক্ষতি ঘটে, সেটা একটা প্রতিবেশী পরিপূরণেরই সঙ্কেত ছাড়া কিছু নয়। পাজির পৃষ্ঠা বেশিদূর উল্টোতে হলো না, বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই দিন রয়েছে ক'টা পাশাপাশি। যদি বাধা বা কোনো আপত্তি না থাকে, প্রিয়বাবু নিকটতম তারিখের উপর আঙুল রাখলেন, তাঁরা সদলবলে এসে পড়েন নীলফামারি। দাবিদাওয়া কিছু নেই, পশুপতির আবার আপত্তি! খ্যাদা নাকে আবার নথ!

ব্যাপারটা যে কী হলো, শ্রীপর্ণা প্রথমটা কিছু দিশে করতে পারলো না। ভারি-ভারি গয়নায় সারা গা তার গরম হয়ে উঠেছে, শাড়ি-ব্লাউজের বোঝায় হেঁট হয়ে বসে থাকার নীরব নিপীড়নে। বিকেলের দিকে আকাশ কালো করে কাল-বোশেখীর শুকনো একটা ঝড় উঠেছিলো, সিঁদুরে আমের বাগানে

কতো আম পড়েছে না-জানি। এ-সব ফেলে-ছড়িয়ে রান্নাঘর থেকে কালিপড়া লণ্ঠনটা কুড়িয়ে নিয়ে পাছদুয়ার দিয়ে চুপি-চুপি বেরিয়ে পড়তে পারলে যেন সে রক্ষা পায়, তার গায়ে বাতাস লাগে। কতো রাতে যে সে ছাড়া পাবে তার ঠিক নেই, এদের ঘ্যানর-ঘ্যানর আর ফুরোয় না। কোঁচড়ে করে আমগুলি কুড়িয়ে এনে পরে পিঁড়িতে বসলে কী ক্ষতি হয়েছিলো! ঘরে যেতে পারলো রাতের প্রায় একযুগ পরে, অন্য দিন যখন সে এর মধ্যে দিব্যি এক ঘুম দিয়ে নিরুদ্বেগে পাশ ফিরেছে। বাড়িতে এতো ধুমধাড়াক্কা—আর কিনা তাকে নিয়েই এতো, অথচ এক ফোঁটা জলও সে এ-পর্যন্ত ঠোঁটে ঠেকাতে পায়নি। এতোক্ষণে মা তার মুখে একটা সন্দেশ ভাঙলেন, কাচের গ্লাস করে আনলেন একটু ঘোলা ডাবের জল। যথেষ্ট। শহর-শুদ্ধু সবাই এসে দল বেঁধে দিস্তে-দিস্তে লুচি উড়িয়ে গেলো, আর কী অপরাধ করেছে সে, সে শুধু রইলো উপোস করে। মেঝের উপর কার-না-কার একটা মস্ত বিছানা ছিলো ঢালা, শ্রীপর্ণা তার উপর ভেঙে পড়লো ঘুমে, জড়িমায়। এতোতেও তার শান্তি নেই। এখানে সে শুতে পাবে না, তার জন্যে বার্নিশ-করা নতুন খাটে মোটা গদির উপর পুরু, নরম তোষকে ধব্‌ধবে বিছানা করা হয়েছে—ভাঙা-ভাঙা ঝাপসা ঘুমের মধ্যে তাকে সবাই একরকম ধরাধরি করে টেনে নিয়ে গেলো। খাটের আধখানা জুড়ে আরেকজন কে এরি মধ্যে শুয়ে আছে এক পাশে। তাকে চিনতে শ্রীপর্ণার দেরি হলো না, খানিক আগে পিঁড়িতে চড়ে তারি গলায় সে একটা মোটা ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিলো। বিছানাটা সে একলা ভরে তুলতে পারেনি, তারি ধার ঘেঁষে শ্রীপর্ণার জন্যে রয়েছে অনেক জায়গা, অনেক আলস্য। ভয়ে তো শ্রীপর্ণা কুঁকড়ে এতোটুকু হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু এই নাকি নিয়ম, এরি জন্যেই এতো ঢাক-ঢোল, এতো হৈ-হাঙ্গামা—চাঁদের চিকন ফালিটির মতো শীতল, স্তিমিত শীর্ণতায় শ্রীপর্ণাকে কে বিছানায় এঁকে দিলে। চোখের পাতায় তার রাজ্যের ঘুম, সে গেলো ডুবে, মুছে, আপনাতে আপনি হারিয়ে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ব্যাপারটা সে বোঝবারো একটু সময় পেলো না। কিন্তু লোকটি বেশ ভালো বলতে হবে, গা ভরে দিব্যি তাকে ঘুমুতে দিলো, ইচ্ছেমতো এঁকে-বেঁকে মাটির অন্ধকারে গাছের শিকড়ের মতো, মাথার থেকে বালিশ সরে গেলে বারে-বারে লাগলো তুলে দিতে, মুখের থেকে খোঁপা-খসা ছেঁড়া চুলের টুকরো, যাতে খাট থেকে না গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায় মাঝে-

মাঝে হাত বাড়িয়ে টেনে আনতে লাগলো বিছানার নিভাঁজ মাঝখানে। ঘুমের জলে আগাগোড়া সে ধুয়ে যাচ্ছিলো বটে, কিন্তু অস্পষ্ট টের পাচ্ছিলো তার ঘুমের কিনারে আর কার প্রতীক্ষা রয়েছে প্রখর হয়ে—বদ্ধ ঘরের ছোট জানালা থেকে দেখা আকাশের নীল দূরত্বের মতো। ঘুমের ঢেউ দিয়ে বারে-বারে লোকটিকে সে ছুঁয়ে যেতে লাগলো। রাত যতো ঘনিয়ে আসে, ঘুমের নিভৃত তলা থেকে শ্রীপর্ণার ততোই যেন কেন মনে হয়, একে আমার আর কোনো ভয় নেই, একে আমি চিনি, একে আমি যেন কোথায় দেখেছি।

তবু, এখানেও শেষ হলো না। তাকে কল্‌কাতায় যেতে হবে। সবাইকে ছেড়ে যেতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিলো বটে, কিন্তু যাচ্ছে সে কল্‌কাতায়, অলি-গলিতে এলোমেলো, বিশাল কল্‌কাতায়, শব্দ ও ধুলোর উড়ন্ত একটা ঝড়ের মধ্যিখানে, ভাবতে তার কিশোর-কল্পনা দুই চোখে উদ্দাম পাখা মেলে দিয়েছিলো। এবং এই সুযোগে সে প্রথম এবার ট্রেন চড়বে। নিরবয়ব, অনিশ্চিত একটা ভয়ের মধ্য দিয়ে যে-সুখ ভীরু চোখে থেকে-থেকে উঁকি মারছে, তার আকর্ষণের বুঝি তুলনা নেই। লটবহরের সে কী একটা পাহাড় এসে জমলো প্ল্যাটফর্মে, কামরাটা বোঝাই হয়ে উঠতে লাগলো ট্রাঙ্কে-বাক্সে, বালিশে বিছানায় —একপাশে, বেঞ্চির শেষ কোণে জানলার ধারে পা গুটিয়ে শাড়িতে-শেমিজে জড়োসড়ো হয়ে বসলো এসে শ্রীপর্ণা অপরাধীর মতো। আশ্চর্য, ঘুমের অন্ধকারে চেনা সেই লোকটি কখন ভিড় সরিয়ে ঠিক তার পাশটিতেই এসে বসেছে। শ্রীপর্ণা যেন আর বিদেশীদের মধ্যে পড়ে নেই, যেন হাতের কাছেই আছে তার আপনার লোক, এমন লোক যার সঙ্গে কথা না কইলেও কথা বলা হয়, যে কাছে বসে থাকলেই মনে হয় কোথাও আর এতোটুকুও ভয় নেই। গাড়ি ছেড়ে দিলো, কোথায় না-জানি শ্রীপর্ণা চলেছে, ফেলে তার এই ঘরে ফিরে যাওয়া সবুজ সন্ধ্যাকাল, বাড়ির পিছনে বিশাল তাদের সেই আমবাগানের ছায়া, শীতে সেই ভোররাতে উঠে পুকুর-ঘাটে গিয়ে তার কলার খোলা ভাসানো। তার চোখের সামনে দিয়ে মাঠের পর মাঠ যাচ্ছে ঘুরে, বেণীর ফাঁকে-ফাঁকে আঁকাবাঁকা ফিতের মতো বনের ফাঁকে-ফাঁকে ছোট-ছোট নদী, গাছ-পাতার আড়ালে তারি মতো মাথায় ঘোমটা টেনে ছোট-ছোট গ্রামগুলি কেমন নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে। এ-সব ফেলে কোথায় না-জানি সে যাচ্ছে, কেনই বা যে যাচ্ছে তা তাকে কে বলবে? এতোক্ষণে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে

উঠোনময় ছুটোছুটি করে সে ঘরে ফিরেছে, দু' হাতের সঙ্গে হাঁটু জড়িয়ে মার কোলের কাছে বসে বেঁধে নিয়েছে চুল, লণ্ঠনে ভরেছে তেল, সন্ধ্যা দিয়েছে ইঁট-বাঁধানো তুলসীতলায়। এখন যেন তা বিশ্বাস করতেও সাহস হয় না। সে-বাড়ি তার বাড়ি নয়, সেই সন্ধ্যাকালটি তার নিজের জন্যে তৈরি হয়নি, আর কার হাতের বাতি পেয়ে তুলসীতলাটি তেমনি ঝকঝক করে উঠেছে। শুধু সে-ই সেখানে নেই, শুধু তারই সেখানে বাসা নয়।

এতোটা শ্রীপর্ণা ভাবতেও পারতো না। তাকে নিয়ে যেন একশো হাতে কাড়াকাড়ি পড়ে গেলো। ক্ষীরোদসমুদ্র থেকে লক্ষ্মী উঠে এসেছে। কী সে উপহারের ঘটা, তার শোবার ঘরটা দাঁড়িয়ে গেলো একটা মিউজিয়মে। সমস্ত ব্যাপারটা শ্রীপর্ণার চোখে একটা ভীমকায় সম্পৎশালিতার চেহারা নিয়ে বসলো। ছেলেবেলায় কোন কালে বাবা তাকে এক বাক্স সাবান এনে দিয়েছিলেন, সাবানগুলি ফুরিয়ে গেলেও বাক্সটা সে অনেকদিন রেখে দিয়েছিলো লুকিয়ে, যখনই লোভ হতো, সে বাক্সটার গন্ধ শুঁকতো—সে-ই ছিলো তার এতোদিনের একমাত্র ঐশ্বর্য। আজ তার উপরে সমস্ত আকাশ যেন ছড়িয়ে পড়েছে। লোকে সাধে কি কল্‌কাতা বলে? কল্‌কাতা না হলে কি কেউ এতো ভালোবাসে, এত জিনিস দেয়, সব সময় সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখে? বাড়িতে সে একহাতে বড়ো-বড়ো বালতি করে জল তুলে আনতো, লাট্টুর মতো ঘুরে বেড়াতো কাজের লেপ্‌তিতে, কিন্তু এখানে সামান্য পান সাজতে বসে আঙুলের ডগাগুলো চুনে-খয়েরে রঙিন করাও তার বারণ। তাই, তাই সবাই বিয়ে করে, বিয়ের নামে মেয়েরা সবাই ময়ূর হয়ে ওঠে—এতোদিনে শ্রীপর্ণা বুঝতে পারলো। সত্যি, শাড়িগুলির কী কামদার পাড়, গয়নাগুলির কী অসম্ভব চেকনাই! এতো জিনিস সে রাখবে কোথায়? শ্বশুরমশাই কিনে নিয়ে এলেন প্রকাণ্ড একটা আলমারি, আয়না দেয়া, চাবি দিয়ে গেলেন তার নিজের আঁচলে বেঁধে। পেয়ে-পেয়ে সমস্ত পৃথিবী যেন সে ফুরিয়ে দেবে। এতোতেও কি শেষ আছে পাওয়ার? তারপর রাতের অন্ধকারে আবার তার পাশে জেগে ওঠে নতুন সূর্য, আলোয় তার সমস্ত আকাশ আলোড়িত হয়ে ওঠে। রোদ পেয়ে পাখির মতো সে এখন চোখ খুলতে পেরেছে। আগে-আগে তার ভীষণ লজ্জা করতো, কিন্তু লজ্জার যে এতো মধুরতা, এতো অসহ্য মধুরতা থাকতে পারে, তা শ্রীপর্ণার আগে আর কে জেনেছে? মুখে তার আগে কথা ফুটতে

চাইতো না, কিন্তু এমন একজন তার পাশে শুয়ে আছে যার সঙ্গে কথা না বলে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকে তার সাধ্য কী। আর, কী-বা সব কথা! তার কি ভাষা আছে, না কেউ তার মানে বুঝতে পারে?

এমন দুষ্টু লোক শ্রীপর্ণা ত্রিভুবনে কোথাও দেখেনি। তার এতো-যত্নে-বাঁধা ফাঁপানো খোঁপাটা খুলে-ভেঙে পিঠময় ছড়িয়ে না দিলে তার স্বস্তি নেই। ঘুমে চোখ আসছে ভারি হয়ে, ফুলের পাপড়ির উপর প্রজাপতির পাখার মতো, কিন্তু এমন সুন্দর, ঠাণ্ডা অন্ধকার, এমন সুন্দর সবাই এখন চুপ করে গেছে, এমন সুন্দর বাইরে শিশির ঝরে পড়ছে ঘাসের উপর, এর মধ্যে কেউ কি কখনো ঘুমোয়? 'ওঠো, ওঠো পর্ণা, বৃষ্টি আসছে, আকাশে ছাড়া পেয়েছে শুঁড়-দোলানো বুনো হাতির দল, কালো অন্ধ একটা শকুনের মতো আকাশ পাখা ঝাপ্‌টাচ্ছে, জাহাজের ডেকের মতো দুলে উঠছে পৃথিবী, ওঠো, জানলায় বসে এমন বৃষ্টি দেখবে না, বৃষ্টির এই ধারালো, দীর্ঘ ধারা? যদি কোনো রাতে চাঁদ উঠতো বড়ো হয়ে, আকাশ গলে যেতো নগ্নতায়, বিছানাটা পেড়ে নিয়ে এসো খাট থেকে, দক্ষিণের নিচু জানলার ধারে, কেননা অতোদূরে খাটের উপরে চাঁদ এসে পৌঁছুতে পারে না। খুব গরম লাগছে কি, পা টিপে-টিপে, নিশ্বাস বন্ধ করে চুপি-চুপি ছাদে, চিল-কোঠায় উঠে এসো। এমন দুষ্টু লোকের সঙ্গে কে পেরে উঠবে? তার পড়ার উপর বাবার কড়া পাহারা, এক্‌জামিন কাছে এসে পড়েছে, তবু লুকিয়ে-লুকিয়ে, এ-পাশ ও-পাশ তাকাতে-তাকাতে দিনে-দুপুরেই সে পিছ্‌লে ঢুকে পড়তো যে-ঘরে শ্রীপর্ণা হয়তো চেয়ারে বসে একলা সেলাই করছে। নিঃশব্দে পিছন থেকে এসে তার মাথায় একটা টোকা মেরে টুপ করে নীচে বসে পড়তো গুঁড়ি মেরে। শ্রীপর্ণা চারদিকে চাইতো ফ্যাল-ফ্যাল করে, কাউকে দেখতে পেতো না, আবার চোখ নামিয়ে সেলাই করে যেতো। অমনি আবার পায়ের পাতায় কে চিমটি কাটলে। শ্রীপর্ণা এবার সারা শরীরে বেসামাল হয়ে উঠতে গেলো ধড়মড়িয়ে, কিন্তু চেয়ার নিয়ে পেছন দিকে ছিটকে প্রায় পড়ে আর কি—তার বেণীর বাড়তি ফিতের সঙ্গে চেয়ারের একটা পায়া কে বেঁধে দিয়েছে আলগোছে। হয়তো ক্ষীরোদ পড়ছে তার টেবিলে, বারান্দার রেলিঙে রোদে-শুকোতে-দেয়া তোষকটা এসেছে শ্রীপর্ণা ফিরিয়ে দিতে, অমনি তার মুখের উপর পাকানো কাগজের ছোট একটা গুলি কে ছুঁড়ে মারলো! কাগজটা তাকে নিখুঁত হাত-সাফাই করে কুড়িয়ে নিতে

হলো অবিশ্যি। তাতে কতো সব মাথামুণ্ডু, বে-আইনি কথা লেখা থাকতো। লেখা থাকতো : তোমার জন্যে সেই হলদেপানা টক লেবেনচুষ কিনে এনেছি, খাবে তো চলে এসো টুপ করে। শ্রীপর্ণাকে তক্ষুনি আবার আরেক প্রস্থ জামা-কাপড় শুকোতে দিতে যেতে হতো বটে বারান্দায়, কিন্তু ঘরে নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তার হাতের টিপ ভালো নয়, কাগজটা লক্ষ্যস্থলে না পৌছে তার ভীরু হৃদয়ের মতো ঘরের বাতাসে উড়তে থাকতো এখানে-সেখানে। আর ক্ষীরোদের পড়া! জালের থেকে মাছের মতো ছিট্‌কে সে বেরিয়ে পড়তো সেই একটুকরো কাগজের লোভে, আকাশ থেকে ঝরে পড়া সেই একটুকরো নীলিমার মুক্তিতে, শ্রীপর্ণার সেই ক'টি আঁকাবাঁকা অক্ষরের অরণ্যে। আর কী-ই বা লেখা থাকতো অতো! লেখা থাকতো, শ্রীপর্ণা ধরে ফেলেছে তার দুষ্টুমি, অক্ষরের কোণগুলিতে তার হালকা হাসি ক'টি টল্‌টল্‌ করছে,—লেখা থাকতো : লেবেনচুষই যদি দেবে, তবে তাই একটা ছুঁড়ে না দিয়ে ঐ একটা কাগজ ছুঁড়ে মারলে কেন?

শ্রীপর্ণাকে বার কয়েক বাপের বাড়ি বেড়াতে যেতে হয়েছিলো অবিশ্যি, বেড়াতেই বটে। কিন্তু কয়েক দিন যেতেই দিনগুলি আর কাটতে চাইতো না, রাতগুলি উঠতো পাথরের মতো ভার হয়ে। এখানে তার অনেক জায়গা, অনেক অবকাশ—দালানে বসে খড়ি দিয়ে ছক্‌ কেটে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে দশ-পঁচিশ খেলো, মেঝের উপর শীতল-পাটি বিছিয়ে বালিশে ভিজে চুল ছড়িয়ে বই পড়ো কোনো নাম না-জানা লেখকের : এখানে এই সবুজ, দীর্ঘায়িত, মন্থর সন্ধ্যাকাল, মাঠময় রৌদ্রদগ্ধ স্তব্ধতা, দু' চোখ খুলে দেখবার মতো এতো অন্ধকার, তারাগুলি সাপের চোখের মতো উজ্জ্বল, কালো মখমলের উপর ছড়ানো কতোগুলি মুক্তো : এখানে এতো আলো, এতো হাওয়া, এতো ঘুম, তবু শ্রীপর্ণার মনে যেন সুখ নেই। তার ভালো লাগতো, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে দেখা, কল্‌কাতার বাড়ির সেই নিঃশব্দ সিঁড়ি, নীচে দেয়ালের ফোকরে পায়রারা বাসা করেছে, বারান্দার উপর পড়েছে ক'টি রোদের বাঁকা, দীর্ঘ রেখা। হয়তো বাসনওলা চলেছে ঘণ্টা বাজিয়ে, মা পা ছড়িয়ে বসে কাঁথা সেলাই করছেন, রাস্তায় জল দেবার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখানে তার কিছুই করবার নেই, যতোক্ষণ ইচ্ছে চুপ করে শুয়ে থাকো, যতোদূর চোখ যায় চেয়ে থাকো ধূসর দিগন্তের দিকে, গাছের শক্তিশালী নিঃশব্দতার দিকে, রৌদ্রের পরিব্যাপী

রিক্ততার দিকে, অন্যমনস্ক, শিথিল-শীতল। কিন্তু তার ভালো লাগতো, যদি সে এখন রেলিঙ থেকে শুকনো কাপড় তুলে কুচিয়ে-কুচিয়ে ভরে রাখতে পারতো আলনা, কুঁজোয় ভরতে পারতো জল—এতোক্ষণ নিশ্চয় কলে জল এসে গেছে—কাজ করবার ফাঁকে যদি হাল্‌কা পায়ে একটু ঘুর-ঘুর করতে পারতো এখানে-সেখানে, তার পড়ার ঘরের আশে-পাশে। সে যেন সাদা, প্রাঞ্জল খানিকটা গদ্য, তাতে ছন্দের বাধা নেই বলে নেই আর কোনো সঙ্কেত, নয় আর সে কোনো কবিতা। মাথায় ঘোমটা রাখবারো তার এখানে দরকার নেই, আঁচলটা বাতাসে উড়ছে এলোমেলো। চুল বাঁধবার সময় সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দের ভয়ে বারে-বারে তাকে চম্‌কে উঠতে হয় না, যতোক্ষণ খুশি, যে ভঙ্গিতে সহজ, শুয়ে থাকতে পারো বিছানায়। পুকুর থেকে ভিজে কাপড়ে উঠোনের রোদে উঠে এসে চুল ঝাড়লে তাকে কে বাধা দেয়, কে বাধা দেয় যদি সে কোমরে আঁচল জড়িয়ে মেয়েদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে, গাছে ওঠে ডাঁসা-ডাঁসা পেয়ারা পাড়তে। ইচ্ছে মতো বড়ো-বড়ো হাঁ করে খেতে পারে সে যতো খুশি, গলা ছেড়ে হেসে উঠতে পারে যখন-তখন,. সন্ধ্যে হতেই ঘুমে জমে যেতে পারে নিটোল হয়ে। কিন্তু ভালো লাগে না তার এই মুক্ত অকৃত্রিমতা, ভালো লাগে না সব সময় নিজেকে এমনি ভুলে থাকতে। সে যেন সে নয়, উপন্যাসে পড়েছে এমন এক অচেনা নায়িকা।

বাঁচতো না সে এখানে, যদি না মাঝে-মাঝে তার চিঠি আসতো, হপ্তায় অন্তত দু'খানা। খস্‌খসে রঙিন খামের উপর পরিচ্ছন্ন ক'টি অক্ষর। শ্রীপর্ণার সমস্ত শরীর বহুতন্ত্রিকা বীণার মতো উঠতো ঝঙ্কার দিয়ে : সেই একটুকরো চিঠি, যেন বনে-বনে বসন্তের সানন্দ আর্তনাদ নিয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ সে-চিঠি সে পড়তো না, শেমিজের মধ্যে বুকের নিভৃতিতে লুকিয়ে রাখতো, বাইরে চেষ্টা করতো দেখাতে কিছুই যেন হয়নি, কিছুই যেন বদল হয়নি সংসারের। যেন তেমনি করে আজো সূর্য উঠেছে, গাছে ধরেছে পাতা, পাখিরা করছে ডাকাডাকি। কিন্তু শ্রীপর্ণা এমন দিন আর কোথাও দেখেনি, এমন সূর্য ওঠা। এতো বড়ো সূর্য, অথচ একান্ত করে আজ শুধু তারি উপর সে ঝরে পড়ছে, এতো বড়ো আকাশ, অথচ সে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে তারি শাড়ির আঁচলে। অনেকক্ষণ সে-চিঠি সে পড়তো না, পরে নিয়ে যেতো শয্যার নিভৃতিতে, আশরীর অসহ্য শিহরণের মতো খুলে ফেলতো সে চিঠির আবরণ, প্রতিটি

অক্ষর মদের ঘন, উত্তপ্ত ফোঁটার মতো ঝরে পড়তো তার মুখের উপর, কোনোটা বা শিশিরের মতো, ঘুমের মতো, অশ্রুর মতো। এ কেমন ধরনের প্রেমপত্র, তার সমবয়সী সখীরা মাথায় হাত দিয়ে বসতো একেবারে, কোথাও একটা প্রেমের কথা নেই। শতকোটি ছেড়ে গুনে একটা চুমুও সে পাঠায়নি চিঠিতে। খালি যতো খুঁটিনাটি অবান্তর কথা. বাড়িতে নতুন কে চাকর এসেছে—তার কী নাম, গেলো ছুটে ধোবার বাড়ি থেকে তার ক'খানা কাপড় আসেনি. নিজ হাতে টেব্‌ল্ গুছোতে গিয়ে কেমন করে সে সেই দোয়াতদানটা ভেঙে ফেলেছিলো, কেমন আজকাল তার জানলার মুখোমুখি উঠছে হলদে চাঁদ। সাহিত্য হিসেবে এ-সব কথার কী দাম: সবাই ঘোরতর সন্দেহ করতে লাগলো শ্রীপর্ণাকে তার স্বামী সত্যি ভালোবাসে কি না। আশ্চর্য, ঐ চার অক্ষরের কথাটার যে কী অর্থ শ্রীপর্ণা ভেবে কিছু বার করতে পারে না, তাই সে অনেক কাটাকুটি করে চিঠির উত্তর লেখে: ছোট-ছোট বৃষ্টির সবুজ ফোঁটার মতো মাঠে অগুনতি কী ফুল ফুটেছে, কোথা থেকে কাল তাদের গরুর হয়েছে সাদায়-বাদামীতে বিচিত্রিত একটা বাছুর, হয়েই কেমন কাঁপতে-কাঁপতে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালো, পুকুরে নতুন মাছ ফেলেছে, দু'পায়ে জল ছিটোতে-ছিটোতে কতোদূর পর্যন্ত সে সাঁতার কেটে আসে একলা। ভালোবাসার কথা সে-ও একটি লিখতে পারে না।

জোয়ারের জলের মতো দিনগুলি জোরে বয়ে যেতে লাগলো, সমুদ্রের উপর দিয়ে পাখির পাখা-ঝাপ্‌টানির মতো। শ্রীপর্ণা প্রথম থামলো, যখন বছর দুই না পুরতে জঠরে তার সন্তান এসেছে আদিম মাটির প্রচ্ছন্ন অন্ধকারে অঙ্কুরায়মান বৃক্ষপ্রাণের মতো। পূর্বাপর ব্যাপারটা সে বুঝতে পারলো না সচেতন হয়ে, শুধু ঘন বনে জ্বলন্ত বসন্ত-বিদারণের মতো সে সৌন্দর্যে ঝল্‌মল্ করে উঠলো। নিজের দিকে তাকালো সে মুগ্ধ হয়ে। সমস্ত শরীরে যেন সুরভিত একটা নেশা লেগেছে। চোখের কোলে ঘুমে-জড়ানো অলস একটি আবেশ, ধূসর একটি স্বপ্ন। তার আর নেই সেই লীলা, নেই সেই লঘুতা: নতুন পাতার মতো সবুজ, বিশীর্ণ সেই শ্রীপর্ণা কেমন গাঢ়, ঘন, নিটোল একটি ফলের মতো ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে! তার এইটুকু শরীরে, একতাল কাদার মতো নরম এই শরীরে কিনা এতো রহস্য! এতো সুখ! তা ভাবতেও যেন ভয়ঙ্কর লাগছে। যেন অন্ধকারে কান্নার আগুনের মতো ফুটে উঠছে তারা, কঙ্করে ফুটছে ঘাস। শুধু স্থূল

শারীরিকতা দিয়ে যেন এই বিশাল অনুভূতিকে আয়ত্ত করা যাবে না। শ্রীপর্ণা রাতের জানলার কাছে চুপ করে বসে রইলো।

সে-মোহ লেগেছিলো ক্ষীরোদেরো চোখে। স্নেহে নরম, ভাবে নিবিড় দু'টি চক্ষু দিয়ে সে তার সর্বাঙ্গ লেহন করে বলতো : তোমাকে কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে পর্ণা, একমাত্র রঘুবংশের কালিদাসই তা বর্ণনা করতে পারেন। সত্যি, আগে তুমি ছিলে মিঠে, হাল্‌কা একটি বাঙলা সুর, এখন হয়ে উঠেছ ছন্দোবদ্ধ, ঘনীভূত একটি সংস্কৃত শ্লোক। পৃথিবীতে এতো রূপ আর যেন কোথাও হতে নেই।

কিন্তু আকস্মিক, শ্রীপর্ণা যখন মাঝপথ ছাড়িয়ে এসেছে, ঘটলো এদিকে দুর্ঘটনা, প্রিয়লালবাবুর সংসারে আকাশ পড়লো ভেঙে। এক সপ্তাহও কাটলো না, ততোদিনের একটা প্রবল, অত্যাগী জ্বরে ক্ষীরোদ নিশ্চিহ্ন নিভে গেলো। মুহূর্তে কী যে কাণ্ড ঘটে গেলো, কেউ ধারণা করতে পারলো না, শ্রীপর্ণাও না। দেখতে-দেখতে সমস্ত বাড়িটা কেমন হাড়ের মতো শুকনো হয়ে গেলো, ভূতের মতো অশরীরী। সবাইকে কাঁদতে দেখে শ্রীপর্ণাও কাঁদলে, এবং আশ্চর্য, সে এতো ছেলেমানুষ, নিজের জন্য না কেঁদে কাঁদলো কিনা যে মরে গেছে একান্ত করে তারই জন্যে। কিন্তু বেশি তাকে কাঁদতে দেয়া হলো না, বেশি বৃষ্টিতে যদি শস্য যায় নষ্ট হয়ে, তারই শরীরে এখনো আছে ক্ষীরোদের উত্তাপ, তারই রক্তের রশ্মিতে ক্ষীরোদের শেষ হোমশিখা। শ্রীপর্ণা আর কাঁদলো না : আর্দ্র, গভীর, সহিষ্ণু মাটির মতো রোপিত সেই বীজকণাটিকে সে পরম স্নেহে লালন করতে লাগলো।

শুকনো, হল্‌দে, ঝরা-পাতার মতো তার গা থেকে খসে পড়তে লাগলো একেক করে গয়নার টুকরো; ক্ষণকালিক সন্ধ্যারাগের পর তার রঙিন, প্রগল্‌ভ শাড়িগুলি অন্ধকারের মতো সাদা, শূন্য হয়ে উঠলো এক নিঃশ্বাসে। কপালটাকে দেখালো অনেকখানি চওড়া, শরীরটা ঢিলে, চুলগুলি কেবল এলোমেলো। আগে তবু-বা ছিলো হাওয়ায়-ওড়া সবুজ একটি পাতা, এখন হয়ে দাঁড়ালো মরা, শুকনো একটা শিকড়। শ্বশুর-শাশুড়ি এরি মধ্যে তার ভীষণ যত্ন নিতে লাগলেন—পাথরের কবরের উপর যেন খানিকটা চুনকাম করা হলো। তারপর আদিত্য যখন হলো, শ্রীপর্ণা একেবারে ভেঙে গেছে—সে তখন একেবারে ব্যর্থ, তার শরীর তখন শস্য-কেটে-নিয়ে-যাওয়া মাঠের মতোই শূন্য, চিহ্নহীন।

আদিত্য হবার পর শ্রীপর্ণা বিস্তৃত বিছানা নিলে। ততোদিন একটানা তার ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হচ্ছে, বুকে নেই এক ফোঁটা দুধ, দেহে নেই এতোটুকু শক্তি। শাশুড়ি বিভাবতী আদিত্যকে বুকের উত্তাপে বাঁচিয়ে রাখতে লাগলেন। দীর্ঘ নয় মাস পর শ্রীপর্ণা যখন প্রথম উঠে বসতে পারলো, আদিত্যও তখন হাঁটু দুমড়িয়ে অল্প-অল্প উঠে বসতে শিখেছে ; দেখা গেল দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে আদিত্য মা-কে ফেলে ঠাকুমার কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই, এবার, দীর্ঘ বিশ্রাম নিতে শ্রীপর্ণা যখন বাপের বাড়ি ফিরে এলো, ছেলেকে বিভাবতী কিছুতেই সঙ্গে দিলেন না, সে তাঁর এতো ন্যাওটা। রোগা শরীর নিয়ে শ্রীপর্ণা তাকে না পারবে সামলাতে, না বা করতে শুশ্রূষা। আদিত্য তাঁদের কী জিনিস, শ্রীপর্ণা তার বুঝবে কী! বিভাবতী তাকে আঁচলে বেঁধে রাখবেন।

খালি হাতে শ্রীপর্ণা বাপের বাড়ি ফিরে এলো। শত আকাশ ভেঙে পড়লেও আকাশের নীচেকার লোকদের বাঁচতে হয়, শ্রীপর্ণাও চাইলো বাঁচতে। দেয়ালের ফোকরে ইঁদুরের মতো নয়, নয় টবে-পোতা বন্ধ্যা পাতাবাহার। পশুপতি তাকে পড়াতে চাইলো, চল্‌তি আধুনিক অর্থে। নইলে দুই রিক্ত, শূন্য হাতে কোন আকাশ সে আঁকড়ে ধরবে? এই নিয়ে দুই পরিবারে বাধলো একটা সঙ্ঘর্ষ, শ্রীপর্ণার উদ্ধত, দুর্নম্য ভঙ্গি তাতে দিলে ধার। পুত্রবধূর এমন পরিণতি প্রিয়বাবু আশা করেননি, তার উপর তাঁর সংসারের ছিলো আরো অনেক দাবি, যেন বা আরো অনেক দখল। এমন করে তাকে খরচের ঘরে ঠেলে দিতে তাঁদের মন উঠলো না। ক্ষীরোদ নেই, নেই ; কিন্তু সমস্ত ঘর জুড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তার স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস, তাঁরা চেয়েছিলেন শ্রীপর্ণা তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে সেই দীর্ঘশ্বাসটি অমর করে রাখুক। তার মলিন, ক্ষুণ্ণ মুখে তাঁরা যেন ক্ষীরোদের তিরোভাবের বেদনাটি পড়ে নিতে পারেন নিশিদিন। তা ছাড়া, শ্রীপর্ণা শুধু ক্ষীরোদের একার ছিলো না, সে ছিলো সমস্ত পরিবারের, বিশাল অবয়বের বিচ্ছিন্ন একটা অঙ্গ ; নিজের জন্যে নিজেকে নির্মাণ করা নয়, পরিবারের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করাই হচ্ছে বিয়ের আদর্শ। অন্তত প্রিয়বাবুর তামাক সেজে দেবার জন্যেও হাতের কাছে একটি লোক দরকার। এটা-ওটা, টুকিটাকি কতো কী জিনিস অগোছাল হয়ে আছে।

শ্রীপর্ণা কোনো কথা কানে তুললো না, সোজা চলে এলো ঢাকায়, ঢুকলো

ইডেন্-এ, লম্বা পা ফেলে ম্যাট্রিকুলেশান্‌টা পার হয়ে গেলো। প্রিয়বাবুর সংসার থেকে ক্ষীরোদ যেন সত্যিই গেলো হারিয়ে, এমন-কি তার স্মৃতির ঘটলো অপমান। আদিত্যকে তাঁরা মায়ের কাছে ঘেঁষতে দিলেন না। এতে আপাতত শ্রীপর্ণার কিছু সুবিধেই হলো যা হোক্, খোলা হাত-পায়ে সময়ের সমুদ্রে যথেচ্ছ সে সাঁতার কাটতে পারলো। হস্‌টেলে থেকে আর কোলে-কাঁখে করে ছেলে মানুষ করা যেতো না। আপাতত এ ভালোই হলো বলতে হবে। শ্রীপর্ণা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে, বা রাত জেগে-জেগে বলতে পারো, স্বচ্ছন্দে বি-এ-টা পাশ করলো, চোখ মেলে পৃথিবীতে খুঁজে পেলো যেন অনেকখানি জায়গা। আর বেশিদূর এগোবার তার সাহস হলো না, ওদিকে পশুপতির থলের মুখটা কুঁচ্‌কে এসেছে। শ্রীপর্ণা নিজেই নামলো এবার টাকা রোজগারের পথে, যাই কেননা বলো এবং যে-কোনো অবস্থাতেই না হোক্, টাকাই হচ্ছে সাফল্যের শীল-মোহর। মাস্টারি নিয়ে চলে এলো সে গিরিডিতে।

নেমে এসেছে বিস্মৃতির শীত: পবিত্র, প্রসন্ন বিস্মৃতির। ছাড়া কাপড়ের মতো গা থেকে তার খসে গেছে অতীতের অন্ধকার, বাসি খবরের কাগজের মতো সে তা ফেলে দিয়েছে ছুঁড়ে। সে চলে এসেছে আরেক নতুন পৃষ্ঠায়, নতুন নিঃসঙ্গতায়—গ্রন্থকারের যেমন আসা এক উপন্যাস থেকে আরেক উপন্যাসে। তার কাছে বাঁচা অর্থ চলা, সময়ের রেখাটাকে অসমাপ্য দীর্ঘায়মান করে তোলা অগ্রগমনের তীক্ষ্ণতায়, বসে-বসে তার উপর মোটা করে দাগা বুলোনো নয়। সে-জীবন নকল দাঁতের মতোই ঘৃণ্য, শ্রীপর্ণার কাছে মনে হলো। স্মৃতিরো একটা আয়ু আছে, যেমন সব-কিছুরই আছে একটা নিখাদ শেষ। আবার এই শেষের পরেই আরম্ভ। শ্রীপর্ণাও আবার আরম্ভ করলো, কখন 'আরম্ভ করলো বলা কঠিন—সময় চলেছে থেমে-থেমে ছন্দ মেপে-মেপে নয়, প্রবহমান প্রবল ধারাবাহিকতায়। সময়ের জলে সময়ের দাগ গেলো মুছে: শ্রীপর্ণা আবার শ্রীপর্ণা। দুঃখ সহ্য করবার মধ্যে সাহস আছে প্রচুর, কিন্তু প্রচুরতরো সাহস আছে সেই দুঃখ প্রত্যাখ্যান করায়: এক নিঃশ্বাসে শ্রীপর্ণা সে-দুঃখ উত্তীর্ণ হয়ে এলো। দেখলো, পৃথিবীতে সবই কেবল জল নয়, আছে দ্বীপ, সবুজ, নির্জন, সূর্যময়। শ্রীপর্ণা উঠলো এসে তেমনি একটা দ্বীপে, তার অনুভূতির গভীর নিভৃতিতে।

সুতোটা সে তা বলে একেবারে ছেড়ে দিতে পারেনি, মাঝে-মাঝে তার

আদিত্যর কথা মনে পড়তো, বুকটা উঠতো হু-হু করে। ইচ্ছে করতো, উন্মত্তের মতো ইচ্ছে করতো, তাকে সে তার দুই উষ্ণ, উচ্ছলিত বুকের উপর চেপে ধরে, তার নির্দন্ত, নিষ্পাপ মুখ সে মুখ দিয়ে পান করে অজস্র। সে তারই শরীরের এক কণা স্বপ্ন, তারই আকাশের একটুকরো রামধনু। তারই গূঢ়তম অন্ধকারে আণবিক সেই প্রাণ সে তিলে-তিলে রঞ্জিত রক্তে সঞ্চীয়মান করে তুলেছে, তারই জন্যে তার সমস্ত শরীর রাতের অরণ্যের মতো কেঁদে-কেঁদে উঠতো। পড়াশোনার ফাঁকে ছুটিছাটা মিললেই সে লুকিয়ে চলে যেতো কল্‌কাতায়, নতুন বালিগঞ্জে, যেখানে তার শ্বশুর ব্যাঙ্ক ঝেড়ে প্রকাণ্ড বাড়ি ফেঁদেছেন। জানতো, তার জন্যে দরজা সেখানে অবারিত নয়, কেননা সে-বাড়ির দেয়াল তাকে ধরে রাখতে পারেনি, প্রেতায়িত, ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলে-ফেলে তাকে জমিয়ে দিতে পারেনি অস্বীকৃত কঙ্কালে—যেমন হাতের মুঠোয় জল নিয়ে তাকে এঁটে-এঁটে শক্ত করা যায় না: জানতো সে বাঁচবার প্রয়োজনে, আদিম, মহান প্রয়োজনে, অতীতকে করেছে অস্বীকার, এবং সেই কারণে ও-বাড়ির লোকেরা তার উপর অনর্গল নয়,—তবু ও-বাড়িতে আদিত্য আছে, তার শরীরের প্রথম একটুকরো স্বপ্ন, তার অন্ধকারে প্রথম সূর্যসঞ্চার, তাকে সে একবার দেখে আসবে। রুক্ষ, কৃশ দেহটির উপর বিষাদে-সাদা সংক্ষিপ্ত শাড়ি জড়িয়ে শ্মশানের স্তব্ধ নিশ্বাসের মতো যখন সে উঠে আসতো দোতলায়, একে-একে প্রণাম করতো গুরুজনদের, তখন কেউ তার উপর আশীর্বাদে অজস্র হয়ে উঠতে পারতেন না বটে, তার শ্বশুর ও শাশুড়ি, ভাসুর বা জা-রা, যাঁরা যে-সময়ে যখন থাকতেন,—কিন্তু আদিত্যকে তার লোভী, ক্ষুধার্ত বুকের উপর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো পিষে ধরতে কে তাকে বাধা দেয়? সবাই দূরে সরে দাঁড়াতো মুখ গম্ভীর করে, কিন্তু যতো অন্যায়ই সে করুক, যতো অপমান, মা'র স্নেহকে কে অপমান করবে? শুধু বাড়ির সারদা-দাসীই উঠতো লিক্‌লিকে জিভে কল্‌কল্ করে: কেমনতরো মা তুমি গা শুনি, ছেলে পেটে ধরে সেই ছেলে ফেলে বই নিয়ে সোহাগ করতে বসেছ? এই সোনার চাঁদ ছেলের চেয়ে ছাই-পাশ কতোগুলি বই তোমার বেশি হলো? তোমার চোখে ঘুম আসে, মুখে তুমি ভাত তুলতে পারো? কী রাক্ষুসি মা, বাবা! সোয়ামি খেয়ে হাত-পা-ছাড়া হয়ে কেউ যে অমন করে নাচতে পারে এমন ধারা বাপের জন্মে দেখিনিকো।

বিভাবতী মুখ টিপে বলতেন : বেঁচে থাকলে আরো কতো দেখবি, সারদা।

শ্রীপর্ণা এ-সব কথা, অনেক সব কথা, কানেও তুলতো না। আদিত্যকে নিয়ে থাকতো সে বিভোর হয়ে, চাঁদকে নিয়ে যেমন রাতের সমুদ্র : শুঁকতো তার সমস্ত শরীর, চুমু খেতো তার সমস্ত গা ভরে—ক্ষীণ, ছোট ক'টি মুহূর্ত শুধু, আদিত্য উঠতো কেঁদে, হাঁপিয়ে, অস্থির হয়ে, মা'র কোল ছেড়ে ঠাকুমার কোলে যেতে পারলে সে বাঁচে।

বিভাবতী নাকের মধ্য দিয়ে ধারালো একটা শব্দ করে উঠতেন : কী আদরের ঘটা! ছেলেটা কেঁদে একেবারে হাট বসালো। ছেলে পেটে ধরলেই আর মা হওয়া যায় না।

সারদা-দাসী কাছে-কাছেই আছে। সেও অমনি স্বর ধরতো ; বাঁচলে কতো দেখবো আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

ছেলের কান্না থামাতে বাক্স থেকে সে রঙ-বেরঙের খেলনা খুলে আনতো. গোড়ায়-গোড়ায় চুষিকাঠি, ঝুমঝুমি, বিস্কুটের কৌটো—পাজামা, পাড়-ছেঁড়া রঙিন সুতোয় কাঁথা সেলাই করে। এবং পর-পর সময়ে ক্রমান্বয়ে টিনের বাঁশি, রবারের বল, লজেন্সের বোতল—জিন বা খাকির হাফ-প্যাণ্ট। শেষ পর্যন্ত একটা ট্রাইসিকেল। জিনিসগুলি আদিত্য হাত বাড়িয়ে নিতো বটে, বিশেষ করে যেগুলো মুখ বাড়িয়ে নেয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীপর্ণাকে সে গ্রহণ করলে না, কিছুতেই না। কতোক্ষণে ঠাকুমার কোলে গিয়ে সে শান্ত হবে! শ্রীপর্ণার হাতে পরবে না সে জামা, করবে না সে স্নান, নেবে না সে দুধের বোতল। সব সময়ে তার ঠাকুমাকে চাই। সেই ক'টি দিন, যে ক'টা দিন থাকতো সে সে-বাড়িতে, রাতে আদিত্য শুতো তার ঠাকুমারই বুকের কিনারে : শ্রীপর্ণা পাশের বারান্দায়, শ্বেতপাথরের ঠাণ্ডা মেঝের উপর, তার নিঘুম, নিরানন্দ নির্জনতায়। মাঝরাতে আদিত্য হঠাৎ কেঁদে উঠতো শ্রীপর্ণার আত্মার আর্তনাদের মতো। শিশুর অবুঝ আবদার রাখতে গিয়ে বিভাবতী মাঝে-মাঝে নাকাল হতেন, রেগে গিয়ে দিতেন হয়তো বা ধমক, তাঁর বুক থেকে তার ক্ষুধার্ত মুখটা দিতেন হয়তো বা জোর করে ঠেলে, আদিত্য আরো বেশি হাঁ করে তার গলা ছাড়তো। সেই চীৎকার বিঁধতো এসে যেন শ্রীপর্ণার বুকে, ছুরির ফলার মতো। তার মনে হতো, সে-ই যেন এখন আদিত্যকে শান্ত করতে পারে, পারে তাকে বুকের নরম গরমে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে। এখন তার

কাছে এলে আদিত্য নিশ্চয়ই কাঁদবে না, রাতের অন্ধকারে তাকে সে এবার ঠিক চিনতে পারবে। কিন্তু তার মিছিমিছি ব্যস্ত হওয়া, ঠাকুমাই তাকে আবার নিখোঁজ শান্ত করেছেন।

শ্রীপর্ণা বেশি দিন শ্বশুরবাড়ি টিঁকতে পারতো না, ছুটির কয়েকটা সেই ছোট-ছোট হালকা দিনও নয়, সহজেই সে বুঝতে পেরেছিলো, এ-সংসারে তার জায়গা নেই, এ-সংসারে সে ধরবে না। পড়তে গিয়ে সে যে কী বীভৎস অন্যায় করেছে তা সে সবার মুখে সামান্য একটা পৃষ্ঠার মতো পড়তে পারে। শুধু আদিত্যের জন্যেই আসা, এ ক'টা মাস পর সে আরো না-জানি কতো বড়োটি হলো। হয়েছিলো তো মিরকুটে, একটুখানি, রেঁায়া-ওঠা বেরালের ছানার মতো, দেখতে-দেখতে কেমন থুব-থুব মাংস গজালো গায়ে, ভুরুতে হলো চুল, আঙুলের ডগায় ছোট-ছোট নোখের ঝিকিমিকি। শুধু আদিত্যের জন্যেই আসা। কিন্তু সবার চেয়ে সে-ই যেন তার বিরুদ্ধে বেশি প্রতিবাদ করে ওঠে, আর, তার মাঝে থাকে না একটুও বিনীত প্রচ্ছন্নতা। তাই দু'টি দিন সামান্য একটু নেড়ে-চেড়ে, খেলা দিয়ে, আদর করে, সে আবার শ্মশানের স্তব্ধ নিশ্বাসের মতোই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতো, বাকি ক'টা দিন বেড়িয়ে বেড়াতো এখানে-সেখানে আত্মীয় পরিচিতের আশ্রয়ে।

শুধু সেইবার, যে-বার সে ট্রাইসিকেল কিনে এনে দিয়েছিলো, আদিত্য যেন তাকে চিনতে পেরেছিলো, অস্পষ্ট করে, তার মনোহীন শৈশব অবচেতনায়। সিটে সে উঠতে পারতো কষ্ট করে—আদিত্য তখন তিন বছরের—কিন্তু পা-দানিতে পা রেখে প্যাড্‌ল্ করবার কৌশলটা সে কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছে না—শ্রীপর্ণা নিচু হয়ে তার হাত-শুদ্ধু হাতলটা ধরে গুটি-গুটি টেনে নিতো সামনের দিকে, লম্বা টানা বারান্দায়, আর সে শ্রীপর্ণার চোখের দিকে চেয়ে হেসে উঠতো খিল্-খিল্ করে, যেন বা নতুন পরিচয়ের উদার উল্লাসে। কিছুতেই আর তাকে ছাড়া নেই, সে তাকে চিনে ফেলেছে এতো দিনে, শ্রীপর্ণার আঁচলটা সে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলো: আবার তাকে চড়াও, আবার তাকে টেনে নিয়ে চলো এখান থেকে ঐখানে। পরের বার শ্রীপর্ণা এসে দেখলো, কারুর আর তাকে টেনে নিয়ে যেতে হয় না, সে নিজেই স্বচ্ছন্দে নিচু হয়ে হাতলের সঙ্গে প্রায় নাক ঠেকিয়ে ঘুরে-ঘুরে লম্বা দৌড় দিতে পারে সাইকেলে; দেখ, দেখ, অতোখানি উঁচু থেকে দেখাতে পারে কী-সব অসম্ভব

কসরৎ। শ্রীপর্ণাকে আর তার সাহায্যে আসতে হয় না বটে, কিন্তু তাকে আদিত্য নির্ভুল চিনতে পেরেছে, ছুটে এসে তার আঁচল ধরে বলে : আমার জন্য এবার কী এনেছ, বলো ? কাছেই তার এক জেঠিমা বাটি করে সাবানের জলে গয়না বুরুস করছিলেন, উঠলেন মুখ বেঁকিয়ে : ছেলের খাঁই যে আর মেটে না দেখছি। দাদা-জ্যাঠারা দিন নেই রাত নেই ভারে-ভারে এতো রাজ্যের জিনিস এনে ছেলের কপালে জড়ো করছেন, তাতেও তার মন ওঠে না, বাড়িতে যে কেউ এলো অমনি হাঘরের মতো তার কাছে গিয়ে ধন্না দিয়ে পড়া —আমার জন্যে কী এনেছ ? ও তোর জন্যে কী আবার আনবে রে ? আদিত্য কিছুতেই বিশ্বাস করতো না : সত্যি শ্রীপর্ণা যেন তার জন্যে কী এনেছে।

তবু যা-হোক সে লেখাপড়া করছিলো, পাশও না-হয় নেহাৎ করলো ঘটে তার কিছু বুদ্ধি ও মাথায় তার কিছু ঘিলু ছিলো বলে, কিন্তু পাশ করেই পেথম মেলে একেবারে নিতে গেলো একটা চাকরি, তা-ও মাস্টারি, তার শ্বশুরবাড়ির কেউ আর সেটা সহ্য করতে পারলো না। এতো বড়ো ঘরের পুত্রবধূ হয়ে সামান্য ক'টা রুপোর চাকতির জন্যে তাকে চাকরি করতে হবে, এটা যেন ক্ষীরোদের মৃত্যুর চেয়েও মর্মান্তিক। সামান্য একবেলা আলো-চাল ও কাঁচকলা খেয়ে যার জীবন কাটাবার কথা, তার আবার কিসের জন্যে টাকা চাই, অতোগুলি টাকা দিয়ে সে করবে কী ? তাঁর টাকা কতোগুলি বাজে উড়ে গেলেও প্রিয়বাবুর গা-টা অমন চড়চড় করতো না ! কিন্তু কী আর তাঁরা পারেন শ্রীপর্ণার মুখের উপর তাঁদের বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেয়া ছাড়া ? কে আর কী করতে পারে ?

আদিত্য তখন ছ' বছর পেরিয়ে গেছে, দস্তুরমতো আজকাল সে সুতোয় ঢিল বেঁধে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঢিল-নোঙর খেলে, পিলেজেত্তাল, ছোট-ছোট মুঠি ঘুরিয়ে হাত-লেপ্‌তি করে। শ্রীপর্ণাকে ভাসা-ভাসা সে চিনে ফেলেছে, কিসে যে তার রুচি, গুলি আর ঘুণ্ডি-ফল, রঙিন চক্ আর লাল-নীল পেন্সিল, দিয়াশলায়ের খোল আর সাবানের বাক্স, সোনা-দানা জরি-মখমলের চাইতেও যে এগুলি বেশি মূল্যবান, আদিত্য দেখলো, এ-কথা কেবল শ্রীপর্ণাই বুঝতে পেরেছে, শ্রীপর্ণাই তার খেলা-ঘরের সঙ্গিনী, তাকে সে ভালোও বেসেছে শিশুর বিশ্বাসে, যদিও তাকে মা না বলে ডাকতো ছোট-বৌ। এবং পরে

এমনও একদিন এসেছিলো, যখন রাতে শোবার সময় ছাড়া আদিত্য তার ছোট-বৌয়ের কাছ-ছাড়া হতে চাইতো না—ছোট-বৌয়ের চোখে জ্বলছে এতো নতুন-নতুন খেলা, তার আঁচলের তলায় লুকিয়ে আছে এতো সব অদ্ভুত আবিষ্কার! ছোট-বৌ তাকে কতো রকম গল্প বলে—সেও একরকম মজার খেলা, ডানাওলা ঘোড়ায় চড়ে, মেঘের মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছে রাজপুত্র, ছোট একটা কৌটোর মধ্যে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ রাক্ষসীর প্রাণ, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিতেই কেমন রাজকন্যা উঠলো জেগে; তারপর কোনো দিন বা বাঘ-সিংহের গল্প, আদিত্য কেমন একদিন গাছে উঠে তার এয়ার-গানটা দিয়ে মেরে ফেললো আস্ত একটা বাঘ, ডোরা-কাটা হলদে-হলদে দাগ, আগুনের গোলার মতো চোখ, তার গর্জনে সমস্ত জঙ্গল গমগম করছে,—ওঃ, কী মজা, আদিত্য জোরে হাততালি দিয়ে উঠতো, তার এয়ার-গানের এক আওয়াজেই বাঘটা একেবারে মরে গেলো! তারপর ছোট-বৌ তাকে কতো মজার-মজার কবিতা মুখস্ত করাতো, কখনো বুক চিতিয়ে, বা চোখ পাকিয়ে, মুঠি উঁচিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে, গম্ভীর মুখে, একটুও না হেসে সে-সব বীররসের অভিনয় করতে কী যে ভালো লাগতো তার! এতো আমোদ সে আর কোথাও পেতো না, সত্যি করে বলতে, ঠাকুমার বাটি-বাটি পিঠে-পায়েস খাওয়ানোর মধ্যেও নয়। এটা সে স্পষ্ট বুঝতো ছোট-বৌ এ-বাড়ির কেউ নয়, মিনি বেড়ালটা যেমন এ-বাড়ির এমন কি সে অর্থেও নয়, সে দু'টি দিন শুধু এখানে বেড়াতে এসেছে, আবার চলে যাবে তার আরেকটা বাড়িতে, পরীর মতো, আরেক ছেলের কাছে, এমনি গল্প বলতে, ছবির বই দিতে, কবিতা মুখস্ত করাতে। তাই শ্রীপর্ণার যাবার সময় আদিত্য তার হাত ধরে-ধরে বাড়ির ফটক পর্যন্ত এগিয়ে আসতে-আসতে মলিন মুখে জিগ্‌গেস করতো: আবার কবে আসবে, ছোট-বৌ, এবার কী নিয়ে আসবে বলো? তাকে বুকে তুলে নিয়ে গালে-গলায় চুমু খেতে খেতে শ্রীপর্ণা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলতো: শিগ্‌গির চলে আসবো; এবার নিয়ে আসবো, নিয়ে আসবো—সে একটা ভীষণ জিনিস, দেখবে কী নিয়ে আসি। এতো বড়ো বুড়ো ছেলে কোলে উঠে চুমু খাচ্ছে, রাস্তার লোকে দেখলে ভাববে কী, আদিত্য জোর করে নেমে আসতো মাটির উপর, বলতো: আচ্ছা, নিয়ে এসো মনে করে। বলে কতক বা তার অসমাপ্ত খেলার কথা মনে করে প্যাণ্টের আলগা হয়ে আসা বেল্‌টটা দু' হাতে

আঁকড়াতে-আঁকড়াতে তীরের মতো সোজা ছুটে যেতো সে বাড়ির মধ্যে, ফিরেও দেখতো না!

মাস্টারি নেবার পর সে প্রিয়বাবুকে একটা চিঠি লিখেছিলো, আদিত্যকে চেয়ে: চিঠিতে ছিলো বা কোথায় প্রচ্ছন্ন একটি দাবির সুর। প্রিয়বাবু সে-চিঠির সবিস্তার জবাব দিলেন। দীর্ঘ জীবন ধরে তিনি শুধু আইনের চর্বিত-চর্বণ করেছেন, তামাদি আর ছানি, কবলা আর খতিয়ান: এতোদিন পরে পেলেন একটু সাহিত্য করবার সুযোগ! তেজী, জোরালো ভাষায় বহু অকথা-কুকথা বলে শ্রীপর্ণাকে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত করে দিলেন। শুদ্ধ করে মোদ্দা কথা ছিলো তাঁর এই: যে-মেয়ে স্বামীর মৃত্যুর পর বিপথগামিনী হয়, তার সঙ্গে স্বামীর পরিবারের, তার স্মৃতিসম্বলিত কোনো কিছু পরিচয়ের সঙ্গে তার সংস্রব থাকতে পারে না। আদিত্য তাঁদের ছেলে, তাঁদের বংশধর, তাঁদের কুলপ্রদীপ, তার উপর শ্রীপর্ণার কোনো অধিকার নেই, মাইনে-করা সামান্য শিক্ষয়িত্রী হিসেবেও নয়। সে মা নামের অযোগ্য, তার সংস্পর্শ আদিত্যের পক্ষে বিষতুল্য, আদিত্য জানে, তার মা-ও কবে মরে গেছে।

চিঠিটা মুড়ে রাখতে-রাখতে শ্রীপর্ণা মনে-মনে হাসলো। এতোতেই এতো, তবু সে এখনো নিরঞ্জনকে বিয়ে করেনি।

তিন

নিরঞ্জনের সঙ্গে শ্রীপর্ণার আলাপ—কী করে কে বলবে কোথায় এবং কখন তাদের প্রথম আলাপ, কতো লোকের সঙ্গেই তো তার আলাপ হয়েছে এ পর্যন্ত, কে মনে রেখেছে তার খুঁটিনাটি ইতিহাস—গোড়া থেকেই কেমন আত্মার অননুভূয় গভীরতার দিকে মুখ ফিরিয়েছিলো। নিরঞ্জন সদ্য জার্মানি থেকে ফিরেছে কী কতোগুলি দুরুচ্চার উপাধি নিয়ে, কী সব ফের ব্যবসা ফেঁদেছে কল্‌কাতায়, গিরিডিতে এসেছিলো সেই সম্পর্কে, কয়লা আর আবের সন্ধানে, প্রায় দেড় বছর আগে। এবং সেইখানেই শ্রীপর্ণার সঙ্গে তার আলাপ, নভেলি কোনো গুণ্ডার কাছ থেকে বাঁচাতে গিয়ে নয়, নয় বা উশ্রীর বিগলিত রজত নির্জনতায়,—কোনো ঔপন্যাসিক বর্ণনার সঙ্গেই তাকে খাপ খাওয়ানো যাবে না, আলাপ হয়েছিলো যেমন করে সভ্য, ভদ্র, শিক্ষিত মানুষের আলাপ হতে পারে, ধরা যাক্‌, পথে, কোনো চায়ের নেমন্তন্নে, বা স্কুলের কোনো প্রাইজ-বিতরণের সভায়—এতোদিনে সে-সব কথা তাদের মনেও নেই। এতোদিন, কেননা আলাপ হবার পর থেকে একেকটি দিন তারা একেকটি নিশ্বাসের মতো উড়িয়ে দিয়ে এসেছে, দিনগুলি কাটছিলো তাদের বর্ষমান নির্ঝর-জলের উপর দিয়ে। এ আলাপ হতোই, এ আলাপ তাদের বহু আগের থেকেই নির্বাচিত, তাই এর কোনো পশ্চাৎপটের দরকার হয়নি, নয় কোনো দৃশ্যসংস্থানের। তারা কে ও কী সেটা পরের কথা, তাদের আলাপটাই হচ্ছে মুখ্য, প্রধানতরো।

সংসারে নিরঞ্জন একেবারে একা, তার বাবার বিস্তীর্ণ ব্যবসার সে একক উত্তরাধিকারী। বাপের জীবদ্দশায়ই সে ইউরোপ গিয়েছিলো ব্যবসা-সংক্রান্ত কী সব জটিল বিষয়ে পারঙ্গম হতে, দেশে ফিরতে-ফিরতেই বাবা গেলেন মারা, প্রকাণ্ড ব্যবসাটা তার হাতে এসে পড়লো। ব্যবসাটা সে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে কিনা সেটা পরের কথা, মরতে-মরতেও সেটা যে নিরঞ্জনের মানবিক আয়ু ছাপিয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। আসলে তার এই সম্পৎশালিতা যতো নয়, যতো নয় তার এই ইউরোপীয় চাকচিক্য, এই বিশাল বিস্তীর্ণ একাকীত্বই ছিলো

তার একমাত্র অহঙ্কার। সেই একাকীত্বে সে যেন আরণ্য একটা পশুর মতো শক্তিশালী। দুই হাতে তার অজস্র আশ্রয়, দুই পায়ে তার অবারিত স্বাধীনতা। তার কঠিন, প্রসারিত কপালটা যেন এই একাকীত্বের তেজে জ্বলছে, নাকে তার দম্ভ, চিবুকে তার দৃঢ়তা, সমস্ত শরীর যেন তার সেই একাকীত্বের স্পর্ধিত, উচ্চণ্ড বিজ্ঞাপন। শক্তি যদি শোভা হয়, তবে নিরঞ্জন পৃথিবীর একজন সুন্দর পুরুষ, সে-সৌন্দর্য তার আকাশের নীল রৌদ্রের মতো স্পষ্ট, গুহাহিত গূঢ় অন্ধকারের মতো ভয়ঙ্কর। তার সৌন্দর্যে কোথায় যেন একটা তীব্র নিষ্ঠুরতা আছে: তার উঁচু হাসিতে, কথা বলার তেজস্বী উলঙ্গতায়, তার প্রতিটি ব্যবহারের স্বতঃস্ফূর্ত ও অনাগরিক অকাপট্যে। শ্রীপর্ণার সামনে এসে সে যখন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতো, বলীয়ান দীর্ঘ চেহারা, তাকে তার মনে হতো নির্জন, দিগন্তপ্রসারী, ঘুমন্ত মাঠের উপর বিশাল এক বনস্পতি, কর্কশ স্তব্ধতায় সর্বাঙ্গে সে নিশ্চল, শক্তিমান, অথচ স্নায়ুতে চলেছে তার প্রচ্ছন্ন প্রাণের আয়োজন, সূর্যের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে তার সমস্ত শাখা, সমস্ত শিকড় তার মাটির গভীর আর্দ্রতার দিকে—আর, শ্রীপর্ণা গভীর আবিষ্ট চোখে তার দিকে চেয়ে থাকতো, আর শ্রীপর্ণাই হচ্ছে তার এই মাটি, আর্দ্র, আহিম, অবাঙ্‌ময়।

নিরঞ্জনেরো ভালো লেগেছিলো এই শ্রীপর্ণাকে। তার শরীরময় উদাস কৃশতাটিকে। সমস্ত শরীরে সে যেন সব সময়েই কেমন অনুপস্থিত, তার রুক্ষ চুলে, নম্র দু'টি চোখে, শাড়ির বিষণ্ণ শুভ্রতায়—কোথাও যেন সে নেই, তার এই মধুর, পলায়মান অশারীরিকতাটিকে। তার ক্লিষ্ট, রুক্ষ কৃশতার করুণ দীর্ঘশ্বাসটি তাকে মুগ্ধ করেছিলো; হাতের দু'টি অসহায় রিক্ততা, চোখের দু'টি কোমল কাতর্য। তার হাসিটি যেন বৃষ্টির পর বনের শিয়রে বাঁকা একটুকরো চাঁদ উঠেছে। খাঁচার থেকে পাখি দিয়েছে ছেড়ে, আড়ষ্ট পাখায় ভালো সে উড়তে পাচ্ছে না, তেমনি তার কথা, ভাঙা-ভাঙা আকাশের স্বপ্ন-মাখানো। যেন তার নিহিত আত্মা শরীরের এই ক্লিশ্যমান রুক্ষতায় পেয়েছে উদাত্ত উচ্চারণ। পুরুষে যদি দেখতে হয় শক্তির বিস্ফার, নারীর বেলায় এই আত্মার পরিচ্ছায়া। শ্রীপর্ণাকে যেদিন সে প্রথম ছুঁলো, তার হাতের মুঠোয় সে যেন নরম একতাল মোম, নিরঞ্জনের মনে হলো, সে যেন কোন মন্দিরের গহ্বরে ঢুকে দেবতার বিগ্রহকে স্পর্শ করছে, পাথরের মতোই ঠাণ্ডা, পাথরের মতোই নিঃশব্দ।

ঔপন্যাসিক ধরনে তাদের মাঝে কখনোই কোনো প্রেমের অভিনয় হয়নি,

তাদের প্রেম ছিলো মৃত্যুর মতোই অবশ্যম্ভাবী, নিয়তির মতোই দুর্বার। কখনো কেউ মুখ ফুটেও কাউকে বলেনি বা বলতে দেয়নি কে কা'কে কতো ভালোবাসে : যখন চারদিকে দিন দেখা যাচ্ছে, তখন বাইরে গিয়ে কে আর আকাশের দিকে তাকায়, সত্যি সূর্য উঠলো কিনা। তাদের দু'য়ের মাঝে প্রেমের বিচ্ছুরণ হিসেবে কোনো খুচরো স্পর্শেরো দরকার ছিলো না, ছেলেমানুষি মিষ্টপ্রিয়তা : দক্ষিণ থেকে যখন বসন্তের হাওয়া দিয়েছে তখন গাছের পাতা নড়ছে কিনা দেখে কী হবে ? তাদের দু'য়ের মাঝে প্রেম ছিলো উহ্য, পরিব্যাপ্ত, সময়ের মতো, মৃত্যুর মতো, মানুষের অন্তিমতম ব্যর্থতার মতো। যেন তাদের সামনেকার দেয়ালে স্পষ্ট লেখা আছে : তাদের দু'জন দু'জনকে চাই, তারা পরস্পর পাহাড় ও সমুদ্রের মতো নির্জন, পাহাড় তাই পাঠিয়ে দিয়েছে নদীর নীল একটি ধারা সমুদ্রের বিস্তারের দিকে। কী হবে কথা বলে, কী হবে বা কথা দিয়ে পরীক্ষা করে, এই অগ্নিময় মুখর স্তব্ধতার ? তাদের দু'জন দু'জনকে চাই এ-কথা ঈশ্বর পর্যন্ত জানেন। সমস্ত আকাশ সেই কথা বলছে।

গোড়ায়-গোড়ায় শ্রীপর্ণা পরিবর্তনটা কিছু লক্ষ্য করতে পারেনি, তার নিজের এই নতুন পরিবর্তন, সাড়া দিতে তার লেগেছে অনেক দেরি। নিরঞ্জন যখন চলে যেতো এখান থেকে, সে চিঠি লিখতো ঘন ঘন, নির্বাষ্প, পরিচ্ছন্ন চিঠি,—প্রত্যেকটি অক্ষর হীরের টুকরোর মতো কঠিন, প্রত্যেকটি অক্ষরে তার ব্যক্তিত্ব থাকতো প্রতিফলিত : দ্রুত, দীপ্ত, সে কতোগুলি অক্ষর—শ্রীপর্ণার উপর মুঠো-মুঠো ঝরে পড়তো যেন শব্দের তারকা। এমনি সে-সব চিঠি যাদের জবাব না লিখে থাকা যেতো না তেমনি উজ্জ্বল, কুজ্ঝটিকাহীন প্রাঞ্জলতায় : ভাষা যেখানে ঢেকে দিতে পারতো না ইঙ্গিতের তীক্ষ্ণতা ; এমনি সে-সব চিঠি যাদের উত্তরে ফের সে চিঠি না-চেয়ে চেয়ে পাঠাতো সেই লোককে যে এমনি সব চিঠি লিখছে। তারো কোনো চিহ্নিত দিন ছিলো না, ছিলো না কোনো ভূমিকার পৃষ্ঠা, শ্রীপর্ণা যখন নিজেকে উদ্ভাবন করলে : তার অজায়মান শূন্যের থেকে বিশাল এই সৃষ্টি। বুঝতেই পারলো না কী করে হঠাৎ একদিন আকাশে এলো এতো আলো, মুহূর্তগুলিতে এতো ধার, শরীর উঠলো মৃত্যুর মতো সুস্বাদু হয়ে। শ্রীপর্ণা বুঝতেই পারলো না : তার জীর্ণ ক'খানি হাড় দিয়ে যেন কী বাজনা তৈরি হয়ে উঠেছে। সে-বাজনা শুনতে পেতো সে,

রাতের মূর্ছিত অন্ধকারে, তরবারির মতো চমকিত দিনের দীপ্ত দীর্ঘতায়। সে যেন নিজেকে নতুন করে পেলো, করলো নিজেকে নতুন করে রচনা, অযান্ত্রিক, মৌলিক রচনা। সে কিছু করলো না, সে হয়ে উঠলো : তার দেহের বৃন্তে আত্মার ফুল, দীপাধারে উজ্জ্বলন্ত একটা শিখা, ঊর্ধ্বায়মান, জ্যোতির্ময়। শ্রীপর্ণার মনে হলো, এতোদিন সে মরে ছিলো, আত্মান্ধতার কবরের তলায় : এটা তার জীবন ছিলো না, ছিলো একটা বিধিবদ্ধ, যান্ত্রিক অনুবর্তন। নিজেকে সে এতোদিন ধরে ছলনা করে এসেছে, চারদিকে চেয়ে নিজেকে নিয়ে এসেছে সে একটা নির্দিষ্ট নমুনায়, প্রাণহীন প্রথার প্রতিচ্ছায়ায় ; সমস্ত সংসারে সে যে একা, সে যে নিজে, এই কথাই সে ভুলে ছিলো। পাঁচজনের মতো হতে গিয়ে সে একজনও হতে পারেনি। শ্রীপর্ণা ভেবে দেখলো, ভেবে দেখলো কি, আয়নায় তার মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলো, দুঃখ যেন তাকে মানায় না, মানায় না তাকে এই অর্থহীন ব্যর্থতা। সে এর জন্যে আসেনি, এমনি জানতে আর করতে, হতে নয় : এমনি জীবনের ভারে জড়ীভূত হয়ে থাকতে, বাঁচতে নয়। আজ হঠাৎ শ্রীপর্ণার মনে হলো, যেন বহু ঢেউ ঠেলে প্রথম পেলো সে মৃত্তিকার আশ্রয়, বাঁচতেই সে এসেছিলো, রোদের মতো, বৃষ্টির মতো, বসন্তের মতো। আর এই বাঁচা কেবল মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে নয়, রক্তে, লাল রক্তে, সিঁদুরের চেয়েও যা লাল, সন্ধ্যারাগের চেয়েও যা গাঢ়। ভাঙা হৃদয় নিয়ে পালকের বিছানায় শুয়ে থাকার চেয়ে রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে মাটিতে পড়ে থাকাও ভালো। শ্রীপর্ণাও এই রক্তেই উঠেছে প্রতিধ্বনিমান হয়ে, তার মূলে, তার আদিমতম আণবিকতায়, মায়ের গর্ভে শক্তিমান, স্বসম্পূর্ণ ভ্রূণের মতো। যা জীবনের সত্যিকারের অভাব, সেই অভাব অন্যান্য হিতৈষীদের চাইতে শ্রীপর্ণাই ভালো বিচার করতে পারবে, তার পরিপূরণের নামই হচ্ছে জীবন। যা আমি চাই, এই মুহূর্তে যা চাই, তীব্রতম দুঃসহতম পিপাসায়, তার দিকে হাত বাড়াতে পারলেই আমি বাঁচলাম। শ্রীপর্ণা এমনি করেই বাঁচবে, তার মতো করে : পৃথিবী তার নিজের চরকায় তেল দিক, শ্রীপর্ণা তার দিকে ফিরেও দেখবে না। সে ভালো হতে চায় না, সে সুখী হতে চায়, এবং এই তার চরম ভালো।

তবু শ্রীপর্ণা সহজে সাড়া দিতে পারেনি, আদিত্যর কথা মনে করে মেরুদণ্ডটা তার সির্‌সির্ করে উঠছে। কিন্তু আদিত্যর জন্যেই বা তার কিসের এতো ভাবনা? সমাজ স্পষ্ট বলে দিয়েছে শ্রীপর্ণা তার কেউ নয়।

আজ পুরো এক বছর সে সে-বাড়ি যেতে পায়নি, তাতে কারুই কিছু ক্ষতি হয়নি, না তার, না আদিত্যর ; বরং সেখানে, তার সমরক্তবাহী আত্মীয়দের ছায়ায়, সে ভালোই আছে, সুখে ও সমৃদ্ধিতে। এতোদিনে হয়তো অক্ষর চিনে-চিনে, বানান করে-করে বই পড়ছে, গাছের ডালে স্টাম্প বানিয়ে ন্যাকড়ার বলে খেলছে হয়তো ক্রিকেট, হয়তো মাঝে-মাঝে প্যান্ট ছেড়ে পড়ছে এখন ধুতি। এতোদিনে ছোট-বৌয়ের কথা তার মনেও নেই। সত্যি, আদিত্যকে দিয়ে তার কী হবে, কে সে তার ? সে তার একটা নির্মাণ, সৃষ্টি নয় ; মাত্র একটা আবিষ্কার, যা ছিলো : নয় এমন একটা উদ্ভাবন, যা ছিলো না। আদিত্যর চেয়েও বড়ো তার এই প্রেম, এই তার অভীপ্সা। এই তার মহত্তরো উদ্ঘাটন। তাকে মিছিমিছি বিব্রত, বিচলিত করে লাভ কী ? থাক সে বিস্মৃতির কুয়াশায়, সব যাক বিস্মৃতিতে বিলুপ্ত হয়ে। শ্রীপর্ণা নতুন, শ্রীপর্ণা প্রথম, শ্রীপর্ণা আবার শ্রীপর্ণা।

ঘরের মধ্যে উঠে গিয়ে শ্রীপর্ণা তক্ষুনি চিঠির কাগজ নিয়ে লিখতে বসলো নিরঞ্জনকে।

শিগ্‌গির চলে এসো, আমি রাজী। যতো শিগ্‌গির পারো। আমি কাল সকালেই কাজে ইস্তফা দেবো। আর একটুও দেরি কোরো না।

চার

ট্যাক্সির ঝক্‌ঝক্‌ শুনে শ্রীপর্ণা বাইরে বেরিয়ে এলো। কাজে যখন সে ইস্তফা দিয়েছে, তখন সটান তার বাড়িতে এসে অতিথি হতে কোনো বাধা নেই।

শ্রীপর্ণা গম্ভীর, হয়তো-বা একটু মলিন গলায় বল্‌লে,—এতো দেরি করলে কেন?

—মানে, আসতে? নিরঞ্জন তার স্বাভাবিক, বলদৃপ্ত ভঙ্গিতে উঁচু গলায় হেসে উঠলো: তুমি যে তোমার কোয়ার্টার বদ্‌লে নতুন বাড়িতে এসে উঠেছ কী করে তার ঠিক করবো বলো? ট্যাক্সিওলা এ বিষয়ে আমাকে মোটেই সাহায্য করতে পারলো না। তারপর ঘুরতে-ঘুরতে, একে-ওকে জিগ্‌গেস কবতে-করতে—

—বাড়ি না বদলালে তোমাকে রিসিভ করতুম কী বলে? শ্রীপর্ণা মলিন একটু হাসলো: সে-কথা বলছি না। গিরিডিতে আসতে দেরি করলে কেন? আমি ক'দিন থেকে রোজ সন্ধ্যে হলেই উনুনে তোমার জন্যে ডেকচি ভরে জল চাপিয়ে রাখছি।

—তার চেয়ে রোজ এই সময়টায় স্টেশনে বেড়াতে গেলেই পারতে। নিরঞ্জনের হাসি আরো এক পর্দা উপরে উঠে গেলো: স্টেশনে আমার জন্যে একটু প্রতীক্ষা করলে আমি বাড়ি বসে স্বচ্ছন্দে তোমার গরম জলের জন্যে প্রতীক্ষা করতে পারতুম।

শ্রীপর্ণার হাসি এবার শব্দে ছিটকে পড়লো; কোলের কাছে হাত দু'টি গুটিয়ে শরীরটাকে সঙ্কীর্ণতরো করে বল্‌লে,—দেখছ না কী শীত! আর তোমার বুদ্ধি কী একখানা! দিন লিখলে না, ক্ষণ লিখলে না, সারা দিনরাত আমি স্টেশনে বসেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিই আর কি।

নিরঞ্জন মুখে-চোখে চঞ্চলতার দীপ্তি এনে বললে,—কাজ, ভীষণ কাজ পড়েছে। এক মুহূর্তও সময় পাচ্ছিলুম না; পেট ভরে একদম খাওয়া হয়নি ক'দিন থেকে। সময়ে-অসময়ে হোটেল থেকে কতোগুলি খাবার কিনে এনে—

বিশ্বাস করো, পর্ণা, সে একটা কী ভীষণ ঝড়ের মধ্যে দিয়ে কেটেছে কয়েকটা দিন।

গায়ের উপর আলোয়ানটা ছোট করে এনে শ্রীপর্ণা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে,—চান করবে নাকি ? নয়তো হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়-জামা বদ্‌লে একটু বোসো, আমি লুচি ভেজে আনছি। আর যা পারি তুটো যেমন-তেমন করে রেঁধে আনতে।

—না, না, লুচি নয়, আমি ভাত খাব, গরম ভাত। নিরঞ্জন চীৎকার করে উঠলো : আর কিছু তোমার রাঁধতে হবে না, আমার ভাত চাই, আমার রাক্ষসের মতো খিদে পেয়েছে, তুমি জানো না আমি কী সাজ্যাতিক খেতে পারি। তোমার ঐ বাবু, ফিন্‌ফিনে, ফুলকো লুচিতে আমার কুলোবে না। গলাটা সে আরো চড়িয়ে দিলে : তার আগে চা চাই, চা, তুধ নয়, চিনি নয়, র চা, রক্তের মতো কালো চা।

নিরঞ্জন বাড়ির ভিতর এসে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো ঘুরে-ঘুরে ; বল্‌লে,—শেষকালে এমন প্রকাণ্ড একটা বাড়ি ভাড়া করে বসলে ?

—কী আর করবো ? শ্রীপর্ণা সামনে বসে চা করতে-করতে বল্‌লে,—হাতের কাছে এক দিনের নোটিসে আর বাড়ি পেলুম না যে। ক'টা দিন যেন এই বাড়িটারই মতো প্রায় দম বন্ধ করে ছিলুম। স্কুলের দাইটা রাতে এসে কাছে থাকতো বলেই রক্ষে। চায়ের বাটিটা এগিয়ে দিয়ে শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো : নতুন বাড়িতে এসে কী মুস্কিলেই যে পড়লুম, কোথায় পাই বাসন-কোসন, কোথায় বা শিল-নোড়া ! রান্নাঘরে গিয়ে আমার সংসারের চেহারাটা যদি দেখ ! তবু ভীষণ ভালো লাগছে; কাঁচা হাতে প্রথম কবিতা লিখতে গেলে যেমন লাগে।

নিরঞ্জন শ্রীপর্ণার মুখের দিকে তৃপ্ত চোখে চেয়ে বল্‌লে,—বেশ লাগছে, যেন প্রকাণ্ড ডুবন্ত জাহাজের ডেকের এক কোণে আমরা নিরাপদে বসে আছি। বলেই সে হেসে উঠলো ঘর কাঁপিয়ে : কই, তোমার চা কই ?

—নিচ্ছি। চোখ নামিয়ে ঠোঁট তু'টি ফুরফুরে করে শ্রীপর্ণা পেয়ালার কিনারে চুমুক দিলো।

সমস্ত বাড়িতে বিশেষ কোথাও আলো নেই, শ্রীপর্ণার পড়বার টেব্‌ল-ল্যাম্পটা ছাড়া একটা মাত্র আর হারিকেন, সেটাও রান্নাঘরে। তবু, ঘরময় নরম অন্ধকারটি নিরঞ্জনের চোখে ভারি ভালো লাগছে, ভালো লাগছে সেই অন্ধকারে পাশের ঘরটিতে তার জন্যে শ্রীপর্ণার বিছানা করা, অন্ধকারের মধ্যে

তার এই অকায়িক চলা-ফেরা। কোথাও আসবাবের কোনো ছিটে-ফোঁটা নেই, দু' পাশের দুই ঘরে পুরু করে খড় বিছিয়ে তার উপর বিছানা পাতা হয়েছে, যা একটা মাত্র শ্রীপর্ণার টেবিল আর চেয়ার, পেরেকে-পেরেকে দড়ি টাঙিয়ে তার উপর শ্রীপর্ণা তার শাড়ি-শেমিজ ঝুলিয়ে রেখেছে, ও-ধারে চামড়ার একটা সুটকেস, দেয়ালে বসানো প্রকাণ্ড আলমারিটার উপর-দিকের তাকে ছোট একটা টাইমপিস। মনে হচ্ছে যেন আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যে এসে তারা ক্যাম্প করেছে। সমস্ত শূন্য যেন তবু শূন্য নয়, সমস্ত অন্ধকার নয় যেন তবু অন্ধকার।

কলার পাতায় শ্রীপর্ণা ভাত দিয়ে গেলো। বেশি কিছু সে রাঁধতে পারেনি রাত করে, কিছু ভাজা আর সিদ্ধ, ডাল আর বড়া—যার যোগাড় ছিলো তার দৈনিক খাদ্য হিসেবে, দু' চামচ ঘি আর এক বাটি দুধ। মহার্ঘতম উত্তুঙ্গ কোনো হোটেলেও নিরঞ্জন এমন আয়োজন দেখেনি, জীবনে খায়নি সে কোনোদিন এমন তৃপ্তি, এমন পবিত্রতায়। অমৃত-নামক কথাটা এতোদিন সে শুধু বইয়েই দেখে এসেছে।

শ্রীপর্ণা সামনেই বসেছে। খেতে-খেতে নিরঞ্জন বললে,—তুমি কী খাবে?

—আমার জন্যে দুধ আছে।

—কেন, নিরঞ্জন পাতের থেকে চোখ তুললো: তুমিও বসে যাও না এই সঙ্গে।

—থাক্, আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। প্যানের থেকে হাতায় করে আরো দুটি ভাত দেবার জন্যে এগিয়ে আসতে-আসতে শ্রীপর্ণা বল্‌লে—ভারি তো খাওয়া. তায় আবার ভাগীদার ডাকছো। নিশ্চয়ই তোমার পেট ভরলো না কিচ্ছু।

—না, তুমিও খাবে এসো, গরস পাকিয়ে নিরঞ্জন প্রায় তার মুখে তোলে আর-কি: আমি বসে বসে গিলবো, আর তুমি উপোস করে থাকবে, এ কিছুতেই হতে পারে না। ভাগীদার নয় তো কী!

তাড়াতাড়ি মুখটা সরিয়ে নিয়ে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—রাতের বেলা ও-সব আমি কিছু খাই নাকি?

নিরঞ্জন আস্তে-আস্তে হাতটা গুটিয়ে আনলো। বল্‌লে,—কিন্তু কেনই বা খাবে না? আর কিসের বাধা?

—না, আজ নয়। শ্রীপর্ণা ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালো।

রাতে আর তাদের সে-সব বিষয় নিয়ে কোনো কথা হয়নি মুখোমুখি। বাইরের বারান্দার অন্ধকারে সেই প্রচণ্ড শীতে খানিকক্ষণ তারা এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলো। অন্ধকার যে এতো কালো, এতো দুর্ভেদ্য কালো হতে পারে, নিরঞ্জন এর আগে স্বচক্ষে কখনো দেখেনি, আকাশ যেন সেই অন্ধকারের ভারে একেবারে কাছে নেমে এসেছে। তারায়-তারায় আকাশ একেবারে ছেয়ে গেছে, কালো পিন্-কুশানে বেঁধা কতোগুলি আলপিনের মাথার মতো ঝক্‌ঝকে। সবুজ তারা, নীল তারা এই সে প্রথম দেখলো, এতোদিনে চিনলো কাকে বলে ধ্রুবতারা, কোথায় সপ্তর্ষি, কোথায় দাঁড়িয়ে কালপুরুষ। কল্‌কাতায় ফিরে আবার সে-সব ধোঁয়ায় যাবে হারিয়ে, আকাশের বিবর্ণ একঘেয়েমিতে। শুকনো, শাণিত শীত রক্তে এনে দেয় ধার, মদের তীব্রতার মতো। প্রতি নিশ্বাসে তারা টেনে নিচ্ছে এই শীত ঝাঁজালো গন্ধের মতো, সমস্ত শরীর যা নেশার মতো বিভোর করে তুলছে। মৃদুতম একটি নিশ্বাস পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না, এমনি অপরূপ স্তব্ধতা।

স্বগতোক্তির মতো নিরঞ্জনের মুখে জায়গাটার কী একটা প্রশংসা শুনতে পেয়ে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—আর দেখবে চলো, কতো রাজ্যের ফুল ফুটেছে আমার উঠোনে। বাড়িটা যখন আমার, তখন উঠোনটাও আমারই।

—আর ফুল দেখতে হবে না। নিরঞ্জন ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে,—এবার আমি সটান লেপের নীচে। আর যাই হোক পর্ণা, শীত নিয়ে প্র্যাক্‌টিক্যাল কবিত্ব করা যায় না। আমি এখন খানিকটা আগুন পেলে বাঁচতুম। যাই বলো, ওর চেয়ে কল্‌কাতা আমাদের স্বর্গ, হাত-পা মেলে যা-হোক তবু দু'য়েকটা কাজ করা যায় ভদ্রলোকের মতো।

শ্রীপর্ণা বল্‌লে—আমার তো এ-জায়গাটাই বেশি ভালো লাগে।

—রক্ষে করো। নিরঞ্জন সারা শরীরে শিউরে উঠলো : আমি তো ভাবছি কালকের সকালের ট্রেনে পালাবো।

—বলো কী ?

—ভয় নেই, একলা পালাবো না। নিরঞ্জন সশব্দে হেসে উঠলো।

—তা নয়, শ্রীপর্ণা কুণ্ঠিত হয়ে বল্‌লে,—কিন্তু কালকেই যাওয়া হয় কী করে ? গোছগাছ সব বাকি।

—ভারি তো তোমার জিনিস-পত্র, তার আবার গোছগাছ! নিরঞ্জনের গলা আবেগে একটু গম্ভীর হয়ে এলো: এ-সব জিনিস, শ্মশানের কতোগুলি ছাই কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তুমি কী করবে? ও-সব ফেলে দাও, উড়িয়ে দাও হাওয়ায়।

শ্রীপর্ণা আবদারের সুরে বল্‌লে,—বা রে, এতো কষ্ট করে আমি এমন সুন্দর একটা বাড়ি নিলুম—

—কল্‌কাতায় এর চেয়েও ঢের সুন্দর বাড়ি আছে।

—থাক্। ছেলেমানুষের মতো ভুরু তুলে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—সেখানে এমন পাহাড় আছে, ঝর্ণা আছে, শালবন আছে? সেখানে এমন আকাশ-ভরা তারা দেখতে পাও? স্লেটের নদী আছে সেখানে? অনুনয়ে সে প্রায় একটা কান্নার স্বর বার করলো: না, ক'টা দিন এখানে থাকো, এই চমৎকার নিরিবিলিতে।

—কল্‌কাতায়ো আমরা এমনি নিরিবিলি, পর্ণা। নিরঞ্জন সাদা, নির্বাষ্প গলায় বল্‌লে,—কিন্তু কী করে এখানে থাকি বলো। ভীষণ কাজ, আপিসে রাজ্যের কাগজ-পত্র জমে আছে, আমাকে গিয়ে সব ক্লিয়ার করতে হবে। এই পচা শীতে এখানে কেউ টিকতে পারে নাকি ভদ্রলোক? নিরঞ্জন মুখ যথাসাধ্য গম্ভীর করবার চেষ্টা করলো: শীতে দেয়ালগুলো যেন সব গলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে—কী রট্‌ন্ জায়গা এ গিরিডি!

শ্রীপর্ণা হেসে ফেললো। বল্‌লে—কিন্তু একেবারেই কালকেই যাবে? ইস্কুলে যে আমার কিছু পাওনা-পত্তর ছিলো।

—রেখে দাও তোমার ইস্কুল। ক' টাকা বলো, আমি দিয়ে দিচ্ছি। নিরঞ্জন হেসে ফেললো: কালই গেলে ভাল হতো, পর্ণা। আচ্ছা কাল না হোক, পর্শু, কী বলো? নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি ঘরের কোটরের দিকে পা বাড়ালো: এবার শুয়ে পড়ো গে, পাৎলা ঐ একটা র‍্যাপার জড়িয়ে আর তোমার আকাশ-ভরা তারা দেখতে হবে না। রাতে তো আর ভাত খাওনি, ঘুম পাবে কোত্থেকে? নিরঞ্জন আবার আরেকটা হাসির আওয়াজ করলো।

রাতটা কেটে গেলো অতলস্পর্শ ঘুমের মধ্য দিয়ে, পরদিন সকালে তারা চায়ের টেবিলে এসে বসেছে: নিরঞ্জন চেয়ারে, শ্রীপর্ণা দূরে, তার সুটকেসের উপর। কোনোদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে-আসা, রুক্ষ, একটু-বা অগোছাল শ্রীপর্ণাকে সে দেখেনি, সে যে কতো সুন্দর, এতোদিন, আজকের আগে পর্যন্ত, কোনো কিনারাই পায়নি সে। সুটকেসে বসার দরুন তার ভঙ্গিটা

কেমন নিচু, হাঁটুর উপর দু' কনুই রেখে কেমন সে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে, ঢালু পিঠে কেমন একটি অলস কোমলতা : হাত দু'টি কৃশতায় কেমন দুর্বল, পায়ের ঢেউ দু'টি কেমন শিথিল। এতো সুন্দর যেন তাকে কোনোদিন দেখেনি, এই তার ঘুমের শিশিরে ফোটা শরীরের শেফালিকায়। শুধু চা-ই আসতে লাগলো জুড়িয়ে।

নিরঞ্জন চায়ের বাটিতে মুখের আধখানা ঢেকে জিগ্‌গেস করলে : তুমি এতো তাড়াতাড়ি মন ঠিক করলে কী করে ? তুমি তো চেয়েছিলে আরো ছ' মাসের সময় !

এ-সব কথা চিঠিতে লেখা কতো সহজ, শ্রীপর্ণা মেঝের উপর চোখ নামিয়ে কথার সুরে প্রচ্ছন্ন একটি হাসি মিশিয়ে বল্‌লে,—ছ' মাস সময় চেয়েছিলুম বলে একেবারে শেষ তারিখেই মতামত দিতে হবে এমন কোনো কথা আছে নাকি ? আমার মনের কতো ছ' মাস পেরিয়ে গেছি।

—ভালোই করেছ শেষ পর্যন্ত মত দিয়ে। নইলে আমি বাঁচতুম না। তোমার ঐ সব বেয়াড়া, অবৈজ্ঞানিক প্রিন্সিপ্‌লে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। নিরঞ্জন হেলানো পিঠটা খাড়া করে উঠে বসলো : শরীর থেকে মনকে বিছিন্ন করে নেয়ার মতো অসম্ভব আর কিছু হতে পারে না। আপ্রাণ ভালোবাসাতে পারবো অথচ আশরীর রোমাঞ্চিত হতে পারবো না, এটা নিতান্ত অবমানবের ফিলজফি। তা, বিয়েটা আমাদের কোন মতে হবে ?

শ্রীপর্ণা মুখ তুলে ধূসর একটুখানি হাসলো। দেয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়ে পায়ের উপর আস্তে সে আরেকটি পা তুলে দিলে। বল্‌লে,—আমাদের বিয়েতে আবার ধর্মমত কী, একমাত্র মানুষের মত। ধর্মের চাইতে আইনই আমাদের কাছে বড়ো, তেমনি একটা সম্মানজনক, সহজ আইনেরই আমরা শরণ নেবো।

—বেশ, তবে কল্‌কাতা গিয়েই আমরা রেজিস্ট্রারের সঙ্গে দেখা করছি। নিরঞ্জন গা ঝাড়া দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো : আর দেরি নয়, পর্ণা, লোহা গরম থাকতে-থাকতেই আঘাত করা উচিত। নিরঞ্জন ঘরের মধ্যে একটু পাইচারি করে নিলো ; বল্‌লে,—আদিত্যর সম্বন্ধে কী ঠিক করলে ?

শ্রীপর্ণা নড়লো না। পরিচ্ছন্ন, একটু-বা প্রখর দৃষ্টি মেলে বল্‌লে,—তার কী ঠিক করবো ? সে থাকবে তার আপন বাড়িতে, বংশের বাতি জ্বালিয়ে। তার কথা আমি আর ভাবি না।

নিরঞ্জন তার গলার স্বরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। অথচ এতোদিন এই আদিত্যর কথা ভেবেই শ্রীপর্ণা শান্তি পাচ্ছিলো না।

শ্রীপর্ণা আবার বললে,—যেন তার অস্তিত্বের কোন দূর, গভীর অন্ধকার থেকে: আমার সন্তানের চেয়েও আমার জীবনে কোনো বড়ো সত্য থাকতে পারে, কোনো মহত্তরো ঐশ্বর্য। আমি তা অস্বীকার করতে পারবো না, তা অস্বীকার করবার আমার অন্যায় সাহস নেই।

নিরঞ্জন যেন সমস্ত শরীরে স্নিগ্ধ হয়ে গেলো। বল্‌লে,—বেশ তো, ইচ্ছে করলে তাকে তোমার কাছে আনিয়ে নিলেই হবে।

—তারা তাকে ছেড়ে দেবে কি না আমার কাছে? মাস্টারি নিতেই কতো কথা বললো, তারপর তো স্পষ্ট বিয়ে করে বসলুম।

—কেন দেবে না? তোমারই তো ছেলে। একশোবার দিতে বাধ্য।

—থাক্‌ গে। শ্রীপর্ণা জোর করে উঠে পড়লো: তাকে দিয়ে আমার কী হবে? সে আমাকে এতোদিন ভুলেও গেছে নিশ্চয়। যখন একবার ছেড়েছি, সব ছেড়েছি। যা গেছে, তা গেছে। ও-সব কথা তুমি তুলো না।

—তাই। নিরঞ্জন তার দীর্ঘায়মান দেহের বৃন্তের দিকে চেয়ে বিহ্বল গলায় বল্‌লে,—শ্মশানে তুমি ফুটে উঠেছ একটি ফুল। আপন ঐশ্বর্যে ফুটে ওঠাই হচ্ছে জীবনের শেষ সত্য। চলো, হাত বাড়িয়ে নিরঞ্জন তাকে ধরতে গেলো: চলো, কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি। চমৎকার রোদ উঠেছে।

নাগালের বাইরে কৌশল করে চলে গিয়ে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—তোমার কী সব আবদারের কথা! আমার এখন রান্না চাপাতে হবে না?

—উঃ, আমার আপিসের বেলা বয়ে যাচ্ছে একধার থেকে! নিরঞ্জন হেসে উঠলো: আমার এগারোটার মধ্যে ভাত চাই একেবারে! বেশ তো, চলো না, ফেরবার পথে বাজার করে ফিরবোখন। ফিরতে যখন মন চাইবে। তারপর দু'জনে রাঁধবো, দু'জনে খাবো।

—তা না হয় যাচ্ছি! কিন্তু কী এতো বাজার করে ফিরবে তুমি?

—কেন, তুমি আজো আমাকে নিরিমিষ খাওয়াতে চাও নাকি?

দড়ির থেকে সাদা আলোয়ানটা পেড়ে গায়ের উপর গুছোতে-গুছোতে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—হ্যাঁ, আজো।

পাঁচ

কল্‌কাতায় বিডন্‌-স্ট্রীটে তার পৈত্রিক বাড়িটা ভাড়া দিয়ে নিরঞ্জন উঠে এসেছিলো পার্ক-সার্কাসে, প্রায় একেবারে পুবের সীমান্তে, যার পরে আর শহরের কোনো চিহ্ন নেই—মাঝারি, দোতলা, নতুন বাড়ি দেখে। উঠে এসেছিলো, ভাড়াটে হিসেবে নয়, এক রকম থোক কিনে নিয়ে। আদ্ধেক যখন বাড়িটা উঠেছে, তাদের কোম্পানিকে, মানে, তার কাছে সেটাকে রেহান দেয়া হয়—বাড়িওয়ালার থাক্-যাক্ টাকার দরকার। বলা বাহুল্য, সে-টাকা আর শোধ করা হয়নি, বাড়িটার নিরঞ্জন কায়েমি দখল নিয়ে বসেছে। তবু ভাগ্যিস, উপরটা এখনো বাকি ছিলো, তারি মধ্যে, যথাসাধ্য ঘর-দোরের সে একটা ছক আঁকলে। সব শুদ্ধু, মন্দ দাঁড়ায়নি চেহারাটা : শ্রীপর্ণা তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লো।

সত্যি, সাবেকি পৈত্রিক বাড়িটা যেন শূন্যতার ভূতে-পাওয়া, স্থানের বিশালতায় সে উঠছিলো হাঁপিয়ে। কেমনতরো যেন সে ছড়িয়ে পড়ছিলো এলোমেলো, নিজের মাঝে নিজে সে আঁট, ঘন হয়ে উঠতে পারছিলো না। তার চারপাশের দেয়ালগুলো খুব দূরে-দূরে সরে থাকলে তার নিজেকে যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে, যে-ঘরগুলিতে কোনো লোক নেই, আসবাব নেই, অথচ যে-গুলির জানলা-দরজা খোলা, তাদের শূন্যতা যেন সব সময়ে তাকে হানা দেয়। একরকম পালিয়েই তাকে আসতে হয়েছে। তা ছাড়া বাড়িটাতে জায়গার কোনো লেখাজোখা ছিলো না বলে কে যে কখন উড়ে এসে জুড়ে বসতো, তার ঠিক ছিলো না : তাদেরো আক্রমণ থেকে নিজের নিভৃতিটা অব্যাহত রাখা দরকার। পালিয়েই সে এলো তার আত্মার ঘন, তপ্ত সন্নিহিততায় : চারদিকে সে পরিমিত, ছন্দোবদ্ধ ; নেই আর এতোটুকু অপচয়, এতোটুকু বিশৃঙ্খলা। সব পারস্পরিক সঙ্গতিতে কেমন উঠেছে সংহত হয়ে। জীবনের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির প্যাটার্নটাও বদ্‌লে নেওয়া দরকার।

ঢুকেই সিঁড়ির দু'ধারে বড়ো দুটো ঘর, একটা সদর ড্রয়িং-রুম, অন্যটা

নিরঞ্জনের মফস্বল-আপিস, বাড়িতে বসে আপিসের কাজ করবার। সিঁড়ির গা ঘেঁষে ছোট এক ফালি গলি বেরিয়ে বড়ো একটা বারান্দায় গিয়ে পড়েছে, তারই পাশে আরো দুটো ঘর, একটাতে না-হয় ভাঁড়ার করা গেলো, আরেকটাতে রইলো খাবার টেবিল পাতা—রান্নাঘরটা আলাদা, পাশেই। শ্রীপর্ণা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো। বাঁ পাশে বিস্তীর্ণ শোবার ঘর, ফরাসী জানলা, ইচ্ছে করলে দু'ধারে অনায়াসে দুটো সিঙ্গল্ খাট পাতা যায়, দরজা খুললেই লম্বা একটা বাথরুম, সকল রকম অনুষঙ্গে একেবারে আধুনিক, দাড়ি কামানো থেকে শুরু করে চুল বাঁধা পর্যন্ত—একেবারে অগোচর। ও-পাশেরটা নিরঞ্জনের লাইব্রেরি, যতোদিন পর্যন্ত না বাবা গতাসু হন, ততো-দিনকার তার পুস্তকপ্রীতির নিদর্শন—ওটাকে শ্রীপর্ণা অনায়াসে তার স্টাডি বানাতে পারবে। ওটার প্রতি নিরঞ্জনের কোনো লোভ নেই, লোভ করবার সময়ো নেই—সকালে সে নীচে, তার আপিসের গ্রীন-রুমে, দুপুরে সে লায়ন্স্ রেঞ্জে, তার আপিসের প্রত্যক্ষ রঙ্গমঞ্চে, আর রাত্রে সে একেবারে তার বিছানায়। ঘর—কতোগুলি ঘর দিয়ে সে কী করবে? উপরের বারান্দা পেরিয়ে আরো যে দুটো ঘর আছে, তাদের একটাতে জিনিস-পত্র, ট্রাঙ্ক-বাক্স, দেরাজ-তোরঙ্গ, আলমারি-আলনা সব থাক্ টাল হয়ে, যতোরকম হিজিবিজি; বাকিটা শ্রীপর্ণা তার ইচ্ছে মতো যে-কোনো কাজে লাগাক্। ইচ্ছে করলে সেটাকে সে তার একটা আন্তঃপুরিক ড্রয়িং-রুম বানাতে পারে, ইচ্ছে করলে করতে পারে তার ড্রেস করবার বুডোয়ার, কিংবা ইচ্ছে করলে রাখতে পারে এমনি খালি—যা তার খুশি। আর ঐ যে দেখছ কাঁটা-তার দিয়ে ঘেরা দক্ষিণের জমির সীমানার ধারে টিনের একটা ছাউনি, ঐটেই আমার গারাজ্, আপাততো আমার টু-সিটারটার; শিগ্‌গিরই একটা শেভ্রোলে কিনবো দু'জনের জন্যে, সেই সঙ্গে ওটাকেও আপাদমস্তক পাকা করে তুলতে হবে।

শ্রীপর্ণা সত্যিই এতোটা আশা করেনি। জানতো নিরঞ্জন অনেক টাকার মধ্যে এসে পড়েছে, তার শিরায় নীল রক্ত, চোখে রুপোলি স্বপ্ন, কিন্তু কৃত্রিম সম্পদ যে এতো সুন্দর হতে পারে, মানুষের বিত্ত যে হতে পারে মানুষের ব্যক্তিত্বের এমন অভিজ্ঞান, এ-কথা সে আর আগে কোনোদিন শোনেনি। মুখের গ্রাস আচ্ছাদন করে যে-বিত্ত আমাদের হাতে থাকে সেই উদ্‌বৃত্তিতেই আমাদের পরিচয়, আমাদের আসল উদ্‌ঘাটন। এ-সব যেন কাঠ ও কাচের

প্রাণহীন কতোগুলি জিনিস নয়, ঘরের চারিদিকে নিরঞ্জনের আত্মা যেন পড়েছে বিকীর্ণ, বিচ্ছুরিত হয়ে। এদের স্থমিত অনুপাতে নিরঞ্জনকে আরো তার বেশি সুন্দর লাগলো। ঘরের প্রত্যেকটি ইট, প্রত্যেকটি বায়ুকণা যেন তাকে এমনি সুন্দর, প্রচুরতায় এমনি সুন্দর হয়ে ওঠবার জন্যে ইশারা করছে।

শ্রীপর্ণা প্রত্যেকটি জিনিস ছুঁয়ে-ছুঁয়ে গেলো, নেড়ে-চেড়ে দেখলো, যেন এর পরেই ছিলো তার আদিম অধিকার, এমনি সমৃদ্ধ, এমনি উদ্বেল সম্পূর্ণতায়। দুঃখ সে চায়নি, দুঃখ একটা আভরণ নয় জীবনের, বরং তা পাপ, বরং তা দারিদ্র্য, মানুষের অধিকারই হচ্ছে সুখী হবার, নিজের-নিজের মাপে। আর দুঃখকে সব সময়েই পরিহার করা যায়, অতিক্রম করা যায়ঃ দুঃখের চেয়েও মানুষ অনেক বড়ো, দুঃখের বাইরেও তার অনেক জায়গা। শ্রীপর্ণা যতোই ভাবতে লাগলো এ বাড়ি তার, তার নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যেই এ-সব উপকরণ, ততোই সে যেন প্রচ্ছন্ন তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। দাঁড়ালো গিয়ে বা একটু আয়নার কাছে, বাথরুমে গিয়ে খামোকা একবার কল খুললে, ঘাঁটলে দুটো বই, আর কখনো বা জানলা দিয়ে রাতের বিশাল, অস্পষ্ট কল্‌কাতার দিকে তাকিয়ে রইলো।

তবু আরো দুটো দিন দেরি হলো, এদিক-ওদিক বন্দোবস্ত করতে, এখানে-ওখানে টুকিটাকি দুটো-একটা জিনিস কিনে আনতে। এ দু'টি দিনের জন্যেও শ্রীপর্ণা তার খোলসটা খুলে ফেল্‌লো না, শরীর থেকে ঝরিয়ে দিলো না শুকনো পাতার বিশীর্ণ হাহাকার। এখনো যেন মেঘ কেটে যায়নি, শুধু ঘোলাটে একটু আভা, পীত, প্রেতায়িতঃ এখনো চাঁদ আসেনি বেরিয়ে তার উদগ্র উন্মুক্তিতে। এখনো শুধু মৃদু-মৃদু দু'টি জলকণা, নদীর নিঝুম একটি ধারাঃ এখনো নয় ময়ূরের মতো সমুদ্র। এখনো শ্রীপর্ণা চুল বাঁধে না, ছাড়েনি তার সেই সাদা থান, বন্দী হয়ে আছে তার উদাসীন, বিবর্ণ কৃশতায়। এখনো নিরঞ্জন হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে পারছে না; কোণের ঐ খালি ঘরটাই সে আপাততো বেছে নিয়েছে। ভোর হবার আগের প্রহরটাই বেশি অন্ধকার। তারপর ভোর যখন হবে, সূর্যের সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও বেরিয়ে আসবে তার অন্ধকার কোটর থেকে। শুধু এই দু'টি দিন, আরো দু'টি দিন।

ঘুম থেকে উঠে, আড়মোড়া প্রায় না ভেঙে, ড্রেসিং-গাউনটা তাড়াতাড়ি গায়ে চাপিয়ে নিরঞ্জন বারান্দা ধরে চললো সেই কোণের ঘরের দিকে—

শ্রীপর্ণাও দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে প্রদীপ্ত চঞ্চলতায়। তাকে দেখেই নিরঞ্জন যেন উথলে উঠলো দুই চোখে, শ্রীপর্ণাকে এখন দেখাচ্ছে ঠিক স্বপ্নের মতো। নিরঞ্জন কথাগুলি যেন তার গায়ের উপর ফুলের পাপড়ির মতো ছিটিয়ে দিলো : আজ, আজ পর্ণা, কতো যুগ পরে আমাদের ঘরে আজ সেই দিন এসেছে।

শ্রীপর্ণা স্মিত স্নিগ্ধ মুখে বল্‌লে,—আজই ? ক'টার সময় ?

—দুটো থেকে চারটে। আমি সব ঠিক করে এসেছি। নিরঞ্জন হয়তো তাকে একটু স্পর্শ করবার জন্যে হাত বাড়ালো।

মুখের উপর চমকিত, দ্রুত একটি হাসির রেখা টেনে শ্রীপর্ণা দেয়ালের দিকে নিজেকে একটু সঙ্কুচিত করলে। বল্‌লে,—দুটো থেকে চারটে। কিন্তু তুমি আজ আপিস করবে না ?

—আপিস ? তুমি বলো কী, পর্ণা ? নিরঞ্জন হাসিতে ফেটে পড়লো : আজ আমার বিয়ে, আর আমি যাবো আপিস করতে ? জীবনে একটা বিয়ে, তা-ও শান্তিতে করতে পাবো না ?

—কী জানি, শ্রীপর্ণাও তার ছোট-ছোট মসৃণ দাঁতে ঝক্‌ঝকে হেসে উঠলো : আমি তো ভাবছিলুম এতো তোমার কাজের তাড়া যে কখন হয়তো বিয়ের কথাটাই ভুলে গেছ।

—কাজ, কাজ, নিরঞ্জন হাল্‌কা গলায় বল্‌লে,—কাজ কি আমার কাঁধে ভূত হয়ে বসেছে নাকি ? আমি কারুর কাজের বোঝা বয়ে বেড়াই না, কাজটা আমার হাতের সুড়সুড়ি, থামিয়ে দিলেই হলো একদিন। আপিসটা আমার—ইচ্ছে করলে দিলেই হলো উঠিয়ে।

—পারো তুমি উঠিয়ে দিতে ?

—যে কোনো মুহূর্তে। কিন্তু তখন দেখবে তোমারই আবার ভালো লাগবে না। সমর্থ পুরুষ হয়ে কী কেবল দিন-রাত পড়ে-পড়ে ঘুমোয় !

শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো শব্দ করে।

নিরঞ্জন ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে,—থাক্‌, এখন আর কোনো কাজের কথা বলতে হবে না। এসো, চা হয়তো তৈরি হয়ে গেলো এতোক্ষণ। আজ একটা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রীপর্ণা চমকে উঠলো : সে কী, তুমি এই উপলক্ষে লোক-জন খাওয়াবে নাকি ?

নিরঞ্জন হেসে বল্‌লে,—এই উপলক্ষে অন্তত আমাদের দু'জনকে তো খেতে হবে। আমাদের দু'জন ছাড়া আর লোক-জনই বা কই পৃথিবীতে ?

—সে তো সন্ধ্যের পর, ব্যাপারটা চুকে গেলে।

—কেন, দিন কি দোষ করলো ? দিনে কি আমরা উপোস করে থাকবো নাকি ?

—পাগল ! তুমি আবার উপোস করে থাকবে !

—আর তুমি ?

লজ্জায় চোখের পাতা দু'টি একটু কাঁপিয়ে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—আজ আমার বিয়ে না ?

একটা বাজতে-না-বাজতেই নিরঞ্জন শ্রীপর্ণাকে তাড়া দিতে লাগলো। না, তার আর কিছু ভয় করছে না, বাথরুমে ঢুকে অনেক জল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে স্নান করলে। এতো জল দিয়ে এতোক্ষণ ধরে সে অনেক দিন স্নান করেনি—ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে শরীরের যে এতো আনন্দ সে-সম্বন্ধে তার যেন কোনো ধারণাই ছিলো না। স্নান করে দীর্ঘ, আর্দ্র চুলে, সমস্ত শরীরে স্নিগ্ধ পিচ্ছিলতা নিয়ে শ্রীপর্ণা ড্রেসিং-টেব্‌লের আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। বন্ধ করে দিলো ঘরের দরজাটা। আজ কেউ আর তাকে সাজিয়ে দিতে এলো না, সে নিজেই সাজ করলে। চিরুনিতে চুলের জট যেন সহজে ছাড়ানো যাচ্ছে না,—তার যে এতো চুল ছিলো, একসঙ্গে এতো তার ভার ও মুক্তি, তাই বা কে জানতো এতোদিন ? সিঁথির দু'পাশে লতানো চুলের মসৃণতায় তার মুখকে কেমন ধারালো কেমন-বা একটু প্রগল্‌ভ দেখাচ্ছে। খোঁপার চূড়াটা যেন একটা উচ্চণ্ড বিহ্বলতা। শ্রীপর্ণা ফের নতুন করে খোঁপা করলে, কিছুতেই তার মনমতো হলো না, কিছুতেই যেন আনতে পারলো না একটা শান্ত শালীনতা। মুখে একটু স্নো ঘস্‌লো, তাতে মুখটাকে যেন আরো উগ্র, ক্ষুধার্ত দেখালো, উচ্চারিত হয়ে উঠলো যেন তার উদ্ধত স্পর্ধা। পছন্দ করে নিরঞ্জন যা একখানা শাড়ি কিনে এনেছে তা কোনো ভদ্রলোকে পরতে পারে না। শ্রীপর্ণা একখানা অনুচ্চারিত, সাদা রঙের শাড়িই কিনতে চেয়েছিলো ; তার এই অহেতুক শুভ্রতাপ্রিয়তার জন্যে নিরঞ্জন তাকে প্রকাশ্যেই কী-সে একটা ধমক দিলে। বল্‌লে : সাদা হচ্ছে প্রাত্যহিকতার রঙ, উৎসবের রঙ হবে লাল, রক্তের মতো, আগুনের মতো। তেমনি একটা লেলিহান লাল

রঙের শাড়ি সে কিনে দিয়েছে। এ-শাড়ি পরা মানে সকলকে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অকারণ সচেতন করে তোলা—গোড়াতে শ্রীপর্ণার কিছুতেই মন ওঠেনি —কিন্তু নিরঞ্জন কথায় প্রচণ্ড জোর দিয়ে বলেছিলো : তাই তো চাই, প্রতি চক্ষুতে প্রচারিত করে দেয়া যে তুমি আজো বেঁচে আছো, আজো সুন্দর হয়ে বেঁচে আছো। অন্তত আজকে এই উৎসবের দিনে তোমার ঐ মৃত্যুর শুভ্রতা ধুয়ে ফেলে দিয়ে জীবনের রোমাঞ্চে লাল হয়ে উঠতে হবে। লাল আর সাদা, শাড়ির আবার কিসের মূল্য, শেষ পর্যন্ত শ্রীপর্ণা আর আপত্তি করেনি। আগের মতো সংক্ষেপে না সেরে শাড়িটাকে তার শরীরের চারধারে বিস্ফারিত করে দিতে হলো, নিপুণ হাতে বিন্যস্ত করে রাখতে হলো ভাঁজের পর ভাঁজ, আঁচলে আনতে হলো একটা উড়ন্ত উচ্ছ্বাস। সাজের ভগ্নাংশগুলি সম্পূর্ণ করে তারপর যখন সে আয়নায় এসে দাঁড়ালো, শ্রীপর্ণা ঠাণ্ডা একটা ভয়ে আপাদমস্তক শিউরে উঠলো, সে যেন আর তাকে চিনতে পাচ্ছে না, সে যেন তাকে ভুলে গেছে! সে যেন মানুষ নয়, অরণ্যে একটা ভয়ঙ্কর দাবদাহ। আয়নার ওপারে যেন আরেকজন কে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন সে নয়, তার প্রচ্ছন্ন কোনো করাল প্রেতমূর্তি, যেন-বা জ্বরে জীর্ণ, পিপাসায় আতুর, লোভে লালায়িত আরেকটা কোনো ছায়া, যা তার শরীরে ছিলো ঘুমিয়ে। গয়নাগুলি গায়ে ঠিক ভালো করে বসেনি, রোদ লেগে তাদের প্রখর ঝিকিমিকিতে তাকে যেন কেমন মূর্খ, কেমন নিঃস্ব, কেমন কুৎসিত দেখাচ্ছে। ইচ্ছে হলো টান মেরে সব সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, মৃত যতো ভার আর আবর্জনা, যা তার চামড়ার বুনটের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। কী হবে এ সব আবরণ আর আভরণ দিয়ে, যখন তার এমনিতেই এতো রহস্য, এতো অসমাধেয়তা; কী হবে বাইরের আলোয় জ্বলে উঠে যখন সে নিজেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার রক্তে আর আত্মায়, তার অপরিমাণ অস্তিত্বের প্রাচুর্যে? হারকিউলিসের পোশাকের মতো রাশীভূত সমস্ত সাজসজ্জা তাকে যেন প্রতি রোমকূপে দগ্ধ করে দিতে লাগলো। কিন্তু উপায় নেই, তাই বলে সে উৎসবের লগ্ন ব্যর্থ করে দিতে পারে না।

নিরঞ্জন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দরজায় টোকা মেরে জিগ্‌গেস করলো : তোমার হলো?

—দাঁড়াও।

আরো কী যেন একটা এখনো বাকি আছে, শেষ তুলিকাপাত। শ্রীপর্ণা আয়নার সামনে আবার ঝুঁকে দাঁড়ালো! সিঁদুরের বদলে, অন্যান্য প্রসাধনের জিনিসের সঙ্গে নিরঞ্জন ছোট এক শিশি কুঙ্কুম এনেছিলো। তারই ছিপি খুলে সংলগ্ন কাঠিটার মুখে, সূক্ষ্ম কম্পমান আঙুলে তার স্তিমিত দু'টি ভুরুর মাঝখানে, শান্ত কপালের উপর ছোট্ট সে একটি ছাপ তুললে।

সত্যিই, আজ তবে তার বিয়ে। আশরীর সজ্ঞানতায়। প্রগল্ভ হাসিমুখে, একটু বা প্রদীপ্ত অহঙ্কারে, আয়নার সে-অপরিচিতাকে সে সম্ভাষণ করলো।

তারপর দরজা খুলে বাইরে এলো বেরিয়ে, মাটির উপরে দিনের তারার মতো।

—গ্লরিয়াস! নিরঞ্জন উল্লাসে প্রায় চিৎকার করে উঠলো: তোমাকে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পর্ণা। তুমি যে কতো সুন্দর, কী বিস্ময়কর সুন্দর, ঈশ্বর তা আজ দেখছেন।

শ্রীপর্ণা অনপনেয় লজ্জায়, কেন কে জানে, ম্লান, বিমর্ষ হয়ে গেলো। আপাদমস্তক এত সে সেজে এসেছে, তবু তাকে তার, কেন কে জানে, ভীষণ অনাবৃত, ভীষণ অসহায় মনে হতে লাগলো। যেন সেখানে সে একটা হাড়ময় কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

নিরঞ্জন এগিয়ে এসে অনায়াসেই তার একখানি হাত ধরলে।

ছয়

কয়েকটা দিন, কয়েকটা মাস কেটে গেলো দীর্ঘ একটা চুম্বনের মতো।

সমস্ত আকাশ যেন গেছে ফুরিয়ে, পৃথিবী ছোট হতে-হতে এই ঘরে, এই চারটি দেয়ালের সীমাবদ্ধতায় উঠেছে ঘন হয়ে। দিন না রাত্রি, কিছু তাদের কোনো খেয়াল নেই, শুধু অবারিত একটি প্রবাহ, তপ্ত দিন আর তীব্র রাত্রি, অবিচ্ছিন্ন ছন্দোময়তা। সমুদ্রের জলে জলে যেই আলো, সেই নির্জন, দুর্নিরীক্ষ্য আগুন উঠেছে জ্বলে, প্রথম মৃত্তিকাকে পৃথিবীতে রূপান্তরিত করবার সময় বিধাতার হাতে ছিলো যেই স্নেহ, সেই স্নেহ যেন তাদেরো হাতে। চারদিকের বাতাস পর্যন্ত যেন একটা জ্বলন্ত তরলতা। এ শ্রীপর্ণা কোথায় এসে পড়েছে, তার জীবনের কী অনাবিষ্কৃত মহাদেশে! জীবনে এমন কতোগুলি সুখ আছে, এতো সমাপ্ত, এতো সুদুঃসহ, যে, তারপর আর মানুষের বাঁচা উচিত নয়,—শ্রীপর্ণাও কেন মরে গেলো না সেই শীতল তীব্রতায়? ভালোবাসায় যে এতো রোমাঞ্চ আছে, নতুন পাতায় বৃক্ষ-মর্মরের মতো, ভয়ে যে এতো আকর্ষণ আছে, অন্ধকার রাত্রে পর্বতচূড়ার মতো, তা কে জানতো পৃথিবীতে? শ্রীপর্ণা যেন তার নির্জন সমুদ্রে সাইরেনের ডাক শুনতে পাচ্ছে। যেন দেবতা প্যানের অন্বেষণে চলেছে সাইকি।

মুঠো-মুঠো করে তারা সোনার মুহূর্তগুলি ছড়িয়ে দিতে লাগলো তাদের অবকাশের মরুভূমিতে। ক্ষান্তিহীন, প্রশান্ত একটা অশ্রান্তি। জানলার কাছে ভোরের সূর্য যখন এসে দাঁড়ায়, শ্রীপর্ণা বুঝতে পারে তার অভ্যুদয়ের ঐশ্বর্য; মথিত দুধের কণ্ঠার মতো রাত্রে যখন বিন্দু-বিন্দু তারা ফুটে ওঠে, বুঝতে পারে বিদীর্যমান সেই অন্ধকারের শিহরণ। সমস্ত শরীর দিয়ে সে ঈশ্বরকে প্রণাম করে যে তার অনিঃশেষ সৃষ্টির অপরিমেয়তার সঙ্গে সঙ্গে তারো জীবনে নিয়ে এসেছে দ্যুতিমান সম্ভাবনা। তারা যেন সৃষ্টির শৈশবে চলে এসেছে, পৃথিবীর আদিমতম স্বর্গে, আদম আর ইভ্-এর মতো, যেদিন ছিল না এই নগর, এই কোলাহল, এই মোটর-মুখরিত সভ্যতা। সুস্থ, প্রফুল্ল, আরণ্য শৈশবে। যেদিন ছিলো

না মন নিয়ে হীন দার্শনিকতা, ক্ষুদ্র, বিকৃত মনোবিকলন নিয়ে : যেদিন শরীরের উপর ছিলো না রাশি রাশি লজ্জা, আত্মার অহেতুক অত্যাচার। জীবনের সেই উদার উচ্ছৃঙ্খলতায়। ঈশ্বর যেন আগে এসেছিলো এ ঘরে, পরে এসেছে দেহের এ সিংহাসনে, আহিত অগ্নির মতো দীপ্যমান এ দেহ। পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে জ্বলন্ত আকাশের মতো এ সুন্দর। এতো ঐশ্বর্য যেন শ্রীপর্ণা কোনোদিন স্বপ্নেও দেখেনি!

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে, ক্রমে-ক্রমে, শ্রীপর্ণা নেমে এলো তার শীতল স্বাভাবিকতায়, প্রাত্যহিক সংসারের সমতলে। আগে-আগে ক'টা দিন নিরঞ্জন সমানে আপিস কামাই করেছে, কোনোদিন যদিও বা গেছে, দু'-এক ঘণ্টার জন্যে; ইদানি তার আফিসের ঘণ্টাগুলি দীর্ঘতরো হয়ে আসতে লাগলো। তবু কী ভালো লাগে যখন সে আপিস থেকে ফিরে আসে,—কখন ফিরবে তার কোনো অনুমেয় সময় বাঁধা নেই, যখন ইচ্ছে সে চলে আসতে পারে, আসেও তাই : যখন হয়তো বই নিয়ে পড়তে-পড়তে চাঁদের আলস্যে শ্রীপর্ণা ঘুমিয়ে পড়েছে ইজি-চেয়ারে, যখন হয়তো বা কোলের উপর একটা সেলাই নিয়ে বসেছে, যখন হয়তো বা, বিকেলের ধার ঘেঁষে, দাঁড়িয়েছে সে এসে জানলায়, ম্লান হয়ে আসা কলকাতার মুখোমুখি। নিরঞ্জন যখন ফেরে, যেন সে কতো যুগ পরে ফিরলো, বিচ্ছেদের পর পরিচয়টি আবার নতুন করে পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। কী সুন্দর করে তাদের ভোর হয়, কী সুন্দর করে তাদের রাত আসে, যেন সমস্ত তাদের চোখের উপর দিয়ে, অনুরণিত রক্তের মধ্যে।

সংসারের মধ্যে ছাড়া পেয়েই শ্রীপর্ণা প্রথম বাবুর্চি তুলে দিলো, রূঢ় সাহেবিপনাকে নিয়ে এলো একটি বিশৃঙ্খল বাঙালিয়ানার ছন্দে, মধুর একটি এলোমেলো কবিতায়। নইলে সে করবে কী, সমস্তটা সকাল, যদি না রান্নাঘরে গিয়ে সে হাঁড়ি ঠেলে, যদি না সেই সঙ্গে-সঙ্গে তার হৃদয়কেও সে জ্বাল দেয়? শ্রীপর্ণা হেসে উঠতো, তা হলে তাকেও আপিস করতে হয়; অথচ বিয়েটা মেয়েদের কাছে, ধর্ম না হোক, নিদেনপক্ষে ভালো মাইনের চাকরি তো একটা বটেই। নইলে সে-ও বা তার ছন্দ খুঁজে পাবে কোথা থেকে? নিরঞ্জনকে খাইয়ে, আপিসে পাঠিয়ে তবে তার অন্য কথা। বা রে, এখনো স্নানই হয়নি, রান্নাঘরটা হয়ে আছে এক হাঁটু, সে এরি মধ্যে এই সঙ্গে খেতে বসবে কী? খাওয়ার চেয়ে খাওয়ানোতে যে কী আনন্দ, শ্রীপর্ণা আবার হেসে উঠতো,

এ-কথা বাঙালী মেয়ের চেয়ে আর বেশি কে জানে বলো ? আচ্ছা হবে, হবে, রাতে খাবো এক সঙ্গে বসে, তখন খেতে-খেতে গল্প কোরো, এখন গল্প করতে-করতে খাও। নিরঞ্জন যখন আপিসে যাবার জন্যে তৈরি, নীচে নেমেছে, তখনো শ্রীপর্ণা ছুটি নেয়নি, সে নিজেই নিজের বাড়িয়ে চলেছে কাজ—এখন আবার ভাঁড়ার ঘরে তাক সাজাতে বসেছে। নিরঞ্জন স্নেহে ধমক দিয়ে উঠলো :

তুমি এমনি সমস্ত দিন খেটে মরবে নাকি ? চান-টান করে খেয়ে নিতে হবে না ?

মিট্-সেফ্টা নতুন করে গুছিয়ে রাখতে-রাখতে শ্রীপর্ণা বল্লে—হবেখন আস্তে-আস্তে।

—আস্তে-আস্তে মানে ? কটা বেজেছে খেয়াল আছে ?

শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো : তোমার ঘড়ি আর আমার ঘড়ি সময়ের একই শাসনে চলে না।

—তোমার ঘড়িতে তো এখনো ভোর হয়নি। নিরঞ্জন ঈষৎ বিরক্ত মুখে বল্লে,—কিন্তু এমনি অসময়ে খেলে শরীর মাটি হয়ে যাবে যে দু'দিনে।

যেন কী ভীবণ অবিশ্বাস্য কথা, এমনি সরলতায় শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো।

—কী যে তোমরা ছেলেমান্সি করতে পারো এই সব তুচ্ছ টুকিটাকি নিয়ে, শিশি আর কৌটোর দোকান, কোথায় তোমার কালোজিরে বা কোথায় তোমার তেজপাতা, কী যে শান্তি পাও তা দেবতারাও বলতে পারেন না।

—দেবতারাও বা এমনি টাকা রোজগার করে কী সুখ পান, তাই বা কে জানতে আসছে ?

অগত্যা নিরঞ্জনও হেসে উঠলো। অল্পক্ষণ। পর মুহূর্তেই মুখে গম্ভীর প্রভুত্বের ভাব ফুটিয়ে বল্লে,—কিন্তু তুমি এ-সব ছাই-ভস্ম নিয়ে খাটতে যাবে কেন ? ইচ্ছে করলে এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্যে অনায়াসে আরো দুটো চাকর রেখে দিতে পারি।

—লুটের সম্পত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে বাড়ির মধ্যে শেষকালে একটা খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে যাক্।

—কিংবা, নিরঞ্জনকে আবার হেসে উঠতে হলো : পেয়ালার সঙ্গে যেমন হাতলের, তেমনি তাদের ভাবও হয়ে যেতে পারে গলায়-গলায়।

—তবেই দেখতে পারছো কেন খাটছি।

—নিক্ না, কতো নেবে চুরি করে? ধরো, ওটাও না-হয় আমি ওদের মাইনেই দিলাম। ইচ্ছে করলে আজই বিকেলে—

হাসিতে স্ফুরিত, চঞ্চল দু'টি চোখ তুলে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—ইচ্ছে করলে তুমি তো আর-কাউকেও বিয়ে করে আনতে পারতে!

অসম্ভব। নিরঞ্জন বাইরে তার মোটরে গিয়ে বসলো।

নীচেটা গোছগাছ করে উপরে আসতে-আসতে শ্রীপর্ণার অনেক দেরি। শরতের নীল দুপুরটি নিঃশব্দতায় ঝল্‌মল্ করছে। শ্রীপর্ণা আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়, লতানো আঙুলে শুকনো বেণীটা খুলে ফেলতে থাকে। আয়নাটা ছেড়ে অনেকক্ষণ তার সরে যেতে ইচ্ছে হয় না, আয়নাতে সে যেন দেখতে পাচ্ছে তার সুখ, তার ঐশ্বর্য, তার আশরীর পরিপূর্ণতা। নিজেতেই নিজে সে বিভোর হয়ে ওঠে। ঠোঁট দু'টি কেমন ঘন, ভুরু দু'টি কেমন তীক্ষ্ণ, চিবুকটি কেমন সাহসী হয়ে উঠেছে। তার বাহুতে এসেছে নিটোল ডৌল, চামড়ায় নতুন মসৃণতা, চুলে কালো ঔজ্জ্বল্য। কেমন সে এখন ক্ষিপ্র, লীলায়িত, পিচ্ছিল। নিজেকেই নিজের তার ভারি ভালো লাগে—যেন কোন ছেলেদের-বইয়ে-পড়া স্বপ্নে-দেখা রাজকুমারী।

স্নান করে আরো অনেক পরে সে খেতে যায়, খাওয়া সম্বন্ধে সে যেন এখনো বিশেষ উৎসাহ সঞ্চয় করতে পারেনি। চর্চার অভাবে রুচিটা তার এখনো মার্জিত হয়ে উঠতে পারেনি, জিভটা যেন এখনো কেমন ভারি ঠেকে। এটাকে নিরঞ্জন নেহাৎ একটা ব্যক্তিগত রুচি বলে মেনে নিতে পারে না কেন, প্রাণহীন একটা অভ্যাসের অসহায়তা বলে? তবু তো দিনের বেলা পাতের পাশে সে একটা বেড়াল নিয়ে বসে—পাড়ার কোন একটা হতচ্ছাড়া বেড়াল এরি মধ্যে তার সঙ্গে দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেলেছে, যতোক্ষণ সে খেতে না নামে বেড়ালটা নীচে থেকে মিহিস্বরে তাকে খুঁজে বেড়ায়—কিন্তু রাতে এক টেবিলে মুখোমুখি খেতে বসে নিরঞ্জনের সেন্টিমেন্টকে সম্মান করবার জন্যেই তাকে মাছ ভেঙে মুখে তুলতে হয়। নিরঞ্জন এ-সব বিষয়ে যেমন বন্য, তেমনি আবার স্বদেশী। বলে: মাছই হচ্ছে এয়োতির চিহ্ন।

আরো একদিন ডেকে বললো: সিঁথিতে তুমি সিঁদুর দাও না কেন?

শ্রীপর্ণা হেসে বললে,—এই তো সিঁদুরের টিপটা কপালের উপর জ্বল্‌জ্বল্ করছে। তোমার চোখ খারাপ হয়ে গেলো নাকি?

—ও তো কপালে, সিঁথেয় সিঁদুর কই ?

—সিঁথেয় দিয়ে কী হবে ?

—না, সিঁথেয় সিঁদুর দিলে ভারি সুন্দর দেখায় মেয়েদের। চেহারায় চমৎকার একটা মহিমা আসে।

—ছাই আসে। শ্রীপর্ণা অস্বাভাবিক জোরে হেসে উঠলো : সিঁদুর দিতে-দিতে কপালের সামনেটায় ছোট একটা টাক পড়ে যায়। যদি বা সিঁথির রেখাটা বদলে দিতে ইচ্ছে করে তো এই সিঁদুরের জ্বালায় পারা য বে না।

নিরঞ্জন গম্ভীর হয়ে বললে,—কেন, প্রত্যেক হিন্দু মেয়েই তো সিঁদুর দেয় সিঁথিতে।

শ্রীপর্ণা বলে উঠলো : আমাদের হিন্দুমতে বিয়ে হয়েছে নাকি ?

নিষ্ঠুর যুক্তিটা যেন নিরঞ্জনকে আর পলক ফেলতে দিলো না। গুটিয়ে গিয়ে আমতা-আমতা করে বললে,—তা হিন্দুধর্ম ভয়ানক উদার, এক অর্থে আমরা তো হিন্দুই।

—সেই উদারতা আমার ললাটে শোভা পাক্। শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো।

—না, নিরঞ্জন আবার তার জায়গায় এসে বসলো, তার স্বামীত্বের আসনে : না, সিঁথিতে সিঁদুর পরলে তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাবে, তুমি জানো না। একটা শিখার মতো সুন্দর। কালো মেঘের মাঝে অচঞ্চল একটি বিদ্যুৎ।

—ভারি সুন্দর দেখাবে! শ্রীপর্ণার দুই চোখ ম্লান হয়ে এলো : এমনিতেই আমি সুন্দর নই ? আমার প্রেম ঐ সিঁদুরের চেয়ে বেশি রক্তিম নয় ?

নিরঞ্জন আর কোনো কথা বলতে পারলো না! শ্রীপর্ণার মুখের কথা ক'টা তাকে যেন সেই মুহূর্তে অবশ করে দিলে। তার যুক্তিতে সে মুগ্ধ হলো বটে, কিন্তু যুক্তিতে কেউ তৃপ্ত হতে পারে না। নিরঞ্জন উঠে পড়লো তার জায়গা ছেড়ে, নেমে এলো বন্ধুতার সমতায়, শ্রীপর্ণাকে কাছে টেনে এনে বল্‌লে,—কিন্তু কাব্যে সিঁদুরকে বলেছে শৃঙ্গারভূষণ—

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শ্রীপর্ণা হাসিতে লুটিয়ে পড়লো। বল্‌লে—কী তোমার চমৎকার রসবোধ! ও-সব লোহা-লক্কড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাগজে-কলমে তুমি তো এখন কবিতা লিখতে বসলেই পারো!

খাওয়া-দাওয়া সেরে শ্রীপর্ণা যখন উপরে উঠে আসে, তখন চারদিকের ঘন দেয়ালগুলো যেন অনেক দূরে সরে দাঁড়ায় অনেকখানি শূন্যতা রেখে। হাতের

কাছে সে আর তখন কোনো কাজ পায় না, কোনো আশ্রয়। দুপুরটা যেন তার বুকের মধ্যে খাঁ-খাঁ করতে থাকে। এতোক্ষণ এখানে-সেখানে নানান কাজ-কর্মের আবর্তে সে ভেসে বেড়ায়, ইচ্ছে মতো চাকর-বাকরকে হাঁক পাড়ে, ধমকায়, নিরঞ্জনের সঙ্গে কাটাকাটা কথায় ও আলাপে অনেকটা দূর সে পার হয়ে আসে। এতোক্ষণ সে ছিলো ব্যাপৃত, এখন কেমন যেন সে নিরাবলম্বের মতো এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে থাকে। ঢোকে এসে সে লাইব্রেরিতে, বিশাল সেই অক্ষরের অরণ্যে, কখনো-কখনো আগাগোড়া পড়তে পারবে ভেবে দু' একটা বইও পেড়ে আনে, কিন্তু কখন কোন পরিচ্ছেদে কার হঠাৎ দুঃখ হবে উদ্ঘাটিত, সেই ভয়ে বেশিদূর সে আর এগোতে পারে না। আজকালকার লেখকরা ভীষণ নিষ্ঠুর, অনেক সময় নিয়তির চেয়েও, বেছে-বেছে যতো তারা দুঃখের জীবন নিয়ে এসে জড়ো করে। তাদের চরিত্রদের যেন সুখ কখনও সয় না, যতো সুখী করেই আঁকো, অন্তরালে রয়েছে তার দুঃখের অবশ্যম্ভাবিতা, মাংসের পেছনে কঙ্কালের মতো। শ্রীপর্ণার এ-সব বই একটুও পড়তে ইচ্ছে করে না, জীবন নিয়ে এ-সব ঘোরতরো সমস্যা : তার চেয়ে ছেলেদের হাল্কা, মজাদার কোনো বই পেলে খানিকটা সময় সে ডুবে থাকতে পারতো। তেমন একটা বই-ও এতোগুলি শেল্ফের কোনো-একটাতেও সে খুঁজে পায় না। বোজা বইয়ের কবরের তলায় মৃত সেই অক্ষরের স্তূপের মধ্যে সে প্রেতগ্রস্তের মতো খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ায়, যেন সহ্য করতে পারে না সেই স্তব্ধতা। তাড়াতাড়ি সে শোবার ঘরে চলে আসে, একেক দিন বিছানা পেতেই শুয়ে পড়ে। যদি ঘুম আসে তো আসে, না এলেও চোখ বুজে জোর করে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ, তার সমস্ত অস্তিত্বকে সেই প্রবল অন্ধকারে বিলুপ্ত করে দিতে চায়। একেক দিন চোখ বুজেও পড়ে থাকা যায় না, দুপুরের রাশীকৃত নিঃশব্দতাটা যেন ভারি একটা পাথরের মতো তার বুক জুড়ে পড়ে থাকে। উঠে পড়ে সে এক ঝট্‌কায়, ইচ্ছে করে ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরিয়ে এখুনি তাকে পাঁচটা করে দেয়। তখন থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে সে নিরঞ্জনের জন্যে স্পষ্ট প্রতীক্ষা করতে পারে—যদিও একেক দিন, অনেক দিন থেকে প্রায়ই, কী দেরি করে যে আসে। তবু পাঁচটা বাজলেই, কি তারো কিছু আগে থেকে, সে বিকেলের ছোটখাটো কাজগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে, চাকরকে না খাটিয়ে নিজেই জল ভরতে পারে কুঁজোয়, কাপড়গুলি রাখতে কুচিয়ে, ঘর-দোর ঝাঁট দিতে, চুল বাঁধতে, গা-

কাপড় ধুতে, এক পেয়ালা চা খেয়ে নিতে আগাম। তবু তখন যেন আবার সে একটা সীমা দেখতে পায়, চলে আসে তার বর্তমানের নিকটবর্তিতায়। তবু তখন থেকে সে যেন খুঁজে পায় চারপাশে তার শিহরিত শরীর, উচ্চারিত হয়ে ওঠে তার স্থূল উপস্থিতি। শুধু দীর্ঘ সেই দুপুরগুলিই তার অসহ্য, সেও তখন দুপুরবেলারই মতো গলে যাচ্ছে তার নির্জনতার রৌদ্রে, তার জলন্ত শূন্যতায়। শুধু দুপুরগুলিই সে বইতে পারে না।

তারপর নিরঞ্জন যখন আসে, প্রায়ই দিনের ধূসরতম প্রান্তে ঘেঁষে, রাস্তায় বেজে ওঠে মোটরের এঞ্জিন, শ্রীপর্ণা সারা শরীরে শীতল, নিশ্চিন্ত একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে—যেন এইমাত্র সে খোলা দরজা পেয়ে কোন একটা আতঙ্কিত আবহাওয়া থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। নিরঞ্জনের সান্নিধ্যে দেখতে-দেখতে আবার সে চলে আসে তার কোজাগরী-রাত্রে, যে-রাত্রে ঘুম নেই, কেবল জ্যোৎস্না। দুপুরের সমস্ত রুক্ষতা সে একটি হাসি দিয়ে মুছে ফেলে শরীর থেকে, যেমন স্লেট থেকে অস্পষ্ট ক'টি পেন্সিলের লেখা, ম্রিয়মাণ ক'টি রেখায় ফুটে ওঠে মসৃণ কমনীয়তা। আবার তার লাস্য জাগে চোখে, পল্লবের ছায়ায় গালের কাছা-কাছি নাকের দুই পাশে, চিবুকের ঢেউটিতে। সন্ধ্যাটা তাদের কী সুন্দর যে কাটে চা-য়ে ও গল্পে, ঠাট্টায় ও তর্কে, চেতনার ধূসর আবছায়ায়, সান্নিধ্যের স্নিগ্ধ সেই গোধূলিতে, তা বলে আর শেষ করা যায় না। তারপর তারা গাড়ি করে বেড়াতে বেরোয়, বেড়াবার জন্যে নিরঞ্জন কিনেছে একটা প্রকাণ্ড শেভ্রোলে, জীবন্ত একটা পশুর মতো স্ফূর্তিমান। এবার সে নিজে ড্রাইভ করে না, স্তোফারকে হুইলে বসিয়ে নিজে সে এসে পিছনে বসে, শ্রীপর্ণার সরস-উত্তাপ নিভৃতিতে। যেদিন যেখানে খুশি ও যেখানে খুশি নয়, সব জায়গাতেই তারা ঘুরে বেড়ায়, নিরুদ্দেশ নীরবতায়, গঙ্গার ধার থেকে শুরু করে যশোর-রোড। তারা কেউ কখনো অবান্তর লোক পছন্দ করে না, তারা পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ, পরস্পরের মধ্যে প্রসারিত। একদিন তারা মিহিজাম পর্যন্ত মোটরে বেড়িয়ে এসেছিলো, অবিশ্যি নিরঞ্জনের আপিসের কী কাজে,—এমনি কেবল বেড়াতেই শ্রীপর্ণার ভালো লাগে, দূরে, আরো অনেক দূরে, যেতে-যেতে সেখানে নগরের সভ্যতা গেছে মিলিয়ে, গুঁড়িয়ে গেছে সব জিনিসের স্তূপ। কল্‌কাতা আর তার ভালো লাগে না। মিহিজামটা তার বেশ লেগেছিলো বটে, তাঁবুর তলায় বেদের মতো ঘরকন্না করা, কিন্তু বেশি দিন সেখানে থাকতে পায়নি।

তেমন একটা জায়গায়ো মানুষে আপিসের কাজে যায় এ-কথা বিশ্বাস করতে সেদিন শ্রীপর্ণার শুধু কাঁদতে বাকি ছিলো।

তারপর রাতে, রাতে আর শ্রীপর্ণার এতোটুকুও ভয় করে না, রাতে তার জন্যে আছে ক্লান্তিহরা সুদীর্ঘ ঘুম।

এক রাতে ঘুমোবার আগে শ্রীপর্ণা বললে,—চলো না, কোথাও বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।

নিরঞ্জন চমকে উঠলো: কেন, কল্‌কাতা কী দোষ করলো?

—তার এই একঘেয়েমি, এই কেবল বৈচিত্র্যের একঘেয়েমি, আমার আর একটুও ভালো লাগে না। রাতের অন্ধকারে শ্রীপর্ণাকে যেন কেমন করুণ শোনালো: চলো না আর কোথাও যাই, পৃথিবীর মানচিত্রে আরো কতো জায়গা আছে। বিয়ের পর আমরা তেমনি করে একবারো বেড়ালুম না।

নিরঞ্জন বললে,—আমার দিন কয়েকের জন্যে শিগ্‌গির একবার দার্জিলিঙ যাবার কথা আছে: মোটরে। তুমি যাবে? যাবে তো চলো।

—সে তো তোমার আপিসের কাজে।

—হ্যাঁ, তা ছাড়া আবার কি!

—না, না, শ্রীপর্ণা কণ্ঠস্বরে প্রায় কেঁদে উঠলো: তেমন করে যাওয়া নয়, নয় ক্যালেণ্ডারের খুচরো ক'টা তারিখের জন্যে। ছুটি নিয়ে ছন্নছাড়ার মতো চলে যাওয়া, ফিরি কি না-ফিরি তার ঠিক নেই। যাবে? কী হবে এমনি একজায়গায় শিকড় গজিয়ে?

নিরঞ্জন তন্দ্রার মধ্যে থেকে হেসে উঠলো, শোনালো তাকে একটা অভ্যাস-চালিত নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মতো: কলকাতা ছেড়ে দু'দণ্ড বাইরে থাকি আমার সাধ্য কী! আমার কাজকর্ম কে দেখবে-শুনবে?

—কাজকর্ম! শ্রীপর্ণা হাসলো না দীর্ঘশ্বাস ফেললো বোঝা গেলো না: কাজকর্ম করে কী হবে?

—কী হবে? নিরঞ্জন হাসির ছলে অদ্ভুত একটা শব্দ করে উঠলো: অনেক বেরিয়ে এসে পেট্রোলের ঝাঁজে মাথাটা তোমার গরম হয়ে আছে! তুমি এবার ঘুমোও।

শ্রীপর্ণা প্রাণপণে রইলো চোখ বুজে। সে যেন আর কলকাতায় নেই।

সাত

রাতে আর শ্রীপর্ণার মনে থাকে না দুপুরের সেই দুর্বহ নির্জনতা, যখন দেয়ালের প্রখর শুভ্রতা অনিমেষ চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে, সাদা শূন্যতার মতো, যখন চোখে না আসে ঘুম, মন বসে না কোনো কাজে, রোদে দ্রুত তীক্ষ্ণ রেখায় পাখা-মেলে-দেয়া পাখির মতো যখন সে আকাশ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে উড়ে বেড়ায়। মনে থাকে না তার রাতের পর রুদতী এই রৌদ্র। ভুলেই থাকে সে, একরকম ভুলেই আছে সে সব।

কিন্তু সেদিন এগারোটারো আগে নিরঞ্জনকে স্নানের জন্যে উঠতে দেখে শ্রীপর্ণা বিবর্ণ মুখে বললে,—আজ এতো সকাল-সকাল?

—হ্যাঁ, আজ আমার আপিসে জরুরি একটা মিটিং আছে। নিরঞ্জন গায়ের জামাটা খুলে ফেললো: বারোটায়। না গেলেই নয়।

—তোমার আবার মিটিং কী? তোমার হচ্ছে ওয়ান্-ম্যান্ বিজ্‌নেস, ইচ্ছে হলে রাখবে, ইচ্ছে হলে তুলে দেবে। তোমার আবার মিটিং কার সঙ্গে?

নিরঞ্জন তার মুখের দিকে চেয়ে তরল চোখে হেসে উঠলো: বড়ো একটা অ্যামেরিকান ফার্মের সঙ্গে নতুন, হেভি একটা কণ্ট্র্যাক্ট। ওরা আজ আসবে আমার আপিসে। চট্ করে চানটা এবার করে নিতে হয়। ক্ষিপ্র হাতে টেবিলটা থেকে স্নানের এটা-ওটা সে কুড়িয়ে নিতে লাগলো।

খালি গায়ে, যেন আর তার সেই বন্য জন্তুর সবল লাবণ্য নেই, দেখাচ্ছে তাকে এখন মসৃণ, নিষ্ঠুর, একটুকরো যন্ত্র, প্রাণহীনতার পালিশে উঠেছে ঝক্-ঝক্ করে।

শ্রীপর্ণার গলা হঠাৎ শীতের হাওয়ার মতো তীক্ষ্ণ, ঠাণ্ডা শোনালো: তুমি কি রোজ-রোজ এমনি আপিস করবে নাকি? সমস্ত দিন, বারোটা থেকে ছ'টা, যখন খুশি, যতোক্ষণ তোমার ইচ্ছে?

নিরঞ্জন থম্‌কে দাঁড়ালো: কী করবো বলো? নানান কাজ, সব দেখতে

হয় একা—একাই আমি একশো। নিরঞ্জন অস্ফুট একটু হাসবার চেষ্টা করলো : চেষ্টা তো করি আরো আগে ফিরতে, কিন্তু দিনগুলি ভারি ছোট। সময় যেন কেবলই হাত থেকে পিছল পড়ে যায়—সময় এতো কম।

শ্রীপর্ণা রূঢ় গলায় বললে,—কিন্তু এতো কাজ করে তোমার কী হবে ?

নিরঞ্জন বললে,—কাজ করবো না তো, করবো কী ?

শ্রীপর্ণা কী বলবে কিছুই ভেবে পেলো না। প্রশ্নটা এমন সমাপ্ত।

—সুস্থ, জীবন্ত একটা পুরুষ, কাজ ছাড়া বাঁচি কী করে ? আর এতো বিচিত্র কাজ, এতো রোমাঞ্চকর। নিরঞ্জন তার বুকের ও কাঁধের স্ফীতস্ফার পেশীগুলিতে পৌরুষের প্রচ্ছন্ন একটা দীপ্তি এনে বললে,—কাজ করবো না তো এনিমিক হয়ে বিছানায় শুয়ে কাৎরাবো নাকি খালি ? তুমিই বলো না, কী করলে তোমার পছন্দ হয় ?

শ্রীপর্ণার দুই চোখ বিষাদে একটু ছলছলিয়ে এলো : কিন্তু আমি একা সমস্ত দিন কী করে কাটাই ?

—বা রে, নিরঞ্জন বিস্মিত মুখে বললে,— এতো প্রকাণ্ড একটা লাইব্রেরি, বই পড়বে বসে বসে। এতো তবে কষ্ট করে পাস করেছ কিসের জন্যে ?

—বইয়ের ভিড়ে আমি ভীষণ হাঁপিয়ে উঠি। যেমনি তার চুল, তেমনি ছাই-রঙের তার গলা, শ্রীপর্ণা বললে,—মনে হয়, কতো আমি পড়ব, কতোটুকু আমার সময় ? হাজার বছর বাঁচলেও তো আমি কিছু শেষ করতে পারবো না। তখন এতো ক্লান্ত লাগে, এতো ভয় করে, বইয়ের একটা লাইনও আর পড়তে ইচ্ছে করে না। সময় আমারো কিছু বেশি নয়।

—বেশ তো, যদি বলো, তোমার জন্যে একটি ভালো দেখে কম্প্যানিয়ন রেখে দি। বিজ্ঞাপনে অনেক ইউরোপীয়ান মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়। এতো-দিন বলোনি কেন ? তার সঙ্গে বসে যতো খুশি গল্প করো না দুপুরবেলা, শিখতেও পারবে কতো কিছু।

—মাইনে দিয়ে রাখতে হবে কম্প্যানিয়ন, আর গল্প করবো বসে ইংরিজিতে ? এক ফুঁয়ে সমস্ত প্রস্তাবটা শ্রীপর্ণা উড়িয়ে দিলো। এক পা এগিয়ে এসে রুক্ষ গলায় বললে,—কিন্তু তুমি কেন এমনি কাজে, টাকা রোজগার করার তুচ্ছ, জঘন্য কাজে নিজেকে এমনি ক্ষয় করে ফেলবে ? টাকা, শুধু টাকা দিয়ে তোমার হবে কী জিগ্‌গেস করি ?

—বা, টাকা রোজগার না করলে খাবো কী দু'বেলা?

—আহা, কতো তোমার খাবার ভাবনা! চোখের উপর শ্রীপর্ণা ভুরু দুটো ঘন করে তুললো; বললে—যতো পাই, ততো চাই—এ কী তোমার দৈত্যাকার ক্ষুধা? এতো টাকা দিয়ে তুমি কী করবে, রাখবে কোথায়?

হাসতে-হাসতে নিরঞ্জন বাথরুমের দরজাটা খুলে ফেললো। ভিতরে চলে যেতে যেতে বললে—তার চেয়ে বলো না তোমার জন্যে আজ আবার কী এনে দিতে হবে, নতুন কোন শাড়ি বা নতুন কোন গয়না! অতো ঘুরিয়ে বললে আমি সহজে বুঝতে পারি না।

শ্রীপর্ণাকে তার পরনের শাড়ি ও গায়ের গয়নাগুলি যেন দংশন করতে লাগলো। যেন সে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে নিরঞ্জনের বিজ্ঞাপনের রঙিন একটা পৃষ্ঠা, তার লাভবান ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন। সে আর কিছু নয়, নিরঞ্জনের কাছে একটা অপব্যয়ের উপাদান, তার ঐশ্বর্যের উদাহরণ। শ্রীপর্ণাকে যেন সে তেমনি চোখে দেখে, যেমন তার বাড়ি, তার ফার্নিচার, তার মোটর, ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট। তার ভিতর দিয়ে নিরঞ্জন প্রকাশ করছে, আর কিছু নয়, শুধু তার সম্পৎশালিতার দম্ভ, শ্রীপর্ণার অস্তিত্বের মধ্যস্থতায়। শ্রীপর্ণা যেন শিশুর একটা খেলনা, নিরঞ্জনের হাতে: সে যেন অবসিত হয়ে এসেছে শুধু একটা চলৎশক্তিমান অভ্যস্ত যান্ত্রিকতায়। তার শরীরটা যেন শুধু একপিণ্ড মাংস, কয়েকটা হাড়ের যোগফল। শ্রীপর্ণা ঘরের চারদিকে চেয়ে সমস্ত কিছু যেন শূন্য দেখলো! যেন এটা বাড়ি নয়, বাস করবার একটা যন্ত্র: কোথাও যেন হৃদয়ের স্পন্দন নেই, শুধু হাড়ময় নিষ্ঠুর বিধিবদ্ধতা। যে সব জিনিস বেশি দিন ধরে টিকবে তাতে বিলাসিতার কোনো মাহাত্ম্য নেই—বেশি দিন ধরেই যদি টিকলো, তবে ওটার জায়গায় ফের নতুন জিনিস কেনবার সুযোগ পাওয়া গেলো কোথায়? ওদিকে ফ্যাশান যে গেছে বদলে। তার সঙ্গে জীবনে ও জিনিসে সঙ্গতি না রেখে চললে কিসের এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতা? যে জিনিস টিকলো সে তো রইলো অনেক জায়গা জুড়ে, অনড় একটা অত্যাচারের মতো। তাই টেঁকসই জিনিসের দিকে সভ্য, ব্যস্ত লোকের আকর্ষণ নেই: জিনিস যতো ঠুনকো, ততোই তার সম্পদ পায় প্রকাশের অবকাশ, ততোই তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় আধুনিকতরো জিনিসের আমদানি করা চলে। নিরঞ্জন সেই সভ্যতারই প্রতীক, মুহূর্তময়, প্রমত্ত সভ্যতার। সব যেন

সে তার পয়সা দিয়ে কিনে নিয়েছে তার বিলাসের উপকরণ হিসেবে : তার প্রেম, তার স্বামীত্ব, তার সুখ। প্রেম—তার কাছে প্রেম হচ্ছে জীবনের একটা প্রসাধন, জৈবনীতির প্রথম সোপান, তাকে নিয়ে অন্তত বিয়ের পর অনর্থক বাড়াবাড়ি করাটা মূর্খতা, স্নায়ুর অপব্যয়। সে যে স্বামী, তার মানে তার সঙ্গে মন মজিয়ে থাকো, হাতের কাছে দরকার মতো এটা-ওটা এগিয়ে দাও, দরকার হলে আবদার করো, এটায়-ওটায় খাটিয়ে নাও। সুখ—সুখ আবার কাকে বলে? প্রতি মুহূর্তে এই টপ্-গিয়ারে চলা, যখন যা খুশি কিনে নেবার স্বাধীনতা, যা-সব দেখে প্রতিবেশীদের প্রতি মুহূর্তে চোখ টাটাচ্ছে, তাই যদি না সুখ হয়, সুখ তবে কোথায় পৃথিবীতে? শ্রীপর্ণার চোখ পড়লো গিয়ে তার ড্রেসিং-টেব্‌লের উপর—থরে-থরে সাজানো আছে যেখানে তার প্রসাধনের টুকিটাকি, ছোটখাটো একটা দোকানের টুকরো। শ্রীপর্ণা হাঁপিয়ে উঠলো, তার সৌন্দর্যটা পর্যন্ত একটা চামড়ার জিনিস, বিশেষ একটা ইন্‌ডাস্ট্রির অঙ্গ। কী সে হবে নয়, কেমন সে দেখতে হবে! শ্রীপর্ণা হাঁপিয়ে উঠলো, মনে হলো যে-তন্তু দিয়ে তার এই জীবন বোনা হয়েছে, তা যেন ভয়ানক খেলো, দু'দিন ব্যবহার করতে-না-করতেই তার রঙ যাচ্ছে জ্বলে, আঁশ যাচ্ছে ছিঁড়ে, এখানে-ওখানে ফুটো বেরিয়ে পড়ছে।

বাথরুম থেকে নিরঞ্জন হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো। বললে,—বলো, কী চাই? কী তোমার জন্যে নিয়ে আসতে হবে?

—কিছু নিয়ে আসতে হবে না। শ্রীপর্ণা গম্ভীর মুখে বল্‌লে,—তোমাকে একটা কথা সত্যি-সত্যি জিগ্‌গেস করি। সত্যি করে বলো, তুমি আরো টাকা রোজগার করতে চাচ্ছ কেন? টাকা নিয়ে তুমি কী করবে?

টাকার কথায় নিরঞ্জন কখনো গম্ভীর হতে শেখে নি! টাকা আবার মানুষের কখনো বেশি হয় নাকি?

—হয় না? নিশ্চয়ই হয়। শ্রীপর্ণা ঝাঁজিয়ে উঠলো: একটা সীমা পর্যন্তই টাকা টাকা, তারপরে সেগুলো ধুলো, ঘৃণ্য আবর্জনা।

—বলো কী? নিরঞ্জন আয়নায় চুল ব্রাস্ করতে-করতে বললে,—সেই উদ্বৃত্তিতেই তো মানুষের উৎসব। প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে গিয়ে সেখানেই তো ঐশ্বর্যের মুক্তি।

—কিন্তু তুমি কী উৎসবটা করছো শুনি?

—আমি এখনো প্রয়োজনের সীমা পেরোতে পারলুম কই? আয়নায় নিরঞ্জনের হাসি দেখা গেলো, শ্রীপর্ণার মনে হলো হিংস্র, ক্ষুধার্ত: এই মাসেই আমাকে আরেকটা গাড়ি কিনতে হবে, এই বাড়িটা বদলাবো ভাবছি, মাথায় নতুন একটা ডিজাইন খেলছে, পরের রুচির সঙ্গে মিলিয়ে থাকতে গিয়ে গা-টা কেমন ঘিনঘিন করছে সব সময়।

—একশোটা বাড়িই করো আর গাড়িই করো, শোবার সময় সেই একটি-মাত্র তো বিছানা, চড়বার সময় একটিমাত্র তো গাড়ি—তোমার থাকবার জন্যে পৃথিবীতে মাত্র দু'টি হাত জায়গা! শ্রীপর্ণা হাসতে গিয়ে আরো গম্ভীর হয়ে গেলো: থাকবার জন্যে সমস্তগুলি বাড়ি তো আর একসঙ্গে জড়িয়ে নিতে পারবে না, চলবার সময় রাস্তায় শুধু একখানি মোটর নিয়েই তোমায় বেরুতে হবে। কী আছে তোমার এই আতিশয্যে? এই আত্মম্ভরিতায়?

—কী হলো তোমার আজ? খুব বড়ো বড়ো শক্ত শক্ত কথা বলছ!

শ্রীপর্ণা এগিয়ে এসে তার হাত ধরলো: এ কাজ তুমি ছেড়ে দাও।

—কাজ ছেড়ে দেবো কী? নিরঞ্জন যেন কথাটা গায়েও মাখলো না: বাবার আমলের ব্যবসা, কতো নাম, কতো প্রতিপত্তি, তা আমি ছেড়ে দেবো?

—হ্যাঁ, ছেড়ে দেবে। তুমিই তো বলেছিলে ইচ্ছে করলেই ছেড়ে দিতেপারো।

নিরঞ্জন হেসে উঠলো: ইচ্ছেটা হতে যাবে কেন এ সুসময়ে? দস্তুরমতো ভালো অবস্থা।

—তোমার ব্যবসার ভালো অবস্থা বলেই পৃথিবীর সবার অবস্থা ভালো?

—বা, টাকা আসছে যে মাসে-মাসে।

—আসুক। শ্রীপর্ণার চোখ অনুনয়ে নরম হয়ে এলো: আমাদের যথেষ্ট টাকা আছে। আরো, আরো, আরো টাকা দিয়ে আমরা কী করবো? কী হবে কেবল এসব জিনিসের স্তূপ বাড়িয়ে, টাকার সংখ্যায় শূন্য যোগ দিয়ে দিয়ে? তোমার, আমাদের একসময়েও কি থামতে হবে না? তার চেয়ে চলো এ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আমরা কোথাও চলে যাই।

নিরঞ্জন অভিভূতের মতো বললে,—কোথায়?

শ্রীপর্ণা যেন দিনের আলোয় স্বপ্ন দেখছে, বললে,—ধরো ইউরোপ। ইটালির কোন গ্রামে, সমুদ্রের ধারে আমরা বাসা করে থাকবো। ইটালি ভারি সস্তা, ভারি সুখী। যাবে?

—ছাড়ো, ছাড়ো, বারোটার সময় আমার মিটিং। নিরঞ্জন হাসিমুখে ছটফট্ করে উঠলো: ভালো পার্টি, দাঁওটা মারতেই হবে যে করে পারি। বলে কিনা এ আমি ছেড়ে দেবো, এতো যেখানে কাঁচা পয়সা! দেশটা আইনে না হয়ে যদি ইকনমিক্সে শাসিত হতো, পর্ণা, তবে তোমার ঠিক ফাঁসি হয়ে যেতো বলে রাখছি।

—তার আর কী বাকি আছে!

—বলে, কিনা সাধা পয়সা আমি ছেড়ে দেব! নিরঞ্জন শিশুর মতো হেসে উঠলো, মূর্খ একটা শিশুর মতো: বলে টাকা দিয়ে কী হবে? কী আবার হবে! ব্যাঙ্কে জমবে, ব্যাঙ্ক আবার নতুন-নতুন ব্যবসাকে উৎসাহ দেবে। একটা ব্যবসা থেকে আরো অনেক ব্যবসা: দেশের চেহারা যাবে ফিরে। চলো, চলো, আমাকে খেতে দেবে চলো। নিরঞ্জন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলো: টাকা দিয়ে কত ভালো কাজ করা যায়, পরের কতো উপকার, শ্রীপর্ণার ইচ্ছে হলো দুই প্রবল হাত দিয়ে মুখটা তার এবার চেপে ধরে—নিরঞ্জন নামবার সঙ্গে-সঙ্গে বলেই চলেছে সমানে: পৃথিবীর কতো কীর্তি। টাকা যদি কিছু থাকে, তবে গরিবদের বিলিয়েও তো দিতে পারি, দিয়ে দিতে পারি কোনো চ্যারিটিতে,—টাকা থাকলে কী না করা যায়?

শ্রীপর্ণা হাসলো: তোমার উদারতাকে অনেক ধন্যবাদ। যে-টাকা দস্যুতা করে গরিবদের থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছ, তাই তাদের দিয়ে যেতে চাও করুণা করে! তাদের পাওনা ফিরিয়ে না দিয়ে দিতে চাও তাদের ভিক্ষা! কীর্তিই তো বটে।

নিরঞ্জন তার মুখের দিকে অবাক হয়ে রইলো।

—নাও বোসো, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, বারোটা প্রায় বাজে। স্যোফারকে গাড়ি বার করতে বলেছ?

আজ আর দুপুরকে শ্রীপর্ণার ভয় নেই। সে শুয়ে-শুয়ে অনেক ভাবতে পারে এখন—অলস অশরীরী যতো চিন্তা। এই সুন্দর দুপুরবেলা, যখন কোথায় না-জানি ট্রেন চলেছে রৌদ্রদগ্ধ মাঠের উপর দিয়ে, গ্রাম্য পথের পাশে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে কোথায় না-জানি বসেছে এক চাষী, যখন কোনো স্কুলে নিচু-ক্লাসের দুষ্টু, চঞ্চল ছেলেরা গোলমাল করে চলেছে অফুরন্ত।

আট

সেদিন দুপুরবেলা ঝিল্‌মিলে রোদে কাঁপতে-কাঁপতে ফুর্‌ফুরে একটা প্রজাপতি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো, রঙের মৃদুল একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো। শ্রীপর্ণা ছিলো শুয়ে, শরীরে রাশীভূত আলস্যে: অল্প-অল্প আবার শীত পড়ে এসেছে বলে ভঙ্গিতে তার একটি উষ্ণ আড়ষ্টতা। বিশেষ কিছুই সে ভাবছিলো না, শুয়ে ছিলো সে তার মধুর মনোহীনতায়, নিরুদ্দেশ অস্তিত্বের শ্রান্তিতে, এমনি সময়, কী করে কে জানে, সেই প্রজাপতির উপর তার চোখ পড়লো। হালকা, রঙচঙে দু'টি পাখায় প্রজাপতি দেয়ালে-দেয়ালে রোদের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিচ্ছে।

কখন ও কিসে যে মানুষের কেমন করে কী হয় বোঝা কঠিন, কোথা থেকে কোথায় সে চলে আসে। প্রজাপতির দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে শ্রীপর্ণার সমস্ত শরীর শীতের ধারালো দীর্ঘশ্বাসের মতো কেঁপে উঠলো: অনুপস্থিত তার মন, একতাল পাষাণের মতো মৃত সেই ভার, কোথা থেকে এসে তাকে যেন পিষে ধরলে। প্রজাপতির মতো লঘু পাখায় তার মনও যেন উড়তে লাগলো তার শরীরের রৌদ্রে। আর সে নিজেকে মুছে ফেলতে পারলো না।

এখন না-জানি সে কতো বড়টি হয়ে উঠেছে! হয়তো তাকে ইস্কুলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, সব চেয়ে নিচু ক্লাসে, আর হয়তো তার কোমর থেকে বারে-বারে বেল্‌ট্‌টা খসে পড়ে না। মাথায় এবড়ো-খেবড়ো একটা সিঁথি, জুলপি দিয়ে হয়তো এখনো দুয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে, সদ্য স্নান করে এসেছে বলে মুখখানি তার কাটা একটুকরো শশার মতো কচি, গায়ে হয়তো ডোরা-কাটা শার্ট, প্যান্টের নীচে ঢোকানো, হাতা দুটো দুই কনুয়ের কাছে গুটিয়ে আছে,—কিংবা কোনোদিন বা বুক-খোলা ছোট কোট, তার যতো রাজ্যের সব বই নিয়ে চলেছে সে ইস্কুলে। সামনাসামনি কোথাও একটা স্কুল আছে নিশ্চয়ই, ট্র্যাম-রাস্তা পেরোতে হয় কিনা কে জানে? সঙ্গে নিশ্চয়ই তা হলে বাড়ি থেকে একটা চাকর যায়—তাকে তাড়া দিয়ে সংসারের কাজ-কর্ম থেকে

ছিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আদিত্যর সে কী ব্যস্ততা—চাকরটা যেন তার চাকর নয়! নিয়ে আসবার সময় সে আবার ঠিক সময় স্কুলে পৌছোয় কিনা কে বলবে? হয়তো একদিন সে আর ভুল করে গেলোই না ধরো, আদিত্য এদিকে-ওদিকে অনেকক্ষণ ঘুর-ঘুর করলে, তার ভীষণ খিদে পেয়েছে, তবুও চাকরের দেখা নেই, তারপর আদিত্য নিজেই হয়তো বাড়ির মুখে পা বাড়ালো। একাই হয়তো তাকে ট্র্যামের রাস্তা পার হতে হবে—বালিগঞ্জের ট্র্যাম ঘন-ঘন আসে না, এই যা ভরসা। শ্রীপর্ণা নিজের মনে নিজেই হেসে উঠলো: আদিত্যের জন্যে যতো ভাবনা। বাড়িতে তার ঠাকুমা, তার 'থা' আছে না? ইচ্ছে হলে তিনিই উঠিয়ে দেবেন সেই দায়িত্বহীন চাকর। কিংবা কে জানে, হয়তো এরি মধ্যেই আদিত্য খুব চালাক হয়ে উঠেছে: রাস্তা পেরোনো কী, দিব্যি সে ট্র্যামের ফুট-বোর্ডে চড়ে বিনা-টিকিটে খানিকটা এগিয়ে আসে বাড়ির দিকে, ইনস্পেক্টরকে দেখতে পেলেই দুষ্টু মুখে হাসতে-হাসতে তাড়াতাড়ি সে নেমে পড়ে, নিখুঁত পায়ে পিছন দিকে আধখানা হেলান দিয়ে। সমস্ত ছবিটি শ্রীপর্ণা যেন তার চোখের সামনে দেখতে পায় স্পষ্ট—কী ভালোই যে তার লাগে এই রকম ছবি আঁকতে! উজ্জ্বল ছবি থেকে আবার সে বিষণ্ণ ছবিতে চলে আসে—তার মনের সঙ্গে ঝাপসা, বিষণ্ণ ছবিগুলিই বেশি খাপ খায়—অশ্রুজলে তুলি বুলানো: বিষণ্ণ ছবিগুলিই জলছবির মতো তার মনের পৃষ্ঠায় অনেকক্ষণ বসে থাকে। কে তার জামা-কাপড়গুলি গুছিয়ে রাখে—হয়তো একধার থেকে সবগুলি ফর্সা কোট-প্যাণ্টই সে পরে ময়লা করে ফেলবে; কে-বা তার নতুন বইগুলিতে মলাট দিয়ে দেয়—হয়তো হাতের ঘাম লেগে-লেগে দু'দিনেই তাদের পৃষ্ঠাগুলি আলগা হয়ে এসেছে। কে-বা দেখে কতোটুকু তার পড়া, কে-বা তৈরি করিয়ে দেবে সময় নষ্ট করে। হয়তো ঠাকুরমার আঁচল ধরে টিফিনের পয়সার জন্যে মিন্‌মিনে গলায় বায়না ধরেছে—ঠাকুরমার দু'হাতে দু'শো কাজ—কোনোদিন বা দুটো পয়সা দেন, কোনোদিন বা দেন না। ছোট্ট পকেটটিতে সে-দু'টি পয়সা ফেলে আদিত্যের সে কী ফুর্তি: কিনবে হয়তো কাঠি-বরফ বা আলু-কাব্‌লি, কিংবা খুব যদি খিদে না পায়, তবে পয়সা দু'টি সে জমিয়ে রাখবে। এমনি করে হয়তো ঠাকুরমার বাক্সেই তার অনেক পয়সা জমেছে। আরো কিছু জমলে সে তা দিয়ে বিদেশ যাবে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে না জানি সে কি খায়,—জেঠিমাদের

কেউ থাকলে অবিশ্যি কোনো কথা নেই, না থাকলে বুড়ো ঠাকুরমাই বা উঠে তখন তাকে কী তৈরি করে দেবে—হয়তো টোপের নীচে সকাল-বেলাকার ভাত বাড়া থাকে, কড়কড়ে, ঠাণ্ডা ভাত : হাত-পা ধুলো কি না-ধুলো, তাই সে বসলো গিলতে, বড়ো-বড়ো হাঁ করে ফেলে-ছড়িয়ে তার সেই ক্ষুধার্ত খাওয়াটি পর্যন্ত শ্রীপর্ণা দেখতে পাচ্ছে। তারপর আঁচিয়ে শার্ট দিয়ে ভিজে মুখ মুছতে-মুছতেই তার দৌড়—সামনের ছোট কম্পাউণ্ডে, কিংবা হয়তো দূরে কোনো পার্কে : খেলা তাকে ডাকছে। হয়তো রবারের একটা বল, হয়তো বা শূন্য হাতে এমনি সব নাম-না-জানা ছেলেমানসি খেলা। কাদের সঙ্গে সে মেশে কে তার খবর রাখে, হয়তো কোনোদিন কার সঙ্গে মারামারি করেই ফিরলো, কপালটা ফুলো, চোখের নীচেটা কেটে গেছে। আহত মুখে তার সেই দুষ্টু হাসিটি কী সুন্দর! সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়িতে এসে সে বই নিয়ে একটু বসলো কি না-বসলো, ঠাকুরের ডাকে কোনো রকমে খাওয়া সেরে নিলো ঘুমুতে-ঘুমুতে, কোথায়, কোন ঘরে সে আজকাল শোয়, হয়তো ছোট তক্ত-পোষের উপর তার জন্যে এখন আলাদা বিছানা—জামাটা গায়ের থেকে এক টানে খুলে নিয়েই তার ঘুম, ঠাণ্ডা, দীর্ঘ ঘুম। হয়তো ছোট-বৌয়ের কথা তার একটুও মনে নেই, একবারো মনে পড়ে না। সেই ট্রাইসিকেলটা হয়তো ভাঙা অবস্থায় বারান্দার এক কোণে পড়ে আছে। সেটায় আর চড়বে কী, সে এখন বড়ো হয়ে উঠছে না, ইস্কুলে পড়ছে না? সেটায় চড়লে হাঁটু দুটো তার চোখা হয়ে কানের কাছে উঠে আসে।

দুপুরগুলি শ্রীপর্ণা আর একা থাকে না, চারিদিকের সাদা, শূন্য দেয়ালে এমনি করে সে দিবাস্বপ্ন দেখে।

তাই বলে, আমি সুখী নই, এ-কথা জানায় শ্রীপর্ণার সাধ্য কী! আমি সুখী নই, এ-কথা বুঝতে দেয়াই তো আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে! আমি সুখী, ছলে-বলে পরকে সেটা জানানোই তো হচ্ছে সভ্যতা। শ্রীপর্ণাও তাই তার সুখ বিকীর্ণ করে চলেছে সংসারে, পলতেয় আগুন না ধরে মোমে ধরলে মোম-বাতিটা যেমন বাতাসে ফর্‌ফর্‌ করে, তেমনি। এতো ঐশ্বর্য, এতো উপকরণের মাঝেও যদি সে সুখী না হয়, তবে শোকঘন শ্মশানে বসে অনায়াসে তরল আনন্দোৎসবও করা যায়। সুখী না হয়ে তার উপায় কোথায়! তবু, তাই, এখনো শ্রীপর্ণা হাসছে, জোরে, শব্দ করে, এখনো শরীরে আনছে ঢেউ, লীলার

পিচ্ছিলতা, পরছে দামী দামী শাড়ি, জমকালো গয়না—শাড়িমাত্রেই তার দামী, গয়নামাত্রেই তার জমকালো—ভরিয়ে তুলছে উপর-নীচের সমস্ত জায়গা তার অবসরের শূন্যতা দিয়ে ; মোটরে বেড়াচ্ছে, যাচ্ছে পার্টিতে, সোসাইটির শিখছে সকল ছলা-কলা।' দিনের বেলা সূর্যমুখী থেকে রাতের বেলা ফুটে উঠছে সে বিলোল রজনীগন্ধা।

ভালোই আছে সে, তার সমৃদ্ধির স্পর্ধিত উচ্ছলতায়। যখন যা সে চায় তাই করতে পারে, যখন যা তার ভালো লাগবে মনে হয় : আধুনিক সভ্যতায় ভালো-লাগাটাও তো একটা পণ্যদ্রব্য, টাকা থাকলে অনায়াসেই তা কিনে আনা যায়। যখন যা তার ভালো লাগে, এক মুহূর্তের পরে আরেক মুহূর্ত। সংসারে যার টাকা আছে অফুরন্ত, তার আবার দুঃখ কী, দুঃখ করবার তার সময় কোথায়? দুঃখ করলেই তো সে দরিদ্র হয়ে গেলো : দুঃখের পরিপূরকই হচ্ছে টাকা। টাকা দিয়ে আমরা অমরত্ব পর্যন্ত কিনে নিতে পারি। না, শ্রীপর্ণার দুঃখ কোথায়? কী তার চাই বলো, এখুনি সে তা পাচ্ছে, চাবি ঘুরিয়ে দেরাজটা তার একবার টানলেই হলো। এমন গভীর প্রাণতপ্ত প্রেম, বুদ্ধি-প্রেরিত সবল সহানুভূতি, নির্বাক স্বাধীনতা—তার আর কী চাই, শ্রীপর্ণা নাম করুক, এখুনি টাকা ফেলে সে তা সংগ্রহ করে আনতে পারবে। এর পর তার আর কী চাই—শরীরময় এই সুখোচ্ছ্বাস, জীবনময় এই সমর্পণের তৃপ্তি, মৃত্যুময় এই অতল পরিপূর্ণতা। এর পরে মানুষে আর কী চাইতে পারে, চাইলেই যখন সে তা পায়!

তবু যতোই শ্রীপর্ণা সুখের শিখা জ্বালতে লাগলো তার চারপাশে, তাকে দেখালো ঠিক যেন কোনো সমাধিস্তূপের উপর পোঁচের পর পোঁচ চূণকাম করা হচ্ছে। যতোই সে হাসে, একবারো তার হাসি সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয় না, সে-হাসির তলায় কোথায় একটি ছায়া করে ঝিকিমিকি। যতোই সে সাজুক, তার কঙ্কালটা সে ঢেকে ফেলতে পারছে না, যতোই সে বেড়াক, কোনোটাই যেন তার যাবার জায়গা নয়। তবু তাকে সাজতে হবে, বেড়াতে হবে মোটরে করে, নিরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তারো অনেক নেমন্তন্ন। দেখাতে হবে তার সৌভাগ্যের পেখম বিস্তার করে, আকাশে মেঘ করুক বা না-করুক। সভ্য হবার এতো বোঝা!

নিরঞ্জনেরো চোখ এড়ায় নি শ্রীপর্ণা কেমন দিনে দিনে বোতলে বাঁচিয়ে রাখা ফুলের বৃন্তের মতো শুকিয়ে আসছে। কিন্তু এ নিয়ে সে আর কী বাড়াবাড়ি

করতে পারে—বিয়ের পর এক বছর পুরতে চললো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের সেই কলেজ-পালানো যুবকের মতো সে তো আর আপিস কামাই করে দুপুরবেলা এসে স্ত্রীর সঙ্গে সোহাগ করতে পারে না,—শ্রীপর্ণার রুচিও তেমন স্যাঁতসেঁতে নয়। যদি শরীর খারাপ মনে করে থাকে, এখুনি নিরঞ্জন ডাক্তার নিয়ে আসতে পারে গণ্ডায়-গণ্ডায়, নার্স রেখে দিতে পারে ঝুড়ি-ঝুড়ি। এখানে যদি তার ভালো না লাগে, এই তো সেদিন দার্জিলিঙ ঘুরে এলো, বেশ তো, দিন কয়েক পরে নিরঞ্জন ভিজিয়ানাগ্রাম যাচ্ছে, তাকে নিয়ে যাবে না-হয় সঙ্গে করে। এমনি একলাই যদি বা সে যেতে চায়, নিরঞ্জনের তাতেও আপত্তি নেই, বলুক না, এখুনি গিয়ে সে বার্থ রিজার্ভ করে আসছে, সঙ্গে না-হয় আরো একটি সহযাত্রিণীর। সেদিক দিয়ে শ্রীপর্ণা আবার ভীষণ ভীরু, ভীষণ পতিপ্রাণা—নিরঞ্জনকে ছেড়ে সে কোথায় যাবে? সমস্তদিন পরে নিরঞ্জন সেই যে সন্ধ্যায় নির্ভুল বাড়ি ফিরে আসে, সেই তো তার আশ্রয়। তবেই তো বুঝতে পারো, নিরঞ্জন মুচকে হেসে বলে, দিনের বেলার এই বিচ্ছেদটা কতো অপরূপ!

তার পিঠের দিকে গোপনে একটি নারী চুপ করে বসে আছে তার ফেরবার প্রতীক্ষায়, এই চেতনাটিই তার কর্মে দেয় প্রেরণা; নইলে সে পারতোও না এতো কাজ করতে, বলতে কি, শ্রীপর্ণার জন্যেই তো তার এতো কাজ, এতো দীপ্তি! কথা শুনে একটু বা হেসে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যেতো শ্রীপর্ণা—যেন এই কথাই সে এতো চুপ করে থেকে নিরঞ্জনকে বোঝাতে চেয়েছিলো!

একদিন শ্রীপর্ণা আর পারলো না, এতোতেও ঢাকতে পারলো না তার লজ্জা! ঘা-টা মর্মমূলে আর লুকিয়ে না রেখে কেটে-চিরে চোখের সামনে তুলে ধরাই ভালো। তাই, একরাতে, নিরঞ্জন শোবার আগে ইজিচেয়ারে বসে একটা বই পড়ছে, শ্রীপর্ণা সাহস করে একটা চেয়ার নিয়ে তার দিকে এগিয়ে বসলো। আবহাওয়াটা ঠিক অনুরূপ কিনা, কী রকম করে কথাটা পাড়লে ঠিক ভালো শোনাবে, কিছু বিচার করে দেখবারই তার সময় হলো না। স্পষ্ট, সরাসরি বললে:

—তোমাকে একটা কথা বলি।

নিরঞ্জন উৎসাহিত হয়ে উঠলো; কোলের উপর বইটা মুড়ে রেখে বললে, —বলো। কিছু চাই?

শ্রীপর্ণা খুকির মতো ঘাড় হেলিয়ে বললে,—হ্যাঁ।

—বলো। নিরঞ্জন ব্যস্ত হয়ে চারদিক চাইতে লাগলো : এক্ষুনি, এক্ষুনি গিয়ে কী তা নিয়ে আসতে পারবো? বেশ তো, বলো, কাল, কাল সক্কালেই তা চলে আসবে। আগে শুনি।

শ্রীপর্ণা আস্তে বললে,—না, তেমন কিছু নয়।

—তবে? আমার সঙ্গে ভিজিয়ানাগ্রাম যেতে চাও? নিশ্চয়, একশোবার। সেখান থেকে আমরা আরো দক্ষিণে ঘুরে আসবো।

—না, তা-ও নয়।

—তা-ও নয়? নিরঞ্জন হেসে উঠলো : বলেই ফেল না ছাই। কোনোদিন কিছু চাও না, আজ একটু চাইতে এসেছ, তা-ও তোমার মুখ ফুটছে না। বলো না, আমি একবার দেখতুম তা তোমাকে এনে দিতে পারি কিনা।

অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে নিচু গলায় শ্রীপর্ণা বললে,—আমার আদিত্যকে একবারটি ভারি দেখে আসতে ইচ্ছে করছে।

—কাকে?

শব্দটা এবার স্পষ্টতরো হলো : আদিত্যকে।

নিরঞ্জনকে কে যেন একটা ধাক্কা মারলে। এতোদিন কোনো কথাই যেন তার কিছু মনে ছিলো না। আফ্রোদিতের মতোই যেন শ্রীপর্ণা তার জীবনের সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিলো, নিষ্কলঙ্ক, নিরবগুণ্ঠ। দ্রুত অগ্রগমনের ছটায় মুছে ফেলে দিয়েছিলো সে অতীতের সমস্ত বিশীর্ণতা, চলতে-চলতে এখন সে যেন একটা হোঁচট খেলো। শ্রীপর্ণার যে একটা অতীত আছে, সে যে তার পক্ষে সশরীর সম্পূর্ণ নয়, যেমন সূর্যের কাছে উন্মোচিত ফুল ছিল সম্পূর্ণ, এই চেতনাটা তাকে যেন একটা বেদনার মতো বিদ্ধ করলে। চেয়ারে আস্তে-আস্তে পিঠটা নামিয়ে নিয়ে এসে নিরঞ্জন নির্লিপ্ত গলায় বললে,—ওকে এখানে নিয়ে আসতে চাও নাকি?

—না, না, শ্রীপর্ণা ম্লান মুখে বললে,—একবারটি শুধু দেখে আসবো।

—কেন, নিয়ে আসতেই তো পারো অনায়াসে। তোমারই তো ছেলে।

শ্রীপর্ণা নীরবে একটু হাসলো; বললে, তারা তাকে দেবে কেন আমার হাতে? আমি তো তাদের চোখে ভীষণ অপরাধী, আমার সন্তানের ওপরেও আমার আর কোনো অধিকার নেই।

নিরঞ্জন বইটা ফের মেলে ধরলো ; নিষ্প্রাণ গলায় বললে,—মামলা করলেই দেখা যায় কার অধিকার।

—না, না, ওকে আমি নিয়ে আসতে চাই না, সেখানেই ও খুব ভাল আছে, শ্রীপর্ণার গলাটা একবার কেঁপে উঠলো : আমি শুধু একটুখানি ওকে দেখে আসবো। তুমি যদি বলো—

—বা, যেতে চাও, যাবে বৈ কি। নিরঞ্জন শ্রীপর্ণার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললো : কিন্তু কোথায় যাবে ?

—কেন, বালিগঞ্জে ওদের বাড়িতে।

—কিন্তু তোমাকে যদি ওরা অপমান করে ?

শ্রীপর্ণা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো, গভীর করে কী জানি ভাবলে ; পরে মুখ তুলে বললে,—করবে না। আর যদি কটু কথা কেউ কিছু বলেও, আমি গায়ে মাখবো না। আদিত্যকে দেখতে পেলেই আমি খুশি।

—না, কটু কথা বললে গায়ে মাখবে বৈ কি। নিরঞ্জন দৃঢ় কণ্ঠে বললে, তোমাকে অপমান করে তাদের সাধ্য কী! কবে তুমি যেতে চাও ?

—কাল। কাল শনিবার, কালকেই।

—কখন ?

—ধরো এই তিনটে সাড়ে-তিনটের সময়।

—ও-রকম একটা বেয়াড়া টাইম কেন ? নিরঞ্জন ভুরু কুঁচকোলো।

—কাল শনিবার, ওর হাফ-হলিডে, আড়াইটের মধ্যে ও বাড়ি ফিরেছে আন্দাজ করছি। শ্রীপর্ণা হাসবার চেষ্টা করলো : তা ছাড়া সেই সময়টায় বাড়ির কর্তা-কর্ত্রীরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে আশা করি। শুধু ও-ই হয়তো আছে জেগে, আমি চুপি-চুপি গিয়ে তখন দেখে আসতে পারবো।

—বেশ, নিরঞ্জন সোজা হয়ে বসলো : তুমি তৈরি হয়ে থেকো, আমি সে-সময় গাড়ি নিয়ে আসবো ঠিক।

শ্রীপর্ণার মুখ গেলো চুপসে। ভয় পেয়ে বললে,—তুমি যাবে নাকি ?

—হ্যাঁ, আমি রাস্তায় মোটরে বসে থাকবো।

শ্রীপর্ণা যেন এতোটুকু হয়ে গেলো : তুমি যাবে কী করতে ?

নিরঞ্জন ফের বইয়ের মধ্যে চোখ ডোবালো ; গম্ভীর গলায় বললে,—তাদের জানাতে যে তাদের বাড়িতে যিনি যাচ্ছেন তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা,

তাকে কারুর নিন্দা বা অপমান করবার অধিকার নেই। সে সইলেও আর একজন রাস্তায় বসে আছে যে কখনও সইবে না।

শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো—না-হেসে উঠে তার উপায় ছিলো না ; বললে,—বা রে, অপমান করবে কেন ? তুমি কেন মিছিমিছি যাবে কষ্ট করে ? তোমার আপিস কামাই হবে না ? আমি একাই যেতে পারবো।

নিরঞ্জন বুঝতে পারলো শ্রীপর্ণা তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছে না। অন্তত সেখানে, সে-বাড়িতে, তার পক্ষে নিরঞ্জনের যেন কোন অস্তিত্ব নেই। 'আমি একাই যেতে পারবো'—কথাটাতে শ্রীপর্ণা যেন একটা নিষ্ঠুর সমাপ্তি টানলে। নিরঞ্জন আবার মিইয়ে গেলো আস্তে-আস্তে। বললে :

—কিসে তুমি যাবে ?

—কেন, ট্র্যামে। এখান থেকে সোজা বাস্-এও তো যাওয়া যায়।

—বাস্-এ ?

—হ্যাঁ, মন্দ কী ! শ্রীপর্ণা অল্প একটু হাসলো : চড়লুমই না-হয় একদিন। বাস্-ট্র্যামে সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলারাও তো চড়েন আজকাল।

—চড়ুক। স্যোফারকে বলে রেখো সে তোমাকে পৌঁছে দেবে। এতোটা যেন নিরঞ্জনের সহ্য হচ্ছিলো না, সে মনোযোগ সহকারে বই পড়তে-পড়তে বললে,—আমি না-হয় ছোট গাড়িটা নিয়েই আপিসে বেরুবো।

তারপর দু'জনের মাঝে আর কোনো কথা হলো না। রাত যখন এলো, তখনো নয়।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই শ্রীপর্ণা আপিসের কর্মচারী যুগলকিশোরকে বাড়ির মধ্যে ডাকিয়ে আনলো। নিরঞ্জন চায়ের টেবিলে বসে খবরের কাগজ পড়ছে, নীচে যুগলকিশোরের হাতে দশটাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে বললে,—আমার জন্যে ছোট দেখে একটা ফুটবল কিনে নিয়ে আসুন তো।

যুগল একেবারে আকাশ থেকে পড়লো : ফুটবল ?

—হ্যাঁ, এনে লুকিয়ে আমার হাতে দেবেন। কেউ যেন দেখতে না পায়।

যুগলের যেন তখনো ধাঁধা লাগছে ; বললে,—ফুটবল দিয়ে কী হবে ?

—যাই হোক্ আপনাকে যখন বলছি নিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি।

যুগল থতিয়ে জিগ্‌গেস করলে : কয় নম্বর ?

—নম্বর, নম্বর আবার কিসের? এই সাত-আট বছরের ছেলে যাতে খেলতে পারে। নিয়ে আসুন গে ঝট্‌পট্‌। আমি একটি ছেলের জন্মদিনে এটা প্রেজেণ্ট দেবো।

সমস্তটা সকাল নিরঞ্জনের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো কথা হলো না। যন্ত্রচালিতের মতো সংসার চললো এগিয়ে। শুধু আপিসে বেরুবার আগে পেগ থেকে টুপিটা তুলে নেবার সময় নিরঞ্জন অন্য দিকে তাকিয়ে বললে,—তুমি তা হলে আজই যাবে ঠিক করলে?

চোখে লজ্জার একটু নরম আভা ফুটিয়ে শ্রীপর্ণা বললে,—হ্যাঁ, তাই তো কথা হলো।

—ঠিক ঐ সময়টায়?

—হ্যাঁ, তাই তো সুবিধে। নিরঞ্জন যে কী চাচ্ছে শ্রীপর্ণা সাতপাঁচ কিছু বুঝতে পারলো না।

—বাস্‌-এ যেতে হলে ক'টার সময় বেরুবে?

—এই এক সময় গেলেই হলো। শ্রীপর্ণা হাসলো: তোমার আসবার আগেই ফিরবো। যেতে-আর-আসতে যতোটুকু লাগে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিরঞ্জন বললে—যেতে পারবে তো একলা? চাকরটাকে না-হয় সঙ্গে নিয়ো।

শ্রীপর্ণা এবার শব্দ করে হেসে উঠলো, শরীরে ফোটাতে হলো-বা ক'টি বাঁকাচোরা তরল লাবণ্যের রেখা: আমার জন্যে কিছুই তোমার ভাবতে হবে না। তুমি আপিসে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কাজ করে যেয়ো।

কিন্তু আপিসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে কাজ করবার আজ দিন নয়। কাগজের উপর কলমের প্রত্যেকটি আঁচড়ে নিরঞ্জন তার অবচেতন মনে ছটফট করতে লাগলো। ঘন-ঘন তাকাতে লাগলো ঘড়ির দিকে। শ্রীপর্ণা যে একা যাবে, তাকে মুছে ফেলে, তাকে অস্বীকার করে, এ যেন তার কিছুতেই সহ্য হচ্ছিলো না। কেন থাকবে তার এই অবনমিত অপরাধীর ভঙ্গি? সমাজে-সংসারে কিছুই যে সে অন্যায় করে নি, বরং দুর্বার দুঃসাহসে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার সত্য, উলঙ্গ তীব্র আলোয় তা সূর্যের মতো উদ্ঘাটিত করে দিতে হবে। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে হবে সে কতো সুখী, কতো সাহসী, কতো সে সত্য-পরায়ণ। সে সেখানে তেমনি ভিক্ষুকের মিনতিতে যাবে কেন? যাবে তার

অধিকারের দম্ভে, তার আভিজাত্যের গরিমায়। অপমান—অপমানের শ্রীপর্ণা বোঝে কী? সংসারে সে আর-কারুর কেউ নয়, সে নিরঞ্জন গুপ্তের স্ত্রী—অপমান তো লাগবে এখানে নিরঞ্জন গুপ্তকে, তার সামাজিক অবস্থাকে, এমন কি তার ফার্মকে। না, এতো সব যখন জড়াচ্ছে এর মধ্যে, নিরঞ্জন প্রেমিকের মতো আর এখানে অভিমান করে থাকবে না, সে শ্রীপর্ণাকে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। নিয়ে যাবে তার মোটরে, রাজপথের পাশে যেখানে তাদের বাড়ি আছে দাঁড়িয়ে, তার সামনে এসে থামবে শব্দ করে, হর্ন বাজাবে, শ্রীপর্ণা মহীয়সীর মতো গর্বিত ভঙ্গিতে চলে যাবে ভিতরে, সে থাকবে নীচে, বৈঠকখানায়—দেখি কে তাকে কী কঠিন কথা বলতে সাহস পায়! ভিক্ষুকের মতো শ্রীপর্ণাকে সে সেখানে পাঠাতে পারবে না। তাতে নিরঞ্জনেরই সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে।

আড়াইটে বাজতেই নিরঞ্জন আপিস থেকে বেরিয়ে পড়লো।

নীচেটা ফাঁকা, থম্‌থম্ করছে। টোকা দিতে চাকর দরজা খুলে দিলো। দুপুরের এই অদ্ভুত নিঃশব্দতার সঙ্গে নিরঞ্জনের কোনোদিন পরিচয় ছিলো না। আস্তে-আস্তে সে উঠতে লাগলো।

গায়ের উপর শ্রীপর্ণার তখন শুধু চাদরটা গুছিয়ে নিতে বাকি, বুকে-পিঠে সেটাকে ভাঁজে-ভাঁজে দু'হাতে ছড়িয়ে রাখতে-রাখতে ঘর থেকে বারান্দায় সবে সে বেরিয়ে এসেছে, দু'জনের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো।

নিমেষে নিরঞ্জন যেন আপাদমস্তক পাথর হয়ে গেলো, আর শ্রীপর্ণা যেন ত্রিভুবনে কোথাও পালাবার পথ পেলো না।

শ্রীপর্ণা আর এখন রাজরাণীবেশে সমারূঢ় নয়, খুলে ফেলেছে তার রঙিন শাড়ি, পরেছে প্রায় সাদা একটা থান, প্রান্তে সূক্ষ্ম একটা কালো নরুন-পাড়; গায়ে নেই আর তার সেই আভরণের আড়ম্বর, দু'হাতে দু'গাছি শুধু রুলি: চুল-গুলি এলোমেলো রুক্ষতায় পড়েছে ভেঙে, নেই সেই খোঁপার উচ্ছলতা: কপালে নেই এক ফোঁটা সিঁদুর, এই দুপুরবেলার মতোই শূন্যতায় যেন খাঁ-খাঁ করছে। যেন শ্রীপর্ণা নয়, শ্রীপর্ণার শুভ্রীভূত একটা কঙ্কাল। গায়ে যেই চাদরটা জড়াতে-জড়াতে সে এখন থেমে পড়েছে সেটাও যেন শূন্য, শূন্যের মতো সাদা। পায়ে শুধু সামান্য একটা চটি—যেটা দেখলেই মনে হয়, চৌকাঠের গোড়ায় ছেড়ে রেখে সে খালি পায়ে ঘরে ঢুকবে।

পাষাণ যেন কথা কইলো : এ কী ! এ তোমার কী পোশাক !

শ্রীপর্ণা কোনো কথা বললে না, চোখ নামিয়ে রইলো।

নিরঞ্জন রূঢ় গলায় বললে,—তোমার এ-রকম সাজ করবার কী অর্থ কিছু জানতে পারি ?

শ্রীপর্ণা তেমনি সাদা-হয়ে-আসা, নীরক্ত গলায় বললে,—নইলে, এ-ভাবে সাজ করে না গেলে, আদিত্য আমাকে চিনতে পারবে না।

নিরঞ্জন স্তব্ধ হয়ে যাবার আগে নিশ্বাসে একটা শব্দ করলে : হুঁ !

—সে যখন আমাকে দেখেছিলো, নিরঞ্জন যখন তাকে দেখেই ফেলেছে তখন সে আর পিছু হটবে না, স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন গলায় বললে,—তখন আমার সাজসজ্জা এমনিই নিরীহ ছিলো। তোমার ভয় নেই, বাড়ি ফিরে এসেই আমি এই খোলসটা খুলে ফেলবো—শুধু এই কয়েকটা ঘণ্টা। এক দিন।

নিরঞ্জন কোনো কথা না বলে তার পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলো, হঠাৎ থেমে পড়ে কুটিল চোখে জিগ্‌গেস করলে : হাতে তোমার ওটা কী ? কিসের প্যাকেট ?

শ্রীপর্ণা দমলো না। বললে,—আদিত্যের জন্যে ফুটবল কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

—ফুটবল ? নিরঞ্জন তীক্ষ্ণ একটা ব্যঙ্গের হাসি হাসলো : এই ক্রিকেটের সময়ে ফুটবল ? আমাকে বললেই পারতে আমি ভালো দেখে দামী এক-সেট ব্যাডমিণ্টন কিনে এনে দিতাম। আর কিছু না পেয়ে ছেলেকে শেষকালে একটা রদ্দি ফুটবল কিনে দিতে গেলে ? বুদ্ধিমান হলে সে যে ওটাতে এখন লাথিও মারবে না। নিরঞ্জন হঠাৎ গলা ছেড়ে বীভৎস হেসে উঠলো।

সেই হাসিতে শ্রীপর্ণার সমস্ত গা দগ্ধ হয়ে গেলো। প্রখর গলায় সে বললে—তা বেশ করবো, যা খুশি দেবো। তুমি—তুমি কেন এর মধ্যে মাথা গলাতে আসছ ? তুমি কেন এখন আপিস থেকে ফিরে এলে ?

—আপিস ? নিরঞ্জন আবার হো-হো করে হেসে উঠলো। শোবার ঘরের দিকে এগোতে-এগোতে বললে—আমারই তো আপিস, ইচ্ছে করলে যে-কোনোদিনই সেটা আমি উঠিয়ে দিতে পারি। কী হবে আমার আপিস করে ?

নয়

শ্রীপর্ণা আর ফিরেও চাইলো না, ধাপে-ধাপে পা ফেলে-ফেলে সোজা সে নেমে গেলো নীচে। বাইরে থেকে সদরটা টেনে দিয়ে চাকরকে খিল দিতে বলে সে রাস্তা নিলো। গায়ের কাপড়টা টেনে দিলো একটু পুরু করে!

এতোদিন বাড়ির মধ্যে, শালীন সব সোসাইটিতে সে যেন কেমন আড়ষ্ট ছিলো, কৃত্রিমতায় কেমন বিধিবদ্ধ; এখন রাস্তায় নেমে, সমস্ত শরীরে সে একটি অনির্বচনীয় লঘুতা বোধ করলে। পায়ের নীচে পথটা যেন বাঁশির সুরের মতো কাঁপছে। গায়ে যেন তার নির্মলতার নতুন একটি গন্ধ মাখানো।

খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে শ্রীপর্ণা মোড় থেকে একটা বাস্ ধরলো। কোথায় গিয়ে যে নামতে হবে শ্রীপর্ণার তা মুখস্ত।

আজ আদিত্যর জন্মদিন—কোনো বারেই শ্রীপর্ণা এ-দিনটা তার কাজের তালিকায় ফাঁকা পায় নি। এবার, সহসা এই স্বাধীনতার শিখরে উঠে এসে, এই দিনটির দিকে চোখ ভরে তাকাবার জন্যে তার অদম্য পিপাসা হলো: আজ তার এই স্বাধীনতাই যেন ব্যবধানের পথটা আগের চেয়ে অনেকখানি ছোট করে এনেছে। আজকে, এমনি এক দিনে, বাস্-এর জানলায় টুকরো-টুকরো পথ দেখতে দেখতে শ্রীপর্ণার মনে হলো তার আত্মার গূঢ়, তপ্ত, প্রবল অন্ধকার থেকে আদিত্য ফুটে উঠেছিলো আনন্দার্ত দুঃসহ একটা বেদনার মতো, মাটির অন্ধকার থেকে অঙ্কুর যেমন ফোটে। সে আজ কতোদিন হয়ে গেছে, তবু শ্রীপর্ণা যেন তার শরীরে স্মৃতির সেই একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাচ্ছে, যন্ত্রণার মতো সেই সুর, যন্ত্রণার থেকে সেই সুরের জন্ম! কোথায় না-জানি সে যাচ্ছে! সেখান থেকে আবার কোথায় না-জানি সে ফিরে আসবে! শ্রীপর্ণা মনে-মনে কেবলই প্রার্থনা করতে লাগলো, পথটা আরো দীর্ঘ হোক, পথ দীর্ঘতরো হলেই সে আরো কতোক্ষণ আশা করতে পারবে।

ক্রমশই বালিগঞ্জের চেহারা বদলাচ্ছে। বেরোচ্ছে নানারকম রাস্তা, উঠছে নানা ধাঁচের বাড়ি। গভর্নমেন্টের পেন্‌সন্-ভোগীরা সব একজোট হয়ে বানপ্রস্থ

নিয়েছে এ-অঞ্চলে। অন্য রাস্তা দিয়ে এগোতে হচ্ছে বলে বাড়িটা খুঁজে পেতে শ্রীপর্ণার কিছু দেরি হলো। নিঝুম পাড়া, রাস্তায় সামান্য একটা ফিরিওলা পর্যন্ত দেখা গেলো না। ফটকের বাইরে শ্রীপর্ণা খানিকক্ষণ ইতস্তত করলে। কোনো ছুতোয়, কে জানে কোন ছেলেমানসি ছুতোয়, আদিত্য যদি এখন একবার বাইরে বেরিয়ে আসে, তবে সে আর গায়ে পড়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকে না! এখান থেকেই তাকে একটু দেখে, ডাকলে যদি কাছে আসে, তবে দুটো কথা কয়, জিগ্‌গেস করে: তার কথা তার মনে আছে কিনা! আর যদি সে বেশি উৎসাহ না দেখায়, উপহারটা তার হাতে দিয়ে তক্ষুনি, তাড়াতাড়ি সে সরে পড়ে। এখন আবার এই নিরীহ পোশাকটা যেন তার গায়ে নিরঞ্জনের সেই তিক্ত দৃষ্টির মতো জ্বালা করছে। শ্রীপর্ণা আরো খানিকক্ষণ দাঁড়ালো, কিন্তু আদিত্যের আবির্ভাবের বিন্দুমাত্র সূচনা দেখা গেলো না। এখন হঠাৎ যদি আকাশ দিয়ে একটা এরোপ্লেন উড়ে যায়! যদি কাটা একটা ঘুড়ি এই কম্পাউণ্ডের উপর এসে পড়ে! কিংবা ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে যদি কেউ এখন একটা ভালুক নাচাতে বসে!

ফটকের দরজার ছিটকিনিটা খুলে শ্রীপর্ণা কম্পাউণ্ডে ঢুকলো। আস্তে-আস্তে উঠে এলো বাড়ির রোয়াকে। এবং একবার চৌকাঠ যখন ডিঙিয়েছে, তখন কে আর তাকে আদিত্যর দেখা পাবার আগে তাড়িয়ে দিতে পারে?

ফরাস-পাতা, নিচু জোড়া-তক্তপোষে তেমনি সেই বৈঠকখানা, রবিবর্মার পুরোনো সেই ছবিগুলি তেমনি দেয়ালে আজো ঝুলছে, দরজার উপরে উঁচু তাকের থেকে সিন্দুরচর্চিত চীনেমাটির সেই গনেশঠাকুরটি আজো ভ্রষ্ট হয় নি। নীচে, এ-ঘরে ও-ঘরে কোথাও একটি নিশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া গেলো না। এমন সময় চুপিচুপি ছিঁচকে একটা চোর ঢুকে পড়লে অনায়াসে বেশ কিছু সরিয়ে নিতে পারে—তারে ঝুলছে যা শুকনো শাড়ি-কাপড়, ঘরে-বারান্দায় ছড়িয়ে আছে যা বাসন-কোসনের ছিটে। এক পাশে বাথরুমের দরজাটা খোলা, কলটা কে তখন ভালো করে আটকে যায় নি, নালে জল বয়ে যাচ্ছে খামোকা। বাথরুমে ঢুকে শ্রীপর্ণা কলটা বন্ধ করে দিলো।

ভীষণ নীরবতা: বাড়িটা যেন ইঁটে-লোহায় শ্বাসরোধ করে আছে। তার চেয়ে জলের শব্দটাও যেন ভালো ছিলো।

সিঁড়ি বেয়ে শ্রীপর্ণা উপরে উঠতে লাগলো। হঠাৎ তার কানে একসঙ্গে কতোগুলি শিশুর ভিন্নগ্রামের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। বুকটা উঠলো ধ্বক্ করে, কিন্তু কোনটা যে আদিত্যর গলা স্পষ্ট বোঝা গেলো না।

লাল রঙের সিমেন্ট-করা চওড়া একটি বারান্দার দু'পাশ দিয়ে ঘরগুলি সাজানো, উত্তরে ও পুবে, দক্ষিণে রাখা হয়েছে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, পাড়াগাঁয়ের গেরস্থালির মতো সেখানে ছোট তৃণহীন একটি উঠোন, একপাশে ফুলের বাগান, শাক-সব্জির ক্ষেত। উপরের সেই দক্ষিণ-খোলা দালানে সিঁড়ির দিকে পিছন করে ছোট একটি তক্তপোষের উপর তাকিয়ায় উবু হয়ে শুয়ে প্রিয়বাবু স্কুলের ছেলেদের জন্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখছেন। নামের পিছনে তার পেন্‌সনি খেতাব জুড়ে দিলে বইটা যে তাঁর অনায়াসেই পাঠ্য বলে নির্বাচিত হবে এ-বিষয়ে তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিলো। আঙুলের ফাঁকে কলম ধরার কায়দায় সেই দৃঢ়তা তাঁর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

কার উপস্থিতিতে বাতাসটা হঠাৎ ভারি হয়ে উঠলো টের পেয়ে প্রিয়বাবু লেখার থেকে মুখ না তুলেই প্রথমে জিগ্‌গেস করলেন: কে?

কোনো সাড়া এলো না, শুধু সেই ভারি ছায়াটা যেন তাঁর পিঠের উপর দিয়ে ক্রমশ তাঁর লেখার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো!

প্রিয়বাবু শরীরে একটা মোচড় দিয়ে ঘুরে বসলেন; অবাক হয়ে, খানিকবা অভিভূত হয়ে, জিগ্‌গেস করলেন: কে?

শ্রীপর্ণা প্রণাম করবার জন্যে ভীরু পায়ে তাঁর তক্তপোষের দিকে সরে এলো।

—কে, তুমি ছোট-বৌ না? প্রিয়বাবুর অর্ধোচ্চারিত চিৎকারটা শ্রীপর্ণাকে যেন মেঝের উপর দাঁড় করিয়ে দিলো, সামনে এগোবার সে আর এতোটুকু জায়গা খুঁজে পেলো না। প্রিয়বাবু যেন অশুচি স্পর্শের ভয়ে দেয়ালের দিকে গুটিয়ে নিলেন নিজেকে, বিদ্যুতের কশার মতো রক্তাক্ত জিহ্বা তাঁর লক্‌লক্ করে উঠলো: এ তোমার কী চেহারা! তুমি না আবার বিয়ে করেছিলে? কী, এবারো তার মাথাটা খেয়েছ নাকি?

শ্রীপর্ণা কোনো উত্তর দিলো না, চারদিকে সস্পৃহ চোখে ঘন-ঘন তাকাতে লাগলো।

প্রিয়বাবু চটির সন্ধানে তক্তপোষের নীচে পা বাড়িয়ে দিলেন। দু'হাতে

কোমরের কসিটা আঁট করতে-করতে কঠিন, কটু কণ্ঠে তিরস্কার করে উঠলেন : তুমি এ-বাড়িতে এসেছ কেন ? এখানে তোমাকে কে ঢুকতে দিলো ?

শ্রীপর্ণা এতোক্ষণে কথা কইতে পারলো : দরজা খোলা পেয়ে আমি নিজে থেকেই ওপরে চলে এসেছি।

—না, দরজা খোলা নয়। প্রিয়বাবু তার মুখের উপর ভারি একতাল লোহা যেন ছুঁড়ে মারলেন : এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, দিন-রাত দরজা এখানে খোলা থাকে না। যাও, এক্ষুনি নীচে নেমে যাও বলছি, আর কোনো বাড়ি দেখ গে যাও।

শ্রীপর্ণা তবু দ্বিধা করতে লাগলো।

প্রিয়বাবু ততোক্ষণে পায়ের উপর টলতে-টলতে উঠে দাঁড়িয়েছেন, সোজা সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন,—যাও, নেমে যাও এই মুহূর্তে। সমস্ত জলাঞ্জলি দিলেও সামান্য চক্ষুলজ্জা তোমার নেই, এ কথা কখনো ভাবি নি।

এক সেকেণ্ডে শ্রীপর্ণা যেন আরো এক যুগ প্রতীক্ষা করলো।

—এখনো দাঁড়িয়ে আছ, আমার বাড়িতে, আমার চোখের সামনে ? প্রিয়-বাবু চারদিকে যেন অন্ধকার দেখলেন, বহু কষ্টে উদ্বেজিত বার্ধক্যকে সংযত করে এগিয়ে এলেন আরেক পা ; বললেন,—যতোদূর অধঃপাতেই নেমে যাও না কেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তুমি মেয়ে, তাই তোমার গায়ে হাত তোলা যাবে না। এখনো বলছি, ভালোয়-ভালোয় চলে যাও এই বাড়ি ছেড়ে।

গোলমাল শুনে আশে-পাশের ঘর থেকে ছেলেপিলের দল ছিট্‌কে বেরিয়ে এসেছিলো, তাদের ভিতর থেকে একজন ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে হাসতে-হাসতে বলতে লাগলো ব্যস্ত হয়ে : শিগ্‌গির দেখবে এসো ঠাকুমা, কে একটা ভিখিরি-মেয়ে নীচে না-দাঁড়িয়ে সোজা ওপরে উঠে এসেছে দেখে দাদু তাকে বকছে, বারে-বারে বলছে নেমে যেতে, তবু নামছে না। কতো ভয় দেখাচ্ছে, তবু তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীপর্ণা বললে, শুভ্র, স্পষ্ট, একটু-বা রূঢ় কণ্ঠে : আদিত্যকে আমি একবারটি দেখতে চাই।

—আদিত্যকে ? প্রিয়বাবুকে যেন কে মুখের উপর প্রহার করলো : আদিত্য তোমার কে জিগ্‌গেস করি ?

—আদিত্য আমার ছেলে। শ্রীপর্ণার গলা একটুও টললো না, নির্ভীক,

প্রশান্ত: আমি কোনো আশ্রয়ের জন্যে এ-বাড়ি আসি নি, যখন একবার ছেড়েছি, তখন একেবারেই ছেড়েছি। ওকে একবারটি ডাকুন, একটু ওকে দেখে, ওর জন্মদিনে ওর হাতে এই উপহারটা সঁপে দিয়ে আমি এক্ষুনি চলে যাবো।

প্রিয়বাবুর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুবার আগেই ঘরের থেকে বিভাবতী আদিত্যকে অনুসরণ করে বাইরে চলে এসেছেন। কিন্তু ভিখিরি-মেয়েকে দেখেই তাঁর চক্ষুস্থির। রৌদ্রের অন্ধকারে তিনি যেন শুভ্রায়িত একটা ভূত দেখেছেন, এমনি বিপন্ন অসহায়তায় উঠলেন হঠাৎ চিৎকার করে: এ কী! ছোট-বৌ যে! এ কোত্থেকে এলো?

শ্রীপর্ণার একবার মনে হলো প্রণাম করতে এগিয়ে যায়, কিন্তু কী হবে এই অভিনয়ে?

আদিত্য গুটি-গুটি এগিয়ে আসতে লাগলো, ভালো করে, একটু-বা তীক্ষ্ণ চোখে, সামনাসামনি শ্রীপর্ণার মুখ দেখবার জন্যে। ঠাকুমার ডাক শুনে আর তার কোনো সন্দেহ নেই, কারুর সামান্যতম মুখব্যাদান করবার আগেই ছুটে এসে সে শ্রীপর্ণার একখানা হাত ধরলে, শিথিল, ঠাণ্ডা একখানি হাত; বড়ো-বড়ো চোখে বিশাল কৌতূহল নিয়ে বললে,—তুমি ছোট-বৌ? সেই ছোট-বৌ? হ্যাঁ, আমি ঠিক চিনতে পেরেছি।

কোলের কাছে উদ্বেল আগ্রহে শ্রীপর্ণা তাকে, তার মুখটাকে দুই ক্ষুধার্ত হাতে চেপে ধরলো। সেই স্পর্শে সমস্ত শরীর যেন তার স্নান করে উঠলো স্নেহের তরল তীব্রতায়, সমস্ত চেতনা দিয়ে আদিত্যকে যেন সে শুষে নিতে চাইলো তার আত্মার পিপাসায়। আজ যে তার জন্মদিন সে-কথা শ্রীপর্ণা ছাড়া আর কারুর জানা নেই: উস্‌কো-খুস্‌কো চুলে মুখখানি কেমন করুণ, জামা-কাপড়গুলি কেমন ছন্নছাড়া, তার জেঠিমাদের একজন এখন সসন্তান কলকাতায় উপস্থিত আছেন বলে তার খাওয়া-দাওয়ার বেশ পরিপাটি ব্যবস্থা হয় তা ভাববারো কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না। শ্রীপর্ণা শীর্ণ, ক্ষিপ্র আঙুলে তার রুক্ষ, অগোছাল চুলগুলি বারে-বারে আঁকড়ে ধরতে লাগলো, হেঁট হয়ে চুমু খাবার মতো করে তার মুখের কাছে মুখ এনে বললে,—আমি ছোট-বৌ নই, মা, তোমার মা।

বিভাবতী তপ্ত তেলের উপর জলের ছিটের মতো চিড়বিড় করে উঠলেন:

মা নয় তো রাক্ষুসী। ওকে ছেড়ে দিয়ে সরে আয়, আদিত্য। ওকে ছোঁয় না। চলে আয় বলছি।

শ্রীপর্ণা তার মুখটাকে আরো জোরে চেপে ধরলো।

আদিত্য মুখ তুলে ঈষৎ সন্দিগ্ধ চোখে তাকে পরীক্ষা করতে চেষ্টা করলো; বললে,—যাঃ, মিথ্যে কথা। ককৃখনো তুমি মা নও। আমার মা তো কবে মরে গেছে—ঐ ওখানে টাঙানো ছিলো না তার ছবিটা, ঠাকুমা? আদিত্য বিভাবতীকে হঠাৎ সাক্ষী মানলে: যেই মা মরে গেলো না, অমনি তার ছবিটা একদিন দাদু আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলে!

যেখানে শ্রীপর্ণা দাঁড়িয়ে ছিলো, সেখান থেকে জানলার খোলা আধখানা দিয়ে ঘরের সমুখটা তার চোখে পড়ে। আদিত্যর কথা শুনে চমকে সে দেয়ালের দিকে চোখ ফেরালে। সত্যি, সে সেখানে আর নেই। সেখানে ক্ষীরোদের এন্‌লার্জ-করা প্রকাণ্ড ফটোর পাশে তারো একটা সমসাময়িক ফটো টাঙানো ছিলো—তার সাধব্যের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। চেয়ে দেখলো সেটা সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছে—সমস্ত ঘরে তার কণিকতম একটি ছায়া পর্যন্ত নেই। শ্রীপর্ণা বুঝতে পেরেছে কবে সে মরলো এবং কেমন করে হলো তার দাহ।

তবু সে আদিত্যর চিবুক তুলে ধরে বললে,—না, কই আমি মরেছি? এই তো আমি দাঁড়িয়ে। মরলে বুঝি কারুর ছবি পোড়ায়, আর সে থাকে বেঁচে? শ্রীপর্ণা আদিত্যর মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠলো।

বিভাবতী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: নিশ্চয় মরেছ, মরতে আর তোমার বাকি কি? ছেলে পেটে ধরেও যে-মা ফের বিয়ে করতে পারে, সে বেঁচে থাকে কেন সংসারে? সদর্পে তিনি শ্রীপর্ণার প্রতি একটা নিষ্ঠুর মুখভঙ্গি করলেন: তুমি ছেড়ে দাও বলছি আমাদের ছেলে। ওকে তুমি জড়িয়ে ধরছ কোন সাহসে? কিসের দাবিতে? ছেড়ে দাও বলছি।

শ্রীপর্ণা দুই অজস্র হাতে আদিত্যর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো: আমি তোমার মা, আমি এখনো মরি নি। মরলে বুঝি কেউ আবার তোমার জন্যে এই ফুটবল নিয়ে আসতে পারে?

—ফুটবল? আদিত্য প্যাকেটটার দিকে লাফিয়ে উঠলো।

প্রিয়বাবুর গলায় যেন একটা বাজ ভেঙে পড়লো: খবরদার! ও ধরে না,

আদিত্য! ছুঁবি তো চাব্‌কে পিঠের চামড়া ছিঁড়ে দেবো। এদিকে সরে আয় বলছি এক্ষুনি।

শ্রীপর্ণার হাত দুটো ঝুলে পড়লো আর পিছ্‌লে ভীত মুখে আদিত্য দাঁড়ালো সরে, ছেলেদের ভিড়ে।

তার ছোট এক জেঠতুতো ভাই খুব মুরুব্বিয়ানা করে বললে,—ওর কাছে যাস্‌নে, আদি-দা, ও ভূত। দেখছিস না কেমন লম্বা-লম্বা হাত-পা!

আদিত্য ধম্‌কে উঠলো: কী বুদ্ধি! ভূত বুঝি কখনো দিনের বেলায় আসে? তাকে বুঝি ছোঁয়া যায়? সে বুঝি দোকানে গিয়ে টাকা দিয়ে ফুটবল কিনে আনতে পারে? ও মা, সত্যিকারের মা, হ্যাঁ, আমি ঠিক চিনতে পেরেছি এতোক্ষণে।

প্রিয়বাবু অসহিষ্ণু, রুক্ষ গলায় বললেন—আর কী! আর তবে দাঁড়িয়ে আছো কী করতে!

—না, যাচ্ছি। কাগজে-মোড়ানো প্যাকেটটা সামনের একটা চেয়ারের উপর নামিয়ে রেখে শ্রীপর্ণা অনুদ্বেল, পরিচ্ছন্ন গলায় বললে,—শুধু আজ ওর জন্মদিন, এ-কথাটা আমি এখনো ভুলতে পারি নি। ওর জন্মদিনের এই জিনিসটা ও হাতে করে তুলে নিলে ওর কিছু অকল্যাণ হবে না। তুমি এটা দিয়ে খেলো, কেমন? আদিত্যর দিকে চেয়ে শ্রীপর্ণা শেষ একবার হাসলো।

বিভাবতীর বিস্মৃত পুত্রশোক হঠাৎ সহস্র ফণায় আলোড়িত হয়ে উঠলো: ছেলের জন্যে এতো মায়া, ছেলে কি শুধু তোমার একলার ছিলো? শুধু তার জন্মদিনটাই মনে আছে, আর কিছু না?

শ্রীপর্ণা আর দাঁড়ালো না। চাদরটা বুকে-পিঠে ঘনিয়ে নিতে-নিতে সে নামতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। কেনই বা যে সে এখানে এসেছিলো কে বলবে? জোর করে দাবি করা দূরে থাক, রদ্দি একটা ফুটবল পর্যন্ত সে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারলো না!

উঃ, কতোক্ষণে বাড়ি গিয়ে গা থেকে এই সব শোকের কালিমা ধুয়ে ফেলে বীতবর্ষণ আকাশের মতো সে সুনীল মুক্তিতে ঝল্‌মল্‌ করে উঠবে? শীতের পাতার মতো এই দারিদ্র্য ঝরিয়ে ফেলে দাঁড়াবে সে তার দীপ্যমান মহিমায়, শরীরের অপরিমাণ ঐশ্বর্যে! কুয়াশা সরিয়ে তার সেই বিকীর্যমান সূর্যচ্ছটায়! বন্ধুর কল্পনা ছেড়ে তার সেই সমতল প্রাত্যহিকতার স্রোতে!

বেশ-বাসের এই নির্লজ্জ দীনতা শ্রীপর্ণাকে যেন প্রতি পদে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। কেন, কেন সে তার মোটরে এলো না, উদ্ধত মেরুদণ্ডে, অনবনম্য তেজস্বিতায়? কেন সে আগে থেকে হারবে বলেই প্রস্তুত হয়ে এলো? কেন সে শকুনের মতো প্রখর নখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলো না?

নীচে নামতেই মেজো-জায়ের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেলো। চোখে-মুখে ঈষৎ সমবেদনার ভাব ফুটিয়ে এবং সেই সঙ্গে বেদনাটি প্রচ্ছন্ন তৃপ্তিতে উপভোগ করতে-করতে তিনি বললেন,—এবারো তুমি কপাল মুছলে নাকি, শ্রী? তাই হয়, মরা লোকও নিঃশেষে একেবারে মরে যায় না, মেজো-জায়ের মুখ রেখায় কুটিল হয়ে উঠলো: বাতাসে তার অভিশাপ ঘুরে বেড়ায়। মরে গেলেই তুমি তাকে ঠকাতে পারো, একথা ভেবো না, কেননা স্বামী শুধু আমাদের ইহকালের নয়।

শ্রীপর্ণা হেসে বললে,—আমার স্বামীর অস্তিত্বের খবর কি আমার কপালেই লিখে বেড়াবো নাকি, আমার সমস্ত জীবনে, সমস্ত ঐশ্বর্যে তা টের পাচ্ছেন না?

মেজো-জা খানিকটা অবাক, খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে বললেন,—সে তবে এখনো বেঁচে আছে নাকি?

—আশা করি থাকবেও। শ্রীপর্ণা শব্দ করে হেসে উঠলো।

—তবে এ তোমার কী ছিরি-ছাঁদ! মেজো-জা তার পোশাকের দিকে ইঙ্গিত করলেন: খুব তা হলে দুঃখে পড়েছো বলো?

সদরের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—আমাদের সুখটা বুঝি আজকাল বাইরের কতোগুলি চাকচিক্যে এসেই শেষ হয়েছে? পরকে না জানাতে পারলে বুঝি আর আমরা সুখী নই?

দ্রুত, দীর্ঘ নিশ্বাসের মতো শ্রীপর্ণা সমস্তটা পথ পার হয়ে এলো। বাড়ি এসে দেখলো নিরঞ্জন একাই কোথায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তার সেই অনুপস্থিতিটা যেন একটা বিরাট ভারের মতো ঘর জুড়ে পড়ে আছে, মৃত একটা ঈগলের ডানার মতো। শ্রীপর্ণা সমস্ত শরীরে ছটফট করে উঠলো, চাদরটা দিলো আলনার উপর ছুঁড়ে, আয়নার কাছে এসে ধুতিটা গায়ের থেকে খুলে ফেললো টান মেরে—একরাশ লজ্জার আবর্জনা, মৃত্যুর তুষারীভূত নিশ্বাস, যেন ক্লেদময় পিচ্ছিল একটা সরীসৃপ তার চামড়ার উপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে

চলেছে—শ্রীপর্ণা নির্দয় এক টানে ছুঁড়ে ফেলে দিলো সেই রাশীকৃত ধূলি-জাল, তাড়াতাড়ি পরলো তার একখানা ঝল্‌মলে রঙিন শাড়ি, রেখায়-রেখায় যার চমক, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে যার প্রগল্‌ভ চপলতা। মাটির একটা বাতিতে শিখা যেন উঠলো সাপের জিহ্বার মতো লেলিহান হয়ে। শাড়িটা পরে, বাহুর তলা দিয়ে ঘুরিয়ে, বুকের ধার দিয়ে লতিয়ে, পিঠের উপরে আলুল করে রেখে শ্রীপর্ণা দাঁড়ালো আকাশের আনীল মেঘমুক্ততায়—গায়ে তার সমুদ্রের বাতাস দিলো। এতোক্ষণে সে যেন তার চারপাশে প্রফুল্ল একটা পরিমিতি পেলো, তার প্রাত্যহিকতার প্রাখর্য। নিজেরই মনে, আয়নায় দাঁড়িয়ে শরীরে আনলো সে একটা দ্যুতিমান মসৃণতা, বাহু দু'টি তুললো লাবণ্যে বিহ্বল করে, দুই চোখ চটুলতায় ধারালো, একটু বা বিলোল হয়ে উঠলো। একেক করে গায়ে সে সব গয়না পরলে। যেন শীত-শীর্ণ অরণ্যে লেগেছে চৈত্রের আগুন। পাথরের ঠাণ্ডা একটা বাটি দেখতে-দেখতে সুরার একটা ভৃঙ্গার হয়ে উঠলো, উচ্ছল ফেনা পড়তে লাগলো গড়িয়ে। চপ্‌চপে করে তেল মেখে চুল সে চিকণ করে তুললে—কালোর সে কী প্রখর উজ্জলতা—চুলগুলিকে আজ খোঁপায় সংক্ষিপ্ত না করে পিঠের উপর দীর্ঘ একটা বেণীতে দিলো সে সর্পিল করে—বনের মধ্য দিয়ে বাঁকা-চোরা, খানিক-দেখা খানিক-অদেখা গ্রাম্য পথের মতো চুলের ফিতেটা থেকে-থেকে উঁকি মারতে লাগলো। ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ সেই বেণীতে সে সাপের মতো সুন্দর হয়ে উঠলো। তাতেও তার স্বস্তি নেই, কপালে সে আজ আঙুলের ডগায় করে সিঁদুরের ফোঁটা দিলে, যেন একবিন্দু তার রক্তাক্ত হৃদয়; এবং, সেখানেও সে থামলো না, শিহরিত শিখায় সিঁদুরটা টেনে দিলো তার দীর্ঘ সিঁথির উপর। তারপর হঠাৎ সে এক ডিবে পান সাজতে বসলো, পান খেয়ে ঠোঁট দুটো রঙিন, বিহ্বল করে তুললে। আর সে এতো-টুকুও সাদা নয়, মুছে ফেলে দিয়েছে সে সকল মৃত্যু, সকল মালিন্য: এখন সে লাল, রক্তের মতো, আগুনের মতো, তার আনন্দের মতো লাল। নিরঞ্জন তো এখন এলেই পারে বাড়িতে।

রাত তখন অনেক, নিরঞ্জন ফিরলো। তাকে যেন কেমন ক্লান্ত, রোগাটে দেখাচ্ছে। ঘরে সে যেন এলো একটা অশরীরী ছায়ার মতো। যন্ত্রচালিতের মতো পোশাক বদলাতে লাগলো, চোখ তুলে একবার চেয়েও দেখলে না, শ্রীপর্ণা কেমন সেজেছে, জ্যোৎস্নার মতো কেমন ছড়িয়ে রয়েছে বিছানা, ফুলদানি ভরে

কতো সে ফুল জমিয়ে রেখেছে টেবিলে। নিরঞ্জন যেন সব দেখেছে, দেখবার তার আর কিছু নেই, তার সমস্ত ভঙ্গিতে যেন সেই ঔদাসীন্য।

শ্রীপর্ণা নিজেই উঠে এলো ; শাড়িটা খস্‌খসিয়ে, চুলগুলিতে বা একটু শব্দ করে সে তার নীরব উপস্থিতিকে ভাষা দিলো ; বল্‌লে,—তুমি একাই বেরিয়ে পড়লে, আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করলে না কেন ? তোমার সঙ্গে যাবো বলে আমি কখন থেকে সেজে বসে আছি।

গলাটা উঁচু করে কলারটা ছাড়াতে-ছাড়াতে নিরঞ্জন নিস্পৃহ গলায় বললে,—তুমি ফেরো কি না-ফেরো তার ঠিক কী ?

—ফিরবো না মানে ? হাসতে চেষ্টা করেও শ্রীপর্ণা হাসতে পারলো না : সেই কখনই তো ফিরে এলুম—যেতে আর আসতে যতোটুকু লাগে। তুমি যে এতো আগে বেরিয়ে যাবে তা কে জানতো ?

নিরঞ্জন গম্ভীর মুখে বল্‌লে—কাজ ছিলো।

—চা না-খেয়েই বেরিয়ে পড়লে ? আরেকটু বসে গেলে তোমার কী ক্ষতি হতো ? আমি তো এসেই পড়তাম।

প্যাণ্ট থেকে নিরঞ্জন ধুতির আবরণে চলে এলো : কলকাতা শহরে এক পেয়ালা চায়ের কিছু অভাব পড়ে নি। আমার জন্যে ব্যস্ত না হলেও তোমার চলতো।

শ্রীপর্ণা স্তব্ধ হয়ে গেলো। চারদিক যেন এলো হঠাৎ দুঃসহ গুমোট করে। সূক্ষ্ম সুতোর উপর দিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত যেন হেঁটে চলে গেলো নিঃশব্দে।

ঘরে একটুও গাফিলি না করে নিরঞ্জনকে তাড়াতাড়ি ফের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে দেখে শ্রীপর্ণা বললে,—তুমি এখন খেতে যাবে না ?

—না, আমি খেয়ে এসেছি। বাইরে আমার নেমন্তন্ন ছিলো।

—খেয়ে এসেছ মানে ?

—মানে তাই। নিরঞ্জন একবার পিছন ফিরেও তাকালো না : তুমি না খেয়ে থাকো, খেয়ে নাও গে যাও।

—এখন কোথায় যাচ্ছ তবে ?

—নীচে, আপিস ঘরে।

শ্রীপর্ণা অসহায় হাতে তাকে আকর্ষণ করলো ; বললে,—এখন আবার তোমার কী কাজ ?

—এখানে বসেই বা আমার কী স্বর্গ ! নিরঞ্জন হঠাৎ তার হাতের পেশীগুলো নিষ্ঠুরতায় আঁট করে ধরলো : ছাড়ো, এখানে বসে বাজে গল্প করবার আমার সময় নেই। আমাকে গিয়ে এখন কতোগুলি সবিস্তার চিঠি লিখতে হবে।

তার হাতের নিষ্ঠুর বিস্ফারের সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীপর্ণার আঙুলগুলি আলগা হয়ে এলো আস্তে-আস্তে।

তবু সে আশা ছাড়লো না, ছাড়লো না তার শাড়ি, জ্বলন্ত সেই শোভা। এতো উদ্দাম সে আজ সেজেছে, এতো উত্তাল, তাতে অভিমানের নেই বিন্দুতম অবকাশ। নির্বিঘ্নে সে আজ খেলো এবং এতো খেলো, চোখে দেখলে স্বয়ং নিরঞ্জনই হয়তো অবাক হয়ে যেতো—তারপর উপরে এসে কোনো রকম টুকরো-টুকরো হাল্‌কা কাজে হাত না দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়, সেই উদ্বেল, সসজ্জ সমারোহে, বিস্তীর্ণ বিসর্পিত আলস্যে। বুকের উপর কালো রক্তের মতো উগ্র একটা গোলাপ নিয়ে লেলিহ আঙুলে খেলা করতে লাগলো। চেয়ে রইলো দেয়ালের শুভ্রতার দিকে, শয্যাস্তীর্ণ আবৃত তার দেহের উপর আলো কেমন তীব্র একটা বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে !

আরো অনেক রাত : নিরঞ্জন এবার উপরে এলো। আলো জেলে তখনো শ্রীপর্ণা তেমনি শুয়ে আছে না-ঘুমিয়ে।

এতোটা যেন নিরঞ্জন আশা করে নি।

গায়ের থেকে জামাটা খুলে ব্রাকেটে টাঙিয়ে রেখে নিরঞ্জন বললে,—ওঠো, আমি এবার ঘুমোবো।

—এক্ষুনি ? পাশ ফিরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রীপর্ণা বললে,—গল্প করবে না একটুও ?

—গল্প আবার কিসের ?

—আহা, কোনোদিন যেন কিছু গল্প করো না। শ্রীপর্ণা সাহসে বুক বাঁধলো : এই যে ঘুরে এলাম ও-বাড়ি তার কোনো কথাই তোমার জানতে ইচ্ছে করে না ?

খাটের প্রান্ত থেকে সরে এসে নিরঞ্জন জানলা পর্যন্ত হেঁটে গেলো। বললে, শুকনো, সাদা, খস্‌খসে গলায় বললে,—ওটা তোমার বাড়ি, ও-বাড়ির ইন্‌টারেস্ট কেবল তোমারই কাছে। তাতে আমার কী এসে যায় ?

শ্রীপর্ণা এক মুহূর্ত হয়তো-বা কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেলো, মাটির সঙ্গে মিশে

গেলো ধুলো হয়ে: এক মুহূর্ত। পরক্ষণেই সমস্ত ঔদাস্ত উড়িয়ে দিয়ে চঞ্চল একমুঠো হাওয়ার মতো খাট থেকে সে নেমে পড়লো, নিরঞ্জনকে অবহিত হবার পর্যন্ত সময় দিলে না, শরীরে তার পালকের মতো লঘুতা, স্রোতের মতো দীপ্তি, পিছন থেকে অল্প বয়সের একটি কিশোরীর মতো সে তার গলা জড়িয়ে ধরলো, প্রায় আধো-আধো গলায় বললে,—তুমি আমার ওপর রাগ করেছ? কিন্তু কেন, কেন তুমি আমার ওপর রাগ করবে?

আকস্মিকতায় নিরঞ্জন একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, আর তার মুখের সেই আধো-গম্ভীর আধো-বিস্মিত চেহারা দেখে শ্রীপর্ণা উঠলো খিলখিল করে হেসে।

শ্রীপর্ণার ছোঁয়া লেগে নিরঞ্জনেরো বয়েস যেন অনেক কমে এসেছে। ঘাড় থেকে তার হাত দুটো ছাড়িয়ে নেবার আধো-আন্তরিক চেষ্টা করতে-করতে বিরক্ত মুখে সে বললে,—তোমার যে দেখছি স্ফূর্তি আজ আর ধরে না।

—কী করে ধরবে বলো? আদিত্যের আজ দেখা পেলুম যে।

গলা থেকে জোর করে তার হাত দুটো ছিঁড়ে নিয়ে অথচ যেন কিছুই হয়নি এমনি তরল স্বাভাবিকতায় নিরঞ্জন বললে,—দিলে সেই ফুটবলটা?

—হ্যাঁ, কিন্তু একটা ভারি ভুল হয়ে গেছে, শ্রীপর্ণা মুখের থেকে হাসিটি কিছুতেই মুছে ফেললো না: সঙ্গে একটা inflator নিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। নইলে তা পাম্প করবে কী দিয়ে?

—এখন তো কতো ভুলই তোমার মনে হবে। নিরঞ্জন মুখ ফেরালো।

শ্রীপর্ণা দমলো না এতোটুকু, স্নিগ্ধ হাসির হাওয়ায় নিরঞ্জনের মেঘ সে উড়িয়ে দিলো; বললে,—হ্যাঁ, এখন অনেক ভুলই মনে হচ্ছে। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেই ভালো হতো। ঝগড়া করে, মারামারি করে, আদিত্যকে যে করে হোক ছিনিয়ে নিয়ে আসতুম। সত্যি, ও ওখানে বিশেষ আরামে আছে বলে মনে হলো না।

—ঝগড়া-মারামারি না-করেই বা নিয়ে আসতে পারলে না কেন? নিরঞ্জন একটা সিগ্রেট ধরালো।

শ্রীপর্ণা অনর্গল হেসে উঠলো: এমন আশ্চর্য, কথাটা পাড়তেই পারলুম না, আদিত্য যদিও আমাকে চিনেছে, যদিও আমার সঙ্গে চলে আসবার জন্যে ব্যস্ত। ওকে দেখতে পেয়েছি সেই যেন কী সম্পদ! বিলীয়মান হাসিটা

শ্রীপর্ণা আবার শব্দে প্রখর করে তুললো : তা ছাড়া তোমার একটা স্পষ্ট, ফাইন্যাল্ মত নিইনি। তুমি সঙ্গে থাকলে বরং—

—আমার আবার মত কী! নিরঞ্জন গম্ভীর মুখে পাইচারি করতে লাগলো : তোমার ছেলে, ইচ্ছে হলে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। তাতে আমার কী বলবার আছে? বরং তাই তো ভালো, নিরঞ্জন যেন প্রায় রুখে দাঁড়ালো : বারে-বারে ভিক্ষুকের মতো ও-বাড়িতে না গিয়ে একেবারেই ওকে জোর করে নিয়ে আসা। তাই যদি তুমি চাও, ওকে রাখতেই যদি চাও তোমার কাছে এনে।

—পাগল! কে আর যাবে ও-বাড়ি! ওকে এনেই বা কী হবে এখানে! শ্রীপর্ণা গলাটা কিছুতেই ভিজতে দিলো না, বললে,—বেশ আছে ও আপনজনের মাঝখানে, সংসারের আড়ালে-আবডালে! ছেলেবেলায় কোন ছেলেটা খুব সুখে থাকে, বাবুগিরিতে গড়াগড়ি দেয়? ছেলেবেলায় দুঃখের স্বাদ পাওয়াটা বরং ভালো। কী বলো?' কিন্তু অতো বাজে কথা কইবার আমার সময় নেই, শিগ্‌গির ঘুমুবে চলো, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নে।

আদিত্যের প্রতি শ্রীপর্ণার এই ব্যাকুলতার অর্থ বুঝতে নিরঞ্জনের কল্পনাকে বিশেষ প্রসারিত করতে হয় না, সে তা সম্মানও করতে পারে যথাসাধ্য; কিন্তু কয়েকটা দিনের চাপা গুমোটের পর সেদিন আপিস থেকে অসময়ে ফিরে এসে বাড়িতে তাকে দেখতে না পেয়ে নিরঞ্জন আপাদমস্তক জ্বলে গেলো। সম্ভব-অসম্ভব কোনো জায়গায়ই তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো না। কোথায় গেছে সে, তাকে না বলে, চুপিচুপি এই দুপুরের নির্জনতায়? কোথায় আবার সে যাবে! ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ একটা রাগ নিরঞ্জনের মেরুদণ্ড বেয়ে সির্‌সির্ করে উঠে গেলো উপরে। আবার সে গেছে সেই বাড়ি, সেই অবনমিত ভিক্ষুকের ভঙ্গিমায়, সেই ম্লান দীন বেশে, লুকিয়ে একটিবার দেখে আসতে তার ছেলেকে? সংসারে তার একমাত্র মা হওয়াই কি সব, তার বেশি তার আর কোনো সম্মান নেই, প্রতিষ্ঠা নেই, পরিচয় নেই? রাগে ও ঘৃণায় নিরঞ্জনের সমস্ত শরীর রি-রি করতে লাগলো। কেন, কেন সে ও-বাড়ির দরজায় গিয়ে প্রত্যাশী হবে? সেখানে তার কিসের আশ্রয়, কিসের অভ্যর্থনা! ছেলেই যদি সে ফিরিয়ে পেতে চায়, তবে তার জন্যে স্পষ্ট, প্রবল কণ্ঠে দাবি জানাক, মামলা করুক্, দরকার হলে স্থাপন করুক তার স্পর্ধিত অধিকার। তার মধ্যে বরং

একটা সংগ্রামের তেজ আছে, সঙ্কল্পের মহত্ত্ব আছে—তাকে নিরঞ্জন সমস্ত চিত্তে স্বীকার করতে পারে—তার পরিবর্তে এ কী লজ্জা, এ কী ভীরুতা, এ কী কদর্য দারিদ্র্য! অতিশয়তার কোঠায় পৌঁছে মাতৃস্নেহ পর্যন্ত অত্যন্ত কুশ্রী, অত্যন্ত অবজ্ঞেয় হয়ে দেখা দেয়। শ্রীপর্ণা এটা বুঝলো না যে সে শুধু মা নয়, সে স্ত্রী, তার মর্যাদার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিরঞ্জনের মর্যাদা, তার দায়িত্ব শুধু আদিত্যকে নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিলো না জীবনে। অন্ধ, অবশ একটা রাগে নিরঞ্জন নিজেকে দুর্বল, অসহায় বোধ করতে লাগলো।

ঘরে নিরঞ্জন পাইচারি করছে টের পেয়ে তার সিগ্রেটের ধোঁয়া শুঁকে, শ্রীপর্ণা নিমেষে পাংশু হয়ে গেলো। এটা যে কেমন করে হয় তার সে কোনো একটা নিয়ম খুঁজে পেলো না। আপিস থেকে নিরঞ্জন মাঝে-মাঝে অসাময়িক বাড়ি ফেরে বটে, কিন্তু যে-দিনই সে বেরুবে, সে-দিনই সে নির্ভুল এসে ঘড়ির কাঁটায় হাজির হবে কেন? কিন্তু এ নিয়ে এখন ভাগ্যকে প্রশ্ন করা বৃথা: শ্রীপর্ণাকে দাঁড়াতেই হবে ভাগ্যের মুখোমুখি।

সামান্য একটা প্রশ্ন উচ্চারণের ভঙ্গিতে কী অবিশ্বাস্য রূঢ় শোনালো! নিরঞ্জন নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালো তার দুর্ভেদ্য নিষ্ঠুরতায়; শ্রীপর্ণার মুখের উপর প্রায় গর্জন করে উঠলো: কোথায় গিয়েছিলে?

মুখের দুটো কথা, কিন্তু শ্রীপর্ণা যেন কাচের বাসনের মতো টুকরো-টুকরো হয়ে গেলো। গায়ের থেকে চাদরটা খুলে রাখতে-রাখতে—আজ আর তার কোনো কলা-কৌশল দেখাবার সুযোগ হলো না—গম্ভীর গলায় বললে,—তোমার কী মনে হয়?

—আবার ও-বাড়ি গিয়েছিলে বুঝি? নিরঞ্জনের ধমকটা তাকে নাড়া দিয়ে গেলো সর্বাঙ্গে।

দেরাজ টেনে হাতের গয়নাগুলি আঙুল দুম্‌ড়ে মণিবন্ধের দিকে নিয়ে যেতে-যেতে শ্রীপর্ণা প্রখর কণ্ঠে বললে,—না।

—তবে?

শ্রীপর্ণা চুপ করে রইলো। তার নিস্তব্ধতাটা যেন একস্তূপ পাষাণের মতো ভারি।

—তবে কোথায় গিয়েছিলে? কোথায় তুমি যেতে পারো? ধাক্কা মেরে সেই পাথরটা নিরঞ্জন ভেঙে দিতে চাইলো।

গয়নাগুলি হাতে-গলায় পরে নিয়ে শ্রীপর্ণা এবার চুল এলিয়ে আয়নায় গিয়ে চিরুনি চালাতে লাগলো। আয়নার মতো স্বচ্ছ, পরিষ্কার গলায় বললে,—ইস্কুলে গিয়েছিলুম। আদিত্যদের ইস্কুলে।

—আদিত্যদের ইস্কুলে? সে কোথায়? নিরঞ্জন হাঁপিয়ে উঠলো: সেখানে গিয়েছিলে কী করতে?

বালিগঞ্জের ইস্কুলটা খুঁজে নিতে বেশি দেরি হলো না! শ্রীপর্ণা চিরুনির দাড়া দিয়ে সিঁথিটা সোজা করে চিরতে লাগলো: গিয়েছিলুম আদিত্যকে একটিবার দেখতে পাই কিনা।

—আদিত্যের দেখা পাবার জন্যে তুমি দুপুরবেলা সোজা তাদের ইস্কুলে চলে গেলে?

—হ্যাঁ, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেও তার দেখা পেলুম না। আয়নার দিকে মুখ করে নির্লিপ্ত, উদাসীন মুখে শ্রীপর্ণা বললে,—টিফিনের সময়, ছেলের দল ছড়িয়ে পড়েছে এখানে-সেখানে, কিন্তু আদিত্য কোথাও নেই। কতোক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় বলো? তাই শূন্য মনে খালি-হাতেই আমাকে ফিরে আসতে হলো।

—তুমি ঠায় ততোক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলে হাঁ করে? বিদ্রূপের বিষে নিরঞ্জন একেবারে জর্জর হয়ে উঠলো: রাস্তার লোকে তোমাকে কী ভেবেছে জিগ্‌গেস করি?

—লোকে আমাকে কী ভাবে বা না-ভাবে তাতে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

নিরঞ্জন সেই মুহূর্তে মুখের কাছে যেন কোনো কথা পেলো না। তার তূণে এবার আরেক অস্ত্র, বললে,—গিয়েছিলে তো আমার মত নিয়ে যাও নি কেন?

—মত দেবার মতো তুমি সে-সময় কাছে উপস্থিত ছিলে না। শ্রীপর্ণা বেণীটা প্রায় শেষ করে এনেছে: তুমি আফিস চলে যাবার পর দুপুরটা ভারি বিশ্রী, ভারি ফাঁকা ঠেকতে লাগলো। ভীষণ—ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগলো আদিত্যকে গিয়ে একবারটি দেখে আসি। বারটা আজ শনি কি রবি নয়, এ-সময়টা নির্ঘাৎ সে ইস্কুলে। সেই দিকেই বেরিয়ে পড়লুম।

—আপিসে আমাকে ফোন করলে না কেন?

—তখন, সে কথাটা মনে হওয়া মাত্র, শ্রীপর্ণা খোঁপায় কাঁটা গুঁজতে

লাগলো : কোথায় তোমাকে ফোন, সমস্ত পৃথিবী আমি ভুলে গেলুম ! একেক নিশ্বাসে একেক বছর যেন কেটে যাচ্ছে।

—কিন্তু গেলে তো এমন পোশাকে যাবার কী দরকার হয়েছিলো ?

কপালে সিঁদুর পরতে-পরতে শ্রীপর্ণা বললে,—পোশাক ? পোশাকে কী এসে যায় ?

—একশো বার এসে যায়। নিরঞ্জন নির্লজ্জ রাগে মেঝের উপর একটা লাথি মেরে বসলো : আদিত্য তো তোমাকে সেদিনই চিনেছে, তবে ঐ পোশাকটা আবার কোন লজ্জায় পরতে গিয়েছিলে শুনি ?

চিরুনির মুখে করে সিঁদুর নিয়ে সিঁথের উপর দীর্ঘ একটি রেখা টানতে-টানতে শ্রীপর্ণা বললে,—ঐ পোশাকেই আমাকে যেন—আমাকে যেন মা বলে মনে হয়।

নিরঞ্জনের মুখের উপর সজোরে কে যেন চাবুক মারলো। যন্ত্রণায় সে উঠলো চিৎকার করে : কিন্তু তোমার এই ব্যবহারে, এই বেশভূষায় আমার সম্মান ক্ষুন্ন করছ তা জানো ?

আলনার থেকে পাট করা রঙিন শাড়ি তুলে নিতে নিতে শ্রীপর্ণা অবাক হয়ে বললে,—বা রে, তোমার সম্মানে এতে কী ক্ষতি হতে গেলো ?

—নিশ্চয়, একশোবার ক্ষতি। নিরঞ্জন তার শেষ বাণ ছুঁড়লো : তুমি নিরঞ্জন গুপ্তের স্ত্রী, সমাজে আমার একটা স্থান আছে, সম্ভ্রম আছে,—আমার আভিজাত্য, আমার সম্মান তুমি একটা ছেলেখেলার জিনিস, সামান্য একটা ফুটবল পাওনি।

শাড়িটা বদলাতে পাশের ঘরের দিকে যেতে-যেতে শ্রীপর্ণা বললে,—বুঝলুম। কিন্তু তোমার সম্মান আর আমার সম্মান এক জিনিস নয়।

দশ

সেদিনের ঘটনার পর আদিত্যর শিশুমনে নানা-রকমের সব অদ্ভুত, অস্পষ্ট, অগোছাল জিজ্ঞাসা এসেছে—একা সে কিছুই কিনারা করে উঠতে পারছে না। 'ছোট-বৌ'ই যে তার মা—মা না হ'লে কি কেউ আর এমন একটা নতুন ফুট-বল কিনে দেয়!—সে-বিষয়ে তার কোনোই সন্দেহ নেই। তাকে সবাই মা'র কাছে যেতে বারণ করে দিয়েছিলো বটে, কিন্তু মা বলে ডাকতে কেউ তাকে মানা করে দেয় নি। ঠাকুমাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে শত ঝালাপালা করলেও সরাসরি কোনো উত্তর পাওয়া যায় না—মা-কে কেবল পোড়ারমুখী, হতভাগী, আরো নানা বিচিত্র শব্দে গাল পাড়তে থাকেন। তাঁর অপরাধের মধ্যে তো এই, ছেলের সে কদর জানে না, শিখলো না ছেলেকে আদর করতে! কী করে শিখবেন, যদি আদিত্যকে তাঁর কাছে যেতে দেওয়া না হয়? মজা মন্দ নয়, দূর থেকে যা একটু ফুটবল পাঠিয়ে আদর করতে গেলেন, অমনি হুকুম হয়ে গেলো: সে-ফুটবল তুমি ছুঁতে পাবে না। আচ্ছা, এ-ও এক কথা—খুশিতে আদিত্যর দুই চোখ বড়ো হ'য়ে ওঠে: যাকে সে এতোদিন মা বলে ডাকতো, সে-ই যদি পরে বড়ো হ'য়ে ঠাকুমা হ'য়ে যেতে পারে, তবে 'ছোট-বৌ'ই বা কেন মা হয়ে যেতে পারবে না? আর, কই, কেউই তো তার জন্মদিনের তারিখটা এমন মুখস্ত করে রাখে নি, কেউই তো কোনোদিন হাতে ধরে দেয় নি একটা উপহার! মা-ই যদি না হবে, তবে এতো রাজ্যের অফুরন্ত দিন-রাত্রের মধ্যে সেই দিনটা সে কী করে মনে টুকে রাখবে? জিগ্‌গেস করি, মা-ই যদি না হবে, তবে তাকে এমন করে দু'হাতে জড়িয়ে ধরবে কেন? লজ্জায় আদিত্য আপন মনে হেসে উঠলো। নিশ্চয়, নিশ্চয় মা। কিন্তু আরেক দিক থেকে আদিত্যর ভীষণ খটকা লাগে। মা কি তবে মরে নি, না, মা-রা কোনোদিন সত্যি মরে না? ফটোতে যাকে সে ঝাপসা মা বলে চিনেছিলো, তার সঙ্গে এই মায়ের খুব বেশি মিল আছে বলে মনে হ'লো না—ফটোটা এখন আস্ত থাকলে সে আরেকবার ভালো করে দেখতো—কিন্তু

কে জানে, এই মা'র সঙ্গে মেলবার জন্যে দেয়ালের সেই ফটোটাও হয়তো বদ্‌লে আসতো এতোদিনে। বা রে, হাতে-গলায় গয়না নিয়ে ছবি তুললেই তো ছবিতে হুবহু গয়না উঠবে, আবার তা ইচ্ছে মতো খুলে রাখলেই তো সেই খালি-খালি হাত-পা! দাদুর প্যাণ্ট-কোট-পরা একটা, ধুতি-চাদর পরা আরেকটা, নানান রকম ছবি টাঙানো নেই? মাঝখান থেকে একা মা-ই দোষ করতে গেলো? এখন যদি সে আবার ছবি তোলে, ঠিক অবিকল তা একেবারে মায়ের মতো হয়ে যাবে।

কিন্তু আরো একটা সমস্যা আছে, সেইটেই গভীর সমস্যা। মা-ই যদি হবে, সে আর তবে আদিত্যের কাছে আসে না কেন? কেন তবে, কেমন করে তবে আদিত্যকে সে ভুলে থাকে?

মা-কে না পাক্‌, তার শিশুকল্পনায় অপরূপ এই মা-নামটি পেয়ে আদিত্য দিনে-দিনে কেমন গম্ভীর, উদাসীন, অন্যমনস্ক হয়ে উঠতে লাগলো। কোনো খেলায় তার মন বসে না—মা'র দেয়া সেই ফুটবলটা নিয়ে শম্ভু আর কেশব, তার জেঠতুত ভাইয়েরা, পাড়ার আর সব ছোট ছোট ছেলে জুটিয়ে খুব হুল্লোড় করে চলেছে—আদিত্য তার ধারও ঘেঁষে না, কখন সবার থেকে আলগা হয়ে গুটি-গুটি চলে যায় সামনের ইষ্টিশানে। কখনো ওভার-ব্রিজের উপর, কখনো প্ল্যাটফর্মে, একমনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মা যেন কতদূর থেকে ট্রেনে চড়ে আজ আসবে। ধোঁয়া উগ্‌রে হুইস্‌ল্‌ দিয়ে কত ট্রেন যায়-আসে, কিন্তু একটি মেয়ের মুখেও সে তার মায়ের মুখ দেখতে পায় না। আচ্ছা, আজ নয় তো কাল। এমনি সমস্ত সন্ধ্যা, দিনের পর দিন। রাত্রে সে তার হাতের লেখার খাতায় মাকে চিঠি লেখে, যাতে মা সহজে পড়তে পায়, তাই বড়ো বড়ো অক্ষরে, কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ নেই—মা'র চিঠিও টিকিট এঁটে ডাক-বাক্সে ফেলতে হয় নাকি? তবে তার টিকিট নেই কেন? ঠাকুমাকে বলতে গেলেই তো তিনি তেড়ে আসেন: তার ঠিকানা জানিস? সত্যি, আদিত্য ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকাতে থাকে—সত্যি, ঠিকানা তো সে জানে না। বলে: মা'র চিঠিতেও ঠিকানা লাগে নাকি, ঠাকুমা?

মূর্তিহীন মা-নামটা আদিত্যকে শিশুকালের অনেক সব ছোটখাটো দুঃখ চিনিয়ে দিয়েছে এক নিমেষে। যখন মা ছিল না, তখন তাকে যদি কেউ মারতো, সে কাঁদতো, কিন্তু নালিশ করতো না; এখন কেউ মারলে সে কাঁদে

না, মনে-মনে মা'র কাছে নালিশ করে। মেজো জেঠিমা সবাইকে সেদিন সন্দেশ দিয়ে তাকে যে শুধু গুড় দিয়ে মুড়ি দিলেন, রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে সেই কথাটিও তার মা'র কাছে জানানো চাই। বালিশে লুকিয়ে-লুকিয়ে একটু সে কাঁদেও আজকাল, তার জীবনের প্রথম সেই কান্নার মধুরতা। বাড়িতে কেউ এলো শুনলে সে লাফিয়ে ওঠে: মা বুঝি এলো। ছুটো-ছাটা হাতে যা দুয়েকটা পয়সা আসে কালে-ভদ্রে, তা সে আজে-বাজে খরচ করে না, নিজেরই বাক্সটিতে জমায়,—পাছে ঠাকুমার জিম্মায় থাকলে পরে তা উদ্ধার করতে বেগ পেতে হয়। সেই পয়সা জমে-জমে যখন এতোগুলি টাকায় ফুলে উঠবে, তখন তা নিয়ে সে মা-কে খুঁজতে বেরুবে, এই ট্রেনে চেপে, অনেক দূরের ট্রেনে, রাত্রির অন্ধকার কাঁপিয়ে। ঠিক বা'র করবে তাকে খুঁজে, ফটোর সঙ্গে না-ই বা মিলুক, না-ই বা চিঠির জবাব দিক, মা-কে চিনতে আদিত্যের একটুও দেরি হবে না।

এমনি করে ক'টা উদাসীন দিন কাটিয়ে, সেদিন ইস্কুলে, টিফিনের সময়, আদিত্য কম্পাউণ্ডের একধারে দাঁড়িয়ে একদল ছেলের গুলি-খেলা দেখছে হঠাৎ কা'র চোখের এক ঝলক তীব্র আলো এসে পড়লো তার মুখের উপর: আদিত্য চমকে উঠলো অলক্ষ্যে। তাকিয়ে দেখলো, রাস্তার ধার থেকে কে একজন স্ত্রীলোক হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আদিত্যকে কারুর বলে দিতে হ'ল না, নির্ভুল পায়ে, আস্তে-আস্তে, যেন একটা অচেতন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে, সে এগিয়ে আসতে লাগলো—যতোই এগিয়ে আসতে লাগলো, ততোই তার স্পষ্টতর মনে হতে লাগলো, মা রয়েছে দাঁড়িয়ে। ঠিক সেই পোশাক, সেদিনের মতো চুলগুলি তেমনি খোলা, মুখে তেমনি সেই মিঠে-মিঠে হাসি।

শ্রীপর্ণা হাত বাড়িয়ে আদিত্যকে ধরে ফেললো।

পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, একটায় ফিতে জোটেনি বলে দড়ি দিয়ে বাঁধা, হাঁটু অবধি ধুলো, তার উপরে জিনের একটা প্যাণ্ট, প্রায় খাকি হয়ে উঠেছে, শার্টের বুক-পকেটটা ছিঁড়ে আধখানা পড়েছে ঝুলে, বোতামগুলো আছে কি নেই, ঘাড়ের চুলগুলি উঠে গেছে খাড়া-খাড়া,—শ্রীপর্ণার বুকটা হু-হু করে উঠলো। মুঠির মধ্যে তার ভেজা ছোট্ট হাতখানি নিবিড় করে ধরে জিগ্‌গেস করলে: আমাকে চিনতে পাচ্ছ?

সুখের অসহ্য লজ্জায় আদিত্য যেন ম্লান হয়ে গেলো। বললে—হ্যাঁ।

—কে বলো তো?

—মা।

শ্রীপর্ণা হাসলো : কী করে চিনলে?

আদিত্য যেন ফাঁপরে পড়লো। পরে হঠাৎ মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শ্রীপর্ণার মুখের দিকে বিস্ফারিত দুই চোখ তুলে বললে,—কী করে চিনবো! মাকে লোকে কী করে আবার চেনে?

—তোমার জন্যে এ কী এনেছি দেখ। একটু সরে গিয়ে শ্রীপর্ণা চাদরের তলা থেকে এনামেলের একটা কৌটো বার করলো, খুলে ফেললো কাপ্‌টা, থরে-থরে নানারকমের খাবার সাজানো : টিফিনের সময় তোমার খিদে পায় না? কী খাও রোজ?

—কিছু না। কিন্তু, মা'র হাতের খাবারের চেয়ে মা'র এখানে এই অহেতুক আসাটাই যেন তার কাছে বেশি আশ্চর্য লাগছে : কিন্তু তুমি এখানে কী করে এলে?

—কেন, বাস্‌-এ চড়ে।

—ধ্যেৎ! কথাটা আদিত্য বিশ্বাস করতে পারলো না।

—কেন, বাস্‌-এ চড়ে আসা যায় না?

—বা, তুমি রেলগাড়ি চড়ে আসবে বলে আমি কতদিন ইষ্টিশানে বসে গাড়ি দেখতুম। যাও, কক্ষনো না। অতো দূর দেশ থেকে কেউ বুঝি কখনো বাস্‌-এ আসতে পারে? রাস্তা কোথায়?

—দূর দেশ নয়, আমি তো কাছেই থাকি।

—কাছেই থাকো? আদিত্য যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো : কদ্দূর?

—চলো, সেখানে যাবে না তুমি?

আদিত্য একবাক্যে সাড়া দিয়ে উঠলো : যাবো। কিন্তু আমার যে এখন ইস্কুল! ঐ যাঃ, ঘণ্টা পড়ে গেলো। কী হবে?

আঙুলের চাপে শক্ত করে তার হাতটা ধরে রেখে শ্রীপর্ণা বললে,—পড়ুক ঘণ্টা! তুমি আগে এখন এগুলো খেয়ে নাও। পরে আমরা বাস্‌-এ করে বাড়ি যাবো দু'জনে।

আদিত্য ছট্‌ফট্‌ করে উঠলো : মাস্টারমশাইকে তা হ'লে বলে আসি গে।

—কী বলে আসবে ?

—আমার মা এসেছে, আনন্দে আদিত্যর দুই চোখ জ্বলে উঠলো : মা'র সঙ্গে আমি বাড়ি যাচ্ছি, মাস্টারমশাই। ছাড়ো, একবারটি চেঁচিয়ে বলেই আমি ছুটে আসবো। তোমার ভয় নেই!

শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো : না, তোমাকে কিছু বলতে হবে না।

—না বলে এলে কাল যে আমাকে ভীষণ মারবে। তুমি জানো না, মা, গুপী সেদিন না বলে বাড়ি চলে গিয়েছিলো বলে মাস্টারমশাই ওকে পরদিন কী মারটাই মারলে, বেঞ্চির উপর নিল-ডাউন করিয়ে রাখলো।

—তোমাকে মারবে না। আমি তোমাকে আরেকটা নতুন ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবো।

—কিন্তু আমি সব বই কিনে ফেলেছি যে। ছাড়ো, ছাড়ো, আদিত্য হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠলো : সব বই আমার ডেস্কের উপর পড়ে রয়েছে—আমার বাংলা, ইংরিজি, ভূগোল—হাতের-লেখা, আমার ড্রয়িং-খাতা—

শ্রীপর্ণা একটুও আলগা দিলো না : তোমাকে আমি আবার সমস্ত কিনে দেবো—পড়ার বই, ছবির বই, অনেক-অনেক বই, যতো তুমি চাও। নতুন ইস্কুলে ও-সব বই তোমার কিছু কাজে লাগবে না।

বাস্-এ ওঠবার সামান্য রাস্তাটুকু দু'জনের এলোমেলো কথায়, টুকরো-টুকরো হাসিতে ঝিক্‌মিক্ করে উঠলো।

ভেঙে-ভেঙে খাবার খেতে-খেতে আদিত্য ভরা মুখে জিগ্‌গেস করলে : আচ্ছা মা, তুমি কী করে বুঝলে বলো তো, আমি তোমাকে রোজ রাত্রে শুয়ে-শুয়ে ডাকতুম, আসতে বলতুম আমার কাছে—

—আমিও যে শুয়ে-শুয়ে সে-ডাক স্পষ্ট শুনতে পেতুম, তাই তো চলে এলুম তোমাকে নিয়ে যেতে।

—আচ্ছা মা, তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে বলো না ?

—জানো না ? শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো : আমি যে মরে গিয়েছিলুম মাঝখানে।

—যাঃ, হাত বাড়িয়ে মাকে আদিত্য আঁকড়ে ধরলো : মরে গেলে বুঝি আবার বেঁচে ওঠা যায় ? তারপর কী যেন সে অনেকক্ষণ ভাবলে ; বললে,—তোমার বুঝি আরেকটা বাড়ি আছে ? সেই বাড়িতেই বুঝি আমরা যাচ্ছি ?

কিন্তু আমার বাক্সটা তো নিয়ে এলে না, মা? সেটার মধ্যে যে আমার পয়সা ছিলো!

—তোমার জন্যে নতুন বাক্স কিনে দেবো দেখো, তাতে অনেক খোপ থাকবে, ধরবে অনেক পয়সা।

—কিন্তু তুমি সেই হাতের-লেখার খাতাটা আনতে দিলে না মা, ওটার মধ্যে তোমার কতো চিঠি ছিল।

—চিঠি?

—হ্যাঁ, কতো চিঠি লিখেছি তোমাকে। মজা পেয়ে আদিত্য লাফিয়ে উঠলো: সে-সব চিঠি তো আর তুমি পড়তে পাওনি! তা ছাড়া—আদিত্য লজ্জায় হঠাৎ মুষড়ে গেলো: সেটা কিছুতেই বলবো না।

—কী? বলো, আমাকে তো বলবে। মাকে বলতে কী দোষ?

—ও বাবা, সে আমি কিছুতেই পারবো না বলতে।

—না বল্‌লেও আমি ঠিক জানতে পারবো দেখো।

—কী করে জানবে? আদিত্য ভীত, সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো: ড্রয়িং খাতাটা তো সেই ইস্কুলেই পড়ে আছে।

—মাস্টারমশাইকে বলে আনিয়ে নেবো বাড়িতে। শ্রীপর্ণা হাসলো: সমস্ত পৃষ্ঠাগুলি উল্টে উল্টে দেখে নিলেই হবে।

—বা, কী আর এমন আছে ওতে! আদিত্য শুকনো গলায় বল্‌লে,—মন থেকে তোমার শুধু একটা ছবি এঁকেছিলুম বই তো নয়। দাদু সেটা দেখে ফেলেছিল, বললে: কী করছিস রে বসে-বসে? বললুম: ছবি আঁকছি। দাদু ঝুঁকে পড়ে বললে: কিসের? সত্যি কথাই বললুম: মা'র। যেই এই কথা শোনা, তোমাকে বলবো কী মা, আমাকে দাদু কী মারটাই মারলে! এই দেখ, আদিত্য তার বাঁ হাতের জামার হাতাটা গুটোতে লাগলো: এই যে।

—তারপর ছিঁড়ে ফেলে দিলো পৃষ্ঠাটা?

—না, ছেঁড়ে নি, কেনই বা ছিঁড়বে? আদিত্য সরলতায় বিস্তৃত দুই চোখে হেসে ফেললো: সেটা যে কিছু হয় নি, মা!

ঝরঝরে দেহ নিয়ে ঝাঁকুনি দিতে-দিতে বাস্ ছুটে চললো।

নিরঞ্জন যখন রাত করে বাড়ি ফিরলো, উপরে এসে তার চক্ষুস্থির:

বারান্দায় আসন পেতে স্তূপীকৃত প্লেটে-বাটিতে কে একটা ছেলে খেতে বসেছে, আর তার সামনে বসে শ্রীপর্ণা সশব্দে হেসে, সোল্লাসে কথা বলে, ছড়িয়ে পড়ছে অনর্গল।

নিরঞ্জন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। বললে,—এ কে ?

শ্রীপর্ণা খোলা চুলে এলোমেলো হয়ে বসে ছিল—এতোখানি রাত, তবু সে এখনো চুল বাঁধেনি, তাড়াতাড়ি আঁচলটা সম্বৃত করে মাথায় ছোট একটা ঘোমটার মতো করে তুলে দিয়ে বল্‌লে,—আদিত্য।

এ ছাড়া আর কোনো উত্তরের সম্ভাব্যতা ছিল না, তবু কী কারণে কে জানে, নিরঞ্জনের মুখ কালো, কুটিল হয়ে উঠলো। যতোদূর সম্ভব প্রাত্যহিক আলাপের সুরটা বজায় রাখবার সে চেষ্টা করলো : একে কোথায় পেলে কুড়িয়ে ?

—ঈশ্বরে বিশ্বাস করো ? শ্রীপর্ণা গলার অদ্ভুত ভঙ্গিতে তার দিকে মুখ তুলে চাইলো ; ঈশ্বর দিয়ে গেছেন।

—ঈশ্বরের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। আজো গিয়েছিলে বুঝি ইস্কুলে ? একটু-একটু করে গলাটা তার এখন হোঁচট খেতে লাগলো : তোমায় সেদিন বারণ করে দিলুম না ?

—বা রে, সেখানে না-গেলে ওকে পেতুম কী করে ?

—গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলে ?

—একটা কারখানায়, আরেকটা তুমি নিয়ে গেছ।

—তবে কিসে, বাস্‌-এ গিয়েছিলে বুঝি ?

—অগত্যা।

—সাধারণ পাঁচজনের ভিড়ে বসে তোমাকে বাস্‌-এ যেতে বারণ করে দিই নি ? নিরঞ্জন হিংস্র একটা কটাক্ষ করলে : ফোনে আমাকে জানালে না কেন ? গাড়ি আমি পাঠিয়ে দিতুম।

—থাক্, এখন আর আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসো না। শ্রীপর্ণা নিচু হয়ে হঠাৎ পরের তরকারি দিয়ে আদিত্যর ভাত মেখে দিতে লাগলো : আজ আর এখন আমার কথা-কাটাকাটি করবার সময় নেই।

নিরঞ্জন তবু নড়লো না। বিশাল একটা বাধার মতো তার গুরুভার উপস্থিতি নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—কী এমন দাঁড়িয়ে আছো এখানে ? ঘরে যাও, ধড়া-চুড়োগুলো ছাড়ো গে এবার। শ্রীপর্ণা তাকে যেন দু'হাতে ঠেলতে লাগলো : তুমি এমন দাঁড়িয়ে আছো বলে ও কিছু খেতে পাচ্ছে না।

নিরঞ্জন তবুও দাঁড়িয়ে রইলো।

—বললুমই তো আর যাবো না, বাস্-এ করে যাবার আর দরকারো নেই আপাততো। কিন্তু, শ্রীপর্ণা খিলখিল করে হেসে উঠলো : আমার যা এখন ফুর্তি হচ্ছে, তার সম্মান রাখার জন্যে আমাকে তোমার এখুনি একটা এরোপ্লেন কিনে দেয়া উচিত ! উঃ, মানুষের টাকা থাকাটা কী শাস্তি, কী বাধা ! সামান্য একটা বাস-এ পর্যন্ত চড়া যাবে না।

নিরঞ্জন পাশ কাটিয়ে ঘরে চলে গেলো।

—আগে ভাবতুম টাকা থাকলে পৃথিবীতে সব কিছুই বুঝি করা যায়, শ্রীপর্ণার কথাটা গলানো, গরম খানিকটা সিসের মতো নিরঞ্জনের কানে এলো : কিন্তু এখন দেখছি অনেক কিছুই করা যায় না।

এক হিসেবে তবু এ একরকম ভালোই হয়েছে বলতে হবে—নিরঞ্জন মেজাজটা তাই হঠাৎ চড়তে দিলো না। শ্রীপর্ণা যে শেষ পর্যন্ত তার দৃষ্টিকেন্দ্রটা পরিষ্কার দেখতে পেরেছে, তার যুক্তির কাছে অন্তত স্বীকার করেছে যে একটা মৌখিক বশ্যতা, এতেই সে যথেষ্ট নরম হয়ে এলো। ভালোই হলো—ছেলের জন্যে আর তাকে এমনি বনে-বাদাড়ে ছুটতে হবে না ; ভালোই হলো, দুপুরের ফাঁকাটা সে ভরে তুলতে পারবে অনায়াসে !

কোটটা খুলে রেখে খালি-মাথায় আবার সে বেরিয়ে এলো। টাইটার ফাঁস ছাড়াতে-ছাড়াতে বললে,—তুমি তো আহ্লাদে খুব ডগমগ করছ, ওদিকে ও-বাড়িতে এতোক্ষণে কী দারুণ কান্নাকাটি পড়েছে কিছু খেয়াল আছে ?

শ্রীপর্ণা বললে,—সে-কান্না এমন কিছু শোনবার মতো নয়। তোমার ভয় নেই, যুগলবাবুকে দিয়ে চিঠিতে আমি খবর পাঠিয়েছি।

—কী লিখেছ শুনি ?

—কী আবার লিখবো ! লিখেছি : আমার ছেলে, আমার কাছেই আছে। আমার কাছেই থাকবে। চিন্তার কোনো কারণ নেই।

—তবু তার মধ্যে কেমন একটা ভিক্ষার গন্ধ থেকে গেছে। নিরঞ্জন

ঠাট্টার স্বরে বললে,—যাই হোক্, জোর করে নিজেকে জাহির করে তো নিয়ে আসতে পারলে না, সেই লুকিয়ে, চুরি করে, কৌশল করে—

শ্রীপর্ণার গলাটা জ্বালা করে উঠলো : কী করলুম, তার চেয়ে কী পেলুম, কী হলুম, সেইটেই আমি বেশি দামী মনে করি। পথের চেয়ে প্রাপ্তি। শেষ পর্যন্ত কোথায় এসে দাঁড়ালুম আমি! তুমি টাকা দিয়ে যা পাও, সেই সুখ, তা আরেকজন তার দারিদ্র্য দিয়েও পেতে পারে। সেই পাওয়ার কাছে তোমার টাকা ও তার দারিদ্র্য কিছুই এসে যায় না। কিন্তু তুমি এখান থেকে যাও, ওকে খেতে দাও পেট ভরে।

নিরঞ্জন আদিত্যর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—ছেলেটি কিন্তু দেখতে বেশ ইন্‌টেলিজেণ্ট।

শ্রীপর্ণার গায়ে যেন খুশির হাওয়া দিলো : হবে না? যেন একটু গর্বের সঙ্গে গ্রীবা হেলিয়ে বললে,—কার ছেলে?

মুহূর্তে নিরঞ্জন যেন মিইয়ে গেলো, চারদিক যেন এলো কুয়াশায় বিমর্ষ হয়ে। নিজেকে যেন সে এই স্বরের সঙ্গে মেলাতে পারলো না; মাতা-পুত্রের এই উৎসবের মাঝখানে সে যেন একটা অর্থহীন ছন্দপতনের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরের দিকে ফিরে যেতে-যেতে নিরঞ্জন আরেকটা কটাক্ষ করলো : কিন্তু একধার থেকে এতো খেতে দিচ্ছ কেন? অসুখ করবে যে। দেখো, একদিনেই একেবারে ফতুর হয়ে যেয়ো না।

সেই সুর, নিরঞ্জন লক্ষ্য করলো, বাড়ির প্রতিটি বাতাসে উঠেছে বেজে। ঘর-দোরের কেমন সব হঠাৎ অদল-বদল হয়ে গেছে, জিনিসে-আসবাবে নতুন ছিরি-ছাঁদ। কে যেন আজ এসেছে অতিথি, প্রতিটি দেয়ালে সেই কথা লেখা। সেই ওধারের বাড়তি ঘরটাই হয়েছে আদিত্যর থাকবার, পাতা হয়েছে নিচু একটা খাট, খাটের উপর বিছানা, যেন সাদা একটা ফুল রয়েছে ফুটে, পড়বার ছোট টেবিল-চেয়ার, বাক্স বলতে টেবিলের সেই দেরাজ দুটোই তার যথেষ্ট, দেয়ালে, ব্র্যাকেটে ঝুলছে তার জামা-কাপড়। নিরঞ্জন অবাক হয়ে গেলো : একদিনে, এরি মধ্যে এতো সব সে জোগাড় করলো কোত্থেকে? এদিক-ওদিক একটু পাইচারি করে আবার এসে ঢুকলো সে তার নিজের ঘরে। এতোক্ষণ তার দিকে যেন সে ভালো করে চেয়েই দেখেনি। নিরঞ্জন থম্‌কে দাঁড়ালো,

সমস্ত ঘরটা যেন মোছা একটা শ্লেটের মতো শূন্য। বিছানাটা এখনো পাতা হয় নি সেই সফেন উদ্বেলতায়, ড্রেসিং-টেব্‌লটাতে যেন বিশৃঙ্খল একটা হাট বসেছে, আলনাতে কাপড়-চোপড়গুলির সেই গুচ্ছীকৃত পারিপাট্য নেই, বই একটা পড়তে-পড়তে চেয়ারের হাতলের উপর উপুড় করে ফেলা দুই মলাটের মাঝখানে। হাওয়ায় দেয়ালের একটা ছবি যদি পেরেকের থেকে সামান্য একটু বেঁকে যায় একদিকে, সেই অণুতম অসামঞ্জস্যটি পর্যন্ত শ্রীপর্ণার চোখ এড়ায় না: কিন্তু, আজ, এখন, মশারির চালের খানিকটা পড়েছে ঝুলে, তোয়ালেটা জায়গায় না থেকে বাথরুমের দরজার উপরে তোলা, তাড়াতাড়িতে পাউডারের কৌটোটার কাপ লাগানো হয় নি। যেন কে এ-ঘর থেকে গেছে চলে—নিরঞ্জন হাঁটতে-হাঁটতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো: সে-কথা যেন সে স্পষ্ট পড়তে পারলো আয়নার অতল, নিশ্চিহ্ন শূন্যতায়।

নিরঞ্জনের সহ্য হলো না, দরজার কাছে না গিয়েই সে চেঁচিয়ে উঠলো: আমার ঘরটা এমনি নরক হয়ে থাকবে নাকি?

শোনা গেলো শ্রীপর্ণার হালকা গলার টান, বনের মুক্তিতে পাখির ডাকের মতো: এই আসছি।

এই সময়, কালকেও, নিরঞ্জন যখন আপিস থেকে ফিরেছে, ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে উগ্র উন্মুখর একটি স্তব্ধতা। ততোক্ষণে শ্রীপর্ণা শেষ করেছে তার সজ্জা, প্রতীক্ষায় সমস্ত ভঙ্গিটি তার ধনুকের ছিলার মতো তীক্ষ্ণ। ততোক্ষণে সে বসেছে এসে চেয়ারে, কিংবা দাঁড়িয়েছে এসে জানলায়: ঝল্‌মল্‌ করছে তার শাড়ি, ঝিক্‌মিক্‌ করছে তার গয়না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্রমাবতীর্যমান লাবণ্যে সে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে একটা তলোয়ার। নতুন বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে সেই তার সৌন্দর্যের চিক্কণ, তীক্ষ্ণ জলধারা। তারপর সেই স্তব্ধতা কেমন ভেঙে বিদীর্ণ হয়ে গেছে হাসির বিদ্যুতে, নিরঞ্জন যখন উপরে উঠে এসেছে, সেই হাসির বৃষ্টি কেমন অবিশ্রান্ত ঝরে পড়েছে তার চোখের উপর, মুখের উপর, ঘনায়মান আকাশ থেকে তৃষার্ত মৃত্তিকায়। তারা তারপর একসঙ্গে খেয়েছে চা, একটি হয়তো ঘণ্টা, নিটোল নিঃশব্দ একটি মুহূর্ত: বেরিয়ে পড়েছে মোটরে, প্রখর অসমাপ্তিতে। আজ হঠাৎ যে এ কী হয়ে গেলো নিরঞ্জন কিছু আয়ত্ত করতে পারলো না। পৃথিবী যেন তার কক্ষ বদলেছে, ঘড়ি তার সময়ের পরিমাপ। শ্রীপর্ণা এখনো কিছুই সাজগোজ করে নি,

একপিঠ খোলা চুলে ছড়িয়ে রয়েছে তার নির্লিপ্ততা। তার রেখায় নেই আর যেন সেই উচ্চকিত প্রতীক্ষা, তার চোখে সেই সুকোমল অধৈর্য। তার মুখ আজ কেমন গম্ভীর, চোখ দু'টি কেমন ঠাণ্ডা, সমস্ত শ্রী-টি কেমন স্তিমিত। শীতের পাতার মতো তার শরীর এসেছে হলদে, শিথিল হয়ে। নিশ্বাসের মধ্যে হঠাৎ সেই শীতস্পর্শ পেয়ে নিরঞ্জন শিউরে উঠলো। ঘরের সমস্ত আলো-হাওয়া বন্ধ করে কে যেন তাকে এই তার মৃত্যু-আর্ত নির্জনতায় বন্দী করে রেখেছে।

চা নিয়ে শ্রীপর্ণা ঘরে ঢুকলো। পরনে আটপৌরে একটা শাড়ি, জমিটা অবিশ্যি সাদা, গায়ে না থাকলে নয় এমনি দু'টো খুচরো গয়না, কপালে সিঁদুর আছে কি নেই তা জানবার জন্যে একটা অণুবীক্ষণ লাগে। হঠাৎ সে কতো সাধারণ, কতো গরিব হয়ে পড়েছে।

নিরঞ্জন রুক্ষ গলায় জিগ্‌গেস করলে: তোমার চা কৈ?

শ্রীপর্ণা যেন এক পা চৌকাঠের বাইরে বাড়িয়ে রেখেছে। বললে,—আমার অনেক কাজ, আমি পরে খেয়ে নেবোখন।

নিরঞ্জন চায়ের বাটিটা স্পর্শও করলো না। বললে,—এখনো কিছু তৈরি হও নি যে?

শ্রীপর্ণা হক্‌চকিয়ে গেলো: কেন, কী আবার তৈরি হবো!

—সাজগোজ করো নি যে কিছু?

শ্রীপর্ণা নিজের গায়ের উপর দিয়ে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলো: কেন, এ এমন কী মন্দ সাজ! এতে তো বেশ পতিব্রতাই দেখাচ্ছে, শ্রীপর্ণা হেসে ফেললো: বেশ ভদ্র ও স্বাভাবিক। বুঝছো না, শ্রীপর্ণা নিরঞ্জনের পাশ ঘেঁষে একটু সরে আসতে চেষ্টা করলো: একেবারে এক লাফে ভীষণ জমকালো হয়ে উঠতে পারি না, আদিত্যর হয়তো ধাঁধা লেগে যাবে। বুঝছো না, আস্তে-আস্তে—

—সে-কথা তোমাকে কে বলছে? নিরঞ্জন ধমকে উঠলো: আজ আমাদের মিসেস দে-র ওখানে নেমন্তন্ন ছিলো না? ক'টা বেজেছে কিছু খেয়াল আছে?

—হ্যাঁ, শ্রীপর্ণা চম্‌কে ভুরু দুটো টান করে বললে,—একদম মনে ছিলো না তো।

—মনে ছিলো না তো তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও। দেরি যখন হলোই, আরো একটু হতে পারবে। ড্রেস করে নাও ভালো করে। কথাটা বলে ফেলে নিরঞ্জন হাত বাড়িয়ে চায়ের বাটিটা ধরতে গেলো।

—কিন্তু কী করে আমি আজ যাই?

—কী করে যাবে মানে? নিরঞ্জনের হাতের ঠেলা লেগে বাটি থেকে খানিকটা চা টেবিলের উপর চলকে পড়লো: সেদিন না তাদের কথা দিয়ে এলে মুখের ওপর?

শ্রীপর্ণা লাজুক চোখে ইতস্তত করতে লাগলো: হ্যাঁ, বলেছিলুম বটে। কিন্তু কী করে যাই বলো? আদিত্য আজ এসেছে।

—তাতে কী? আওয়াজটা যেন নিরঞ্জন তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলো।

যেটুকু মিটিমিটি জ্বলছিলো, শ্রীপর্ণা তা-ও নিবে গেলো আস্তে-আস্তে; কালো, গম্ভীর মুখে বললে,—তুমি একাই যাও।

—আমি একা যাবো মানে? নিরঞ্জন আরেক পর্দা উঁচুয় উঠে গেলো: কোনোদিন আমি একা গেছি? আমার তো একার নেমন্তন্ন হয় নি, আমার সস্ত্রীক নেমন্তন্ন হয়েছে।

—কিন্তু সব দিনই তো সমান যায় না মানুষের। শ্রীপর্ণা যেন অসম্পৃক্ত হয়ে দাঁড়ালো তার বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বে: আমি আজ যেতে পারি কী করে? আমিও তো আজ একা নই! আর, শ্রীপর্ণা নিরঞ্জনের মুখের দিকে পরিপূর্ণ করে তাকালো: আর আদিত্যকেও তো নিয়ে যেতে পারি না সেখানে।

—নুইসেন্স! নিরঞ্জন ঘিন্‌ঘিন্‌ করে উঠলো: ওকে নিয়ে যাবে কী? ওকে রেখে যাবে। যাও, তার স্বরটা উলঙ্গ একটা আদেশের মতো শোনালো: তাড়াতাড়ি শাড়ি বদ্‌লে এসো, আর বেশি দেরি করা যাবে না।

—কিন্তু তা হয় না। শ্রীপর্ণা শান্ত কণ্ঠে বললে।

—কী হয় না?

—আদিত্য আজ নতুন এসেছে, ওকে আমি একলা ফেলে রেখে কোথাও যেতে পারবো না।

—য়্যাদ্দিন ও কোথায় ছিলো? নিরঞ্জন এখন একেবারে খেঁকিয়ে উঠলো: য়্যাদ্দিন ওকে কোথায় ফেলে রেঁখেছিলে?

—যেইখেনেই হোক, এমন একটা অনাত্মীয় নির্জনতায় নয়। অসম্ভব,

শ্রীপর্ণা ঘর থেকে চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো: ওকে ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা আজ আমি ভাবতেই পারছি না। ও কী ভাববে? কার সঙ্গে কথা কইবে? শ্রীপর্ণা দরজার বাইরে চলে গেলো: তুমি একাই যাও। আমার জন্যে কী!

নিরঞ্জন একাই গেলো। মিসেস দে-র সান্ধ্য সম্মিলনে অবিশ্যি নয়, এখানে-সেখানে, পথে-পথে। তীব্র, আর্ত একটা হাহাকারের মতো সে মোটর ছুটিয়ে দিলে। কোথায় সে যাবে তার ঠিক নেই, বেগস্খলিত, অন্ধ একটা উল্কার মতো সে নির্লক্ষ্য ছুটে চলেছে। কোন অদৃশ্য শত্রু তাকে তাড়া করেছে পিছন থেকে, যতদূর সে যায়, ততদূর পর্যন্ত তার চক্ষু। কিছু সে ভাবতে পারছে না, কোথাও সে থামতে পারছে না, চলেছে এমনি গতির অব্যাহতিতে। যতো যায়, ততোই যেন বেড়ে যাচ্ছে তার পথ, বেড়ে যাচ্ছে তার বর্তমান, অন্ধকার ততোই ক্রমে দুর্বহতরো হয়ে উঠছে।

তাকেও এক সময়ে থামতে হলো।

বাড়ি ফিরে এসে—আজ আর সে আপিস-ঘরে ঢুকলো না—সোজা, চোখ বুজে চলে এলো শোবার ঘরে। ঘরটা অন্ধকার, হাত বাড়িয়ে সে স্যুইচ টানলে। মৃতের অট্টহাসির মতো সেই তীব্র আলো বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লো। আজ আর শ্রীপর্ণা তার বর্ণাঢ্য আলস্য নিয়ে শুয়ে নেই, নেই আর সেই তার রুপোলী জলের উপর তরল একটি ঘুমের প্রশান্তি, নেই আর সেই প্রতীক্ষার কোমল উষ্ণতা। জামা-কাপড় ছেড়ে অভ্যাসচালিতের মতো নিরঞ্জন ঘুমের পোশাক পরলো। সময় করে শ্রীপর্ণা ঘরটা একসময়ে গুছিয়ে গেছে বটে, সাদা চোখে দেখে কোনো খুঁতই বার করা যাবে না—হাতের কাছাকাছি ছোট একটা টোপ দিয়ে খাবার ঢেকে রেখেছে পর্যন্ত, যদি, ধরো, ভুল করে তখন সে উপস্থিত থাকতে না পারে। সুবিধের দিক থেকে সমস্ত-কিছুই সাজানো-গোছানো, য়্যাশ-ট্রেটি পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝক্ করছে। শ্রীপর্ণাকে একটিবার ডাকতে পর্যন্ত হবে না, গ্লাসে করে জল পর্যন্ত সে ভরে রেখে গেছে। পান সে খায় না, তবু দু'টি পান,—যদি আজ তার হঠাৎ খেতে ইচ্ছে হয়, যদি সেই অছিলায় তার ডাকতে হয় শ্রীপর্ণাকে। নিরঞ্জন শুকনো, কঠিন চোখে ঘরময় সেই প্রাণহীন পরিচ্ছন্নতার দিকে তাকিয়ে রইলো। মাঝে শ-ওআলেস্‌এ গিয়ে হালকা কিছু সে খেয়ে নিয়েছিল বটে, কিন্তু তার বাঙালি ক্ষুধায় আরো

কিছু সে মুখে তুলতে পারতো, যদি এখন শ্রীপর্ণা তার কাছে বসে থাকতো সেই তার ঘুমবিজড়িত রমণীয়তায়। ঘাসের চটি দুটো পা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিরঞ্জন বিছানায় শুয়ে পড়লো। আলো নেভাবার কথা মনেই হলো না, দরজা রইলো তেমনি হাট করা। আলো নেভাবার কথা তার নয়, তাদের মিলনের প্রথম পরিচ্ছেদটা, গল্প-গুজব, এমনি আলোর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতো: দরজা বন্ধ করবারো কোনো দরকার ছিল না, তাদের দু'য়ের মাঝখানে ছিল না তখনো কোনো দরজার ব্যবধান। কিন্তু সব দিনই মানুষের সমান যায় না, শ্রীপর্ণার কথাটা এখনো নিরঞ্জনের কানে বাজছে। অগত্যা তাকেই আজ আলোটা নিবিয়ে দিতে হবে। অন্ধকারে মুছে দিতে হবে এই প্রখর পরিহাস।

শোয়া ছেড়ে নিরঞ্জন উঠতে যাচ্ছিলো, দরজার ওপারে কার শাড়ি উঠলো খস্‌খসিয়ে। নিরঞ্জন প্রাণপণে চোখ বুজে রইলো।

—এ কী, কখন এলে ?

নিরঞ্জন ঘুমে একেবারে অসাড়।

শ্রীপর্ণা তার মাথায় একটু ঠেলা দিলো: 'কী, খেলে না যে ?

—কী বিরক্ত করো ? নিরঞ্জন খেঁকিয়ে উঠলো: ঘুমুতে দাও।

শ্রীপর্ণা দূরে সরে দাঁড়ালো। বললে,—মশারিটা ফেলে দেবো ?

—দরকার নেই।

—আলোটা এমনি জ্বালা থাকবে ?

নিরঞ্জন কর্কশ কণ্ঠে বল্‌লে,—জানি না।

—শোনো। কী কথা বলতে গিয়ে শ্রীপর্ণা থেমে গেলো।

নিরঞ্জন টুঁ একটা শব্দ করলো না। ঘুমে একেবারে সে ভেসে যাচ্ছে।

—শোনো, শ্রীপর্ণা স্নিগ্ধ গলায়, একটু-বা অন্তরঙ্গতার স্বর মিশিয়ে বললে,—আমি আজ আদিত্যর কাছে শুচ্ছি।

নিরঞ্জনের একটি নিশ্বাস পর্যন্ত শোনা গেলো না।

শ্রীপর্ণা দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। বললে,—বিছানায় আমাকে না দেখতে পেলে ও হয়তো কেঁদে উঠবে। একা শুতে ওর অভ্যেস নেই, একা শুতে ওর ভয় করে। তাই—শ্রীপর্ণা দরজার কাছে গিয়ে টুপ করে স্বইচ ঠেলে ঘর অন্ধকার করে দিলো।

এগারো

তারা, নিরঞ্জন আর শ্রীপর্ণা, ছিলো যেন পৃথিবীর প্রথমতম স্বর্গে : পরস্পরের প্রবল সন্নিহিততায়, বিহ্বল আত্ম-পর্যাপ্তিতে। পৃথিবীর সমস্ত নির্জনতা তারা ভরে রেখেছিল, তারা দু'জনে, তাদের বাহুমণ্ডলীর মাঝে আকাশ ছিলো সঙ্কুচিত হয়ে। তাদের বাইরে আর কোনো জায়গা ছিলো না, না-বা তাদের মাঝখানে, দিনের রাজত অজস্রতা ও রাত্রির আবৃত রহস্য দিয়ে তারা সুন্দর, সম্পূর্ণ করে রেখেছিল তাদের সৃষ্টি : দিন ও রাত্রির মতো তাদের খরশান দুই অস্তিত্ব, মৃত্যুর তীক্ষ্ণতার মতো, স্রোতের শুভ্রতার মতো, যার বাইরে ছিল না কোনো সত্য, ছিলো না কোনো দেবতা। প্রতিটি মুহূর্তের চিতাগ্নিতে প্রতিটি মুহূর্ত উঠতো পবিত্র হয়ে। তারা ভুলেই ছিল একেবারে যে তাদের বাইরে অরণ্যে আছে কোনো শক্তি, মাঠে আছে কোনো শোভা, অন্তরীক্ষে কোনো বিস্ময়। তাদেরই পরস্পরের সংস্পর্শে ছিল তারা শক্তিমান, দৈবত শক্তিমান ; ছিল তারা সুন্দর, শ্যামায়িত সুন্দর ; ছিল তারা অপরূপ, অসমাপ্য অপরূপ। সময়ের সমুদ্রের তীরে তারা ছোট-ছোট মুহূর্তের ঝিনুক নিয়ে খেলা করতো। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারতো কখন উঠেছে সূর্য, কখন জেগেছে ঝড়, কখন নেমেছে অন্ধকার। তারা ছিল মাটির নৈকট্যে, আকাশের ঘনিষ্ঠতায় : তাদের দু'জনকে নিয়ে ছিলো পৃথিবীর অসীম দিগন্ত-বিস্তার। তারা ছিল পরস্পরে আচ্ছন্ন, আকাশ আর পৃথিবীর মতো, পরস্পরে নিরন্তরাল। তাদের জীবনে ছিল মৃত্যুর তীব্রতা, শরীরে ছিল ঈশ্বরের উপস্থিতি।

কিন্তু সেই স্বর্গে, সৃষ্টির সেই শৈশব স্বর্গে, কোথা হতে একটা সাপ এসে ঢুকেছে। ধূর্ত, বিষাক্ত একটা সাপ। তার নিশ্বাসে স্বর্গ এসেছে ম্লান হয়ে। তাদের শরীর হয়ে এসেছে অস্থি-র একটা সন্নিবেশ, রক্তের একটা ধারা, হৃৎপিণ্ডের একটা স্পন্দন—দিন-অতিবাহনের একটা যন্ত্র। সেই সমুদ্র দাঁড়িয়েছে একটা জলাশয়ে। মৃত্যুতে নেই আর সেই কল্পনার সমারোহ, মৃত্যু যেন আগামী কালের একটা সাধারণ ঘটনা। আকাশ যেন একটা ভার, পৃথিবী

যেন একটা জিনিস। তারা দুইজনে, নিরঞ্জন আর শ্রীপর্ণা, যেন নিমেষে শিকড় ছেড়ে চলে এসেছে শাখায়, বহুলীকৃত পাতার অন্তরালে: তাদের মাঝে এসেছে এখন লজ্জা, অশুচি লজ্জা, এসেছে ভয়, অশরীরী ভয়, এসেছে সন্দেহ, সর্পিল, শীতল সন্দেহ। পর্বতের সেই বিচ্ছিন্ন, সঙ্কীর্ণ চূড়া থেকে তারা নেমে এসেছে দৈনন্দিন সমতলতায়: সাধনাকে নিয়ে এসেছে একটা প্রাণহীন প্রসাধনের পর্যায়ে, জীবনকে নিয়ে এসেছে বিস্তৃত একটা সুবিধের ধারাবাহিকতায়। যেন জাহাজ ডুবছে, তারা দুইজন পাশাপাশি রেলিঙ ধরে আছে দাঁড়িয়ে, কেউ কিছু বলতে পারছে না, পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁজছে আশ্রয়, খুঁজছে সহানুভূতি। দু'জনেই একলা, এতো কাছাকাছি থেকেও, নীচে জল উঠেছে শুধু ফেনিল হয়ে। এই কয়েকটা শুধু মুহূর্ত, নিরঞ্জনের স্নায়ু-শিরা ঠাণ্ডা একটা ভয়ে সির্‌সির্‌ করে উঠলো, তারপরেই জলের অচঞ্চল বিস্তীর্ণ একঘেয়েমি।

ব্যাপারটা যে কী করে কী ঘটে উঠলো নিরঞ্জন প্রথমটায় কিছু আয়ত্ত করতে পারলো না। সামান্য একটা ছেলে কুড়িয়ে পেয়ে শ্রীপর্ণা যেন নিজেকে পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে: হারিয়ে ফেলেছে তার নিগূঢ় সত্তা, তার বিচিত্রতরো সম্ভাব্যতা। একে অতিক্রম করে তার আর কোনো উন্মোচন নেই—এখানেই সে যেন সমাপ্তির রেখা টেনে দিয়েছে, ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে তার বাকি যতো পৃষ্ঠা, মুছে ফেলে দিয়েছে তার সমস্ত সঙ্কেত। এইখানেই সে থেমে পড়লো, এখানেই সে চরিতার্থ। তার জীবনে আর কোনো স্বপ্ন নেই, নেই আর কোনো তীর্থযাত্রা। তার সন্তানের কাছে নিরঞ্জন, যেন দিনের আলোয় একটা বাতি জ্বেলে ধরা মাত্র।

ছোট একটা খুকি পর্যন্ত তার খেলনা নিয়ে এমন মাতে না, যেমন আদিত্যকে নিয়ে শ্রীপর্ণা মেতেছে। হ্যাঁ, তাকে উন্মত্ততাই বলতে হয়, নিরঞ্জনের কাছে মনে হচ্ছিলো, এ একটা অসুস্থ ভাববিকার, প্রায় একটা মানসিক হিস্টিরিয়া। তার চোখের উপর সমস্তটা অভিনয় ঠিক একটা স্থূল প্রহসনের মতো। শ্রীপর্ণা ছেলের জন্যে সংসার থেকে পর্যন্ত খসে এসেছে। আজ হাতে তার অনেক কাজ—তার ছেলে। ঠাকুরকে দু'একটা রান্না সে এখন মাঝে-মাঝে শুধু দেখিয়েই দিতে পারে, নিজের হাতে আর খুন্তি নাড়তে পারে না। ততোক্ষণ তার ছেলে করবে কী একলা, তাকে পড়া বুঝিয়ে দেবে কে? তাকে স্নান করানো, সাজানো-গোছানো, খাওয়ানো-দাওয়ানো—তার

আর এখন অতো সময় কোথায় ? দুপুরবেলা কোনোদিন বা আদিত্যকে নিয়ে জু-তে বেরোতে হয়, ছবির সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখাতে হয় তাকে জন্তু-জানোয়ার, ক্যাঙ্গারু কেমন করে হাঁটে, ভালুকের কেমন জ্বর হয় মিনিটে-মিনিটে, ঐ বানর থেকে কেমন করে আস্তে-আস্তে মানুষ হয়ে উঠেছে। কোনোদিন যায় মিউজিয়মে, কোনোদিন বা জংলি কোনো সিনেমায়। এমন অদ্ভুত, নিরঞ্জনের সম্মানজ্ঞান এতো নিখুঁত যে, এই জন্যে, শ্রীপর্ণার এই সব অসামাজিক শহর-বেড়ানোর জন্যে, তাকে আরেকটা ফালতু মোটর কিনে দিতে হয়েছে। সে-ও তাই তার নিজের মোটরে করে একা-একা শহরে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে-সেখানে, যাবার মতো কোথাও একটা জায়গা আছে কিনা যেতে-যেতে আশে-পাশে তারই কেবল সন্ধান করতে থাকে।

তাই বলে শ্রীপর্ণা নিরঞ্জনের প্রতি কর্তব্যে নিজেকে খাটো করে এনেছে, এ-কথা ভাবতেই পারো না। কী নিরঞ্জনের চাই, সব তার কাছটিতে। ঘুম থেকে উঠতে-না-উঠতেই চায়ের ট্রে-টি সাজানো, স্নান করবার জল ভরা টবে, কখন আজ আপিসে বেরুবে দয়া করে একবারটি বললেই হয়, টেবিলে খাবার তৈরি। প্যাণ্টের ক্রিজ্‌টি থেকে টাইয়ের পিন্‌টি পর্যন্ত নিখুঁত। জুতো তার একদিনো শুকিয়ে থাকে না, চাকরের হাত জোড়া থাকলে শ্রীপর্ণা নিজেই বুরুস করতে বসে। কী তার চাই মুখ ফুটে একবার বলুক না সে, শ্রীপর্ণা একশো হাতে তা এক্ষুনি করে আনবে। কেস্‌-এ সিগারেট পর্যন্ত সে সাজিয়ে রেখেছে। আশ্চর্য, কিছুই আর তার চাইতে হয় না, আশ্চর্য, চাইবার সুযোগ দেবার জন্যে শ্রীপর্ণা কোথাও এতোটুকু খুঁত রাখে নি। স্যোফারটাকে শ্রীপর্ণার জন্যে রেখে সে নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যায় আপিসে, হায়, তার আপিসে! আপিসেই সে আজকাল টিফিন খেয়ে এলে শ্রীপর্ণার দোষ কী, সে তো রোজ রাতে যতোক্ষণ না নিরঞ্জন বাড়ি ফেরে, ততোক্ষণ উপোস করে জেগে বসে থাকে। সে যদি আজকাল রাতের খাওয়া হোটেলেই বন্দোবস্ত করে নেয়, তবে শ্রীপর্ণা কী করতে পারে ? তার দিক থেকে কোথায় কী ত্রুটি হচ্ছে বলো। দিব্যি তার জন্যে সে ধব্‌ধবে নিভাঁজ বিছানা পেতে রেখেছে, মশারি ফেলে তার কোণীয়তম কুঞ্চনটি পর্যন্ত সে গুঁজে দিয়েছে টান করে, ফুলদানিতে গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুল রয়েছে তার প্রতীক্ষায়। নিরঞ্জনের ফিরে আসার সাড়া পেলে শ্রীপর্ণা অনুগামিনী স্ত্রীর মতো সেই ঘরে এসে একটু হাজির হয়, এটা-ওটা যদি কিছু

তার লাগে, এগিয়ে দেবার জন্যে, জানলাটা খোলা থাকবে না বন্ধ করে দেবে, কিংবা আদিত্য যদি কিছু নতুন দুষ্টুমি বা আবদার করে থাকে তার স্বগত ইতিহাস বলতে। এ যেন তার গৃহচর্যারই একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছে, দিনের শেষে গৃহকর্ত্রীর কাছে চাকর যেমন এসে কুণ্ঠিত মুখে বাজারের হিসেব দেয়। কোনো-কোনোদিন বা একটু গল্প ফাঁদতে চেষ্টা করে মিষ্টি একটু হাসি মাখিয়ে, কিন্তু নিরঞ্জন তখুনি যদি মশারি তুলে শোবার উদ্যোগ করে, তবে একতরফা সেই গল্প শ্রীপর্ণা কতোক্ষণ জমাতে পারবে? মাঝে-মাঝে দুয়েকটা সে ব্যক্তিগত কথারো অবতারণা করে, কিন্তু চারপাশে অনুকূল বাতাস না থাকলে কতো আর সে সুতো ছাড়তে পারে জিগ্‌গেস করি? এক-আধবার সে বলেও গম্ভীর হয়ে, যেন কতো গভীর চিন্তার তলা থেকে বলছে: তোমার আজকাল দেখছি খুব বেশি খাটনি পড়েছে, কিন্তু এতো খাটলে শরীর তোমার টিকবে কেন? কিন্তু যার উদ্দেশে এই কথা বলা, কথাটা না শোনার আগেই যদি সে ঘুমে তলিয়ে যায়, তবে তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই অভিযোগ আর কোথায় দাঁড়ায় বলো? অগত্যা সেই নীরবতাকেই শ্রীপর্ণার সম্বোধন করতে হয়—যে-কথাটুকু এখনো বলা তার শেষ আছে। সুইচ-বোর্ডের কাছে এসে সে বলে,—যে-কথা শোনবার জন্যে নিরঞ্জন সমস্ত ঘরে কান পেতে আছে—বলে: আমি এবার চললুম ও-ঘরে। সঙ্গে সে একটি ব্যাখ্যাও জুড়ে দেয়: ঘুমের মধ্যে জেগে উঠে আমাকে পাশে দেখতে না পেলে ও ভারি ভয় পাবে। তারপর আলোটা দেয় নিবিয়ে। আলোটা নিবিয়ে দেবার জন্যেও তো তার একবার আসা উচিত। তারপর—তারপর আবার কী। সারাদিন শ্রীপর্ণাও তো আর কম টো-টো করেনি, ঘুমে একবার ধুয়ে গেলে মানুষের আবার কী দুঃখ! ততোক্ষণই তার জ্বালা, যতোক্ষণ সে জেগে থাকে।

যতোক্ষণ সে জেগে থাকে। নিরঞ্জন জেগে থাকে তার আপিসে, তার টাকার চক্রাকার ঘূর্ণামানতায়। মানুষের সঙ্গে যতো জটিল চুক্তির জালে জড়িত হয়ে। সংসারে কাউকে বিশ্বাস নেই, থাকতে হয় এমনি একটা ধূমময় আতঙ্কিত আবহাওয়ায়। কে তাকে কখন ঠকাচ্ছে, কা'কে সে কখন ঠকাতে পারলো না, এমনি একটা সন্দেহের কলুষিত আবর্তে। যেন কোথাও তার জন্যে উত্তপ্ত একটি স্বাভাবিকতা নেই, তার আত্মার বিনিঃশেষ উদ্ঘাটন। সব সময়েই তাকে একটা মুখোশ টেনে থাকতে হচ্ছে, লোভী, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর।

কোথাও, কোনো মুহূর্তেও, সে এই মুখোশটা খুলে ফেলতে পারছে না,—তার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো, দেখতে পারছে না সে তার সত্যিকারের নিজের মুখ আর কারো মুখের দর্পণে। দেখতে পারছে না এই লোভ কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে দেবতার আরাধনায়, এই নিষ্ঠুরতা কেমন বলশালী হয়ে ওঠে জীবনের দৃপ্তিতে, এই স্বার্থপরতা কেমন ঐশ্বর্যময় হয়ে দাঁড়ায় আত্মবিকিরণের বহুলতায়! একেক দিন আপিসের চেয়ারে তার মেরুদণ্ডটা অবশ হয়ে আসে: এ সে করছে কী, কার জন্যে সে দু'হাতে এই টাকা লুটে চলেছে? এতো টাকা, শুধু এতো টাকা দিয়ে তার কী হবে, কিসের জন্যে সে এতো ভার জমা করছে, ক্ষয় করবেই বা সে কিসের প্ররোচনায়? কচুরি-পানায় ভরে উঠেছে নদী, কোথায় তার সেই উত্তাল, উত্তরঙ্গ মহিমা! নিজেকে যদি সে প্রচুরই না মনে করতে পারলো বাঁচবার উৎসাহে, তবে এই টাকায় তার চিতার উপরে প্রকাণ্ড একটা মঠ তৈরি হোক্। টাকা—টাকা সে ব্যয় করছেও তো অজস্র, এখানে-সেখানে, নানা অবান্তর অভিলাষে, ক্ষণকালিক উন্মাদনায়, কিন্তু সুখই সে পেলো, পেলো না বিস্মৃতি, শিহরণই সে পেলো, পেলো না সেই অতলতম শান্তির গভীরতা। হায়, টাকা দিয়ে প্রেমই শুধু কিনতে পাওয়া গেলো না। এক জায়গায় এসে টাকাও তার শক্তিমত্তা হারিয়ে বসে: লক্ষ-লক্ষ উপকরণের সঞ্চয়েও এক জায়গায় শূন্যতা তুমি কিছুতেই ভরে তুলতে পারো না। ব্যয় যে করবে তারো পিছনে একটা কল্পনা থাকা চাই, সেই কল্পনার বিলাস পর্যন্ত কবিতার মতো অপরূপ হয়ে ওঠে, কিন্তু যেখানে সেই কল্পনার প্রসার নেই, সেই উদ্বৃত্ততার সমারোহ, সেখানে ব্যয় একটা প্রচণ্ড অভিশাপ। তুমি একটা তাজ-ও গড়তে পারো, একটা গম্বুজও গড়তে পারো। টাকার পরিস্ফীতি দিয়ে নিরঞ্জন এখন এই গম্বুজ তৈরি করতে চলেছে। তার চারদিকে কেবল পাথর আর পাথর, মসৃণ ও শীতল, পাথরের নিশ্চল নৈঃশব্দ্য।

আপিস যাওয়া নিরঞ্জন একরকম বন্ধ করে দিলে। বন্ধ করে দিলে, কেননা, যতো রাতেই হোক আপিস থেকে বাড়ি ফিরে আসার মধ্যে আগের সেই মধুর ক্লান্তি নেই, সেই মধুর সতৃষ্ণতা। এখন বাড়ি হয়ে উঠেছে যেন ঠাণ্ডা একটা গুহা, দেয়ালগুলো যেন মৃত হাতের স্পর্শ দিয়ে তৈরি, মাথার উপরে আলোটা যেন নীরবে অট্টহাস্য করছে। বাড়ি ফিরে এসে মুখোশটার তার রঙ বদলাতে হয় শুধু, টেনে খুলে ফেলতে পারে না। আগে-আগে আপিসে যখন

সে নিজেকে ছড়িয়ে দিতো রাশি-রাশি কাজে, কাজের অদম্য দানবিকতায়, তখন তার মনের নিঃশব্দ গভীরে একটি তৃপ্তি, একটি প্রতীক্ষা থাকতো ঘুমিয়ে, যে, তার এই জানলার পিছনে আরেকটি জানলায় শ্রীপর্ণা চুপ করে বসে আছে। বসে আছে কখন সে বাড়ি ফিরবে। নিরঞ্জন আজকাল আর বাড়ি ফেরে না, তার কক্ষে ফেরে। সারা দিন সে কী করে নিজেই সে বলতে পারবে না গুছিয়ে, তার জীবনে এসেছে একটা ছন্দোহীন বিশৃঙ্খলা, যাতে দ্রুততার দীপ্তি নেই, শুধু একটা এলোমেলো খামখেয়াল, যেমন আত্মহত্যা করবার আগে কোনো লোক এখানে-সেখানে ছট্‌ফট্ করে বেড়ায়, সেই আতঙ্কময় সঙ্গ-চ্যুতিতে। তবু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, হাতে তার কিছু টাকা ছিল।

সেদিন বাড়িতে বসেই জানা গেলো, এতোদিন পরে তাদের সেই ষ্টিম-লঞ্চটার খদ্দের জুটেছে: তাকে একবার আপিস যেতে হবে। বিক্রি করলেই হাজার কয়েক টাকা মুঠোর মধ্যে এসে পড়ে আকাশ-ফুটো, অতি-সহজে, অতি-অকাতরে। এ দাঁও ছাড়তে নেই: যেখানে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়, সেখানে পক্ষাহত লোকও নিশ্চেষ্ট থাকে না। হ্যাঁ, টাকা—টাকায় আবার মানুষের কোন কালে অরুচি হয়েছে? কেউ মরলে প্রথমেই আমরা জিগ্‌গেস করি, কতো টাকা সে রেখে গেলো? নিরঞ্জন অনেক দিন পর আপিসের চেয়ারে গদিয়ান হয়ে বসলো। এর মাঝে যদিও কখনো গেছে, টাকা আনতেই গেছে, নতুন করে টাকা আসবার পথ করতে যায় নি। সহজেই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মোটা কিছু সে পকেটস্থ করলে—তার ন্যায্য টাকা, তার প্রাপ্য দাবি। কোথা থেকে কী করে মানুষের মন মোড় ঘুরে বসে, বলা কঠিন। ঠিকই তো, সবই তো তার ন্যায্য পাওনা, বিশাল তার অধিকার, অপরাভূয় তার প্রভুত্ব। সূচ্যগ্র মেদিনীই বা সে কেন ছাড়বে? কেন সে স্থাপন করবে না তার বলিষ্ঠ দাবি, তার বিস্তীর্ণ আধিপত্য—যখন হাতের মুঠোর মধ্যেই তা আছে, প্রতিটি নিশ্বাসের নাগালে!

নিরঞ্জন চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো। সোজা বেরিয়ে পড়লো গাড়ি করে। ঘুরলো ড্যালহৌসি স্কোয়ায়, ঘুরলো মার্কেট, ঘুরলো পার্ক-ষ্ট্রিট—চোখ-মুখ বুজে কী কতোগুলি সে সওদা করলে। তারপর সিধে বাড়ি চলে গেলো।

আর-আর দিনের মতো ঢুকলো না সে আজ অপরাধীর চেহারা করে। নীচের দোর-গোড়া থেকেই তার আবির্ভাবটা বাড়ির সমগ্র বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত

হয়ে পড়লো। চাকর একটা ধমক খেলো, সদর খুলতে তার এতো দেরি হয় কেন, সিঁড়ির কাছে ছিলো একটা বালতি, সেটা একটা লাথি খেয়ে ছিট্‌কে পড়লো শব্দ করে, বারান্দার উপর কে কতোগুলি নেবুর ছিব্‌ড়ে ফেলে রেখেছে, নিরঞ্জনের মুখে তার মুণ্ডুটা আর আস্ত রইলো না।

তবু এতো গোলমাল শুনেও শ্রীপর্ণা এলো না বাইরে বেরিয়ে।

নিরঞ্জন দরজার ওপারে চুপ করে এসে দাঁড়ালো।

দেখলো ছোট টেবিলটির পাশাপাশি দু'খানি চেয়ারে শ্রীপর্ণা আর আদিত্য নিতান্ত সমবয়সীর মতো ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে। কাঁধের ধার বেয়ে বাহু ছুঁয়ে পিঠের উপর শ্রীপর্ণার চুলগুলি রয়েছে ছড়িয়ে, ঘোমটার একটা আভাস কোথাও নেই, শুধু সাদা একটি শেমিজে তাকে দেখাচ্ছে অনেক ছোট, প্রায় নতুন-শাড়ি-পরতে-শেখা গ্রামের কিশোরী। দুই হাতের মাঝখানে মোটা একটা বই ধরা, তার থেকে সুর করে-করে পদ্যের আকারে ছেলেকে সে কী পড়ে শোনাচ্ছে! এ পৃষ্ঠায় নতুন কী একটা ছবি এসে পড়েছে, তাই ভালো করে দেখবার জন্যে আদিত্য উঠেছে চঞ্চল হয়ে, চেয়ারে সে ঠিক জুৎ করে বসতে পারছে না। মাত্র একটা পাখি হয়ে নখের আঁচড় ও পাখার ঝাপট দিয়ে জটায়ু কী করে দশ-মাথা-ওয়ালা রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করলে, সেটা তার চোখের নানারকম কোণ থেকে দেখা চাই।

দরজার ওপারে নিরঞ্জনের নিঃশব্দ উপস্থিতিটা অনড় একটা অন্ধকারের মতো ভারি হয়ে রইলো।

নিরঞ্জন দূর থেকে বললে,—শোনো!

যেন সে চৌকাঠটা পেরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে না। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে শিশুর চোখে উপভোগ করতে পারে না এই যুধ্যমান পাখির ছবিটা। ভাগ নিতে পারে না তাদের এই সুখে, যোগ দিতে পারে না এই সরলতায়। যেন এইখানে তার শত্রুর তাঁবু। যেন এটা একটা সাপের কোটর।

নিরঞ্জন চাপা গলায় হাঁকলে: শোনো!

শ্রীপর্ণা তাড়াতাড়ি খোঁপা জড়ালো, বাহু ও পিঠ ঢেকে আঁচল দিলো টেনে, ছোট একটি ঘোমটায় কপালের কাছেকার গুঁড়ো-গুঁড়ো চুলগুলি দিলো ঢেকে। মুহূর্তে হারিয়ে ফেললো সে তার সমস্ত শ্রী, শীতল, শিথিল সেই শ্রী, হারিয়ে ফেললো সে সমস্ত সরলতা, সেই সস্মিত সরলতা। উঠে দাঁড়ালো সে বয়সের

বোঝা নিয়ে, যেন তার কঠিন, নিষ্ঠুর ব্যক্তিত্বে, তার অনমনীয় নাগরিক ভঙ্গিমায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে আদিত্যকে সে ব্যস্ত হয়ে বললে—তুমি ততোক্ষণ ছবি দেখ, উনি কী বলছেন আমি শুনে আসছি।

নিরঞ্জনকে শ্রীপর্ণা তার শোবার ঘরে অনুসরণ করলে। কী এমন গূঢ়, দরকারি কথা থাকতে পারে শ্রীপর্ণা আকাশ-পাতাল কিছু ভেবে পাচ্ছে না।

হাতের থেকে প্যাকেটটা খাটের উপর ছুঁড়ে দিয়ে নিরঞ্জন রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করলে: তুমি এ কী আরম্ভ করেছ?

প্রশ্নটা যেন শ্রীপর্ণার দুই চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। চারদিকে চেয়ে কোনো যেন সে কিনারা করতে পারলো না, শুকনো গলায় ঢোঁক গিলে বল্‌লে,—কেন, কী হলো?

—দিন নেই রাত নেই ছেলে নিয়ে এ তুমি কী ছেলেখেলা শুরু করেছ জিগ্‌গেস করি? না, নিরঞ্জন আর লজ্জা করবে না, যা বলবার সোজাসুজি বলে ফেলে সে হালকা হবে। অন্ধকারে বসে পারবে না সে আর নিজেকে প্রতীক্ষায় ক্ষয় করতে।

শ্রীপর্ণা হাসিমুখে বল্‌লে,—রামায়ণ পড়ে শোনাচ্ছিলুম। ছেলেমানুষের সঙ্গে ছেলেখেলাই তো করতে হয়।

—কেন, ওকে একটা ইস্কুলে ঢুকিয়ে দিতে পারো না? নিরঞ্জন মুখিয়ে উঠলো।

ঘরে যখন ঢুকেই পড়েছে, শ্রীপর্ণা এটা-ওটা কাজ করে দিতে লাগলো। বললে,—কাছাকাছি ভালো ইস্কুল কোথায়?

—কাছাকাছি না থাকে, যেখানে সঙ্গে বোর্ডিং আছে, তেমন একটা ইস্কুলে রেখে দিলেই তো চলে যায়।

—বোর্ডিং? শ্রীপর্ণা যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

—হ্যাঁ, সেখানে থাকলে ভালো পড়াশুনো হবে। কী বললে যে কথাটা ভালো মানায় নিরঞ্জন চট্ করে কিছু ভেবে উঠতে পারলো না: বেশ চালাক ছেলে, তোমাকে ছেড়ে অনায়াসে একা থাকতে পারবে। শিশুকাল থেকে নিজের ওপর বিশ্বাস করে একা থাকতে পারাটা ভবিষ্যতে অনেক ফল দেয়। যা মুখে এলো নিরঞ্জন আবোল-তাবোল বকে যেতে লাগলো: আমাদের বাঙালি ছেলেদের হাতে-পায়ের বেড়ি হয়েছে এই মায়ের আঁচল। ছেলের যদি

ভালো চাও, এবং ভালোই চাও আশা করি—নিরঞ্জন কথাটাকে শেষ করতে পারলো না : মন্দ কী, মাঝে মাঝে গিয়ে আমরা দেখে আসবো, খোঁজ-খবর নেবো নিয়মমতো, ছুটি-ছাটায় বাড়িতে নিয়েও আসতে পারো ইচ্ছে করলে। নইলে, এ কী—এ কী বিশ্রী—

লজ্জা শেষ পর্যন্ত নিরঞ্জনকেও করতে হলো যে।

শ্রীপর্ণা ম্লানমুখে বললে,—বোর্ডিং-এই যদি রাখবো, তবে ও-বাড়িটা কী দোষ করেছিল ?

—কিছু দোষ করে নি। নিরঞ্জন প্রচ্ছন্ন রাগে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। বল্‌লে,—বেশ, আঁচলেই যদি বেঁধে রাখতে চাও, আঁচলটা একটু টেনে লম্বা করলে কী ক্ষতি ? কাছকাছি ইস্কুল না থাকে, দূরে তো আছে। আর যাদের তিন-তিনখানা মোটর আছে মজুত, কল্‌কাতা শহরে তাদের দূর বলে কিছু নেই। বেশ তো, ভালো ইস্কুলেই ভর্তি হোক্‌ না, ওর জন্যে আরো একটা না-হয় স্যোফার রেখে দেবো—ক্ষতি কী, কতো টাকাই তো কতো দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমার আদিত্যর গ্রহ-নক্ষত্র তো এমন কিছু প্রতিকূল দেখছি না, বিদ্রূপে নিরঞ্জনের চোখ দুটো ধারালো হয়ে উঠলো : ভাগ্যক্রমে সে তো বড়োলোকের আশ্রয় পেয়েছে।

কথাটা শ্রীপর্ণা গায়ে মাখলো না, কথাটার মধ্যে নির্লজ্জ একটা সত্য আছে। শুধু শান্ত গলায় বল্‌লে,—পাগল! এইটুকু ছেলে ইস্কুলে পড়বে কী! এখন পর্যন্ত রামায়ণের গল্পও জানে না।

—ক'টা ছেলের জানবার এমন মাথাব্যথা হয়েছে শুনি ? না, তারা ইস্কুলে কেউ পড়ে না ? আমিই জানি ? নিরঞ্জন মুখ খিঁচিয়ে উঠলো : আমিই বলতে পারি তোমার জটায়ু পাখি ছিলো, না, বাঁদর ছিলো ?

শ্রীপর্ণা না হেসে থাকতে পারলো না। বল্‌লে,—তুমি না জানলে কিছু ক্ষতি নেই। কিন্তু আদিত্যর জানা চাই।

—সংসারে তোমার আদিত্যই একমাত্র দিগ্‌গজ হবে।

—হলে হতেও পারে। কী করে তুমি বলো ?

—কিন্তু রামায়ণ পড়াবার জন্যে ওর ইস্কুল বন্ধ করছ কী বলে ?

—ইস্কুলের মাস্টারদের থেকে আমি ভালো পড়াতে পারবো বলে। শ্রীপর্ণার গলা ঈষৎ তপ্ত, গম্ভীর হয়ে উঠলো : ইস্কুলের মাস্টাররা কেমন করে পড়াতে

হয় তা জানতে পারে, কিন্তু কী পড়াতে হয় তার বিন্দুবিসর্গও জানে না। আমি ইস্কুলের মাস্টার তো ছিলুমই, শ্রীপর্ণা মসৃণ দাঁতে পরিচ্ছন্ন একটু হাসলো : এখন মা হয়েছি।

—তা আমি জানি না। নিরঞ্জন, পরাভূত বিপর্যস্ত নিরঞ্জন, হঠাৎ একটা চিৎকার করে উঠলো : আমি জানি না। তুমি আমার সঙ্গে এখন বেরুবে কিনা বলো ?

—কোথায় ?

—বেড়াতে।

—বেড়াতে ? শ্রীপর্ণা খুশিতে উঠলো ঝল্‌মল্‌ করে : নিশ্চয়, নিশ্চয় যাবো। এক্ষুনি এই মুহূর্তে। তবু যা হোক, অভিমানে শ্রীপর্ণার চোখ দু'টি আর্দ্র হয়ে এলো : এতোদিনে বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা বল্‌লে।

বরং এতোদিন ধরে এই ছিলো শ্রীপর্ণার অভিযোগ। আদিত্যর আসার পর থেকে নিরঞ্জন কেমন দূরে সরে গেছে, শীতকালের তির্যক সূর্যের মতো। আদিত্যর আসার পর থেকে সে কেমন হঠাৎ উদাসীন হয়ে পড়েছে, তার নেই সেই আগের উত্তাপ, আগের উৎসাহ। যেন আদিত্যকে সংসারের সমস্ত জায়গা ছেড়ে দিয়ে সে চলে গেছে নির্বাসনে : এ বাড়ি-ঘর যেন তার নয়। ছোট, একরতি এই ছেলেটার প্রতি তার এতো অভিমান, এতো ঈর্ষা। সে আজকাল হোটেলে খায়, প্রায় সমস্ত রাত তার ফেরবার প্রতীক্ষায় শ্রীপর্ণাকে আলো জ্বেলে বসে থাকতে হয়, এখান দিয়ে, ঘরের এই দুয়ার দিয়ে চলে যাবার সময়ও তাকে সে একটিও কথা বলে যায় না গায়ে পড়ে। যেন ঘুমন্ত আদিত্য তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। একবারটিও কাছে ডাকে না, ফরমাস করে না, ভুল ধরে ভুল করে একবার বকে না পর্যন্ত। আগে কতো-কতো জিনিস সে তাকে এনে দিতো ভারে-ভারে, আজকাল কলকাতার সমস্ত দোকান-দানি যেন দেউলে হয়ে গেছে। আদিত্য যেন তার কতো বড়ো শত্রু, আদিত্যকে কোলে নিয়ে নিরঞ্জনের কাছে তার জাত গেছে : সে অস্পৃশ্য, সে অশুচি। তার মাতৃস্নেহটা যেন নিরঞ্জনের কাছে প্রায় অসতীত্ব। অথচ, নিরঞ্জনো যদি মিশে যেতো এই সুধাস্রোতে, এই শৈশবারাধনায়, যদি আদিত্যকে করতো স্নেহ, শ্রীপর্ণাকে সম্মান, তবে কতো সুন্দর, সহজ হয়ে যেতো। জীবনের দশ দিক কেমন ভরে উঠতো সৌরভে। তা নয়, আদিত্যকে নিরঞ্জন কিছুতেই ক্ষমা

করতে পারছে না, নিষ্পাপ, অবোধ, সরল একটা শিশুর প্রতি যতো তার আক্রোশ, যতো তার প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ। মা হয়ে শ্রীপর্ণাই বা তা কী করে ক্ষমা করতে পারে ?

আজকে হঠাৎ এই অযাচিত অভ্যর্থনায় শ্রীপর্ণা সারা শরীরে খুশির ঝিলিক দিয়ে উঠলো। হাওয়া বুঝি ফিরলো এতোদিনে। কয়েদখানার দরজা গেলো খুলে।

শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—তবু, কদ্দূর যাবে ?

—ঠিক কী! আগে বেরিয়ে তো পড়ি, তারপর দেখা যাবে। মিসেস রায়ের ওখানে কতোদিন যাইনি। নিরঞ্জন খাটের রেলিঙের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে প্যাকেটটার দিকে হাত বাড়ালো: এই নাও, তোমার জন্যে দু'টো জিনিস কিনে এনেছি।

শ্রীপর্ণা ক্ষিপ্রহাতে প্যাকেটা খুলতে-খুলতে বললে,—কী ওটা ?

—দেখই না খুলে।

ছাপ-মারা দড়িটা শ্রীপর্ণা টান মেরে ছিঁড়ে ফেললো: শাড়ি! ও বাবাঃ, কী গর্জাস রঙ!

—হ্যাঁ, যাও, তৈরি হয়ে নাও চট্ করে।

—ও বাবাঃ, এ কে পরবে? শ্রীপর্ণা ঠোঁট উলটোলো।

—কেন? কতো দাম, কিছু আন্দাজ করতে পারো ?

—না-ই পারলুম, কিন্তু এ-শাড়ি আমি পরবো কবে ?

—আজই।

—পাগল! শ্রীপর্ণা হেসে ফেললো: লোকে বল্‌বে কী! আমার এখন বয়েস হয়েছে না ?

—কতো বয়েস? কতো বছর হলে মেয়েদের বয়েস হয় ?

—যাই হোক্, আমি মা হয়েছি না? শ্রীপর্ণা তার চোখে রহস্যময় একটি আভা ফোটালো।

—মা হয়েছ তো আমার কী!

—তোমার কী মানে? শ্রীপর্ণা গাম্ভীর্যে অটল হয়ে দাঁড়ালো: তুমি জানতে না কখনো ?

নিরঞ্জন মিইয়ে গেলো ; তা, মা-রা কি আর সাজে না ?

—আমিও তেমনি মায়ের মতোই সাজবো। সঙ্গে আরেকটা বাক্স ছিলো, শ্রীপর্ণা এবার সেটার মুখ টিপলে। বেরিয়ে এলো ঝক্‌ঝকে একটা নেকলেস। বল্‌লে,—কী সর্বনাশ! এ করেছ কী? টাকা তোমাকে কামড়াচ্ছিলো নাকি?

শ্রীপর্ণার এই অহৈতুক গিন্নিপনা নিরঞ্জনের একদম সহ্য হলো না। সে ঝাঁজিয়ে উঠলো: আমার টাকার জন্যে তোমার মায়া করতে হবে না। তুমি এখন যাও, তৈরি হয়ে এসো। আমি গাড়ি বার করতে বলছি।

শ্রীপর্ণা খিলখিল করে হেসে উঠলো: এই শাড়ি আর গয়না পরে বেরুলেই হয়েছিলো আর-কি। সবাই আমাকে ঠিক পোদ্দারের বৌ ভাবতো।

—তাই তো চাই। নিরঞ্জন জোর দিয়ে বল্‌লে।

—কী চাও?

—তোমাকে যাতে লোকে কারুর স্ত্রী বলে ভাবতে পারে।

রূঢ় ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে শ্রীপর্ণা ম্লান হয়ে গেলো। বল্‌লে,—আর কিছু আনো নি?

—আর আবার কী আনবো? পাঁচ শো টাকা আমার এতেই বেরিয়ে গেলো।

—অন্তত পাঁচ পয়সার একটা জিনিস। শ্রীপর্ণা করুণ গলায় বললে,—আদিত্যের জন্যে একটা কিছু আনলে না কেন?

—যাও, যাও, আমি পারি না অতো সোহাগ করতে। শিগ্‌গির তৈরি হয়ে নাও। নিরঞ্জন বাথরুমে ঢুকে গেলো: চা-টা আমরা বাইরেই খাবো।

শ্রীপর্ণা যখন তৈরি হয়ে ফিরলো, পরেনি সে সেই শাড়ি, গলায় নেই সেই হার, নিরঞ্জনের দু' চোখ উঠলো জ্বালা করে। কিন্তু এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি করতে তার আর ইচ্ছে হলো না। এমনিতে, হঠাৎ দেখলে, বেশ পরিচ্ছন্ন সাজ হয়েছে এ-কথা বলতেই হবে—সাদা গরদের জমির উপর কালো সতরঞ্চি পাড়, কিন্তু বলতে কি, তার শাড়ি-পরার ধরনটা কেমন রূঢ়, কেমন সম্বৃত। আঁচলে সেই বিলোল আলস্য নেই, নেই সেই সিল্কের একটি নরম বিশৃঙ্খলা। সযত্নে সেই একটু শিথিল হয়ে থাকবার কৌশলটি সে হারিয়ে ফেলেছে। আজ আর সঙ্কেত নয়, সে যা, তা যেন সে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চায়, তার দেহ বহন করবার নির্লিপ্ততায়, এমন-কি তার শাড়িতে। খোঁপাটা সে আজ বেঁধেছে কোনোরকমে হাত-প্যাঁচ করে, তার চুলে নেই আর সেই পুঞ্জিত উজ্জ্বলতা।

শরীরে কোথাও নেই একটুও স্পর্ধা, যেন তলহীন গম্ভীর তৃপ্তি। তার লাবণ্যটি আজ নির্ঝরধারার মতো বর্ষমান নয়, দীঘির জলের মতো প্রশান্ত। গলায় সরু একটি হার, এতো ছোট যে, আগের মতো বুকের খানিকটাতে এসে টিক্‌টিক্ করছে না, ফুল্-হাতা সাদা সিল্কের ব্লাউজে কাঁধ থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত ঢাকা, কোথাও নেই সেই লীলা, সেই দ্যুতি, হাতার নীচেই চাপা পড়েছে হাতের চুড়ি ক'গাছ, চাপা পড়ার জন্যে থেকে-থেকে আর তাদের সেই চমকিত বাজনা নেই। সমস্ত সজ্জাটিকে সে আজ বেঁধেছে যেন উদাস ভৈরবীর সুরে। চারপাশের আবহাওয়ার আভাটিকে সে এতো নামিয়ে এনেছে যে, তার সঙ্গে এখন কথা বলতে হলে গলার স্বর পর্যন্ত কোমল, বিষণ্ণ করে তুলতে হবে। গাম্ভীর্যে ও নিঃশব্দতায় সে এতো পবিত্র, এতো অব্যাহত যে, তাকে যেন এখন স্পর্শ পর্যন্ত করা যাবে না।

শ্রীপর্ণার বাঁকা ঠোঁটে সেই পিছল হাসিটি কিছুতেই ফুটলো না, আর এলো না সেই গ্রীবার বঙ্কিমা। বল্‌লে,—কী, কিছু খারাপ হয়েছে দেখতে?

নিরঞ্জন ত্বরান্বিত হয়ে বললে,—জানি না। চলো। শিগ্‌গির।

কিন্তু নীচে, সদরের কাছে এসে, নিরঞ্জন আপাদমস্তক পাথর হয়ে গেলো। স্বোফার মোটর বার করেছে রাস্তায়, হুড্‌টা তোলা, তার ভিতর কোট ও ধুতি পরে, সিঁথি পেড়ে, ফিতে-বাঁধা জুতো এঁটে, আদিত্য সিটে হেলান দিয়ে বসে আছে।

বিরক্তির বিষে নিরঞ্জন জর্জর হয়ে গেলো। বল্‌লে,—এ কী? ও কোথায় যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে?

শ্রীপর্ণা শান্ত মুখে বললে,—কোথায় আবার যাবে! আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে।

নিরঞ্জন প্রতি তন্তুতে ছট্‌ফট্ করে উঠলো: বা, ওকে কেন সঙ্গে নিয়ে চলেছ? ও সঙ্গে গেলে চলবে কেন?

শ্রীপর্ণা গাড়ির দিকে এগোতে-এগোতে বললে,—তবে ওকে কোথায় রেখে যাবো? ও সঙ্গে থাকলে ক্ষতি কী? ও-ও না-হয় আমাদের সঙ্গে একটু ঘুরে এলো। এসো, নিরঞ্জনকে শ্রীপর্ণার ডাকতে হচ্ছে: মিসেস রায়ের ওখানেই যদি যাও, বেশ তো, তাঁর ছেলেদের সঙ্গে ও স্বচ্ছন্দে খেলা করতে পারবে।

নিরঞ্জন নিঃশব্দে, আস্তে-আস্তে, গাড়িতে এসে উঠলো। নইলে ভালো

দেখায় না, কিছু মানে হয় না না-গেলে। সামান্য একটা শিশুর কাছে হার মেনে যাওয়ায় কোনো পৌরুষ নেই।

এক ধারে শ্রীপর্ণা, আরেক ধারে নিরঞ্জন, মাঝখানে আদিত্য। গাড়ি ছেড়ে দিলো। সামান্য একটা শিশু, নদীর দুই তীরে সঙ্কীর্ণ একটা সেতু নয়, পরিব্যাপী, বিশাল একটা পর্বতের ব্যবধান।

শ্রীপর্ণা আদিত্যর সঙ্গে খোলা গলায় নানা রকম আলাপ করে চলেছে। তাদের দু'জনের খুশি মোটরের শব্দকে উঠেছে ছাপিয়ে।

সার্কুলার-রোড দিয়ে উত্তরে কতোদূর যেতেই কি-একটা জায়গা বেছে নিয়ে নিরঞ্জন স্তোফারকে থামতে বল্‌লে।

শ্রীপর্ণা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালো : কী হলো ?

নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে স্তোফারকে বললে,—একটু দাঁড়াও। আমি এখান থেকে একটু ঘুরে আসছি।

বলে সামনের একটা বড়ো ফটক-ওলা বাড়িতে সে ঢুকে পড়লো।

যথাসম্ভব সমস্ত ঘটনাটার সে একটা ভদ্র চেহারা দিতে চেষ্টা করলো। ফিরে এলো সে কয়েক মিনিট পরেই, এবং আশ্চর্য, এবার কিনা হাসিমুখে। নিখুঁত, নির্ভুল ব্যস্ততায়। গাড়ির দুয়ার ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো যে-দিকটায় শ্রীপর্ণা বসেছিলো। সরল, স্নিগ্ধমুখে বললে,—ভারি মুস্কিল হলো, আমি এখন যেতে পারবো না। এখানে এসে একটা কাজে পড়ে গেলুম হঠাৎ। কাজটা আজই হওয়া চাই।

শ্রীপর্ণার মুখে কোনো প্রতিবাদের রেখা ফুটবার আগেই নিরঞ্জন স্তোফারের কাছে সরে এলো। বল্‌লে—তুমি এদের নিয়ে যাও, মা-জী যেখানে যেতে বলেন। আমার জন্যে ফিরে আসতে হবে না, আমি ম্যানেজ করে নিতে পারবো।

বলে সে আর কোথাও ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা সেই ফটক-ওলা বাড়ির দিকে অগ্রসর হলো।

আস্তে-আস্তে মোটরটা গেলো গড়িয়ে।

নিরঞ্জন রাস্তার দিকে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখলে গাড়িটা কদ্দূর গেছে। নিরাপদ দূরত্ব অতিক্রম করে গেছে দেখে তৎক্ষণাৎ সে এক লাফে একটা চলন্ত ট্র্যামে উঠে পড়লো।

বারো

আদিত্যকে শ্রীপর্ণা নানা ছল-ছুতোয় নিরঞ্জনের কাছে পাঠিয়ে দেয় নিরন্তর, নিঃসহায়, তার সঙ্গে ভাব জমাবার জন্যে। শ্রীপর্ণাকে যদি সে সত্যিই ভালোবেসে থাকে, শ্রীপর্ণার দৃঢ় বিশ্বাস, তবে আদিত্যকেও সে ফেলতে পারবে না। আদিত্যকে নিয়েই তো সে যা, তা ; আগেও যেমন ছিলো, আজকেও। এ যদি তার মহিমা না হয়ে একটা অসম্পূর্ণতাই হয় নিরঞ্জনের কাছে, তবে তার প্রেম এই অসম্পূর্ণতাকেই বা মার্জনা করতে পারবে না কেন ? প্রেম যদি পাপকে মেনে নিতে পারে, কলুষিত কদর্যতাকে, তবে এই তার ঐশ্বর্যময় রিক্ততাকেই বা সে কেন গ্রহণ করতে পারবে না—শুধু এই অকিঞ্চিৎকর একটা ছন্দপতনকে। আজ যদি শ্রীপর্ণার দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে হতো, এবং এই নিরঞ্জনেরই সঙ্গে, আর নিরঞ্জনের থাকতো একটি ছেলে, তবে শ্রীপর্ণা তাকে নিতো না কোল ভরে, দিতো না তাকে স্নেহ, তার এই দেহস্পন্দিত উত্তপ্ত স্নেহ ? সে কি তখন উপন্যাসের বিমাতা হয়ে থাকতো ? তবে এই বেলাই বা কেন বিপর্যয় ঘটছে ?

শ্রীপর্ণার প্রচুর বিশ্বাস আছে, আদিত্যর ছোঁয়া লেগে নিরঞ্জনের এই ঔদাসীন্য খসে পড়বে। নিজের প্রেরণায় না হোক, নিষ্ক্রিয় অভ্যাসের বশে, প্রতিদিনের এই নিঃশব্দ চলমানতায়, আদিত্যকে সে স্বীকার করে নেবে। তাই সে ঘন-ঘন কাজে-অকাজে নিরঞ্জনের কাছে তাকে পাঠিয়ে দেয়, এটা-ওটা এগিয়ে দেবার জন্যে। যেমন ধরো বাড়ির ঠিকানায় চিঠি এসে পড়লে চিঠি, হঠাৎ দেয়াশলাই ফুরিয়ে গেলে দেয়াশলাই, খাওয়ায় পর পানের ডিবে। তার সঙ্গে আদিত্যর সে একটা গিঁট পাকাতে চেষ্টা করে। আজকাল নানা সাংসারিক ব্যাপারে নিরঞ্জনকে শ্রীপর্ণার দরকার হয় ঘন-ঘন, সেই সব কথা নিজে না বলে ইচ্ছে করেই আদিত্যর মুখ দিয়ে পাঠায়, বলে : যাও তো আদি, ভদ্দরলোককে গিয়ে বলো তো, মা দশটা টাকা চেয়েছেন। কিংবা : ভদ্দরলোককে গিয়ে জিগ্‌গেস করে এসো তো, রাতে তিনি কী খাবেন ? আরো : আমার এখন হাত জোড়া, সেলাই করছি, ভদ্দরলোককে দিয়ে তোমার ইংরিজি হাতের

লেখার প্রথম লাইনটি লিখিয়ে আনো গে। নিরঞ্জনকে ভদ্রলোক ছাড়া আর কোনো বিশেষণে সে আখ্যাত করতে পারে নি। সে ভদ্রলোক—ভদ্রলোকের মতোই সে ব্যবহার করবে আশা করি। কোনোখানে, কোনো সময়ে, সে নিরঞ্জনের অনর্থক বিরক্তির কারণ ঘটালে শ্রীপর্ণা ছুটে এসে তক্ষুনি আদিত্যকে শাসন করে ; বলে : দেখছো না এখন তিনি কাজ করছেন, কেন এইখানে বসে চেয়ার দোলাচ্ছ ? কিংবা : এমনি করে যেখানে-সেখানে কমলানেবুর ছিব্‌ড়ে ফেলে রেখো না, উনি দেখতে পেলে ভীষণ রাগ করবেন। আরো : গেঞ্জিটা শিগ্‌গির গায়ে দাও আদি, উনি বাড়ি এসেছেন, খালি-গায়ে থাকাটা উনি একদম ভালোবাসেন না। এমনি করে প্রতি পদে তাকে সে ভয় করতে শেখায়, ভক্তি করতে শেখায়, কিন্তু শ্রীপর্ণা একমাত্র তার নিজের ভালোবাসা দিয়ে নিরঞ্জনকে ভালোবাসতে শেখাতে পারে না।

নিরঞ্জন হয়তো নীচে আপিস-ঘরে বসে কাজ করছে, কুণ্ঠিত পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালো আদিত্য, তার মায়ের কী ফরমাস নিয়ে। নিরঞ্জন অনেক সময় আদিত্যের মুখের দিকে অনিমেষে চেয়ে থাকে, হাসিতে উজ্জ্বল, ভয়ে গম্ভীর, বিস্ময়ে সুন্দর সেই মুখ—কথার আভা-ভরা তার সেই দু'টি চঞ্চল চোখের দিকে : ভেবে পায় না এই একবিন্দু শিশু, কী করে তার জীবনের অপরাজেয় পরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে ! তার হাসি, তার কথা, তার মনোহরণ সরলতা, নিরঞ্জনের বুকের কোন গূঢ়তম অন্ধকার থেকে তাকে দংশন করতে থাকে। কিন্তু মুখে তাকে হাসি আনতে হয়, সংক্ষিপ্ত হলেও কথার সে দরকারি জবাব না দিয়ে পারে না, আর এই নিরীহ, নির্মল সরলতার সামনে সাধ্য কি তুমি রাগ দেখাতে পারো ? তা ছাড়া তুমি ভদ্রলোক, তোমার বয়সের একটা সুস্থতা আছে, স্নায়ুর একটা সংযম, তুমি ইচ্ছে করলেই রাগের রশি ছেড়ে দিতে পারো না। অন্তত তোমার একটা ধনমর্যাদাও তো আছে, তুমি কৃপণ হও কী করে, তুমি ভালোবেসেছ, হীনতা তোমাকে শোভা পায় না। অতএব মাঝে-মাঝে, প্রায় নিজেরো অলক্ষিতে আদিত্যকে সে কাছে ডেকে আনে, তাকে ছোঁয়, তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করে। হায়, মনের ভাসমান দুর্বল একটি মুহূর্ত। পরক্ষণেই সমস্ত শরীর তার রাগে ও জ্বালায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে—সে হার মানতে বসেছে এই শিশুর কাছে, দাবি ছেড়ে দিতে বসেছে তার সমস্ত পৃথিবীর—তার আপ্রাণ হয়ে ওঠার সাধনা—তাড়াতাড়ি আদিত্যকে সে মন থেকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে

দেয় দূরে তার নিশ্বাসের বাইরে। মনে হয়, ও যেন তাদের উজ্জ্বল উৎসবে রক্তিম পানীয়ের পাত্রে মড়ার একটা খুলি। তাদের আগ্নেয় পর্বতের উপর ও জমেছে যেন তুষার হয়ে। তাদের ছন্দ দিয়েছে ভেঙে, তাদের স্বাভাবিকতার নির্মল অনাবৃত আকাশে নিয়ে এসেছে ঘোরালো ঘনঘটা, তাদের স্বপ্নের উপর নিয়ে এসেছে রূঢ় রশ্মি। নিরঞ্জন অন্তরের অন্তরালে বসে আর সহ্য করতে পারে না, সহসা সবলে তাকে ঠেলে দিয়ে একেক সময় ধম্‌কে ওঠে : যা বলছি শিগ্‌গির এখান থেকে। সময় নেই, অসময় নেই, কেবল বিরক্ত করতে আসা ! তোর মা নিজে আসতে পারে না ?

একেক দিন শ্রীপর্ণারো আর সহ্য হয় না। একেক দিন তারই চোখের উপর নিরঞ্জনের অন্তরের অন্তরালটা কখন খসে যায়।

নীচে, গারাজের পাশের ছোট কম্পাউণ্ডটিতে আদিত্য মালি আর স্যোফারের সাহায্যে নতুন সাইকেল চড়তে শিখছে। যতো পড়ে-পড়ে যাচ্ছে, ততোই সে হেসে উঠছে অনর্গল, আর বারে-বারে উপরের জানলার দিকে তাকাচ্ছে, যেখানে শ্রীপর্ণা দু'হাতে চুল খুলতে-খুলতে উপভোগ করছে তার ছেলের এই অমানবীয় কৃতিত্ব। মাঠ ভরে শীতের সুন্দর রোদ।

হঠাৎ উপরে, পিছন থেকে, নিরঞ্জন এসে দাঁড়ালো সেই জানলায়। তারই সঙ্গে এই দৃশ্যটি উপভোগ করতে এসেছে ভেবে শ্রীপর্ণা তার দিকে তৃপ্ত নয়নে তাকালো।

নিরঞ্জন বল্‌লে,—ওকে এ বাইক কে কিনে দিলে ?

কথার স্বরে শ্রীপর্ণা ঘাবড়ে গেলো। বল্‌লে—কে আবার দেবে ? আমি—আমিই দিয়েছি।

—এটুকু ছেলের আবার বাইক চড়বার শখ হলো কী করে ?

চাপা একটু গুমোট, হেসে শ্রীপর্ণা সেই ভার তরল করে দিতে চাইলো। বল্‌লে,—ওর ছেলেবেলায়, আমি যখন কলেজে পড়তুম, তখন ওকে একটা ট্রাইসিকেল কিনে দিয়েছিলুম। তার কথা ও এখনো ভোলে নি—সেই ট্রাইসিকেলের সম্পর্কেই আমাকে ওর প্রথম চেনা—তা যদিও ওর মনে নেই। শ্রীপর্ণা জানলা দিয়ে তাকালো : কয়েক দিন থেকেই বায়না ধরেছে ওকে এবার একটা দু'-পেয়ে গাড়ি কিনে দিতে হবে—আদিত্য ফের পড়ে গেলো দেখে শ্রীপর্ণা হেসে উঠলো : ও এখন বড়ো হয়ে উঠেছে যে।

নিরঞ্জন বল্‌লে—এতো মোটর চড়েও তোমার ছেলের গাড়ি চড়ার শখ মিটছে না ?

কথাটা শ্রীপর্ণাকে লাগলো। গম্ভীর গলায় বল্‌লে,—মোটরে চড়লে মানুষের পায়ে হাঁটার অধিকারো চলে যায় নাকি ?

—তা যায় কিনা জানি না, নিরঞ্জন ঘরের মধ্যখানে চলে এলো : কিন্তু বাইকটার কতো দাম পড়লো জিগ্‌গেস করি ?

শ্রীপর্ণার মুখের সমস্ত রক্ত ম্লান হয়ে গেলো। বল্‌লে,—টাকা পচিশ-তিরিশ হয়তো হবে। যুগলবাবু এখনো আমাকে চেঞ্জটা ফিরিয়ে দেন নি।

—তিরিশ টাকা ! নিরঞ্জন ফিরে যেতে-যেতে থামবার একবার দুর্বল চেষ্টা করলো ; বল্‌লে,—এমন একটা বাজে খেয়ালে তুমি এতোগুলি টাকা উড়িয়ে দিলে এককথায় ?

শ্রীপর্ণার নাকের ডগাটা হঠাৎ লাল হয়ে উঠলো : তোমার মুখে এ-কথা নতুন শোনাচ্ছে বটে। তিরিশ টাকা তোমার এতোগুলি হলো ? কোনটা তোমার বাজে খেয়াল নয় জিগ্‌গেস করি ? সেই লাল, গালে চিবুকে কানে পড়লো ছড়িয়ে : সেই যে সেদিন আমার তুচ্ছ একটা শাড়ি ও গয়নার পিছে পাচ-পাঁচ শো টাকা উড়িয়ে দিয়ে এলে, সেটা তোমার কোন খেয়াল ? মুহূর্তে সেই লাল আবার সাদা, কাগজের মতো সাদা হয়ে গেলো এক ফুঁয়ে : আদিত্যর জন্যে কিছু খরচ করলেই সেটা বাজে খরচ হলো ? তোমার পার্স থেকে তিরিশটা টাকা এমনি খোয়া গেলে তুমি টের পাও কখনো ? আজ ওকে একটা বাইক কিনে দিয়েছি বলেই তোমার লাগছে !

—নিশ্চয়। কথাগুলি বলতে ও শুনতে নিরঞ্জনের নিজেরই মাথা কাটা যাচ্ছে, তবু একবার যখন শুরু করেছে, তখন তার শেষ পর্যন্ত না পৌছে আর উপায় নেই : নিশ্চয়। তিরিশ টাকা এমন কিছু কম নয়। এই তিরিশ টাকার জন্যে অনেক বেকার রাস্তায়-রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তিরিশ টাকা পেলে তারা সন্তুষ্টি বর্তে যেতো। নিরঞ্জন দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, এখানে আর সে দাঁড়াতে পারছে না, তারই নীচতার মুখোমুখি হয়ে, তবু সে বল্‌লে—নিশ্চয়। টাকা আমার তুমি এতো সস্তা পাও নি যে হাতের মুঠোয় পেয়ে তা নিয়ে এমনি ছিনিমিনি খেলবে।

শ্রীপর্ণা, ঠিক কী করছে বুঝতে না পেরে, আঁচলের থেকে চাবির রিঙটা

খুলে নিয়ে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো : কে চায় তোমার টাকা ? কে আর ও-ময়লা তোমার ছোঁবে ?

যেন চাবির সেই তোড়াটা সবেগে নিরঞ্জনের মুখের উপর এসে পড়লো, এমনি সে দাঁড়ালো স্তম্ভিত হয়ে। কী যেন একটা কঠিন কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিলো, কিন্তু মুহূর্তে মনে পড়ে গেলো তার পদমর্যাদার কথা, তার ধনগৌরবের কথা—তেমন কিছু কেলেঙ্কারি সে করতে পারে না। চোটটা সে অতি কষ্টে সামলালো যা হোক, ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লে,—এতে এতো চটে ওঠবার কী হয়েছে ? আমি এমন কি মন্দ কথাটা বললুম শুনি ? নিরঞ্জন আম্‌তা-আম্‌তা করতে লাগলো : এইটুকুন ছেলে সাইকেল চড়ে রাস্তায় বেরুলে যে-কোনো সময়ে অ্যাকসিডেণ্ট হতে পারে। ভালোর জন্যই বলা ! টাকা গেছে তো গেছে, নিরঞ্জন আর কোনো দিকে না চেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে : কতো দিক থেকেই তো যাচ্ছে জলের মতো।

কিন্তু, দু'দিন গেলো, শ্রীর্ণাকে কিছুতেই চাবি ফিরিয়ে নিতে রাজী করানো গেলো না।

—তা কী করে হয় ? এতো সব হিসেব-পত্তর কে রাখতে যাবে ? আমি তার মাথা-মুণ্ডু কী বুঝি বলো ?

—আমি রাখলে তো, শ্রীপর্ণা চোখ নিচু করলো : আরো বেশি খরচ হয়ে যাবে। হিসেবের আর তল খুঁজে পাবে না। সামান্য তিরিশটে টাকার জন্যে সেদিন যা করলে—

—হয়েছে, হয়েছে, থামো। নিরঞ্জন সবলে কথাটা চাপা দিতে গেলো : দাও না, দাও না তোমার আদিত্যকে কী কিনে দেবে ! যা তুমি চাও, যা কিনে দিলে তোমার শান্তি হয়, নিয়ে এসো না এক্ষুনি। নিরঞ্জন চাবির গোছাটা তার দিকে এগিয়ে দিলো : টাকার কী অভাব ! টাকা রোজগার তো করছি এরি জন্যে !

পাকে-প্রকারে আদিত্যর একটা কথা উঠলেই নিরঞ্জন কেমন সব আবার ঘুলিয়ে ফেলে।

—তুমি তো খোঁটা দেবেই। শ্রীপর্ণা তার চারপাশে কঠোর একটা বিচ্ছিন্নতা আনলে : কিন্তু আদিত্য যদি তোমার ছেলে হতো, আর আমি যদি তার সামান্য একটা সাইকেলের জন্যে হিংসেয় এমনি ফেটে পড়তুম, তা

হলে তোমার কাছ থেকে খুব বেশি শ্রদ্ধা আদায় করতে পারতুম না আশা করি! রাখো, চাবির গোছাশুদ্ধ, নিরঞ্জনের হাতটা সে ঠেলে দিলো: তোমার ঐশ্বর্যে আর আমরা ভাগ বসাতে চাই না!

হঠাৎ চারদিকে অন্ধকার দেখে, কী করবে কিছু ভেবে না পেয়ে নিরঞ্জন শ্রীপর্ণার হাত দু'টো চেপে ধরলো, অবোধতরো শিশুর অসহায়তায়।

নীচে, সিঁড়ির কাছে, আদিত্যর গলা শোনা গেলো কোথা থেকে একটা ছাগল ধরে এনেছে। বিকট উল্লাসে তাই সে ঘোষণা করছে মায়ের কাছে।

হাতের থেকে শ্রীপর্ণা ছিট্‌কে বেরিয়ে এলো। বারান্দার রেলিঙ দিয়ে নীচে ঝুঁকে পড়ে বললে,—কার না কার ছাগল, শিগ্‌গির ছেড়ে দাও বলছি।

আদিত্য তাতে বিশেষ রাজী নয়। অগত্যা নীচেই শ্রীপর্ণা নামছে, নিরঞ্জন এসে আবার তাকে বাধা দিলো, বল্‌লে,—দেরাজের চাবি না নাও, অন্যান্য তোমার সব বাক্স-তোরঙ্গের চাবিও তো এতে মেলাই আছে দেখছি। এগুলি নিয়ে আমি কী করবো? এগুলি নিয়ে যাও।

—রাখো, নিচ্ছি। ছেলের চোখের উপর দাঁড়িয়ে শ্রীপর্ণা ঝগড়া করতে পারে না, পারে না নাটকীয় অঙ্গভঙ্গি করতে। তাই সে বল্‌লে, স্বাভাবিক সাধারণ গলায় বললে,—টেব্‌লের ওপর রেখে দাও, আমি খুলে নেবো'খন। বলেই তর্‌তরিয়ে নেমে গেলো সিঁড়ি দিয়ে।

তবু, কয়েক দিনে, নানারকম কোমল কৌশলে শ্রীপর্ণাকে সে নরম করে এনেছিলো, এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটে গেলো। সাধারণ অবস্থায় হলে নিরঞ্জন হয়তো একে ততো গ্রাহ্য করতো না, কিন্তু বাড়িতে আদিত্যর বিদ্যমানতাটাই ব্যাপারটাকে ঘোরালো করে তুললো।

অসাময়িক একদিন দুপুরবেলা আপিস থেকে ফিরে উপরে উঠবার সময় নিরঞ্জন দেখতে পেলো রান্নাঘরের রোয়াকে শ্রীপর্ণা কোন-একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে অত্যন্ত নিচুগলায় কথা কইছে। নিরঞ্জন যেন দেখেও দেখলো না, তবু চোখের ধারালো কোণ দিয়ে যেটুকু সে দেখলো তাতে তার ভুরু উঠলো কুঁচকে। প্রথম এটা সে স্পষ্ট লক্ষ্য করলে যে, স্ত্রীলোকটি নিতান্তই নিম্নশ্রেণীর, এবং তাকে দেখে দু'জনেই কেমন একটু বিশেষ ভাবে সচকিত হয়ে উঠলো। যেমন ঘনিষ্ঠ সন্নিধানে বসে আলাপ করছে, তাতে তাদের মধ্যে মর্যাদার এতোটুকুও তারতম্য দেখা গেলো না—নিরঞ্জনের মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠলো—

শ্রীপর্ণা কী বলে যে একটা ছোটজাতের মেয়েমানুষের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্যে ভাব-বিনিময় করতে পারছে, শত বিকটতম দুঃস্বপ্নের মাঝেও নিরঞ্জন তা কল্পনা করতে পারতো না। রাগের চেয়ে কুটিল একটা সন্দেহেই যেন সে বেশি কালি হয়ে উঠলো।

নিরঞ্জন আদিত্যকে পাকড়াও করলে। বল্‌লে,—একটা জিনিস নিবি ?

ভদ্রলোকের এই অপ্রত্যাশিত আপ্যায়নে আদিত্য একেবারে গলে গেলো। বাঁশের বাঁখারি দিয়ে সে একটা ধনুক তৈরি করছিলো। সব সাজ-সরঞ্জাম ফেলে রেখে সে ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকলে।

নিরঞ্জন একটা বাক্স খুলে কতোগুলি রঙিন পেন্সিল, কাগজ-পত্র বাঁধবার কতোগুলি লাল ফিতে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে,—নিবি এগুলো ?

লজ্জায় ও লোভে আদিত্য হেসে ফেললো। বললে,—দিলে নেবো না কেন ?

—দিচ্ছি, কিন্তু নিরঞ্জনের এখানে গলা নেমে এলো : তোর মা কার সঙ্গে নীচে বসে কথা কইছে জানিস ?

এর জন্যে আদিত্যকে ঘুষ দেবার দরকার ছিলো না। সোজাসুজি তাকে জিগ্‌গেস করলেই সে বলে দিতো। বলবার মতোই সে খবর।

—জানি না ? আদিত্য খুশিতে চোখ বড়ো করে বললে,—ও আমাদের সারদা-দিদি।

—কে সারদা ?

—আমাদের আর একটা বাড়ি আছে না—সেই বালিগঞ্জে ? তুমি তো দেখনি সেই বাড়ি, না, এটার মতো সুন্দর নয়, আদিত্য ঠোঁট কামড়ে খানিক ভাবলে : কিন্তু এটার চেয়ে অনেক বড়ো—সেই বাড়ির উঠোনেই তো আমরা ফুটবল খেলতে পারি। দাদু ভয়ানক বকে, বল একবার উপরে গিয়ে পড়লে কিছুতেই দেয় না, পাম্প খুলে ফেলে।

—হ্যাঁ, তোর সারদা-দিদি সেই বাড়ির কী হয় ? নিরঞ্জন ধরিয়ে দিলো।

—বা রে, কী আবার হবে! আদিত্য হো-হো করে হেসে উঠলো : দিদি বলে সত্যি-সত্যি ও আমাদের দিদি নাকি ? ও তো আমাদের বাড়ির ঝি ছিলো। আমরা সবাই ওকে দিদি বলে ডাকি।

—কিন্তু এ-বাড়ি এলো কী করে ?

—বা রে, আসবে না ? মা যে ওকে চিঠি লিখে আনিয়েছে। ও যে

এখানে থাকবে এখন থেকে। আদিত্য গলা থেকে একটা বুড়োটে সুর বার করলে: মাইনে ওর খুব বেশি নয় তাই বলে। আর ও থাকলে, জানো, বাড়িতে একটা কাকও কখনো ডাকতে পাবে না।

নিরঞ্জন রাগে একেবারে অসহায় হয়ে গেলো। ঝি সত্যিই শ্রীপর্ণা রাখছে কিনা, এবং রাখলেও কী উদ্দেশ্যে রাখবে তা সে একটিবার চিন্তা করেও দেখলো না। সুস্থ মস্তিষ্কে কিছু চিন্তা করবারো তার সময় নেই। ফিতের বাণ্ডিল আর পেন্সিলগুলি আদিত্যর হাতে দিয়ে নিরঞ্জন বললে,—নে, পালা।

মাকে দেখাতে আদিত্য এক দৌড়ে নীচে চলে গেলো। কোনো কারণ নেই, ভদ্রলোক যে তাকে গায়ে পড়ে এতোগুলি জিনিস দিয়ে দিলেন অনায়াসে, এই আনন্দ রাখবারই তার জায়গা নেই।

রাত্রে মশারি ফেলতে এসে শ্রীপর্ণা হঠাৎ আজ ইজিচেয়ারটায় বসলো। বল্‌লে,—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

আজকাল সেই কথাটা আগে বলে নিয়ে তবে তার সঙ্গে কথা আরম্ভ করতে হয়। নিরঞ্জন জানলার কাছের অন্ধকারটিতে বসে একটা সিগ্‌রেট খাচ্ছিলো। বল্‌লে,—বলো।

—আমি একটি ঝি রাখবো ভাবছি।

কথাটা শ্রীপর্ণাকে সে শেষ করতে পর্যন্ত দিলো না। ধারালো দাঁতে একটা নেকড়ের মতো খেঁকিয়ে উঠলো: ঝি? ঝি এ-বাড়িতে কী হবে? ও-সব নুইসেন্স আমি সইতে পারবো না।

শ্রীপর্ণা একটুও গায়ে মাখলো না। ঠাণ্ডা গলায় বল্‌লে,—আদিত্যর জন্যে রাখবো, আদিত্যকে দেখা-শোনা করতে পারবে। আমিও একটু ফাঁকা হব।

নিরঞ্জন দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো—কথার গূঢ় অন্তরালে কোনো ইঙ্গিত ছিলো কিনা তা পর্যন্ত ভেবে দেখলো না, বল্‌লে,—তোমার আদিত্যর জন্যে আমি আর কটা ঝি রেখে দেবো?

অসহ্য। শ্রীপর্ণা বোবা হয়ে গেলো।

সেই স্তব্ধতা নিরঞ্জন গায়ের উপর জন্তুর নিশ্বাসের মতো অনুভব করলে। সিগ্‌রেটটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে নিরঞ্জন বল্‌লে,—যদি বলো তো হোল-টাইম গার্ডিয়ান-টিউটার রেখে দিতে পারি—ভদ্রলোকে যা পারে। এ-বাড়িতে ঝি-গিরি চলবে না, এ তোমাকে আমি স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি।

শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—কিন্তু এ ঝি-টি খুব ভালো। তার কাছে আদিত্য নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবে। মা'র ছেলের মতো।

—সেই সুবাদে বুঝি হু'টি বোনে খুব ঘেঁষাঘেঁষি বসে গল্প করছিলে?

—হুই বোন? শ্রীপর্ণা খাড়া হয়ে উঠে বসে চেয়ারের প্রান্তে প্রায় সরে এলো: তুমি এ সব কী বলছ পাগলের মতো?

—পাগলের মতো! নিরঞ্জন বিকৃত মুখে বল্‌লে,—যে এসেছিলো সে তোমার দিদি না, তোমার সারদা-দিদি না?

—তুমি কী করে জানলে?

—কোনো-কিছুই আমার জানতে বাকি থাকে না। চেয়ারের হাতলটা নিরঞ্জন শক্ত করে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো: বলো, সত্যি কিনা? তুমি তোমার আগের শ্বশুর-বাড়ির পুরোনো সারদা-ঝিকে এখানে এসে থাকবার জন্যে চিঠি দিয়েছ কিনা?

—দিয়েছিই তো। তাতে কী হয়েছে? এর মাঝেও শ্রীপর্ণা হাসলো: আদিত্যকে সারদা-দিদিই মানুষ করেছে। তাঁকে পেলে ও আর কিছু চায় না।

—তুমিও আর কিছু চাও না। তাই সমস্ত রাজ্যে তোমার পুরোনো শ্বশুর-বাড়ির ঐ এক সারদা-ঝিকেই চিনেছিলে।

—তাতে কী দোষ হয়েছে?

—না, কী আবার দোষ হবে! নিরঞ্জনের চোয়াল দুটো দৃঢ় হয়ে উঠলো: তারপর কোনদিন দেখবো একটা চাকর ধরে এনেছ, বলবে, এ আদিত্যকে চান করিয়ে দিতো, কোনদিন বা আর-কাউকে, বললেই হলো, এ আদিত্যর মাথায় ছাতা ধরতো, এ দিতো তার জুতোর ফিতে বেঁধে। নিরঞ্জন হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—তোমার ঐ একটা ছেলের জন্যে আমি তো সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এখানে পুষতে বসি নি।

—বেশ তো, শ্রীপর্ণাও আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো বিশীর্ণ বিষণ্ণতায়, বল্‌লে,—বেশ তো, সারদা-দিদিকে না রাখলেই হবে। এর জন্যে এতো কী কথা! সারদা-দিদি না থাকলেই ওর যত্ন কম হবে, এমন কোনো কথা নয়।

শ্রীপর্ণা আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। নিরঞ্জন রইলো চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে।

আশ্চর্য, মশারিটা ফেলে দিয়ে গেলো না। আলোটা নির্লজ্জের মতো জ্বলছে।

তেরো

নিরঞ্জন এতোদিনে এটা স্পষ্ট, নিঃসন্দেহে বুঝেছে যে, নারীর জীবনে প্রেমই মহত্তম নয়, মহত্তম হচ্ছে সন্তান। সন্তানের জন্মে তাদের প্রেমের অবসান, দিনের আবির্ভাবে যেমন রাত্রির মৃত্যু। সন্তানেই তারা কৃতকার্য, তারা চরিতার্থ, এর পরে আর কিছু নেই। এর আগে প্রেম হচ্ছে শুধু শেষ-রাত্রের অন্ধকারের আলোড়ন, সূর্যের প্রতীক্ষায় : তারপরে তাদের দিন, নিশ্চিন্ত, নিরাপদ দিন, অনির্বাপিত প্রাত্যহিকতা। এর পরে প্রেম শুধু একটা সুবিধে, সহজ একটা অভ্যাস, যদি উপমা বদ্‌লানো যায়, ঘোলাটে একটু জ্যোৎস্না : পূর্ণিমার চাঁদ পড়েছে ঢলে। প্রেম হচ্ছে তাদের জীবন্ময় এই সার্থকতারই প্রেরণায় স্পন্দিত, যদি প্রেম তাকে বলো ; এবং প্রেমের জন্যে তারা আর তপস্যা করতে রাজি নয়, প্রেম না হলেও তাদের চলে, যদি তারা পেয়ে গিয়ে থাকে তাদের সন্তান, যদি তারা পেয়ে গিয়ে থাকে নিজেকে, নিজের বিশ্বকে। কথাটা ভেবে নিরঞ্জনো একটু চম্‌কালো না : এ পাপের মতোই আদিম, শিশুর সরলতার মতোই পুরোনো। চম্‌কালো না, কিন্তু চোখের সমুখে সমস্ত দিন-রাত্রি যেন শুকনো ও শূন্য হয়ে গেলো। সে—সে কী নিয়ে থাকবে, কোথায় তার শেষ সম্পূর্ণতা, তার সমগ্র সমাপ্তি ?

সব কিছু জেনে-শুনেই শ্রীপর্ণাকে সে বিয়ে করেছিলো, তার প্রেমের সামনে দাঁড়াতে দেয়নি সে কোনো বাধা, কোনো অন্ধতা। সেদিন তাদের জগতে, তাদের সম্মিলিত মহান একটি অস্তিত্বের অতীতে আর কোনো সত্য ছিলো না ; তারা দুই দেহে ছিলো এক দেবতা, দুই আত্মায় ছিলো এক অখণ্ডমণ্ডল। কিন্তু এইখানে, তার বেলায়ো, প্রেমই হলো না শ্রীপর্ণার আদ্যন্ত সর্বস্ব : প্রেম একটা আপাতরম্য উপক্রমণিকা মাত্র, চাই একটা বিরাট পরিণাম, সসমারোহ উপসংহার। সম্ভব একটা সময় পর্যন্ত সে অপেক্ষা করলো না, ডাক পড়লো আদিত্যর, তার সেই প্রাতস্তন সূর্যের শোণিমা—তার স্ফুরিত কামনার প্রথম কবিতা! অপেক্ষা সে করতে পারে, কিন্তু আদিত্যকে সে বর্জন করতে পারে

না: আদিত্যই তার প্রথম, আদিত্যই তার পরম। না, নিরঞ্জন গোড়ায় কিছু আপত্তি করে নি, কখনোই সে পারতো না আপত্তি করতে, এতো বিশাল-পরিপূর্ণ, এতো দুর্ধর্ষ-দুঃসহ ছিলো তার প্রেম—তার সঞ্চয়ের সামনে সংসারে কোনো ক্ষতির অঙ্কই সে অনুপাতে বড়ো করে দেখতে শেখে নি। কিন্তু ভাগ্য হঠাৎ কোথায় পরিহাস করলে, সব ভোজবাজির মতো ওলোট-পালোট হয়ে গেলো। ছোট একটা শিশু, তার বিশাল অজ্ঞানে নিষ্পাপ, তার অসহায় সরলতায় অঘাতনীয় সেই শিশু, কোথা থেকে এসে তার এই আকাশ-পরিব্যাপী প্রেমকে দাঁড়ালো আড়াল করে, তার নিশ্বাসে মুহূর্তে সে দাবদগ্ধ অরণ্যের মতো শুকিয়ে গেলো। তার এই অপরিমাণ প্রেম, মধ্যরাত্রে ঘুম-ভাঙা শিশুর কান্নার মতো তার আত্মার এই কাকুতি, সব একটা ছোট, তুচ্ছ শিশুর স্নেহের কাছে গেলো হেরে, সে হয়ে দাঁড়ালো চিরস্থায়ী একটা মিথ্যে, তার মাত্র জীবনধারণের প্রয়োজনে। শ্রীপর্ণা পাখা গুটিয়ে মাটিতে নেমে এলো, পরিণতির তৃপ্তিতে, প্রাপ্তির সেই অন্ধকারে বন্ধ করে দিলো তার জানলা, যে-জানলা দিয়ে দেখা যেতো আকাশের কোটি-কোটি ক্ষতমুখ, অগণন তারা। হায়, সীতা রইলো তপোবনে, রামেরই হলো নির্বাসন। নিরঞ্জন হয়ে দাঁড়ালো তারাহীন একটা আগ্নেয় শূন্যতা।

শ্রীপর্ণার এই মনোবিবর্তনটা নিরঞ্জন যেন অনায়াসে পড়ে ফেলতে পারে। যতোদিন সে কলেজে পড়তো, অপরিচিত একটা অবস্থার পরিবেশে, নতুন তার ভাবের দীপনায়, ততোদিন তার আদিত্যকে দরকার হয় নি: তার হাতে ছিলো বই, বইয়ের ভিতর দিয়ে অনাবিষ্কৃত পৃথিবী। যখন ছুটি পড়তো ক্যালেণ্ডারে, মনটা তার ফাঁকা ঠেকতে শুরু করতো, তার অভ্যাসের একঘেয়েমিতে নিয়ে আসতো সে একটি উৎসবের সুর, ছুটতো কল্‌কাতায়, আদিত্যকে একবার দেখে আসতে। তেমনি তার প্রেমের প্রাথমিকতায় আদিত্যকে তার দরকার পড়ে নি, সে ছিলো তখন মৃত্যুর ঝঙ্কারে, অতীন্দ্রিয়তার ইন্দ্রজালে। আজ হঠাৎ যেন সে আবিষ্কার করলে তার ছুটি। আদিত্যকে সে দু'হাত বাড়িয়ে কাছে ডেকে নিলো—তার অভ্যাসের পৃথিবীর পরে উৎসবের আকাশ। আদিত্যকে নিয়ে আসা, কাছে এনে রাখা, এখন তার পক্ষে অনেক সোজা—তার আছে এখন সামাজিক শক্তি, অর্থের প্রভুত্ব, পদমর্যাদার অহঙ্কার—সব মিলিয়ে এখন সে স্বাধীন, দুর্ধর্ষ; আদিত্যকে তার

কাছ থেকে আর কে কেড়ে রাখতে পারবে? নিরঞ্জন অস্থির হয়ে উঠলো: শ্রীপর্ণাকে সে সব দিয়েছে, যা সে চায়, সামাজিক শক্তি, অর্থের প্রভুত্ব, পদমর্যাদার অহঙ্কার, কেবল নিজেকেই দিতে পারলো না। শুধু সেই পেলো না স্থান, সেই পেলো না কোনো মূল্য।

সেদিন রাত্রে, তেমনি ঘড়ির কাঁটায় শ্রীপর্ণা চললো নিরঞ্জনের ঘরে মশারি ফেলে দিতে বা জল গড়িয়ে দিতে বা তেমনি দু'য়েকটা কাজ করে দিতে খুচরো, যেমন সে রোজ আসে। রাত অনেক হলেও নিরঞ্জন এখনো নিয়মমতো শোয় নি, ঘরে পাইচারি করে বেড়াচ্ছে। দরজার কাছে এসে সে থম্‌কে দাঁড়ালো।

নিরঞ্জন দাঁড়ালো গিয়ে জানলায়। শ্রীপর্ণা ঘরে ঢুকলো।

নিরঞ্জন গম্ভীর হয়ে বল্‌লে,—চেয়ারটাতে বোসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

শ্রীপর্ণা চুপ করে ইজিচেয়ারে এসে বসলো, বা, বলা যেতে পারে নিরঞ্জনের কথাটা তাকে ধাক্কা মেরে চেয়ারে বসিয়ে দিলে। নিরঞ্জনকে কেন-না-জানি অল্প-অল্প ভয় করতে লাগলো, সহজ অলস আরামে চেয়ারে নিজেকে সে মেলে দিতে পারলো না, ভঙ্গিটা উচ্চকিত, অসহিষ্ণু করে রইলো।

নিরঞ্জন নিঃশব্দে লাগলো পাইচারি করতে। কোনো কাজ নয়, একটা সিগ্‌রেট পর্যন্ত সে এখন খাচ্ছে না। তাতে নিঃশব্দতাটা যেন আরো ভারি, আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

শ্রীপর্ণা চঞ্চল হয়ে উঠলো: বলো, কী কথা!

নিরঞ্জন তার দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়ালো। বসলো একটা চেয়ার টেনে, দূরে, মুখোমুখি: এবারে ধরালো একটা সিগ্‌রেট। তার চোখের মতো জ্বলতে লাগলো সিগ্‌রেটের মুখ।

অনিমেষ চোখে তাকিয়ে রইল শ্রীপর্ণার দিকে, শ্রীপর্ণার শরীরের দিকে। ঐ দেহে নিশ্চয়ই তার আশ্রয় আছে, অধিকার আছে। ইচ্ছে হলো এখুনি দরজা বন্ধ করে দিয়ে আলো নিবিয়ে দেয়, প্রবল ও আদিম অন্ধকারের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার সমস্ত নিষ্ফলতা, সমস্ত ঔদাসীন্য।

কিন্তু দেখলো সেই শ্রীপর্ণা আর নেই। যেন কতো দীর্ঘ দিনের রোগশয্যা থেকে সে উঠে এসেছে। রোগে মুখ চিরকালের জন্যে বিকৃত হয়ে গেলে পরমা

সুন্দরীও যেমন সময়ের একটি বিন্দুতে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, পুড়িয়ে ফেলে দেয় তার সাজ-সজ্জা, ছুঁড়ে ফেলে দেয় তার আভরণের বোঝা, আর যেমন দাঁড়াতে হয় না তাকে আয়নার সামনে রূপের অহঙ্কারের স্ফীতিতে, আর করতে হয় না তাকে ভয়, কারুর কামনা বা কারুর বিশ্বাসঘাতকতা, আর করতে হয় না তাকে ঈর্ষা, কারুর সৌন্দর্য বা সম্পদ, যেমন সে চলে আসে একটি অনাবৃত অনায়াস উদ্ঘাটনে, তেমনি শ্রীপর্ণাও যেন তার জীবন-ভঙ্গির সমস্ত শৈথিল্য নিয়ে চলে এসেছে একটি শীতল নিশ্চিন্ততায়। আর কিছু তার চাইবার নেই, ভয় করবার নেই, সংগ্রাম করবার নেই—সে এসে পড়েছে অবসানের চমৎকার মুক্তিতে। দেখতে-দেখতে সে কেমন বুড়োটে হয়ে এসেছে, তার গলাটা দেখাচ্ছে সরু, কাঁধ দু'টো ঢিলে, চোয়াল দু'টো ভাঙা—কী হবে তার বয়েস দিয়ে, আর কী হবে তার দেহটাকে বয়েসের কম করে দেখিয়ে? আয়নার সামনে গিয়েও আর সে দাঁড়ায় না, একবার দেখেও না ভুল করে, তার চুলে সেই ঢেউ নেই, সেই উজ্জ্বল অন্ধকার নেই, সেই সাপের মসৃণতা নেই, কেমন একরাশ আবর্জনার মতো হাওয়ায় উড়ছে এলোমেলো,—কী হবে আর তার রূপচর্চা করে, যা সে সত্যিকারের, মেকি প্রসাধনে তাই সযত্নে ঢেকে রেখে? আর তার কিছু লজ্জা নেই, এতোটুকু কুণ্ঠা : সে মা, তাইতেই সে খুশি, তাইতেই সে ভরপুর। পরনে সাধারণ, উদাসীন একটি শাড়ি, তাতে না আছে দীপ্তি, না আছে পারিপাট্য, পরিধানের ভঙ্গিতেও নেই সেই বিসর্পিত অবকাশ ; আর কী-ই বা হবে তার শাড়ির শ্রী দিয়ে? সে যে মা, তা এতেই রয়েছে প্রকাশিত। তার জন্যে কোনো আয়োজনের দরকার করে না, দরকার করে না কোনো উপকরণের বিজ্ঞাপন। শ্রীপর্ণার কোনো-কিছুতে আর উৎসাহ নেই, সে সাজলো কি না-সাজলো, পার্টিতে নেমন্তন্নে গেলো কি না-গেলো, নিরঞ্জনের সঙ্গে আর বেড়ালো কি না-বেড়ালো: কোনো-কিছুতে নেই কৌতূহল, সে সুন্দর কি কুৎসিত, সে যুবতী না প্রৌঢ়া, সে শরীরকে বহন করছে, না শরীর তাকে বহন করে চলেছে। সে নিশ্চিন্ত, প্রায় নিরুপায়ের মতো নিশ্চিন্ত, মরবো ঠিক জেনে যেমন অন্তিমতম মুহূর্তে মানুষের মনে স্নিগ্ধ নিশ্চিন্ততা আসে। সে যেন নিজের কোনো প্রমাণ চায় না, সে চায় নিজের পরিচয়। সে যখন এই পরিচয়ই পেয়ে গেছে, তখন জগৎ-সংসারে আর কী তার খোঁজবার রইলো? শ্রীপর্ণা চেয়ারের মধ্যে একটুখানি খস্‌খস্ করে উঠে ফের স্থির হয়ে গেলো। তার

শরীরের সেই অবসন্ন শীর্ণতা যেন মনে হলো নিরঞ্জনেরই নিরুচ্চার একটা হাহাকার।

শ্রীপর্ণা আবার উঠলো খস্‌খসিয়ে। বল্‌লে,—চুপ করে রইলে কেন? কী কথা আছে, বলো।

নিরঞ্জন বল্‌লে,—চুপ করে থাকাটা বুঝি কথা হতে পারে না?

—না, সত্যি বলে ফেল, শ্রীপর্ণা তার দুই পায়ের পাতায় চঞ্চল হয়ে উঠলো: আমার সময় নেই।

—সময় নেই মানে? নিরঞ্জন ক্রুদ্ধ গলায় বল্‌লে,—প্রতি মুহূর্তে আমাদের সময় আছে। চুপ করে বসে থাকো। সময় যতো সরে যাচ্ছে, দিয়ে যাচ্ছে আবার ততো সময়, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। উঠো না বলছি।

—বেশ, তবে বলো। শ্রীপর্ণা অল্প একটু হেসে হাতের উপর চিবুক রেখে বসে রইলো।

বলবার কথা নয়, শোনবার কথা।

শ্রীপর্ণা আর বসে থাকতে পারছে না। কোনো আভাস না দিয়ে আকস্মিক ক্ষিপ্রতায় সে উঠে দাঁড়ালো। বল্‌লে,—মুখ বুজে বোবার মতো এমনি বসে থাকতে পারি না।

নিরঞ্জন অমনি উঠে দরজার কাছে গিয়ে বল্‌লে,—যেতে পাবে না।

—সে কী? শ্রীপর্ণা হটে গেলো: আদিত্যর আজ বিকেল থেকে জ্বর—

—হোক্ জ্বর। তুমি যেতে পাবে না ও-ঘরে।

—যেতে পাবো না মানে?

—আমি বলছি তুমি যাবে না। নিরঞ্জনের কণ্ঠ হঠাৎ কেমন অবসন্ন হয়ে এলো: তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—আবার কী কথা! শ্রীপর্ণা নির্ভয়ে এবার এগিয়ে এলো সেই দু'পা, গম্ভীর মুখে বল্‌লে—পথ দাও বলছি। আমি যাবো ও-ঘরে। আদিত্য হয়তো আমাকে খুঁজছে।

নিরঞ্জন আলগোছে সরে দাঁড়ালো; বল্‌লে,—সংসারে আদিত্যই তোমার সব, আমি তোমার কেউ নই?

শ্রীপর্ণা দরজার কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে গেলো, চলে যেতে পারলো না।

হ্যাঁ, নিরঞ্জন আজ বলবে, এতোক্ষণে বলবে। শুধু দেবতারা শুনতে পাবেন,

শুধু ঘরের এই দেয়ালগুলো শুনতে পাবে। বাইরের পৃথিবী, বৃহৎ সেই লোকারণ্য, এই দৃশ্যের বিন্দুতম আভাসও জানবে না। জানবে না, নিরঞ্জন গুপ্ত, এতো যার অর্থ ও সামর্থ্য, প্রতাপ ও প্রতিপত্তি, এতো যার সুখ ও সুযোগ,—সে কিনা সব-কিছু ফেলে দিয়ে সামান্য প্রেমের জন্যে, সামান্যতরো স্ত্রীর প্রেমের জন্যে কাতরতা করছে। হ্যাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কেউ তারা জানবে না, তাই লজ্জা কী, নিরঞ্জনো সত্য হয়ে উঠবে, শ্রীপর্ণার মতো লজ্জা দেবে ছুঁড়ে ফেলে—সেও হবে তার মতো নিশ্চিন্ত, তার উপলব্ধির তীব্রতায়।

নিরঞ্জন আবার বললে—আমার প্রতি তোমার কোনো ভালোবাসা, কোনো কর্তব্য নেই "

শুধু দেবতারাই শুনতে পেলেন, শুধু দেয়ালগুলিই শুনলো।

শ্রীপর্ণা চোখ নামিয়ে বল্‌লে,—কী করবো, আদিত্যর হঠাৎ আজ জ্বর এসে গেছে। কী রকম বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে বিছানায়।

নিরঞ্জন আস্তে-আস্তে চেয়ারে গিয়ে বসলো! কোনো কথা বল্‌লো না।

শ্রীপর্ণা চৌকাঠটার কাছে এসে থামলো। বিদ্রূপ করে বল্‌লে,—তোমার প্রতি কর্তব্যের কোথায় ত্রুটি দেখলে শুনি? কোথায় তোমার ওপর আমার ভালোবাসার অভাব ধরা পড়লো?

—যাও, যাও, চলে যাও এখান থেকে।

আর, শ্রীপর্ণা চলে যেতেই নিরঞ্জন দরজাটা দু'হাতে বন্ধ করে দিলে।

আর-আর দিন তবু বা খোলা থাকতো উৎকণ্ঠিত একটি প্রতীক্ষার মতো; আজ সম্পূর্ণ বন্ধ, নিরুত্তর প্রত্যাখ্যান!

মধ্যরাত, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ তখন অনেক দূর উঠে এসেছে, দরজায় হঠাৎ কার করাঘাত হলো। প্রথমে মৃদু, পরে দ্রুত, ব্যস্ত, ঘন-ঘন।

নিরঞ্জন ঘুমিয়ে ছিলো তার শূন্য বিছানায়, রাশীভূত শ্রান্তিতে। হঠাৎ সেই আঘাত যেন লাগলো এসে তার হৃৎপিণ্ডে। উঠলো ধড়মড় করে। চেয়ে দেখলো তারই ঘুমের মতো আকাশে নেমেছে জ্যোৎস্না, সমস্ত-কিছু যেন তার ঘুমে রয়েছে ভিজে। রাত্রির অপার রহস্যে নিরঞ্জন মুগ্ধ হয়ে গেলো—নিঃশব্দতার এই কল্লোল। এ রাত্রি যেন পৃথিবীর নয়, অন্য একটা কোনো অনাবিষ্কৃত নক্ষত্রের।

আবার শব্দ হলো। দরজাটা তাকে দিয়ে খুলিয়ে তবে ছাড়বে।

হ্যাঁ, যা সে ভেবেছিলো, যা না হয়েই যায় না। শ্রীপর্ণা দাঁড়িয়ে, তার এতো-কালের ঘুম দিয়ে তৈরি। নিরঞ্জন আলো জ্বাললো না, যেন সে স্বপ্ন দেখছে।

শ্রীপর্ণা শুধু সন্তানের জন্যেই নয়, পুরুষের জন্যে। আগে পুরুষ, পরে সন্তান। তাই সে না এসে থাকতে পারেনি। তার মাঝে আছে দ্বিতীয় সন্তানের প্রতীক্ষা, দ্বিতীয় পুরুষের স্বপ্ন।

শ্রীপর্ণা ব্যস্ত হয়ে শুকনো মুখে বল্‌লে,—আদিত্যর জ্বরটা ভীষণ বেড়ে গেছে, প্রায় একশো চার।

নিরঞ্জন শ্রীপর্ণার মুখের দিকে মূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলো।

—ভারি ছট্‌ফট্‌ করছে, কোঁকাচ্ছে, থেকে-থেকে কেবল তেষ্টা—

নিরঞ্জন বল্‌লে,—জ্বর—তা আমি কী করবো?

—কোনো ডাক্তার নিয়ে আসা যায় না?

নিরঞ্জন তার বিছানায় ফিরে গেলো: ডাক্তার! এতো রাতে ডাক্তার! হাত দিয়ে মাছির মতো কথাটা সে উড়িয়ে দিলে।

—কেন হবে না? টাকা দিলেই হবে। শ্রীপর্ণা সাহসে বুক বাঁধলো: আমাদের তবে টাকা আছে কী করতে? যুগলবাবুকে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দাও না, তোমার নাম শুনলেই চলে আসবেন।

—যাও, যাও, আর আদেখ্‌লেপনা করতে হবে না। নিরঞ্জন দেয়ালের দিকে পাশ ফিরলো: পৃথিবীতে কেবল একা তোমারই ছেলে আছে! আর-কারুর ছেলের কোনোদিন অসুখ করে না! রাত-দুপুরে অমনি তাদের জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে ডাক্তার ডাকতে হয়? কল্‌কাতা শহরে কেবল তোমারই একমাত্র টাকা আছে! নিরঞ্জন নাকের মধ্য দিয়ে হেসে উঠলো।

শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—কিন্তু অসুখ কঠিন হলে ডাক্তারই বা ডাকতে হবে না কেন?

—তোমার অসুখ কঠিন হতে পারে, আমার টাকাটাও এমন কিছু তরল পদার্থ নয়। নিরঞ্জন পা ছড়িয়ে আরাম করে শুলো। চোখ বুজে আপন মনে বল্‌লে,—তুচ্ছ একটা কথার জন্যে আমার এমন সুন্দর ঘুমটা দিলে ভেঙে।

প্রেতায়িত একটা ছায়ার মতো শ্রীপর্ণা রইলো দাঁড়িয়ে।

নিরঞ্জন ঝাঁজিয়ে উঠলো: কী আর এখানে দাঁড়িয়ে আছো বোকার মতো? ছেলে তোমার ছট্‌ফট্‌ করছে, যাও, দেখ গে, এখনো বেঁচে আছে কিনা, না, ডাক্তারের অভাবে এক রাত্রেই টেঁসে গেছে একদম।

চোদ্দ

শ্রীপর্ণা তার ঘরে ফিরে এসে আদিত্যের মাথায় পাখা করতে বসলো, একটা পেয়ালায় করে জল নিয়ে পাতলা দু'ফালি ন্যাকড়া ভিজিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে দিতে লাগলো জল-পটি।

বিবর্ণ জ্যোৎস্না উঠেছে অস্পষ্ট স্মৃতির মতো, সেই জ্যোৎস্না এসে পড়েছে আদিত্যর বিছানায়, শ্রীপর্ণার পিঠের পাশটিতে। জানলার ভিতর দিয়ে বাড়িয়ে-দেয়া ঠাণ্ডা, সাদা, অসহায় হাত। সেই জ্যোৎস্নার ছোঁয়া লেগে শ্রীপর্ণার সমস্ত শরীর মধুর ম্রিয়মাণতায় অবশ হয়ে এলো, তবু, আজ কিছুতেই জানলাটা সে বন্ধ করতে পারলো না।

আদিত্যর এখানে আসার পরদিন থেকে, যেদিন থেকে সে তার বাহুর ঘনতায় এসে শুয়েছে, সেই দিন থেকে, শ্রীপর্ণার অচেতন মনের গূঢ় অন্ধকার থেকে নানা স্মৃতি অঙ্কুরের মতো প্রত্যহের পৃথিবীতে ফুটে উঠতে চাইছিলো। দেয়নি সে ফুটতে, শ্রীপর্ণা প্রাণপণে রক্ষা করেছে আপনাকে, সেই মনের দুর্লক্ষ্য গুহামুখে চাপা দিয়েছে সে তার প্রাত্যহিক পৃথিবীর ভার। স্মৃতি হচ্ছে ধুলো, রাশি-রাশি জীর্ণ পাতার আবর্জনা, প্রতি দিবসের বেগবান সম্মুখগতিতে পিছনের সেই ধুলো দিতে হবে উড়িয়ে, বাঁচতে যদি সে চায়, সব সময়েই সামনে তার নীল নির্মুক্তি। শ্রীপর্ণা এমনি এতোদিন বাঁচতেই চেয়েছিলো উদ্দাম মুহূর্ত-বিকিরণে, উন্মুখ সম্মুখীনতায়। উড়িয়ে দিয়েছিলো সে সমস্ত ধুলো, ঝরিয়ে দিয়েছিলো সমস্ত লালচে, হলদে পাতা—তার নতুন বসন্ত-বিদারণে। কিন্তু যক্ষ্মার বীজাণু যেমন একদিন অপরিপুষ্ট শরীরের জীর্ণতায় এসে গোপনে দেখা দেয়, তেমনি তার মনের এই দুর্বল, অসহায় বিষণ্ণতায় সেই স্মৃতি আজ হঠাৎ বারে-বারে দংশন করতে লাগলো।

তার আজ মনে পড়লো ক্ষীরোদকে—সত্যি-সত্যি মনে পড়লো, শত অন্য কথা ভেবে, শত অন্য কাজ করে, কিছুতেই সে-স্মৃতি মন থেকে সে তাড়িয়ে দিতে পারলে না; সে স্মৃতি তাকে বাতাসের মতো ঘিরে ধরেছে, রক্তের মতো

ঘিরে ধরেছে, মৃত্যুর উপস্থিতির মতো ঘিরে ধরেছে—তাকে তাড়িয়ে দেয় আর শ্রীপর্ণার সাধ্য কী। তাকে আজ তার স্পষ্ট মনে পড়লো, বহুবিস্তীর্ণ জনতার থেকে আহরণ করে আনা একটি মুখ: গর্জমান সমুদ্র থেকে ছিনিয়ে আনা অবিনশ্বর মুহূর্ত: তাকে মনে পড়লো আজ এই হলুদ জ্যোৎস্নায়, বিছানার উপর এই তার ম্লায়মান রেখায়, আকাশের এই গভীর নিঃশব্দ পরিব্যাপ্তিতে। তাকে মনে পড়লো: শ্রীপর্ণা কী করতে পারে যদি তার আজ হঠাৎ মনে পড়ে গিয়ে থাকে? মানুষ কী করতে পারে, যখন তার থেমে পড়তে হয়, যখন সামনে তার পথ গিয়েছে ফুরিয়ে? তাড়িয়েই বা সে দেবে কেন, যদি তার রূঢ় রৌদ্রে এই স্মৃতিটি বিষণ্ণ একটি ছায়া মেলে ধরে? তাড়িয়ে দেয় শ্রীপর্ণার সাধ্য কী?

ক্ষীরোদকে আজ তার মনে পড়ে গেলো, হ্যাঁ, ক্ষীরোদকে,—নামটা সে মনে-মনে কয়েকবার উচ্চারণ পর্যন্ত করলে। তাকে মনে পড়ে গেলো ক্ষণিক একটা মর্মরিত বনহিল্লোলের মতো নয়, চকিতোদ্ভাসিত কল্পনার বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো নয়, মনে পড়লো স্থির, স্থায়ী, অবিনশ্বর একটি সত্যের মতো। বাতাস আমাদের বেষ্টন করে আছে, তেমন একটা সত্য: আকাশ আছে পৃথিবীর ভূমিকায়, তেমনি। মনে পড়লো, যেমন মাঝরাতে শূন্য বিছানায় ঘুম-ভাঙা শিশুর মাকে মনে পড়ে। মনে পড়লো আদিত্যর এই শুকনো, শীর্ণ মুখে। মনে পড়লো তার এই জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে চুপ করে জেগে বসে-থাকার আলস্যে। তুমি কিছু বলতে পারো না, কারণ-অকারণ নেই, মানুষের এমনি আবার একদিন মনে পড়ে যায়—শ্রীপর্ণারো আজ মনে পড়ে গেলো।

সে যেন স্পষ্ট দেখলে, আশ্চর্য, সে স্বপ্ন দেখছে না, কে-একটি লোক যেন জ্যোৎস্নার দীর্ঘ রেখায় ঘরের মধ্যে সন্তর্পণে ঢুকে পড়েছে। যেন আস্তে-আস্তে রোগের পাণ্ডুর বিশীর্ণতায় ভেঙে-ভেঙে সে শুয়ে পড়লো বিছানায়, দীর্ঘ বিশ্রান্তিতে। সেই নাক, সেই ভুরু, চোখের পাতায় তেমনি দু'টি চোখ বুজে থাকা। এ যেন আর আদিত্য নয়, আর কেউ, তার স্মৃতির একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস। শ্রীপর্ণা ভয় পেয়ে বালিশের উপর ঝুঁকে পড়লো। ডাকলো: আদি।

আদিত্য জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটো একটু চেটে কাতর গলায় বললে,—মা, জল!

চামচেয় করে ঠাণ্ডা একটু জল শ্রীপর্ণা তার ঠোঁটের ফাঁকে ঢেলে দিলে।

যে মরে গেছে মনে করে আছো, সে মরে না, কক্‌খনো মরে না ; সে চেয়ে থাকে, সে ডাকে, সে কথা কয়।

শ্রীপর্ণার একটি রাতের কথা মনে পড়ে গেলো, সে-রাতের প্রতিটি তারা তার মুখস্ত। মনে পড়ে গেলো, ক্ষীরোদের সেই অসুখের সময়, এমনি এক রাতে, ক্ষীরোদ অস্ফুট কান্নার স্বরে অন্ধকারে কখন বলে উঠেছিলো : মা, জল ! বিভাবতী দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে পাখা হাতে করে ঝিমুচ্ছিলেন, শ্রীপর্ণা শিয়রের কাছে দুই চোখ ব্যথায় উন্নিদ্র করে বসে আইস-ব্যাগ দিচ্ছিলো। জল চাইতে শ্রীপর্ণা এমনি চামচেয় করে জল ঢেলে দিয়েছিলো তার দাঁতের ফাঁক দিয়ে, বালিশ-ঢাকা তোয়ালে দিয়ে মুছে দিয়েছিলো তার মুখ। ক্ষীরোদ এই মুহূর্তে একটু জেগে আছে মনে করে, শ্রীপর্ণা আইস-ব্যাগটা সরিয়ে নিয়ে অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে তার উত্তপ্ত ডান হাতখানি তার ভিজা কপালের উপর নামিয়ে এনেছিলো। কোমল একটি প্রার্থনার মতো সে হাত। তেমনি এখনো ডান হাতখানি শ্রীপর্ণা আদিত্যর কপালের উপর রাখলো। মনে পড়ে, পাছে বিভাবতী জেগে ওঠেন, সেই ভয়ে তার আঙুলগুলিতে ছিলো কী সঙ্কোচ, আঙুল থেকে বাহুমূল পর্যন্ত তার হাতটা ছিলো বীণার তারের মতো টানা। ক্ষীরোদ বুঝতে পেরেছিলো কার এই ভাষা, আস্তে-আস্তে সেই হাতখানি সে টেনে নিয়েছিলো তার বুকের মধ্যে, সান্ত্বনার মতো, বিশ্বাসের মতো। তাড়াতাড়ি আদিত্যর গলার কাছে শ্রীপর্ণা তার হাত রাখলো, উঃ, হাতটা পুড়ে যাচ্ছে, জ্বরটা কী জোরেই যে এলো ! শ্রীপর্ণার ভয় করতে লাগলো, ভয়ে তার মনে হতে লাগলো নিজেকে নিতান্ত একা, নিতান্ত অসহায় বলে। তেমনি সে-সব রাতগুলিতেও তার ভয়ানক ভয় করতো, কিন্তু সে-ভয়ে তার এমন একা, এমন শূন্য লাগতো না : সে-ভয়ের অন্ধকার থেকে ফুটতো প্রার্থনার ফুল—তার গন্ধ যেন এই রাতেও লেগে আছে। শ্রীপর্ণা চেয়ে দেখলো, চাঁদ কখন হেলে গেছে পশ্চিমে, সেই জ্যোৎস্নার রেখাটি গেছে মিলিয়ে, সমস্ত ঘর খালি।

নিরঞ্জন অবিশ্যি তার কর্তব্যের কোনো ত্রুটি করলো না। সকাল বেলাই সে ডাক্তার নিয়ে এলো—তার সকালবেলাকার পৃথিবীতে তার আয়োজন-ব্যবস্থার কোনো ব্যাঘাত ঘটতে পারে না, তার সামাজিক মর্যাদার কথাটা একবার মনে করো। ডাক্তার বুকে স্টেথিস্কোপ লাগিয়েই বুঝলেন নিউমোনিয়া, দু'দিকই ধরে গেছে। ব্যাপার গুরুতর।

নিরঞ্জন তার ব্যয়ের বন্যতায় উদ্দাম হয়ে উঠলো : তাতে কী ? চিকিৎসা-পত্রের যাবতীয় ব্যবস্থা আমি ত্ব'মিনিটে করে ফেলছি।

এবং ত্ব'ঘণ্টায় সে যা কাণ্ড করে তুললো, তাতে বাইরের লোকের কাছে স্পষ্টই মনে হতে লাগলো, মিস্টার গুপ্তর বাড়িতে বিরাটকায় একটা উৎসব শুরু হয়েছে। হ্যাঁ, নিশ্চয়, বড়োলোকের বাড়ির ছেলের অসুখ, একটু ঘটা করতে হয় বৈ কি—বড়োলোকের বাড়ির মৃত্যুশোকটাও সর্বোচ্চকণ্ঠেই নিনাদিত হয়। হ্যাঁ, নিরঞ্জন শহরের সবগুলি সেরা-সেরা ডাক্তার আদিত্যর পিছে লেলিয়ে দিল—অনেক ডাক্তারে মিলে পরামর্শ না করলে, এ-বাড়ির দরজায় অনেক গাড়ি একসঙ্গে না দাঁড়ালে নিরঞ্জনের মান থাকে না। আদিত্যকে বাঁচানোর চাইতে তার সম্মান বাঁচানোটাই আগে দেখতে হবে।

নিরঞ্জন শ্রীপর্ণাকে গিয়ে বল্‌লে,—তুমি একা পারবে না, এ ভারি শক্ত রোগ। ত্বটো নার্স রেখে দি।

কুণ্ঠিত হয়ে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—কী দরকার!

বিরক্ত হয়ে নিরঞ্জন বল্‌লে,—অন্তত রোগের বেলায় মাতৃস্নেহ নিয়ে কবিত্ব কোরো না। মা হয়ে কেবল কাঁদতেই তো পারবে—কাঁদবার সময় একদম কিছু ফুরিয়ে যাচ্ছে না কারুর। আগে একবার প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখা যাক্ ছেলেটাকে বাঁচানো যায় কিনা। ডাক্তারদেরো তাই মত, নার্স চাই। উদগ্র উল্লাসে নিরঞ্জন প্রায় পাশবিক হয়ে উঠলো : এখন চাই কঠিন ডিসিপ্লিন, প্যাচপেচে সিণ্টিমেণ্ট নয়। টাকা, টাকার জন্যে ভেবো না। নিরঞ্জন তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করে নীচে নেমে গেলো।

এলো ত্ব'-ত্বটো ফিরিঙ্গি নার্স উঁচু কিরায়ায়, মণে মণে বরফ, চাকর লাগলো গোটা কয়েক, ওষুধে-পত্রে, ফলে-মূলে, নানান উপকরণে ঘরটা বোঝাই হয়ে উঠলো আদিত্যর। কাজে যতো না লাগুক, নিরঞ্জনের কাজে লাগছে, তার আত্ম-প্রচার, তার বিলাসোৎসবের কাজে। এ-ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট বলে নিরঞ্জন তাদেরকে তার শোবার ঘরটা ছেড়ে দিতে চাইল যতোদিন না কিছু সম্পূর্ণ একটা ব্যবস্থা হয়—এ নিরঞ্জনেরই মুখের কথা—ততোদিন না-হয় সে নীচে, বা পাশের লাইব্রেরি-ঘরটাতে গিয়ে শোবে—তার জন্যে ভাবনা কী! বলা বাহুল্য, শ্রীপর্ণা গম্ভীর মুখে জানালো এ-ঘরটা এমন কিছু ছোট নয়, বেশ খটখটে, ডাক্তাররা এর অনুমোদন করেননি, এবং এ-ঘরটাই বেশ নিরিবিলি।

তা, থাক্, ও-ঘরে, কিন্তু শ্রীপর্ণা চলে আসুক সরে। রোগীর কাছে নার্সরাই মা, মা নার্স না-ও হতে পারে সব সময়। রোগটা একটা বিধিবদ্ধ বিজ্ঞানের বিষয়, এলোমেলো খানিকটা হা-হুতাশের নয়। বলা বহুলতরো হবে, শ্রীপর্ণা সে-ঘরে শিকড় গজালো।

নিরঞ্জনের এই নিষ্ঠুর নির্লজ্জতায় শ্রীপর্ণা ভিতরে-ভিতরে কালি হয়ে গেলো। আদিত্যর অসুখ করেছে, সে যেন তার একটা আসুরিক আস্ফালন। ঐশ্বর্যের বিদ্যুদ্দন্তে সে হাসছে। দীপ্তি নেই, শুধু তাপ, শুধু দাহ—দুঃসহ অপমানে শ্রীপর্ণা যেন খাক হয়ে যাচ্ছিলো। এতোদিনে নিরঞ্জন যেন তার উদারতা দেখাবার সুযোগ পেয়েছে, তার বর্বর উদারতা : শ্রীপর্ণা ও আদিত্যর জন্যে সে কতোখানি প্রসারিত হতে পারে, তারই একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ দেবার সুযোগ। আদিত্য যদি আজ মরেও যায়, তবে, শ্রীপর্ণা যদি বলে, তবে তার চিতায় সে একটা সোনার মঠ পর্যন্ত তৈরি করে দিতে পারে। শ্রীপর্ণা যদি চায়, শ্রীপর্ণার জন্য সে কী না করতে পারে সংসারে? টাকায় কী না করা যায়!

শ্রীপর্ণাকে আদিত্যর পাশ থেকে সরানো গেলো না। কখন গায়ে দু'ঘটি জল ঢেলে দুটি মুখে দিয়ে আবার সে এসে তার পাশ ঘেঁষে বসে, নিরঞ্জন ঘুণাক্ষরে জানতেও পারে না। চেহারা তার এ ক'দিনে আরো কাহিল, আরো কুৎসিত হয়ে গেছে—যেন ঢল্‌ঢলে মলাটে উইয়ে-খাওয়া একটা বই; তার দিকে তাকানো যায় না, পড়া যায় না একটিও আর লাইন। চোখ গিয়েছে বসে, গাল গিয়েছে তুবড়ে, কণ্ঠার হাড় দুটো উঠেছে ঠেলে। আগে যদিও বা সে একটি দীঘি ছিলো, এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা ডোবা। সমস্তটা শরীর পাকিয়ে গেছে গ্রন্থিল একটা দড়িতে। যেন শ্মশানের অন্ধকারে পাখা ঝাপ্‌টে বেড়াচ্ছে একটা শকুন।

নিরঞ্জন একদিন দাঁড়ালো তার মুখোমুখি। গলা ঠিক চড়াবে না নরম করে আনবে বুঝতে পারলো না।

বল্‌লে,—তুমি রাতদিন এই রোগা ঘরে বসে আছো কেন? পয়সা দিয়ে তবে নার্স রেখে দিলুম কী করতে?

শ্রীপর্ণা আর্দ্র চোখে চেয়ে বল্‌লে,—আমার জন্যে তো আর তোমার পয়সা লাগছে না।

নিরঞ্জন কঠিন স্তব্ধতায় গুম হয়ে রইলো। বল্‌লে,—তোমার জন্যে লাগছে

না, না-হয় আর কারুর জন্যে লাগছে—সে যাই হোক্, ওতে আমার একটি আধলাও এসে যাচ্ছে না। কিন্তু, নিরঞ্জন তার মুখের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করলো : কিন্তু তোমার এ কী চেহারা হয়ে গেছে!

—চেহারা দিয়ে আমি কী করবো? শ্রীপর্ণা সর্বাঙ্গে শিথিল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে গেলো।

নিরঞ্জন নিদারুণ ঘৃণায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়ালো। তার সমস্ত চেতনা ঘৃণার কঠিন, উজ্জ্বল একটা স্ফটিকে গেলো রূপান্তরিত হয়ে। তার চোখের দৃষ্টি ঘৃণায় শাণিত হয়ে উঠলো তলোয়ারের ব্যগ্রতার মতো। অভিভূত হয়ে গেলো সে সেই ঘৃণায়—সেই অশরীরী উত্তপ্ততায়। কেন যে তার ঘৃণা, স্পষ্ট কারণ সে কিছু খুঁজে পেলো না : ঘৃণা হলো শ্রীপর্ণার এই উৎসারিত স্বাভাবিকতাকেই। তাইতেই শ্রীপর্ণা তার শত্রু,—জল যেমন আগুনের। নিরঞ্জন ঘরে-বাইরে এই ঘৃণার আনন্দে বিভোর হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এই ঘৃণা তাকে একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছে। এতো দিনে সে যেন তবু একটা কিছু পেলো, জীবনের একটা কিছু স্থূল, স্থাবর সম্পত্তি : তার এই ঘৃণা, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। প্রেমের সেই গলিত মধুরতার চেয়ে ঘৃণার এই বিষাক্ত তিক্ততায় অনেক বেশি স্বাদ, অনেক বেশি মত্ততা। প্রেমে তবু একটা নিরবয়ব আতঙ্ক থাকে, ঘৃণায় উদগ্র মুক্তি, নিশ্চিন্ত অবসর। ঔদাসীন্য নয়, তাতে প্রাণ নেই, উদ্দীপনা নেই, উল্লাস নেই : ঘৃণা, নির্ধূম, ঊর্ধ্বায়িত একটা শিখা, শব্দহীন অট্টহাস্য। সত্যি করে বলতে গেলে, কোনো কারণ নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই : একটা অহেতুক আনন্দ, নিরুদ্দেশ লোলুপতা। নিরঞ্জন জর্জর হয়ে ফিরতে লাগলো এই ঘৃণার হিংস্রতায়।

শ্রীপর্ণাকে তার যে কী বীভৎস কুৎসিত লাগছে, বিশেষতো এই তার শাড়িতে, তার গয়নায়, যেন কঙ্কালও তার চেয়ে সুন্দর, তার চেয়ে শোভন—কঙ্কালেও একটা সত্য আছে, আছে একটা অনুপাতের সুষাম্য। না, এই শ্রীপর্ণাকে সে কোনোদিন ভালোবাসেনি, এই তার দুর্বল ভাবাকুলতায়। বরং সেদিনের শ্রীপর্ণা তার সেই রুক্ষ সুচারু কৃশতায় অনেক সুন্দর ছিলো। তার শাড়ির সেই শুভ্রতা ছিলো অনেক পবিত্র। মুখে তার সেদিন এমন একটা কুৎসিত কান্না ছিলো না, ছিলো একটি বিষাদের স্নিগ্ধতা। সেদিনো সে সম্পূর্ণ ছিলো, নিজের নিভৃত একাকীত্বে ছিলো সে ছন্দোময়। বরং, তবু সে ছন্দ বজায়

রাখতে পারতো, যদি সে নিরঞ্জনের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারতো জীবনের বহুব্যাপী উপভোগের উচ্ছ্বাসে, দুই হাতে মুঠো-মুঠো মুহূর্ত ছড়াতে-ছড়াতে। যদি সে দেহ-মনে নাগরিক, সভ্য হয়ে যেতে পারতো, যদি হাতে পতাকা নিতে পারতো এই শতাব্দীর সভ্যতার। কিছুই পারলো না সে, স্বর্গেও নয়, পৃথিবীতেও নয়, মাঝখানে শূন্যে সে লেগেছে দুলতে—এই তার কিছু-না-হওয়ার শূন্যে। ঘৃণায় নিরঞ্জন কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো। বরং সেই সে ভালো ছিলো তার সেই বিষণ্ণ শুভ্রতায়, সেই কোমল বিরতিতে। তার মুখে তখন শোক ছিলো না, ছিলো শান্তি। কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিলো না, ছিলো বিস্তীর্ণ একটি সমর্পণ। সমস্ত শরীরে ছিলো তপস্যার একটি আভা, কঠিন একটি নির্মলতা : তাকে ছোঁয়া যেন মন্দিরের গহ্বরে গিয়ে দেবতার বিগ্রহকে ছোঁয়া। রুক্ষ অগোছাল চুলে, নিরাকাঙ্ক্ষ গভীর দু'টি চোখে, উদাস কপালে, রিক্ত দু'খানি হাতে, তার অস্তিত্বের পরিব্যাপী নিস্পৃহতায় সে ছিলো নিরঞ্জনের আত্মার প্রশান্ত একটি প্রার্থনার মতো। তাকেই সে ভালোবেসেছিলো, এই বিলাসিনী শ্রীপর্ণাকে নয়। তার কাছে শ্রীপর্ণা আজ চলে এসেছে একটা তথ্যের নিশ্চল সীমাবদ্ধতায়। গয়না-শাড়িগুলো ঠিক তার গায়ে-গায়ে বসছে না, দেখাচ্ছে যেন রূঢ় বিজ্ঞাপনের মতো : যেন নির্বাপিত চিতার উপর সারি-সারি মাটির বাতি বসানো হয়েছে।

শ্রীপর্ণাকে সে ঘৃণা করে, অথচ শ্রীপর্ণাকেই সে চায়।

এদিকে আদিত্যের অসুখটা ইদানি খুব বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে স্ফীততরো হয়ে উঠছে নিরঞ্জনের অমিতব্যয়িতার পরিমাণ, কোথাও এক বিন্দু সে খুঁত রাখছে না, তার বিরুদ্ধে যাতে কারু কোনো বিন্দুতম নালিশ না থাকতে পারে। মাঝ-রাতের ঘুমের অন্ধকার থেকে মাঝে-মাঝে সে চম্‌কে উঠছে, যেন এক্ষুনি শ্রীপর্ণা কেন-কে-জানে আকস্মিক চিৎকার করে উঠলো। নিরঞ্জন গা ঝেড়ে মাঝে-মাঝে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে : কই, কোথায় কী শব্দ, অন্ধকারে ঝিল্লি ডাকছে, হাতুড়িতে ছোট-ছোট বরফ-ভাঙার শব্দ, নার্সদের অস্ফুট ক'টি ফিস্‌ফিসানি। দূরে রাস্তায় জ্বলছে গ্যাস। নিরঞ্জন আবার শুয়ে পড়ে, ঘুম আসে না, এতো নিস্তব্ধতায় তার ঘুম আসে না।

একদিন, মাঝরাতে, নিরঞ্জন এমনি একটা স্পষ্ট চিৎকার শুনতে পেলো, হ্যাঁ, ঠিক শ্রীপর্ণার গলা। শ্রীপর্ণা ছাড়া এতো জোরে আর কে চেঁচিয়ে উঠবে!

নিরঞ্জন ধড়মড় করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলো। চটি-জুতোটা খুঁজে নিয়ে গায়ে সে জামা পরলে: শ্রীপর্ণাকে সে ঘৃণা করে বটে, তবু শ্রীপর্ণাকেই সে চায়—দরজা খুলে চল্‌লো সে আদিত্যর ঘরের দিকে।

পুরু শেডের তলায় ঘরে আলো জ্বলছে মিট্‌মিট্‌ করে, আদিত্যর শিয়রের কাছে শ্রীপর্ণা মলিন একটি রেখায় ঘুমে পড়েছে ভেঙে, চেয়ারে বসে রাতের নার্স দিচ্ছে পাহারা। কোথাও কিছু নয়।

দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শুনে নার্স বেরিয়ে এলো। ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে,—আপনি উঠে এসেছেন কেন?

নিরঞ্জন ক্লান্ত গলায় বল্‌লে,—বড্ড অস্থির লাগছে।

—না, না, কিছু চিন্তা করবেন না। মিসেস গুপ্তকে তো অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি, আপনিও যদি অবুঝ হ'ন, নার্স গম্ভীর হয়ে গেলো: তা হলে আর কী করে চলে? যান, শুয়ে পড়ুন গে।

নিরঞ্জন জিগ্‌গেস করলে: এখন কেমন আছে?

—একই রকম। নার্স ঘরের মধ্যে চলে গেলো: ভাবনার কিছু নেই। এই এখন একবার জ্বর নেবো।

নিরঞ্জন আর দাঁড়ালো না। নিজের ঘরে গিয়ে পাইচারি করতে লাগলো।

পরদিন সকালবেলা নিরঞ্জন আবার আরেকটা কান্নার শব্দ শুনলে। এবার স্পষ্ট দিনের বেলা, নিরঞ্জন নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে না। ব্যস্ত হয়ে ছুটে সে আদিত্যর ঘরে গেলো, কিন্তু ব্যাপারটা সে কিছু বুঝে উঠতে পারলো না। আদিত্যর বুকের পাশে বসে কে-একটি প্রৌঢ় মহিলা তার কপালে-চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, আর চোখে আঁচল চেপে কাঁদছেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে; নার্স তাঁকে হাতে ধরে কাঁদতে বারণ করছে, আর দূরে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে শ্রীপর্ণা রয়েছে দাঁড়িয়ে, অপরাধীর মতো, শুক্‌নো, শূন্য চোখে। নার্সের অনুরোধে মহিলাটি অতি সহজেই নিবৃত্ত হলেন। নিরঞ্জন ফাঁপরে পড়লো। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়ে জিগ্‌গেস করলে: কি, কী হলো?

কেউ কোনো উত্তর দিলো না, শুধু মহিলাটি নিরঞ্জনের গলা শুনে তাড়াতাড়ি মাথায় প্রকাণ্ড একটা ঘোমটা টেনে দিলেন।

আদিত্য রোগা, বিশীর্ণ মুখে অস্ফুট হেসে উঠলো: ও ভদ্দরলোক। ভদ্দরলোককে দেখে লজ্জা কিসের, ঠাকুমা?

ঘরে যেন আগুন লেগেছে এমনি দ্রুততায় নিরঞ্জন ঘর থেকে গেলো বেরিয়ে।

মহিলাটি কতোক্ষণ পরে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে নিরঞ্জন জরুরী কাজে শ্রীপর্ণাকে লাইব্রেরি-ঘরে ডেকে আনলো, বল্‌লে,--কে এসেছিলো ?

শ্রীপর্ণা অবসন্ন গলায় বল্‌লে,—আদিত্যের মুখেই তো শুনলে, ওর ঠাকুমা।

—ওর ঠাকুমা মানে তোমার শাশুড়ি ?—কী, কথার জবাব দিচ্ছ না কেন ?

—আদিত্যর ঠাকুমা বল্‌লে যদি চিনতে না পারো, শ্রীপর্ণা ঢোঁক গিল্‌লে : হ্যাঁ, তাই, আমার শাশুড়ি।

সহসা কী কথা বলে' বসবে নিরঞ্জন ভেবে পেলো না। বল্‌লে,—তাঁরা না তোমাকে ত্যাগ করেছিলেন ?

—আমাকে করেছেন, কিন্তু আদিত্যকে করেননি।

নিরঞ্জন সোজাসুজি চটে উঠতে পর্যন্ত পারলো না। শেল্‌ফ্ থেকে একটা বই তুলে নিয়ে এলোমেলো পৃষ্ঠা উল্‌টোতে-উল্‌টোতে বল্‌লে,—তুমি বুঝি তাদেরকে খবর দিয়েছিলে ?

—না, খবর তাঁরা আপনা থেকেই পেয়েছিলেন।

—তা পান্, কিন্তু আমার বাড়িতে এই সব চলবে না।

—কী সব ?

নিরঞ্জন চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগে বই পড়ছে।

শ্রীপর্ণা অসহিষ্ণু হয়ে বল্‌লে,—আদিত্যকে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন, তার অসুখ শুনে—

নিরঞ্জন বলে উঠলো : এ আবার এমন কী অসুখ যে মান-সম্মান ভুলে তক্ষুনি একেবারে ছুটে আসতে হবে এ-বাড়ি ?

শ্রীপর্ণা নির্লিপ্ত মুখে বল্‌লে,—মান-সম্মানের কথা আসে কী করে ? তবে অদিত্যকে তিনি দেখতে এলে তুমি তাঁকে তাড়িয়ে দিতে চাও নাকি ?

—তবে ও-বাড়িতে গিয়ে থাকলেই পারো। ছেলে নিয়ে, শাশুড়ি নিয়ে, গুষ্টিবর্গ নিয়ে। বইয়ের পৃষ্ঠায় নিরঞ্জনের মুখ ঢাকা : তবে আর এখানে পড়ে আছো কোন দুঃখে ? এটা আমার বাড়ি—আমার বাড়িতে চলবে না এ-সব নুইসেন্স। আমি তোমাকে আগে থাকতে বলে রাখছি

শ্রীপর্ণা দেয়ালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলো।

হঠাৎ হাতের বইটা আরেকটা চেয়ারের উপর ছুঁড়ে ফেলে নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ালো : আমি চলে যাবো এ বাড়ি ছেড়ে।

—তোমার বাড়ি, তুমি যাবে কেন? শ্রীপর্ণা কুটিল করে তাকালো একবার নিরঞ্জনের মুখের দিকে : বরং আমাদেরকেই তাড়িয়ে দিয়ো। বলে দ্রুত পা ফেলে সে চলে গেলো নিরঞ্জনের দীর্ঘশ্বাসেরো আগে।

সন্ধ্যের দিকে শ্রীপর্ণাকে সে আবার ডাকালে।

—আমি আজ রাত্রেই চলে যাবো ঠিক করলুম।

শ্রীপর্ণা ভীত, পাংশু মুখে বল্‌লে,—কোথায়?

—তা জানি না।

—জানো না মানে?

—জানি না মানে যাবো!

শ্রীপর্ণা কথাটাকে আমোলেই আনবার চেষ্টা করলো না : পাগল! আদিত্যর এমন অসুখ, তুমি এখন যাও কী করে?

—কেন, আমি থেকে কী এগিয়ে দিচ্ছি? তোমার টাকার দরকার, রেখে যাচ্ছি যথেষ্ট।

—কিন্তু, শ্রীপর্ণা প্রশান্ত, পরিষ্কার গলায় বল্‌লে,—তুমি এখন গেলে ভালো দেখায় না।

—ভালো দেখায় না?

—না। শ্রীপর্ণার গলা আরো শুকনো, আরো প্রাঞ্জল হয়ে উঠলো : কাল ডাক্তাররা এসে তোমাকে বাড়ি দেখতে না পেলে কী বলবেন? কাল সকালে-সন্ধ্যেয় দলে-দলে তোমার বন্ধু ও বন্ধুনিরা যখন আদিত্যর খবর নিতে আসবে, তখন তোমার অনুপস্থিতি তাদের কী বোঝাবে?

নিরঞ্জন ঠাণ্ডা হয়ে গেলো, একটি কড়ে আঙুলও সে তুলতে পারলো না।

আমাকে কেউ ভালোবাসে তার মধ্যে গৌরব আছে, কিন্তু আমার ভালোবাসা কেউ প্রত্যাখ্যান করলো, তার মধ্যে গভীর, দুঃসহ লজ্জা। সভ্য মানুষ প্রাণপণে তা লুকিয়ে রাখে, যা ভালো দেখায় না, তেমন কোনো জিনিস দেখিয়ে সেই দুঃখহীন লজ্জাকে কেউ উদ্‌ঘাটিত করতে পারে না।

শ্রীপর্ণার এক নিশ্বাসে নিরঞ্জন ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। একমাত্র গাড়িটা নিয়েই সে এখানে-সেখানে ঘুরে আসতে পারে।

পনেরো

একটুও আশ্চর্য নয়, নিরঞ্জনের নিখুঁত বিধি-ব্যবস্থার জোরে, টাকার জোরেই বলতে পারো, আদিত্য ভালো হয়ে উঠলো। এতো সেবা, যত্ন ও অর্থব্যয়ের এই একমাত্র ফল দাঁড়াতে পারে, অনিবার্যরূপে। আদিত্য ভালো হয়ে উঠলো। এখন শুধু তার আস্তে-আস্তে সবল হয়ে ওঠবার প্রতীক্ষা। তাই তাকে এখনো দীর্ঘ দিন বিছানার বিশ্রামে থাকতে হচ্ছে।

এর পরে, এখন থেকে, সংসারের আকাশে লঘু পাখায় শ্রীপর্ণার ছড়িয়ে পড়ার কথা। এখন থেকে ঘটনার পাথরে একেক করে পা ফেলে-ফেলে সময়ের ঝর্ণাটা সে অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে। আর কী, আবার শরীরে নিয়ে আসতে পারে পুরোনো সেই ভঙ্গিমা, মনে সেই মসৃণ মুক্তি।

কিন্তু ব্যাপার ঘটলো উল্‌টো। শ্রীপর্ণা আদিত্যর ঘরের মধ্যে নিজেকে আরো ঘন করে গুটিয়ে নিলে।

সংসারের বদ্‌লে গেছে সুর : বদ্‌লে গেছে পৃষ্ঠপট। তাতে শ্রীপর্ণা আর না পাবে সঙ্গতি, না পাবে সমানুপাত। সে এখন নিতান্ত খাপছাড়া, অবান্তর চিঠির শেষে ইতির মতোই নিরর্থক।

নিরঞ্জন আজকাল আর বাইরে বেরোয় না, সমস্ত বাহিরটাকেই সে একরকম তার বাড়ির মধ্যে টেনে এনেছে। বাড়ির মধ্যে মানে নীচের তলায়, তার ড্রয়িং-রুমে। সেইখানে উত্তাল হয়ে উঠেছে তার ঘৃণা, তার ঘৃণার মদির মহোৎসব। সেইখানে উড়ে-উড়ে আসে শহরের সব রঙিন প্রজাপতিরা, মদের গ্লাস থেকে উপচে-পড়া ফাল্‌তু খানিকটা ফেনার মতো সমাজের সেই ফেনবিন্দুগুলি—যারা 'আমি বেঁচে আছি' এই খবরটা জানাচ্ছে শুধু তাদের শরীরে, যারা সৌন্দর্য ও রূপকে নিয়ে এসেছে একটি সমতল সমার্থকতায়, যারা জীবনকে পেয়েছে প্রকট স্পষ্টতার মধ্যে, প্রচ্ছন্ন রহস্যের মধ্যে নয়। কাচের বাসনের মধ্যে ভাসমান কতোগুলি মাছ, কাগজের কতোগুলি ফুল। বেড়াল চুরি করবে না বিশ্বাস করা যায়, প্রেমে পড়বে না বলে যাদের বিশ্বাস করা যায়

না। যারা হাসতে হবে বলে হাসে, কী কায়দায় কখন কাঁধ নাড়তে হবে জেনে কাঁধ নাড়ে, ঠোঁট কুঁচকোনোটাকে যারা একটা মুখের কারুকার্য হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছে। তাদের ও তাদের অনুষঙ্গগুলিকে নিয়ে নিরঞ্জন প্রতি সন্ধ্যায় হাট জমায়। কখনো গান, কখনো হাসি, কখনো হুল্লোড়। ওড়ে চা, পোড়ে সিগ্‌রেট্‌, বাটিতে-বাটিতে, কৌটোয়-কৌটোয়। খিদমৎগাররা আঙুলের ইশারায় উঠছে-বসছে, সমস্ত বাড়ি তটস্থ। স্ফূর্তির ঝড় বইছে উদ্দাম। অনেক—অনেক রাত পর্যন্ত।

শ্রীপর্ণা সেই সময়টা, অনেক রাত পর্যন্ত, উপরের ঘরের জানলায় চুপ করে বসে থাকে। এ-সময়টায় কোনো-কোনো রাতে জ্যোৎস্না থাকে, কোনো রাতে বা থাকে না। নীচের সেই আলোকিত কোলাহলের ঊর্ধ্বে শ্রীপর্ণার অন্ধকারে একটি স্তব্ধতা থাকে জেগে। কোনো কিছু মনে করতে গেলে, বহু দূর অতীতে মনের গভীর অন্ধকারে কিছু খুঁজতে গেলে সে পায় শুধু এই স্তব্ধতা। যারা মরে গেছে তাদের যদি কেউ বা কখনো বাঁচে, তারা বাঁচে শুধু এই স্তব্ধতায়। মৃত্যুর তুমি আর কিছু মনে করতে পারো না, এই স্তব্ধতা ছাড়া।

সেই সব দিনগুলি তার জীবনের উপর শিশিরের মতো ঝরে পড়েছিলো। শ্রীপর্ণার মনে পড়ে তার বিয়ের সেই রাত, শরীরের মধুর সেই লজ্জা: তার মৃত্যুর সেই দিন, শরীরের মধুর সেই রিক্ততা। সে-সব দিন পল্লবে-ঢাকা বৃন্তবিনত ফুলের মতো কমনীয় ছিলো, ছিলো না আঙুর-নিঙড়ানো মদের মতো ঝাঁজালো। সে-সব দিনে সে সীমাস্খলিত বন্যাবেগ ছিলো না, ছিলো আপন পরিমিত রেখায় আঁকাবাঁকা একটি নির্ঝরিণী। সে-সব দিনে সে কতো সুন্দর ছিলো, কতো পবিত্র। উগ্র চোখের অন্তরালে বনের কিনারে ফোটা ছোট লাজুক একটি ফুলের মতো তার সেই শেষ কৈশোর, প্রতিপদের চাঁদের খানিক রেখার মতো তার প্রথম সেই উন্মোচন।

আজ আর তার সেই লজ্জা নেই, সেই শুচিতা নেই। সবই যেন স্থির, স্পষ্ট, প্রতিপাদিত! আর সেই প্রতীক্ষা নেই, সেই ঘুমিয়ে জেগে থাকা। সবই যেন জানা, ফুরিয়ে ফেলা, দাগা বুলোনো। একটা ধারাবাহিক সমাপ্তি। শ্রীপর্ণা এ কী হয়ে গেছে!

ক্ষীরোদের সঙ্গে তার টুকরো-টুকরো দেখা হতো, জলের ঢেউয়ে ভাঙা-ভাঙা ছায়ার মতো। চারদিকে ভাসুর আর শ্বশুর, গুরুজনের ভিড়, তারই মধ্যে

হঠাৎ একটা ফাঁকা জায়গায় চপল একটি মুহূর্তে তাদের হয়তো দেখা হয়ে যেতো, চোখের বিশাল একটি চাওয়া, হয়তো ত্বরিত আঙুল এসে লাগতো আঙুলের মুখে, হয়তো বা কনুয়ের কাছে একটি চিম্‌টি, একটা গুলি-পাকানো কাগজের একটা টুকরো এসে পড়তো তার মুখের উপর। সমস্ত দিনে দিন যেন আর কাটতে চাইতো না; পৃথিবী থেকে রাতগুলি যেন উড়ে পালিয়েছে। ভাঙা-ভাঙা আলাপে তাদের তৃপ্তি হতো না: 'আধ গ্রাশ জল যেন নিদাঘের কালে।' তারপর, দীর্ঘতম দিনেরো শেষ আছে, নামতো রাতের অন্ধকার, তার গায়ের উপর ঝল্‌মলে শাড়ির মতো। কখনো ক্ষীরোদ পড়েছে ঘুমিয়ে, জায়েদের সঙ্গে-সঙ্গে সংসারের পাট তুলে চুপিচুপি চলে এসেছে সে ঘরে, হাতের মুঠিতে সাজা দু'টি পান নিয়ে। কখনো সে পড়েছে ঘুমিয়ে, ক্ষীরোদ টেবিলে জেগে একজামিনের পড়া করছে। তাদের সেই ঘুম, তাদের সেই ঘুম ভাঙিয়ে দেয়া। অথচ ক্ষীরোদকে সে কোনোদিন 'ভালোবাসেনি'। সমস্ত রাত কী যে তারা এতো কথা কইতো একটি নিশ্বাসও আজ তার মনে নেই। শুধু শ্রীপর্ণা যে কতো সুন্দর ও ক্ষীরোদ যে কতো ভালো, নানা নীরবতায় তারই কেবল পুনরাবৃত্তি চলতো। যতোবার আওড়াও, একেকটা কবিতা যেমন ততোবার নতুন মনে হয়, তেমন শ্রীপর্ণা যে সুন্দর আর ক্ষীরোদ যে ভালো—দু'টি তথ্য একত্র হয়ে একটি সত্যে উঠতো অসীম হয়ে—এ-কথা তারা কিছুতেই ফুরিয়ে ফেলতে পারতো না। তখন তাদের মাঝখানে কতোগুলি উপকরণের স্তূপ ছিলো না: সজ্জা আর আভরণ, জিনিস আর জিনিস: তখন তাদের মাঝে চাঁদ জাগতো, তারা ফুটতো, আকাশ থাকতো অন্ধকার হয়ে। তাদের, তার সেই রাত। কিছুই জানতো না, কিছুই তারা বোঝেনি—তাদের সেই আদিম, অপার্থিব বিস্ময়, তাদের মধুর অজ্ঞানময় অন্ধকার। কী পেলো সে বুদ্ধি দিয়ে? কী দেখলো সে তার চোখের এই প্রখর উন্মীলনে?

কাটা-কাটা ভাবে কতো ছবি তার মনে পড়ছে। কতো চপল ছেলেমান্‌সি। কী করে তার হাত থেকে চুলের খোঁপাটা সে আস্ত রাখতে চেষ্টা করতো, কতোবার সে তার চাবি রেখেছে লুকিয়ে, পরে চৌবাচ্চার জল-দেবতাকে পান-সুপারি মানতে যাবার সময় তার ম্লান মুখের দিকে চেয়ে কেমন বার করে দিয়েছে আস্তে-আস্তে, কেমন একেক দিন দুপুরে তার বাবার কড়া পাহারা এড়িয়ে এখানে-সেখানে তার জন্যে সে উঁকিঝুঁকি মেরেছে, অথচ মুখে এমন

একখানি ভাব, যেন কিছুই হয়নি পৃথিবীতে, শুধু আজ হঠাৎ ভীষণ গরম পড়েছে কল্‌কাতায়। সময় চলে যাচ্ছে, না, থেমে আছে, তাদের হিসেবেই আসতো না, পায়ে-পায়ে শুধু দিনগুলি ছিলো দীর্ঘ, রাতগুলি যেতো একটি ঘুমের পরেই ফুরিয়ে। সময় পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে, কেটে-কেটে দিনগুলিকে আনলো ছোট করে।

মনে আছে কতোদিন ক্ষীরোদ ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকতো, আর তার হাতার উপর বসে তার কাঁধের কাছে বেঁকে গিয়ে শ্রীপর্ণা আর কিছু করবার না পেয়ে চিরুনি দিয়ে ধরে-ধরে তার চুল আঁচড়ে দিয়েছে। কতোদিন তারা দাঁড়িয়েছে এসে জানলায়, যখন কখনো আকাশ এসেছে মেঘে কালি করে, যখন বড়ো-বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি এসে পড়েছে তাদের মুখের উপর। তাদের সে-সব দিনে কোনো কথা ছিলো না, ছিলো স্বর : কোনো আস্বাদ ছিলো না, ছিলো অনুভব : তাদের ঘুমের উপর দিয়ে শুধু সময় গড়িয়ে যাওয়া! কতোদিন মা হয়তো লুকিয়ে তাকে একটা কিছু খেতে দিয়েছেন, সেটা সে আরো লুকিয়ে এনেছে ক্ষীরোদের মুখের গহ্বরে। কতোদিন সে হয়তো ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে কোনো সংসারের কাজে, দরজার কড়ার সঙ্গে কখন তার আঁচলটা গেছে জট পাকিয়ে। হাতের বাসনটাই সে নামিয়ে রাখবে, না, দরজার ফাঁসটাই সে আগে ছাড়াবে, শ্রীপর্ণা কিছু ভেবে উঠতে পারছে না। দাঁড়াও, সে-ও প্রতিশোধ নেবে। তুই চোখ প্রাণপণে বুজে এমন সে আজ ঘুমুবে—ভাবতেই শ্রীপর্ণা হেসে উঠতো : দাঁড়াও, তবু সে ছাড়বে না।

বনের অন্ধকারে সব সময়েই যেমন মনে হয় কিসের একটা ছায়া ঘুরছে তোমার সঙ্গে-সঙ্গে, তেমনি শ্রীপর্ণা তার মনের অন্ধকারে ক্ষীরোদের ছায়া দেখতে লাগলো—তার সেই মৃত্যুর তুহিনতা!

মরবার পর ক্ষীরোদকে যে কতো সুন্দর দেখিয়েছিলো আজকে সময়ের এতো দূরে বসে শ্রীপর্ণার প্রথম মনে হচ্ছে। জীবদ্দশায় তোমার রূপের জন্যে তোমাকে হয়তো অনেক আয়োজন করতে হয়, তোমার বেশভূষা, তোমার শরীর-শ্রী, তোমার কতো কী, কতো কী নয়,—কিন্তু মৃত্যুর বেলায় তোমার রূপের জন্যে তোমাকে নির্ভর করতে হয় একান্ত তোমার চরিত্রের উপর। মৃত্যু আর সব ধুয়ে-মুছে এই সুপ্ত, প্রচ্ছন্ন চরিত্রটিকে শুধু ফুটিয়ে রাখে তার অসীম অব্যক্ততায়। মৃত্যুর বেলায়, শুধু মৃত্যুরই বেলায়, যা তুমি হয়েছ নয়, যা তুমি

ছিলে। ক্ষীরোদের মৃতদেহের সেই শিলাময় অপার নিশ্চিহ্নতায় স্পষ্ট রেখায় তার চরিত্রটি ছিলো লেখা—এতোকাল পরে প্রথমে যেন শ্রীপর্ণা তার পাঠোদ্ধার করতে পারলো।

শ্রীপর্ণা মাঝে-মাঝে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, ওপারের ছায়াটা সত্যি সে নিজে কিনা চেনবার জন্যে তাকিয়ে থাকে। সে কী অপরিচেয় কুৎসিত হয়ে গেছে, কী অশুচি! যে দেহ ছিলো তার একদিন গুণীর হাতের বীণা, তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে কতোগুলি হাড় আর মাংস। তার আর নেই সেই লজ্জা, সেই শুচিস্মিতি : এখন কেবল দাহ, এখন কেবল মুখরতা। আনন্দকে নিয়ে এসেছে সে স্ফূর্তিতে, সেই পরিচ্ছন্ন লাবণ্যটিকে নিয়ে এসেছে আবিল লবণাক্ততায়। সমস্ত শরীর যেন তার একসঙ্গে ছি-ছি করে উঠলো। চুলই বা আর সে বাঁধে কেন, শরীরে দোলায় শাড়ির হিল্লোল, কেনই বা সে আবার নতুন করে সংসার পেতেছে—ঘরের দেয়াল পর্যন্ত তাকে তীক্ষ্ণ দাঁতে ধিক্কার দিয়ে উঠলো। সে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা তথ্য, খবরের কাগজের খবর, কেনা-কাটার একটা হিসেব—কোথায় তার সেই কবিতার মতো সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা, কবিতার মতোই অসীম থেকে যাওয়া! এরই নাম বুঝি প্রেম—যা তার মাতৃস্নেহের চেয়েও প্রচণ্ড! শ্রীপর্ণা সরে আসে আয়নার থেকে। তার চেয়ে, তার এই গ্লানি, এই পরাভবের চেয়ে, উলঙ্গ, উদ্ধত পাপেও বুঝি বেশি মহত্ত্ব ছিলো।

শ্রীপর্ণার সময় আর কাটে না, সময়ের সেই রেখাটা আর দীর্ঘায়মান না হয়ে বৃত্তাকার হয়ে উঠেছে।

পার্টির মাঝখান থেকে নিরঞ্জন একদিন ব্যস্তসমস্ত হয়ে উপরে উঠে এলো। শ্রীপর্ণা আদিত্যর ঘরে, আদিত্যর পাশে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কী কতোগুলি কাগজ-পত্র নিয়ে নাড়া-চাড়া করছিলো, চম্‌কে উঠলো।

নিরঞ্জন বল্‌লে,—তোমাকে ওঁরা নীচে ডাকছেন।

—কেন? বালিশ দিয়ে কাগজ-পত্রগুলিকে সে চাপা দিলে।

—কেন আবার কী! তুমি আমাদের পার্টিতে জয়েন্‌ করবে না?

শ্রীপর্ণা রইলো চুপ করে, অপরাধীর মতো।

—আদিত্য তো এখন দিব্যি সেরেই উঠেছে, তবে আর বাধা কী? নিরঞ্জন এক পা এগিয়ে এলো : চলো, বাড়িতে তোমার এতো গণ্যমান্য গেস্ট এসেছেন—

—প্রথমতো, বাড়িটা আমার নয়, বালিশটাতে জানুর ভর রেখে শ্রীপর্ণা একটু-বা ভীত মুখে বল্‌লে,—দ্বিতীয়তো, এঁরা কেউই আমার কাছে আসেন নি।

নিরঞ্জন পিছু হট্‌লো না, সে-সব আধো-আলো আধো-ছায়ার ভাব তারা কাটিয়ে উঠেছে। স্পষ্ট করে বল্‌লে,—হলোই বা। অন্তত appearance তো রাখতে হয়। যা ভালো দেখায় না, তাই বা তুমি কী করে করতে পারো?

শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—তারো আর দিন নেই।

নিরঞ্জন সেটা গায়েই মাখলো না: খুব আছে। তুমি চলো। নিরঞ্জন হাসলো: ড্রেস করে নিলেই তোমাকে আবার ভালো দেখাবে।

—পোশাকে আর আমার স্পৃহা নেই একটুও।

—পোশাক! কোনটা তোমার পোশাক নয় শুনি? নিরঞ্জন ঘৃণায় ঝল্‌সে উঠলো: এই ছেলে, ছেলে নিয়ে এই তোমার গদ্গদভাব—এটা একটা পোশাক নয়? নিরঞ্জন সোজা হয়ে দাঁড়ালো: সব কিছুরই একটা সীমা আছে, ভদ্রতা আছে। উঠে এসো বলছি।

—তারা কেউ যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, শ্রীপর্ণা স্নিগ্ধ মুখে বল্‌লে,—এখানে চলে এলেই তো পারেন।

—তবু তুমি যাবে না?

—সত্যি, আমাকে কারুর ভালো লাগবে না। শ্রীপর্ণার মুখ বেদনায় ধূসর হয়ে এলো: আমি পারবো না সেখানে স্বর মেলাতে।

—তুমি এই ছেলে আঁকড়ে পড়ে থাকবে? নিরঞ্জন নীল হয়ে উঠলো!

শ্রীপর্ণা কথা কইলো না।

কী যে করবে, নিরঞ্জন হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুই তার করবার নেই। নীচে পার্টি চলেছে তুমুল।

দরজার দিকে সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলো। কুটিল, বিকৃত মুখে অদ্ভুত হেসে উঠে সে বল্‌লেঁ,—শুধু একটা ছেলে থাকলেই মায়ের সম্মান পাওয়া যায় না। সেই অর্থে পৃথিবীর যে-কোনো মেয়েই মা হতে জানে। তাতে কোনো কৃতিত্ব নেই।

নিরঞ্জনের তিরোধানের সঙ্গে ঘরের অন্ধকারও যেন সেই স্বরে হেসে উঠলো।

ষোলো

নিরঞ্জন পার্টি ভেঙে দিলো। সোফা-সেটিগুলি এলোমেলো, কুশনগুলি নিপীড়িত —শূন্য ড্রয়িং-রুম। ঘরময় পোড়া সিগ্রেটের টুকরো, বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে সেণ্টের ঝাঁজ, চাপা হাসির কঙ্কাল। কাউকে আর ডাকলো না সে বাড়িতে। যারা কাল এখানে-সেখানে ভুল করে রুমাল ফেলে রেখে গিয়েছিলো, তারা আজ ডাকতে এসে দেখলো নিরঞ্জন বাড়ি নেই! নিরঞ্জন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। Labrador-এর জমির কথা সে শুনেছিলো, যেখানে মাটির উপরে রাশি-রাশি রঙিন ফুল রয়েছে ফুটে,কিন্তু এক হাত নীচেই যেখানে জমানো বরফ। নিরঞ্জন ছেড়ে দিলো সেই প্রজাপতিপনা। দিন কয়েক আবার সে আপিস নিয়ে খুব মাতামাতি শুরু করলে, কতোগুলি লোকের চাকরি কেড়ে নিলো। ভীষণ কড়া, ভীষণ হুঁশিয়ার—নিরঞ্জনের হাতের কলমটা পর্যন্ত বুঝতে পারে তার এই রক্তের ধার। চুনোপুঁটি থেকে আপিসের ম্যানেজার পর্যন্ত তার এই মেজাজের চাকচিক্যে হকচকিয়ে গেছে। আগে সে কখনো-সখনো আপিসে এলে সবাই খুশি হয়ে উঠতো, এখন সে সময় ধরে রোজ আসছে বলে সবাই গেছে ভয় পেয়ে। তার মোটরের শব্দ শোনা মানে চোখে সর্ষেফুল দেখা। আগে যদি বা আসতো চেয়ে-চিন্তে কিছু টাকা কুড়িয়ে নিতে, এখন আসছে সে হিসেব মেলাতে। আগে যদি বা ভিক্ষা, এখন লুণ্ঠন।

কিন্তু তারপর? তারপর কোথায় সে যায়?

ম্যানেজারকে গোপনে ডেকে এনে নিরঞ্জন বল্‌লে,—ব্যবসা আমি তুলে দেবো।

তার চেয়ে ম্যানেজারের মুখে একটা চড় মারলে সহজে সে সেটা বুঝতে পারতো। ম্যানেজার আম্‌তা-আম্‌তা করে বল্‌লে,—সে কী বলছেন! এমন চল্‌তি ফ্যালাও কারবার, বছরে এতো মুনাফা দিচ্ছে—তুলে দেবেন কী?

—হ্যাঁ, তুলে দেবো। আমার ভালো লাগে না কিছু, আমি বিরক্ত হয়ে গেছি।

কথাটার কোনো কিনারা করা ম্যানেজারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। সে শুধু বল্‌লে,—কিন্তু এতোগুলো টাকা ঘরে এসে যাচ্ছে—

—টাকা! টাকা! টাকারো কি একটা সীমা নেই? ম্যানেজার যেন কী ঘোরতর অপরাধ করে বসেছে, নিরঞ্জন এমনি তার উপর মুখিয়ে উঠলো: টাকা দিয়ে কী হবে? টাকাগুলি আমি কী করে খরচ করবো বলতে পারেন? যথেষ্ট হয়েছে, এবার একটা নতুন কিছু করা যাক্।

—কিন্তু আপনার আপিসে এতোগুলি লোক খাটছে, ম্যানেজার মুখ কাঁচুমাচু করে বল্‌লে—তারা ভাতে মারা যায় যে। ব্যবসা তুলে দিলে তাদের কী উপায় হবে ভাবুন? এতোগুলি পরিবার—

নিরঞ্জন চম্‌কে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। সে অসহায়, টাকা তার স্বাধীনতা পর্যন্ত কিনে নিয়েছে।

ম্যানেজার বল্‌লে,—আপনার শরীর বিশেষ ভালো দেখছি না। দিন কয়েকের জন্য কোথাও চেঞ্জে-টেঞ্জে—

—দেখি।

নিরঞ্জন তার মোটরে বেবিয়ে পড়লো।

কিন্তু কেনই বা সে যাবে? তার হারবার কথা নয়, সংসারে যার টাকা আছে সে কখনো হারে না, তাকে হার কখনো শোভা পায় না বলে। সে যাবে কোথায়? এ তার বাড়ি, তার সমস্ত। এতো যার টাকা, সে এ-কথা ভোলে কী করে? ব্যবসা তুলে দিলে দেশ তাকে কী বলবে—ব্যবসাবিমুখ এই বাঙলা দেশ? অন্তত দেশের কাছে একটা কীর্তি, একটা উদাহরণ খাড়া করে রাখবার জন্যেও তো তার ব্যবসাটাকে সাজিয়ে রাখা চাই। আর এমন কিছু সে শ্মশান সাজিয়ে বসছে না। না, সব তাকে বহন করে বেড়াতে হবে যান্ত্রিক ধারাবাহিকতায়। এর মাঝে বিরক্তি নেই, বিলাস নেই, শুধু অভ্যাসের আবর্তনা, নিশ্ছিদ্র দুর্ভেদ্যতা। বিরক্ত হয়েই বা সে কী করতে পারে?

আর কিছু নাই হোক্, চাই শুধু ব্যক্তিত্বের বিস্ফারণ—অতিকায় একটা যন্ত্রের মানবিকতা।

যন্ত্র নিষ্ঠুর, যন্ত্র অপক্ষপাত, যন্ত্র চলেছে আপন নিয়মে, আপন যন্ত্রণায়।

অসুখের থেকে উঠে আদিত্যকে দেখাচ্ছে ঠিক একটা কাঁকলাশের মতো। লিক্‌লিকে পায়ে এ-ঘর, উপরে-নীচে এখন সে এক-আধটু চলাফেরা করতে

পারছে। ঠেলে-বেরিয়ে-আসা মস্ত বড়ো রোগা চোখে সে সমস্ত আকাশটাকে যেন গিলে খাচ্ছে। যা কিছু দেখছে, তাই তার কাছে লাগছে অভূতপূর্ব সুন্দর : যা কিছু দেখছে, তারই উপর তার লোভও হচ্ছে অভাবনীয়। তার যেমন বেড়ে গেছে দৃষ্টি, তেমনি তার গ্রাস। নড়বড়ে হাতে সে এটা ধরে, ওটা ভাঙে, সেটা খায়।

নিরঞ্জন তাকে দেখতে পারে না চোখের কোণায়। তাকে দেখলেই তার গায়ের রক্ত হয়ে আসে নীল, তার স্নায়ু-শিরায় সবুজ, সূক্ষ্ম কতোগুলি সাপ ওঠে কিল্‌বিল করে।

—তোকে বলেছি না আমার ঘরে কখনো আসতে পাবি না? আবার ঘাঁটছিস আমার টেব্‌ল্? নিরঞ্জন খেঁকিয়ে উঠলো : যা বেরো, বেরো বলছি শিগ্‌গির।

হাতের জিনিসটা টেবিলের উপর ফেলে রেখে আদিত্য রুগ্নতরো মুখ করে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ নিরঞ্জনের কী মনে হলো, হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকলে : শোন্।

আদিত্য গেলো আরো ভয় পেয়ে।

নিরঞ্জন যথাসাধ্য চোখ দুটো তরল ও মুখাভাস কোমল করে তুললো। বল্‌লে,—কাছে আয়, একটা জিনিস দেবো।

আদিত্য কৌতূহলী হয়ে বল্‌লে,—কী জিনিস?

নিরঞ্জন টানা খুলে তাকে ছোট একটা ঘড়ি দেখালো।

—সত্যি দেবে?

—দেবো, নিরঞ্জন তার দিকে হাত দুটো আরো ব্যাকুল করে দিলো : যদি আমার একটা কথা শুনিস।

—কী কথা? আদিত্য এবার নির্ভয়ে এলো ঘেঁষে।

তাকে দুই হাঁটুর মধ্যে ঘন করে জড়িয়ে ধরে তার রোগা আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করতে-করতে নিরঞ্জন বল্‌লে—তোর মা ও-গুলি কী পড়ছিলো রে?

আদিত্য ভীষণ অবাক হয়ে বল্‌লে,—কখন? কই, কী পড়ছিলো?

—ঐ যে সকাল বেলা, তুই তোর মার কাছে বসে খিদে পেয়েছে বলে কাঁদছিলি, নিরঞ্জন বিশদ করে তাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলো : তোর মা কী পড়ছিলো বলে তোর কথায় কান দিচ্ছিলো না, আমি তখন সামনে দিয়ে হেঁটে

যাচ্ছিলুম, আমার সাড়া পেয়ে তোর মা কেমন চম্‌কে উঠে কাপড়ের তলায় সেগুলো লুকিয়ে ফেললো,—সেই যে—

—হ্যাঁ, ব্যস্ততায় দীপ্ত হয়ে উঠে আদিত্য বল্‌লে,—সেই কতোগুলি ছেঁড়া-খোঁড়া কাগজ ?

—হ্যাঁ, আমাকে সেগুলো এনে দিতে পারিস ?

—এক্ষুনি। আমাকে ঘড়িটা ঠিক দেবে তো তা হলে? কী করে দম দিতে হয় শিখিয়ে দেবে তো ?

—দেবো। কিন্তু কোথায় সেগুলো আছে জানিস ?

—কেন, মা'র বিছানার তলায়! ছাড়ো না, দেখ না একবার আমি ঠিক নিয়ে আসতে পারি কি না।

—কিন্তু তোর মা কোথায় ? তোর মা যদি দেখে ফেলে ?

—কী করে দেখবে? মা তো এখন চানের ঘরে। ছাড়া পাবার জন্যে আদিত্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো : মা'র আসবার আগেই আমি নিয়ে আসছি।

নিরঞ্জন তাকে ছেড়ে দিলে।

এক মিনিটের মধ্যে আদিত্য দুই হাতে কতোগুলি কাগজ-পত্র কুড়িয়ে এনে নিরঞ্জনের সামনের টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিলে : কই, আমার ঘড়ি ?

নিরঞ্জন সে-কথায় কর্ণপাতও করলো না। চিঠিগুলি গুছিয়ে নিয়ে সে পড়তে বসলো একেক করে।

সব ক্ষীরোদের চিঠি। তার একখানাও শ্রীপর্ণা ছিঁড়ে ফেলে নি, তারিখ বিলিয়ে পর-পর নম্বর দিয়ে সাজানো। চিঠির স্তূপের মাঝে ক্ষীরোদের ছোট একখানি আবাঁধা ফটো, যে-টুকুই সে কুড়িয়ে পেয়েছিলো—এতোদিন পর্যন্ত সে যা তার বাক্সের তলায় সযত্নে রক্ষা করে এসেছে।

আদিত্য চেঁচাতে লাগলো : আমার ঘড়ি ! আমার ঘড়ি !

চিঠিগুলি নিরঞ্জন গোগ্রাসে গিলতে লাগলো। সব সে পড়বে, তবে ছাড়বে।

আদিত্য হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো : বা রে, আমার ঘড়ি কোথায় ? তখন বল্‌লে ওগুলো এনে দিলে আমাকে ঘড়ি দেবে, এখন দিচ্ছ না কেন ? বা রে, আমাকে আমার ঘড়ি দিয়ে দাও।

নিরঞ্জন তবু চিঠিগুলি পড়ে চলেছে। তার আর কোনো বোধ নেই, কোনো ইন্দ্রিয় নেই, তার সমস্ত চেতনা তার চোখের দৃষ্টিতে কেন্দ্রীভূত।

এগিয়ে এসে নিজেই ঘড়িটা নেবার জন্যে আদিত্য এবার টেবিলের টানা ধরে টান মারলো।

চিঠিগুলির উপর পড়লো এসে কার বাধা, মুহূর্তে নিরঞ্জনের মাথা ঘুরে গেলো, আদিত্যকে সে সবলে ধাক্কা মারলে।

মেঝের উপর পড়ে গিয়ে আদিত্য প্রবল চীৎকার করে উঠলো ; আর তার চীৎকার শুনে একপিঠ ভিজে চুল নিয়ে শ্রীপর্ণা এলো ছুটে।

মুহূর্তে শ্রীপর্ণার সমস্ত রক্ত রাগে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি আদিত্যকে কোলের মধ্যে টেনে তুলে নিয়ে নিরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে সে মড়ার মতো ঠাণ্ডা অথচ ভয়ঙ্কর গলায় বল্‌লে,—একে কে মারলো ?

নিরঞ্জন দেয়ালের মতো নিশ্চল। দেয়ালের মতো সাদা, স্পষ্ট গলায় বল্‌লে, —ঘরে তো আমি ছাড়া আর কাউকে দেখতে পচ্ছি না।

কোলের উপর আদিত্যর মুখ চেপে ধরে তার মাথায় ও পিঠে শ্রীপর্ণা হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, হঠাৎ রুখে উঠলো : তুমি, তুমি রোগে-ভোগা একফোঁটা এই ছেলেটাকে ধরে মারলে ? কেন, কী করেছে ও শুনি ?

—ও কিছু করতে যাবে কেন ? নিরঞ্জন হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠলো : আমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি মেরেছি।

আদিত্য মা'র কোলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো : আমাকে আগে ঘড়ি দেবে বল্‌লে, পরে যেই চাইতে গিয়েছি, অমনি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো।

—খবরদার, শ্রীপর্ণা চোখে-মুখে, শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরায় ধারালো হয়ে উঠলো : তুমি আমার ছেলের গায়ে কোনোদিন হাত তুলতে পারবে না।

—তা তো হলো। ছেলে নিয়ে অনেক ন্যাকামো করেছো, নিরঞ্জন চাপা বাঁকা ঠোঁটে একটা কলুষিত ঠাট্টা করলে : কিন্তু এগুলো কী ?

টেবিলের দিকে নজর পড়তে শ্রীপর্ণা সমস্ত শরীরে ধুসর, বিবর্ণ একটা ছায়া হয়ে গেলো। ছায়ারই মতো যেন শূন্যের উপর এগিয়ে এলো দুই পা। ছায়ায়িত, নীরক্ত গলায় বল্‌লে,—এ—এ-সব তুমি কোথায় পেলে ?

—আমাকে আনতে বলে দিলো, মা, আদিত্য ভয়ে-ভয়ে আরেকবার কেঁদে উঠলো : বল্‌লে ঘড়ি দেবে একটা। ঐখানে, ওটার মধ্যে ঘড়িটা আছে, মা। এখন দিচ্ছে না। নিরঞ্জনের দিকে চেয়ে আদিত্য ভুরু বাঁকালো : মিথ্যে কথা বলে ! ছেলেমানুষ পেয়ে ঠকায় !

নিরঞ্জন প্রখর চোখে চিঠিগুলিকে প্রায় ছাই করে দিয়ে বল্‌লে,—এগুলি কী ? কার, কার চিঠি ?

শ্রীপর্ণা সরে দাঁড়ালো। বল্‌লে,—কার আবার ! আমার।

—তা তো হলো। কিন্তু কে লিখেছে ?

—নীচেই নাম আছে।

—নীচেই নাম আছে ! খল্‌খল্‌ করে নিরঞ্জন হেসে উঠলো—সে-হাসি পাথরের টুকরোর মতো শ্রীপর্ণার গায়ে ছিটিয়ে পড়তে লাগলো : নীচেই নাম আছে ! এ-চিঠিগুলি বুকের পাঁজরের মতো পুষে রেখেছিলে এতোদিন ?

শ্রীপর্ণা লজ্জার শেষ প্রান্তে এসে পড়েছে যেখানে মানুষের আর কোনো লজ্জা থাকে না। তাই তার গলার স্বর দৃঢ়তরো হয়ে উঠলো : হ্যাঁ ; আমার চিঠি তুমি ফিরিয়ে দাও।

কাগজের সেই রাশীকৃত আবর্জনা নিরঞ্জন দুই হাতে নিয়ে শ্রীপর্ণার গায়ের উপর ছিটিয়ে দিলো। বল্‌লে,—কিন্তু সেই কথা এতোদিন বলো নি কেন ?

চিঠিগুলি কুড়িয়ে নিতে-নিতে শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—সেই কথা কি আমিও জানতুম ?

নিরঞ্জন আবার একটা কৃত্রিম, শুক্‌নো হাসিতে ফেটে পড়লো।

মা চলে যাচ্ছে দেখে আদিত্য আরেকবার, শেষবার চেষ্টা করলো। মিন্‌মিনে্‌ গলায় বল্‌লে,—আমার ঘড়ি ! আমার ঘড়ি !

সহসা টানাটা খুলে ফেলে নিরঞ্জন ঘড়িটা বার করলো। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে আদিত্যর প্রসারিত, লোলুপ হাতের মধ্যে ঘড়িটা গুঁজে দিয়ে বল্‌লে,—এই নাও ঘড়ি। আমি কাউকে কোনোদিন ঠকাই না, যাকে যা যখন দেবো প্রতিজ্ঞা করি, তক্ষুনি তা তাকে দিয়ে দিই।

—আমিও তোমাকে ঠকাতে চাই নি। শ্রীপর্ণা বল্‌লে।

নিরঞ্জন হেসে উঠলো : সেইটেই তোমার বিশেষত্ব। সামান্য একটা—কী বলবো, তবু তোমাকে আমি বিয়ে করেছিলুম, শ্রীপর্ণা, সামান্য একটা—তারো তোমার চেয়ে বেশি সাধুতা আছে। সেও ঠকায়, কম-বেশি সব মেয়েই ঠকায়, কিন্তু যাক্‌, তুমি যাও, কিন্তু—

নিরঞ্জন চেয়ারের উপর ভেঙে পড়লো।

সমস্তটা দিন যে কী করে কাটলো নিরঞ্জনের কোনো খেয়াল নেই।

বিকেলবেলা, নীচের আপিসে কাগজে-পত্রে রাশীভূত হয় সে চুপ করে বসে ছিলো, যখন সে যথার্থ অনুপাতে পৃথিবীকে প্রথম চেয়ে দেখছে।

তারই দরজার পাশে শোনা গেলো শ্রীপর্ণার গলা। আদিত্যকে সে কী বলছে, আদিত্য রাজী হচ্ছে না।

নিরঞ্জন কান খাড়া করে রইলো।

আস্তে-আস্তে বিকেলের সেই ম্লায়মান আলোয় শ্রীপর্ণা আদিত্যকে নিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

শ্রীপর্ণা বল্‌লে,—আমরা যাচ্ছি।

যেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, নিরঞ্জন অনড় হয়ে বসে রইলো চেয়ারে।

কিন্তু, এ কী—শ্রীপর্ণার এ কী পোশাক! শাড়িটা একদম সাদা, বিষাদের মতো সাদা, তার শেষ প্রান্তে সেই নরুন-পাড়টিও আর নেই, তার ফের ফিরে আসবার সেই ক্ষীণতম আশার চিহ্ন। হাত দু'টি রিক্ত, গলাটি করুণ, চোখের দৃষ্টিটা যতোদূর শুষ্ক, যতোদূর তীক্ষ্ণ করে তাকানো যায়, তার কপালে রুক্ষ, নির্মম ঔদাস্য। মোটা খদ্দরের সাদা একটা চাদর গায়ের উপর আবার সে ঘন করে টেনে দিয়েছে। পায়ে স্ট্র্যাপ-দেয়া সেই স্যাণ্ডেল্, হাতে সেই তার শিক্ষয়িত্রীর সামান্য অ্যাটেসে-কেস্।

আবার তাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে, কী পবিত্র! তার বৈরাগ্যে, তার বিচ্ছিন্নতায়।

চোখ মেলে সমস্ত ছবিটা নিরঞ্জন যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

অলক্ষ্যে ঘরের দিকে শ্রীপর্ণা হয়তো এক পা এগিয়ে এলো। ম্লান, ধূসর গলায় বল্‌লে,—আমাকে যেতে দাও। একজনের ধ্বংসস্তূপ দিয়ে আমি আরেক জনের প্রাসাদ গড়তে পারলুম না।

মায়ের পিছে-পিছে আদিত্যও এসে দাঁড়ালো দরজার গোড়ায়।

চেয়ার ছেড়ে নিরঞ্জন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো। বল্‌লে, আমতা-আমতা করে বল্‌লে—যাবে যে, কী করে যাবে? সোফারকে বরং গাড়িটা বার করতে বলি। যেখানে বলবে, তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে'খন।

—দরকার নেই। শ্রীপর্ণা আদিত্যর হাত ধরে রাস্তায় নেমে আসতে-আসতে বল্‌লে,—আমরা বাস্-এই যেতে পারবো।

বিবাহের চেয়ে বড়ো

প্রথম প্রকাশ
১৩৩৮

শ্রীবুদ্ধদেব বসু
করকমলেষু

প্রথম দেখা ট্রেনে।

চক্রধরপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামতে কী আহ্লাদেই আটখানা হয়ে ফাজিল মেয়ের মতো বৃষ্টি নেমে এল। ব্যস্ত পদশব্দ ও আকুল জলধ্বনি ছাপিয়ে কার একটি সলজ্জ ও সহাস্য কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আর্তনাদের মত অথচ আনন্দ দিয়ে ভরা। কেন কে জানে প্রভাতের মন বলে উঠল ওরা এই গাড়িতেই উঠবে। মেয়েটিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যেই যেন অন্ধকার আকাশের এই অশ্রুর আয়োজন। আজকের বাও তাই বাউলিনী, ট্রেনের গর্জন নয়, যেন নিপীড়িতা বসুন্ধরার কান্না।

মেয়েটি গাড়ীতে উঠে চুল এলো করে দিল, শাড়ির আঁচল দিয়ে মাথাটা মুছে বুক ঢেকে ফের আগের জায়গায় রাখল। ফের খোঁপা তৈরি করে চুলের কাঁটা গুঁজতে লাগল।

ঠুমকি নাচে বৃষ্টি না ঝরলেই বুঝি ভালো ছিল। কামরায় আরো বেশি লোক উঠত। না ঘুমিয়ে তাকিয়ে থাকবার কারণ ঘটত না।

সঙ্গের ছেলেটি ভারি মজাড়ে, আমুদে। যেমন চোকালমুখাল তেমনি জোরালো জোয়ান। গায়ের পোষাক সাহেবী।

অশ্রু গাড়ীর চারদিক একবার চেয়ে নিয়ে বিছানো কম্বলটার উপর পা তুলে বসল। কোণের ঐ ছেলেটির দিকে চেয়ে কেমন যেন ওর একটু ভালো লাগল—এমনিই, একেবারে অকারণ। যেমন পথে যেতে যেতে ফুটন্ত বকফুল ওর ভালো লাগে, কুরচি করমচা ভালো লাগে, যেমন ভালো লাগে গঙ্গামাটি, কালো মেঘের ঢেউ। ঐ ছেলেটির শুধু মুখে-চোখে নয়, কৃশ দীর্ঘ দেহ ঘিরে এমন একটি কঠিন ঔদাস্য যে অশ্রু মুগ্ধ হয়ে কয়েক সেকেণ্ড বেশিই তাকিয়ে ফেলল। কে জানে কেন ইচ্ছে করল দুটি কথা কই—সাদাসিধে কথা, কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, কবে ফিরবেন, কোন ট্রেনে ফিরবেন?

কী কাজ করেন, কত টাকা মাইনে পান, এ সব জানতে ইচ্ছে করল না। কিম্বা কোথায় আপনার বাড়ী, বাড়ীতে কে কে আছে—তাও না।

অশ্রু চঞ্চল হয়ে বললে—দাদা, খাবারের ঝুড়িটা কোথায়? গাড়ীতে উঠেই খিদে পেয়ে গেল। এখুনি না খেলে লুচিগুলি সব সুখতলা হয়ে যাবে। এস, হেলপ করো আমাকে।

প্রভাত এই বলেই নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিল—এরা সব মোমবাতি, এক ফুঁয়ে নিবে যাবার মতো। এদের আছে কেবল ঠাট-ঠমক, এরা ঠোঁটে-কলা। মেজাজ অত্যন্ত টেড়া, মন দেমাকে ছাপাছাপি। তার চেয়ে তমালশ্যামলা সব্রীড়কটাক্ষা গৃহকোণের সান্ত্বনালক্ষ্মী ঢের ভালো। এরা রংদার, ভেজাল, রোখো—তার চেয়ে গেঁয়ো ছুটুলে বউও ভালো।

হাঁড়ির জলে জীয়ল মাছের মতো প্রভাতের মন আইঢাই করে উঠল।

খাওয়া শেষ করে অশ্রু বলে উঠল—জল! তুমি কী হতভাগা দাদা, জলের কুঁজোটাই ফেলে এসেছ! পরে স্বর নীচু করে বললে,—ওঁর কাছ থেকে একটু জল চেয়ে নাও না।

খাবার ভাগ দিল না, জলের ভাগ নিতে এসেছে! এমনি একটা কথা যে বলা যায় প্রভাত তা ভাবতেই পারল না। নিজের হাতে জল গড়িয়ে দিলে। গ্লাশটা অশ্রুই নিতে চাইল হাত বাড়িয়ে। তার পাশ কাটিয়ে প্রভাত গ্লাশটা দাদার হাতেই এগিয়ে দিলে।

প্রভাত আবার ভাবতে চেষ্টা করল—এদের খালি বেশভূষার চটক, দুই চোখে ঠেকার ঠিকরে পড়ছে—এর চেয়ে হোক না সে কেলেকুষ্টি, নাই বা জানল কানড়া ছাঁদে খোঁপা বাঁধার আর্ট—নাই বা হল লেখাপড়ার ফুলঝুরি—তবুও তা ঢের ভালো। পাতাবাহারের চেয়ে ঢের ভালো বনতুলসী।

অশ্রু নীরেনকে বললে—ওর সঙ্গে একটু আলাপ করো না দাদা। তুমি কী রকম, মুখ বুজে বসে থাকতে ভালোও লাগে তোমার!

প্রভাতের সঙ্গে নীরেন মামুলিভাবে কথা পাড়ে, প্রভাত খালি কাটা-কাটা উত্তর দেয়, জের টানে না। তাই আলাপ গড়াতে চায় না। গায়ে পড়ে কত আর কথা পাড়া চলে?

কিন্তু প্রভাত ভাবে, মেয়েটি কথা বলছে না কেন? ওর চোখে কেন এমন ঔদাসীন্য, কেন এমন নীরবতা? দুটি চোখ থেকে যেন অন্ধকারে শিশিরের মতো মমতা ঝরে পড়ছে। ওর তম্বু গ্রীবা, তম্বু দুটি পদতল—সব কিছুই যেন অহেতুক ঔৎসুক্যে স্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে। প্রভাত জানলা দিয়ে মুখ

বাড়িয়ে ভিজে অন্ধকার দেখে আর ভাবে—কে জানে, 'এও বুঝি একরকম কথা বলা।

কিন্তু সে কথোপকথনের পাত্র সে নয়।

থুথ্‌ড়ো কাঁচা ঘর, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তুফান একটা তুড়ি দিলেই সাবাড়। মৃত্যুশয্যায় বাপ, মা'র আয়ুতেও ফুঁ লেগেছে—সব কটি অপোগণ্ড শিশুই রোগা ডিগডিগে, কিন্তু সবাই পেটগজন্দর। এ জীবন একটা অনাবাদি জমি, শুধু কাঁটা-জঙ্গলে বোঝাই। বিয়ে করে চার হাজার টাকা পণ পাবার আশা—তাই বা কতদিন! আর তার খেসারত একটা মেয়ে-ব্যাঙচি, তারই সঙ্গে নটখটি করে জীবন কাবু ও কাবার করে দেওয়া। পান্তাভাত আর পাঁকালমাছ খাবে, দশটা-পাঁচটা করবে—একটা সন্তান চিতায় আরেকটা আঁতুড়ে—এমনি হতে-হতে যে কটা হাতের পাঁচ থাকবে—কী করবে তারা? কোথায় তাদের ঘর, তাদের ভবিষ্যৎ?

দম বন্ধ হয়ে আসে—প্রভাত কামরার মধ্যে মুখ টেনে এনে আবার চেয়ে দেখে মেয়েটির মুখখানিতে যেন একটি স্নকোমল সহানুভূতি; কল্কা-কাটা খদ্দরের চাদরটা যে গায়ে টেনে দিচ্ছে তাও যেন তাকেই স্নেহ করে—জানলার কাঁচটা তুলে দিচ্ছে, যেন বলছে, গায়ে একটা কাপড় জড়াও—আর কিছু না পেলে কাপড় ছাড়া আর উপায় কী—ভারি ঠাণ্ডা আজ, জানলাটা অমন হা-হা করে খুলে রেখো না।

নীরেন ঘুমিয়ে পড়েছে—অশ্রু হেলান দিয়ে আধশুয়ে ট্রেনের আলো দেখছে, দেখছে আলোর পোকা, বাইরের বিশাল অন্ধকার আর থেকে-থেকে ঐ ছেলেটির মুখ—তার দৃঢ় দেহের ভঙ্গি—সে যেন আরেক অন্ধকার। মাঝে মাঝে চোখের উপর চোখ এসে পড়ছে—পুরুষালির সহজ তেজে উচ্চারিত, চাপা ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের ধারালো হাসির আভাস। আশ্চর্য, কথা কইছে না কেন? কথা কইবার ছল খুঁজছে না কেন? কত সহজেই তো বলতে পারে, এবার ঘুমোও, জল খাবে, জানলাটা বন্ধ করে দিই? ছাই, কী বলতে হবে তাও আমিই শিখিয়ে দেব?

তনুমধ্যা আরূঢ়যৌবনা রহস্যময়ী শ্যামরী—তার দুই চোখ স্নেহে ও বন্ধুতায় করুণায় ও কুশলজিজ্ঞাসায় টইটুম্বুর। আর জিজ্ঞাসার নীচেই তো পিপাসার বাসা—প্রভাত জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আপন মনে বললে, বিধাতা, আর রসিকতা কেন?

সঙ্গে মালপত্র বলতে ছোট একটা স্যুটকেস ও বিছানার একটা কঙ্কাল—'ক্রুগ'-এ গাড়ী দাঁড়াতেই প্রভাত লাফিয়ে নেমে গেল। যেন যত তাড়াতাড়ি পালানো যায়, যত তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেলা যায় মন থেকে।

অরণ্যের মতই গভীর গহন। যা দুষ্প্রবেশ তার আকর্ষণই বুঝি বেশি দুর্বার।

দুটি মুহূর্তের জন্যে যা স্থায়ী তা দুটি মুহূর্তের পরেই বিদায় দেওয়া ভালো।

কিন্তু বিকেলের পড়ন্ত আলো মেয়েটির চোখের পাতায় পড়ে ঝিকমিক করে উঠবে এ একেবারে কল্পনাতীত। স্থির মাটিতে সেই চলন্ত ট্রেনের চঞ্চল মেয়েটিই তো! পরনে আটপৌরে শাদা জমির পাতলা শাড়ি, নিবিড় মমতায় সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে রয়েছে—দুখানি পা'র খানিকটা শঙ্খের মতো শাদা, বুকের খানিকটা খোলা, তাতে সন্ধ্যার স্নেহচুম্বনের আলো।

অশ্রুর হৃৎপিণ্ড পূজার ঘণ্টার মতো বেজে উঠল। —দাদা, ঐ যে উনি, উনি এখানেই এসেছেন দেখছি। ডাকো না ওঁকে।

ধুলোয় একবার সোনার পিন হারিয়ে ফের সেটাকে পেয়ে অশ্রুর যতখানি আহ্লাদ হয়েছিল, তার একচুল কম নয়। শুধু আনন্দ নয়, দেখা পেয়ে সে যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে—এমনি। হৃদয়ের মধ্যে কোন জায়গাটা যেন বেজুত লাগছিল—ঠিক হয়ে গেল।

নীরেন গায়ে পড়ে খুব আলাপ করল এবার, অশ্রুও লজ্জালুলতার মতো মুখ ঝেঁপে রইল না—অশ্রু এবার মৌটুসকি।

সব চেয়ে যে প্রশ্নটা জরুরি সেটাই আগে করল অশ্রু। —কবে ফিরছেন?

—কাল।

—কাল? কোন ট্রেনে?

—এই ট্রেনেরই ডাউনে।

—আমরাও ঐ ট্রেনেই কাল ফিরছি। উলসে উঠল অশ্রু।—চমৎকার হবে, একসঙ্গে সবাই হল্লা করে যাওয়া যাবে। আপনি তো রাস্তায় একবারও চোখের পাতা এক করেন না দেখলাম।

—সবাই যদি ঘুমোয় তবে রাত জেগে দেখবে কে?

—ট্রেনে রাত জেগে কতই না দেখবার জিনিস!

—কেন, আপনার ঘুমটুকু!

কী দুর্ধর্ষের মতো কথাটা বললে কিন্তু কত না আত্মীয়তা মিশিয়ে ! কে জানে ঘুম দেখতে উঠে এসেছিল কিনা, নুয়ে পড়েছিল কিনা স্বপ্নের মতো !

তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়তে হয় ।—কেন এসেছেন এখানে ?

ছোট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রভাত তাড়াতাড়ি বললে,—এখানে আমার দিদি থাকেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। আপনারা ?

—দাদাটা শিগগিরই কালাপানি পেরোবে কিনা, তাই যাবার আগে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখা করা হচ্ছে । আমি থানাদার হয়ে বেরিয়েছি। কী, ভালো করিনি ? ঝিলকিয়ে হেসে উঠল অশ্রু।

প্রভাতের মন্তব্য করার আগেই নীরেন বললে—বোকা মেয়েটাকে কত বললুম, বি-এ পাশ করলি, চল আমার সঙ্গে। ভয়েই ঘাবড়ে গেছে। বিলেত দেশটা যে মাটির এ মোটা কথাটাই ওকে বোঝাতে পাচ্ছি না।

—মাটির যে তাতে সন্দেহ কী, কিন্তু আমাদের নিজের দেশটা যে সোনার। তোমরা এক-একটা দিগগজ হও গে, আমরা আমাদের দেশী সংসারে শান্তির নিকেতন গড়ে তুলি। কী বলেন ? প্রভাতের দিকে তাকাল অশ্রু।

প্রভাত কী বলবে ভেবে পেল না। সে কিছু বললে না বলে অশ্রু অভিমানের ভাব করে চুপ করে রইল। প্রভাতের মনে হল অশ্রুর নীরবতাগুলিও মদের ফোঁটার মতো।

—চলুন, আমাদের মাসীমার বাড়ী চলুন। নীরেন প্রভাতের হাত ধরল।

অশ্রু তার নিজের ইচ্ছাটা প্রবল করতে চাইল। —এখুনি বাড়ী ফিরব কী, চলো ঐ ঘুমন্ত নদীটার পারে বেড়াই।

—নদী—সে অনেক দূর। আপত্তি করল নীরেন।

—তা হলে একটা টাঙ্গা নিই। বলে চলতি একটা টাঙ্গাকে নিজেই ডেকে বসল অশ্রু।

এখন গোলমাল বাধল কে কোথায় বসে! গাড়োয়ানের পাশে একজনের না বসে গত্যন্তর নেই।

—উনি অতিথি মানুষ, উনি গাড়োয়ানের সঙ্গে বসবেন কী। অশ্রু প্রায় শাসন করে উঠল। প্রভাতকে লক্ষ্য করে বললে,—আপনি চলে আসুন পিছনে।

তা হলে বুঝি অশ্রুর পাশেই বসতে হয়। নীরেনের উপস্থিতিতে সেটাও বিসদৃশ।

কিন্তু কী হঠকারী মেয়ে—বলে বসল, তোমরা দুজন পিছনে বোসো, আমিই সামনে যাচ্ছি।

সেটাও অসম্ভব।

তাই নীরেন ভাড়া দিয়ে টাঙ্গাটা বিদায় করে দিল।

তারপর হেঁটেই চলল তিনজন—মাঝখানে অশ্রু, কখন আবার কথার ঝোঁকে, কথারই কারসাজিতে প্রভাতের বাঁ পাশে।

অন্ধকারে পথ হারিয়ে তিনজনে অনেক পরে মাসীমার বাড়ীর হদিস পেল। সারা পথ অশ্রুর কথাই পাঁচকাহন—আর অবান্তর কথাই যে শ্রোতার গুণে এমন অনর্গল হতে পারে তা এই নির্জন মাঠ-বন কোনোদিন এর আগে প্রত্যক্ষ করেনি।

মাসীমা অপরিচিতকে দেখে সরে যাচ্ছিলেন, অশ্রু ঘোষণা করে বসল, ও দাদার বন্ধু, তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই মাসীমা।

তারপর প্রভাতের কাছে সরে এসে বললে—বসুন। পরের মতো ওরকম জবুথবু হয়ে কেন? বেশ করে হাত-পা ছড়িয়ে বসুন—কম তো আর ঘোরা হয়নি। হোঁচট খেয়ে-খেয়ে আমার বুড়ো আঙুল দুটো তো থেঁতলে গিয়েছে।

—কই, দেখি। সাহস করে দিব্যি বলতে পারল প্রভাত।

দুহাতের দুটো বুড়ো আঙুল একত্র করে দেখাল অশ্রু।

—সে কী?

—পায়ের বুড়ো আঙুল বুঝি দেখানো যায়?

দুজনেই অবাধে হেসে উঠল।

সকাল বেলা দিদি যেমন যত্নে পাশে বসিয়ে খাইয়েছিল, অশ্রুও যেন ততখানি যত্নে নিজের হাতে খাবার সাজিয়ে এনেছে।

থালা দেখেই প্রভাত পেছিয়ে গেল। —পারব না।

অশ্রু আরো এগিয়ে এল। —খুব পারবেন। আমি বলছি পারতে হবে।

—অসুখ করবে।

—অসুখ করলে সেবা করবার জন্যে আমি গ্যারিণ্টি রইলাম।

—সত্যি?

—এক সত্যি নয় তিন সত্যি।

—আর যদি অসুখ না করে?

—তা হলে আমার সেবা করবেন।

—আপনার সেবা! প্রভাত যেন ফাঁপরে পড়ল।—কী করে?

—আবার খেতে এসে।

অন্ধকারে অশ্রুই খানিকটা পথ এগিয়ে দিল। বললে—কাল খুব সক্কাল বেলায় ঘুম থেকে উঠেই চা না খেয়েই চলে আসবেন এখানে। খুব খানিকটা বেড়ানো যাবে। কী, চাকর ডাকিয়ে লণ্ঠন দেব একটা?

—না, দরকার নেই। অন্ধকারে একা-একা ফিরে যেতেই ভালো লাগবে।

—হোঁচট খেয়ে পড়লে কিন্তু সে সেবার ভার আমার উপর নেই। আচ্ছা, আচ্ছা, তাও নেওয়া যাবে, কিন্তু আলো নিলে ভালো হত।

—আমার কালোই ভালো। অন্ধকারেই বেরিয়ে গেল প্রভাত।

—কাল আসবেন কিন্তু মনে করে। কেমন থাকেন আমার জানা চাই।

প্রভাত মনে স্থির করল, কাল ককখনো ওদের বাড়ি যাবে না—খেয়ে দেয়ে এমন গভীর ঘুম দেবে যে ন'টার আগে আর উঠবে না। বিধাতা, আর কেন?

কিন্তু যতই ভরপেট থাক, ঘুম এল না প্রভাতের।

ষাট টাকা মাইনের কেরানি—সে কী করে শিয়রে স্বপ্ন নিয়ে ঘুম যায়? ষাট টাকার মধ্যে বাড়িভাড়া আঠারো, রুগ্ন বাপের কবরেজি চিকিৎসা বাবদ বারো, বাজার খরচ দৈনিক পাঁচ আনা করে ন টাকা দু আনা—ছোট বোন দুটোর বিয়ের জন্যে কুড়ি টাকা করে জমাতে হবে—আর বাকী দশ আনার উপরই তার প্রভুত্ব—সে বিড়িই থাক আর ট্রামেই চড়ুক।

বিধাতাকে এ পর্যন্ত কম ঘুষ দেওয়া হয়নি। কত বলেছে, আরো গোটা কুড়ি টাকা বাড়িয়ে দাও, অন্ধ ভাইটাকে স্কুলে ঢোকাই, বোন দুটোকে বিয়ের নৌকোয় পার করি, মা'র সুবিধের জন্যে একটা ঝি রাখি। কত বলেছে। বিধাতা শুনেও শোনেননি, মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন।

একটা টিউশানির জন্যেও কত হাঁটাহাঁটি করেছে। হবে-হচ্ছে করে লাগছে না শেষ পর্যন্ত।

অগত্যা বাবা তার জন্যে বিয়ে ঠিক করলেন। চার হাজার টাকা বরপণ পাওয়া যাবে, সেইটেই আকর্ষণ। মেয়ের খুঁত আছে বলেই অতগুলো রূপোর চাকতি। একে অমাবস্যা তায় একখানা পা ছোট। তা সে যাই হোক, টাকা

পাওয়া নিয়ে কথা। টাকাই ফর্সা, টাকাই কুলীন। টাকারই সমস্ত অবয়ব অনবদ্য।

এ সব কথা অশ্রুকে বলা যায় না। অন্তত এখুনিই বলা যায় না। আর যখনই বলা তখনই তার উর্দ্ধশ্বাস পলায়ন।

তবু যতক্ষণ ঘুম না আসে স্বপ্ন জেগে থাক শিয়রে।

দিদিও স্বপ্ন দেখছেন।

থাকেন বাঙলার সীমানা পেরিয়ে মধ্যপ্রদেশের এক বুনো গাঁয়ে—তাঁকে বিয়ের নায়রী করে নিয়ে আসতে প্রভাত রওনা হল। আগের পক্ষের দিদি—চব্বিশ বছর বিয়ে হয়েছে, সেই থেকেই দেশছাড়া। স্বামী সামান্য মাইনে নিয়ে একটা ইস্কুল মাস্টারি করেন। ঐ জংলা বুনো খোট্টা দেশেও সদলে মা-ষষ্ঠীর পথ চিনে আসতে বেগ পেতে হয়নি। বাবা বারণ করেছিলেন—শুধু-শুধু টাকার শ্রাদ্ধ, শ খানেকের উপর এতেই বেরিয়ে যাবে, হাফ-টিকিটই লাগবে হয়তো খান ছয়েক। প্রভাত বলেছিল—দিদি না এলে বিয়ের সমস্ত বাজনা বুজে যাবে।

দীর্ঘ চব্বিশ বছরের নির্ব্বাসিতা নারী বাঙলার সবুজ সান্ত্বনাসিঞ্চিত নীড়ের জন্যে বাহুর দুই ব্যাকুল ডানা বিস্তার করে দিয়েছে। সবুজ মাঠ কত দিন দেখেনি —নুয়ে-পড়া নীল আকাশ। এখনো নদীতে বকের ডানার মতো শাদা পাল তুলে ঘোমটা-দেওয়া বউয়ের মতো নৌকো নাচে, পানকৌটি ডুব দেয় জলে? মাছরাঙা—গাঙশালিক? ছেলেরা উঠোনে তেমনি কানামাছি খেলে? মেয়েরা মাঘমণ্ডলের ব্রত করে? আর তেমনি কাঠগোলাপ ফোটে—সজনে ফুল? হাওয়ায় তেমনি পাটের খোপা দোলে আর? সালিধানের চিরে পাওয়া যায়? কাউনের চাল?

রুক্ষ তামাটে মাটির নিরানন্দতা সমস্ত দেহে—হঠাৎ যেন বাংলার শ্যামল মাটির স্নেহরসে স্নান করে ওঠে। বলে, আমিই সব নিতকাম করব তোর বিয়ের, যাত্রাকলস আঁকব, পিঁড়িচিত্র করব, উলু দেব, কুলোতে পঞ্চপ্রদীপ সাজিয়ে বরণ করব, দোরে মঙ্গলঘট দেব—

স্বপ্ন না দেখে মানুষের উপায় কী। জীবনে সৌভাগ্যের মুখ দেখে না বলেই তো সে স্বপ্ন দেখে! স্বপ্নই তো একমাত্র সৌভাগ্য।

কিন্তু, কী আশ্চর্য, সকাল ন'টার আগেই ঘুম থেকে উঠল প্রভাত। স্বপ্ন শুধু মানুষ ঘুমিয়েই দেখে না, কখনো কখনো দিনের আলোয় খোলা চোখেই

দেখে। আজ সকালে ইচ্ছে করলেই সে অশ্রুকে দেখতে পারে এই অনুভবটাও তো একটা স্বপ্নের মতো।

দিদিকে বললে—এখানে এসেই এক বন্ধু জুটে গেল। একটু দেখা করে আসি। শিগগিরই ফিরছি—তোমরা সব রেডি হয়ে থাক।

অশ্রু দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়—যেন প্রতীক্ষার প্রতিমা।

—এই আপনার ঘুম ভেঙেই আসা?

—আমার ঘুম তো এখনো ভাঙেনি। হাসিভরা বিহ্বল চোখে তাকাল প্রভাত।

—কেন, কী হল?

—আপনি ছোঁবেন তবে তো ঘুম ভাঙবে।

—কেন, জ্বর হয়েছে নাকি? অশ্রু প্রভাতের কপালে একটু হাত রেখে ব্যাখ্যাটা সরল করতে চাইল।

কিন্তু প্রভাত তাকে তরল হতে দিল না। নিজের হাতের মধ্যে অশ্রুর হাত-খানি টেনে নিল। কেন যেন মনে হল এ হাতের মধ্যে অনেক-অনেক ভবিষ্যৎ।

ঝাঁ-ঝাঁ রোদ—হঠাৎ যেন জ্যোৎস্নার মতো মিঠে লাগে, প্রভাতের মন মদির হয়ে উঠেছে। না, বিয়ে করে তার জীবনের সমস্ত সম্ভাবনার পথ সে বন্ধ করে দেবে না। এখুনি তার ঘরবন্দী হবার সময় আসেনি। না, টাকাই জীবনের সব কিছু নয়। মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচে না। যদি জীবনে সে একটা প্রেম পায় তা বিবাহের চেয়ে বড়ো।

দিদি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, প্রভাতকে রাস্তায় দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন—তোর আক্কেলটা কী রকম শুনি? সেই কখন থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেঁধে-ছেঁদে তৈরি হয়ে আছি, তোর আর দেখা নেই। বন্ধুর বাড়িতে এতক্ষণ না থাকলেই নয়? এখন কখন খাবি, কখন যাবি। মোটে আর ঘণ্টা-খানেক বাকি গাড়ী ছাড়বার—

—খবর ভালো নয়, দিদি।

—কেন, কী হল?

—কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, বাবার হঠাৎ ষ্ট্রোক হয়েছে। বিয়ে পিছিয়ে গিয়েছে। আমাকে এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে।

—দিদি কেঁদে উঠলেন—আমাকে নিয়ে চল।

—না, বিয়ে যখন হচ্ছে না—প্রভাত যেন এখুনি বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচে।

—সে কী, দুটি খেয়ে যা।

—খাবার সময় নেই। স্টেশনে যা পাই খেয়ে নেব। তুমি কেঁদো না—বাবা ঠিক ভালো হয়ে যাবেন। তারপর পিছন ফিরে বললে—বিয়ের দিন ঠিক হলে আবার আসব। নিয়ে যাব তোমাকে।

দিদি সুন্দর করে সেজেছেন। অব্যবহৃত পুরোনো কখানা গয়না গায়ে দিয়েছেন, কপালের মধ্যিখানে ডগডগে সিঁদুর—কাপড়ের পাড়টা চওড়া লাল।

তাঁর চোখেমুখে সর্বাঙ্গে সোনার বাংলা দেশ দেখার স্বপ্ন।

কে জানে, মিথ্যে দিয়েই সে স্বপ্ন ভরা। তাই আবার মিথ্যে দিয়েই সে স্বপ্ন ভেঙে দিল প্রভাত। স্বপ্ন ভেঙে যাওয়াও জীবনের আরেক স্বপ্ন।

প্রভাত ষ্টেশনে পৌঁছে বাবার কাছে তার পাঠাল—বিয়ের দিন পিছিয়ে দিন, আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ।

মধ্যপ্রদেশের উপর মধ্যরাত্রি—কামরায় চতুর্থ লোক ওঠেনি। উঠলেও তারা অস্তিত্বহীন।

সন্ধে হতেই নীরেন শুয়েছে—খানিকক্ষণ বকবকানির পর অশ্রুও ঢুলে পড়েছে। বলেছে, আপনিও আমার মাথার সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে উলটো দিকে গা টান করে শুয়ে পড়ুন।

কী অপার অকূল ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা! প্রভাত শিয়রে বসে একবার অশ্রুকে দেখতে লাগল। মৃদু নিশ্বাসের তালে সোনার গাগরী দুটি অতি ধীরে দুলছে। সমস্ত মুখে লাবণ্যময় প্রশান্তি। মুদ্রিত দুটি ঠোঁটে যেন স্তব্ধতার সঙ্গীত—ললাট যেন শ্বেতপদ্মের পাপড়ি, ব্রততীর মতো লীলায়িত দুটি বাহু—কানে এককালে দুল পরবে বলে যে জায়গাটা ফুঁড়েছিল সেটাও অনেকক্ষণ দেখলে। সুতনু, সুমধ্যমা—ওর নবযৌবনের সৌরভে প্রভাতের সমস্ত দেহ উন্মুখ ও উল্লসিত হয়ে উঠল। ইচ্ছে হল ওর কপালে কোমল করে ডান হাতটা একটু রাখে।

কিন্তু কে জানে হয়তো ছোঁয়া পেয়ে জেগে উঠবে। জেগে-ওঠাটা এই ঘুমিয়ে-থাকার মতো সুন্দর নাও হতে পারে।

দেখল অশ্রুর পা-দুখানি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে বেঞ্চিতে বেশ

খানিকটা জায়গা আছে—শীর্ণ হয়ে বসা যায় হয়তো। মনে হতেই প্রভাত মাথার দিকের জায়গা ছেড়ে পায়ের কাছটিতে গিয়ে বসল। দেখল শাড়ির প্রান্তটা বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে গেছে। প্রভাতের বুকের ভিতর একটা ঠাণ্ডা আনন্দ অজানা ভয়ের মত শিউরে উঠল। মনে হল রহস্য-মন্দিরের কটা সিঁড়ি যেন হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। প্রভাত সন্তর্পণে হাত বাড়াল—না, অনাবৃত পায়ের উপর রাখল না, শাড়ির প্রান্তের ধারটুকু ধরে আস্তে নিচের দিকে টেনে দিল।

রহস্য উন্মোচনে নয়, রহস্য আবরণে। ভঙ্গুরতা, তোমার নামই রমণী—বলেছিল শেকসপিয়র। প্রভাতের বলতে ইচ্ছে হল, রমণী, আবৃতিই তোমার নাম। যতক্ষণ আবরণ ততক্ষণই তুমি রহস্যের মন্দির। অনাবরণে তুমি রহস্যের গবেষণাগার।

—এ কী. আপনি পায়ের দিকে বসেছেন? ঝট করে উঠে পড়ল অশ্রু। প্রভাত লজ্জিত হবার ভাব করে বললে—কোণের দিকটায় পিঠ রেখে বসে ঘুমোব ভেবেছিলাম।

—দরকার নেই ঘুমিয়ে। আসুন গল্প করি। অশ্রু বেশ খানিকটা কাছাকাছি হয়ে বসল।

—হ্যাঁ, তাই ভালো। কৃতজ্ঞ মুখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল প্রভাত।

কিন্তু চলন্ত ট্রেনে রাত্রির রহস্যপুরীর দরজায় বসে নির্জনে যে কী গল্প করা যায় দুজনে কেউই কিছু ভেবে পেল না। অথচ স্তব্ধ হয়ে থাকাটাও ভয়ঙ্কর লাগছে।

—তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। অশ্রু চঞ্চল হয়ে উঠল—আপনি বরং শুয়ে পড়ুন, আমি জেগে থাকি।

—এমন কথা মহাভারতে লেখে না। প্রভাত বললে—বরং আপনি শুয়ে ঘুমোন, আমি বসে ঘুমোই।

—আপনি যে তা হলে কত ঘুমোবেন জানা আছে। অশ্রুর গলায় ছোট একটু দুষ্টুমির টান।

—তা হলে এই বেশ আছি, দুজনেই বসে বসে ঢুলি।

—এটা কোনো কাজের কথা নয়। অশ্রু প্রায় শাসনের সুর আনল।—যখন একজনের লম্বা হবার মতো যথেষ্ট জায়গা আছে তখন আপনার সেটা সদ্ব্যবহার করা উচিত।

—আমার ? প্রভাতের খেয়াল হল একই কথার আবর্তের মধ্যে ওরা ঘুরছে অথচ এই তুচ্ছ কথা-কাটাকাটি কী সুখকর !

—হ্যাঁ, আপনার। কলকাতা পৌঁছেই তো আপনার আপিস—সেই দশটা-পাঁচটা। কি, ঠিক নয় ? রাতে ঘুমিয়ে না নিলে আপনি কাজ করবেন কী করে ?

অশ্রুর কণ্ঠে কী যেন অকথিত মমতা, প্রভাতও অলক্ষ্যে স্নিগ্ধ হতে স্নিগ্ধতর হল—কিন্তু আপনি ?

—আমার কী ! আমি তো গড়িয়ে গড়িয়ে সারা দুপুর শোধ তুলব। শব্দ করে হেসে উঠল অশ্রু।

—তা তুলুন। কিন্তু রাত জেগে পরের দিনে আপিস করা, আবার আপিস করে ফের রাত জাগা, এ আমার অভ্যেস হয়ে গেছে—

—এ আপনার কেমনতরো আপিস ? বেশ, অশ্রু হঠাৎ উৎসাহী গলায় বললে—আপনি তবে আপনার আপিসের গল্পই বলুন।

প্রভাত বুঝল অশ্রু এই পথে তার সাংসারিক পরিচয়টা জেনে নিতে চায়। আশ্চর্য, সে কিছু লুকোল না, মিথ্যের ময়ূরপুচ্ছ ধরল না, ঠিক-ঠিক সব কথা উজাড় করে ঢেলে দিল।

ঘুম থেকে উঠে বাজার করতে যাই। বাজার করে আসতে-আসতেই আপিসের বেলা হয়ে যায়। হেঁটেই যেতে হয় কিনা। পাঁচটা পর্যন্ত কলম পিষি। কলম পিষে যখন হেঁটে বাড়ি ফিরি তখন সন্ধে হয়ে যায়—একটা পাথরের বাটিতে ঠাণ্ডা জল নিয়ে তাতে খানিকক্ষণ বাঁকানো আঙুলগুলো ডুবিয়ে রেখে সোজা, কর্মঠ করি। পরে আবার রাস্তায় বেরুই। টিউশানির সন্ধান করি। গান নেই কবিতা নেই খেলাধুলা নেই সঙ্গী নেই বই নেই—কোনো আমোদ-প্রমোদ নেই—আমোদের মধ্যে রাত জেগে ছারপোকা মারা আর সঙ্গীর মধ্যে চিররুগ্ন অন্ধ ভাইটা, রাত্রে ওর কাছে শুই কিনা। কোনো স্বপ্ন নেই—না, আছে, চাকরিতে একটা লিফট পাই কিনা—প্রাইভেটে এম-এ-টা পাশ করে নিতে পারি কিনা। পরে হঠাৎ যখন আপনাকে দেখলাম—

মুহূর্তের মধ্যে প্রভাত যেন কী হয়ে যায়—কে জানে সে নিজেই স্বপ্ন হয়ে উঠল কিনা—অশ্রুর উৎসুক হাতের ওপর তার হাতখানি উপহার দিতে এতটুকুও কুণ্ঠা করে না, বলে চলে—হঠাৎ যখন আপনাকে দেখলাম, আপনি প্রতিবেশী

আত্মীয়ের মতো আমার সঙ্গে কথা কইলেন, স্নেহ করে খেতে দিলেন, এই উষ্ণ সান্নিধ্যটুকু দিলেন—ভাবতে অবাক লাগল এর জন্যে আমার কী তপস্যা ছিল? অযোগ্য হতভাগ্য—একটা অক্ষম গরীব কেরানী—

অশ্রুর চোখ অজানা ব্যথায় ছলছল করে উঠেছে। অযোগ্য তো এমন করে টানে কেন? ওর বাইরের রুক্ষতা কেন অমন দুর্বার রহস্যের ইঙ্গিত দেয়? মনে হয় যেন সমতল ভূমির উপর হঠাৎ একটা পাহাড় এসে দাঁড়িয়েছে। যোগ্যতার হিসাবে পাহাড়টার আর দাম কী, কিন্তু কী দুর্ধর্ষ আকর্ষণ দিয়ে ভরা!

প্রভাতের হাত আরো একটু শক্ত করে, আপনার করে ধরল অশ্রু। বললে—কিন্তু আপনাকে দেখেই আমার মন যে কী ভীষণ সুস্বাদু হয়ে উঠেছে সে কথা কে বলে? আমি যেন হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করে বসলাম—সে যে কী, কেমন, বোঝানো যায় না। তারপর একটু থেমে চঞ্চল হয়ে বললে—কিন্তু মানুষকে কেন এত দুঃখ সইতে হবে? ভালোবাসা না পাওয়ার দুঃখের চেয়ে না খেতে পাওয়ার দুঃখ, রোগে ভুগে পঙ্গু হওয়ার দুঃখ কী প্রচণ্ড! আপনি কেন এত দুঃখ পাবেন? না, আপনাকে আমি পেতে দেব না।

প্রভাত একটু হাসল। বললে—আমার কথা কে ভাবে? কিন্তু যখনই ভাবি অন্ধ ভাইটা একদিনের জন্যেও দিনের আলো—মনুমেণ্ট দেখতে পাবে না—কাঁদে আর বলে, আমাকে মনুমেণ্ট দেখাও, মা। উঃ, আমি যদি অন্ধ হতাম! তা হলে তোমার মুখও তো দেখতে পেতাম না কোনোদিন—

স্থির চোখে চেয়ে অশ্রু বললে—আর আমি যদি এখন অন্ধ হই!

কথাটার মধ্যে-কি লঘুতার সুর বাজল? তবে কেন অন্ধ হওয়ার নীরন্ধ্র যন্ত্রণাটা স্বীকার করতে চায় না? অশ্রু অন্ধ হবে কেন? তার জীবনে সর্বাঙ্গে উচ্ছ্বসিত সাফল্য-বিলাস, সে কেন দৃষ্টিহীন হতে যাবে?

প্রভাত হাতটা ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল, অশ্রুই অনুমতি দিল না। একটু বুঝি বা কাছে টানল।

তবে অন্ধ হবার কি আর কোনো অর্থ আছে?

—তোরা এখনো ঘুমোসনি? নীরেন নড়ে-চড়ে উঠল।

প্রভাত আর অশ্রুও নড়ে-চড়ে বসল। কথাও বন্ধ হল। হাতের স্পর্শটুকুও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তবু মনে হল স্তব্ধতাও বুঝি আরো কত কথা কইতে পারে। আর স্পর্শহীনতাও আনতে পারে কত গভীর সংযোগের আস্বাদ।

ভোরবেলা রূপনারানের ওপর দিয়ে যখন ট্রেন যাচ্ছে তখন ওরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইল—দুজনের মুখেই যেন অপার্থিব আনন্দের আভা, যা পৃথিবীর কান্না দিয়ে তৈরি।

ষ্টেশনে গাড়ি যখন থামল তখনই অশ্রু বলতে পারল—আফিস সেরেই কিন্তু আমদের বাড়ি আসবেন। আসবেন অবশ্যি। আমি পাথরের বাটিতে বরফ গলিয়ে রাখব। আফিসের কাজের ভিড়ের মধ্যে পড়ে ভুলে যাবেন না যেন। দেখবেন—

পরে একটু কাছে এসে বললে—আমি না ভুললে কি করেই বা ভুলবেন দেখব। আসা চাই কিন্তু, আমি পথ চেয়ে থাকব। বুঝলেন, পথ চেয়ে থাকব।

হ্যাঁ, পাহাড়ই হেঁটে আসবে।

এখানে ওখানে করে, বন্ধুদের মেসে খেয়ে-শুয়ে, আফিসে কলম পিষে প্রভাত চার দিন কাটিয়ে দিল যা হোক। দুনো উৎসাহে ও খাটে—খেটে এত তৃপ্তি যেন ও আর কোনোদিন পায়নি—স্বাস্থ্য খারাপ হলে আর কেউ অনুযোগ দেবে এই আশায় নিজের কাহিল দেহটার ওপরেই মায়া পড়ে। আফিসে হিসেব মেলায় আর মনে-মনে কান পেতে শোনে, ট্রেনের চাকার শব্দ, রক্তের গভীরে অনুভব করে সেই হাতের মধ্যে হাত ঢেকে রাখা—সেই—

বাড়ি যখন ফেরে, সমস্ত ইট-কাঠ যেন একসঙ্গে বিদীর্ণ হয়ে যায়—কী হয়েছিল তোর? ঐ এক টেলিগ্রাম করেই আর কোনো খবর নেই? তুই কি কসাই?

—অসুখ করেছিল। অসুখের ওপর কী হাত আছে? প্রভাত মাকে প্রণাম করে, ছোট ভাইবোনগুলিকে একটু অকারণ আদর করে।

—এখন কেমন আছিস? মা গায়ে হাত রাখেন।

—এখন ভালোই আছি। ভরা গলায় বলে ওঠে প্রভাত। এত ভালো সে আর কোনোদিন থাকেনি। ভালো-কথাটা বলা যায় এই যেন সে ভুলে ছিল!

রোগশয্যা থেকে বাবা চেঁচিয়ে ওঠেন—হতভাগাটা যেতে না যেতেই ব্যামোয় পড়ল! তখনই বলেছিলাম ঐ অজাত দেশে গিয়ে কাজ নেই। আর

এমন কী ব্যামো হল যে একেবারে বিছানা নিতে হল! অলক্ষুনে কোথাকার! এ দিকে এত বড়ো দাঁওটা গেল ফসকে—ওরা অন্য জায়গায় ভিড়েছে। এবারে কলা চোষো—

প্রভাত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। অন্ধ ভাইটির রুখু মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

কিন্তু সংসার কী করে চলবে?

বিধাতাই এর বন্দোবস্ত করে দিলেন—একান্ত মামুলিভাবে। আয় না বাড়িয়ে ব্যয় কমালেন।

তিন দিনের আড়াআড়িতে দুটি বোন কলেরাতে মারা গেল—এক থালায় করে একই বাসি খাবার খেয়েছিল দুজনে।

দুটি গ্রাস বুজল—কুড়িটাকা করে আর জমাতে হয় না। এ ক'দিনে যা জমেছিল বাবা একদিন রাগ করে তাই তুলিয়ে আনলেন। আজেবাজে খরচ করে দিলেন উড়িয়ে।

আফিস থেকে ফেরবার সময় প্রভাত মাঠে অনেকক্ষণ জিরিয়ে নেয় আজকাল—এক দমকে অনেকগুলি কদম আর ফেলতে পারে না। শোকাচ্ছন্ন প্রদোষে ওর অর্দ্ধভুক্ত অপরিচ্ছন্ন বোন দুটির মুখ মনে পড়ে—সংসারের সমস্ত উৎপীড়ন ও অপমান নির্বিবাদে একান্ত অপরাধীর মতো বহন করত ওরা—একখানা ভালো কাপড় পরেনি কোনোদিন, মুখ ফুটে কোনো আবদার করেনি, মা'র সঙ্গে-সঙ্গে রেঁধেছে, বাসন মেজেছে, কাপড় কেচেছে—আর ওদের বিয়ে দিতে পরিবার সর্বস্বান্ত হবে এই ভয়ে বালিশে মুখ গুঁজে খালি কেঁদেছে। যদি ওরা বাঁচত—প্রভাত ভাবছিল—ওরা শত কুৎসিত হলেও ওদের হৃদয় কি আর কারু হৃদয় ছুঁয়ে বাজিয়ে ধন্য করে দিতে পারত না?

কিন্তু শোক নিয়ে বিমর্ষ হয়ে কতক্ষণ থাকবে প্রভাত? জীবনে শোকের অপর পার থেকে যে ভালোবাসা ডাকছে। শোক চলে যায় কিন্তু ভালোবাসা যে যায় না। সময় তো শোককে অস্পষ্ট করে কিন্তু ভালোবাসাকে উজ্জ্বল করে রাখে।

অশ্রু প্রভাতকে একেবারে ওর তেতলার ঘরে নিয়ে এল, বিছানা পেতে দিল, বললে—হেঁটেই এসেছ মনে হচ্ছে, শোও, শুয়ে পড়ো লক্ষ্মীটি—

প্রভাত বললে—বিছানা দেখে শোবার লোভ হচ্ছে, কিন্তু তার দরকার নেই—

—লোভের জিনিস যদি সহজেই পাওয়া যায় তবে নিয়ে নিতে হয়। দরকারের কথা ভাবারই দরকার করে না।

অশ্রু উজ্জ্বল চোখে সপ্রতিভের মতো বললে। তাকে এখন কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে! চুলগুলি বোষ্টমীদের মতো ঝুঁটি করে বাঁধা, একখানি আটপৌরে পাতলা শাড়ি পরনে—কুচকুচে কালো চওড়া পাড়—গায়ে শুধু একটা শেমিজ—শাদা নয়, গোলাপী।

—বাড়িতে কে আছে, দেখে কী ভাববে। প্রভাত তবু দ্বিধা করে।

—ভর দুপুরবেলা, বাড়িতে এখন তেমন কেউ নেই। অশ্রু বলে অকপটে—থাকলেও আমার ঘরে কেউ উঁকি মারতে আসবে না। আর এলেও দেখবে আমি আমার এক শ্রান্ত বন্ধুকে আমার বিছানায় বিশ্রাম করতে দিয়েছি।

প্রভাত যদি বা বিছানায় বসে, শুয়ে পড়তে সঙ্কোচ করে।

অশ্রু নিজেই আবার নিজের কথার জের টানে—কোত্থেকে কে কী দেখে ফেলে সেই ভয়ে জানলা-দরজা বন্ধ করে রেখে বাঁচা যায় না। তারপর, কী সাহস মেয়েটার—দিব্যি হাসিমুখে বলে—এখন তো আর দরজা বন্ধ করছি না যে লোকে কিছু অনুমান করবে।

এখন করছে না, পরে একদিন করতে পারে !

ফিটফাট নরম বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে প্রভাত। সাহস-ভরা স্বরে জিগগেস করে—তুমি কোথায় ঠাঁই নেবে ?

—আমি তোমার শিয়রে বসব।

প্রভাত যেন এতখানি ভাবতে পারেনি। ভাবতে পারেনি মদিরার পাত্র এমনি আবার মমতার মধুরে ভরে যাবে।

সত্যিই শিয়র ঘেঁষে বসে অশ্রু। কাঁঠাল চাঁপার কলির মতো কোমল ও শুভ্র আঙুলগুলি অতি ধীরে ধীরে প্রভাতের কপালে ও চুলে বুলোয় আদর করে। যেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে সমস্তটি হৃদয় জলের মতো ঢেলে-ঢেলে দিতে চায়।

নিস্তব্ধ দুপহর—একটা কাকের পর্যন্ত ডাক নেই।

প্রভাত ওর বোন দুটির কথা ছাড়া অন্য কথা মনে করতে পারে না। মমতায় এমন দ্রব এখন পরিবেশ। বলে—মা শোকশয্যায় একান্ত শ্রান্ত—এ কদিন

প্রভাতকেই দুবেলা রাঁধতে হচ্ছে—কষ্টের চেয়ে মালিন্যই যেন বেশি—কত দীর্ঘ দিনের মেয়াদ কবে ফুরোবে কে বলতে পারে ?

প্রভাতের চোখের উপর অশ্রু তার হাত রাখে।

—এ চোখে জল নেই, না, জ্বালাও নেই। প্রভাত বলে—তুমি যে হাত রেখেছ, চোখে এখন শুধু স্বপ্ন—অসম্ভবের স্বপ্ন।

অশ্রুর ইচ্ছে হয় বলতে—আমাকে নিয়ে চলো তোমার বাড়ি, তোমাদের জন্যে দুটো ভাত ফুটিয়ে দিয়ে আসি। মা'র সেবা করি—একটু বা তোমার।

বলতে পারে না।

প্রভাতের বলতে ইচ্ছে হয়—আমাদের ঘর পচা নোংরা বুড়ো, তবু তুমি সেখানে গিয়ে পা রাখবে ? কেনই বা রাখবে ? কিন্তু যদি রাখো—লক্ষ্মীর 'পাড়া' পড়বে, তোমার এই কল্যাণদৃষ্টি এই স্নেহস্পর্শ এই অমলিন সান্নিধ্য পেয়ে আমি আমার সমস্ত দারিদ্র্য ভুলতে পারব। কিন্তু তুমি—তোমার সন্তোষ কোথায় ?—ছিঃ, আমি একটা কী! অধমাধম কেরানী—এম-এ-টা পর্যন্ত পাশ করতে পারিনি।

পারে না বলতে।

অশ্রু প্রভাতের ঘাড়ের তলা থেকে বালিশটা সরিয়ে ওর মাথাটা নিজের প্রসারিত কোলের উপর টেনে নেয়। প্রভাত তার অস্থিরতাকে প্রাণপণে শান্ত করে রাখে। অশ্রুর কোমল ও উত্তপ্ত বুকের আভাসের ছায়া তার মুখের উপর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় তবু সে উদ্বেল হয় না। শক্ত সংযমের মধ্যে সমস্ত আবেগকে ধরে রাখে।

প্রভাতের দীর্ঘ দৃঢ় শরীরের প্রতি মায়ায় অশ্রুর ঘুমন্ত যৌবন ময়ূয়ের মতো সর্বাঙ্গে পেখম মেলে ধরে।

অশ্রু বলে—একটা বাইক কিনে নিলে তোমার খুব সুবিধে হবে। আমি টাকা দেব, মনোমত দেখে একটা কিনে নিও। কি, মোটর-বাইক কিনবে ? সঙ্গে সাইড-কার ?

দুই চোখে রহস্যময় ইঙ্গিত—অথচ স্নেহে কী নম্র!

অশ্রু আদরে উচ্ছল হয়ে নিজেই নুয়ে পড়ে বুকটা ওর মুখের উপর চেপে ধরে, বলে—এবার থেকে একদিনও হেঁটে আফিস যেতে পাবে না, যদ্দিন না বাইক হয়। ট্রামে করে যেতে হবে। বাড়িতে একটা ঠাকুর রাখো সম্প্রতি,

সেই রাঁধুক—ঝি কি চাকর যা সুবিধে হয়, একটা রাখো। বুঝলে? সব আমি দেব।

প্রভাত চোখ তুলে বলে—তুমি পাগল হয়ে গেছ নাকি? পাগলি!

—পাগলি মানে? আমার বাক্সে যে কতগুলো টাকা পড়ে আছে তা দিয়ে কী হবে শুনি? আর শোনো, এবার থেকে আফিসেই টিফিনের বন্দোবস্ত কোরো—পেট ভরে যেন—শরীর নিয়ে গাফিলি কোরো না। আমি না হয় পাগলি, কিন্তু তুমি লক্ষ্মীটি হয়ে আমার কথা শুনো—কেমন?

কোলের থেকে ধীরে ধীরে প্রভাতের মুখ তুলে একটু কী ভেবে বালিশের ওপর রেখে অশ্রু উঠে দাঁড়ায়। আলমারি খুলে কতগুলি আনকোরা জামা বের করে বলে—তোমার জন্যে এই দুটো পাঞ্জাবি করেছি—সেদিন ভিজে এসে যে জামাটা ছেড়ে গেছলে সেটার মাপে। আর এই কটা রুমাল। খবরদার, তুমি কিন্তু একটুও আপত্তি করতে পারবে না—ধোপাবাড়ি থেকে কাচিয়ে এনে গায়ে দিয়ে একদিন আসতে হবে কিন্তু—তোমার নেমন্তন্ন রইল।

সমস্তগুলি জামা ও রুমাল পরিপাটি করে ভাঁজ করে একটা খবরের কাগজ দিয়ে জড়ায়, পরে একটা লাল সুতো দিয়ে বাঁধে, বাড়তি সুতোটা দাঁত দিয়ে কাটে, থুতিয়ে মেঝের উপর ফেলে দেয়।

এগুলি অশ্রু বসে বসে ওর জন্যেই তৈরি করেছে, ওকে স্মরণ করে—মুগ্ধ হয়ে প্রভাত তাই ভাবে—আর কে জানে কেন ওর ছোট বোন দুটির কথা মনে পড়ে যায়।

প্রত্যেকটি জামা ও রুমালের কোণে প্রভাত ও অশ্রুর ইংরিজি আদ্যাক্ষর দুটি একত্রে গাঁথা আছে—প্রভাতের চোখে তা এখনো পড়েনি। তবু মুখ ফুটে বলতে পারে না অশ্রু।

তুমি বলতে পারবে না—ভাষার বদলে বিধাতা মানুষকে এ অভিশাপ দিয়েছেন। বিধাতাও বলতে পারেননি।

অশ্রু ষ্টোভ ধরায়। নিমকি ভাজে। বলে—আমার পাশে এসে বোসো।

প্রভাত ওর কাছে বসে বলে—ভাবতেই পাচ্ছি না তুমি রাঁধছ আর আমি তোমার কাছটিতে বসে আছি।

—আর কার জন্যেই বা রাঁধছি?

—আমার জন্যে।

অস্ফুট দুটি কথা, কিন্তু সম্পূর্ণ বলা হল না। জীবনের আসল রান্না কার জন্যে রাঁধবে ?

দুজনে একসঙ্গে চা খায়। নিমকি আবার পরস্পরকে খাইয়েও দেয়। আঙুল-গুলো তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে অশ্রু একটু হাসে—নিমকির সঙ্গে আরো কী যেন সে দিয়ে দিচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পেরেছে !

—কী দস্যি, আঙুল কামড়ে দিয়েছে! নিজেই আবার চোখ পাকিয়ে নালিশ জানায়।

—কই দেখি। হাত ধরবার জন্যে প্রভাত হাত বাড়ায়। বলে—দাও, ওষুধ লাগিয়ে দিই।

—বিষের ওষুধ বলে বিষই আবার দেবে তো ? শব্দ করে হেসে ওঠে অশ্রু।

সন্ধ্যা হয়ে আসে।

যেমন একসময় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হয় তেমনি আবার এক সময় বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়।

যাবার সময় অশ্রু বললে—দয়া করে এই দশটা টাকা নিয়ে যাও—

প্রভাত দু হাত সরে গিয়ে বললে—তুমি কি বুদ্ধিশুদ্ধি খুইয়ে ফেললে নাকি ?

অশ্রু তেমনি সহজ স্বরে বললে—মোটেই না। তোমার কষ্টের সময় বন্ধুর থেকে নিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করা উচিত নয়। আমি যে তোমার বন্ধু—সখী।

—আমার যে টাকার কষ্ট তা তুমি কি করে বুঝলে ?

—সে বোঝার অন্তর্দৃষ্টি আমার আছে।

—অন্তর্দৃষ্টিতে শুধু এইটুকু বুঝলে ? গভীর করে তাকায় প্রভাত।

—হ্যাঁ, অন্তত এটুকু বুঝি যে তোমার অন্তর্দৃষ্টিই অল্প। সুন্দর করে কটাক্ষ করে অশ্রু—নাও, এস এগিয়ে, পকেটে ফেলে দিচ্ছি। যে ক'দিন যায়। এস—

—ধার দিচ্ছ ? প্রভাত হঠাৎ কী রকম গম্ভীর হয়ে যায়।—ধার তো আমি চাইনি।

—আমি কোনো জিনিসই ধার দিতে শিখিনি। আমার ব্যবসাদারি বুদ্ধি অত ধারালো নয়। অশ্রুকেও কেমন একটু বাঁকা শোনায়।

—তবে ভিক্ষা ?

—ছিঃ, কী যে বলো যা-তা। এস, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, তোমার মাথায়

একটা রুমাল বেঁধে দিই। নাও, দুষ্টুমি কোরো না। আফিসে টিফিনের একটা ব্যবস্থা করে ফেলো। পরে আর দু চার দিনের মধ্যে—এ কি, যাচ্ছ যে?

প্রভাত ফিরে না তাকিয়েই বলে—তোমার কাছে অর্থ ভিক্ষা করতে আসিনি।

অশ্রুর দু চোখ ব্যথায় করুণ হয়ে আসে—তোমাকে অপমান করলাম বুঝি? বা রে, আমি বুঝি তোমার পর? আমার কাছ থেকে বুঝি নেওয়া যায় না?

শেষের কথাটা যেন অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে স্পর্শ করে। প্রভাতের পা চলতে চায় না। কতদূর গিয়েই ফের ফিরে আসে।

অশ্রু সেই বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে আছে, বালিশের ওপর চুলগুলো এলো করে দেওয়া—সেমিজের ধারে খোলা খানিকটা পিঠ—সারা মেঝেয় নোটটা টুকরো করে ছেঁড়া।

খোলা পিঠের উপর হাত রাখে প্রভাত। বলে—ওঠো, এবার যে তুমি দুষ্টুমি করছ। সত্যি সত্যিই, পকেটে একটাও পয়সা নেই—কি করে যাব তবে? হেঁটে? সে যে অনেকদূর। ওঠো।

তারপর অশ্রুর হাত ধরে সস্নেহে আকর্ষণ করতে চায়। আরো কিছু বলতে চায় হয়তো। অশ্রু পাথর হয়ে থাকে। তাকে বুঝি টলানো যায় না।

এতক্ষণ কাঁদেনি—অশ্রু এবার কাঁদে। কেন দু হাত বাড়িয়ে টেনে তুলে নিতে পারে না? সংসারে অর্থই কি একমাত্র শক্তি—পুরুষত্ব শক্তি নয়?

ঐশ্চর্যই সব, মাধুর্য কিছু নয়?

খানিকক্ষণ সেই কান্না দেখে মেঝের থেকে নোটের কয়েকটা ছেঁড়া টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে প্রভাত চলে যায়। পায়ে হেঁটেই।

চোখের জলেই বুঝি তৃপ্তির সমুদ্র।

কিন্তু উপায় কী অশ্রুকে না কাঁদিয়ে? পুরুষত্বের চেয়েও কি মনুষ্যত্ব বড়ো নয়?

অশ্রুর বাবার সঙ্গে প্রভাতের আলাপ সেই প্রথম—যেদিন সবাই নীরেনকে জাহাজে তুলে দিতে ঘাটে জড়ো হয়েছিল। তেজী টগবগে ঘোড়ার মত নীরেন, প্রভাতের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—চললাম ভাই, তোমার চেনাশোনা

সবাইকে আমার কথা বোলো—গুরুজনদের প্রণাম দিও, চিঠি লিখলে জবাব দিতে ভুলো না।

একটা গরীব কেরানী, মইয়ের একেবারে শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য একটা আফিসে রোথো চাকরি—কিছুই বলবার মতো নয়। প্রভাতকে দেখে অশ্রুর বাবা দস্তুরমতো বিরক্তই হলেন। প্রথম দর্শনে লোকের প্রতি মানুষের ঘৃণাও হয়!

তা দেখতেও যদি ভালো হত। কালো ঢ্যাঙা রুক্ষ টান-টান চেহারা। কেমন একটা বন্য অনার্যতা। এ কি সুবাদে তাঁর ছেলে-মেয়ের বন্ধু হয়?

গাড়িতে উঠে অশ্রু বলে—আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন না প্রভাতবাবু, আপনাকে একেবারে নামিয়ে দিয়ে যাব।

বাবা গম্ভীর মুখে বলেন—তা হলে আমার দেরি হয়ে যাবে। বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বলেন।

অশ্রু নীরবে শুধু একটু হাসে। সেই হাসিটুকু সম্বল করেই একা-একা চলে যায় প্রভাত।

আগুন দুপুরটা সুরে-ভরা মোহময়। কিন্তু বারটা যে রবিবার সেটা বুঝি প্রভাতের খেয়াল নেই।

খাটে বসে অশ্রু খোলা চুলে বই পড়ছে আর মুখোমুখি চেয়ারে বসে প্রভাত তাকে দেখছে বিভোর হয়ে। যেমন অমাবস্যা রাত্রির আকাশ দেখে, নিবিড়শ্যাম অরণ্য দেখে। আর চকোর যেমন মেঘকে বলে সরে যাও, চাঁদের আভাসটুকু অন্তত দেখি, তেমনি ওর দুই চোখ অশ্রুর গায়ের আঁচলকে বলছে, দয়া করে একটু অসতর্ক হয়ে খসে পড়ো।

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে যায়।

যিনি দোর ঠেলে সবলে ঢোকেন তিনি অশ্রুর জেঠতুতো বড়দা—পত্নী-বিয়োগের পর থেকে ব্রহ্মচারী আছেন বলে যাঁর গর্ব।

—কী করছিস? কেউটের চোখে তাকিয়ে জিগগেস করেন অশ্রুকে।

—পড়ছি।

অশ্রু যে আসলে পড়ছে না, শুধু ভালো দেখাবার জন্যেই বইটা খুলে রেখেছে তা বুঝে নিতে ব্রহ্মচারীর দেরি হল না।

—তুই পড়ছিস তো উনি কী করছেন?

—উনি শুনছেন।

—যখন ঘরে ঢুকি তখন তো কই শব্দ করে পড়া শুনিনি।

—তখন একটু থেমে ছিলাম—

—বেশ, পড়, আমিও শুনি। ব্রহ্মচারী আরেকটা চেয়ারে বসে পড়ে।

অশ্রু খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।—ইচ্ছে হয় তুমি পড়ো।

ব্রহ্মচারী বইটা নেড়েচেড়ে দেখল সেটা একটা বিলিতি উপন্যাস, তখুনি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে—বেশ, আমিই পড়ব, আমার ঘর থেকে বাঁধানো গীতাখানি নিয়ে আয়—

অশ্রু বলে—সে বই তো কবে তোমার খোকার দুধ গরম করতে আগুনে বিসর্জন দিয়েছি। বলে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

অশ্রুর বাবা যখন ব্যবসার খাতিরে বাইরে যান তখন এই ব্রহ্মচারী দাদাই শাসনের চাবুকটা তুলে নেন হাতে। বাবা হলে শুধু লাগাম টানেন, ব্রহ্মচারী আবার সেই সঙ্গে চাবুকও হাঁকড়ান।

প্রভাত সেদিন বাড়ি ফিরে এসে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ওর ঘুমন্ত অন্ধ ভাইটিকে দেখতে লাগল। হঠাৎ মনে হল—ওরও চোখ যেন ক্ষয় হয়ে গেছে, ও আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না—যেন পৃথিবী হঠাৎ অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকার মতো ইন্দ্রিয়াতীত হয়ে গেছে—তার মনিহারি দোকানের ঝাঁপ পড়ে গেছে, চিচিমের গুহা আর খুলবে না কোনোদিন।

হেঁটেই আফিস যায়, হেঁটেই ফেরে—দু এক বেলা নিজের হাতে রাঁধেও, বাবার গা-হাত-পা টিপে দেয়, বাজার-দর নিয়ে মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে।

মা বলেন—কবে মরণ হবে?

প্রভাতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—আমার মরণ দেখেই যেন হয়।

এক এক দিন অশ্রুদের গলিটাও মাড়িয়ে আসে—এমনি বেড়াতে-বেড়াতে।

খাঁচার পাখি অশ্রু—বাঙালী গৃহস্থের মেয়ে যেমন হতে হয়। সোনালী লতার মতো বাড়তেই পেয়েছে—এই যা, নইলে না আছে বিদ্রোহ, না আছে ফল-ফলানো। কাঁচের বাসনের মতো ঠনকো, শুধু একটু উষ্ণ চা খাওয়ার জন্যে। চুপ করে বসে খালি জামা সেলাই করে নানা রঙের ছিটের, তসরের, কত কী, কবে দেবে এবং দেবেই বা কিনা তাই ভাবে, আর বিয়ের যে সম্বন্ধগুলি আসে কে জানে মনে মনে তার সঙ্গে মেলায়।

শোবার আগে ঈশ্বরকে ডাকে—ও যেন ভালো থাকে, ওর সুন্দর শরীর যেন সুন্দর থাকে, ওকে আর কষ্ট দিও না, ওকে একটা ভালো কাজ পাইয়ে দাও। নয় তো যদি পারে আমাকে যেন ভুলে যায়, আমি বড়লোকের মেয়ে বলে আমাকে যেন ঘৃণা করে।

জানলায় বসে দূর পথের দিকে চেয়ে থাকে—বহুদূর পর্যন্ত ওর অম্লান শুভেচ্ছাটি পাঠিয়ে দেয়। রাতে শুয়ে ভাবে পাশে বুঝি এসে শুয়েছে, সেই দীর্ঘ-চ্ছন্দ ঋজু্ দেহ নিয়ে, আপন মনে চঞ্চল-চপল আদর করে, তেমনি বুকের মধ্যে মুখটা চেপে ধরে, কপালের ঘাম আঁচল দিয়ে মুছে দেয়।

হঠাৎ ব্রহ্মচারী বড়দা একদিন বিয়ের জন্যে ক্ষেপে ওঠেন। যেন ক্ষেপে ওঠাই স্বাভাবিক। বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে—জোয়ারের উলটো টানে একা আর গুণ টানা হয়ে উঠবে না।

টাট্টু ঘোড়ার মতো বউ, টগবগ করে ফেরে। মঠবাসিনীর বিলিতি সংস্করণ বুঝি!

চিঠি লিখে একটি ছেলেকে দিয়ে অশ্রু প্রভাতের কাছে পাঠাল।

তুমি একটিবার এস। লক্ষ্মীটি এস। কতদিন তোমাকে দেখিনি। আমার প্রার্থনায় ভালো আছ নিশ্চয়ই আর আমার প্রার্থনা সত্ত্বেও আশা করি আমাকে একেবারে ভোলোনি। একবারও দেখতে ইচ্ছে করে না, অন্তত দেখা দিতে? এসো, অনেক কথা আছে। বড়দা তো উদার হয়ে নিজে গিয়েই তোমাকে নেমন্তন্ন করে এসেছেন। তবে আর ভাবনা কী? এসো কিন্তু।

ইতি-তে শুধু অশ্রু লেখা নয়—তোমার অশ্রুমতী।

বড়দা যে কেন তাকে নেমন্তন্ন করল কে বলবে। নতুন বিয়ের খুশিতে মনে বুঝি বদান্যতা জেগেছে, কিন্তু কে জানে হয়তো বা অশ্রুর প্ররোচনায়। অশ্রুই বা কেন তাকে আহ্বান করবে? তার অক্ষমতা তার অপদার্থতা কি প্রমাণের আরো অপেক্ষা রাখে?

প্রভাত তবু গেল—একটু বেশি রাত করেই। দু চারজন চেনা লোকের সঙ্গে দু-চারটে মামুলি কথা-টথাও কইল, খেল, বাজে ক'টা ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতেও কুণ্ঠিত হল না।

অশ্রু চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে—কত কাজ ওর, সবখানেই ওকে দরকার। কী সুন্দর সেজেছে—বহুদিনকার আগের সেই চেনা দেহলতা আজ যেন নতুন রহস্যে ঢেকে এসেছে। নতুন করে ফের যেন চেনাতে চায়—যতই চিনবে ততই যেন নতুন হবে। ছিঁড়ে কেড়ে উড়িয়ে দিয়ে সব একেবারে শেষ করে দেওয়া যায় না? লোভ শেষ করে দেয়, ভালোবাসা নতুন করে রাখে। রতির শেষ আছে, আরতি অন্তহীন।

মুখে কেমন সুন্দর ঔদাসীন্যের ভাব—প্রভাতকে দেখেও একটু কৌতূহল নেই, জিজ্ঞাসা নেই—এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ওর চোখে চোখ ফেলবারও যেন সময় নেই। ও যেন কে—ওকে অশ্রু যেন কোনোদিন দেখেছে বলেও মনে করতে পারছে না।

এসো, অনেক কথা আছে। সে কথা কখন কইবে? জেগে না ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে? কোন সে বিস্ময়ের জাগরণ, কোন সে বিস্মৃতির ঘুম?

অনেক কথা আছে—তারায় ভরা কালো আকাশটারও যেন সেই কথা।

নীচের তলায় কোণের দিকে একটা নিরিবিলি ঘরে নোয়ানো চেয়ার টেনে প্রভাত গা এলিয়ে বসে পড়ে। না, সে প্রতীক্ষা করে যাবে। এক সময় অশ্রু ঠিক তাকে খুঁজতে আসবে—তাকে না জানিয়ে প্রভাতের চলে যাওয়া অসম্ভব। খুঁজতে এসে ঠিক তাকে এই কোণের ঘরে আবিষ্কার করবে। তারপর এক মুহূর্তে একটি অপরূপ পরিচয় সংঘটিত হবে। দেবতারা দেখবার জন্যে চক্ষু মেলে থাকবেন।

বসে থাকতে থাকতে প্রভাত বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল।

বরবধুর ফুলশয্যা আজ—মুখর উৎসব সমাপ্ত হয়ে গেছে শুধু একটি কক্ষ ছাড়া—সে কক্ষ নিশ্চয়ই এখন আর ব্রহ্মচারীর নয়। সে কক্ষ কবির।

প্রকাণ্ড বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে অশ্রু সেই নীচের ঘরে এল। এসেই মুগ্ধ হয়ে গেল—দুই চোখে জল ডেকে এল। কী সুন্দর ঐ ঘুমটুকু! ইচ্ছে করল এক চুমুকে ঐ ঘুমটুকু ও পান করে ফেলে—এক চুমুকে এবারের এই জীবন।

অশ্রু প্রভাতের কাছে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে মনে হল সে বুঝি নিজেও আর জেগে নেই। আস্তে প্রভাতের কপালে ডান হাতখানি রাখলো, জামার বোতামগুলি খুলে আস্তে বুকের ওপর। রাখতেই তার সমস্ত দেহ সেতারের মত

ঝঙ্কার করে উঠল। মনে হল এই ক্ষণিক একটু স্পর্শেই ও যেন ওর আলাদা অস্তিত্বের কথা ভুলে যেতে বসেছে।

তারপর প্রভাতের একখানি হাত সে নিজেই তুলে নিল, রাখল নিজের গালে, গলার নীচে, বুকের কাছে। তারপর কী জানি কেন, পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বসল।

অথচ জাগাতে পারল না।

—যাই একটা বিছানা নিয়ে আসি। অশ্রু বিছানা আনতে চ[illegible]ল উপরে।

ফিরে এসে দেখল, প্রভাত ঘরে নেই, উঠে চলে গেছে।

ঘুম ভাঙাতে পেরেছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু জাগাতে পারেনি।

কিন্তু যে জেগে উঠবে সে তো জানে সে কত বড়ো ছন্নছাড়া। যোগ্যতার বাজারে যুক্তির মাপকাঠিতে তার দাম তো ফুটো পয়সারও কম। তবু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যুক্তি মানে না কেন? কোন নিয়মে প্রাণের আকাঙ্ক্ষাই যোগ্যতার বরাসন অধিকার করে বসে?

শুধু চাই—এই প্রাবল্যেই কি পাওয়া চলে? যদি ও পক্ষও চায় তবে আর বাধা কিসের, কোন সমাজনীতি, কোন অর্থনীতি?

এ তো শুধু চাওয়া নয়, এ যে আবার টিঁকিয়ে রাখা। ভালোবাসাকে ঢেলে দিয়ে বিয়েতে স্থায়ী করা।

হায়, ঢেলে দিলেই বুঝি সেটা আর ভালোবাসা থাকল!

ওপক্ষে যে ওটা ভালোবাসা সেটা তুমি বুঝছ কী করে? হয়তো বা সেটা আলেয়ার আলো—ছলনার শিখা।

যেমন ছলনার শিখা ঐ দোরের পাশে দাঁড়ানো সুন্দরী মেয়েটি। সুন্দরী না হোক, সেজেছে তো সুন্দর করে। কৃশ দেহলতা ঘিরে সেই সুচারুতা, প্রতীক্ষারত ভঙ্গিটা বিরহবেদনার তুলি দিয়ে আঁকা। সব চেয়ে আশ্চর্য, তার পাতলা শাড়ির নিচে গোলাপী সেমিজের আভাস।

প্রভাত তার ঘরে চলে আসে। সেই তেমনি বিছানা পাতা। পরিশ্রান্ত জীর্ণ শরীর বিছানায় ঢেলে দিয়ে প্রভাত খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকে। মেয়েটি

শিয়রে না ব'সে পায়ের কাছে বসে। কতদিন অশ্রুর পাতু'খানি দেখেনি, দেখেনি চোখদুটি, শোনেনি মুখের কথা, পায়নি হাতের ছোঁয়া।

প্রভাত মেয়েটিকে বলে—কাছে সরে এস।

মেয়েটি উৎসাহিত হয়ে কাছে ঘন হয়ে আসে।

তার শুকনো বিবর্ণ হাত প্রভাত টেনে এনে কপালে রাখে, জামার বোতাম খুলে বুকের উপর—কই, এতটুকুও তো আগুন লাগে না।

মেয়েটি একফাঁকে উঠে দেয়ালগিরির আলোটা কমিয়ে দিয়ে এসে ফের বসে। এবার ঘনতর হয়ে। প্রভাতের দেহ ঘৃণায় কিলবিল করে ওঠে। সরে গিয়ে বলে—আলোটা বাড়িয়ে দাও, ঐ আলোই তোমার অবগুণ্ঠন।

মেয়েটির সময়ের দাম আছে, তাই বিরক্ত হয়ে হাত পাতে—টাকা চায়।

এখানেও টাকা!

কত কষ্টের টাকা—তাই অকাতরে প্রভাত দিয়ে দেয় মেয়েটাকে।

—এ কি, তুমি চলে যাচ্ছে কেন?

—যাতে আবার আরেকদিন আসতে পারি।

—তা এসো না আরেকদিন। আজ কি দোষ হল?

—তুমি তো আমার বউ নও, তুমি আমার বন্ধু, আমার সখী—

—তা হলে টাকা দিচ্ছ কেন? টাকা ফেরত নিয়ে যাও। মেয়েটি তার আঁচলের গ্রন্থিটা খুলে ফেলে।

—না, না, তোমার যে বড্ড অভাব—তোমার ল্যাম্পে তেল নেই, পলতেটা দপদপ করছে।

প্রায় ছুটে রাস্তায় নেমে পড়ে প্রভাত। বাড়িতে এসে দেখে—একটি ছেলে তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে।

—কে?

—আমি তিনু, অশ্রুদির ভাই।

—কী মনে করে?

—আপনার একটা চিঠি আছে।

আলোর সামনে ধরে এক নিশ্বাসে ছোট্ট চিঠিটা পড়ে ফেলে প্রভাত।

—বাইরে তোমাকে খুঁজে না বেরিয়ে নিজের মধ্যে তোমাকে দেখছি। তোমার শরীর ভালো নেই, তুমি খুব কষ্টে আছ, এই কেবল আমার মনে

ডাক দিচ্ছে। তিনুর সঙ্গে দুটো লাইন লিখে পাঠিও। আশা করি এত তাড়াতাড়ি আমাকে ভুলে যাওনি। এই সঙ্গে তোমাকে একশোটা টাকা পাঠাচ্ছি—তুমি নিয়ো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—একটুও সঙ্কোচ কোরো না লক্ষীটি। কেন নেবে না? আমি যে তোমার বন্ধু, বন্ধুর চেয়েও বেশি—পরমাত্মীয়। তোমার অভাব যদি কিছু পূরণ করতে না পারি তবে আমার টাকার তো কোনো দামই নেই। নিয়ো—এমনি করেই তো আমাকে নেওয়া। প্রণাম নিয়ো, সেই সঙ্গে অনন্ত ভালোবাসা। ইতি। তোমার অশ্রুমতী।

মুখে যা আসত না কলমে তাই এনেছে। আশায় যা নেই তাই রেখেছে ভালোবাসায়।

বছর পনেরোর ছেলে—তিনু পকেটের থেকে নোটের তাড়া বের করে প্রভাতের হাতে তুলে দিতে চায়।

প্রভাত গুটিয়ে গিয়ে বলে—ও তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। বোলো, আমি বেশ ভালোই আছি।

—কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে গেলে পথে পকেট কাটা যাবে বলে দিদি ভয় দেখিয়ে দিয়েছে। তিনু সরল চোখে হাসে।

—এত বড়ো পকেটমার থেকে যখন রেহাই পেলে তখন আর ভয় নেই।

—না, আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে, যদি ফিরিয়ে আনিস তবে তুই একটা আস্ত বোকা।

—তুমি তো ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েই ভালো করে প্রমাণ করতে পারবে যে তুমি বোকা নও। দু দুবার ট্র্যামে যাওয়া-আসা করলে তোমার পকেট মার গেল না। কেউ ফিরিয়ে দেবার পর সে টাকা ফেলে দিয়ে গেলে কেউ বুদ্ধিমান বলে না। তুমি অশ্রুকে বোলো আমি বেশ স্বচ্ছন্দেই আছি—

—কিন্তু আপনার শরীর তো খুব খারাপ দেখাচ্ছে। আপনার মা বলছিলেন প্রায়ই জ্বর হয় আপনার।

—ও কিছু নয়। একটু সাবধানে থাকলেই সেরে যাবে।

—কিন্তু—দু চোখে যেন অশ্রুরই করুণা আর স্নেহ নিয়ে তাকায় ছেলেটি।

প্রভাত তিনুকে রাস্তায় অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দেয়—নানান খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে—সমস্ত দিন দিদি কী করে—কলেজ কি এখনো চলছে? না কি বিয়ের তোড়জোড় হচ্ছে? বাইরে বেরোয় না কখনো?

—আপনি যান না কেন ?

—আদার বেপারী কি জাহাজের খোঁজে যেতে পারে ? আমি যে যাই তোমাদের বাড়ির লোক পছন্দ করে না।

—কিন্তু দিদি তো করে।

—সে আর কতদিন ! আস্তে-আস্তে অন্যরকম হয়ে যাবে।

—আপনি যদি বলেন আমি দিদির সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দিতে পারি।

প্রভাত নিজেকেই অনুকম্পা করে হাসল। শেষকালে কিনা এই একরত্তি ছেলেটার কাছ থেকে সাহায্য নিতে হবে! রাস্তার খানিকদূর এগিয়ে দিতে-দিতে প্রভাত বললে,—তুমি টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে বোলো, প্রভাতদা তোমাকে ঢের-ঢের ধন্যবাদ জানিয়েছেন—এই টাকাটা যেন রেখে দেন, প্রভাতদা মরে গেলে তা দিয়ে তার চিতায় যেন একটা ছোট্ট স্মৃতিচিহ্ন রাখেন—কিংবা আর কোনো সুযোগ্য বন্ধুকে উপহার দিয়ে দেন। বলতে পারবে ? পারবে না ?

তিনু উত্তর দেয়—না। ও সব বুঝি কেউ কাউকে বলে ?

যে কথাটা বলবার, যেটা মর্মের কথা, তাও তো বলা যায় না। সেটা হচ্ছে এই—তুমি এমনি করে বারে-বারে আমার অপদার্থতাকে প্রমাণিত কোরো না। তুমি যদি আমার বউ হতে, তবে অপদার্থ স্বামী হয়েও আমি তোমার থেকে সামান্য টাকা-পয়সা কি, ধুলো-বালিও স্বচ্ছন্দে নিতে পারতাম। কিন্তু আমার বন্ধুত্বটাকে ছোট করে দিও না। নিষ্কিঞ্চন হয়েও তো মহামহিমান্বিত বন্ধু হতে পারি। যার টাকা নেই, তার কি আর কিছুই নেই, কিছুই থাকতে পারে না ? যার টাকা নেই তার কি থাকতে পারে না ভালোবাসার ভাণ্ডার ? কুবেরের ভাণ্ডারের চেয়েও যা বেশি ?

তুমি যদি আমার বউ হতে—এমন অসমসাহসিক কথাও ভাবা যায় ?

তুমি যদি আমার বন্ধু থাকো—এ বুঝি তারও চেয়ে দুঃসাহসিক। বিয়ে বড়ো জিনিস হতে পারে, কিন্তু বন্ধুতা বুঝি তারও চেয়ে বড়ো।

হ্যাঁ, বন্ধুতা—স্ত্রী-পুরুষে বন্ধুতা—একসঙ্গে সংসার না করেও বন্ধুতা। সজ্ঞান, সক্রিয়, সংযত বন্ধুতা।

বিয়ে করে উদয়াস্ত একসঙ্গে থেকে তো পরস্পরকে ক্ষয় করে ফেলা। অবারিত সান্নিধ্যই তো অনাদরের হেতু। অভ্যাস থেকেই শৈথিল্য, বিমুখতা।

রক্তের মধ্যে জরার প্রবেশ। আর এই বন্ধুতায় জরা নেই, বার্ধক্য নেই, নেই ক্ষয়-ভয়। আকাঙ্ক্ষা সব সময়েই অনির্বাণ। পুরুষ সব সময়েই দৃঢ়কায়, স্ত্রী সব সময়েই স্থিরশ্রী। রক্তের মধ্যে যন্ত্রণার চিরন্তন আনন্দ।

বন্ধুতা তো সহস্থিতি কই? থেকে-থেকে থেমে-থেমে এক আধবার দেখা হবে তো? যে পলতের মুখে আগুন জ্বলছে সেটাকে মাঝে-মাঝে উসকে না দিলে চলবে কেন? কী করে আশ্বস্ত হবে যে প্রদীপের মাঝে স্নেহতেল তেমনি সঞ্চিত আছে?

বছর ঘুরে যায়—দিনের পর রাত পোহায়—আর দেখা নেই, চিঠি নেই, কিছু নেই।

তিনুও একবার আসে না পথ ভুলে।

কিন্তু মন বলে, এ বস্তুর আর বিকল্প নেই। যে ভালোবাসা অন্তরে একবার দেখা দিয়েছে সে আর উৎখাত হবে না। কী তার আশ্চর্য শক্তি, দৃঢ়প্রোথিত হয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকবে। যতই গাছগাছালি বসাও না কেন, সেই বনস্পতিকে আড়াল করতে পারবে না।

কিন্তু এ কী অভাবনীয়!

অশ্রুর বিয়ের নিমন্ত্রণ-চিঠি এসে হাজির। শুধু ডাকে আসেনি—অশ্রুর সেই ব্রহ্মচারী বড়দা—আর ব্রহ্মচারী নন, এখন কর্মচারী—নিজেই একখানা বয়ে নিয়ে এসেছেন।

—মেয়ে কিছুতেই বিয়ে করবে না—পাঁচ কাহন নিজেই বলতে লাগলেন বড়দা—কিন্তু জিগগেস করি, করবিটা কী? মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছিস তখন বিয়ে করা ছাড়া তোর আর কী করবার আছে? মেয়ের কিছুতেই মন ওঠে না, কোনো পাত্রই পছন্দ হয় না। মেয়ে বড় হয়েছে, জোর জবরদাস্তি করে তো আর গছিয়ে দেওয়া যায় না। শেষকালে আমরা বললাম, বেশ তো, তোর যদি কোনো লাভার-টাভার থাকে, বল, তার সঙ্গেই লাগিয়ে দি। তখনো মেয়ে চুপ, ঘাড় নেড়ে বললে, নেই তেমন কেউ। কিন্তু কতদিন আর ঘাড় বাঁকা করে থাকবে—বয়সের একটা ধর্ম আছে তো? তারপর এমন পাত্র!

দুর্বল রেখায় সম্মতির হাসি হাসল প্রভাত। —তা তো ঠিকই!

পাত্রের কথা না শুনেই ঠিকই বলছ কী ! এ তো শুধু বর নয়, বিধাতার বর। বড়দা আবার পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন—বি-সি-এস ছেলে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কদিন পরেই মহকুমা, তারপর একেবারে জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বিস্তর মাইনে, প্রতাপ-প্রতিপত্তি—আরাম, সুখ, তৃপ্তি। মেয়ে এবার লাফিয়ে উঠল—নেচে নয় লাফিয়ে উঠল—আর 'না' করবার দুর্বুদ্ধি করল না। এই আসছে রবিবার বিয়ে—তোমার তো ছুটি, যেতে অসুবিধে হবে না। যেয়ো, দেখে এসো—

—কোনো লাভার-টাভার আছে কিনা। বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল প্রভাত।

—ও সব ছেলেমানসি প্রেম জলবসন্তের মতো।—কোনোই দাগ রাখে না। যদি বড়মানসি প্রেমও হয় বড়জোর দিন দুয়েকের দপ্দপানি—বিয়ের পর একটা সন্তান জন্ম হওয়ার পরেই ঠাণ্ডা—ব্যস, খতম।

রবিবারের দুপুর বাড়িতে বসেই কাটাচ্ছে প্রভাত। এখন বিকেল হয়ে এল।

ভাবছে যাবে কিনা বিয়েতে। একবার কৃত্রিম সাজে দেখে আসবে কিনা অশ্রুকে। কেমন রঙ মেখেছে, গয়না চড়িয়েছে, শুভদৃষ্টির জন্যে চোখে কেমন এনেছে কৌতূহল। আবার ভাবছে যে আটপৌরে সাজে রয়েছে তার মনশ্চক্ষে, তাই অক্ষয় হয়ে থাক। পুতুল ভেঙে যাচ্ছে তো যাক, প্রতিমাকে নষ্ট করি কেন ?

আশ্চর্য, কানাকড়ির সামর্থ্য নেই, পর্বতপ্রমাণ অভিমান আছে। একবেলার ভালোবাসাকেই মনে করছে একজন্মের ভালোবাসা। একটি মৃদু উষ্ণ ঘন স্পর্শকেই মনে করছে নগ্ননিতল সমুদ্রের অবগাহন।

আকাশ ধূসর হয়ে এল—প্রভাত উঠি-উঠি করছে—দরজা ঠেলে ভিতরে কে ঢুকল।

—কে ? প্রায় ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল প্রভাত।

আগন্তুক ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল।

—এ কি, তুমি ? অশ্রু ? মূঢ়স্বরে উচ্চারণ করল প্রভাত।

—হ্যাঁ, ছুঁয়ে দেখ—আমি, ভূত নই। অশ্রু তক্তপোশের ধারে এসে প্রভাতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

—তোমার আজ বিয়ে না ?

—বিয়েই তো।

—হয়ে গেছে ?

—এখনো তো দিনের আলো ফুরিয়ে যায়নি। দিন থাকতে কখনো বিয়ে হয় ?

—তা হলে পরে হবে। প্রভাতের গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠল।

—হবে কি গো, হচ্ছে—এই তো হচ্ছে।

—হচ্ছে ? সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল প্রভাত।

প্রভাতের দু কাঁধের উপর দুটি হাত অশ্রু মালার মতো করে রাখল। বললে —এবার তবে মালা বদল করো।

প্রভাত দুর্ধর্ষ দুই বাহুতে অশ্রুকে তার বুকে জড়িয়ে ধরল। বললে—এই মালা বদল, হৃদয়-বদল, এই মুখচন্দ্রিকা—

আলিঙ্গন থেকে ফের বেরিয়ে এল অশ্রু। —আমি এবার চলে যাব।

—চলে যাবে ?

তবে কি প্রভাত আশা করছে অশ্রু এই বাড়িতে আস্তানা নেবে ? এই ভাঙা থুথুরো স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে ? এই অল্প মাইনের ঘর-বারান্দায় ? এই বিবর্ণ পরিবেশে ? শরীরের শক্তিই তো আর জীবনের স্বাস্থ্য নয়। এইখানে বসে সে তার উজ্জ্বল অস্তিত্বে মর্চে পড়তে দেবে ? আর সেটাই কি হবে প্রভাতের স্বপ্নের অনুবাদ ? চলে যাবে না তো কী, নিশ্চয়ই চলে যাবে।

কিন্তু অশ্রু বললে অন্য কথা। বললে—আমি পালিয়ে এসেছি।

—কোথায় ? আবার একটা অবান্তর প্রশ্ন করল প্রভাত। নিশ্চয়ই তার কাছে নয়। তার কাছে এলে প্রভাত তাকে আটকে রাখছে না কেন ? কেন যেতে দিচ্ছে ? বিয়ে হয়ে যাবার পরেও তার অধিকার খাটাচ্ছে না কেন ? না, সেই তো যেতে দিচ্ছে, ছেড়ে দিচ্ছে। সে জানে এই ছেড়ে দেওয়ার মধ্যেই ভালোবাসা। অনেক কিছু বাকি রাখার মধ্যেই জীবনের সম্ভোগ।

—চলেছি জলপাইগুড়ি। অস্পষ্ট আলো সত্ত্বেও হাতঘড়ির দিকে তাকাল অশ্রু।

—সেখানে কী ?

—চাকরি পেয়েছি। টিচারি। আজকের দার্জিলিঙ মেলেই পালাব। বাড়িতে কেউ জানে না।

—কেউ জানে না। নিষ্প্রাণ কণ্ঠে কথাটা শুধু আওড়াল প্রভাত।

—শুধু তিনু জানে। তার হাত দিয়েই স্যুটকেস বেডিংটা পাচার করেছি। সেই ট্যাক্সি এনে দিয়েছে।

—ট্যাক্সি ?

—হ্যাঁ, ট্যাক্সি নিয়ে সে তো রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছে। তাই বেশিক্ষণ দেরি করবার সময় নেই। বাড়িময় এতক্ষণ হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে নিশ্চয়—সবাই হয়তো চারদিকে বেরিয়ে পড়েছে খুঁজতে—যাই, পালাই—

—চলো তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিই—

খুব বীরত্ব দেখাল যা হোক। প্রভাত নিজেই নিজেকে টিটকিরি দিল। তিনু যা পারল তার ততটুকুও মুরোদ নেই।

অশ্রুই তাকে নিরস্ত করল। বললে—খুঁজতে লোক নিশ্চয়ই তোমার বাড়িতে আসবে, হয়তো এক্ষুনিই এসে পড়বে। তোমাকে তখন বাড়িতে না দেখলে সিদ্ধান্ত করবে তোমার সঙ্গেই পালিয়েছি। ওদেরকে তেমন কিছু আভাস দেওয়া ঠিক হবে না। শেষে স্টেশনে না ধাওয়া করে।

না, প্রভাত বাড়িতেই থাকবে। তার বাড়িতে খোঁজ করতে এসে লোক তাকে দেখে বুঝবে তার সাধ্য নেই যে অশ্রুকে নিয়ে পালাতে পারে। তার অকর্মণ্যতায় সকলে নিশ্চিন্ত হবে।

অশ্রু দরজার দিকে এগুলো।

—এখুনি যাবে ?

এ প্রশ্নটাও কাপুরুষের প্রশ্ন। কিন্তু তাকে যে যেতে দিচ্ছে ছেড়ে দিচ্ছে এটাও তো প্রেমেরই সংযম। নইলে কি ইচ্ছে করছে না অশ্রুর ঐ মুখ ঐ বুক, বসনান্তরালের সমগ্র দেহের প্রতি রোমকূপ অজস্র মদির চুম্বনে পাণ্ডু করে দিতে ?

—হ্যাঁ, যাই, ওদের স্টেশনে খোঁজ করতে আসার আগে অন্তত দার্জিলিং মেইলটা বেরিয়ে যাক।

আর অশ্রুরই কি ইচ্ছে হচ্ছে না তার আগে অন্তত একবার রথের চাকার তলায় মাটির ঢেলার মতো নিজের অস্তিত্বটা প্রভাতের বিস্ফারিত বুকের নিচে গুঁড়ো করে ফেলে।

—চলো তোমাকে ট্যাক্সি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

তারো দরকার নেই। দেরি দেখে তিনু নিজেই ট্যাক্সি নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

আর কালহরণ করা গেল না। উঠে পড়ল অশ্রু।

কিছু একটা বলতে হয় বলে প্রভাত বললে—ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখো কিন্তু।

ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল। কথাটা কেউ শুনল বলে মনে হল না।

তিন বছর পরে ফের যবনিকা উঠলো। রঙ্গমঞ্চে একা প্রভাত।

প্রভাতের মাইনে এবার ন-এর কোঠায় পৌচেছে যা হোক; তেমনি বছর খানেক আগে বাবাও বাতের ব্যথায় খতম হয়েছেন। সংসারে মা আর প্রভাত; আর সেই দুঃখী অন্ধ ভাইটি,—ছোট হাত তুলে ঘরের দেয়াল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে মনুমেন্টের স্বপ্ন দেখে। টিম্‌টাম্ করে সংসার চলে। প্রভাত সকাল বেলা টিউশনি করে বাজার এনে দেয়; মা-ই রাঁধেন,—মা'র সঙ্গে-সঙ্গে প্রভাতও সকালবেলাটা নিরামিষ খায়। আফিস থেকে খেটেখুটে এসে ছোট ছাতে একটু পাইচারি করে, মা'র সঙ্গে সংসার সম্বন্ধে একটু মনকষাকষি চলে, কোনো দিন বা মাঠে খেলা দেখে আসে। রাতে তোলা-উনুনে মা মাছ ভেজে স্নান করে বিছানায় নাটুকে বুকে নিয়ে শুয়ে পড়েন। প্রভাত অনেক রাত করে শোয়—জেগে জেগে ততক্ষণ বই পড়ে; ভাবে, উপন্যাসের দু'এক পৃষ্ঠা লিখতে চেষ্টা করে, কাটাকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। এবার একটি টুকটুকে বৌ নিয়ে এলে ভারি মানায় কিন্তু। প্রভাতের ঔদাসীন্যকে আর ক্ষমা করা যায় না।

মা কিছু বলতে এলে প্রভাত হেসে বলে,—দেখ মা, পুরুষমানুষের ল্যাঠা কম। কাছাটা নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল। পেগু থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত রাস্তা খোলা।

মা বলেন,—কিন্তু এই শূন্য পুরীতে মন আর টেঁকে না, খাঁ খাঁ করে। হাঁপিয়ে উঠছি।

প্রভাত সরাসরি বলে,—তবে তুমি দিদির কাছে দিন কয়েকের জন্যে জিরোও গে। নাটুকে অন্ধ-ইস্কুলে ভর্তি করে দি।

মা একটু রেগে বলেন—কিন্তু বিয়ে তুই করবি না কেন ?

—বিয়ে কেন-ই বা যে করবো তারো কোনো ভালো কারণ তুমি দেখাতে পারবে না। যে-সব কথা তোমার জিভের গোড়ায় আসছে তা আমি জানি, মা। বড্ড বাজে ও সেকেলে। বিয়ে করছি এ-ব্যাপারের চেয়ে কাকে বিয়ে করছি এইটেই বড়ো কথা। তাকে পাওয়া যায় না, মা।

মা সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করেন,—কাকে ?

প্রভাত হেসে বলে,—যাকে পাওয়া যায় না, তাকে।—তারপর কথাটাকে সহজ করে দেবার চেষ্টায় বলে—বিয়ে আমি একেবারে করবো না এমন আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ নেই। তোমাদের এই বিয়ের প্রথাটা বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে, তাকে আমি একটু ঝালিয়ে নিতে চাই। দরকার হয়েছে।

মা কি-যেন বলতে চান, প্রভাত বাধা দিয়ে বলে চলে—তেমন পরীক্ষার যদি সুযোগ না জোটে, আমি না-হয় প্রতীক্ষা করেই থাকবো। দেহের সেবাদাসী অনেক জোটে মা, আত্মার ঘরণীরই দেখা মেলে না।

মা বলেন,—আত্মা কি দেহ থেকে আলাদা ?

প্রভাতে জবাব দেয় : কিন্তু সেবাদাসী আর পূজারিনী এক নয়, মা।

মা বলেন,—কিন্তু সেই স্বপ্নভঙ্গের দুঃখ যে আরো ভীষণ। পূজারিনী যখন ভুখারিনী হয়ে ওঠেন ?

—সেই তো আমার ভয়, মা।

—ভয় না থাকলে ভালোবাসা হয় কি করে ?

মা'র মুখে এত সব কথা শুনে প্রভাত বিস্মিত হলো। মা'র বৈধব্যদীপ্ত ললাটে তেজস্বিতা, সমস্ত শরীর থেকে পবিত্রতা বিকীর্ণ হচ্ছে।

প্রভাত মাকে জড়িয়ে ধরে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে—বাঙলা দেশের মেয়েদের তো তুমি চেন না মা, তারা স্বামীকে মা'র কোল থেকে কেড়ে রাখে। সংসারের শেষ প্রান্তে মাকে নির্বাসন দিয়ে বৌয়েরা স্বামীর কাঁধে সওয়ার হয়ে রাজত্ব চালায়। তোমার ছেলে হয়ে তোমার এই লাঞ্ছনা সইবো না, মা !

প্রভাতের পিঠে হাত বুলুতে-বুলুতে মা স্নিগ্ধস্বরে বলেন—বাঙলাদেশের মেয়েদের আমি চিনি না, তুই চিনিস ? আমি যেন বিলেত থেকে উড়ে এসেছি। বাঙলা দেশের মেয়ের মতো মেয়ে আছে ভূ-ভারতে ? দেখিস, তোর বৌ আমাকে মাথায় করে রাখবে।

কথোপকথনকে প্রভাত আরো স্বচ্ছ করে তোলে। বলে—তারপর বৌ এলে তুমি আমাকে ফেলে নাটুকে তুলে নেবে, ওকেই আঁকড়ে ধরবে তখন। আমি তখন তোমার পর হয়ে গেছি। পরের মেয়েকে ডেকে এনে এত হাঙ্গামায় কাজ কি, মা? এই আমরা আছি বেশ। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

মা বলেন—স্বস্তির চেয়ে ভালো স্বাস্থ্য। আমার হাতে একটি সম্বন্ধ আছে, লক্ষ্মী মেয়ে, তাকে পেলে আমার সংসারে সোনার ফসল ফলবে। সামনের পুজো পেরোলেই অঘ্রানে আমি উৎসব লাগাবো।

প্রভাত হেসে বলে—তোমার এই ছোট বাড়িতে কুলুলে হয়।

মা বলেন—স্বপ্ন দেখতে ছোট বাড়ি বাধা দেয় না। আয়, মা-কালীর প্রসাদটুকু নে দিকি।

হাত পেতে সন্দেশটুকু নিতে-নিতে প্রভাত বলে—তোমার ঐ কালীর মতো একটি মেয়ে জুটিয়ে দিতে পার তো দেখ। আর লক্ষ্মী নয়, দু'একটা কালী পেলে দেশের হয় তো কালিমা ঘোচে।

রঙ্গমঞ্চে একা প্রভাত।

নিজের ছোট ঘরটিতে একা প্রভাত তার ভাঙা চেয়ারে চুপ করে বসে আছে,—সামনের কেরোসিন-কাঠের নড়বড়ে টেবিলের ওপর ছোট টাইম্‌পিস্‌ ঘড়িতে দুটো বাজে—প্রভাতের চোখে ঘুম নেই।

জানলাগুলি খোলা, কৃষ্ণপক্ষের ফ্যাকাসে জ্যোৎস্না মেঝের এক ধারে এলিয়ে পড়েছে। অস্থির পদে খানিকটা পাইচারি করে প্রভাত আবার এসে চেয়ারে বসলো।

এক-এক্ করে তিনটি বছর খসেছে; আশ্চর্য, হিসেব করে দেখলো এক-হাজার পঁচানব্বুই দিন। দিগ্বধুর ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এতগুলি মুক্তো! প্রভাত তা ধুলায় ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে, কুড়িয়ে রাখেনি। তিনটি বৎসরকে মিনিটে ভাগ করতে প্রভাত হাঁপিয়ে উঠলো,—এতগুলি মুহূর্ত ধরে সে বরাবর নিশ্বাস নিয়েছে, ক্লান্তিতে থেমে পড়ে নি। তিন বছর পেরিয়ে এসে আবার ও চেনা আকাশের হাতছানি পেল। প্রভাত এতদিন বেঁচে ছিল কি করে? এতদিন

স্বচ্ছন্দচিত্তে নিশ্বাস গ্রহণ করবার ওর সামর্থ্য ছিল বলে ও একেবারে অবাক হয়ে গেল। আনন্দে আত্মহত্যা করা যায়—এমন কথা অবিশ্যি প্রভাত কোনো দিন শোনেনি, কিন্তু জগতে এমন ব্যাপারও আজ সম্ভব হতে পারে। চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রভাত জানলায় এসে দাঁড়ালো। আকাশের আরো বড়ো হওয়া উচিত ছিল, জীবনকে এত ক্ষণস্থায়ী করে বিধাতার সৃষ্টি-কৌশলের এমন কী মর্যাদা হয়েছে!

প্রভাত ভাবছিলো এমনটি না হয়েই যায় না। দিনের আলোয় আকাশের তারা কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবে—অন্ধকারে আবার তারা চোখ চেয়েছে। একমাত্র আশাই আকাশ উত্তীর্ণ হতে পারে—সেই আশা কি ধূলায় লুণ্ঠিত হবে? বিচ্ছেদে প্রভাতের বিশ্বাস নেই, সেই ছেদ শুধু ছন্দেরই রূপান্তর। এ যে ঘটবে প্রভাত জান্‌তো, ভালো করেই জানতো। না ঘটেই যে পারে না! এ ঘটবে বলেই প্রভাত দুই হাতে এতগুলি দিন-রাত্রির উদ্বেল সমুদ্র সাঁত্‌রে এসেছে!

এই নিয়ে বোধ হয় তিরিশবার চিঠি পড়া হল:

জলপাইগুড়ি

হাতের লেখা বদলাতে পারে কিন্তু আমি বলতে যাকে বুঝি তা বদলায়নি। চিনতে পাচ্ছ তো? তোমার সেই অশ্রু।

বহুদিন পরে তোমার মনের মুকুরে আবার আমার ছায়া ফেললাম। নিভৃতে আবার আমাদের শুভদৃষ্টি হোক।

চিঠি লিখো শিগগির। পরে অনেক কথা আছে ইতি।

অস্পষ্টরূপে জানতো বটে আবার ডাক পড়বে, কিন্তু আজ কেন যে হঠাৎ ডাক পড়লো সেই সমস্যারই সমাধান হচ্ছে না। প্রভাত ঘেমে উঠলো। ভাবলো, যে-দিনই ডাকতো সেই দিনই এমনি চমকে উঠবার কারণ ঘটতো, আজকের বিশেষ কোনো উত্তরের জন্যে অধীর হওয়া নিতান্ত বোকামি! চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া কতক্ষণ থাকে জ্যোতির্বিদরা তা নিয়ে আঁক কষুক,—চাঁদও ঘুরছে, পৃথিবীও ঘুরছে। প্রভাত তর্ক করবে না, বিশ্বাস করবে।

রাইটিং প্যাড-এর খান দশেক পাতা ছিঁড়ে প্রভাত শুধু এইটুকু লিখতে পারলো :

ভালো করে চিনতে পাচ্ছি না। তুমি আমার সেই অশ্রু? তুমি আমার সেই মনোহংসের সরসী?

ফেরত ডাকেই চিঠি এলো :

তোমার সেই অশ্রু বটে কিন্তু গলানো অশ্রু নয়। একটু কঠিন, জমাট বরফের মতো। অথচ ঠাণ্ডা।

মনে হোল তুমি ভালো আছ। অনেক দিন কোনো খবর পাইনি—তাই চিঠি লিখতে ভারি ভয় হচ্ছিল। আরো মনে হলো আমাকে একেবারে ভুলে যাও নি। আমি লিখিনি বলে তোমাকেও লিখতে হবে না—এ নিয়মটা ভারি সভ্য নিয়ম। আমি অত সভ্যতা পছন্দ করি না। আমার নামে নিশ্চয়ই অনেক গুজব শুনেছ। ইস্কুল-টিচারি করতে এলে অনেক আজগুবি গুজবের পসরা বইতে হয়। আমি আর বইবো না ভাবছি, বেরুবো।

বেরুবো,—তোমার সঙ্গে। তুমি আমার এই চিঠি পেয়েই এখানে চলে আসবে। চাকরি করছ নাকি আজকাল? অত ছোট চিঠি লিখতে তোমাকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিলো শুনি? যদি চাকরি থেকে ছুটি না পাও কাজে ইস্তফা দিয়ে আসবে। আমি এই তিন বছরে মন্দ টাকা জমাইনি। পুরুষই খালি সংসার বহন করবার গর্ব ভোগ করবে আর স্ত্রী-জাতিকে কৃপাপাত্রী করে রাখবে—এটা একটা বর্বর প্রথা। বন্ধুত্বের বেলায় divine right of sex খাটে না, বুঝলে?

টাকার কথা শুনে এবারো যদি অপমানিত বোধ কর, তা হলে বুঝবো তোমার ছেলেমানসি আজো ঘোচেনি। তুমি এখনো সেন্টিমেণ্টাল যুগে বাস করছো। তিন বছরের অদর্শন মনের একটা খুব ভালো স্বাস্থ্যকর টনিক, তুমি কি বল? আবার আমরা পরস্পরকে নতুন করে দেখবো—জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্লাটফর্মে।

হ্যাঁ, ভালো কথা—এই প্রশ্নটা মন থেকে তাড়াতে পাচ্ছি না, বিয়ে করনি তো ? যদি বিয়ে করে থাক, তবে দিন কয়েকের জন্যে বৌয়ের সঙ্গে ধর্মঘট করে এখানে হাওয়া বদ্‌লে যেয়ো। আর যদি ধর্মঘট করার অসুবিধে ঘটে, তোমার ধর্ম যা বলে তাই করো। এসো কিন্তু। কেমন ? ইতি।

চিঠি পড়ে প্রভাত লাফিয়ে উঠলো। জলপাইগুড়িটা কলকাতা থেকে তিন শো বারো মাইল দূরে কেন ? মুহূর্তে মাইলের পর মাইল উড়ে যাবার জন্য মানুষের আয়ত্তাধীন কোনো যন্ত্র এতদিনে আবিষ্কৃত হওয়া উচিত ছিলো। সুইচ টিপলেই যেমন অতি-সহজে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে ওঠে, তেমনি মনে করা মাত্রই প্রিয়ার সশরীর আবির্ভাবের কোনো একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্যে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছেন না কেন ? মোট কথা, মানুষের এক-জোড়া পাখা থাকলে ভালো হত, সেকেণ্ডে সে-পাখা তিন শো মাইল পার হয়ে যাবে।

সত্যি, অশ্রুকে সে ভালো করে মনেও করতে পারছে না—সব কি-রকম ঝাপসা হয়ে আসে। তিন বছরের আগের অশ্রুকে কল্পনা করে ওর তৃপ্তি হয় না, ও নতুন অশ্রুকে দেখতে চায়, অনাবিষ্কৃত অশ্রুকে। নূতনতর উপলব্ধির আশায় প্রভাত ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

চিঠিটা জামার পকেটে দুমড়ে রেখে তক্ষুনিই মা'র কাছে গেলো ছুটে। মা তখন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বঁটি পেতে তরকারি কুটছিলেন। কাছে বসে নাটু আলু নিয়ে লোফবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আপন মনে খিলখিল করে হাসছে।

প্রভাত প্রসন্ন মুখে বললে—মা, আমি জলপাইগুড়ি যাচ্ছি।

মা প্রশ্ন করলেন—হঠাৎ ?

প্রভাত মেঝের ওপর বসে পড়লো। বললে—একটি বন্ধু ডেকেছে, মা।

মা'র আবার সন্দেহ করবার কারণ ঘটলো। বললেন—কে বন্ধু ?

প্রভাত জবাব দিলে : তাকে তুমি চিনবে না, মা।

—কলেজের বন্ধু ? ছেলেবেলার ?

প্রভাত না বলে পারলে না : বহু জন্মের। কথাটাকে ঠিক ব্যাখ্যা করা যাবে না, মা। মোটকথা, জলপাইগুড়ি আমাকে যেতে হবে। তোমার অনুমতি চাই।

মা বললেন—আমার চেয়ে আফিসের অনুমতির দাম বেশি। ছুটি পাবি এ সময়? কি রে, কথা বলছিস না কেন?

প্রভাত বলে বসলো: ছুটি যদি না পাই, চাকরিতে সেলাম ঠুকেই আমাকে ছুটতে হবে।

মা এবার রীতিমত ভয় পেলেন। বললেন—এমন তোর কে বন্ধু? বলি, ভালো চাকরি দেবে?

প্রভাত হেসে বললে—চাকরি কেড়ে নিয়ে বাউণ্ডুলে করে ছাড়বে। আর চাকরি পোষাবে না, মা।

মা'র তরকারি কোটা বন্ধ হয়ে গেল। বললেন—হেঁয়ালি রাখ। কি ব্যাপার খুলে বল।

প্রভাত কুণ্ঠা দমন করে অশ্রুর চিঠিটা মা'র হাতে তুলে দিলো! চিঠি পড়ে মা'র মুখ গেল শুকিয়ে। চিঠিটা মুড়্তে-মুড়্তে বললেন—এ আমি পছন্দ করি না। এর জন্যে চাকরিতে জলাঞ্জলি দিয়ে সংসার ফেলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে হবে, এটার মধ্যে যে অসংযম আছে তাকে আমি ঘৃণা করি। তোর মুখ দিয়ে এমন কথা বেরুলো কি করে?

প্রভাতের এবার লজ্জা করতে লাগলো। বললে—আচ্ছা, আফিসে একটা দরখাস্ত করে দিচ্ছি—আজই। যদি ছুটি না মেলে? তবে আমাকে এখেনেই চুপ করে বসে থাকতে হবে? এতটা সংযমই কি ভালো?

মা কি বলতে যাচ্ছিলেন, প্রভাত বাধা দিয়ে বললে,—তোমার উপদেশের উপকারিতা সম্বন্ধে আমি সন্দিহান নই, চাকরি বাঁচিয়ে রেখেই আমি কলকাতা থেকে পা বাড়বার চেষ্টা করবো, কিন্তু যদি ফসকে যায়, যাবে। জলপাইগুড়ি যাবো মানে, আমার দিন কয়েক অসুখ করবে—ছুটি পাবো বোধ হয়। যদি না-ই পাই, তোমাকে জানিয়ে রাখা ভালো মনে করে চিঠিটা আর লুকোলাম না। জীবনে মানুষ দু'টি নারীর আশ্রয় পায়—এক মা আর প্রিয়া। তুমিও আমার বন্ধু, মা। এ আনন্দ তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখি কি করে?

মা ফট্ করে বলে বসলেন—কিন্তু অশ্রু তোকে বিয়ে করবে?

—কথাটাকে পালটে বলো মা, তুই কি অশ্রুকে বিয়ে করবি? সে সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত আজ তোমাকে জানালে তুমি ভীষণ চমকে উঠবে; সে-সিদ্ধান্তটা আমারো নবলব্ধ। পরে তোমাকে জানাবো, মা; নিশ্চয়।

বিয়েটাকেই নরনারীর সম্পর্কের চরম পরিণতি মনে করে আত্মবঞ্চনার দিন চলে গেছে। বিয়ের চেয়ে বন্ধুতাটাই বড়ো জিনিস।

—কিন্তু সে-বন্ধুতা টিঁকলে হয়!

—যদি না টেঁকে, তবে তাকে রঙীন স্থতো দিয়ে বেঁধে আটকে রাখা যায় না, মা। পেয়ে হারানোর চেয়ে হারিয়ে পাওয়া ঢের ভালো।

মা মুখ ভার করে বললেন—কিন্তু যে-মেয়েটিকে আমি ঘরের বৌ করব বলে ঠিক করে রেখেছি তাকে তুই কিছুতেই ফেলতে পারবি না, প্রভাত। এ-সব হতচ্ছাড়া প্রেমে স্থফল হয় না কোনো দিন।

—স্থফলের জন্যে তো সেই অঘ্রান-তক বসে থাকতে হবে। তার আগে পুজো। একটা লম্বা ছুটির দরখাস্ত করে দি। কিছু পাওনাও হয় তো আছে। তিনটি প্রাণীর জন্যে দরকার হলে আর একটা ছোটখাটো চাকরি বাগিয়ে নেওয়া যাবে হয় তো। কিন্তু শুভদিন মানুষের ভাগ্যে ঝাঁকে-ঝাঁকে আসে না, মা। সময়ের চুলের ঝুঁটি আঁকড়ে ধরা চাই। বলে প্রভাত বেরিয়ে গেলো।

মা তক্ষুনি মনে মনে ছেলের শুভবুদ্ধির জন্যে মা-কালীর কাছে মানত করলেন।

ঘরে গিয়ে প্রভাত কালি-কলম নিয়ে বসলো। কেবলই অনুভব করতে লাগল অশ্রু নতুন, এখনো নতুন। চিঠিটা হলো এইরূপ :

আফিসে দরখাস্ত করে দিলাম। শনি, রবি নিয়ে সম্প্রতি তিন দিনের ছুটি পাবো মনে হচ্ছে। তিন বছরের পর তিন দিন যথেষ্ট নয়, জানি। কিন্তু কোনো মেয়ের জন্যে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আসার সেন্টিমেণ্টাল যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি। সৌভাগ্যবশতই বলতে হবে। কেন না, বন্ধুতা টেঁসে গেলেও চাকরিটা টিঁকে থাকবে। অন্নসমস্যার দিনে সেটা কম কথা নয়।

মোটকথা, শুক্রবার ভোরে স'পাঁচটার সময় স্টেশনে থেকো। যদি একান্তই ছুটি না পাওয়া যায়, টেলি করবো। কিন্তু, পারবো কি না গিয়ে? মা সংযম অভ্যাস করতে বলেছেন; তিন বছরের সংযম কি যথেষ্ট নয়? অশ্রু কি বলেন? ইতি।

নাটুর মাথায় হাত বুলিয়ে প্রভাত মা'র পায়ের ধুলো নিলে। বাঁ বগলে ছোট বেডিং ও ডান হাতে স্যুটকেস নিয়ে প্রভাত তিন-নম্বর বাস ধরতে বেরিয়ে পড়লো।

মা নাটুকে নিয়ে শুতে এলেন। সারা রাত তাঁর চোখে ঘুম এলো না,—দুশ্চিন্তায় মন তাঁর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তবু ভাগ্যিস, তিন দিন ছুটি পাওয়া গেছে। সোমবার সকালেই যে প্রভাতের ফিরে আসা চাই এ বিষয়ে তিনি মাথার কিরে দিয়ে দিয়েছেন,—প্রভাত তা খেলাপ করবে না। এতদূর অধঃপতন তার হবে না হয় তো,—কিন্তু বলা কি যায়? বালুচরে পা আটকে যেতে কতক্ষণ?

যে-মেয়ে বিয়ের সভা থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে তাকে তিনি পুত্রবধূরূপে কল্পনা করে সুখ পান না। তিনি তো আর জানেন না সেই মেয়ে কেন বেরিয়ে এসেছিল। জানলেও হয় তো ক্ষমা করতেন না, কেন না এত বড় বিদ্রোহাচরণের মধ্যে সাহসের চেয়ে নির্লজ্জতাই প্রকাশ পেয়েছিলো বেশি। অশ্রুর পরিবার তাই তার মুখের উপর তাদের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে—ও আজ পথচারিণী, মাথায় ওর কলঙ্কের কুলো; এই মেয়ের জন্যেই ছেলে তাঁর বেহেড হয়ে ছুটে গেলো ভাবতে মা চোখের জলে বালিশ ভেজাতে লাগলেন।

কিন্তু এ কয় দিনে প্রভাতের চেহারা এত সুন্দর ও সতেজ হয়ে উঠেছে—ওর মুখে দীপ্তি, কাজে-কর্মে উৎসাহ—ছেলেকে এমন প্রসন্ন তিনি আর দেখেন নি আগে। মরা শাখায় নতুন পাতা গজিয়েছে। প্রভাত যেন এ-ক'টা দিন সেতারের তারের মতো বেজেছে—হাতে ওর স্পর্শমণি! বিধাতা মানুষকে খুশি করেন, কিন্তু এমন সর্বস্বান্ত হবার লোভ দেখিয়ে কেন? রিক্ততা না এলে কি পরিপূর্ণ মুক্তি নেই?

মা তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা—এই আঙুল দু'টিকে তুলে ধরে নাটুকে বললেন—একটা আঙুল ধর্ তো নাটু।

মধ্যমা ধরলেই প্রভাত শুভেলাভে সোমবার ভোরে ফিরে আসবে, নচেৎ—তর্জনী-সম্বন্ধে কিছুই তিনি ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। অন্ধ ছেলে মা'র হাতখানি অনুভব করে করে আঙুল ধরবার জন্যে মুঠি মেললো। মা তাঁর নিজেরই অজানতে মধ্যমাটি নাটুর প্রসারিত করতলে ধীরে এনে স্পর্শ করালেন

বোধ হয়। নাটু নিবিড় করে মুঠি চেপে ধরলো! স্বস্তিতে মা'র বুক ভরে গেলো। এবারে ঘুমোবার জন্যে চোখ বোজা যাবে।

দার্জিলিং মেইল ত ছাড়লো। বারাকপুরের পর স্পিড্ দিয়েছে।

ইণ্টার ক্লাসের টিকিট। প্রভাত ভেবেছিলো কোনো রকমে একটু জায়গা করে সতরঞ্চিটা পেতে লম্বা হয়ে পড়বে। একেবারে পার্বতীপুরে গিয়ে জাগবে—টাইম্-টেবল্ মিলিয়ে দেখলো তখনো বেশ অন্ধকার থাকবে, বাড়িতে হলে ডি. লা. মেয়ারের কবিতা পড়তো; কিন্তু ট্রেনে এর পর আর ও চোখের পাতা এক করতে পারবে না—জানলা দিয়ে সুদূরবিস্তীর্ণ মাঠের দিকে চেয়ে থাকবে। ওর চোখের সামনে আস্তে-আস্তে অন্ধকারের পর্দা উঠে যাবে, ওর চোখের সামনে আকাশ উদ্‌ঘাটিত হবে—ভাবতে ওর রোমাঞ্চ হচ্ছিল। ট্রেনে বসে শেষ রাত্রিটুকু জাগার মতো সুখ নেই।

একে আর ভিড় বলে না,—প্রভাত সতরঞ্চি পাতলো। গাড়ি ছাড়তেই শুয়ে পড়লো। কিন্তু না আছে দার্জিলিং মেল-এর স্পিড্, না আসে ঘুম! ঘুম না এলে ও মনে-মনে অনেক আজগুবি ছবি আঁকে; হয়তো পুরীর সমুদ্র সাঁতরে যাচ্ছে; হয়ত মোহনবাগানের হয়ে সতেরো মিনিটে সাতটা গোল স্কোর্ করলে; হয়ত বা বিলেতের কোয়েকার সোসাইটি ওকে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করে প্যাসেজ পাঠিয়ে দিয়েছে; ও সমুদ্র দিয়ে নয়, ওভারল্যাণ্ড-এ দেশ দেখতে-দেখতে রওনা হল—বোগ্দাদেই আটকা পড়ে গেলো বুঝি, যদি যেতে হয় ট্রেনে নয়, উড়ো জাহাজে যাবে এবার। কিন্তু আজ 'মনের মুকুরে যার ছায়া পড়েছে' কোনো আঁচড় টেনেই তাকে আড়াল করা গেল না। সে একেবারে ঘন হয়ে তপ্ত হয়ে পাশে বসল—কতক্ষণ পরে, কি আশ্চর্য, শুয়ে পড়ল। এত ছোট বেঞ্চিতে দু'জনে যে পাশাপাশি কি করে শোয় ঢাকাঢুকি দিয়ে, ভাবাই যায় না। মুস্কিল! ট্রেনের আস্তে চলাটাও কখনো-কখনো হার্টের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। অতএব গাড়ির শেকল টেনে দেওয়া উচিত। থামবার জন্যে নয়, চলবার জন্যে।

প্রভাত উঠে বসলো। এক যুগ কাটিয়ে এসে এতক্ষণে কি না রানাঘাট। আকাশে মেঘ করেছে বুঝি। বৃষ্টি হলে মন্দ হয় না, বৃষ্টি থামবার আশায়

কান পেতে থেকে কতক্ষণ কাটিয়ে দেওয়া যায় তা হলে। বৃষ্টি তো এক সময়ে থামবেই। সঙ্গে একটা বই বা খবরের কাগজ পর্যন্ত আনেনি যে পড়বে। কী-ই বা পড়তো? একটা ছবির বই আনলে মন্দ হত না, কিংবা যোগাড় করে কোনো pornography। মনোযোগ আটকে থাকতো হয় তো। আচ্ছা, অশ্রু, কোনোদিন ওসব বই পড়েছে? যাক গে, পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করা যাক:

—কদ্দুর যাচ্ছেন?

—রংপুর। পার্বতীপুরে গাড়ি বদল করতে হবে। হাঙ্গামা মশাই। শেষ রাত্রেই ঘুমটা চেগে আসে। পড়ি ঘুমিয়ে, পার্বতীপুর পার হয়ে যাক। টিকিট ছিল সেকেণ্ড ক্লাসের—ভেবেছিলাম গার্ডকে পার্বতীপুরে জাগিয়ে দেবার কথা বলে নবাবি করে একটু ঘুমুব, কিন্তু শালারা একটা বেঞ্চিও খালি রাখেনি। টিকিট বদ্‌লাবারো সময় হল না। একেই বলে ভাগ্য, মশাই। টাকাও গেল, টাকও ঢাকলো না।

—বার্থ আগে রিজার্ভ করেন নি কেন?

—এই দুর্ভোগ সইতে। দূর থেকেই ভোগ করছি আর কি! এখন পৌঁছতে পারলে হয়। পেছনে শনি বেশ শানিয়েছেন বুঝলাম। ট্রেনে এখন কলিশান না হলে বাঁচি!

প্রভাত চমকে উঠলো। সত্যিই তো, যদি দুর্জয় ধাক্কা লেগে দার্জিলিং মেল্ খান্-খান্ হয়ে যায়! এতে আশ্চর্য হবার তো কিছুই নেই,—হামেশাই তো হচ্ছে। ঢাকা মেল উল্টোল, গয়া এক্‌স্‌প্রেস এক্‌সা হয়ে গেল। প্রভাত আরেকটু হলে চেঁচিয়ে উঠছিল আর কি! কিন্তু না, দার্জিলিং মেল এত দুর্বল হবে না। কে জানে? টাইটানিকো তলিয়ে গেছে। ও যদি আজ মরে যায়—ওর চোখের সামনে আকাশ যদি আজ আর আত্মপ্রকাশ না করে—কি হয় তা হলে? ও আকাশের ওপারে চলে গিয়ে অশ্রুকে অশ্রু-সমুদ্রের পার থেকে লুট করে নিয়ে যাবে। মৃত্যুর পরেও কি মানুষের সাজগোজ থাকে? অলিভার লজ্-এর ওপর ওর আস্থা আছে। কিন্তু এ প্রশ্নের তো উত্তর নেই। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঈশ্বরের কাছে আজকের রাতের জীবনটুকুর জন্যে ভিক্ষা চাইলে এমন কি অপমান হবে? ঈশ্বর নাই বা থাকলেন, তার জন্যে একটু প্রার্থনা করলেই কি গঙ্গার জল

শুকিয়ে যাবে? সত্যি কথা বলতে কি, ওর প্রত্যহের ভূগোলে অস্ট্রেলিয়া বলেও ত কোনো দেশ নেই। তাই বলে মনে-মনে সে দেশ বেরিয়ে এলে ওকে মারে কে শুনি?

বসে, শুয়ে, স্টেশনে খাবার খেয়ে, সিগারেট ফুঁকে, মনে-মনে আঁক কষে, যাত্রীদের চেহারা দেখে-দেখে, তাদের মনের অবস্থা আন্দাজ করে করে (একটি যাত্রীও প্রেমে পড়ে নি) প্রভাত কোনোরকমে রাত প্রায় কাবার করে এনেছে। দার্জিলিং মেইল বেসামাল হয় নি যা হোক। আকাশে আলোর ছোঁয়াচ লাগলো বুঝি। দু'একটা করে পাখি উড়তে শুরু করেছে। ফুরফুরে তাদের পাখা। ঘুমো আকাশের চোখ! বৃষ্টি না হয়ে ভালোই হয়েছে। হয় তো ঠিক সময়ে অশ্রু এসে প্ল্যাটফর্মে পৌছতে পারতো না। আকাশের রসিকতা করার একটা সময়-অসময় আছে। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের অযথা কষ্ট হতো।

মাইল্-পোস্ট-এর দিকে তাকিয়ে দেখলো জলপাইগুড়ি পৌছুতে আর মোটে সাত মাইল বাকি। এবার স্বচ্ছন্দে দার্জিলিং মেল্ ডিরেইল্‌ড্ হতে পারে,—প্রভাত সাত মাইল পায়েই মেরে দিতে পারবে খুব। গ্রে স্ট্রীট-এর মোড় থেকেও হাজরা রোড পর্যন্ত অনেক হেঁটেছে, অনেক। কিন্তু না, দার্জিলিং মেল্ বেশ ভদ্র। বাধ্য ছেলেটির মতো সুড়সুড় করে এগিয়ে চলেছে। হ্যাঁ, আর দুই কদম। এঞ্জিনের ফুঁ-টা আরো জোরে হওয়া উচিত ছিল। জলপাইগুড়িটা যেন কিছু নয়!

আঃ! ফিলিপ সিড্‌নির হাত থেকে জলের গ্লাশ পেয়ে মুমূর্ষু সৈনিক এর চেয়ে বেশি আরাম পায়নি। প্রভাত তাড়াতাড়ি বিছানাটা গুটিয়ে নিলে। ভগবান নেই এমন কথা যদি এখন কেউ বলতে আসে, প্রভাত তার সঙ্গে আদপেই তর্ক না করে একটা ঘুসি মেরে বসবে হয় তো, কিন্তু তারো কাজ নেই—গোলমাল বাধতে পারে। তার চেয়ে সোজাসুজি নেমে পড়াই ভালো। ট্রেনটা থামুক। চলন্ত ট্রাম থেকে নামবার ওর রীতিমত অভ্যেস আছে। কিন্তু চলন্ত ট্রেন থেকে কায়দা করে নামবার কোনো মানে হয়না,—প্ল্যাটফর্ম পালিয়ে যাচ্ছে না। আরে মশাই, দরজার কাছে মাল-পত্তর নিয়ে এত ভিড় করলে কি চলে? সমস্ত দিন ধরে আপনিই নামবেন নাকি? আচ্ছা ভদ্রলোক তো!

প্ল্যাটফর্ম। তা হলে নামা গেল! দার্জিলং মেলের-এর জন্যে আর ভাবনা নেই। পাতালে যাক। প্রভাত পা বাড়ালো।

কে যেন এগিয়ে আসছে। সেই শাড়ি-ব্লাউজের প্যাকেট। মেয়ে নিশ্চয়ই। প্রভাতের ততটুকু দৃষ্টিশক্তি আছে। নেহাৎই বাঙালি হয়ে জন্মেছে, নইলে প্রভাত নিশ্চয় নাম ধরে ডেকে উঠতো। অনর্থক লোকদের হকচকিয়ে দিয়ে লাভ নেই। এখন অন্ধকারো ফুরিয়ে গেছে। কণ্ঠস্বরটা নিশ্চয়ই সঙ্গত হত না।

হ্যা, অশ্রুই বটে। প্রভাত ঠিক চিনতে পেরেছে, নিশ্চয়ই। চেহারাটা একটু ভালো হয়েছে মনে হচ্ছে; ভালো হয়েছে মানে অল্প একটু মোটা হয়েছে। বিয়ে না হয়ে বাঙালি মেয়ের স্বাস্থ্য ফেরার দৃষ্টান্ত দেখে প্রভাত মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো। মাঝে ওর কানে একটা উড়ো খবর এসেছিল যে অশ্রুর ফুস্‌ফুসের ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা হয়েছে,—কথাটায় কান দিলেও প্রাধান্য দেয় নি, কারণ অশ্রুর আহ্বান যে কোনোকালে ফের শ্রুত হবে এ-ধারণা তখন ছিলো না। ফলাফল জানবার জন্যে তাই উৎসুক হয়নি। এই মোটা হওয়াটুকু হয় তো সেই 'অটো ভ্যাক্‌সিন'-এর—ঠিক ফল নয়, ফুল!

বহরে বেড়েই যদি থেমে পড়ত তা হলে পিপের মতো গড়গড়িয়ে গড়িয়ে দেওয়া যেত হয় তো। কিন্তু না; মাথায়ও অশ্রু বেশ ঢ্যাঙা হয়েছে। গ্লাশের কিনারা বেয়ে উপচে-পড়া উচ্ছ্বসিত সুরার ফেনার মতো অশ্রুর যৌবন,—ঊষার অঞ্জলি-উৎসারিত আলোর নিবেদনের মতো। কথাটাকে ছোট করে বলা যেতে পারে—একটা কনকচাঁপা, উগ্র, উজ্জ্বল, মদির! এত রূপ যেন আর কোনো দিন দেখেনি—ঝড়ে নয়, সমুদ্রে নয়, মৃত্যুর সুগম্ভীর আবির্ভাবেও নয়। জীবনে যেন জোয়ার ডেকেছে। দুই চোখে এত রূপ যেন কুলিয়ে উঠছে না। প্রভাত যেন তার চোখের সামনে অরোরা-কে দেখছে। ও পা বাড়ালো।

পায়ে গ্রিশিয়ান স্যাণ্ডেল, এবং পায়ের পাতা থেকে শুরু করে আটপৌরে চওড়া-পাড় শাড়িটি দেহবল্লরীকে বল্লভস্নেহের মতোই আবেষ্টন করে উঠে গেছে, মাথায় ছোট একটুখানি ঘোমটা, হেয়ারপিন দিয়ে আঁটা নয়। অতএব এগিয়ে আসতে গিয়ে মাথার কাপড় গেল খসে, এবং সেটা ফের তুলতে গিয়ে

খোঁপার ওপর বেকায়দায় হাতটা লাগতেই খোঁপাটা কাঁধ বেয়ে পিঠের ওপর ভেঙে পড়লো। চুলে অশ্রু কি তেল মাখে? এত ঘন পুঞ্জিত হল কি করে? আচ্ছা শিঙল্ড্ হলে অশ্রুকে কেমন মানাবে? ঠোঁটে তার জন্য লিপস্টিক্ দেওয়া চলবে না? অশ্রুর ঠোঁট দুটি ভারি হয়ে ভালই হয়েছে। মেয়েদের পাতলা ঠোঁট ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক নয়। নিশ্চয়ই অশ্রুর আজ ঘুম থেকে জাগতে দেরি হয়েছে, তাই শাড়িটা তাড়াতাড়ি বদলে আসতে পারে নি। শাড়ির কুঞ্চনগুলি শোভা হয়ে বিরাজ করছে। মুখের উপর ঘুমের যে মলিনতাটুকু লেগে আছে তা ঘুমেরই মতো সুন্দর।

দু'জনে এগিয়ে আসতে লাগলো। ওদের ডান হাত দুটোতে কখন যে ককটেইল হয়ে গেল কেউই ঠিক ঠাওরাতে পারলো না! দু'টি দেহ যেন নদীর সেতুর দুই পারের স্তম্ভের মতোই অবিচলিত রইলো—বীণার মতো ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো না যা হোক। কারণ হয়তো এই যে, ওরা যেন এমনি পরস্পরের স্পর্শলাভের অভ্যাসে এখানে এখন অসাড় হয়ে গেছে। সত্যিকারের কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় বেশিক্ষণ হাতে হাত ঠেকিয়ে থাকা যায় না। ভীষণ ভিড়, লোকের তত নয়—চোখের।

অশ্রু কথা বলতে পারলো: এই তোমার জিনিস? চলো।

প্রভাত অশ্রুর চোখের দিকে তাকিয়ে বললো—কোথায়?

—আমার হাতে সুটকেসটা দাও। আপাতত একটা ঘোড়ার গাড়িতে তো গিয়ে উঠি,—যাবার জায়গা আছে।

প্রভাত সুটকেসটা ছাড়লো না। বললে—এটুকু ভার বইবার আমার ক্ষমতা আছে। চলো।

গাড়িতে ওঠবার আগে পা-দানিতে পা রেখে অশ্রু একটু পিছন ফিরে বললে—সুটকেসটা আমার হাতে দিলেই ভালো করতে, কেননা রাজ্যি শুদ্ধু লোক আমার দিকে এমন ভাবে চাইছিল যে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যেন কত সন্দেহের! এই সব লোকগুলোর ফাঁসি হয় না কেন?

প্রভাত দেখলো কথা বলতে ওর রীতিমত অসুবিধে হচ্ছে। স্নায়ুগুলো হঠাৎ যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লো। ট্রেনেই রোজকার মত মুলার্-এর কতকগুলি 'ফিগার' করে এলে পারতো। এত অবসন্ন লাগবার তো কথা নয়! সমস্ত রাত্রি ধরে যে-জিভে ওর কথার সুড়সুড়ির শেষ ছিল না সে-জিভ হঠাৎ মরে

শুকিয়ে গেল নাকি? এত ঢোঁক গেলবার অভ্যেস ওর কোনো কালে ছিলো না বলেই তো মনে হচ্ছে।

প্রভাতের মুখোমুখি বসে অশ্রু বললে—পাশে বসলে কথা বলার অসুবিধে হবে। তারপর দুই চোখে একটি কমনীয় কৌতুক নিয়ে শুধালো: তারপর?

প্রভাত পা দুটো একটু ছড়িয়ে, বুকটা সামান্য একটু ফুলিয়ে স্নায়ুগুলোকে শাসন করলে; বললে—তারপর আর কি? জলপাইগুড়ি চলে এলাম। এখন জল পাই তবেই হয়।

অশ্রুর দাঁত দেখা গেল। প্রভাত মুক্তো কোনো দিন দেখেনি, তবু তা'বলে সারি সারি মুক্তো অমন হলে তার অমর্যাদা হবে না। বললে,—জল না পাও, জলপাই পাবে!. দাঁত যাবে টোকে।

প্রভাত। সে-জল্পনা করেই ত এসেছি।

অশ্রু। দাঁড়াও, দেখি আর হয় কি না। (ভেবে) হয় না, না হোক্, (থেমে) তারপর, আছ বেশ?

প্রভাত। ছিলাম বেশ। এখন কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠছি।

অশ্রু। কেন?

প্রভাত। তাই যদি জানতাম তো ছুটি না পেয়েও ছুটে আসতাম না।

অশ্রু। ছুটি পাও নি? কি হবে তবে?

প্রভাত। কি আবার হবে? আমার অসুখ করতে পারে না? (একটু হেসে) আমার অসুখই তো করেছে।

অশ্রু। (চমকিত) অসুখ?

প্রভাত। (দিব্যি কইতে পারছে) অসুখ ছাড়া আর কি! নইলে সুস্থ থাকলে কেউ এমনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে নাকি?

অশ্রু। (গম্ভীর) কথাটা ফিরিয়ে নাও, নইলে কথা কইবো না।

প্রভাত। এর ওপর আবার যদি কথা না কও, তা হলে দয়া করে কোচোয়ানকে গাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলো। হাসপাতাল থেকে পরে একেবারে পাতালে।

অশ্রু খিলখিল করে হেসে উঠলো। পরে গম্ভীর হবার ভান করে বললে—কালই তোমাকে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে?

প্রভাত। কালই এটা কলি; তাই তোমার এ কথায় আশ্চর্য হলে শোনে

কে? শুনেছি আজ রাত্রেই একটা ট্রেন আছে। যাবার সময় নিশ্চয়ই এবার ঘুমুতে পাব।

অশ্রু। তোমার সারা রাস্তা একটুও ঘুম হয়নি? কাল রাতে ভারি গরম ছিলো, না?

প্রভাত। তাই তোমারো ঘুম হয় নি মনে হচ্ছে।

অশ্রু। না, তা কি আর হয়েছে! ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই ত চেহারা ফিরিয়ে দিলাম।

প্রভাত। এবার আমাকেও ঘুমোবার জন্যে ফিরিয়ে দাও।

অশ্রু। আহা! তোমার সঙ্গে as if আমার কোনো কথা নেই!

প্রভাত। আছে নাকি? কতটুকু সময় লাগবে? বলেই ফেল না।

অশ্রু। ঐ ত বললাম: তারপর?

প্রভাত। 'তারপর'-এর কোনো উত্তর হয়?

অশ্রু। উত্তর যদি কিছু না-ই হয় চুপ করে থাকো। মাথায় অতগুলো চুল রেখেছ কেন?

প্রভাত। তুমি রেখেছ কেন? সত্যি, তোমাকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে!

অশ্রু। আর গোঁফ জোড়া নির্মূল করে তুমি যে কী অপরূপ হয়েছ -বাঁদরের মতো—

প্রভাত। আমার অপমান বোধ করা উচিত কি না, তুমি বল। তোমাকে চামচিকে বললে তুমি চিম্‌টি কেটে দেবে না?

অশ্রু। (অন্যমনস্ক) দেব ত, কিন্তু এসে পড়লো যে। তুমি এখানে নামো। এটা ডাক-বাংলো। সঙ্গে টাকা আছে তো?

গাড়ি থামতেই প্রভাত নেমে পড়লো। ডাক-বাংলোর বেয়ারা এসে জিনিস দুটো ভেতরে নিয়ে গেলো। অশ্রু গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বললো,— বিকেলে আসবো। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিয়ো কিন্তু। আমি আগে থেকেই এখানে সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি—তোমার ভাবতে হবে না।

গাড়োয়ানকে গাড়ি-ভাড়াটা দেওয়া সঙ্গত হবে কি না প্রভাতকে ভাববার অবকাশ না দিয়েই গাড়ির চাকা চারটে ঘুরে গেলো।

সেই গাড়ি করেই অশ্রু তার স্কুলের কোয়ার্টারে ফিরে এলো। ভাড়া চুকিয়ে ভিতরে বারান্দায় ঢুকেই দেখলে বুলু (আরেকটি শিক্ষয়িত্রী) মুখে

টুথ-ব্রাশ ঢুকিয়ে এক-মুখ ফেনা করে ফেলেছে। অশ্রু ছুটে এসে এমন বেগে তার গলা জড়িয়ে ধরলে যে কতগুলি ফেনা বুলুর গিলে ফেলতে হলো। অশ্রু প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো : সে এসেছে।

বুলু নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বললে—ছাড়্ রাক্ষুসি। কে এলো ?

আলিঙ্গন একটু শিথিল করে অশ্রু কানে-কানে বললে—আমার রাজপুত্র। আমার চোখে যদি দেখিস তবে তুইও তাকে রাজপুত্র বলবি।

—তা হলে বন্দীদশা ঘুচলো ? এই তিন বছর মাস্টারি করে এখন বুঝি বিয়ে করে বয়ে যাবার সখ হয়েছে। হবে কবে শুনি ?

অশ্রু বুলুর গাল টিপে দিয়ে বললে—যমের বাড়ি গিয়ে।

বুলু বললে—বি-এ পাশ করে সবাই এম-এ-ই পড়ে শুনেছি। কেউ কেউ দেখছি প্রেমে-ও পড়ে। য়্যাদ্দিন তো কৈ শুনতে পাইনি।

—তোকে শোনাবার জন্যে আমার ঘুম হচ্ছিল না। কাল সারা রাত আমার যে ঘুম হয়নি, তা অবিশ্যি অন্য কারণে।

—কি কারণে ?

—সভয়ে বলবো, না নির্ভয়ে ?

—সভয়ে।

—তা হলে বলি, রাত বারোটা পর্যন্ত একজামিনের কাগজ দেখেছি—বারোটার পর থেকেই আমি নির্ভয়, বুলু। তারপর আর ঘুম আসেনি। বই পড়বার জন্য টেবিলে বসতে গিয়ে ভুল করে জানলায় এসে দাঁড়ালাম। জানলা থেকে এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যায়।

—রাজপুত্রকে কোথায় সিংহাসন দিলি ?

—ডাক-বাংলোয়। হৃদয়ে বলতে পারতাম বটে, কিন্তু সেটা তোর প্রশ্নের ঠিক স্বাভাবিক উত্তর হত না। চা-র জল চাপিয়েছিস ? চা খেয়েই ঘুম দেবো লম্বা। জাগাস নি পোড়ারমুখি।

বলেই অশ্রু অন্তর্হিত হলো।

অশ্রুর জীবনের আজকের এই ছোট দিনটুকু নিয়েই একটা প্রকাণ্ড উপন্যাস লেখা চলে—জেম্‌স জয়েস যেমন *Ulysses* লিখেছে। একটি দিন—অর্থাৎ সকাল আটটা থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত (ঠিক পুরো একটি দিনো নয়)—তাই

নিয়ে সাত শো বত্রিশ পৃষ্ঠার বিচিত্র উপন্যাস! অশ্রু এত ধীরে ধীরে গত রাত্রি যাপন করেছে যে তার প্রতিটি নিশ্বাস-পতন নিয়ে একেকটা পরিচ্ছেদ হতে পারে। সেই রাত্রি নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলে অশ্রুর সামান্য একটা জীবনে ধরবেই না।

অশ্রু *Ulysses*-এর সেই ব্লুম-এর কথা হঠাৎ ভাবতে বসলো। ব্লুম জাতিতে জু, ডাবলিনের একটি সাদাসিধে কেরানি—ব্যাঙ্কে কাজ করে বোধ হয়। ব্লুম ঘুম থেকে ওঠে; শোবার ঘরে বিছানার ওপর তার স্ত্রী মলি-কে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় ফেলে রান্নাঘরে ঢোকে, সেখান থেকে বড়ো-হল্‌টায়; সেখানে বসে একটা পুরোনো খবরের কাগজ পড়ে; এবং প্রাতঃকৃত্য শেষ করতে-করতে নিজের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চালায়। অদ্ভুত লোক! তারপর মাংসের দোকানে গিয়ে 'কিড্‌নি' কেনে, একটা ঝি দেখে কামমোহিত হয়। তারপর বাড়ি এসে 'কিড্‌নি'টা নিজেই ভাজে; ওপরে স্ত্রীর কাছে খাবার নিয়ে যায়। তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টায় অনেকটা সময় হেলাফেলা করে,—নিচে মাংস পোড়ার গন্ধ পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় ফের রান্নাঘরে। এই সব। তারপর ফের রাস্তায়; স্নানের দোকানে; শবানুগমন-মিছিলে; একটা খবরের কাগজের আপিসে; একটা রেস্টুরেণ্টে; লাইব্রেরিতে; মদের হোটেলে; সমুদ্রের পারে; হাসপাতালে; বেশ্যালয়ে—(সেখানে ব্লুম থাকে অনেকক্ষণ—ইউলিসিসও Circe-র গুহায় অনেক দিন ছিল, না?) সেখানে মদ খেয়ে শ্রান্ত হয়ে সে ষ্টিফেন্ ডেড্‌লাস-এর সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসে।

গল্পের শেষ ভাগের কথা ভাবতে গিয়ে লজ্জায় অশ্রুর গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। ব্যাপারটা কিছু নয়,—অতি সামান্যই; ব্লুম্-এর স্ত্রী মলি স্বামীর কাছে শুতে যাচ্ছে! ওটা জয়েস্ না লিখলেও পারতো। কিন্তু কেনই বা লিখবে না?

শুনেছে বইটা নাকি অশ্লীল। হবে ও-বা। অশ্রু অবিশ্যি এক নিশ্বাসে পড়তে পারেনি, কিন্তু ছাড়তেও পারেনি। কোনো বিষয় বিষয়-হিসেবেই যে কী করে অশ্লীল হতে পারে অশ্রু তা কিছুতেই বোঝে না। এ নিয়ে ও কত তর্ক করেছে—প্রাথমিক প্রথাগুলোকে বন্ধুদের মন থেকে ছিঁড়তে পারেনি। যা কিছু দোষ হতে পারে স্টাইলের বা লিখনভঙ্গীর। *Ulysses*-কে সে কারণে নির্বাসিত করলে অশ্রুর দুঃখ হত না। অন্য যে-কারণে লণ্ডনে ও নিউ ইয়র্কে

Ulysses-এর লাঞ্ছনা হয়েছে সে-কারণটাকে উপহাস করতে পারলে মানুষের উপকারই হতো। মানুষের হৃদয় আছে আত্মা আছে বলতে পারো, কিন্তু শরীর আছে বলতে পাবে না। খেতে পারবে, ঘুমুতে পারবে, কিন্তু আসঙ্গ-লিপ্সার বেলায় শুধু মুখ বুজলেই চলবে না, দস্তুরমতো জিভ কাটতে হবে। বার্ণার্ড শ-এর মতো জিভ বার করে ভ্যাঙচাবার যো নেই। অন্তত এ দেশে।

মনে-মনে এ-সব নিয়ে অশ্রু অনেক কিছু-ই তর্ক করতে চাইলো, কিন্তু তর্ক করতে চিন্তার পারম্পর্য রাখার জন্যে যে সবল ও অনন্য অভিনিবেশ দরকার এ-রকম উচাটন মন নিয়ে তার সাধনা চলে না। অতএব পাশ-বালিশটা বুক থেকে ছুঁড়ে ফেলে অশ্রু বিছানার উপর উঠে বসলো। এত রাজ্যির চুল নিয়ে ওর আপদ হয়েছে—একটু নাড়াচাড়া করতে গেলেই ঘাড়ের ওপর দিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে এসে পিঠ বেয়ে কোমরের ওপর লুটিয়ে পড়ে; বারে-বারে খোঁপা বাঁধার হাঙ্গাম অনেক,—তবু ও পিন্ আটকাবে না। চুল বাঁধতে বাঁধতে নজরে পড়লো,—সেল্ফ-এর ওপরকার টাইমপিস-এ মোটে তুটো বেজেছে। ইচ্ছে হল ঘড়িটা মেঝের ওপর আছড়ে মারে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে মনে হয়েছিলো রোদ থিতিয়ে এসেছে বুঝি; এখন ভালো করে ঠাওর করলে আকাশটা তামাটে, থমথমে,—ধীরে ধীরে মেঘ জমছে। পরনের শাড়িটাকে পরিপাটি করবার চেষ্টা করতে করতে অশ্রু বিছানা থেকে নেমে পড়লো। খালি পা,—জুঁইফুলের মতো শাদা, ধবধবে! মুখখানি যেন রূপোর পিল্‌সুজের ওপর সোনার প্রদীপ!

শাড়িটাকে গুছোতে-গুছোতে হঠাৎ অশ্রুর মনে হলো এই বেশেই বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়! বিকেল বলে এসেছে বলেই যে কাঁটায় কাঁটায় কথা রাখতে হবে এতটা বিলিতি কায়দা তাকে না মানালে মহাভারত এ ক' ঘণ্টায় অশুদ্ধ হবে না আশা করি। কুঁড়েমি খুব ভালো জিনিস,—অশ্রু কুঁড়েমি খুব পছন্দ করে। মানুষ আরেকটু কুঁড়ে হতে শিখলে আরো খানিকটা সভ্য হতে পারতো। নিশ্চয়ই। তর সয়না বলে ছুটতে গিয়ে অকারণে এতো সব কাণ্ড করে বসছে যে কোনো দার্শনিকই তার তারিফ করতে পারছেন না। একটু কুঁড়ে হলে লেখকেরা বই লিখে তক্ষুনি ছাপতে ছুটতো না,—পরে দেখতে পেতো কলম কি-রকম কাঁচিয়েছে। কাঁচির দরকার। বৈজ্ঞানিকেরা আরেকটু কুঁড়ে হলে, অকারণ যন্ত্রপাতির উৎপীড়নে পৃথিবীর যন্ত্রণা এতো বাড়াতো না।

কবিরা যদি আরেকটু কুঁড়ে হতো তবে দেখতে পেতো বিনিয়ে-বিনিয়ে কথায় কাঁদুনি গাওয়া কোনো ভদ্রলোকের পোষায় না,—আরাম-কেদারায় শুয়ে একটু 'রাম' খেলে বরং কাজ দেবে। নেপোলিয়ান খুব বড় বীর বটে, কিন্তু পৃথিবীতে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বলে কোনো বই না থাকলে অশ্রু অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দিতে পারতো Fabius Cunctator তাঁর চেয়ে মহৎ, তাঁর চেয়ে বরণীয়। কোনো কাজ তক্ষুনি-তক্ষুনি করে ফেলাটা নিতান্ত সহজ, একেবারেই সাধারণ ; কিন্তু তাকে পিছিয়ে রেখে-রেখে তার জটিলতা বাড়িয়ে তবে তাকে সম্পন্ন করার মধ্যে বেশি বীরত্ব। ঠিক সময়ে স্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে চাপার মধ্যে গৌরব কিছুই নেই, কিন্তু ট্রেন ছাড়বার সময়টুকু বাড়িতে বসে হাই তুলে কাটিয়ে দিয়ে পরে হেঁটে যাবার মধ্যে মূর্খতাই আছে এ-কথা বেনে বা বণিকেরা বলতে পারে—অশ্রুর মত উল্টো। মানুষের সময় কম—ঘড়ির কাঁটা নাকি অহর্নিশি তাই বলছে,—ঘড়ির এই গায়ে-পড়া অভিভাবকত্ব বরদাস্ত করবো না ; অশ্রু ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে পাচের কোঠায় প্রমোশন দিলে। এই ওর বিকেল।

অর্থাৎ কুঁড়েমি করা দূরে থাক্, সময়নিষ্ঠা-পালনের ধৈর্যটুকুও ওর পোষাবে না এখন। সময় দিয়েছে বলে তার আগে যাওয়া যাবে না এমনিই বা যদি কোনো নিয়ম থাকতো তবে আয়ুর অধিকারী হয়ে এসে এই বিস্তীর্ণ আকাশের নিচে শিশুমৃত্যু ঘটতো না। এমন দৃষ্টান্ত বা কেন ? একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবলে অশ্রু এর চেয়েও অনেক খেলো নজির দেখাতে পারবে। কিন্তু না, সত্যি সময় নেই—অশ্রুর বলে আসা উচিত ছিল দুপুরেই যাবে। বিকেলের চেয়ে দুপুরটাই বেশি রোমান্টিক—অমাবস্যার নিশীথ রাত্রির চেয়েও। প্রেম-বর্ণনায় একমাত্র কালিদাস ছাড়া আর কোনো কবি ঘাম বা মাছির কথা উল্লেখ করেনি বলেই কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারলো না। রইলো পিছিয়ে। অশ্রু এবার কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করবে। লুডোভিচিকে পথে না বসিয়ে ও ছাড়ছে না। কিন্তু এক্ষুনিই কাগজ পেন্সিল নিয়ে না বসলে রাতারাতি নোবেল প্রাইজ হস্তান্তরিত হচ্ছে না—এই যা সান্ত্বনা। ততক্ষণে শাড়িটা বদলে নিলে কাজ দেবে। অশ্রু ট্রাঙ্ক খুললো।

মেঘ করে এসেছে বলেই ওকে ফিকে সবুজ রঙের শাড়ি পরতে হবে এমন কবিত্ব করবার দিন গেছে। ও সাদাসিধে শাদা শাড়িই পরবে। মেঘ

কেটে গিয়ে রাত্রে যে স্তিমিত জ্যোৎস্নাটুকু ফুটবে বা যে ভীরু রজনীগন্ধাটুকু ঠোঁট মেলবে তারই আভাস। ওই ভেবেই যদি শাড়িটা গায়ে জড়ায় কবিত্বটা যে তাতে বেশি সমৃদ্ধ হবে তা নয়, বরং উল্টে আরো জলো ও ফিকে হয়ে যাবে। যাক। অশ্রু আপন মনেই একটু হাসলো। মোট কথা, সম্প্রতি শাড়ির কিছু অভাব হয়েছে। যা একখানা খদ্দর আছে সেটা গায়ে চড়ালে ঢের বেশি ফ্যাশানেবল হয় বলে তাতেও ওর আপত্তি। এই বেশ। এতেই ওকে উড়িয়ে নেবে। বাকল-পরার দিন ফিরে এলে অশ্রু আবার এসে ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করবে'খন—আজকের দিনে—মোহিনী-মিল্-এর এই শাড়ি ওকে আবৃত করুক! মোহিনীর সঙ্গে এতেই ওর মিল হবে।

রূপচর্চায় অশ্রু একজন পুরো আর্টিস্ট। এতদিন উদ্দেশ্যহীন হয়েই অঙ্গ-সজ্জা করেছে—নিজেকে তৃপ্তি দেবার জন্যেই। অবিশ্যি অলঙ্কারের আড়ম্বরে নয়, একমাত্র শাড়ি-পরার সূক্ষ্ম সুচারুতায়। কিন্তু আজকের শাড়ির আঁচলটা কিছুতেই বুকের ওপর দিয়ে ঠিক মতো লতিয়ে উঠছে না। কারণ আজকে ও একটি বিশেষ পুরুষকে মুগ্ধ করতে চায়,—প্রেমিকের অন্তরে স্বাস্থ্য ও সুষমা-সঞ্চার করার পক্ষে নারীসৌন্দর্যের উপকারিতায় ওর অগাধ বিশ্বাস। এ কথা বেশি মনে করেই ওর শাড়ি পরায় দেরি হচ্ছে। তাই বলে বুলুর সাহায্য নেওয়া দরকার নেই। বুলু এ-সব ব্যাপারে অত্যন্ত স্থূল, হয়তো পেছনের দিকে কতগুলি কুচি দিয়ে বসবে! মা গো! এর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।

শাড়ি পরা তো হল—ওমা, বৃষ্টি এসে গেলো যে! চড় মেরে ঠাট্টা! অশ্রু আরেকটু হলে কেঁদে ফেলেছিলো আর কি! বৃষ্টিতে ভিজে অভিসারে যাওয়ার নিয়ম অবিশ্যি আছে—কিন্তু আশ্চর্য, সেই যুগে কোনো অনুরাগিণীরই প্লুরুসি হয়নি! তখনকার দিনের বেরসিক কবিদের শাপ দিয়ে রসাতলে পাঠিয়ে অশ্রু জানলায় এসে দাঁড়ালো। এত জোরে বৃষ্টি না এলে যেন পৃথিবী আর বাসুকির শিরোধার্য থাকতো না! এই বর্ষায় কত কবির কলমের মর্চেই যেন মুছে যাচ্ছে। বিধাতা যে মঙ্গলময় নয় এর একটা সদ্য প্রমাণ পেয়ে অশ্রু খুশি হলো বলে কাঁদতে চাইলো। সত্যি, এ সময়টা কি করেই বা কাটবে? ঘুমিয়ে? কার সঙ্গে ঘুমিয়ে? বই পড়ে? তেমন কোনো বই পৃথিবীতে লেখা হয়নি। একটু সেলাই করলে কেমন হয়? নিজের কপালটা? একটা চিঠি? কাকে? যমকে?

বিরসমুখে জানলা থেকে ফিরে এসে অশ্রু ঘড়ির কাঁটাকে প্রকৃতিস্থ করলে।

যাই বলো, এখন গেলে হয়তো দেখত প্রভাত ডেক্‌-চেয়ারে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দুপুর বেলার পুরুষের ঘুম ভারি বিশ্রী দেখতে, ভারি বিস্বাদ! তা ছাড়া বৃষ্টি এসে পড়ায় দুপুরবেলার নিজস্বতাই হারিয়ে গেল—এই নির্জনতার চেয়ে সেই নিস্তব্ধতা ঢের বেশি অর্থজ্ঞাপক, ঢের বেশি সুস্পষ্ট ছিলো। বৃষ্টিতে প্রেমালাপ জমে যা ভীরু, অর্ধস্ফুট, অনতিব্যক্ত—নিজের সামর্থ্যে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না বলে, চতুর্দিকে মেঘের রহস্যাবগুণ্ঠন টেনে কোনোরকমে মুখ বাঁচায়,—ঠুন্‌কো, পল্‌কা, পান্‌সে! রৌদ্রদীপ্ত দুপুরের প্রেম স্পষ্ট, নির্ভীক, প্রখর—প্রতিটি বাক্য তরবারির তড়িৎ-বিকাশের মতো দৃপ্ত, তেজস্বী, ধারালো। সুচতুর ব্যঙ্গ, প্রচণ্ড কলহাস্য! উলঙ্গতা আছে বলেই তার উজ্জ্বলতা। বাইরের আকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে কণ্ঠস্বরে কৃত্রিমতা আসে না, না বা আচরণে জড়তা। দৃষ্টি সেখানে বাষ্পাকুল নয়; কঠিন, ক্ষুধার্ত। দেহে মল্লার বাজে না, বাজে দীপক! দুপুরের প্রেমে সতীবিরহব্যথী শিবের আশীর্বাদ!

এমন দুপুরটা আকাশের অশ্রুতে ভিজে ফ্যাকাসে, ভ্যাপসা হয়ে গেলো। অশ্রুর জীবনে এ একটা পরম ক্ষতি। কথার মূল্য রাখতে গিয়ে বিকেলে যখন ও যাবে তখন মাটির সঙ্গে-সঙ্গে হৃদয়ও ঠাণ্ডা হয়ে সব একেবারে মাটি করে দেবে। তখন আকাশ আসবে জুড়িয়ে, হৃদয়েরও তখন গোধুলিবেলা। গোধুলির চেয়ে দুপুরের ধুলিই ওর বেশি পছন্দ। হাতে কিছু না পেয়ে অশ্রু গেল বুলুর সঙ্গে আলাপ করে bored হতে। ওকে দিয়ে এক পেয়ালা চা করিয়ে নিলে মন্দ হয় না।

বৃষ্টিকে এক সময়ে থামতে হলো। থামতে তাকে হতোই। সমস্ত কিছুরই একটা স্বাভাবিক অবসান আছে—এ একটা বড়োরকমের আশ্বস্তি। নইলে স্বয়ং বিধাতাই উঠতেন হাঁপিয়ে। এ-পৃথিবীটাও একদিন চলতে চলতে থেমে পড়বে—যাক গে চুলোয়! আজকের বিকেলেই তো তার ধুমকেতুর সঙ্গে বাহুনিবদ্ধ হবার লগ্ন নয়। অশ্রু বুলুর চুল টেনে দিয়ে উঠে পড়লো।

খাটের নিচে স্যাণ্ডেলটা খুঁজছে, বুলু শুধোলো: সেজে-গুজে কোথায় যাচ্ছিস পোড়ারমুখি?

ঘাড় নিচু করে রেখেই অশ্রু বললে—এই যদি সাজার উদাহরণ হয় তবে তোর আদিম প্রপিতামহী ইভ-এর লজ্জায় জিভ কাটবার আর দরকার হবে না। বাঁচলাম। কিন্তু জুতো কোথায় লুকিয়েছিস, বল্‌।

কপালে চোখ তুলে বুলু বললে—আমি কি জানি ?

—অবিশ্যি ইভ বা উর্বশী কারুরই জুতো-পরার অভ্যেস ছিল না,—আমি তো তাদেরই সমবয়সী। সহানুভূতি থাকা ভালো। চাইনে জুতো! তোদের পাঁউরুটির কাজ দেবে। মুক্তহস্তে যা দান করব মুক্তপদে তা ফিরিয়ে নেব দেখিস। বলে অশ্রু চুলের খোঁপাটা ঘাড়ের ওপর নেড়ে চেড়ে বসিয়ে, মাথার কাপড়টা তার ওপর আল্‌তো করে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সামনের মাঠে—ভিজা নরম সবুজ মাঠে। অমনি জানলা দিয়ে স্যাণ্ডেল জোড়া ছুটে এলো। অশ্রু পেছন ফিরেও তাকালো না।

খালি-পায়ে মাঠ মাড়িয়ে যেতে-যেতে অশ্রুর রোমাঞ্চ হচ্ছিল। ঘাসগুলিকে যেন পায়ের তলায় শিশু-সন্তানের চুমোর মতন নরম লোভনীয় লাগছে। রাস্তায় একটা গাড়ি নেই যে ডাকবে। এ মাঠটুকু পেরিয়ে রাস্তায় পা পাততে হবে ভেবে অশ্রুর মনে আর সুখ ছিলো না। খানিকক্ষণ এখেনেই টহল দেওয়া যাক। সুন্দর আকাশ—ড্রয়িংরুমে ঐ হাল্‌কা রঙের একটা কার্পেট হলে ভারি মানায় ; ও রঙের কালো পানীয় পেলে অশ্রু তা এক চুমুকে খেয়ে ফেলতে পারে! হাওয়াতে একটু শীত-শীত করছে বুঝি,—নয়ানসুকের পাতলা ব্লাউজের উপর অন্তত একটা খদ্দরের চাদর জড়ানো উচিত ছিল। আলিঙ্গন বহুকালস্থায়ী হতে পারে না,—এক ফাঁকে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। সর্দি হলে প্রেম জমানো ভারি কষ্টকর ব্যাপার। বারে বারে হাঁচি এলে কোনো কথারই গাম্ভীর্য থাকে না। হ্যামলেট যখন ওফিলিয়ার ঘরে এসেছিলো, কিংবা ওথেলো যখন নিদ্রিতা ডেস্‌ডেমোনার শয্যাপার্শ্বে, তখন দু'টি মেয়েই যদি হেঁচে উঠতো তা হলে দু' দু'টো খুন বেঁচে যেতো। বেঁচে যেতো বটে, কিন্তু শেক্সপিয়ার বাঁচতো না। অতএব একটা গাড়ি নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে।

রাস্তা। গেলো মিনিট পাঁচেক কেটে। আকাশের রং বদলাতে শুরু করেছে—এ রঙ-এর পা-পোষেও অশ্রুর মন উঠবে না। এবারে আবার বৃষ্টি নেমে এলেই অশ্রুকে বাধ্য হয়ে প্রতীক্ষমানা প্রিয়ার চোখের জলের সঙ্গে তার উপমা দিতে হবে। না, বৃষ্টি আসবার আগেই বিধাতা বুদ্ধি করে রাস্তার উপর একখানা ভাঙা গাড়ি এনে দিলেন। বুদ্ধি করে,—দয়া করে নয়। কারণ, অশ্রুকে ভিজতে হলে বিধাতারই হতো মুস্কিল, কেন না অশ্রু ডাক-বাংলোয় না গিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে যেতো—একটা নূতন প্রেমাভিনয় দেখবার

আনন্দ থেকে বিধাতা অকারণে বঞ্চিত হতেন। বাঙলা-দেশের বিধাতার ভাগ্য ভালো। গাড়িটা থামিয়ে অশ্রু পা-দানির কাদা থেকে শাড়িটা বাঁচিয়ে বসে পড়লো। গাড়ি চললো গড়িয়ে—গদাইলস্করি চালে। গাড়োয়ানকে তাড়া দেবে ভাবলে, কিন্তু অশ্বিনীকুমার দু'টিকে সায়েস্তা করা স্বয়ং সায়েস্তাখাঁরো কর্ম নয়। গাধা পিটিয়ে যে ঘোড়া করা যায় অশ্রুর আর সংশয় রইলো না।

ডাক-বাংলোটা তা হলে আছে—উড়ে যায়নি। বিধাতার অমানুষিকতার তালিকায় এ-ব্যাপারটা আজকের বিকেলের জন্য অন্তত অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলে অশ্রু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়তে গিয়ে বাধা পেলো। কেননা, নিশ্বাস এত দ্রুত হওয়া উচিত—বারান্দায় প্রভাত, সশরীরে—চীনের দেয়ালের মতো। দৃষ্টি গিয়ে ঠেকলো, রইলো আটকে। অশ্রুকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে প্রভাতই এলো ছুটে—দূরে বল্ দেখতে পেয়ে গোল-কিপার যেমন ছুটে আসে। বললে,—বিকেল মরে বাসি হয়ে গেলো,—এতক্ষণে বুঝি ঘুম ভাঙলো তোমার ?

অশ্রু বললে,—গাড়োয়ানটাকে পয়সা দিয়ে বিদেয় কর তো আগে—পরে বিকেলের বিকল হওয়ার কাহিনী বলা যাবে।

পকেটে হাত রেখে প্রভাত বললে,—গাড়িটাকে না ছাড়লেই তো ভালো হত, বেরুতাম।

অশ্রু অল্প একটু হেসে বললে—তোমার যেমন বুদ্ধি! তোমার পায়ে কি বাত হয়েছে যে গাড়ির ঝাঁকুনি খেয়ে ব্যায়াম করতে চাও। তা ছাড়া এমন সন্ধ্যা ক'জনের ভাগ্যে আসে! এমন সন্ধ্যার জন্যে ঊর্মিলা কত সন্ধ্যায়ই বৃথা বাতি জ্বেলেছে! গাড়ি চড়ে পরে না-হয় শ্বশুরবাড়ি যেয়ো, এখন এস হাঁটি।

গাড়োয়ান বিদায় নিতে প্রভাত বললে,—তোমার যে খালি পা!

খুকির মতো হাত তুলে অশ্রু বললে,—তবে কাঁধে তুলে নাও। সামনে একটা খাঁড়ি বা নর্দমা পড়লে আমাকে নিয়ে ডগলাস্ ফ্যায়ারব্যাঙ্কসের মতো না হয় কসরৎ দেখিয়ো। হাঁটতে আমি খুব পারবো ; হাঁটতে আমার ভালো লাগে। এসো শিগগির।

রাস্তা বেশ নির্জন,—বৃষ্টি পড়ে আকাশ তাজমহলের মেঝের মতন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—তাজমহল অশ্রু কোনোদিন দেখেনি, আকাশকেও ছোঁয়া গেলো না—কিন্তু উপমা তার জন্যে আর অসার্থক হবে না। চোখ দিয়ে ছোঁয়া, চোখ দিয়ে ছবি আঁকা। এই চোখ দিয়ে মৃত্যুর পরে নতুন তারার নতুন গ্রামের ছবি

আঁকতেও ওর ভাবতে হয় না। নিশ্চয়। সেই গ্রামের রঙ এখনকার সাতটা রঙের থেকে আলাদা আরেকটা—সেই জীবনের অনুভূতি আরো বহুবিচিত্র,—মাটির দেহ নিয়ে তার সম্পূর্ণ কল্পনা করা যায় না। সেখানে আলো নেই, খালি অন্ধকার। ধূসর অস্পষ্টতা। অপরিচয়ের গভীর সম্পর্ক। প্রয়োজনের বোঝা Lethe-র পারে ফেলে এসেছে। সেখানে—সেই চিরসূর্যাস্তের দেশে সুচির-স্তব্ধতা। অথচ কী আনন্দঘন উজ্জ্বল জীবন! সেই বচনাতীত অনুভূতিতে অশ্রু উত্তীর্ণ হবে কবে?

বৃষ্টির পর আকাশকে নীল চোখ ভাবলে দিগন্তরেখাকে মনে হবে ঠিক ভুরুর মতো বাঁকা। এক ঝাঁক পাখি বেরিয়ে এসেছে। পাখার অস্ফুট ঝাপট শোনা গেল। আকাশ যেন শব্দ করে তার আনন্দ জানালো। হাঁটতে হাঁটতে অশ্রু বল্‌ল—দুপুরে ঘুমিয়েছিলে?

প্রভাত রেইন-কোটটা ডান কাঁধের ওপর গুছিয়ে রাখতে রাখতে বল্‌ল—তুমি আস-আস করে ঘুমুনো আর হয়ে ওঠেনি। বাদলা-হাওয়া লেগে মন ভিজে যদি সেন্টিমেণ্টাল হয়ে ওঠে তাহলে তোমার হাঁচি পাবে না আশা করি। কদ্দিন পর দেখা হল বল তো—অথচ মনে হয় যেন 'সেদিন সকাল'!

অশ্রু নীরব হয়ে রইলো। প্রভাত বলে চললো: যেদিন পিওন তোমার চিঠি দিয়ে গেলো সেদিন ক্যালেণ্ডারে কোন তারিখ ছিল জানি না, কিন্তু মনে হয়েছিলো সেদিনই আমার জন্মদিন। কেন আবার হঠাৎ ডাকলে বল তো?

অশ্রু বললে—এই জন্যেই সন্ধেবেলাটা আমি পছন্দ করি না,—নিজের মনের চেহারার ভালো করে ঠাহর হয় না। সব ঝাপসা হয়ে আসে। দুপুরেই সেইজন্যে আসতে চেয়েছিলাম। বেশ একটা সহজ স্পষ্টতা থাকে। কেন আবার ডাকবো? খুশি!

প্রভাত। তিন বছর পরে আবার মনে করলে—এর কি কোনো কারণ নেই?

অশ্রু। তিন বছর পরে আমার দাঁতে ব্যথা হয়েছে—এরো কি কোনো বিশেষ কারণ আছে? তোমাকে ভীষণ করে মন চাইল—দেখি তোমাকে পাওয়া যায় কিনা। দেখলাম তুমি তেমনি অপরূপ।

প্রভাত। চল, নদীর ধারেই যাই।

অশ্রু। বেশি নির্জনতা আমার পছন্দ হয় না, আমি হাঁপিয়ে উঠি। সেই জন্যেই কলকাতায় যাবো—কালই। তোমার সঙ্গে।

প্রভাত। কলকাতায় কেন ?

অশ্রু। সব কেন-র উত্তর দিতে গেলে কোটি কোটি কেনোপনিষদেও কুলুবে না। তোমার নাম প্রভাত কেন ?

প্রভাত। কলকাতায় তো একলাই যেতে পারতে, আমাকে এতটা দৌড়িয়ে এনে কী লাভ হল ?

অশ্রু। সব কাজই একলা করতে হবে বিধাতা মেয়েমানুষকে এমন দিব্যি দিয়ে দেননি। কলকাতায় যাবো কারণ জলপাইগুড়িতে আর জল নেই ; তোমার সঙ্গে যাবো কারণ তোমার সঙ্গে এক গাড়িতে ট্র্যাভেল করতে আমার ভালো লাগবে। খুব।

প্রভাত। আমার তো না-ও লাগতে পারে।

অশ্রু। বলো কি, এ আমি বিশ্বাসই করবো না। আমি এখনো বুড়ি হইনি।

প্রভাত। হওনি নাকি ?

অশ্রু। যাক, দরকারি কথাগুলি সেরে নি। আপাতত কলকাতায় গিয়ে আমাকে এক হোটেলে উঠতে হবে—বাড়ির দরজা তেমনি বন্ধ। দরজার গোড়ায় বসে ধন্না দেবো আমি তেমন ধার্মিকও নই, দরজা যে ভেদ করব তেমন ধনুর্ধরও নই। অতএব—

প্রভাত। হোটেলে ?

অশ্রু। হ্যাঁ, আকাশ থেকে পড়লে যে! গ্র্যাণ্ড হোটেলেই উঠতাম, কিন্তু বেজায় খরচ। দু' একদিন হলে খুব চাল করে থাকা যেতো—কোনো সাহেবের সঙ্গে বন্ধুতা করবার সুযোগো মিলে যেতো হয়তো কিন্তু প্রায় এক হপ্তার ওপর কলকাতায়ই জিরোতে হবে। অতএব—হ্যাঁ, অতএব ক্যাল্‌কাটা-হোটেলেই ঘর নেবো।

প্রভাত। তোমার স্কিম্ তো খুব ইন্‌টারেষ্টিং। তারপর ? আমি থাকবো কোথায় ?

অশ্রু। দেখা করতে আসতে পারো দিনের বেলায়—রাত্রে বাইরের লোককে ম্যানেজার নিশ্চয়ই allow করবেন না। আমারো ঘুমানো চাই তো। বিকেলে আসবে—অনেক জিনিস-পত্র কেনার দরকার—কুকার, হোল্ড্‌অল্—

প্রভাত। সেফ্‌টিপিন্ ; হেয়ারক্লিপ—

অশ্রু। কেন য়্যাদ্দিন কলকাতায় থাকবো তা আন্দাজ করতে পেরেছো ?

প্রভাত। কি করে পারবো? সাত দিন থেকে কলকাতাকে কেন সপ্তম স্বর্গ করে তুলবে তা তোমার বিধাতাই জানেন। মিস্ মেয়ো বোধ হয় য়্যাদ্দিনও ছিলো না।

অশ্রু। বোকার মতো যা-তা বোলো না। থাকব মানে থাকতে হবে।

প্রভাত। নিশ্চয়! বোকার মতো মানে মূর্খের মতো।

অশ্রু। কেন না কলকাতাতে নেমেই তুমি হাওড়া গিয়ে কোনো গাড়িতেই বার্থ রিজার্ভড্ পাবে না। পুজোর আগে কি রকম ভিড় হয়েছে আইডিয়া আছে তোমার?

প্রভাত। পাঁজির পাতায় কখন পুজো আসে তারই আইডিয়া নেই—

অশ্রু। অতএব—

প্রভাত। অতএব—

অশ্রু। অতএব বার্থ পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সাত দিন আগে টিকিট পাওয়া যাবে—দেখা যাক, অন্তত শেয়ালদা-দিল্লি প্যাসেঞ্জারে পাশাপাশি দুটো বেঞ্চি পাওয়া যায় কি না। একেবারে পাটনায়—

প্রভাত। বলিহারি! আমি ভাবছিলাম যে-রকম কথার কদম ছুটিয়েছ, বুঝি ফংচু হয়ে কাম্স্কাট্কা যাচ্ছ! পাটনা? আমাদের বস্তিবাটি কি দোষ করলো?

অশ্রু। তোমার মাথায় যে গোবর তা এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। যুক্তিটা শোনো—

প্রভাত। পাটনা যাবার পক্ষে আবার যুক্তি আছে নাকি?

অশ্রু। প্রতি একশো মাইল অন্তর একদিন করে ব্রেক-জার্নি পাওয়া যায় —সে জ্ঞান তোমার আছে? আমাদের টিকিট তো লাহোরের—এগারো শ নিরানব্বুই মাইল্। ই, আই, আর-এর টাইম্-টেব্‌ল্ আমার মুখস্ত। প্রথমেই নামবো পাটনায়।

প্রভাত। তবু তোমার পাটোয়ারি বুদ্ধিকে তারিফ করতে পারছি না, অশ্রু। পাটনায় নামবে হাইকোর্ট দেখতে? এক্কা চড়ে যাবে দেখতে তুমি?

অশ্রু। পাটনায় নেমে যে নালন্দায় যাওয়া যায়—পুরোনো পাটলীপুত্রে—ইতিহাস তো পোকায় কেটেছে। তা ছাড়া, সেখানে আমার একটি বন্ধু আছে।

প্রভাত। আশা করি পুরুষ।

অশ্রু। নিশ্চয়। মুখ কালো কোরো না। সমান sex-এ সত্যিকারের বন্ধুত্ব হয় না।'

প্রভাত। বুঝলাম। তারপর? পাটনা থেকে কোথায়? বক্সার?

অশ্রু। সে বুঝি এক শো মাইল পেরিয়ে?

প্রভাত। আমি তো আর টাইম্-টেব্‌ল মুখস্ত করিনি।

অশ্রু। তারপর সটান এলাহাবাদ!

প্রভাত। আঃ, একটা জায়গার নাম করলে বটে।

অশ্রু। তার মানে? পাটনার থেকে এলাহাবাদে এমন কি বেশি জৌলুস্! একেবারে গদ্‌গদ হয়ে উঠলে যে—

প্রভাত। সেখানে হাইকোর্ট তো আছেই, যমুনাও আছে।

অশ্রু। কেন, পাটনায় বুঝি গঙ্গা নেই?

প্রভাত। কোথায় গঙ্গা, কোথায় যমুনা! এসে মিললো এলাহাবাদে। ওখানে গঙ্গাও আছে যমুনাও আছে।

অশ্রু। লোহার শিকলে যমুনা তো সেখানে বন্দী।

প্রভাত। তবু তার সঙ্গে গঙ্গার তুলনা হয় না। যমুনা গঙ্গার মতো দেবী নয়, শিবের জটায় তার জন্ম নয়; সে নিতান্ত নিরাভরণা, শীর্ণকায়া, বিরহ-ব্যথিতা। ভারি লক্ষ্মী নদীটি। দুঃখিনী। পূর্ববঙ্গে এমনি একটি নদী আছে, তার নাম শীতললক্ষ্যা।

অশ্রু। তুমি যদি যমুনা নিয়ে অমন কবিত্ব করো তা হলে এলাহাবাদ যাওয়া বন্ধ করে দেব।

প্রভাত। কিন্তু আর কোথায় যাবে? পশ্চিমে যতই এগোও যমুনাকে তুমি ছাড়তে পারবে না। অতীত রাতের একটি বিষণ্ণ স্মৃতির মতো তোমার মনে লেগে থাক্‌বে। বেশ, এলাহাবাদ থেকে?

অশ্রু। পরে বিবেচনা করা যাবে। এখন এস ফেরা যাক্।

প্রভাতের হাত নিজের হাতে টেনে নিল অশ্রু।

অন্ধকার হয়ে এসেছে,—মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ মুখ বাড়িয়েছে দেখে দু'-জনের মুখ খুশি হয়ে উঠলো। অশ্রু বললে—খানিকটা ডান-হাতি গেলেই

আমাদের হস্টেল, আমাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যেতে পারবে তো? দিব্যি ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে।

প্রভাত রেইন-কোটটা অন্য কাঁধের ওপর তুলে নিতে-নিতে বললে—এতদিনে জ্যোৎস্নার উপকারিতার একটা উদাহরণ পাওয়া গেলো। নইলে এতদিন জ্যোৎস্নায় বরাবর কবিদের পেট ফেঁপেছে।

অশ্রু। বাজে কথা বলো না। যেতে পারবে তো একা?

প্রভাত। না-হয় একটা গাড়ি ডেকে নেবো।

অশ্রু। হ্যাঁ, তাই নিয়ো। গাড়ি তোমার জন্য গড়াগড়ি যাচ্ছে কি না!

প্রভাত। কেন, তোমার হস্টেলে একটু জায়গা হয় না?

অশ্রু। হয়! এই যে একসঙ্গে একটু হাঁটলাম তাতেই বাঙলা দেশে এতক্ষণে হয় তো ভূমিকম্প হচ্ছে। হয় তো দেখতে পাবো কালকেই খান তিনেক ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের দরখাস্ত পড়েছে।

প্রভাত। কারণ?

অশ্রু। কারণ আমার গায়ে সীতা-সাবিত্রীর পালিশ নেই। সীতা তবু রামায়ণে (বাল্মীকির রামায়ণে) পাতালে প্রবেশ করবার আগে রামকে যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দিয়েছিলো, আমার সে-গালাগালি দেবারো অধিকার নেই।

প্রভাত। সীতা আবার রামকে বকলো কখন?

অশ্রু। শুধু বকা, জন্তর মতো মা-বাপ তুলে। সংস্কৃত জানো তো মূল বাল্মীকি পড়ে দেখো।

প্রভাত। আমার পড়ে কাজ নেই। বাল্মীকির চেয়ে বাঙালির রামায়ণ ঢের ভালো।

অশ্রু। মিথ্যে বানানো বলে—কিন্তু এর বেশি আর পা বাড়িয়ে কাজ নেই। এর পরেই স্কুল-কম্পাউণ্ড, যদি ওখানে এসে পড় তা হলে ইস্কুল হয় তো উঠে যাবে।

প্রভাত। বল কি? সত্যি, আমি কিন্তু এত সহজে স্কুল উঠে যাওয়ার খুব পক্ষপাতী।

অশ্রু। আর পক্ষ পেতে লাভ নেই। আমি চল্লুম। দুটো মুখে গুঁজেই দেব লম্বা ঘুম। ভারি ঠাণ্ডা মিষ্টি রাত।

প্রভাত। বটে! আর আমি এমনি দাঁড়িয়ে থাকবো?

অশ্রু। দাঁড়িয়ে থাকবে কেন, ডাক-বাংলায় ফিরে যাবে। একা যাবার অভ্যাস কর। (গম্ভীর) একাই যেতে হবে। আর মায়া বাড়িয়ে কাজ কি। তবে ঐ কথা রইল, কালই কলকাতা যাচ্ছি। ঠিক থেকো। আমি জিনিস-পত্র নিয়ে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়বো কিন্তু।

প্রভাত। তা তো পড়বে, কিন্তু কখনো কথা হয় নি! তোমার একার কথাতে চললে এই ইস্কুলো চলতো।

অশ্রু। (ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে) ইস্কুল না চললেও দার্জিলিঙ্‌ মেল্‌ চলবে। এখন যাও, মেয়ে-ইস্কুলের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকা ভদ্রতা নয়।

প্রভাত। আর মেয়ে-স্কুলের কম্পাউণ্ডের কাছে ছেড়ে দিয়ে যাওয়াটাই যেন ভদ্রতা! এ-সবো কি বাল্মীকির রামায়ণ থেকে শেখা নাকি?

অশ্রু। তোমার সঙ্গে বকর-বকর করতে পারি না। কাল—কাল আবার দেখা হবে। বলে অশ্রু ভেতরে ঢুকলো।

কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে পেছন ফিরে তাকাবার সনাতন একটা রীতি আছে—অশ্রু তার লোভ সম্বরণ করতে পারবে কেন? ব্যাপারটা ওর ভালো লাগলো না। চেয়ে দেখলো প্রভাত পকেট থেকে রুমাল বার করে নেড়ে-নেড়ে ওকে ডাকছে। এ যে দেখছি ভারি সেকেলে, অশ্রু খাপ্পা হয়ে ফিরে এলো।

অশ্রু। এখনো দাঁড়িয়ে আছ যে?

প্রভাত। তোমার যাবার পরমুহূর্তেই যদি চলে যাই তবে ছবিটায় সামঞ্জস্য থাকে না। যেখানে ব্যালেন্স নেই সেখানে সৌন্দর্যও নেই। দৃশ্যটায় কি রকম যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। হতে গল্‌সোয়ার্দি কিংবা ওনিল্‌, বুঝতে সমস্ত দৃশ্যটা কেমন নড়বড়ে বেখাপ্পা, বেজুত, ঠেকছে।

অশ্রু। আমি তো ভাবছিলাম, বাড়ি ফিরে তবে কবিত্ব করবো। তুমি যে একেবারে লোক হাসালে। একেবারে রুমাল তুলে ডাকাডাকি। একবার একটা এঞ্জিন বাঁচাবার জন্যে একটি মেয়ে রেল্‌লাইনে দাঁড়িয়ে রুমাল তুলেছিলো জানি। তোমার মতো বিপদ বাড়াতে নয়। যদি কেউ দেখে ফেল্‌তো?

প্রভাত। তবু তোমার 'দেখে-ফেলার' ভয় গেলো না। যতই তড়পাও, লোকনিন্দার হুক্কাহুয়া শুনে তুমিও ল্যাজ গুটোও। দেখতো তো বয়ে যেতো। রুমালে কি আছে, তা তো আর দেখতে পেতো না।

অশ্রু। রুমালে কি আছে? দেখি? সেই জন্যে ডাকলে?

প্রভাত। ডাকবার একটা কারণ দেখাতে হলে রুমালের রহস্য আমি দেখাবো না।

অশ্রু। না, না; দেখি।

প্রভাত। (রুমালটা হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে) চোখ বোজ।

অশ্রু। বাঃ, চোখ বুজে কখন আবার কে দেখতে পেয়েছে!

প্রভাত। সত্যিকারের সব দেখা চোখ বুজেই ঘটেছে, অশ্রু। চোখ বোজ।

অশ্রু। (চোখ বুজে) আমি বোকার মতো চোখ বুজলাম। দেখাও দেখি—

প্রভাত। আর আমি বুদ্ধিমানের মতো—

অশ্রু হেসে বললে—তুমি তো ভীষণ villain। আচ্ছা, যদি কেউ দেখে ফেলতো!

প্রভাত। তুমি তো আর দেখতে পেতে না।

অশ্রু। এবারে তোমার দৃশ্য তার পূর্ণ নাটকীয়তা লাভ করেছে?

প্রভাত। করেছে, কিন্তু তোমাকে কি রকম ঠকালাম বলো তো! অন্ধকারে চোখ বুজে রুমাল দেখা! চলো হস্টেলে, এই গল্প সবাইকে বলে আসি।

অশ্রু। সবাই থামচে দেবে।

প্রভাত। এ কী রকম হল জান? একবার এক মান্দ্রাজি ভদ্রলোক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ হল্-এ নিবিষ্টমনে ছবি দেখছেন—যতই দেখেন ততই আবিষ্ট হন। এমন সময় পেছন থেকে একটি মারহাঠি ভদ্রলোক বললেন: এক চোখ বুজে তাকান, ছবিটা খুলবে। মান্দ্রাজি ভদ্রলোক এক চোখ বুজবার কসরৎ করতে গিয়ে ক্ষণকালের জন্যে দু'চোখই বুজে ফেললেন, আর সেই ফাঁকে তাঁর পকেট থেকে মনিব্যাগটি অদৃশ্য হয়ে গেলো। তাঁর সর্বস্ব! তেমনি—

অশ্রু। তেমনি কি? একটা চুমুতেই আমার সর্বস্ব লুট হয়ে যায় না বোকারাম—

বলেই ফের পা বাড়ালো।

প্রভাত। (বাধা দিয়ে) যাচ্ছই তো, তোমার একখানা হাত দাও। দেখি তুমি নার্ভাস হয়েছো কি না। যক্ষ্মাক্রান্ত কীট্সের হাত ধরে কোল্‌রিজ নাকি মৃত্যুকে স্পর্শ করতে পেরেছিলো।

অশ্রু। এবার মুখ ফুটে চাইতে পারছো! হাত তো একবার দিয়েছি।

প্রভাত। সে চলবার হাত, বলবার হাত নয়। এবার বলবার হাত দাও। হাত চাওয়া যায়, কিন্তু চুমু চাওয়া যায় না। কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়? কখনো কখনো ছিনিয়েই নিয়ে নিতে হয়। প্রথম চুমুমাত্রেই ভীরু, সাবানের বুদ্‌বুদের মতো। প্রস্ফুটিত হতে না হতেই যায় শুকিয়ে। আমার কি, স্বয়ং রুডল্‌ফ ভ্যালেন্‌টিনেরো। প্রথম চুমুতে চোখ চেয়ে থাকলে কেন জানি বাধে—যেমন প্রথম কবিতার ছন্দে বাধে।

অশ্রু। এখন তো দেখছি কিছুতেই বাধছে না। তুমি যাবে না?

প্রভাত। যাচ্ছি। এক কাজ কর—হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি; তুমি বরং আমার যাবার পথে একদৃষ্টে চেয়ে থাকো।

অশ্রু। (হেসে) তাই সই।

প্রভাত। (পেছন ফিরে) দরকার হলে রুমালের বদলে আঁচল উড়োতে পারো।

অন্ধকার রাস্তায় প্রভাত ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলো। অশ্রু তখনো একটি চিত্রলেখার মত দাঁড়িয়ে।

ডাক বাংলোয় ফিরে এসে প্রভাত বেয়ারাকে ডেকে তাড়াতাড়ি রাত্রির খাওয়া সেরে নিলো। একে আর রাত বলে না,—কলকাতায় তো এখন সবে সন্ধ্যা—কিন্তু এরি মধ্যে এদেশের ঘুম এসেছে। প্রভাত বারান্দায় ডেক-চেয়ারটা টেনে আনলো। কিন্তু চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হল না। পাইচারি করে সমস্ত শরীরটাকে চঞ্চল, অস্থির, বেগময় করে রাখতে চায়। আলস্য আজ ওকে তৃপ্তি দেবে না। এই উচ্ছলতা কমে এসে যখন মাত্র উষ্ণতায় পর্যবসিত হবে তখনই কবিতা লেখা সম্ভব। ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতার এই সংজ্ঞায় সে বিশ্বাস করে। মরুভূমি-সম্বন্ধে সত্যিকারের কবিতা লিখতে হলে ইজি-চেয়ার আর ইলেকট্রিক পাখা চাই। প্রেমিকার অন্তর্ধান না ঘটলে প্রেমের কবিতায় প্রাণ আসে না।

যাক কবিতা, কাব্যের চেয়ে মানুষ বড়ো। লক্ষ এপিকে একটা মানুষের সত্য চরিত্র বর্ণনা চলে না—সে এতো বিচিত্র, এতো বহুল-প্রকাশময়! কাল

প্রভাত ছিল সামান্য কেরানি, পাঁচ আঙুলের একটা আঙুল,—অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত,—নেহাৎই সাধারণ! ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন না থাকবার কোনো কারণই কাল ছিল না। বিকেল পাঁচটায় ড্যালহৌসি স্কোয়ারের চার ধারে কেরানির যে বিপুল ঢল নামে তারই অন্তরালে আত্মগোপন করে ছিলো,—ওকে সেখান থেকে অপসৃত করে নিলেও সে মিছিলের তাল কাটতো না। ও এত অপ্রয়োজনীয়। ভগবানকে ও এইজন্যেই কোনোদিন ডাকেনি যে, ভগবান বলে কেউ থাকলেও ওর কথা নিশ্চয়ই আর কানে তুলবেন না। এত তুচ্ছ লোকের এত অকিঞ্চিৎকর প্রার্থনা শোনবার জন্যে তাঁকেও কান খাড়া করে রাখতে হবে—ভগবানকে এত ছোট বলে কল্পনা করতে ওর বাধতো। সেই প্রভাত আজ কয়েক ঘণ্টায় যেন খোলস বদলে ফেলেছে। পৃথিবীর মাথার উপরে যে এতো বড়ো একটা আকাশ আছে সে-কথা আজকে রাতে হঠাৎ আবিষ্কার করে ওর তৃপ্তির যেন আর শেষ রইলো না। সব চেয়ে আশ্চর্য, সেই আকাশের মুকুরে প্রভাত নিজের মুখের ছায়া দেখছে—এবং ওর মুখ যে কত সুন্দর তা ও এই প্রথম টের পেলো। ওর নার্সিসাস্-এর কথা মনে পড়ে। নার্সিসাস্ ঝর্ণার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়া দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো—নিজেরই সঙ্গে সে প্রেমে পড়লো, নিজেরই বিরহে কাঁদলো, নিজেকেই পাবে না ভেবে অসীম বেদনায় আত্মহত্যা করলো। সে কী অপূর্ব মৃত্যু! নার্সিসাস্ ফুল হয়ে জেগে উঠলো ঝর্ণার উপর!

প্রভাত ভাবলো আমরা প্রিয়াকে ভালোবাসি না, ভালেবাসি আমরা আপন আত্মাকে—যে-আত্মা নারীকে প্রিয়া করে দেখেছে। তাই সে আমাদের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু, যার মধ্যে নিজেকেই বেশি করে দেখতে পাই। যে-প্রতিভায় আমরা প্রস্তরের বেদীতে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করি তার জন্যে আমাদের অহঙ্কারের অন্ত কৈ? প্রেমে আমাদের আনন্দ যতো, অহঙ্কার তার চেয়ে ঢের বেশি। এই অহঙ্কারে বিধাতাও আমাদের সমকক্ষ নন। তাই প্রেম যখন মরে, বেদনার চেয়ে অপমান এই জন্যেই বেশি লাগে যে, অহঙ্কার যায় ধূলিসাৎ হয়ে। অহঙ্কার যাওয়া মানে নিজের কাছে ব্যক্তিত্ব হারানো। নিজের কাছে লজ্জাই সব চেয়ে বড়ো লজ্জা।

নইলে অশ্রু তো এখানে গৌণ,—ও যে কেরানি ছাড়া আর কিছু, ওরো যে এতো বড়ো বায়ুমণ্ডলে নিশ্বাস ফেলবার অধিকার আছে, আকাশের আস্বাদ

নেবার—তা ওকে বোঝালো ওর সভ্যজাগ্রত বুদ্ধি, নব-উন্মেষিত প্রতিভা! যেখানে হৃদয় জাগে, বুদ্ধি থাকে ঘুমিয়ে, সেখানে প্রেমের স্বভাব হয় ছিঁচকাঁদুনে স্যাঁতেসেঁতে—আর যেখানে হৃদয় নেই, খালি বুদ্ধি, সেখানে প্রেম অর্থ সকালে উঠে গরম দুধ খাওয়া ও কাণ্ট্-এর *Critique of Pure Reason*-পড়া। কিন্তু বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয় মেশাতে হবে! তা হলে দুটো প্রেমপত্র লিখে দু'রাত পাশাপাশি শুয়ে দুটো হাই তুলে পুন্নাম-নরক থেকে রক্ষা পেয়ে কায়ক্লেশে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে যা হোক।

ভাবতে বসলে মন যে বাঁধা সড়ক দিয়ে না চলে অলি-গলিতে গড়িয়ে পড়ে এর জন্যে প্রভাত মনকে শাসন করে মোড় ফেরালো। এমন সময় ও কোনোদিন সংসারের ভাবনা না ভেবে বারান্দায় বসে জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা করবে এ-কথা ওর জন্মাবার ছ'দিনের দিন মা'র আঁতুড় ঘরে ঢুকে ওর ভাগ্যবিধাতা নিশ্চয়ই ওর কপালে লিখে রেখে যান নি। ও যেন ফের নতুন মুখোশ পরে অশ্রুর কাছে আবির্ভূত হল—তার মানে ও ওর দ্বিতীয় চরিত্রাভিব্যক্তি আবিষ্কার করেছে। ব্রাউনিঙ মনে পড়ে:

"God be thanked, the meanest of His creatures
Boasts two soul-sides, one to face the world with,
One to show a woman when he loves her."

কথাটা সত্যি, কবিতায়ো শোনায় ভালো; কিন্তু যে-মুখ করে আমরা এই নিরাপদ রুক্ষ সংসারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করি, প্রেয়সীর কাছে সে-মুখ তুলে ধরতে পারবো না কেন, লজ্জা কিসের? প্রেয়সীর কাছে দাঁড়াতে হলেই সে-মুখে মেকি পাউডার ঘষতে হবে—এই কল্পনা-বিলাসের তাৎপর্য কোথায়? প্রেয়সীও আসবার সময় তাঁর আটপৌরে আধ-ময়লা শাড়িখানি ছেড়ে জরির চুম্‌কি দেওয়া বেনারসি পরে এসে একেবারে নক্ষত্রমণ্ডিত অমাবস্যা-রাত্রির উপমেয়া হয়ে উঠবেন—এরি বা কাব্যগত প্রয়োজনীয়তা কিসে? প্রভাত কেরানি, ক্ষুদ্রস্বার্থপীড়িত, লোভী, সংকীর্ণচিত্ত—এ-সব পরিচয় একদম লুকিয়ে লেফাফাদুরস্ত হয়ে অশ্রুর কাছে এসে দেখা দেবে—উদার, মহানুভব, ইত্যাদি—! কেন? প্রেম করবার বেলায়ো যদি এত লুকোচুরি—যেখানে অজস্র আত্মপ্রকাশের তাগিদ—তবে প্রেম করার চেয়ে দু'ছিলিম তামাক খাওয়ায় বেশি লাভ। এমনি করে পোষাকি কাপড়-চোপড় পরে পরস্পরকে দেখা

দিতো বলেই ওথেলো আর ডেস্‌ডেমোনার মধ্যে এমন প্রকাণ্ড ফাঁক রয়ে গেলো। ডেস্‌ডেমোনা ভালবেসেছিলো যোদ্ধা ওথেলোকে, ঘরোয়া ওথেলোকে নয়,—ফলে তার বুক পেতে ছুরি খেতে হলো। প্রেয়সীর কাছে মুদ্রাদোষ দেখানো নিষেধ আছে—এই নিয়ে রাশি-রাশি বই লেখা হল—কেন বাপু, মুদ্রাদোষ নেই অথচ মানুষ—এমন অমানুষ আছে ক'টি? সব সময়ে নিজের সঙ্গে বঞ্চনা করে একটা কৃত্রিম উজ্জ্বলতার মুখোস পরে নিজের মহিমা বাড়াতে হবে—এই আত্ম-অপমান প্রত্যেক প্রেমিক কি করে সহ্য করেন? পাছে ব্যক্তির স্বরূপ জানলে প্রেয়সী নাকের ওপর কাপড় টেনে যান পিছিয়ে! যেখানে এত ভয় এত সন্দেহ সেখানে প্রেমের ফাঁসি হওয়াই তো উচিত একশোবার। যাকে জানতে চাইবো তাকে জানাবো না—এ অসামঞ্জস্যের কথা প্রেমের বেলায় ওঠে কেন? তাই প্রতিমুহূর্তে প্রেমিক-প্রেমিকারা পরস্পরকে ঠকাচ্ছে। এবং সেই কারণেই "love-marriage" আর টিকছে না, উঠছে হাঁপিয়ে, পদে পদে অমিল,—পোষাকি কাপড়-চোপড় উইয়ে কেটেছে। জীর্ণ বসনের তলা থেকে দারিদ্র্য পড়েছে বেরিয়ে।

প্রভাত কথাগুলো নিয়ে মনের মধ্যে এমন ভাবে নাড়াচাড়া করছে যেন অশ্রু ওর দেহের কূলে এসে একদিন উত্তীর্ণ হবেই। এমনি একটি বিশ্রী আশা করাও প্রেমের ব্যাপারে স্বাভাবিক; প্রেমও তার একটা নিশ্চিন্ত সহজ পরিণতি খোঁজে, হয় বিরহে বিস্মৃতি, নয় বিবাহে বৈক্লব্য! প্রভাত ক্ষণবন্ধুতার উপযুক্ত দাম দিতে জানে, তাকে আটকে রাখবার জন্যে তার গলায় দড়ি চাপিয়ে তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিতে হবে এই বর্বরতা সে পছন্দ করে না। সে Moment Musical-এর ভক্ত।

তার কারণ প্রত্যেক ভালোবাসাই গভীর বন্ধুতায় দৃঢ়ীভূত হয়ে দুই দেহ আর দুই আত্মার ব্যবধান ঘোচাবে—মেয়েদের এমন প্রেমে প্রভাত বিশ্বাসবান নয়। এ-কথা টের পেলে অশ্রু নিশ্চয়ই কোমরে কাপড় বেঁধে একেবারে মারমুখো হয়ে উঠতো,—এমন সব তর্ক করতো হয়তো যার যাথার্থ্য প্রমাণ করতে প্রভাতকে এনসাইক্লোপিডিয়া গ্রাস করতে হতো। কথাটা ওর তর্কের দিক দিয়ে ওঠেনি, অনুভূতির দিক থেকে উঠেছে—তর্ক অবশ্য ও-ও করতে পারে না এমন নয়। মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্ক করায় এই অসুবিধে যে, সব কথা বলা যায় না, দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথা বেরুবার আগে জিভ কাটতে হয়—মেয়েরা

সব ঠুন্‌কো পুতুল, গায়ে আঁচড় লাগবে। পাঞ্জা কষতে হলে সমতল জায়গায় দাঁড়ানো উচিত। সম্ভ্রমের সিংহাসনে বসিয়ে মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করা চলতে পারে, তর্ক করা নয়। তাঁদের দয়া করে নেমে আসতে হবে।

মেয়েদের প্রেম সন্ততির জন্যে, ব্যক্তির জন্যে নয়। মেয়েরা ভালোবাসে স্বামীনামক একটা গুণবাচক বিশেষণকে, কোন বস্তু-বিশেষকে নয়। তাই স্বামী যখন মরে তখন স্ত্রী কাঁদে বিধবা হল বলে, অনেক অসুবিধায় এবারে তাকে পড়তে হবে বলে। মেয়ে হয়েছে প্রতিমা, পুরুষ হয়েছে প্রতীক। এই দুয়ে মিলে আমাদের প্রেম। শিশুকাল থেকে শিব গড়ে স্বামীর পুজো করে যে-ভাবটি মেয়েরা মনে মনে লালন করে যৌবনোদ্গম হতেই সে-ভাবটি যে-কেউর প্রতি আরোপিত করে মেয়ে হয় পতিব্রতা। সে-সৌভাগ্য তোমারো জুটতো, আমারো জুটতো, ও-পাড়ার পঞ্চাননো অযোগ্য হতো না।

বিশেষ করে বাঙালি মেয়েদের দোষ দেওয়ায় বাহাদুরি নেই—বিশেষ অশ্রুর অনুপস্থিতিতে। বায়রন যে বায়রন সেও পর্যন্ত তার *Sardanapalus*-এ মেয়েদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। বায়রনকে ক্ষমা করা যেতে পারে কেননা, ভাবপ্রকাশেব বিচিত্রতাই কবি-প্রতিভার বিশেষত্ব। নারীর যা মূল্য তা কী সে সৃষ্টি করে তার মধ্যে নয়, কী সে সহ্য করে তার মধ্যে। সহ্য করাটা ভীরুর ধর্ম। সহ্য তাকেই করতে হয় প্রকৃতি যাকে বেঁধেছে ; তাই সেটা তার কৃতিত্ব নয়। খুব তীব্র বেদনা বা আনন্দ অনুভব করবার তার ক্ষমতা নেই এবং সেই জন্যেই সে তেমন সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে নি যা অমরত্ব লাভ করতে পেরেছে। অমরত্ব লাভ করাটাই অবশ্যি সাহিত্যিক উৎকর্ষের চিহ্ন নয়। তবু অমরত্ব লাভ করা দূরে থাক, দুটো নাম করা যায় তেমন নামও মেয়েদের কোনো বাপ-মা রাখে নি। এবারে অশ্রু নিশ্চয়ই মারতে আসতো। মেয়ে সৃষ্টি করতে পারে নি ? কেন ? মাদাম কুরি ? বিজ্ঞানের কথা ছেড়ে দাও, সাহিত্য। কেন, ব্যারেট ? উণ্ডসেট ? শীলা কেইস্মিথ ? চুপ কর অশ্রু, হাসিয়ো না বলছি। তার চেয়ে বলো না কেন অনুরূপা দেবী !

মশার কামড় খেয়ে বাইরে বসে থাকলে পূর্বপুরুষেরা উদ্ধার পাবে না। এবার ঘুমুনো যাক। ঘুমুতে যাবার আগে একটা সিগারেট খাওয়া যেতে পারে। সিগারেট, সেও খাওয়া ; জল, সেও খাওয়া ! আর চুমু, সেও খাওয়া ! বাঙলা ভাষায় ক্রিয়া নেই,—সে জন্যে জাতটাও অকর্মণ্য। ক্রিয়া নেই বলে আনন্দ

নেই; তাই বেড়ে চলেছে ব্যাধি, বেড়ে চলেছে বার্ধক্য। কথা আবার ঘুরে যাচ্ছে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ঘুমুতে গেলেই আর ঘুম আসবে না! তার চেয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা যাক। টেলিস্কোপ ছাড়া গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে কোনো আবিষ্কার সম্ভব হবে না। খুব একটা দার্শনিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করছি ভাবলে শিরদাঁড়াটা ডেক-চেয়ারের ওপর আলগোছে নেতিয়ে পড়ে। সব মিথ্যে, বাজে, বিস্বাদ।

একবার নাকি দুই চীনে ভদ্রলোক বার্লিনে গিয়েছিলো থিয়েটার দেখতে। দু'জনেরই সমান বিদ্যে, দু'জনেই সমান রসিক। খানিকক্ষণ বসে থেকে একজন লেগে গেল যন্ত্রপাতি দেখতে; আরেকজন কিন্তু কিছুতেই হার মানবে না। সে তেমনি ঠায় চুপ করে বসে-বসে সেই দুর্বোধ ভাষা গিলতে লাগলো। একেই বলে রসগ্রাহিতা। প্রথম জন হচ্ছে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত—সারা সৌরজগৎ ঘুরে বেড়ায়, অথচ না পায় সীমা না পায় থৈ; আরেকজন হচ্ছে দার্শনিক পণ্ডিত—দুর্জ্ঞেয় রহস্য হাতড়ে বেড়ায়, অথচ না পায় অর্থ না বা রস! আমি করব কাব্যসৃষ্টি, আমার পেছনে থাকবে সমালোচক, আমি গাইব গান, পিছনে আসবে স্বরলিপি। আমি সূর্যের চারধারে গ্রহ নক্ষত্রগুলোকে ঘুরিয়ে দিলাম—সে-ঘোরার তাপ-নির্ণয় করতে ভিড় করে এল অসংখ্য বৈজ্ঞানিক। সমালোচকের আবদারে কবির কলম বেঁকে যায় না—পিথাগোরাস না এলেই পৃথিবী বুঝি হয়ে থাকত চ্যাপটা, আর সূর্য বেচারা ঘুরে-ঘুরে দম খোয়াতো!

যাই বলো রসগ্রাহিতাই হচ্ছে সভ্যতার পরম পরিচয়। সৃষ্টিটা তত দামী নয়, যতোটা তার রহস্য-উদ্ধার। বুনো অসভ্যরাও এমন সৃষ্টি করেছে যার অর্থ ও মর্যাদা তারা বুঝতো না বলেই তারা অসভ্য—কিন্তু তাতে যদি আমাদের তাক লাগে তবেই বুঝ্ব আমরা সভ্য হয়েছি। নাঃ, এ ভীষণ বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আর পিন্ ফুটিয়ে সিগারেট খেয়ে কাজ নেই। ঘুমুনো যাক। কুঁজো থেকে বেয়ারা জল এনে দিলে, প্রভাত তা দিয়ে ঘাড় ধুতে বসলো।

অশ্রুর জিনিস-পত্রের ফিরিস্তি শোন: একটা প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক—বুকে হাতি না নিয়ে এ ট্রাঙ্কটা নিলে রামমূর্তির খ্যাতি এক তিল কমতো না, প্রকাণ্ড বেডিং—তাতে বুঝি খাটের গদি থেকে শুরু করে পা পোষ পর্যন্ত আছে—ছটা ঋতুর

ছ-প্রকার শয্যার সরঞ্জাম ; তা ছাড়া ছোট দুটো স্টকেস ; একটা খাবারের বাক্স বেতের তৈরি ; একটা ফোল্ডিং রকিং চেয়ার—একটি না হলে অশ্রুর না হয় পড়া, না হয় ছুটির দিনে দুপুরে ঘুমুনো ; একটা বই-এর বাক্স কেরোসিন-কাঠে প্যাক করা ; একটা ছোট বেডিং—পথে গাড়িতে পাতবে বলে ; একটা জলের কুঁজো—ভারি চমৎকার কাজ করা—এটা ফেলে আসতে পারতো, কিন্তু অমন চমৎকার কাজ করা জিনিস বলেই অশ্রুর মায়া লেগেছে। এই সব পদার্থ প্ল্যাটফর্মে জড়ো করে অশ্রু প্রভাতকে উদার কণ্ঠে বললে—লাগেজ করো।

প্রভাতের মাথায় যেন মালগুলো একসঙ্গে পড়লো ভেঙে—কর্ণের বাণ খেয়ে ঘটোৎকচের মুখের চেহারায়ো এমনি অঘটন ঘটেনি। প্রভাত বললে—আজ পর্যন্ত মনি-অর্ডার করতে শিখিনি,—আমার দ্বারা ওসব হবে না। যদি পারো তুমিই একলা এর ব্যবস্থা করো, নইলে থাক সব পড়ে—পরপারে কিছুই সঙ্গে যাবে না।

এই নিয়ে লেগে গেল তর্ক—তুমুল, উদ্দাম। পুরুষগুলো যে মেয়ে-বিহনে একেবারে অসহায়, অকর্মণ্য—অশ্রু এ-কথা অনেক আগে থেকেই জানে। এগুলোর না আছে বুদ্ধি না আছে বোধ। প্রভাত অসহায়ের মতো মুচকে একটু হেসে বললে—বাহন একটি না হলে আমাদের সত্যিই মানায় না। গণেশের যেমন ইঁদুর। নারদের যেমন ঢেঁকি।

লাগেজ-এর ব্যবস্থা অশ্রু একাই করলো। ডাউন-ট্রেনে ভিড় নেই—জানলার দিকের বার্থটায় অশ্রু বিছানা পেতে নিলো। বললে—মাঝের খালি-গদিটার ওপর পড়ে থাকো, বুঝবে মজা।

প্রভাত হেসে বললে—আমি মাঝের বেঞ্চিটাতে বসছিই নে, তোমার বিছানাতেই আমার একটু জায়গা হবে—বসবার। শোবার সময় না হয় উঠে আসবো।

অশ্রু। শোব না হাতি!

প্রভাত। তুমি শুয়ো।

অশ্রু। আর তুমি?

প্রভাত। জেগে থাকবো। প্রতি নিশ্বাসে তোমাকে দেখব। তোমাকে ঘুমুলে নিশ্চয়ই খুব আঁটসাঁট দেখাবে না।

অশ্রু। এই, আস্তে। বলে অন্যদিকের জানলার ধারের বার্থ টায় যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে শুয়ে আছেন তাঁর দিকে ইঙ্গিত করলে।

গাড়ি দিলো ছেড়ে। স্টেশনে বুলুরা আসবে বলেও আসেনি—তাই ওদের লক্ষ্য করে সারা জলপাইগুড়ি শহরটার ওপর একটা বিষাক্ত দৃষ্টিশেল হেনে অশ্রু তর্কে মন দিলে। প্রভাত বলছিলো : মেয়েরা যে সভ্য হয়নি তার প্রমাণ—চলতে হলে হয় নেবে গুচ্ছের আণ্ডা-বাচ্ছা, নয় রাশি-রাশি মাল। কখনো কখনো দু'প্রস্থই ; ভার কিংবা ভিড়।

অশ্রু প্রতিবাদ করে উঠলো : মেয়েরা না থাকলে খেতে কি ? চলত কি করে ?

প্রভাত। এক জোড়া জুতো না হলেও আমাদের চলে না,—সকালে উঠে একটা dentifrice দরকার। মেয়েরা না থাকলে রেঁধে দেবার অসুবিধে ঘটতো, ভাগ্যিস মেয়েরা আছেন ! মই ওয়ালা না থাকলে বিকেলে কলকাতার রাস্তার গ্যাস জ্বলতো না ; রাস্তায় পড়তো না জল, জমাদাররা ধর্মঘট করলে শহরে লাগতো কলেরা। মেয়েদের উপকারিতায় আমি সন্দেহ করি নে।

অশ্রু রীতিমত খাপ্পা হয়ে উঠলো : তুমি এমনি অপমান করে কথা কইলে আমি গাড়ির শেকল টেনে দেব।

প্রভাত। তা মেয়েরা পারেন।

অশ্রু। মেয়েরা কী যে পারেন তা যদি তুমি জেনেও স্বীকার না করো সে তোমার একচোখোমি। ত্যাগে সংযমে সেবায় আত্মোৎসর্গে এমন গরীয়সী আর কোথায় পাবে ?

প্রভাত। মানি ; বুদ্ধিতে নয় !

অশ্রু। মেয়ে ছাড়া তোমাদের শৈশব অসহায়, যৌবন নিরানন্দ, প্রৌঢ়তা বিরস, মৃত্যু রুক্ষ, তৃষাক্ত।

প্রভাত। পুরুষ ছাড়া তোমাদের জন্ম আকাশকুসুম, যৌবন পঙ্গু, প্রৌঢ়তা দুর্বল, মৃত্যু বিষাক্ত।

অশ্রু। মেয়েদের দুই হাতে অজস্র সেবা, অকৃপণ তিতিক্ষা, অপূর্ব আত্মনিবেদন। দুঃখ-দুর্দিনে মেয়েরা সান্ত্বনার দীপশিখা। মেয়েরা গৃহদীপ্তি, পুরুষের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী।

প্রভাত। কবিত্ব করো, বাধা দেব না। শুনতে আমার ভালোই লাগবে। মেয়েদের নিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে মিষ্টি করে লেখা রবি-ঠাকুরের কবিতার আমি প্রকাণ্ড ভক্ত। সেগুলো সত্যকথন বলে নয়, সেগুলো নেহাৎই কবিতা বলে। যদি বলো, ভাবুকের আদর্শ উন্নত হতে হতে অবশেষে মেয়ে-মানুষের আকার নেয়, আমি তোমাদের মুখ চেয়ে সেই ভাবুককেও না হয় ক্ষমা করবো। কিন্তু সত্যি করে বলো দেখি মেয়েরা কোনোদিন কোনো বড়ো বেদনা সয়েছে বা কোনো বড়ো আনন্দের অধিকারী হয়েছে ?

অশ্রু। তুমি বলো কি ? প্রত্যেক মানবজন্মের পেছনে প্রসূতির যে তীব্র ও গভীর বেদনা আছে—তার চেয়ে মহত্তর বেদনার দৃষ্টান্ত তুমি দেখাতে পারো ? মেয়েরা বড়ো বেদনা সয়নি তো কে সয়েছে ? পৃথিবীতে মাত্র দুটি মহান ও মর্মভেদী ক্রন্দন আছে—এক সন্তান যখন হয়, আর সন্তান যখন মরে—দু'টি কান্নাই মায়ের, মেয়ের।

প্রভাত ? কথাটাকে তুমি সুন্দর করে বললে বটে, কিন্তু এক ফুঁয়ে এর ভাবের কুয়াসা উড়িয়ে দিচ্চি। প্রসবের বেদনাটা খুব বড়ো বেদনা নয়—তা হ'লে appendicitis operation করার বেদনাও তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে পাল্লা দিতে পারে। ধরো, রোগীকে ব্যথা না দিয়ে আজকাল যেমন সহজে দাঁত তোলা যায়, তেমন যদি painless delivery-র প্রচলন হয় তখন এ-বেদনার গর্ব যাবে ধূলিসাৎ হয়ে। শারীরিক কষ্টের কথা যদি বলো, ট্রামগাড়ির তলায় পড়ে যার পা যায় আটকে অথচ যে বেঁচে থাকে—তীব্র বেদনানুভবের ক্ষেত্রে তা হলে সে হিরো। আমি সেই দুঃখের কথা বলছি না। তুমি মেয়ে বলেই নিতান্ত অসহিষ্ণু হয়ে কথাটার গূঢ় অর্থ বোঝনি। বেদনা অর্থ আত্মার বেদনা, আনন্দ অর্থ সৃষ্টির আনন্দ—আত্মপ্রকাশের আনন্দ।

অশ্রু। হয় তো তেমন ঢের আছে; আমি জানি না বলে দৃষ্টান্ত দিতে পারবো না।

প্রভাত। দৃষ্টান্ত নেই বলেই জান না। তেমন ভাবুক হবার সাধনা মেয়েদের নেই। তার জীবন স্বচ্ছ, প্রশান্ত, মন্থর—স্রোতের ফেনিল উচ্ছ্বাসে আবর্তসংকুল নয়, বেগবান নয়, সন্ধানব্যাকুল নয়। তার প্রাণে না আছে তাপ, দেহে না আছে স্বাদ! আমার রেইন্-কোট্‌টার মতো—জল থেকে ত্রাণ করে এই তার উপকারিতা। পুরুষের চেয়ে মেয়ে কত খর্ব, কত সংকীর্ণ!

পুরুষ বাস করে একমাত্র বর্তমানে নয়, অতীতের সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শেখেনি, দুই চোখে তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন। পুরুষ অতীতকে সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যতের আবিষ্কারে চলেছে। জীবন তার কতো বিস্তৃত, কত অগাধ। আর, মেয়েদের জগৎ হচ্ছে সামান্য সংকীর্ণ এই ছোট বর্তমানটুকু—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে কোনো ভরসা রাখে না, বিস্মৃতির বালিতে অতীতকে সে মুছে দিয়ে এসেছে। তাই মেয়েরা জীবনে অগ্রসর হয় না, আত্মায়ো খর্ব হয়ে থাকে।

অশ্রু। যে-সমাজ খালি পক্ষপাতী পুরুষের সৃষ্টি, সেখানে মেয়েদের খর্বতা—

প্রভাত। তুমি এটা কেন লক্ষ্য করছ না আমি নারী-পুরুষের সামাজিক তারতম্য নিয়ে কথা বল্‌ছি না। আমি জানি সমাজ কৃত্রিম, বাইরের একটা খোলস মাত্র। সেখানে পুরুষ যদি অন্যায় করে তোমাদের দাবিয়ে রাখে সেজন্য তোমাদের না হয় ক্ষমা করলাম।

অশ্রু। আমাদের ক্ষমা!

প্রভাত। হ্যাঁ, তোমাদের। কারণ, সেখানেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে শক্তিতে ও বুদ্ধিতে তোমরা ছোট। কেউ কাকে পদানত করে রেখেছে—এ-ব্যাপারটার মধ্যে এক পক্ষের অত্যাচারের যতোই কেন না প্রমাণ পাওয়া যাক, অপর পক্ষের দুর্বলতাকে কি বলে অস্বীকার করবে? রাজাকে নিষ্ঠুর অত্যাচারী বলে গাল দিয়ে পরাধীন দেশের দাসত্বের না মেলে সান্ত্বনা, না বা সমর্থন। আমি জানি, সমাজ নিয়ে তোমাদের ওপর অনেক জবরদস্তি হয়েছে, আমি সে-দিক দিয়ে যাচ্ছি না, কেননা সমাজ, হয় তো কেন নিশ্চয়ই, উল্টে যাবে—কিন্তু অঙ্গারকে শতবার ধুলেও তার মলিনতা ঘুচবে না। প্রকৃতি যে বিকৃতি ঘটিয়েছেন তাকে মারবে কি করে?

অশ্রু। তার মানে?

প্রভাত। তার মানে তোমরা সেই সংকীর্ণই থাকবে, দৃষ্টি তোমাদের বর্তমানের সীমাকে অতিক্রম করতে পারবে না। ছোট স্বার্থ নিয়ে কলহ করবে, কেননা সৃষ্টি করতে বুদ্ধি ও বেদনাবোধের যে বিকাশ দরকার তোমাদের মস্তিষ্কে তার জায়গা নেই।

অশ্রু। তুমি যতই কেন না বলো—একদিকে পুরুষকে আমরা নিশ্চয়ই হারিয়েছি। সে আমাদের রূপ! কবিরা আমাদের পায়ের তলায় পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

প্রভাতে। জানি এ কথা বলে তুমি অনেকটা আশ্বস্ত হবার ভান করবে। ওটা তোমাদের no-trump-এর বড়ো bid। রূপ তোমাদের আছে—তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র, আত্মবঞ্চনার বর্ম—হাতির যেমন দাঁত, গণ্ডারের যেমন খড়্গ। শক্তি যার নেই তারই অবলম্বন হল চাতুরী। আর সেই রূপের স্থায়িত্বই বা কতদিনের? একটি দু'টি সন্তান হলেই সে-রূপ আইডিন্-লাগা মরা চামড়ার মতো খসে পড়ে—প্রসব করবার পর পিঁপড়ের যেমন পাখা খসে।

অন্য বার্থে যে ভদ্রলোকটি শুয়েছিলেন তিনি এবার উঠে বস্‌লেন। খাপ থেকে চশমাটি বার করে নাকের মাঝামাঝি বসিয়ে প্রভাতের দিকে একটি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রশ্ন করলেন: মশাইদের কতদূর যাওয়া হচ্ছে?

প্রশ্নটা শুনেই বোঝা গেলো এ-সব কথা-বার্তা শুনে ভদ্রলোকের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে ওঠেনি; তবু কণ্ঠস্বরকে বিনয়-স্নিগ্ধ করেই প্রভাত জবাব দিলো: কলকাতা। আপনি?

ভদ্রলোক বললেন—আমিও সেইখেনে! কলকাতায় কোথায় থাকা হয় মশাইদের? (অশ্রুকে লক্ষ্য করে) সঙ্গে উনি কে জিগগেস করতে পারি?

—পারেন না। বলে প্রভাত মুখ ফিরিয়ে পুরোনো কথায় ফিরে গেলো: রূপের কথা বলছিলে না? পুরুষের তুলনায় মেয়ের রূপ যেন সূর্যের পাশে জাপানি দেশলাই। পুরুষের তুলনায় খর্ব—মনে ও বাক্যে ত বটেই—কায়মনোবাক্যে। এমন "unaesthetic sex" আর আছে কোথায়? কি সাহিত্য, কি সঙ্গীত, কি ছবি—বধির, তোমরা বধির। বীঠোফেন্-ও বধির হয়েছিলেন কিন্তু সে বধিরতা তাঁর সৃষ্টি-সাধনাকে আহত করতে পারে নি; মিলটন্ হয়েছিলেন অন্ধ, কিন্তু সেই চিরসূর্যাস্তের অন্ধকারে যে-স্বর্গ রচনা করেছিলেন তার তুলনা নেই। আচ্ছা, সৃষ্টি-সাধনায় নারীকে তো কেউ 'বাধা দিতে আসেনি, সে কেন কবি হতে পারলো না, কেন পারলো না ছবি আঁকতে? উত্তর দাও, অশ্রু। প্রতিভার যে অধিকারী হয় অবস্থার বশ্যতা সে স্বীকার করে না। সে গৃহত্যাগ করে, ভাগ্যের সঙ্গে যুঝতে নিরস্ত্র হয়েই পথে বেরয়, অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে প্রতিভাকে সে একটি মহান মর্যাদা দান করে। তোমরা কেন এত নির্জীব, কেন এত ভীরু, কেন এত পরীক্ষাকুণ্ঠ? গৃহের দায়িত্বের কথা যদি তোল—তা হলে পুরুষের বেলায় পৃথিবীর দায়িত্বের কথা তুলবো। যদি সে প্রতিভার স্পর্শ পায় গৃহকে সে মানবে কেন, ভেঙে বেরিয়ে

পড়বে। প্রতিভাবানও কি তোমার এই সংসারের ready-made তুচ্ছ নিয়ম-কানুন দিয়ে বাঁধা থাকবে? সে নিজে নিজের নিয়ম তৈরি করবে, নিজের নিয়ম নিজে ভাঙবে। ধরণী দেন শস্য, তোমরা দাও সন্তান। তোমাদের দিয়ে রচনা লিখতে হলে এই বলেই উপসংহার করতে হয়। রূপ? সন্ন্যাসীরা যেমন গায়ে গেরুয়া টেনে ভণ্ডামি লুকিয়ে রাখে, তোমরাও তেমনি ছলাকলার আবরণে অন্তরের অন্তঃসারশূন্যতা ঢেকে রেখেছো। কথা কইছ না কেন?

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাঁর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিবাণে অশ্রুর সর্বাঙ্গ এমন বিদ্ধ করছিলেন যে সে অসীম বিরক্তি নিয়ে তাড়াতাড়ি মাঝের বেঞ্চিটায় ভদ্রলোকটির দিকে পিঠ করে একেবারে প্রভাতের গা ঘেঁষে বসে পড়লো। প্রভাত বুঝলো ব্যাপারটা। তু'জনে একসঙ্গে সামনের পরিত্যক্ত বেঞ্চিটায় পা ছড়িয়ে দিল—সামনে খোলা জানলার ওপারে ধাবমান অন্ধকার। আলোটা নিভিয়ে দিলে ভালো হত। কিন্তু ভদ্রলোকটি অস্পষ্ট একটি হুম্ বলে ফের তেমনি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে একটা খবরের কাগজ নিয়ে পড়েছেন এবার।

অশ্রু প্রভাতের কাঁধের ওপর মাথাটা প্রায় এলিয়ে দিয়ে বললে—কিন্তু প্রেমের বেলায় আমাকে যদি তুমি প্রাধান্য না দাও, তা হলে কথা কইবো না।

প্রভাত। তর্কের বেলায় অভিমান খাটে না। নারীর বেলায় প্রেম কখনো পরম নয়; স্নেহটা একটা instinct, সে একটা গরুরো আছে। কিন্তু প্রেমে শুধু emotion নেই intellect-ও আছে,—তোমাদের বেলায় খালি তুধের জলীয় অংশটুকু। বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে যে-প্রেম—সে যতই সত্য হোক—অনেকটা সমাজের দাবি, সংসারের স্থবিধে। বিয়ের আগে যে প্রেম—সে যতই সত্য হোক—বিয়ের পরে তার আর অস্তিত্ব নেই, সে অস্ত গেছে। বিয়ের পরে খ্যাতি বাঁচাতে একমাত্র মেয়েরাই বলতে পারে: ওঁকে আমি বোনের চোখে দেখেছিলাম, কিংবা ভাগ্নীর। মেয়েরা আত্মিক সাহসে এত অধঃপতিত যে তাদের সামান্য sense of justice পর্যন্ত নেই।

অশ্রু। তুমি মাতৃস্নেহকেও উড়িয়ে দেবে নাকি।

প্রভাত। উড়িয়ে দেব না তবে জুড়েও যে বসতে দেব এমন নয়। মাতৃস্নেহ খুব পবিত্র—ভালো ভালো পয়ার লেখা যেতে পারে ও-বিষয়ে; কিন্তু পিতৃস্নেহের সঙ্গে তার এই জন্যেই সমান আসন হয় না কারণ পিতৃস্নেহে যেখানে অহঙ্কার, আত্ম-চরিতার্থতা, মাতৃস্নেহে সেখানে মাত্র হৃদয়াবেগ, একটা

সামান্য অভ্যেস। পিতৃস্নেহ instinctive নয় intellectual—instinct-এর চেয়ে intellect বড়ো।

অশ্রু। আমি তা মানি না। যতই কেন না বিরূপ তর্ক করো, আমি চটছিনে। বলে অশ্রু আরো একটু ঘেঁষে এসে গুন্‌গুন্ করে একটা সুর ভাঁজতে লাগলো। এবার অশ্রু দস্তুরমতো প্রভাতের কাঁধে মাথা রাখলে। ব্যাপারটা এতো সাজ্ঘাতিক নয় যে ট্রেন উল্টে যাবে। তবু পেছনের বেঞ্চি থেকে ভদ্রলোকের আরেকটি নকল হুঙ্কার শোনা গেলো।

প্রভাত বললে— ভালো হয়ে উঠে বোস।

অশ্রু। বাঃ, শরীরকে একটু বিশ্রাম দিচ্ছি তাতে তোমার আপত্তি করবার কারণ কি? পুরুষদের শক্তি সম্বন্ধে এতো সব লম্বা-লম্বা বক্তৃতা দিয়ে সামান্য একটা মেয়ের খোঁপার ভার বইতে পারবে না এ-কথা শুনলে এতক্ষণের নীরব ও অনুপস্থিত মেয়ের দল টিটকিরি দিয়ে উঠবে।

প্রভাত। কিন্তু ভদ্রলোক কি ভাবছেন বল তো?

অশ্রু। তোমার সাহসের দৌড় এবারে বোঝা গেলো। তোমার ভদ্রলোক কি ভাবছেন ভেবে তো গ্রহ-তারায় কলিশান্ লাগছে। তাঁকে যা খুশি ভাবতে দাও। শরীর যখন আহত হয় রুগ্ন হয়—তখন সেই কষ্ট লোকের দেখতে খুব ভালো লাগে। সেটা বেশ সহজ, স্বাভাবিক কিন্তু শরীরকে আরাম দিতে গেলেই লোকের চোখে তা সয় না, লাগে দৃষ্টিকটু। এর কারণ কি বলতে পারো? আজ যদি আমার খুব জ্বর হয়ে কাঁপুনি হত ও তোমার কাঁধে মাথা রেখে শুতাম তা হলে দৃশ্যটা মানাতো, ঐ ভদ্রলোকের সহানুভূতিও পেতাম। কিন্তু সুস্থ শরীরটাকে একটুও মোলায়েম আয়েস দিতে গেলেই যত আপত্তি। প্রকাশ্যে ফোড়া কাটো, দাঁত তোলো—বেশ; কেউ কিছু বলতে আসছে না, কেন না শরীর কষ্ট পাচ্ছে; কিন্তু প্রকাশ্যে একটা চুমু দাও দিকি, লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাবে। নেংটি পরে সন্ন্যাসী সেজে শরীরকে কষ্ট দাও বাহবা দেবে, কিন্তু একটা গরদের আলখাল্লা পরলেই হল সে বিলাসী, হল খারাপ। কেন? শরীরটা তো প্রতিনিয়ত কষ্ট পাচ্ছেই, একটু আরাম পেতে দেখলে লোকের হিংসে হয় কেন?

প্রভাত হয় তো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, পেছন থেকে ভদ্রলোকটি রুখে উঠলেন: মশাইয়েরা কি সারা রাতই এমনি বকবক করবেন নাকি? চুপ করুন

না খানিকটা। একে ভুগছি ব্লাড-প্রেসারে, তায় যতো সব—। সঙ্গে থাকতো পাঁচকড়ি—দিতো ঠাণ্ডা করে।

কেউ চটলে তার ওষুধ হচ্ছে তাকে আরো চটিয়ে দেওয়া—মিষ্টি কথা বলে। তাই প্রভাত পেছন ফিরে অতি-বিনয়ে সদ্যব্রাহ্মধর্মদীক্ষিত যুবককে পর্যন্ত হার মানিয়ে বললে—আহা, ভারি কষ্ট হচ্ছে তো আপনার। আপনি শুয়ে পড়ুন, আলোটা নিভিয়ে দিই। বলেই উঠে সুইচ অফ করে দিলে।

গাড়িতে অন্ধকারের সঙ্গে বাতাসের বন্যা। অশ্রুকে দু'হাতে অনুভব করে নিতে প্রভাতের দেরি হল না। অন্ধকারের মতো ঘন ও উদ্বেল।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো স্টেশনে। প্রভাত বললে—চলো রেস্টুরাণ্ট কার-এ, বেটাইম হলেও কিছু খাওয়া যাক। লোক থাকলেও এর চেয়ে ভালো company পাবো।

উৎফুল্ল হয়ে অশ্রু বললে—চলো।

রেস্টুরাণ্ট কার-এ ঢুকে জানলার ধারে একটি ছোট টেবিল বেছে ওরা দু'জনে মুখোমুখি বসলো। টেবিলের ওপর দু'টো কনুইয়ের ভর রেখে সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে অশ্রু বললো—যাই বল, আমি Eudemonist!

প্রভাত শব্দটার অর্থ জানতো না; বললে—তার মানে?

অশ্রু। মানে খুব সোজা, শব্দটাই জাঁকালো। মানে হচ্ছে: যাতেই আমি আনন্দ পাবো তাই আমার ধর্ম। যেখানে আনন্দ সেখানে পাপ নেই।

প্রভাত। যেখানে পাপ আছে সেখানে আনন্দও আছে।

অশ্রু। সত্যিই আনন্দ থাকলে সেটা আর পাপপদবাচ্য রইলো না। যেখানে আনন্দ নেই অথচ কর্তব্য আছে দাসত্ব আছে, সেইটেই পাপ। যেমন ধরো, আজ যদি তোমাকে বিয়ে করি, পশু'ই সেটা পাপ হয়ে দাঁড়াবে, কেন না আনন্দ যাবে মরে। তাই করবো না বিয়ে—আনন্দকে জীইয়ে রাখতে চাই। বিয়ে বড়ো না আনন্দ বড়ো?

ততক্ষণে বয় এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। প্রভাত বললে—তোমার মস্তিষ্ক যে-প্রকার উত্তেজিত হয়েছে তাতে মিছরির জল পেলে স্বাস্থ্যকর হত; তা যখন পাওয়া যাচ্ছে না, কিছু মাংসই নেওয়া যাক আপাতত।

ছুরি-কাঁটা সরিয়ে রেখে অশ্রু আঙুলের ডগাগুলি ঝোলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা ধরো যদি মরে যাই ?

প্রভাত। ওঃ, তুমি কী morbid !

মাংস-চিবোনো বন্ধ করে অশ্রু বললে—সত্যিই, আনন্দদায়ক মুহূর্তে আমরা মৃত্যুর পদধ্বনি শুনি। দুঃখের সময় জীবন এসে উপহাস করে, কিন্তু আনন্দের সময় মৃত্যু করে আশীর্ব্বাদ।

প্রভাত। দু'জনে একসঙ্গে রেস্টুরাণ্ট কার-এ বসে কুক্কুট খাচ্ছি—এটা এমন কি আনন্দদায়ক মুহূর্ত যে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে হবে।

অশ্রু। তার মানেই তোমাদের তীব্র আনন্দানুভূতি নেই !

প্রভাত। এর আগে কোনোদিন বুঝি ফাউল খাওনি ? ফাউলেই এত, বিফ-এ বোধহয় দশায় পড়বে। অত জোরে হেসো না, নামিয়ে দেবে। যদি একান্তই মরি এ-সময়, তবে যেন কপালে একটি জীবনী-লেখক জোটে, এই প্রার্থনা করে মরবো।

অশ্রু। কারণ ?

প্রভাত। রেস্টুরাণ্ট-কার-এ বসে দুটি নরনারী ঝোলমাখা মুখে চুমু খেতে-খেতে একসঙ্গে হার্ট-ফেল করে মরে গেল, এ-খবরটা পেলে অনেক জীবনী-লেখকই কলম উঁচিয়ে আসবেন। রয়টারে এ-খবরটা উঁচু দামে বিক্রি হয়ে, সুদূর পৃথিবীতে পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়বে। যাদের জীবন যত ব্যর্থ তাদের জীবনী তত জমে। সেই জন্যেই রবিঠাকুরের জীবন-স্মৃতিটা কিছুই হয়নি। জীবনী লিখতে বসে ঘোমটা টানাকে আমি সইতে পারি না। একটা পরিপূর্ণ উদ্ঘাটন চাই।

অশ্রু। তার জন্যে অতি তুচ্ছ ঘটনার বিবৃতি করতে হবে ? কখন খেলো কখন আঁচালো।

প্রভাত। না। জীবনের বড়ো বড়ো উপলব্ধির কথা বলতে হবে—বড়ো বড়ো আবিষ্কারের কথা, সেই উপলব্ধির পেছনে হয়তো নিদারুণ স্খলন আছে, মহান অধঃপতন ! অথচ তাকে এড়িয়ে ভালোমানুষটি সেজে ধর্মভীরু জনতার বাহবা নেওয়ার মতো কাপুরুষতা আর কি আছে ? খালি কবিকে জানবো মানুষকে জানবো না—সে-জানা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। জানো অশ্রু, ব্রাহ্ম-সংস্কার আমাদের এ বিষয়ে দারুণ ক্ষতি করেছে। আমরা বড়ো বেশি রকম prude, মিন্‌মিনে,

খুঁৎখুঁতে। প্রকাশব্যাপারে আমরা নিতান্তই দুর্বল, লাজুক, মুখ-চোরা। তাই সাহিত্য আমাদের মেয়েলি থেকে যাচ্ছে—বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

কথাটা অশ্রু এড়িয়ে গেলো। দাঁত থেকে আঙুল দিয়ে মাংসের ভুক্তাবশিষ্ট অংশ বের করে বললে—যাই বলো, খুব সুখী জীবন নিয়ে ভালো জীবনী জমে না। সত্যিই, ব্যর্থতাটাই বেশি মজার! রানী এলিজাবেথের চেয়ে জোয়ান্ অফ আর্ককে এই জন্যেই ভালো লাগে যে, বেচারিকে পুড়ে মরতে হয়েছিল। Austerlitz-এ নেপোলিয়ান-এর যুদ্ধের খ্যাতি বহু-কীর্তিত, কিন্তু তোমার কি মনে হয়না St. Helena-তে এসেই তিনি অমর হলেন! বাইবেল পড়েছ?

প্রভাত। না।

অশ্রু। বাইবেলে কথিত আছে Elijah এমন-কি মরেন নি পর্যন্ত, রথে করে স্বর্গে বাহিত হলেন। অমন একটা সাজ্ঘাতিক রকমের গৌরবময় জীবন নিয়ে কোনো বড়ো লেখা হতেই পারে না। মহাভারতে কোন নারী-চরিত্র তোমার ভালো লাগে?

প্রভাত। কাদের ভালো লাগে না একধার থেকে নাম বলে যেতে পারি: গান্ধারী, কুন্তী—

অশ্রু। একটি মাত্র মেয়েকে আমার ভালো লাগে,—সে দ্রৌপদী।

প্রভাত। কারণ?

অশ্রু। একজনকে ভালবেসে পাঁচজনের হয়ে গেলো। এমন আর একটা ব্যর্থ আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত তুমি সমস্ত স্বর্গ খুঁজেও পাবে না।

প্রভাত। কিন্তু সে-ব্যর্থতাবোধ দ্রৌপদীর ছিল না।

অশ্রু। সেটা আরো দুঃখদায়ক।

প্রভাত। বাঃ, যেখানে বোধ নেই, সেখানে দুঃখ কোথায়? তুমি তা একবারো বোধ করছ না যে তাজমহলের নীচে না শুলে ভীষণ দুঃখ, কিন্তু মমতাজকে তুলে আনতে গেলেই দেখবে তাজমহলটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্-এর অধম হয়ে গেছে।

অশ্রু। কিন্তু দ্রৌপদী polyandry নিয়ে সে-যুগে এতো বড়ো একটা আধুনিক experiment করলো, কৃতকার্য হতে পারলো না। যাকে সে অর্জন করেছিল সে-অর্জুনকে সে পাঁচজনের মধ্যে একজন করে দেখতে পারলো না। এটা কম ট্র্যাজিডি?

খাওয়া ফুরিয়ে গেলো, কিন্তু পরের স্টেশনের তখনো দেরি আছে। অগত্যা ছুটো স্যাণ্ডউইচ ও ছু' পেয়ালা চা'র অর্ডার দিয়ে প্রভাত তার বুকপকেট থেকে এক কবিতা বার করে বললে—তবে শোনো :

দু'টি হাত জোড় করি প্রথমে প্রণাম,
তার পরে হাত গিয়ে বাসা বাঁধে হাতের কুলায়ে
শীতল নরম,
তার পরে কথা নাই, চুপচাপ, একটু বা ঘাম,
তার পরে ঠোঁট ভাঙে অধরের পাথরের ঘায়ে—
এ-রকমি শুনেছি নিয়ম।
তার পরে? তার পরে আর কি শুনিবে?
মাথার উপর থেকে আকাশ গিয়েছে হয়ে চুরি।
একদম ফাঁকা!
বাতাস ফুরায়ে গেছে এক শ্বাসে, সূর্য গেছে নিবে,
তার পরে কবিতার খোলা খাতা রহে কোল জুড়ি,
তার পরে ভাষা ভুলে থাকা॥

ঢোঁক গিলে প্রভাত বললে—মানেটা বুঝতে পারছ তো?

অশ্রু। তার মানে, কি রকম হয়েছে আমার থেকে একটা মত চাও?

প্রভাত। তোমার মতকে আমি প্রাধান্য কোনো কালেই দিতে রাজি নই, বিশেষত সাহিত্যালোচনায়,—তবু যখন শোনালামই, মত জানতে চাওয়াটা স্বাভাবিক।

অশ্রু। ছাই হয়েছে। প্রেমাস্পদা অন্তর্হিত হলে ও-রকম একটা অসহায় ভাব নিয়ে হাত পা ছড়িয়ে কবিতার খাতা নিয়ে বসে থাকতে হবে—এ-দুর্বলতা ও অস্বাস্থ্য সইতে পারি না।

প্রভাত। তার মানেই, তুমি কিচ্ছু বোঝনি। কবিতাকে তোমরা হিতোপদেশ ছাড়া অন্য কিছু বলে কবে বুঝবে? এ শুধু একটা মানস-ভঙ্গির বর্ণনা,—এটা ভালো না মন্দ এ নিয়ে কে মাথা ঘামাতে বসেছে! খালি কোলাহলই করতে পার, রসগ্রাহিতা তোমাদের নেই। অস্থির হয়ো না, আমি প্রমাণ দিচ্ছি। থিয়েটারে মেয়েদের মতো কাউকে চেঁচাতে শুনেছ? সেই জন্যে গ্রীসে থিয়েটারে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো।

অশ্রু। কবিতা-বোঝার সঙ্গে থিয়েটারে ঢোকবার সম্পর্ক কি?

প্রভাত। সম্পর্ক এই, ললিতকলাচর্চায় তোমাদের দান করবার যদি কিছু থাকে, তা হচ্ছে কোলাহল! তোমাদের বুঝতে হবে বলেই সব-কিছুকে 'কথামালার' স্তরে নামিয়ে আনতে চাও। কিন্তু তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি কবিতা লিখিনি,—আমার Muse যদি খুশি হন, তাই ঢের।

অশ্রু। তোমার কবিতা ভালো হয়নি, এ-কথা বলার যদি আমার স্বাধীনতা না থাকে তবে আমাকে তুমি বৃথাই পরিশ্রম করে কবিতা শোনালে! কেন ভালো হয়নি, তার একটা যুক্তি পেলে তুমি খুশি হও বুঝি, কিন্তু কেনই যে ভালো হয়েছে, তাই বা তুমি বোঝাতে পারবে? যতই কসরৎ কর, রবীন্দ্রনাথের সিংহাসন আর কাড়তে পাচ্ছ না। তিনি বাঙলা সাহিত্যে চিরজীবী।

প্রভাত। হোন চিরজীবী, তাঁর আয়ুর অঙ্ক মহাকাল কষবে। কিন্তু তিনি চিরকাল বিরাট পর্বতের মতো পথ জুড়ে বসে থাকবেন আর আমরা সমস্বরে তাঁর সাহিত্যিক দীর্ঘায়ুতার জন্যে জয়ধ্বনি করবো, আমাদের সময় এত অপর্যাপ্ত নয়। রবীন্দ্রনাথকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবার মানেই বাঙলা সাহিত্যটাকে রসাতলে পাঠানো। যে-রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাধা হয়ে আছেন আমাদের বাঁচতে হলে তাঁকে আঘাত করতেই হবে।

অশ্রু। তুমি যে এখুনি কোমর বেঁধে লড়াইয়ে লাগলে দেখছি। যারা যতো বেশি দুর্বল যতো শ্লথপ্রাণ তাদেরই আস্ফালন বেশি। চমকের চকমকি ঠুকতে পারলেই তাদের চরম আত্মতৃপ্তি। এক লাফে সিঁড়ি ভাঙতে চায় acrobat-রা, আর্টিস্টরা নয়। রবীন্দ্রনাথকে ডিঙোনো সোজা, সমকক্ষ হওয়াই কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ।

প্রভাত। জানো, কোনো স্বপ্নাবিলাসীই সত্যিকারের কবি নয়—অন্তত বিংশ শতাব্দীতে নয়। খালি মলয় হাওয়া আর জ্যানাটোজেনে খাঁটি মাটির সাহিত্য হয় না—

অশ্রু। আকাশের সাহিত্য হোক—তারই বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য আমরা চাই। মাটির নাম করে আমরা পাঁকের উপাসক হতে চাই না।

প্রভাত। হাতে যার ধুলো লেগে নেই, ললাটে যার শ্রমের স্বেদবিন্দু শোভা পেল না, গায়ে যার লাগেনি দারিদ্র্যের আঘাত—তেমন কবিকে আমরা

মেঘলোকে নির্বাসন দেব। মেঘ-তরঙ্গ, আকাশ-ঝটিকা—ঢের হয়েছে ; এখন চাই মাটি, প্রতি দিবসের সংগ্রাম, প্রতি দিবসের পাপ !

অশ্রু। কিন্তু প্রতি দিবসের সেই পরিচয়টাই পৃথিবীর বড়ো পরিচয় নয়। মানুষ যখন মরে তখনো তার চোখ অর্ধ-নিমীলিত থাকে, জীবনকে দেখবার জন্যেও চক্ষু আমাদের অর্ধ-উন্মীলিত রাখতে হবে। চোখ দুটো বড়ো করলেই বড়ো কোরে দেখা হয় না রবীন্দ্রনাথ খুব প্রকাণ্ড আর্টিস্ট বলেই জীবনকে এমন সত্য—রহস্যাচ্ছন্ন বলেই সত্য—করে উদ্ঘাটিত করেছেন ! আর তোমরা অতি-আধুনিকেরা সেই জীবনকে বীভৎস, বিকৃত, বিশ্রী করে দেখাচ্ছ। তোমরা বিংশ শতাব্দীর ব্যাধি।

প্রভাত। তুমিও দেখছি সাধারণ riffraff-এর দলে। গত কাল যা হয়ে গেছে এদের পক্ষে তাই বড়ো নজির। অতীতের লাঠি দিয়ে তারা বর্তমানকে প্রহার করে। তোমাদের রবীন্দ্রনাথকেই ধরো না। 'নষ্টনীড়' রচনা করে তিনি তখনকার বাঙলা-সমাজে যে অনিষ্ট করেছেন বলে অভিযোগ শোনা গেছল, সেই 'নষ্টনীড়'ই এখন অতি-আধুনিকদের কাছে সংযম-শিক্ষার standard হয়েছে। কে জানে দশ বছর বাদে এই অতি-আধুনিকদের অসংযমই তুলনামূলক সমালোচনায় পরবর্তী সাহিত্যিকদের কাছে মনে হবে বিরস, মিথ্যা এবং সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ নয় বলেই কুৎসিত। তুমি খানিক আগে জোয়ান অফ আর্কের নাম করেছিলে না? তারই দৃষ্টান্ত নাও। ১৪৩১ খৃস্টাব্দে তাকে ঈশ্বরনিন্দার জন্য পুড়িয়ে মারা হল, পঁচিশ বছর পরে সেই ডাইনি মেয়েকেই ফের গির্জা নবজীবন-দান করলে, ১৯০৮ খৃস্টাব্দে তার প্রায়শ্চিত্ত হল, ১৯২০-তে সে হল canonized ! আজ যাকে তুমি ব্যাধি বলছ সেই এককালে হবে বিশল্যকরণী। না-ও হতে পারে। তার জন্যে ভীরুর মতো জীবনকে সম্পূর্ণ জানা ও জানানোর থেকে নিজেকে সঙ্গোপনে বঞ্চিত রাখবো—এ আর্টিস্টের ধর্ম নয়। গ্যয়টের Die Leiden des Jungen Werthers (উচ্চারণ ঠিক হয়নি নিশ্চয়ই) পড়ে অনেক লোক নাকি আত্মহত্যা করেছিল। পরে গ্যয়টকে জিজ্ঞাসা করা হল, এতগুলি মৃত্যুর জন্যে তিনি নিজেকে দায়ী মনে করে দুঃখবোধ করছেন কিনা। গ্যয়েট হেসে বললেন : মরতে দাও ওদের—জীবনে আরো অনেক কলঙ্ক আছে, আরো অনেক কুশ্রিতা। প্রচুর, প্রচুর ; এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। অতি-আধুনিকের লেখা পড়ে কেউ যদি ভ্রষ্ট

হয় তবে উত্তর দেব : হতে দাও, এই উনিশ শতাব্দীর পাপ ও দুঃখের জন্যে অন্তত অতি-আধুনিকরা দায়ী নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে যদি কেউ প্রেমে পড়ে আত্মহত্যা করে তবে তোমাদের রবিঠাকুর কি তাঁর বইগুলি পুড়িয়ে ফেলবেন? তিনিও কি বল্‌বেন না : মরতে দাও ভীরুদের। কিন্তু আর না, স্টেশন এসে গেছে। এসো প্লাটফর্মে হাঁটি। আজ রাত্রে আর ঘুম হচ্ছে না।

প্লাটফর্মের যেখানটায় চেঁচামেচি একটু কম সে-রকম একটা জায়গা বেছে নিয়ে অশ্রু ও প্রভাত পাইচারি করতে লাগলো। গাড়ি ছাড়তে দেরি আছে। নতুন করে কথা শুরু করবার মতো আবহাওয়া পেয়েই প্রভাত বলে চললো : অতীতে অভ্যস্ত জনসাধারণ আমাদেরকে যার জন্যে নিন্দে করছে সে-ই আমাদের প্রথম গুণ, আমাদের প্রধান মূলধন! আমরা সেই নিন্দনীয় গুণেরই অনুশীলন করবো—সে-ই আমাদের নিজস্বতা। আমরা নিজস্বতা বর্জন করবো না—আমরা ততোটা নির্ভীক। প্রত্যহের পৃথিবী নিয়ে public-এর কারবার, তারা অসাধারণের আবির্ভাবে উদ্‌ব্যস্ত হতে চায় না,—তারা আরামলোভী, যা কিছু ভূতপূর্ব তারা তাদের ভূত! ওদের কথায় আমরা কান পাতি না—সে-ই আমাদের বড়ো বিজ্ঞাপন। ওরা ঝড়কেও ঢেলা মারে, বন্যার জলেও থুতু ছিটোয়। সত্যি অশ্রু, যে-আর্টিস্ট এই public-এর সঙ্গে চিরকাল মিতালি পাতিয়ে কায়ক্লেশে কলম বাঁচিয়েছে—কলমের খোঁচা মেরে এদের অস্থির, ক্ষতবিক্ষত করে দেয়নি—সে কখনোই বড়ো হতে পারেনি জেনো। যারা মাঝারি তারাই করে মীমাংসা, যারা করে মীমাংসা তারাই জেনো মাঝারি। বরং মূর্খ ভালো, মাঝারিকে সইতে পারবো না। আমাদের সঙ্গে public-এর চিরজন্মের বিরোধ—তাদের আমরা ঘাড় ধরে নবপ্রভাতের দেশে টেনে নিয়ে যাব ; যতই তারা হাত-পা ছুঁড়ুক, যেতে তাদের হবেই। তখন আবার দেখবে তারা আর সেখান থেকে এগোতে চাইছে না। Public থেমে থাকতে চায়, ওরা ভীরু, সন্দিগ্ধ। আমরা এই জনতার শত্রু, জনতার মুক্তিদাতা।

খারাপ হওয়ার কথা বলছো? সন্নেসিনি দেখেও লোকের কামোদ্রেক হয় বিশ্বাস করো? কালীর চরণামৃত খেয়ে একজন কলেরা হয়ে অক্কা পেয়েছিলো সে-খবর রাখো? Angleo-র ট্র্যাজিডির কথা জান তো? জানো না? Isabela-র মতো পবিত্র, তাপসী মেয়েকে দেখে তার জীবনে ঘটলো পরম অধঃপতন। চৈত্রসন্ধ্যা এলেই অধরে চুম্বনস্পৃহা জাগে কেন? আমরা কী করে

খারাপ না হয়ে পারি? আমাদের চামড়ার নিচে যে রক্তস্রোত বইছে তা-ই আমাদের মাতাল করে রেখেছে। যতদিন একলা ছিলাম, ভালো ছিলাম, চরিত্রবান ছিলাম। তারপর তুমি এলে। চরিত্র আর ঠিক থাকে কি করে?

গাড়িতে উঠে দেখা গেলো ভদ্রলোক তাঁর দিকের জানলা তিনটে তুলে দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আলো নেভানো, পাখা চলছে। হাইজিন-এর এটা কি-রকম নিয়ম ঠিক নিরূপণ করবার চেষ্টা না করে, অশ্রু আর প্রভাত এবার বেশ স্বচ্ছন্দে যথেষ্ট ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে পারলো। ফটো তুলে রঙ চড়ালে রাধা-কৃষ্ণের অসম্মান হতো না। ভাগ্যিস্ এটা শুক্লপক্ষ নয়; চাঁদ উঠলেই দৃশ্যটা হতো ফিকে, কথা-বার্তা হতো মাজা-ঘসা, পালিশ-করা। প্রেমের ব্যাপারে কবিরা চাঁদকে কেন যে এত আস্কারা দিয়েছেন বলা কঠিন। অন্ধকারে কত সুবিধে।

এইখেনে অশ্রু ও প্রভাতের মুখ না এঁকে যদি ওদের দেহভঙ্গি দুটোকে নন্দলাল বসুর সূক্ষ্ম রেখায় এঁকে দেওয়া যেত তো ভালো হত। অমন pose-এর জন্যে কন্টিনেন্টের বড়ো-বড়ো আঁকিয়েরা পর্যন্ত বড়ো-বড়ো দাম নিয়ে আসতেন। কথায় সেটা আঁকতে গেলে বেশি-রকম স্থূল হয়ে পড়বে। বেশি কথা বলাও মুস্কিল। ভাষায় সব কথা খুলে বলার লোভ এমন প্রচণ্ড হয় যে সুর যায় কেটে। ওরা পাশাপাশি বসে, মাঝের বেঞ্চিটাতে প্রভাতের প্রসারিত পা-র ওপর অশ্রু আলগোছে তা'র পা দু'টি তুলে দিয়েছে এবং কাজে-কাজেই centre of gravitation-এর স্থান-পরিবর্তন হওয়ার দরুন অশ্রুর মাথা প্রভাতের কাঁধের ওপর পড়েছে এলিয়ে; এবং দু'জনে নেহাৎই কথা কইছে বলে ওদের গালে গাল লাগতে পারছে না। ওটুকুর ব্যবধান না থাকলেই যেন ওরা ধরা পড়ে যাবে।

প্রভাত বললে—আচ্ছা ও-কবিতা তো তোমার ভালো লাগেনি। হস্টেলের কমপাউণ্ড থেকে তোমার সেই বিদায়-নেওয়া ব্যাপারটা নিয়ে কিছু একটা লিখবো ভাবছিলাম; মাত্র চার লাইন হয়েছে। শোনো:

বক্ষের সম্মুখে আসি যবে তুমি মাগিলে বিদায়,
ভয়কুণ্ঠ দু'টি স্তন শিহরিল উত্তপ্ত আশ্লেষে:
পলক পতন মাত্র সহিল না; বুঝিলাম হায়,
চুম্বনের কালটুকু ফুরায়েছে চুম্বনের শেষে।

অশ্রু বলে উঠলো : অশ্লীল।

বলা-য় লাভ হলো এই অশ্রুর মাথাটা তার লোভনীয় উপাধান হারালো। প্রভাত সোজা হয়ে উঠে বললো, বললে—কেন অশ্লীল? চুম্বন আর স্তন আছে বলে? চা খাওয়া বলতে পারবো, চুমু খাওয়া বলতে পারবো না? তোমার ফুস্‌ফুস্‌ বলতে পারবো, বুকের পাঁজরা বলতে পারবো, স্তন বলতে পারবো না? লক্ষ্মণ যে সূর্পণখার স্তন কেটে ফেলেছিলো, কৃষ্ণ যে পুতনার স্তনাগ্র দংশন করে তাকে ঠাণ্ডা করলে সেগুলো অশ্লীল?

অশ্রু উঠলো হেসে; বললে—মোটেই তার জন্যে নয়; একটি মাত্র 'হায়' ঢুকে ব্যাপারটাকে বিশ্রী করে তুলেছে। নইলে চলনসই হয়েছে। ওখানেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত,—এর পর অগ্রসর হলে তোমাকে পুলিশে ধরবে।

প্রভাত রীতিমত খাপ্পা হয়ে উঠলো : পুলিশে ধরবে? অশ্লীলতার জন্যে? দুর্নীতির জন্যে? জানো অশ্রু, heresy-এর ভয়ে মধ্যযুগে কোনো বড়ো সাহিত্য হলো না, বিংশ শতাব্দীতেও কোনো বড় সাহিত্য হবে না এই morality-র ভয়ে। কথাটা অবিশ্যি জর্জ ম্যুর-এর।

অশ্রু। যারই হোক, তোমরা অতি-আধুনিকেরা এতো সব অশ্লীলতা লিখছ যে রীতিমত তোমাদের পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া উচিত।

প্রভাত। কিন্তু বিচার করবে কে? এ তো আর জমির চৌহদ্দি-বিচার নয়; এখেনে চাই সূক্ষ্ম রসবোধ, সূক্ষ্মতর কবিমনীষা—তোমাদের দেশের কটা বিচারকের তা আছে? আমেরিকা তো ভীষণ শিক্ষিত ও সভ্য দেশ, কিন্তু সেখানে *Replenishing Jessica*-র বিচারের সময় জুরিরা যে-বিদ্যার পরিচয় দিয়েছেন তা শুনলে তুমি হাঁ হয়ে যাবে। বারো জনের মধ্যে তিনজন রাত-কাণা বলে কোনোদিন কোনো বই-ই পড়েন নি, আটজন সমসাময়িক সাহিত্যের কোনোই খবর রাখেন না, বাকি একজন স্পষ্ট স্বীকার করলেন : বাড়িতে আমার হয়ে আমার স্ত্রী-ই পড়াশোনা করেন! এরাই তো করবে আমাদের বিচার? পুলিশের হাতে ভারতীর এই বলাৎকার (কথাটা অবিশ্যি অতি-আধুনিক নয়) অসহ্য।

অশ্রু। তোমরা যে-রকম বাড়াবাড়ি করছ তাতে শঙ্কিত হবার কারণ ঘটেছে।

প্রভাত। বেশি দামের আরব্যোপন্যাস বা ব্যাসের মূল মহাভারত না হয় লোকে কিনতে পারবে না, কালিদাসের সমাস ভেঙে ভেঙে সংস্কৃত পড়বার ধৈর্য্য

হয় তো অনেকেরই নেই, ভারতচন্দ্র যোগাড় করা অনেকের পক্ষে দুষ্কর,—কিন্তু চার পয়সা দিয়ে খবরের কাগজে যে legal intelligence কিনতে পাওয়া যায় তা তুমি ঠেকাবে কি করে? দু' পয়সার বাঙলা কাগজগুলোও ধর্ষণ-বৃত্তান্তে ঠাসা। সেখানে তো উপন্যাস নয় যে উড়িয়ে দেবে, মোটা সত্য কথা—প্রত্যক্ষ ও নিষ্ঠুর। তা পড়ে পাঠকদের নৈতিক অবনতি হয় না? বেছে বেছে ঐ খবরগুলোর প্রাধান্য দেওয়ার কোনই উদ্দেশ্য নেই? তোমার সাহিত্যের বেলায় চরিত্র টল্‌মল্‌ করে ওঠে। তা হলে law-reports অশ্লীল, বাড়িতে পারিবারিক চিকিৎসার জন্যে আনা হোমিওপ্যাথিক বই অশ্লীল, দেয়ালে টাঙানো কালীর মূর্তি অশ্লীল, নিরাকার ব্রহ্ম অশ্লীল, —কেননা, প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কোনো অঙ্গই তাঁর নেই।

অশ্রু। Law-reports বা ডাক্তারি বইয়ের মর্ম বুঝতে হলে specialisation দরকার।

প্রভাত। সাহিত্যের বেলায়ই সে specialisation-এর কথা উঠবে না কেন? তুমি পদ্যমালা শেষ করেই পড়তে যাবে ভারতচন্দ্র, *Nursery Rhyme* পড়েই হুইটম্যান, বড়লেয়ার, বায়রন? এই আস্পর্দ্ধা তোমার আসে কেন? ছেলের হাতে Rabelais বা Boccaccio পড়তে পারে এ ভয় যতখানি, ছেলে তার দাদার Anatomy-র বই খুলে genital organs-এর ছবি দেখে ফেলতে পারে—এ ভয়ো কম নয়। পরিণত বয়সের চিন্তাকে শিশুর বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করে তুলবো—এ জবরদস্তি সাহিত্যের বিচারেই উঠে থাকে। ছেলেদের তো সিগারেট খাওয়া অপরাধ—সেই জন্য আমি খাবো না সিগারেট? বলে প্রভাত একটা সিগারেট ধরালো: তুমি কবে খেতে শিখবে?

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রভাত বলে চলল: তুমি হেন্‌রি ভিজেটেলির নাম শোননি। তিনি ছিলেন এক দুর্দ্ধর্ষ প্রকাশক—তেমন প্রকাশক বাঙলা দেশে ক' শতাব্দী বাদে আসবে বলা যায় না। Zola-র ইংরিজি অনুবাদ তিনি ছাপিয়েছিলেন, তা ছাড়া তাঁর প্রিয় গ্রন্থকার ছিল সব অশ্লীল লেখক: Flaubert, Goncourt, Gautier, Murger, Maupassant, Paul Bourget। তাঁকে পুলিশে ধরলে, তাঁর অপরাধ এত জঘন্য বলে বিবেচিত হলো যে তিনি তার পক্ষে একটা উকিল পর্যন্ত পেলেন না। সত্তর বছর বয়সে তাঁর তিন মাস জেল হয়ে গেল। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে, অশ্রু, ভিজেটেলি

তবু জোলার হুবহু অনুবাদ করাননি,—'an expurgated Zola outraged the sloppy Victorians!' এখন এই জোলা ইংলণ্ডেও বহুবরেণ্য! তোমার বইয়ের বাক্সে হ্যাভ্‌লক এলিসের *The Psychology of Sex*-এর দু' তিনটে ভল্যুম দেখলাম। এলিস্ এখন ঋষিতুল্য বলে বিশ্বকীর্তিত, কিন্তু এই এলিস্‌কেই একদিন রাজদ্বারে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল—ইংলণ্ডে বই তাঁর ছাপা হল না। তেমনি দেখো একদিন অতি-আধুনিকদের অশ্লীল বই-ই স্কুলপাঠ্য হবে—সুইন্‌বার্ণ হয়েছে, হুইট্‌ম্যান হয়েছে—অথচ জীবদ্দশায় এঁদের কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি।

অশ্রু। সমাজে যে-রুচি প্রচলিত আছে তাকে নষ্ট করতে এলে নিশ্চয়ই ইষ্ট হয় না। সমাজ ওঠে ক্ষেপে।

প্রভাত। এককালে মেয়েদের সেমিজ-পরাটা সমাজের রুচিতে বাধতো; তখন ব্লাউজের প্রচলন হয় নি বলে উত্তমাঙ্গ সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ আব্রু ছিলো না। সেও একটা রুচি। এখন সে-কথা স্বপ্নে ভাবলে তোমরা স্বপ্নে জিভ কাটবে—গরমের দিনে খালি গায়ে শুয়েও। এককালে সহমরণে যাওয়াটা খুব উচ্চাঙ্গের সতীধর্ম ছিলো; এখন সে-অনুরোধ করলে তোমরা assault-এর চার্জ আনবে। বরং দু'রাত্রি শোক করা সোজা, চিতেয় উঠে চিৎকার করাটা বর্বরতা। রুচির কথা বোলো না। ইংরেজ মেয়েরা দেখায় বুক, বাঙালি মেয়েরা পিঠ, আর হিন্দুস্থানি মেয়েরা পেট। সুচিরকালের জন্যে কোনো রুচিই আটকে থাকে না। সব দেশেই সব সমাজেই রুচি তার চেহারা বদ্‌লাচ্ছে। জাপানে ও রাশ্যায় মেয়েরা একসঙ্গে উলঙ্গ হয়ে স্নান করে—শুনে তুমি নিশ্চয়ই লজ্জায় নেতিয়ে পড়ছ—আমাদের কাছে এ-ফ্যাশান দস্তুরমতো অশ্লীল—ইংরেজদের কাছেও। এককালে ইংলণ্ডে মেয়েদের স্কার্ট জুতো ছাড়িয়ে রাস্তার ওপরে পড়ে ধুলো না ঝাঁট দিলে আর রক্ষে ছিলো না, এখন সে-স্কার্ট হাঁটুর ওপর উঠেছে। পায়ের কোন point-এ এসে অশ্লীল বলে থামতে হবে বলতে পারো? তিরিশ বছর আগে ankle দেখে যে চাঞ্চল্য হত এখন হাঁটু দেখে তা হয় না: ডিকেন্সের সময় যা বুক বলে নিন্দিত হত এখন তা মাত্র কাঁধ! কিন্তু, আবার শুন্‌ছি স্কার্টের নাকি অধঃপতন ঘটছে, অর্থাৎ ফের নিচে নেমে আসছে; এর যুক্তিটাও রুচিবৈষম্যের পরিচয় দেবে। কারণ নাকি এই: অনাবরণ সৌন্দর্যকে বাধা দেয়। সৌন্দর্য আসলে হচ্ছে

ইসারা, রূপে নয়, রেখায়; রাসে নয় রসে; রহস্যে অর্থাৎ গোপনতায়। তাই এখন আবার সমস্ত শরীর ঢেকে ফেলবার জন্যে সবাই ঝুঁকে পড়েছে দেখছি। কখন আবার উলটোটা হবে কেউ বলতে পারেনা।

অশ্রু। তোমাদের মাথা খেয়েছে যতো পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য। আমাদের সাত্ত্বিক দেশে তোমরা যে-সব ভাব আমদানি করছ তাতে হাওয়া বিষিয়ে উঠেছে। য়ুরোপের ছাড়া-কাপড় পরে তোমরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে যে সমস্যার সমাধানে কলম শানাচ্ছ সে-সব সমস্যাই ধোঁয়া, মনগড়া! য়ুরোপে যেটা জীবন-মরণের কথা, সেটা তোমাদের কাছে রঙিন ভাববিলাসিতা মাত্র।

প্রভাত। মুস্কিল এই, সাত্ত্বিক দেশের শিবের যে-পুজোর প্রথা আছে তা শুনে মিস্ মেয়োর মূর্চ্ছা হয়েছিলো। গৌহাটির কামাখ্যা আমাদের সব চেয়ে বড়ো দেবী। ভারতবর্ষের মন্দিরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে এস দয়া করে। দরজা-জানলা বন্ধ রেখে যে-হাওয়া আমরা বিষিয়ে তুলেছি তাকে আমরা মুক্তি দিয়ে পবিত্র করতে চাই। আমরা আজ ছোট শহরের ছোট গলির বাসিন্দা নই, বিরাট পৃথিবীতে আমাদের বাসা, সব মানুষের বেদনা আমাদের নিজের বেদনা। আমাদের সমাজে সমস্যা নেই তো কোথায় আছে? পরাধীনতাই বড়ো সমস্যা; তারপরে sex। এই যে দিনের পর দিন নর-নারীর সুচির ব্যবধান চলেছে এটা কি দেশের পক্ষে খুবই শুভ? যে-দেশে নর-নারীর স্বাধীন বন্ধুতার স্থান নেই—সে-দেশ উঠবেই তো বিষিয়ে। পাশ্চাত্ত্যের ভাব আমদানি করছি বলে যে অভিযোগ করছ তারো ভারি মজা আছে। বাঙলায় যেটা অশ্লীল, সংস্কৃতে সেটা নয়, ইংরিজিতে তো নয়-ই। আবার জার্মানিতে যেটা অশ্লীল নয় সেটা ইংরিজিতে জঘন্য। Dreiser-কে যখন তার *Sister Carrie*-র জন্য ধরলো (পড়নি বইটা? আমার কাছে আছে।) তখন সে বললে কি জান: আমার নাম Dreiser না হয়ে যদি Dreisershefsky হত আর আমি যদি আমেরিকা থেকে না এসে Warsaw থেকে আসতাম তা হ'লে কপালে এই দুঃখ থাকতো না। কিন্তু তা যখন নয়, বিদায়! গ্রাম্য খাঁটি ভাষায় লিখতে গেলেই মুস্কিল, খুব পোষাকি করে লেখ, মানিয়ে যাবে। ইংলণ্ডে বইয়ের দাম কম হলে অশ্লীল, বই মাকে উৎসর্গ করলে আর অশ্লীল নয়।

অশ্রু। তুমি sex-কে আমাদের দেশে খুব বড়ো সমস্যা বলে মনে কর?

প্রভাত। নিশ্চয়ই! হথর্নের মতো তাকে আমি ফুল নাই বললাম, তবে

ঐ সমস্যাটার উপযুক্ত সমাধান হয়নি বলেই এত অস্বাস্থ্য, এত চিত্ত-দারিদ্র্য। আমরা হাত বাড়িয়ে প্রতি কাজে নারীর সাহায্য পাই না, তাই কাজ আমাদের কাছে উৎসব হয়ে ওঠেনি। এই আড়াল যদ্দিন না ঘোচে তদ্দিন sex বানান করতে গেলেই আমাদের দাঁত ভাঙবে। তাই আমাদের সাহিত্য মেয়েদের ব্রতকথার সামিল হয়ে উঠতে না পারলেই শিবের জটায় গঙ্গা গেলো শুকিয়ে। এমন বই লেখা চাই যা স্বচ্ছন্দে মেয়েদের পড়ার টেবিলে পড়ে থাক্‌তে পারবে —যা বাপ-মা-ভাই-বোন মিলে পড়ে কাঁদতে পারবে। কিন্তু জীবনে এমন সব ব্যাপার নিত্যই ঘটছে, অশ্রু, যাতে আমরা বাপ-মাকে নিমন্ত্রণ করলেও তাঁরা আসতে লজ্জা পাবেন। সাহিত্যের বেলায় তাঁদের এই অভিভাবকত্বের অর্থ কোথায়?

অশ্রু। কিন্তু সাহিত্য খালি যে যৌনসম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করবে এ-অস্বাস্থ্যও বা তুমি সমর্থন করছ কি করে? জীবনব্যাপারে ওটাই কি summum bonum?

প্রভাত। যদি বলি, তাই, আমাকে কী ভাববে জানি না। মানুষের যতো কিছু বৃহত্তর উপলব্ধি সব এই sex-এর সাহায্যেই ঘটেছে। ধরো প্রেম। প্রেম তো sex ছাড়া কিছুই নয়। তুমি ঐ শব্দটার একটা স্থানিক অর্থ করো না—ও একটা ধর্ম; বাঙলা ভাষায় ওকে অনুবাদ করতে গেলে বলতে হয় ভালোবাসা। খালি তাই নিয়েই সাহিত্য হবে,—লেখকরা দর্জি বা ছুতোর হ'লে তেমন ফরমায়েস করা যেতো হয়তো;—কিন্তু যদি কারুর সাহিত্যে সত্যিই sex বড়ো উপাদান হয়ে ওঠে, তাকে যেন কৃত্রিম লজ্জা এসে অভিভূত না করে, সৃষ্টিকে সে যেন বলিষ্ঠ হতে দেয়। যে-লেখা গভীর উপলব্ধিপ্রসূত সে কখনোই অশ্লীল হতে পারে না—, তাই ভল্‌টেয়ার অশ্লীল নয়, হোরেস্‌ অশ্লীল নয়, বায়রন অশ্লীল নয়, শেক্‌স্‌পিয়ার অশ্লীল নয়। কিন্তু এক সময় ইংলণ্ডে শেক্‌স্‌পিয়ারের অশ্লীলতা সংশোধন করতে এক মহাপুরুষের উদয় হয়েছিলো—নাম তাঁর টমাস্‌ বৌড্‌লার; তিনি শেক্‌স্‌পিয়ারকে কাটতে বললেন। কিন্তু আবার সেই মজা হল, অশ্রু।

অশ্রু। কি?

প্রভাত। Victorian-দের কাছে সেই bowdlerised শেক্‌স্‌পিয়ারই মনে হল 'too frank'।

অশ্রু। আচ্ছা তুমি কি মনে কর না এই যে ঝাঁকে-ঝাঁকে লালসা-লিপ্ত লেখা বেরুচ্ছে মাসিক কাগজে, তাদের বন্ধ করা উচিত?

প্রভাত। Gourmont-এর একটা কথা শোন : When morality triumphs, nasty things happen. প্রচার বন্ধ করলেই কলম বন্ধ হয় না। অশ্লীলতার বিচার যারা করবে তাদের বিদ্যে-বুদ্ধির পরিচয় তোমাকে নতুন করে আর দিতে হবে না। কিন্তু কি কারণে বন্ধ করবে শুনি?

অশ্রু। লেখা পড়ে অপরিণতবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা নষ্ট হবে বলে।

প্রভাত। এটাই মজা অশ্রু, যারা এই অশ্লীলতা prosecute করে তাদের নষ্ট হবার ভয় নেই, নষ্ট হবে তদের স্ত্রী, তাদের ছেলে-মেয়ে। নিজেদের এই প্রকার নিশ্চিন্ত superiority-বোধটা অত্যন্ত কৌতুকের কিন্তু। পরের জন্যে তার মাথা-ব্যথা, নিজে সে নির্মুক্ত। আচ্ছা, সিনেমা দেখে ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী খারাপ হয় না, রাস্তায় কুকুর দেখে, চৌরঙ্গিতে মেমদের পা দেখে? তুমি shocked হয়ো না, অশ্রু। শাস্তি দেবে বলে যে অশ্লীল বই তুমি কেড়ে নিলে, তোমার সেই অশ্লীল নামাঙ্কিত করে দেবার দরুনই কি তা হু-হু করে উড়ে যাবে না? ছেলেরা ইস্কুলের ঠিকানায় ভি-পি করে বই নেবে, স্ত্রীরা দেওরদের দিয়ে বাজার থেকে কিনে আনবে ডবল দাম দিয়ে। এইটেই সব চেয়ে মজার, সাহিত্যের শ্লীলতার বিচার হবে criminal law অনুসারে, সাহিত্যিক রসবোধের নিয়মানুসারে নয়। যা সত্যিই কুশ্রী তা আপনিই যাবে শুকিয়ে, আদালতের লাল ফিতে বেঁধে তাকে মর্যাদা দেবার কারণ কি? ছেলে-মেয়েদের চরিত্র খারাপ হবে ভেবে তোমারো যে মাথা ধরে গেছে। ছেলে-মেয়েদের sexসম্বন্ধে train কর না কেন? বার্ট্র্যাণ্ড্ রাসেল্-এর মতানুসারে তুমি তোমার ছেলে-মেয়েদের সামনে ব্যায়াম করবার সময় নগ্ন হয়ে তাদের মিথ্যা রহস্য-সন্ধিৎসা নষ্ট করে দিতে পারবে? যেখানে mystery সেখানেই অশ্লীলতা। ছেলে যখন বাপকে শুধোয় : এঞ্জিন কি করে চলে, এরোপ্লেন কি করে ওড়ে, বাপ তার সাধ্যমত উত্তর দিতে কুণ্ঠা করেন না। কিন্তু যখন ছেলে বলে : বাবা, আমি কী করে হলাম, তখনই বাপ আম্‌তা আম্‌তা করে জবাব দেবেন : তুমি চাঁদ থেকে নেমে এসেছ, ঈশ্বর তোমাকে দিয়ে গেছেন। চাঁদ থেকে যে নেমে আসা যায় না, ঈশ্বরকে যে চোখে দেখা যায় না এবং বাপের ঐ আম্‌তা আম্‌তা করে বলার জন্যেই ছেলের কাছে ব্যাপারটা দাঁড়ায় রহস্যাচ্ছন্ন, বাপ

দাঁড়ান মিথ্যাবাদী। ছেলের কৌতুহল বাড়ে, এবং যদি খারাপ হওয়া বলো সে তখন থেকেই খারাপ হয়। সাহিত্য পড়ে খারাপ হওয়ার ভয়, বাড়িতে গর্ভিণী আত্মীয়া-বর্গকে দেখে ভয় নেই? আস্তে হেসো, ভদ্রলোক জেগে উঠবেন। ঘুমিয়ে আছেন বলেই এতো সব কথা বলা যাচ্ছে।

একবার আমেরিকায় স্কুল-মেয়েদের sex-information-এর আদি-কারণ জানবার জন্যে চেষ্টা হয়েছিল; বেশি মেয়ে যোগ দেয়নি—মোটে ১৫৫ জন। তালিকা যা হয়েছিল তা দেখ।

প্রভাত পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে বললে,—এটা আমি টুকে রেখেছি।

অশ্রু পড়তে লাগল :

পড়ে	৭২
কথাবার্তা কয়ে	১৪
মাস্টার, নার্সদের কাছ থেকে	৬
চাকরদের থেকে	১৬
দেখে (পশুপাখি বাপ-মা ছেলেপিলে)	২৬
আত্মীয় স্বজন	৮
বুড়োবুড়ির থেকে	১৩
	মোট—১৫৫

অশ্রু বল্‌লো : তবেই দেখতে পাচ্ছ পড়েই বেশি মেয়ে বকেছে।

প্রভাত হেসে বল্‌লো : কি-কি পড়ে বকেছে তারো একটা হিসাব নাও। বলে আরেক টুকরো কাগজ বার করলো।

অশ্রু পড়লো ঃ

বাইবেল

ডিক্সনারি

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া

শেক্‌স্‌পিয়ার

ডিকেন্স

ডাক্তারি বই

স্পেনসারের *Faerie Queene*

থ্যাকারে

জর্জ এলিয়েট

স্কট

মটলির *Rise of the Dutch Republic*

প্রভাত। আমাদের দেশেও যদি হিসেব নেওয়া সম্ভব হতো তো এরি অনুরূপ মজার ব্যাপার ঘটতো নিশ্চয়। রামায়ণ-মহাভারত বাদ পড়ত না।

এন্‌সাইক্লোপিডিয়াতে অশ্লীলতার কোনো ব্যাখ্যা নেই, তার বিচারের কোনো মানদণ্ড পাবে না। সব মিলে বইয়ের বিচার হবে, না, একটা লাইনে বা একটা মাত্র প্রাদেশিক শব্দে, তা বোঝা কঠিন। তুমি তো স্তন সম্বন্ধে আপত্তি করেছিলে কিন্তু ফ্রান্সে বদলেয়ার হ্রদের সঙ্গে প্রেয়সীর উদরের বর্ণনা করেছিলো বলে কেলেঙ্কারির আর সীমা রইলো না। প্লেটো তো কবিতাকেই বনবাসে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর Republic-এ, সেখানে "পাখী সব করে রব"-এর মতো নিষ্পাপ কবিতারো স্থান হতো না, তিনি হোমারকে পর্যন্ত সাফ করতে চেয়েছিলেন। সায় দেবে তুমি? দেখ আমরা খুব ভালো দলে আছি—কে নেই আমাদের পক্ষে? ইউরিপিডিস্, শেক্‌স্‌পিয়ার, শেলি—

অশ্রু। শেলি?

প্রভাত। হ্যাঁ, শেলি। *Queen Mab*-এ blasphemy-র জন্যে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তুমি নাম শুনে যাও: বায়রণ, মুসে, ওভিড্, ভলটেয়ার, রুসো, গ্যয়টে, মলিয়ার, ডস্টয়ভস্কি—এমন কি সেণ্ট অগষ্টিন পর্যন্ত।

অশ্রুর খোলা চুলগুলি দু'হাতে মুঠি ভরে ধরে প্রভাত বললো: পৃথিবীর অনিষ্ট করবে মানুষের এই passion? এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো? সমালোচকদের মতো এই বিশ্বাসে আমরা সত্যিই আনন্দ পাই না অশ্রু, যে, মানুষ সব সময়েই অবনত অধঃপতিত হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। আমরা মানুষের মহত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করি। তুমি কি মনে কর শেক্‌স্‌পিয়ার-এর *Venus and Adonais* না পড়লেই নিষ্পাপ ও নির্মল থাকবে? পৃথিবীতে একমাত্র ঋতুসংহারই কি পুণ্যসংহার করতে বদ্ধপরিকর? এই পৃথিবীর পাপ ও লোভ, রোগ ও দারিদ্র্যের (সবগুলিই মানুষের অনিষ্টকারী) মাঝে থেকেও যারা দু'চারটে সংস্কৃত শ্লোক পড়তে ভয় পায়, sex-এর নামে যাদের ধনুষ্টঙ্কার হয়—তাদের সঙ্গে কার তুলনা দেব? একবার কোন এক ফাঁসির কয়েদিকে

ফাঁসি-কাঠে লটকাবে বলে জেল থেকে নিয়ে যেতে এসেছিলো। জেল থেকে ফাঁসির জায়গা কতটুকুনই বা পথ! বৃষ্টি এসে গেল হঠাৎ। কয়েদি বললে: ছাতা দাও, ভিজতে পারবো না। ছাতা মাথায় দিয়ে কয়েদি ফাঁসি-কাঠে গলা পাতলে। এরাও সব যেন তাই,—ফাঁসির কয়েদি হয়ে ছাতা খুলেছে! কিন্তু ঢের হয়েছে অশ্রু, আর না।

আর না মানে, আর কথা নয়—এইবার একটু বিশ্রাম করা যাক। ঘুম অবিশ্যি খুব পাচ্ছে না, তবু দেহটাকে একটু প্রসারিত করতে পারলে আয়েস হত। এই ভেবে প্রভাত মাথাটা একটু হেলিয়ে দিতেই অশ্রুর বুকের কুলায়ে আশ্রয় পেলো। গাড়ি পুরো দমে চলেছে,—অন্ধকার ক্রমেই আবছা হয়ে আসছে। ভদ্রলোক আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরলেন; অশ্রু চঞ্চল হয়ে উঠতে চাইছিলো, কিন্তু বুকের ভার রইলো অটল হয়ে। এমনি উদাসীন হয়ে আধ-শোয়া অবস্থাটা মন্দ নয়। গেলো অনেকক্ষণ কেটে। নৈহাটি ছেড়েছে। প্রভাত উঠে বসলো, কিন্তু বায়রণের কবিতার দুটো লাইন বলবার জন্যে। ঐ লাইন-দুটো বলবার প্রয়োজন হত না যদি না অশ্রু (বোকার মতো) বলে উঠত: কী গরম!

অতএব প্রভাত ভেবে দেখলো লাইন দুটো বলা দরকার:

"What men call gallantry and the gods adultery,
Is far more common where the climate's sultry."

বলে দু'হাত দিয়ে খুব বড়ো একটা গোলাপফুলের মতো অশ্রুর মুখ একেবারে নিজের মুখের কাছে তুলে আনলো। হলিউডে হলে এখানে খুব একটা চমৎকার close-up হত সন্দেহ নেই।

আগে থেকেই চিঠি দেওয়া ছিলো। সব ঠিকঠাক। অশ্রুকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে প্রভাত হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে বাস্ নিলে। বাড়ি এসে গেল পনেরো মিনিটে। ওদের গলিতে পা দিয়ে দেখলো কিছুই বদ্‌লায়নি। আশ্চর্য! বাঁকে বসে তেমনি দোকানিটা ফুলুরি ভাজছে, ফিরিওলা তপাসে-মাছ হেঁকে যাচ্ছে, রাস্তার ওপরে কর্পোরেশানের একটা নো-রোড লাগানো, দূরে একটা রোলার দাঁড়িয়ে। এই ওর পরিচিত পৃথিবী! আশ্চর্য্য! বাড়ি ঢুকে নিশ্চয়ই

দেখতে পাবে মা ছাতে ঘুঁটে দিচ্ছেন, নাটু গালের ওপরে মাছি তাক করছে। ওর বাড়িটা তেমনি বিবর্ণ বিমর্ষ হয়েই আছে! বাড়িটা মেঘলোকে প্রমোশান পায়নি।

নাটু বারান্দায় বসে মহাশূন্যকে মুখ ভেঙচাচ্ছে; পাছে দাদার পায়ের শব্দ চিনে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে সেই ভয়ে প্রভাত অতি নিঃশব্দে পা ফেলে-ফেলে ঘরে ঢুকলো। সারা রাত্রির অনিদ্রা—শরীর পড়ছে ভেঙে; তবু জুতো-জামা না খুলেই ভাঙা চেয়ারটায় বসে পড়ে পা ছড়িয়ে দিলো। নাটু এখন তার মাথার চুলগুলো টেনে-টেনে দেখছে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা যায় কি না।

এখুনি মা এসে পড়বেন—অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন নিশ্চয়। মা এসে গেলেই ফুরিয়ে গেল! স্নান করতে যা, পোস্তর বড়া হয়েছে গরম-গরম, চল্ আফিসে, জুতো দুটো বুরুশ করে নে—যা ধুলো জমেছে! মাথার চুলগুলি কবে কাটবি? কেমন লাগল জলপাইগুড়ি? কি বললে অশ্রু? বাপ জায়গা দিয়েছে?

খেয়ে-দেয়ে পেটের বাঁ দিকে একটা বেদনা নিয়ে ছুটে ওর বাস্ ধরতে হবে—দাঁড়িয়েই যেতে হবে, আফিস-টাইমে জায়গা নেই বসবার। আফিসে গিয়ে চেয়ার টেনে বসতেই সামনে ওর সেই নাক-চ্যাপটা ভবানীবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—দেশলাইয়ের কাঠি বার করে অনবরত দাঁত খোঁচাচ্ছেন। কে একজন নাকি পিন্ দিয়ে দাঁত খুঁচিয়ে মরে গেছল। আচ্ছা, জাপানে না কি চুমু খাওয়া বারণ হয়ে গেছে, কারণ প্রতি চুমুতে নাকি হাজারে-হাজারে বীজাণু ঠোঁটের খেয়া পারাপার করে। অশ্রুর যদি টি. বি. থাকে? বাঙলা দেশে এত লোক টি. বি. তে মরে অথচ একটা স্যানাটোরিয়াম্ নেই। শেষকালে ন্যুট হাম্সুন্ পর্যন্ত টমাস-মান্-এর দেখাদেখি স্যানাটোরিয়াম্ নিয়ে বই লিখলে: ***Chapter the Last***। বাঙলা দেশে একটা থাকলে আরো কি গল্প লেখবার খোরাক জুটতো। আচ্ছা, টি. বি.-টা খুব কাব্যির ব্যারাম, তাই সব লেখকই রক্তামাশয় বা বেরিবেরি ছেড়ে টি. বি.-র রক্তরাগে রুমাল রাঙিয়েছেন। প্রেয়সীদের বেরিবেরি হয়ে পা ফুললে আর রক্ষে ছিলো না, কোনো প্রিয়ার গলগণ্ড হয়েছে বলে শোনা যায়নি। পৃথিবীতে কী রোগ নেই? যদি কেউ এসে বলে: একটা লোকের বাঁ কানটা ডান কানের জায়গায় এসে উল্টে বসেছে—প্রভাত তা-ও বিশ্বাস করবে। মানুষের এইটুকুন শরীরে ছ শ' ছাপ্পান্নটা

ব্যাধি। তবু তাকে চোখ লাল করে তম্বি করা হল কি না—ভালো হও। শরীরে রক্ত দিয়ে বললে কি না—সচ্চরিত্র হও; মহুয়ার বন তৈরি করে বলা হল—ওখান দিয়ে হেঁটো না, গড়িয়ে পড়বে। মহুয়া নামটি বেশ। বধূকে পাবার আগের ডাক-নাম, পেলে পরে তার নাম হওয়া উচিত দ্রাক্ষা। একবার কে এক মাস্টার দ্রাক্ষার মানে করেছিলো কিসমিস। 'বক্ষে দ্রাক্ষা গুচ্ছে গুচ্ছে' —এমন একটা লাইনের টুক্‌রো এতদিনে বাঙলা কবিতায় পাওয়া গেলো। বাঙলা কবিতা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে—মার গলার আওয়াজ পাওয়া গেছে। ঘরের দিকে এসে পড়লেন বুঝি। ও এতক্ষণ অশ্রুকে না ভেবে বেরিবেরি নিয়ে রিসার্চ করছিলো। সত্যি, অশ্রুকে এত কাছে পেয়ে এসেছে অথচ ওকে ভাবা যাচ্ছে না। আকাশ-ভরা রোদের দিকে চেয়ে জ্যোৎস্নার কথা ভাবা মুস্কিল। অশ্রুর চোখ ভাবতে গিয়ে ভুরু মনে পড়ে, ভুরুর দীর্ঘতা অনুসরণ করতে গিয়ে মাঝপথে হঠাৎ ঠোঁট দুটি এসে আবদার জানায়। এতো নিবিড় করে অশ্রুকে স্পর্শ করা হোল অথচ ওর হাতের আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়নি! সিংহের সৌন্দর্য যেমন কেশরে, নারীর সৌন্দর্য তেমন নখাঙ্কুরে! প্যারিস যে হেলেন্‌কে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো তা শুধু হেলেনের আঙুলে প্রলুব্ধ হয়ে। রামের চেয়ে মেনিলিউস কত উদার—সীতাকে অগ্নিপ্রবেশ করতে হয়েছিলো, হেলেন্ একেবারে স্বামীর বাহুপ্রবেশ করলে। একেই বলে গ্রীক। আচ্ছা, টেলিমেকাস-এর সঙ্গে হেলেনের সেটা কি সত্যি? টেলিমেকাসটা ভারি ভীরু—আমাদের লক্ষ্মণ-টাইপের। লক্ষ্মণটা চোদ্দ বছর সীতার পা-ই দেখলে—এতো বড় ওজবুক বাল্মীকি ছাড়া কেউ কল্পনা করতে পারতো না। আচ্ছা, বাল্মীকি হলে ট্রেনের সেই ভদ্রলোককে সেই ব্যাধের মত অভিশাপ দিতেন? সেই ভদ্রলোক কেমন ঠেসে ঘুমুলে! ভুঁড়িটি কি অটুট! অশ্রুকে অত সব বক্তৃতা না দিয়ে কোলের ওপর ছোট খুকিটির মতো ঘুম পাড়িয়ে দিলেই তো হত ভালো। চোখের পাতায় চুমু খাওয়াটা এলিজাবেথান্ যুগে একটা ফ্যাশান ছিলো, ভালোবাসারো ফ্যাশান বদ্‌লায়। Passion-এর জন্যেই passion, যেমন আর্টের জন্যেই আর্ট—এ নিয়ম উঠে গেল কেন? Paolo ও Francesca-র ভালোবাসা শুনতে ভালো—নরকেও তারা বিচ্ছিন্ন হয়নি, কিন্তু তেমন ভালোবাসা বিংশ শতাব্দীতে সইবে না—Paolo, Francesca-র কি-রকম আত্মীয় ছিলো, বিয়ে হতে পারতো না—তবু তাদের মিলন হল।

আচ্ছা, অর্জুন তো তার মামাতো বোন সুভদ্রাকে পরম আরামে বিয়ে করলে! মান্দ্রাজে কোনো কোনো জাতে নির্বিবাদে ভাগ্নিকে বিয়ে করা চলে! বড়ো সব মজার আইন,—মনুর মতে বাপের ও মার দুই দিকেই সাত ঘর বারণ, পৈথিনসির মতে বাপের দিকে পাঁচ ঘর ও মার দিকে তিন। বাঙালি ব্রাহ্মণেরা তাই নিষ্ঠা-সহকারে পালন করছেন,—মনু এখানে অমান্য। আবার বেদ কী বলে শোন। বেদের মতে পিসির মেয়ে আর মামার ছেলেতে পরম বন্ধুতার সুযোগ আছে এবং উল্টোউল্টি। মান্দ্রাজিরা চালাক—এই নিয়মটা লুফে নিয়েছে। অন্তঃপুরে cousin-দের মধ্যেই যে প্রেম ভালো জমে এ-কথা অস্বীকার করা আর বেদকে ভ্রান্ত বলা সমান মিথ্যা। বাইরে আব্রু, ভেতরে মিল—এমন একটা মধুর সম্পর্কের ক্ষেত্র আছে বলেই বাঙালির অন্তঃপুর বলতে আজো আমাদের মন আনচান করে ওঠে। আচ্ছা, এমন যদি হয় (হলেই হল) অশ্রু ওর বোন—মামাতো মাসতুতো নয়—একেবারে সহোদরা! ধরা যাক, শিশুকালে অশ্রু যায় মরে—শ্মশানে নিয়ে যায়, খুব বৃষ্টি নামে, শব ফেলে সব শ্মশান-বন্ধুরা আশ্রয় খোঁজে, বৃষ্টি থামলে এসে দেখে শব অন্তর্ধান করেছে! এবং সেই শব যদি আজ (ধরা যাক্) কুড়িবছর পরে বোন বলে সার্টিফিকেট দেখায়—তবে? সত্যি, উগ্র ও উন্মুখ অধরৌষ্ঠের কাছে অশ্রুর আত্মদানে মহত্ত্ব আছে। অশ্রুর গলা ঠিক শঙ্খের মতো। এবার কাছে পেলে ও ভালো করে অশ্রুকে দেখবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেহের মতো সৌধ আর আছে কী? পৃথিবীতে কিছুই সম্পূর্ণ করে দেখা হয় না। মানচিত্রে ওপোর্টো বলে যে-জায়গা আছে এ-জন্মে তার মাটি ও মাড়িয়ে আসতে পারবে না। এই সময়ে লণ্ডনে গ্রীন পার্কে যে মেয়েটি বেড়াচ্ছে (একটি না একটি মেয়ে নিশ্চয়ই সে-পার্কে আছে) তার সঙ্গে আলাপ করা হবে না। সত্যি, কত অল্প আয়ু, কী ভীষণ! এতো আশা অপূর্ণ থেকে যাবে—এতো সব স্পর্শাতীত হয়ে রইলো! হাত বাড়িয়ে আকাশকে পাওয়া যায় না বলেই নাকি আকাশ সুন্দর! পেতে পারে না বলেই মানুষ ছোট। ছোটখাটো জীবন—ছোটখাটো সংসার—মন্দ কি? ছোট একটি বিছানা—দুটি করে ছোট ছোট হাত পা—একটি শিশু! যদি শুধোয় কোত্থেকে এলাম—প্রভাত তার ঠিক উত্তর দেবে—অক্ষরে-অক্ষরে। অশ্রুকে লজ্জিত হতে দেবে না।

আচ্ছা, অশ্রুর সঙ্গে সেই ওর বাড়ি থেকে পালাবার রাত্রে প্রভাতের সঙ্গে

একটা বিয়ে হয়ে গিয়েছিল না? তবে ওরা কোথাও ঘর নিয়ে একসঙ্গে থাকে না কেন? সর্বনাশ! তা হলেই তো ভুষ্টিনাশ। হাড়ে-হাড়ে চেনার চেয়ে ধারে-ধারে চেনা অনেক ভালো। তাকে নিয়ে ঘরে এনে পর করার জন্যে নয়, বাইরে রেখে পরম করার জন্যে। ধরা না দেওয়া মানেই ভরা হয়ে থাকা, সব সময়েই ভরা হয়ে থাকা।

দুপুরে একটা কাণ্ড ঘটে গেলো। খাওয়ার পর খানিকক্ষণ পাইচারি করা অশ্রুর অভ্যেস। এবং আজকে ইস্কুল বলে, কোনো উপদ্রব নেই বলে, দুপুরে নিশ্চয়ই একটু ঘুমুনো যাবে। বেশ পরিষ্কার তকতকে বিছানা—অচেনা বিছানায় চট করে ঘুম আসবে না বলে অশ্রু একটা দৈনিক কাগজ যোগাড় করেছে। এই শেষ বিজ্ঞাপনটা পড়া হলেই কাগজটা বাতাহত কদলী-পত্রবৎ ভূপতিত হবার আয়োজন করবে এমন সময় দোর গোড়ায় জুতোর শব্দ হল। অশ্রুর জিহ্বা এমন অসাবধান যে চুল্‌কে উঠলো: এসেছ? যেন আফিস পালিয়ে এলেই প্রভাতের চতুর্বর্গ ফললাভ হবে! কিন্তু এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে জুতোর অধিকারীটি নিশ্চয়ই প্রভাত নয়—অশ্রুর সেজকাকা।

অশ্রু বিছানার ওপর উঠে বসে দু'হাত পেছনে তুলে একরাজ্যের চুল নিয়ে হাঁপিয়ে উঠলো। সেজকাকা সোজা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন, সার্চ করতে এসে পুলিসের কর্তার বোধকরি এমনি মনোভাব হয়; অপারেশান্‌-এর আগের মুহূর্তের রুগীর মতো অশ্রু নার্ভাস হয়ে পড়লো। তবু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে খাট থেকে নিচু হয়ে সেজকাকাকে প্রণাম করার জন্য হাত বাড়ালো, কোঁচা দিয়ে সেজকাকা জুতো ঢাকলেন। বোঝা গেল প্রণাম তিনি নেবেন না।

কিন্তু কথা আরম্ভ হওয়া দরকার। সেজকাকাই গলা খাঁখরে নিলেন, বললেন,—কার সঙ্গে এলি?

অশ্রু তখন খাটের একেবারে ধারটাতে বসে হাঁটুদুটোকে একটা acute angle-এ বাঁকিয়ে পা-দুটোকে দিয়েছে খাটের তলায় চালিয়ে! দুই চোখে বুদ্ধি ও প্রতিভা যেন চক্‌চক্‌ করছে,—ললাটে প্রতিভার দীপ্তি। হাত দু'টি যে টান করে রেখেছে বিছানার ওপর তাতে পর্যন্ত যেন নিঃশঙ্কতার ভাব আছে।

হাঁটু দুটো একটু দুলিয়ে ও ওর ক্ষণেকের স্নায়বিক দৌর্বল্যকে ধমক দিলে। বললে—জলপাইগুড়ি থেকে এক ট্রেনে একলা চলে আসার মধ্যে অস্বেরো বীরত্ব নেই! তবে সৌভাগ্যবশত একলা ছিলাম না, সঙ্গে সাথি ছিলো।

সেজকাকার এত রাগ হল যে পাঞ্জাবির গলার বোতামটা খুলে ফেলতে হল। বললেন—কে সে লোক?

অশ্রু অক্ষরগুলো স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলো: শ্রীপ্রভাতমোহন—

সেজকাকা মুখের যা-একখানা ছাঁচ করলেন স্টাডি-হিসেবে যে-কোনো মিউজিয়মে স্থান পেতে পারে। বললেন,—ঐ হতচ্ছাড়া বিশ্ববয়াটে ছোঁড়াটা—ঐ চরিত্রহীন—

অশ্রু রীতিমত কৌতুক বোধ করলো। প্রভাতের নাম-মাহাত্ম্য এমন প্রবল ভেবে হিংসেও হ'ল একটু। হাসির ভুরভুরি চেপে একটা কিছু বলা দরকার, তাই বললে—চক্ষু না থাকলে তাকে অনায়াসে চক্ষুহীন বলা যায়, কিন্তু চরিত্র বস্তুটি যে কোথায় আছে, বা কোথায় নেই occultist-রা পর্যন্ত সন্ধান পান না।

এর উত্তর কি হতে পারে সেজকাকাকে তা ভাবতে দিয়ে ইতিমধ্যে আমরা তাঁর দেহবর্ণনাটা সেরে নি। এটা অবশ্য খুব জরুরি নয়, তবু সেজকাকাকে আমাদের মনে ধরেছে। সব চেয়ে যেটা প্রখররূপে ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক তা হচ্ছে সেজকাকার নুয়ে পড়া নাক, অনেকটা ধনেশ পাখির ঠোঁটের মতো—এবং সেই নাকের ওপর একটি মটর-দানার মত ছোট আঁচিল। দেখলেই কড়ে আঙুলের টোকা মেরে ফেলে দেবার পরখ করতে ইচ্ছা করে—আঁচিলটা এমনি আলতো হয়ে বসেছে। এটুকুনই যদি সে মুখের বিশেষত্ব হত—তা হলে বোঝা যেতো সেজকাকা মাত্র পিউরিটান; কিন্তু সেই উদ্যতখড়্গের মতো নাসিকার তলদেশে একটি স্থূল ও হৃষ্টপুষ্ট গুম্ফ বিরাজ করছে, শুধু বিরাজ করছে না, সম্মার্জনীর মতো একটা মার্জনাহীন রুক্ষতা নিয়ে সর্বদাই মারমুখো হয়ে আছে। গোঁফের প্রত্যন্ত প্রদেশদুটো আগে ঠোঁটের সমান্তরাল করে ছাঁটা ছিল, কিন্তু একদিন অবাধ্য ক্ষুর গল্পের সেই আদর্শ বিচারক বাঁদরের মত সমান করে গোঁফের চৌহদ্দি ভাগ করতে গিয়ে গুম্ফটিকে একেবারে নাসারন্ধ্রের তলায় ঠেলে এনে তার দারোয়ানি দিয়েছে। এবং তাতেই চেহারার আরেকটি বিশেষণ বেড়েছে: পরনিন্দুক।

অশ্রুর কথার উত্তরে সেজকাকা কিছুই ভাবতে পারলেন না। অতএব

প্রশ্ন পালটানো আবশ্যকীয় হয়ে উঠলো। বললেন—বাড়ি না গিয়ে এখানে এসে উঠেছিস যে ?

মিহি করে হেসে অশ্রু বললে—বাড়ির দরজা তো তোমরাই বন্ধ করে দিয়েছ। আমাকে তোমরা যে অপমান করেছো একমাত্র মেয়ে হয়েছি বলেই আমাকে তা পিঠ পেতে সইতে হবে এতো বড় অমানুষ হয়ে তোমাদের বংশে আমি জন্মাইনি, সেজকাকা।

হেসে কথাটা বললে বলে কথাটা সেণ্টিমেণ্টাল্ হল না। সেজকাকা তাঁর গুম্ফবিন্দুটি উন্নত করে (ঘৃণার পরিচায়ক) বললেন—তুমি যথেচ্ছাচারী হয়ে ঘুরে বেড়াবে আর আমরা অভিভাবক হয়ে তাই দেখে নির্লিপ্তের মতো হাই তুলবো আমাদের কি এত বড়ো অমানুষ হতে উপদেশ দাও নাকি ?

বোঝা গেলো সেজকাকা চটছেন, সম্বোধনের ভাষা তাঁর মধ্যমপুরুষে পদস্থ হয়েছে। অশ্রু বিনীত স্বরেই বললে—ভাষার যথেচ্ছ প্রয়োগের জন্যে কতগুলো কথার অপপ্রয়োগ ঘটছে, নইলে যথেচ্ছাচারী কথাটা শুনতে যতো খারাপ তার সত্যিকারের অর্থ টা তত ন্যক্কারজনক নয়। নিজে যা ভাল বলে বুঝবো অকুণ্ঠ-চিত্তে তাই পালন করবো,—এর মতো চরিত্রগর্ব আর কি আছে ? পরেচ্ছাচার-জনিত অপমান আর আত্মহত্যা সমান জিনিস।

সেজকাকার এবার দাঁত দেখা গেল, পান-খাওয়া পোকায় কাটা দাঁত, অর্থাৎ—খেলো কথ্য ভাষায় বলতে গেলে—সেজকাকা দাঁত খিঁচোলেন : তাই বিয়ের সভা থেকে পালিয়ে যাওয়াকে তুমি চরিত্রগর্বের নমুনা বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করছো ?

ঘাড়ের ওরর খোঁপাটাকে জুৎ করে বসিয়ে অশ্রু শাদা খরখরে গলায় বললে—সে তিন বছরের কথা। কেন পালিয়ে এসেছিলাম তার অর্থ টা এখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু মিথ্যা হয় নি। যদি তুমি শুনতে চাও তো বলি।

গুম্ফবিন্দুকে সূচ্যগ্রবৎ তীক্ষ্ণ করে সেজকাকা বললেন—শুনি !

অশ্রু ডান হাঁটুর ওপর অতি ধীরে বাঁ calf-টি স্থাপন করলো, বিছানায় আধখানা কাৎ হতে পারলে অতীত দিনের গল্প বলায় যে সহজ একটা সুখ আছে তা সম্পূর্ণ করে সম্ভোগ করা যেতো, কিন্তু সেজকাকা নেহাৎই সেজকাকা। পায়ের ওপর পা-তোলাটি পর্যন্ত তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। অশ্রু বলল—বিয়েতে সম্মত হওয়াটাই প্রথমত আমার ভুল হয়েছিলো, শতকরা

নিরানব্বুই জন বাঙালি মেয়ের মতো আমিও যাচাই করে দেখলাম না—বিয়ে করতে আমি প্রস্তুত আছি কি না। নানান পারিবারিক ঘটনা-আবর্তে পড়ে আমিও একটা খড় ধরতে ছুটেছিলাম। কিন্তু ভুল আমার ভাঙল—ঠিক বিয়ের লগ্ন এসে পৌঁছুতেই। ভুল যদি ভাঙলই, ভাঙুক, তার সময়টা ঠিক পাঁজির সঙ্গে মিল রাখছে কি না সে-দেখবার সময় আর ছিলো না। পালালাম! কেন বিয়ে করছি, কাকে বিয়ে করছি এই প্রশ্নগুলো এমন গোলমাল বাধিয়ে তুললো যে বিয়ের বাত্তি আমার কানেই ঢুকলো না।

সেজকাকা। বিয়েটা ভুল হচ্ছিল কিসে? এমন সুযোগ্য পাত্র!

অশ্রু। সেখানেই লাগলো খটকা—ঠিক সুযোগ্য কি না। তা ছাড়া পাত্র সুযোগ্য হলেই মিলনটা সুভোগ্য হবে কি না—

সেজকাকা ধমকে উঠলেন; তার মানে?

অশ্রু। ঐ তো মুস্কিল, তুমি সেজকাকা হয়ে বসে থাকলে খোলাখুলি কিছুই বলা যাবে না। সম্পর্কের মিথ্যে সৌজন্যের খোলস না খসাতে পারলে পদে-পদে আমার বাধবে। Confession করতে গিয়ে যদি দেখি যে পুরোত ধমকাচ্ছেন তা হলে পুরোতেরো ধর্মচ্যুতি ঘটে। ডাক্তারের কাছে রোগের হিস্ট্রি বলতে রুগীর লজ্জা করলে চলে না, উকিলের কাছে মক্কেল যদি মিথ্যাবাদী হয় তা হলে মোকদ্দমা যায় ফেঁসে। তোমার অভিভাবকত্বের সিংহাসন ছেড়ে তুমি যদি আমার সঙ্গে সমতল জায়গায় এসে না দাঁড়াও, তা হলে আমাকে প্রশ্ন করা বৃথা।

চেয়ারে সামান্য স্থান পরিবর্তনপূর্বক দেহভার পুনঃস্থাপন করে সেজকাকা বললেন—আচ্ছা।

অশ্রু বাঁ পায়ের পাতাটি সামান্য একটু দুলিয়ে-দুলিয়ে বলে চললো: শতকরা নিরানব্বুই জন বাঙালি মেয়ের মতো দূরদর্শিতাহীন অন্ধ আত্মদানের লজ্জা আমার সইলো না, আমি ঐ বাকি একজন! আমি অসাধারণ। বাঁ হাতে ত্যাগ করবার স্বাধীনতা না রেখে দক্ষিণ হস্তে আমি গ্রহণ করতে রাজি নই। আমি বারে বারে গ্রহণ করবো, বারে বারে আমার যাত্রার প্রতিবন্ধককে উত্তীর্ণ হয়ে যাবো। সেই পণ করেই সেদিন বেরিয়েছিলাম।

সেজকাকা। তাই আমাদের সবার মুখে কলঙ্কের কালি মাখিয়ে তুমি এমন একটা অনাচার করলে।

অশ্রু। কণ্ঠের হাড়ে যদি থাইসিসের পোকা পাওয়া যায়, তবে সে-হাড় উপড়েই ফেলা উচিত; কণ্ঠাভরণ শোভা পাবে না ভেবে সেই পচা হাড় পুষে রাখা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। তোমাদের কলঙ্কের কালির ভয়ে আমার জঘন্য আত্মবলিটা নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে যতই কীর্ত্তিত হত না কেন, আমার পক্ষে সেটা হত পরম অসতীত্ব। (এখানে সেজকাকা একটা মুখভঙ্গি করলেন) একটা ভুল যদি করেই থাকি তা সংশোধন করবার স্বাধীনতা আমার থাকবে না—সমাজের এই জুলুম আমি কিছুতেই মানবো না। একটা গোটা মানুষের চেয়ে তোমাদের দশ জনের আরামের সমাজ নিশ্চয়ই বড়ো নয়। তা ছাড়া—

সেজকাকা দু'পাটি দাঁত দৃঢ়বদ্ধ করে কীটকৃত দন্তরন্ধ্র দিয়ে আওয়াজ করলেন: তা ছাড়া?

অশ্রু। তা ছাড়া আমার এই বিয়ের পেছনে একজনের বেদনা ছিলো। তখন মন ছিলো কাঁচা, আমার মিলনোৎসবে কোনো উপবাসী আত্মা পিপাসার্ত চাতকের মতো চেয়ে আছে এ ভাবতে আমার হৃদয় কেঁদে উঠলো। সে-দিনের কথা বলছি, নইলে সেই মিলন যদি আমার সত্যি হত তা হলে অন্যের অনাহূত অশ্রুবর্ষণকে আমি গ্রাহ্য করতাম না। সে মিলন শালগ্রাম পাথরের মতোই মিথ্যে বলে আমি বেরুলাম, এবং যেখানে এসে প্রথম বিশ্রাম নিলাম সে হচ্ছে প্রভাতের বাড়ি।

সেজকাকা। যে-ছেলে এমন করে কাঁদলে তাকে বরণ করলেই তো ল্যাঠা চুকে যেতো।

অশ্রু। ওর কান্না মোছাতে গিয়ে আমাকে হতো কাঁদতে,—ল্যাঠা চুকতো না। তা ছাড়া কাঁদতে পারাটাই ভালোবাসার পরম মূল্য নয়। সে-পরীক্ষাই আমার, সে-অনুসন্ধান। তোমার সঙ্গে এ-সব বিষয় নিয়ে সবিস্তার ব্যাখ্যা করায় অসুবিধা আছে। তুমি যে আমার সেজকাকা এ-কথা তুমি কিছুতেই ভুলতে পারছো না।

সেজকাকা জোর দিয়ে উঠলেন: নিশ্চয়ই না। ছেলে হলে বেত নিয়ে আসতাম, একান্ত মেয়ে হয়েছিস বলেই—

অশ্রু গম্ভীর হয়ে বললে: তাই শুধু ধমকে অভিভাবকত্বের মাইনে নিতে এসেছ?

ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করে সেজকাকা বললেন—তাই পুরুষ দেখে বেড়ানোই তোমার পরমার্থ? এই তোমার পরীক্ষা!

অশ্রু কঠিন হয়ে বললে—Don't be vulgar. (হঠাৎ ওর ফের জয়েস-এর কথা মনে পড়লো। সব অশ্লীলতাই স্টাইলে, ব্যবহারে। *Per se* কোনো জিনিসই অশ্লীল নয়। ঐ কথাটাই যদি সেজকাকা এ-রকম করে বলতেন: নব নব জীবনের স্পর্শ ও স্বাদ পাবার জন্যে—তা হলে ভাষাটা রবীন্দ্রনাথেরো অযোগ্য হত না।)

সেজকাকা চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন—তা হলে যাচ্ছিস না তুই বাড়ি?

অশ্রুও উঠে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে খোঁপাও গেলো ধুপ করে ভেঙে। এবার অশ্রু আর খোঁপা মেরামত করতে বসলো না। দীর্ঘ, ঘন চুল—ঠিক এমিলিয়া ভিভিয়ানির চুলের মতো। সর্বাঙ্গে ওর greek contour. (contour-এর বাঙলা করা যাক দেহবঙ্কিমা।)

অশ্রু বললে—এর পরেও তুমি যেতে বল? তোমাদের কলঙ্কভাজন হয়ে!

সেজকাকা। কিন্তু তোমার নামে চতুর্দিকে তো ঢি-ঢি পড়ে গেছে। জলপাইগুড়িতে তো কম কেলেঙ্কারি কর নি।

অশ্রু। জীবনের অভিধানে ও শব্দটার বিভিন্ন অর্থ, সেজকাকা। সে-জন্যে আমি মাথা ঘামাই না, তোমরাও না ঘামালে ঘুমুতে পারবে। যে পঞ্চসতীর নাম করে তোমাদের মহাপাতক নাশ হয়, আমিও না-হয় তাদের দলভুক্ত হলাম। ক্ষতি কি?

ইদানি বেলাগুলো আচমকা পড়ে আসে; আকাশকে রোগী ভাবলে ভাবা যেতে পারে ও হার্ট-ফেল করলে। এমনি সময় ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠলো প্রভাতের আবির্ভাবে—আকস্মিক ও প্রত্যাশিত। সেজকাকা বলে উঠলেন: এই যে।

এবং কালবিলম্ব না করে প্রভাতের একটা হাত ধরে তাকে বাইরে বারান্দায় টেনে আনলেন। ব্যাপারটা বেশ নাটকীয়, নাই বা হল ভদ্রতা-সঙ্গত—আমাদের বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অনায়াসে চলতে পারে। ওরা বেরিয়ে গেলে অশ্রু খোঁপা বাঁধতে বসলো।

বারান্দায় দুটো চেয়ারে দু'জনে বসলো। স্বর নিচু করে নাকের আঁচিলটি একটু চুলকে সেজকাকা বললেন—আপনি তো অশ্রুকে ভালোবাসেন, না?

প্রভাত ঘাবড়ে গেলো ; তার চেয়ে, আকাশে ক'টা তারা আছে জিগগেস করলে একটা আন্দাজি উত্তর দেওয়া সহজ হতো। উত্তরের যাথার্থ্য প্রমাণ করতে প্রশ্নকর্তারই হতো মুস্কিল। এমন একটা প্রশ্ন নিয়ে কোনো বিজ্ঞানই ভয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে নি। যা-ই উত্তর দাও, সম্পূর্ণ হবে না। যদি বল, হ্যাঁ ; সন্দেহ ঘুচবে না ; যদি বল, না ; ঘুচবে না ভয়।

প্রভাত বললো—এখনো বুঝতে পারিনি।

সেজকাকা ভাবলেন এই বিনয়ই চরিত্রহীনতা। তবু অসন্তোষ দমন করে বললেন—অশ্রুকে বিয়ে করুন না কেন! আপদ যায় চুকে।

এর উত্তর হল কাটখোট্টা। প্রভাত ঠাট্টার স্বরে বললো—মোটে মাইনে পাই নব্বুই টাকা, ঐ টাকার মাইনেতে কিছুই চলে না মশাই।

সেজকাকা একেবারে হাওড়া ব্রিজ থেকে গঙ্গায় পড়লেন ; কিন্তু ডাঙা পেতে দেরি হল না। ডাঙা যখন পেলেন চোখ তাঁর রাগে ও অপমানে রাঙা হয়ে উঠেছে। সামনের শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর একটা ভীষণ ঘুষি মেরে বলে উঠলেন : তোমাদের এই নষ্টামি আমি দেখে নেব। বলেই ডান-হাতে কোঁচা ধরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন, অশ্রু তাড়াতাড়ি চৌকাঠের কাছে এসে হাঁকলে : তিনুকে একদিন পঠিয়ে দিয়ো কিন্তু।

প্রভাত সেই বারান্দায় চেয়ারে বসে থেকেই হাঁক দিলে ঃ বয়! চা নিয়ে এসো।

ম্যানেজারকে বলে অশ্রু ঘরে একটা ইজি-চেয়ার আনিয়েছে। রাতের খাওয়ায়ো অনেকগুলি কোর্স দেয় ; অশ্রু ভোজনব্যাপারে অতিমাত্রায় বর্বর হলেও এত সে গলাধঃকরণ করতে পারে না। ইস্কুলে যখন পড়তো তখন কম খাওয়াই ছিলো লেডি হওয়ার নিশানা,—কিন্তু লেডি হওয়ার সাধনায় ইদানি ঢিলে দিয়ে অশ্রু বড়ো-বড়ো গ্রাস মুখে পুরে শব্দ করে খায় আর অব্রাহ্ম পোষাক পরে ব্যায়াম করে। শরীর তার এত সেরেছে যে অটো ভ্যাক্‌সিন্ নিয়েছে বলে ভুল হয়।

ইজি-চেয়ারে চিৎ হওয়া যতটুকুন সম্ভব শরীরকে ততটা ঢেলে দিয়ে অশ্রু

তন্ময় হয়ে কী সব ভাবতে বসলো। মানুষের ভাবনায় অন্তত কোনো ডিসিপ্লিন খাটে না—তা প্রজাপতির মতো পাতলা পাখা মেলে উড়ে চলে। রাত এখন মন্দ হয় নি, এগারটা বাজে। পাশের ঘরে কে একটি ভদ্রলোক গুন্ গুন্ করে গান গাইছেন। সামনের দরজাটা খুলে অশ্রু তার ঘরেই চেয়ার পেতে শুয়েছে। শিগগির ঘুম আসবে না।

ইজি-চেয়ারটা সম্ভব হয়েছে পৃথিবীতে monarchy-র পতন হয়েছে বলে। ডেমোক্রেসির যুগ না এলে এমন হাত পা ছড়িয়ে আরাম করার কথা ভাবাই যেতো না। তখন সব সময়েই শিরদাঁড়া খাড়া করে বুক ফুলিয়ে বসে থাকতে হত—কখন ওপরওয়ালার হুঙ্কার আসে, এখুনিই হুকুম তামিল করতে হবে, সময় নেই। এখন আর আমরা ওপরওয়ালা বলে কাউকে স্বীকারই করি না—আমাদের হাতে এখন ঢের সময়, একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। যদি কিছু বলবার থাকে, একটা চেয়ার টেনে সামনে বসো, আস্তে-আস্তে শোনা যাবে, আমার হাত পা গুটোনো চলবে না। শরীরকে আরাম দেওয়ার মতো কীর্তি আর কিছুতে হতে পারে না। শরশয্যায় শুয়েও ভীষ্মদেব আরাম করে গঙ্গোদক পান করবার জন্যে অর্জ্জুনকে অনুরোধ করেছিলেন। আত্মহত্যা করবার জন্যে টেবিলের ওপর থেকে বিষের শিশি আনতে গিয়ে চেয়ারের পায়ায় গুঁতো খেয়ে আত্মঘাতী আহা করে ওঠে, পায়ের ওপর হাত বুলোয়। শরীর দেবতা—private divinity। এই শরীর স্পর্শ করেই নোফালিস মন্দির স্পর্শ করতেন। St. Paul-টা এমন মূর্খ, শরীর ও তার আচ্ছাদনের পবিত্রতার অর্থই নাকি আত্মার অশুচিতা। তাঁর মতে উকুন হচ্ছে দেবপূজার বড়ো নৈবেদ্য! এই সুস্থ দৃঢ় pagan শরীর একটা প্রকাণ্ড সম্পত্তি। একে সহজে কষ্ট দিতে নেই। শ্রান্ত হয়ে দুই বলিষ্ঠ পরুষ বাহুর উপাধান পাওয়ার মতো শান্তি আর কোথায় আছে। প্রভাত বেশ বলশালী, তবু যেন কোথায় খুঁত আছে। ওকে দেখা আর নন্দনকাননে ইভ-এর সাপ দেখার একই অর্থ। মিলটন পর্যন্ত তাঁর *Paradise Lost*-এ মেয়েদের ওপর চটে গেলেন। য়্যাডাম হল খালি ঈশ্বরের জন্যে, ইভ হল য়্যাডামের মাঝে যে ঈশ্বর আছেন তাঁর জন্যে। ইভ-এর চেয়ে য়্যাডাম হল বেশি সুন্দর—অশ্রুর চেয়ে প্রভাত। প্রভাতের মুখে ভীরুতাময় নির্মলতা নেই, তাই ভালো লাগে, তবু সব মিলিয়ে কেন আবার ভালো লাগে না। আকাশের ঝড় ভালো লাগে বলে নিদ্রাহীন নিদাঘনিশীথের শ্রান্তিও

ভালো লাগবে এটা বাড়াবাড়ি। কত রকম contradictions, কাটাকুটি, অসঙ্গতি নিয়ে মানুষের জীবন। ট্রেনের প্রভাতকে মনে হয় pagan, কলকাতার প্রভাতকে মনে হয় philistine। অশ্রু যেন কায়াহীন নীহারিকা। কভু ম্যাডোনা, কভু মেসালিনা, কভু ব্লু-স্টকিঙ। কভু রাধা, কভু রামী। তরকারির স্বাদ যেমন নূনে, জীবনের স্বাদ তেমনি তার contradictions-এ। এক নিয়মকে চিরকাল আঁকড়ে থাকে তারাই যারা বামন, আকাঙ্ক্ষায় যারা বেঁটে। ক্যাস্টর-অয়েল শরীরের পক্ষে মাঝে মাঝে উপকারী বলেই তাকে চিরকালের জন্যে খাদ্যে রূপান্তরিত করে নেওয়া ও চিরকালের জন্যে জীবন-ধারণের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া একই কথা। একমাত্র তারাই consistent যারা মৃত। যে বাঁচবে সে বাড়বে, আপনাকে নিয়ে বারে বারে ছাঁটকাট করবে, ফ্লানেলের জামার মতন জীবনো তার বারে বারে খেপে যাবে। নইলে না আঁচিয়ে খালি বসে বসে একঘেয়ে খাওয়ার মধ্যে স্বাস্থ্য নেই। নিজের সঙ্গে বারে বারে সাক্ষাৎকার হওয়া দরকার, নানা আত্মার দর্পণে নিজের নানা প্রতিকৃতি। একই নারী একজনের স্ত্রী হয়ে আরেকজনের মা। Prism যেমন আলোর বিভিন্ন রঙ প্রতিফলিত করে, তেমনি মানুষের আত্মা। নির্মলের কাছে সে যা, প্রভাতের কাছে তা নয়। নির্মলটা সত্যিই কী কঠিন, নির্মলো ঠিক স্ফটিকের মতো। আত্মা এবং দেহের পার্থক্য বোঝে না। যাকে আত্মা দেবে তার কাছে আত্মদান করতে না পারলে ওর প্রেমের পরিপূর্ণতা নেই। যার আত্মা ও আবিষ্কার করতে পারবে না তাকে স্পর্শ করতেও ওর লজ্জা। প্রেমের পরিণতিই হচ্ছে বিবাহ—ওর কাছে। তাই অশ্রুর উৎসুক অধরকে উপবাসী রেখে ও বললে : যদি আমার সঙ্গে গৃহ নাও, তবেই আমার ইহকালটা তোমার তৃষ্ণার্ত অধরে ক্ষয় করে দিতে পারি, নচেৎ নয়। অশ্রুকে ও প্রত্যাখ্যান করলে। অশ্রু বিয়ে করতে চায় না অথচ প্রেম প্রত্যাশা করে এটা নির্মলের কাছে ব্যভিচার। নির্মল এখনো টেনিসনের প্রতিবেশী। বিয়ে করবার কুৎসিত কৌতূহল অশ্রুর নেই বলে দুটো চুমু খাওয়ায় যেন সূর্য-চন্দ্র ধর্মঘট করে বসবে। আখ খাবার জন্যে দাঁত উপযুক্ত মজবুত নয় বলে মোহনভোগ খাওয়া যাবে না এটা চরিত্রের একটা বড়ো কৃতিত্ব নয়। তা হলে একজামিন দিতে যাবার আগে লিখে-পড়ে প্রস্তুত হওয়ারো কোন সার্থকতা নেই। স্টেজে নামবার আগে যেন রিহার্সেল দিতে হবে না। সাঁতার শিখতে গিয়ে জলে একবার ডুব

দিয়ে নিলে সেটা ব্যভিচার। নির্মল ওকালতি করলে পয়সা পেতো। নির্মল! ওদের ইস্কুলের একটি মেয়ে একবার নির্মল বানান করেছিলো দন্ত্য ন-য় দীর্ঘ ঈ দিয়ে। ঐ বানানটি ভুল হলেও ওর ভালো লাগে। ঐ ভুল বানানে শব্দটার একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। শব্দের বানান ও মানুষের ব্যবহার নিয়ে কোনো কানুন করতে যাওয়াই অন্যায়। বাঙলা ভাষা থেকে তিনটে স, দুটো ন, দুটো জ কবে নির্বাসিত হবে। সোজা হতে পারলেই সব সহজ হয়ে যায়। বাঙলা টাইপ-রাইটারে একটা উ লিখতে হলে তিনবার চাবি টিপতে হয়, ততক্ষণে ইংরাজিতে God বা Sex লেখা হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ বাঙলা অক্ষরগুলিকে রোমান অক্ষরে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছেন সেটা ভালোই। অশ্রুর নাম ভাগ্যিস নগেন্দ্রবালা হয়নি। নামের মধ্যে সত্যিই একটা চরিত্রাভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শেলি বললেই মনে কেমন আবেশ আসে, *Adonais*-এর frail form-এর কথা মনে পড়ে। রসেটি ছাড়া ইংরেজ লেখকদের কারুর নামে vowel-ending আছে বলে তো মনে হয় না! ফিললজি পড়তে বড়ো ইচ্ছা করে। একবার ওদের ইংরিজি অনার্স ক্লাশের একটি মেয়ে মাস্টারকে বলেছিলো: আমাদের ফাইললজি ক্লাশ কখন হবে? মাস্টার বলেছিলেন: আমাদের ফাইলসপি ক্লাশের পরে। আরেক বার কোন একটা ছেলে-কলেজে মাস্টার বোর্ডে নোটিশ দিয়েছিলেন: Mr So and So will not take his classes। একটা ছেলে দুষ্টুমি করে classes এর c-টি দিলো মুছে। পরদিন মাস্টার এসে ব্যাপারটা দেখলেন এবং গম্ভীর হয়ে l-টিও মুছে দিলেন। ওদের ক্লাসের মেয়েগুলি কী অসম্ভব রকম খারাপ কথা বলতো। কলেজের মেয়েদের সম্বন্ধে ছেলেদের ধারণা ওরা যেন সব Dresden China, ঝক্‌ঝকে, নির্মল। আবার নির্মল! অশ্রুকে সে হয়তো ভাবতো Psyche, নিজে কিন্তু Pan হয়ে ওর গুহায় কোনো দিন এলো না। কী কঠিন, স্বয়ং Circe এলেও হয়তো কেঁদে কেঁদে আত্মহত্যা করতো। সেই বিশ্রী দঙ্গলের মাঝে একটি মেয়ের সে দেখা পেয়েছিলো—ক্ষণকালের জন্যে—নাম তার ইন্দিরা। রবীন্দ্রনাথকে চুরি করে বলতে হয় মেয়েটি যেন আত্মার শিখা; আর অতি-আধুনিক ভাষায়—আত্মার ফোয়ারা! শেলির Asiaও এর তুলনায় স্থূল। সমস্তটি দেহ যেন একটি ভঙ্গি, ইসারা! যেন দেবী Diana! বাঙলার সরস্বতীর চেয়ে সুকোমল, উর্মিলার চেয়ে নিঃশব্দচারিণী! গোধূলির

শেষ রশ্মি দিয়ে ওকে তৈরি করা হয়েছে। মাটিতে এসে যে কেন ও পা ঠেকালো আকাশের তারারা বলতে পারে। কী চমৎকার গান গাইত! ওর শরীরে যেন স্নায়ু নেই, খালি সুর! এই ধূলির ধরিত্রীতে ও আকাশের বাণী নিয়ে এসেছিলো। কলেজে কারু সঙ্গে মিশতো না, চুপ করে কোণটিতে বসে বই পড়তো। একবার আমাকে শুধু বলেছিলো: প্রেমের চেয়ে আর্ট বড়ো, আমি সেই আর্টের উপাসিকা। সেই ইন্দিরাকে নির্মল বিয়ে করেছে। বিয়ে না করতে পারলে যেন ওর ঘুম হতো না। আনন্দের চেয়ে যেন আরাম বড়ো। প্রেমকে দীর্ঘায়ু করতে ও ভোগকে দীর্ঘ করতে চায়। যেন প্রেমের তীব্রতার চেয়ে সম্ভোগের দীর্ঘতাটাই বেশি কাম্য। যেন কতকগুলি তালি দিলেই জুতো টেঁকে! আমরা খালি বন্ধন দিয়ে টেঁকাবার জন্যেই ব্যস্ত; গ্রীন-হাউসে কৃত্রিম উত্তাপ দিয়ে যেমন পরদেশী গাছ বা আগাছাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, তেমনি বিয়ে করে আমরা প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। কাঁচের ঘরে ঢিল পড়ে, গাছ যায় কুঁকড়ে, মরে; তার চেয়ে খোলা হাওয়া অনেক ভালো। সন্তানকে বৈধ করতে গিয়েই প্রেমের ঘটছে সর্বনাশ। তবে বিয়ে করায় অনেক সুবিধে—ঝক্কি কম। খাও, দাও, প্রসব কর—ইহকালের ষোলকলা পূর্ণ হল। জন্ম-শাসন পর্যন্ত নীতিসঙ্গত নয়, কেন না ধর্মের আদিম উপদেশকে অমান্য করা হয়। কলকাতায় কোনো বার্থ-কন্‌ট্রোল clinic নেই কেন? ধন্য শহর এই কলকাতা! এসব নিয়ে কিছু কলাকৌশলের কথা বলতে গেলেই প্রসিকিউশন! কিন্তু কে জানে পরে হয়তো খোলাখুলি দেখিয়ে-শুনিয়ে শিখিয়ে তুলতে হবে। সমুদ্রের তরঙ্গ গর্জন শুনে যেমন মন প্রশান্ত হয়, কলকাতাও তেমনি আত্ম-বিস্মৃত করে। ল্যাম্বের মতো শহর খুব ভালো লাগে আমার। কবিত্বশক্তি থাকলে আমি জনতার কবি হতাম। গাঁয়ে যাও, সামান্য একটা মাছির শব্দ তোমাকে উচাটন করে দেবে,—সব আওয়াজ সেখানে আলাদা-আলাদা, বাঁশের পাতায় হাওয়ার শব্দ, ঘরে ফেরা গরুর ডাক, পাপড়ির ওপর শিশির পড়ার শব্দ। বাবাঃ, কান পেতে এত শুনতে হয় বলেই গাঁয়ে মন ওঠে বিষিয়ে, সব কিছু দেখা ও শোনার অর্থ ভীষণতমরূপে স্পষ্ট বলেই গাঁয়ে গিয়ে মনের আর ছুটি থাকে না, সেটা প্রকাণ্ড জুলুম। লাখো লাখো কোলাহলকে পাঞ্চ করে খেয়ে কলকাতা যেন একটা মত্তমত্তা দানবী-র মতো আর্তনাদ উগরে দিচ্ছে। কান খাড়া রাখতে হয় না, মন জুড়োয়, ঘুম পায়। বিকেলবেলা

যে-মুটেটা মোটরের মাড-গার্ডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলো তার কান্না ঐ ফিরিওয়ালার হাঁক থেকে আলাদা করে নেওয়া অসম্ভব,—একটা ঢেউ থেকে আরেকটা ঢেউকে ছিনিয়ে নেয় কার সাধ্য। সমুদ্রে ফেনা, শহরে মানুষ। কেউ কাকে চেনে না। পাশের ঘরে ভদ্রলোকটি যে গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইছেন তিনি এটিকেট বাঁচাতে ককখনো এঘরের চৌকাঠ মাড়াবেন না; আর আমি যদি দরজা ঠেলে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকি গল্প করবার জন্যেই, নির্মলের ভাষায় সেটা হবে ব্যভিচার। ঐ ভদ্রলোক যদি আজ রাত্রে আত্মহত্যা করেন, তবেই ঐ ঘরে ঢোকা আমার সম্ভব হতে পারে; কিংবা এখুনি যদি হোটেলে আগুন লেগে যায়, ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা অসতর্ক কোলাকুলি হলেও বেমানান হবে না। শুক্তির মতো আমরা নিজের নিজের খোলার মধ্যে আত্মগোপন করে সংকুচিত হয়ে আছি। 'কাছে থেকেও দূরে'—কথাটায় কবিত্ব আছে; সেটা অর্থবান হয়ে ওঠে প্রতিবেশীর বেলায়। এত কাছে যে মনে হয় nuisance, এত দূরে যে গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা আমরা প্রভাবিত হলেও কোনো কালে প্রতিবেশী দ্বারা হবো না। এমন মেয়ে নেই যে আয়নায় দাঁড়িয়ে মুখের চেহারা না দেখেছে এবং না ভেবেছে আমি একজন পরমা সুন্দরী। মানুষের মুখের চেয়ে সত্যিকারের আয়না কী আছে পৃথিবীতে! সেখানেই আমাদের সত্যিকারের ছায়া পড়ে, সেখানেই আমরা সৌন্দর্যের পরখ করতে পারি। সৌন্দর্য খালি গুণবত্তায় নয়, আত্মার মাধুর্যে নয়—পোষাকে, খোঁপায়, দাঁড়াবার বা শোবার ভঙ্গীটিতে। বাঙালি মেয়েদের পোষাকে রঙ নেই, বৈচিত্র্য নেই;—এটা জাতীয় শুভলক্ষণ নয়। আজ গ্লোবে গিয়ে যতগুলি মেম দেখলাম সব ক'টার পোষাকের রঙ আলাদা,—দেখলে, রামধনু লজ্জায় মিলিয়ে যাবে। তবু পরিচ্ছদ আমরা ভালবাসি; ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা করতে গিয়ে আমরা পরস্পরের শাড়ি ও খোঁপার তারতম্য বিচার করি। ছেলেরা ফুটবল আর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে যেমন সুখ পায়, আমরাও বেঁচে যাই পোষাক বা স্বামীর কথা বলে। সে-থিয়েটারে আমরা যাইনে যেখানে সামাজিক নাটক অভিনীত হয়, কেননা পোষাক নেই। 'সীতা'র পরে 'ষোড়শী' দেখে অনেক মেয়ে ভেবেছিলো ওটা একটা কমিক, কেন না serious হলে পোষাক থাকতো। যাই বল, পোষাকের একটা নৈতিক মূল্য আছে। একটা ভালো ছাঁটের ব্লাউজ গায়ে দিলেই পৃথিবীকে লাগে সুন্দর,

আকাশকে মনে হয় লোভনীয়। শাড়িটা যদি লম্বায় মোটে চুয়াল্লিশ ইঞ্চি হয় তবে নিশ্চয়ই সে রাতে ভালো ঘুম হবে না, দুঃস্বপ্ন দেখবো। সিল্ক না পরলে রবীন্দ্রনাথ ককৃখনো এত বড়ো কবি হতে পারতেন না। সাহেবেরা যে ডিনারের আগে ড্রেস করে তা শুধু ভালো হজম হবে বলে। কিন্তু পোষাক অর্থ কি তার দৈর্ঘ্য না হ্রস্বতা! পোষাকের বেলায় একটু বাহুল্য থাকা ভালো, নইলে রহস্য-বিরহিত হলে মেয়ে আর মোয়া একজাতীয় হয়ে উঠবে। চুল ছেঁটে ফেলায় সুবিধে অনেক, কিন্তু ওটাই বাঙালি মেয়ের বিশেষত্ব, তার নিজস্ব হেডড্রেস। দেশের একটা নিজস্বতা থাকা ভালো; যদিও Bendaর মতে স্বদেশপ্রেমই হচ্ছে পৃথিবীর সব চেয়ে অনিষ্টকারী। সেটা ভারতবর্ষের বেলায় খাটে না। কেন না যে-দেশ পরাধীন তার বিশ্বপ্রেমের স্বপ্ন দেখা আর কুঁজোর চিৎ হয়ে শোয়া সমান হাস্যাস্পদ। উৎকট স্বদেশপ্রেমের জন্যে সব দেশ মিলতে পাচ্ছে না—এটা তখনিই ভারতবর্ষের পক্ষে সমস্যা হয়ে উঠবে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন, স্বতন্ত্র। আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে কী করলাম? চুল বাঁধলাম আর প্রেম করলাম। তা-ও একটা মনের মতো করে করতে পারলাম কৈ? কোথাও যেন পূর্ণতা নেই। আচ্ছা, চোখ বুজে বিয়ে করে ফেললে কেমন হয়—একেবারে একটি নিরীহ অচেনা লোককে! সেই বিয়ের সভা থেকে পালিয়ে না এলে এতদিনে আমার কী রকম চেহারা হত! সেই চেহারায় আমাকে মানাতো না। কতগুলি চেহারা আছে যাদের মরলেই বেশি মানায়—যেমন ধরো ইফিজেনিয়া। বার্ণার্ড শ'-র ছেলেপিলে থাকলে তাঁর লেখার দাম অনেক কমে যেতো। আমার সমবয়সী পিসতুতো বোন পুষি যে ছ'টি সন্তান প্রসব করে শরীরে ও মনে মীইয়ে পড়েছে তার এক চুল এদিক-ওদিক হলে সৃষ্টির সামঞ্জস্য থাকতো না। পুষিকে ওর স্বামী যে-সব চিঠি লিখতো তার দুয়েকটা পড়েছিলাম—উঃ, কী ভালগার! অথচ ওর স্বামী একজন সংস্কৃতে এম-এ। স্বামীর বিরুদ্ধে ডিফামেশান আনা যায় কি না জানি না; বাঙলা দেশে ডিভোর্স থাকলে ঐ রকম একটা চিঠিই যথেষ্ট। এগুলি ন্যায়সঙ্গত, এতে চরিত্রহানি হবার সম্ভাবনা নেই। স্ত্রী-র সঙ্গে ব্যবহারে ব্যভিচার বলে কোনো শব্দ নেই। দেয়ালে একটা টিক্‌টিকি পোকা ধরবার জন্যে ওৎ পেতেছে। পোকাটা এমন বোকা যে বুঝতে পারছে না; ধরা দিলেই যেন ওর মোক্ষলাভ হবে। আরশোলা, টিক্‌টিকি, ছারপোকা, ইঁদুর, কেঁচো, জোঁক, কচ্ছপ,

বিছে, বিধাতার কী অপূর্ব সৃষ্টি। লরেন্স মশা নিয়ে কবিতা লিখেছে—কচ্ছপ নিয়ে। শুধু তাই নয়, চাম্‌চিকে আছে, গুগ্‌লি আছে। যাব কোথা? গো-সাপের কথা নাই বললাম। বিধাতার রুচি ভালো! লিংকন বলতেন: গরিবদের ওপর ভগবানের গভীর মমতা, নইলে ঝাঁকে-ঝাঁকে এত গরিব সৃষ্টি করবেন কেন? ফুলের চেয়ে আগাছাকেই প্রকৃতি বেশি ভালোবাসে, তাই পৃথিবীতে যতো ফুল তার চেয়ে ঘাস বেশি। দুয়েকটা মশা কামড়াচ্ছে, ঘুমুতে যেতে বলছে। ঘুমোবার আগে বাথরুমে যেতে হবে—দাঁত মাজতে হবে। দাঁত না মাজলে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখবো। দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরবার লোক নেই পাশে। থাকলে সেটাই একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন হতো। বিছানায় পাশ-বালিশ আমি পছন্দ করি না। প্রভাতের কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে রাখলে মন্দ হত না, এখন একটু চেষ্টা করা যেতো। এমন কোনো dentifrice নেই যে নিকোটিন্‌এর কোটিং তুলতে পারে। সিগারেটটা unaesthetic তো বটেই, চুমোর স্বাদ কেড়ে নেয়। তবু এখন একটু ধোঁয়া ছাড়তে পারলে কী এমন মন্দ হত! কোনো ভদ্র মেয়ে কোনো দিন গাঁজা খেয়েছে? খায় নি, অথচ গাঁজার গল্প করতে ওস্তাদ। কেন খায় নি? কৌতূহল হয় না? গাঁজা না খেয়ে মরলে সেই মৃত্যুটা অসার্থক মনে হয় না? বায়স্কোপের সবগুলি গল্প গাঁজাখুরি—মানে, conclusionগুলি। সব filmএর শেষেই জোড়াতালি দিয়ে বিয়ে ঘটাতেই হবে। বিয়ে অমনি হলেই হল। যেখান থেকে গল্পের শুরু হওয়া উচিত, সেখানেই ওরা যবনিকা ফেলে দেয়। মাতার জঠরে শিশুর বন্দীত্ব নিয়ে কেউ একটা গল্প লেখেনি কেন, কিংবা মৃত্যুর পরে। অভিজ্ঞতাই কাব্যকারক নয়, প্রতিমা বা কল্পনাই কাব্যকারক। সংস্কৃত আলংকারিকরা তা বুঝতেন। বামন কিন্তু রীতি বা স্টাইলকেই বলেছেন কাব্যের প্রাণ; রস নয়। বাঙলা দেশে সবাই বেমালুম আওড়াচ্ছে: সত্য, শিব, সুন্দর। ঐ তিনটে শব্দের কোনো মানে নেই, এমন কি ওদের ধ্বনি-মাধুর্য পর্যন্ত কমে এসেছে। বাথরুমের বাল্‌ব্‌-টার আবার কী হল? মুস্কিল। এখন মুখ ধুই কি করে? যাক্‌। এতেই হবে—হ্যাঁ, জলের টাম্বলারটা পাওয়া গেছে, জলগুলিতে স্বাদ নেই। আঃ, মোলায়েম! রবিঠাকুর প্রেম-এর সঙ্গে 'এলেম' মিলিয়েছেন, তার চেয়ে 'মোলায়েম' ভালো মিল। মশারি টাঙানো আমার দ্বারা পোষাবে না। যে গরম, ব্লাউজটা খুলে ফেলতে হবে—শাড়িটাও

নিতে হবে বদলে। নাঃ, মশা আছে—না-ঘুমিয়ে ছটফট করে রাত কাটাবার মতো প্রেমের বয়স চলে গেছে—আমার তো বটেই, পৃথিবীরো। দরজাটায় খিল ভালো করে আঁটতে হবে বৈ কি; কেননা আততায়ী এলে স্যুটকেস থেকে ছোরা বার করে প্যাঁচ দেখানোর ঝামেলা অনেক। আততায়ীর হাতে নিশ্চয়ই এতটা সময় নেই যে ইজি-চেয়ারে বসে দু'ঘণ্টা তর্ক করবে। শোয়া যাক। আমি তো শুলাম, কিন্তু এ-কথা খুব সহজেই ভাবা যেতে পারে যে এ-রাত্রে এখন কারু কারু ঘুম আসছে না। ধরা যাক্ রুগী, এঞ্জিন-ড্রাইভার, সিগনেলার, নবদম্পতি, বেশ্যা। আমার আবার মস্ত দোষ আছে। শাদা ঘোড়ায় চড়ে টগবগ করে ছুটছি—এই কথা না ভাবতে পারলে আমার ঘুম আসে না। আমার পেছনে তেত্রিশ কোটি সৈন্য,—আমার তুলনা শুধু আমিই। আমার আগে কোনো ইতিহাস হয়নি। বাঁ কাৎ হয়ে পিলের দিকটা চেপে ধরলে আমার সহজে ঘুম আসে—শাদা ঘোড়া কুয়াশা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, টিকটিকি, ক্যাঙ্গারু, ইজিচেয়ার, তোয়ালে, বার্ণার্ড শ'র দাড়ি, চেস্টারটনের ভুঁড়ি, সেজকাকার আঁচিল, টিঙ্কচার আইওডিন, হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড, বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং, সেনেট হাউস, স্মেলিং সল্ট, বৈঠকখানা রোড, বাডেন-বাডেন, মুসোলিনি, শরৎ চাটুজ্জে, ক্যালেণ্ডার, পাটনা, গোলঘর, গঙ্গা…

প্রভাত বললে—তিন দিনের আগে তুমি বার্থ পাচ্ছ না। তাও 13 up-এ শেয়ালদা থেকে যে-ট্রেনটা বেনারস হয়ে দিল্লি যায় সেটায়। 7 up-এ একটা আপার বার্থ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তোমার পক্ষে সেটা সুবিধের হবে না।

অশ্রু বললে—তাও একটা মাত্র।

প্রভাত। আপাতত একটা হলেই চলবে।

অশ্রু। তার মানে? আমি একা যাব নাকি?

প্রভাত। কাজেকাজেই। ছুটি পাওয়া গেলো না।

অশ্রু। ছুটি পাওয়া গেলো না মানে?

প্রভাত। যদি শুদ্ধ ভাষায় বললে কথাটা তোমার বোধগম্য হয়, তা হলে বলি, অবকাশের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

অশ্রু। এ-চাকরি তুমি ছেড়ে দাও।

প্রভাত। প্রেমের জন্যে এত বড়ো আত্মত্যাগের কথা শুনলে বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগৎ আমাকে উপহাস করবে! বিরহের চেয়ে ক্ষুধা মারাত্মক। তোমার সঙ্গ—আমার খুব কামনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তার জন্যে চাকরি খুইয়ে মা ও নাটুকে শুকিয়ে মারবো এত বড়ো প্রেমিক তোমাদের সত্যযুগেও মানাতো না। সে-সব যুগে সুবিধে ছিলো এই, বাড়িতে সব সময়েই খাবার থাকত। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তিটা প্রশংসনীয় হতে পারলো এই জন্যই যে ঊর্মিলাকে উপোস করতে হয়নি। ইস্কুল-মাস্টাররা তো নর-নারীর প্রেমের চেয়ে ভগবদ্ভক্তিকে উঁচু আসন দেবেন—যদিও সত্য কথা বলতে গেলে দু'টোর কোনোটাই ক্ষুধার মতো প্রবল নয়। তবু আজ যদি আমি ধর্মেরো ডাক শুনে মা ও ভাইকে ফেলে গৃহত্যাগ করি, এতো বড়ো অধর্ম পরশুরামও ভাবতে পারতো না।

অশ্রু। তা হলে কী হবে?

প্রভাত। সমস্যা মোটেই কঠিন নয়। টিকিট লাহোরেরই কেটে সোজা পাটনায় চলে যাও এখন। সেখানে না তোমার কে বন্ধু আছেন!

অশ্রু। সে এলাহাবাদ-ব্যাঙ্কে বদ্‌লি হয়েছে।

প্রভাত। ব্যাঙ্কে বদ্‌লি হয়েছে মানে?

অশ্রু। ঐ hybridটায় দুটো অর্থ বোঝা গেলো। মানে সে ব্যাঙ্কে কাজ করে—নিশ্চয়ই ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে—এবং পাটনা থেকে বদলি হয়েছে এলাহাবাদে।

প্রভাত। (হেসে) তা হলে তোমার পাটনা পিট্‌টান দিলে?

অশ্রু। তা তো দিলে, কিন্তু তুমি করবে কী।

প্রভাত। কী আর করব! আফিস থেকে এসে হাই তুলবো আর তুড়ি দেব। নিত্যকালের মতো কলকাতা আবার কালিয়ে যাবে।

অশ্রু। না, ঠাট্টা নয়, be serious।

প্রভাত। সিরিয়াসই তো হচ্ছি। ছুটি পেলাম না এর চেয়ে গুরুতর বা গম্ভীর কথা আর কী হতে পারে! আজ বুধবার, চলো শনিবারে তোমাকে তুলে দিয়ে আসি। সোজা এলাহাবাদই যাও।

অশ্রু। হ্যাঁ, ঐ রদ্দি ট্রেনে চড়ে একা-একা ছটফট করতে-করতে আমি মারা যাই আর কী! ঐ ট্রেনে চড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাইনে। তার চেয়ে এক কাজ করি, এস। তোমার পুজোর কদিনো কি ছুটি নেই?

প্রভাত। আছে। মোটে তিন দিন। সেই তিন দিনে এলাহাবাদে যাওয়া এবং আসা ছাড়া তিনটে কথা বলবারো সময় পাব না। কিন্তু সেই পুজোর তিন দিনেরো দেরি আছে। তুমি ততদিন কলকাতায় থাকবে নাকি? এই হোটেলেই? তা হলে ততদিনে তোমার মনি-ব্যাগটি পটল তুলবেন।

অশ্রু। না, আমি এই ফাঁকে কটা দিন পুষি-দির বাড়ি কাটিয়ে আসি।

প্রভাত। সে কোথায়?

অশ্রু। দিলদারনগরে,—মোগলসরাইয়ের ডাইনে। মেইন লাইনেই পড়বে। তোমার সাধের 13-up বোধ হয় ওখানে একটু বিশ্রাম নেবেন। দেখি টাইম-টেবলটা?

টাইম-টেবলটায় চোখ বুলিয়ে অশ্রু বললে—একটা দশ মিনিট। মন্দ নয়। তোমার ছুটির তারিখ আমাকে জানাবে, আমি সেই অনুসারে দিলদারনগর ছাড়ব। দু'জনের সাক্ষাৎকার হবে এলাহাবাদে।

প্রভাত। আমাকে কি তোমার সেই বন্ধু জায়গা দেবেন?

অশ্রু। কেন, এলাহাবাদে পঁচিশ গণ্ডা হোটেল, তা ছাড়া যমুনা আছে।

প্রভাত। তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমাকে কেনই বা যেতে হবে—

অশ্রু। সেটা বুঝছ না? এমনি, বেড়াতে—দুটো দিন অন্যরকম আকাশ দেখতে, অন্যরকম আবহাওয়া। অন্যরকম কথাবার্তা। তোমার যদি যেতে ইচ্ছে না করে, সে আলাদা কথা। জোর করে সম্মতি আদায় করবার মতো অসভ্যতা আমার নেই। বেশ, আমি একলাই যাবো।

অশ্রু রীতিমত অভিমান করেছে। তাড়াতাড়ি কোনো কথা কয়ে এই অভিমানের কুয়াশাটুকু উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাই বোকামি। প্রভাত চুপ করে রইলো।

অশ্রু বলে চললো: আমাকে নিয়ে তোমার মনে নানারকম সন্দেহ চলেছে আমি বুঝি। কী যে তুমি আমাকে ভাবছ না, জানি না। এই দীর্ঘ তিন বছর পরে হঠাৎ অজ্ঞাতবাস ছেড়ে কেন আবার তোমার একান্ত কাছে এসে পড়লাম —এই প্রশ্নটার উত্তর আমি দেব। শুনবে?

ট্যাক্সি চৌরঙ্গিতে এসে পড়েছে। এম্পায়ারে ওদের যাত্রার আজ শেষ হওয়ার কথা কথা ছিল, কিন্তু অশ্রু ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বারণ করলে। গাড়ি চললো দক্ষিণে।

প্রভাত বললে—যাবে না ?

অশ্রু। না। তোমাকে সেই ধাঁধাটা বুঝিয়ে দেব, শুনবে ব্যাখ্যাটা ?

প্রভাত। তা যদি বলো, ব্যাখ্যার চেয়ে ধাঁধা অনেক সত্য, অনেক মধুর। ধরে নাও গ্রহতারার ষড়যন্ত্রে আবার আমাদের দেখা হয়েছে।

অশ্রু। না, ষড়যন্ত্র নয়। আমি এতদিন ইচ্ছে করেই নিজেকে লুকিয়ে ছিলাম। এই তিন বছরে আমি তোমার পরীক্ষা নিয়েছি। দাঁড়াও, আমাকেই সবটা বলতে দাও। পরিষ্কার কথাকে আমরা ভয় করি বলেই দেহ-মনে এত অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছি। সামান্য রুমাল নিয়ে ওথেলো যে-কাণ্ডটা করে বসলো, মাথা ঠাণ্ডা রেখে তা নিয়ে পাঁচ মিনিট ডেস্‌ডোমোনার সঙ্গে কথা কইলে ব্যাপারটা ট্র্যাজিডি না হয়ে ফার্স হতো। তোমার সঙ্গে আমার গভীর হৃদ্যতা হয়েছিলো এবং তারই টানে বিয়ের সভা থেকে আমি উঠে এসেছিলাম। কিন্তু তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমাকে বিয়ে করে তোমার পরম সর্বনাশ ঘটাবো, আমি তোমার তেমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নই। তা ছাড়া তখন বিয়ে করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, আজো হইনি; কারণ আজো আমি শ্রান্ত নই, নিজেকে নিরাশ্রয় নিরালম্ব ভাববার মতো দৌর্বল্য আমার আসেনি। চলে গেলাম জলপাইগুড়ি সামান্য টিচারি নিয়ে। বাড়ির সদর দরজায় খিল পড়লো, বাবা দুর্ভাষায় দুর্বাসাকে পর্যন্ত অতিক্রম করলেন; আত্মীয়-স্বজনেরা কলঙ্কিনী বলে আখ্যাত করে আমাকে তাঁদের পুত্রী-পৌত্রীদের কাছে নরকের দ্বাররূপে দাঁড় করিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। সে-সব আমি নীরবে সহ্য করেই তীব্র প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু তারপরে জলপাইগুড়িতেই একটা কাণ্ড ঘটে গেলো।

প্রভাত নিবিষ্টমনে সিগারেট টানছে। অশ্রু খোঁপাটা ঘাড়ের ওপর জুৎ করে বসিয়ে বলে চললো : সেই কথাই তরশু সেজকাকা বলতে এসেছিলেন। কাণ্ডটা আর কিছু নয়, আরেকজনকে ভালোবাসলাম। তোমাকে তখনো ভুলিনি, তোমার প্রতি আমার মমতা স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহের মতোই অপরিসীম, তবু চিত্ত আবার উন্মুখ হয়ে উঠলো। নবাবিষ্কারের আশায় অধীর মনকে বাঁধি কি করে ? তুমি shocked হচ্ছ ?

হাওয়ায় সিগারেটের ছাই উড়িয়ে দিয়ে প্রভাত বললে—না।

—এমন পুরুষ আছে যার জন্যে হৃদয়ে শুভকামনার আর অন্ত থাকে না, রাতে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে তার কথা ভাবতে ইচ্ছে হয়, ভাবলে ভালো

লাগে এবং এত ভালো লাগে যে চোখে জল আসে। সে অসুস্থ হলে অজস্র সেবায় তার জন্যে দেহপাত করতে সাধ হয়, সে বিপন্ন হলে তার জন্যে নিজেকে রিক্ত উন্মুক্ত করে দেবার উন্মত্ততা আসে। সে আমার তুমি। কিন্তু এমন পুরুষেরো দেখা পেলাম যাকে জয় করবার জন্যে প্রাণে জাগে প্রচণ্ড লোভ; যার নৃশংস ঔদ্ধত্যকে স্ত্রৈণতায় রূপান্তরিত করবার ইচ্ছা হয়। সে তার অবিচল পবিত্রতার পাহাড় থেকে নেমে এসে আমার পায়ের ধুলায় কলঙ্কিত হবে এত বড়ো প্রলোভন দমন করতে ক্লিওপেট্রা পারতো কিনা জানি না, আমি পারলাম না। আমি গেলাম এগিয়ে, কিন্তু হটে এলাম। সে আমার নির্মল। তুমি শুনছ?

প্রভাত। শুনছি, কিন্তু কথাটা এমন কিছু নয় যে, তোমাকে এত উত্তেজিত হতে হবে!

অশ্রু। নির্মলের কথা বলতে গিয়ে আমি উত্তেজিত না হয়ে পারি না। খুব ধীরে ধীরে একটা যুদ্ধ বা ভূমিকম্পের বর্ণনা করলে সে-বর্ণনা ব্যর্থ হবে। আমি দু'জনকে ভালবাসলাম; কিন্তু সত্য কথা বলতে যদি বাধা না দাও তো বলি, আজো আমার ভালোবাসার অন্ত পাইনি।

প্রভাত। যেন না পাও, তাই প্রার্থনা করি। নতুন-নতুন অচরিতার্থতায় প্রেম তোমার মহনীয় হয়ে উঠুক।

অশ্রু। নির্মলকে পারলাম না পরাভূত করতে, আমার প্রেম কিন্তু তবু সংকুচিত হল না। যে-প্রেমের পরিণতি বিবাহ নয় এবং যে-বিবাহের পরিণতি সন্তানজনন নয় সে-প্রেম ও বিবাহকে নির্মল ঘৃণা করে। আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি হলুম না বলে সে আমার চুম্বন পর্যন্ত সহাস্যমুখে প্রত্যাখ্যান করলে। জলপাইগুড়িতে প্রায় দু'বছর আমার এই ভীষণ পরীক্ষা চলেছে। বাইরে হারলাম বটে, কিন্তু অন্তরে বলবতী হয়ে উঠলাম। সেই পরীক্ষার সাক্ষীরূপে যাকে পেলাম সে আমার ব্যর্থতা।

অশ্রু চেয়ে দেখলে প্রভাত গদিতে ঠেস দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনছে।

—নির্মলকে হারালাম বটে, কিন্তু তোমাকে হারাবো ভাবতে মন কেঁদে উঠলো। এই তিন বছরে তুমি হয় তো অনাত্মীয় হয়ে গেছ, হয় তো অশ্রুর নাম তোমার সেদিনকার অশ্রুর মতোই মুছে গেছে, তবু তোমাকে না ডেকে পারলাম কৈ? দেখলাম সেই ডাকে তুমি সাড়া দিয়েছো, মনে হল আমি যদি ভুলক্রমে নির্মলের অন্তঃপুরিকাও হতাম, তুমি এমনি করেই সাড়া দিতে!

প্রভাত। আর আমি যদি এতো দিনে একটি অন্তঃপুরিকাকে অন্তরে এনে প্রতিষ্ঠিত করতাম ?

অশ্রু। তা হলেও আমার ডাক অনুচ্চারিত থাকতো না। তোমার স্মৃতি আমার জীবনের একটা বিশ্রাম-নীড়। তোমাকে নিয়ে যদি আনন্দার্ত না-ই হতে পারি, তবু তোমার প্রতি আমার সুশীতল এই স্নেহটি অমর হয়ে থাকতো। কিন্তু এই দীর্ঘক্লিষ্ট দিন-রাত্রির অত্যাচার তোমাকে বশীভূত করতে পারেনি,—আজো তুমি মুক্ত। তুমি নির্মলের মতো বিয়ে করনি। কেন করনি ?

প্রভাত। সে একটা accident! যদি আমাকেও পরিষ্কার করে কথা বলবার অনুমতি দাও তো বলি, তোমাকে ভালবেসেছি বলেই অন্য কাউকে আমি বিয়ে করবো না, সন্ন্যাসধর্মের এই উচ্চাদর্শ আমার সামনে উপস্থিত নেই। তা ছাড়া বিয়ে করার কতকগুলো ব্যাবহারিক সুবিধে আছে; আমার মা বুড়ো হয়েছেন, অবস্থা এত স্বচ্ছল নয় যে রান্নার জন্যে লোক রাখি—মা-ই সব করেন; বৌ এলে মাকে ছুটি দিতে পারতো। তাই বলে বৌকে যে ভাল লাগতো না, তা-ও নয়—বিনাদামের উপহারের প্রতি যেমন মমতা হয় আমার এক তিলো কম হত না তার তুলনায়। কিন্তু যাই বলো অশ্রু, নির্মলের কথায় সুগভীর একটা সত্য আছে। সেই সত্য তোমার-আমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ নয় বলেই তাকে অস্বীকার করবার সংস্কার যেন আমাদের না হয়।

অশ্রু। প্রত্যহের ছোটখাটো গ্লানিতে সে-প্রেম কি মলিন হয়ে উঠতো না ?

প্রভাত। যাতে মলিন না হয় তার চেষ্টা করতে, সে-চেষ্টায় পরাঙ্মুখ বলেই তো আমাদের নর-নারীর সম্পর্কে এতো কুশ্রীতা আত্মপ্রকাশ করছে। স্ত্রীকে যতো দিন আমরা সামগ্রী মনে করবো, এবং স্বামীকে যতো তোমরা দেহদাস মনে করবে ততদিন আমাদের সংসার অশুচি থাকবে। এবং তারই প্রতিকার-কল্পে প্রেমের প্রয়োজনীয়তা আছে। নির্মলের কথা মিথ্যা নয়, অশ্রু। যে-প্রেম জীবনের পরম উপকার সাধন করে সে-প্রেমকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে জীবনে না থাকে স্বাদ, না থাকে তৃপ্তি। আমরা স্ত্রী-পুরুষেরা পরস্পরকে সমগ্রভাবে আয়ত্ত করে ফেলি বলেই আমাদের জীবনের রহস্য যায় মরে, মিলন হয় মলিন। কিন্তু তুমি যে নির্মলের অন্তঃপুরিকা হয়েও আমার প্রতি অন্তঃশীল স্নেহ লালন করবার গর্ব করছ, তা মিথ্যা। দাঁড়াও, আমাকে শেষ করতে দাও। তোমার স্নেহের খাঁটিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আমি না-ই বা করলাম,

কিন্তু যে-স্নেহের বাহ্যাভিব্যক্তি নেই আমি তার দাম দিতে বিমুখ থাকবো। আরো কথা আছে। সান্নিধ্য না থাকলে স্নেহের সার্থকতা কোথায়! প্রেম শুধু চিত্তের প্রসাধন নয়, জীবনের সর্বব্যাধিনাশক মহৌষধি। যে-মন অন্যত্র একবার বিক্ষিপ্ত হয় সে-মনের একনিষ্ঠতা নষ্ট হয় বলেই স্নেহের ঘটে অপমৃত্যু।

অশ্রু। দৈহিক প্রয়োজন-কথাটা যদি ব্যাপকভাবে নাও তো বলি, দৈহিক প্রয়োজনেই যদি বিয়ে করতে হয়, তবে তাই বলে ব্যক্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে, লুপ্ত করে, zero হয়ে বসে থাকতে হবে—সমাজের দেওয়া এই বিধির আমরা বিপদ ঘটাবো। একজনের স্ত্রী হয়েছি বলে আরেকজনের বন্ধু থাকতে পারবো না এত বড়ো একনিষ্ঠতার বড়াই করলে আমার গা জ্বলে। গৃহিণী অর্থ সমস্ত বাহিরকে ঠেলে ফেলে গৃহবন্দিনী হয়ে থাকা নয়। সামান্য সংসারে আমার প্রকাণ্ড ভবিষ্যতকে কুণ্ঠিত, সংকুচিত করে রাখতে পারবো না।

প্রভাত। দোষ সমাজবিধির নয়, অশ্রু, দোষ যদি কারুর থাকে তবে এই মানুষের চিত্তবৃত্তির ভঙ্গুরতার। প্রেম দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না বলেই তা মধুর, বিরহের উত্তেজনা সমগ্র জীবনব্যাপী হলে আমরা অথর্ব, পঙ্গু হয়ে থাকতাম। আমরা খুব অল্প দিন বাঁচি বলেই জীবনকে এতো নিবিড় করে আঁকড়ে ধরতে চাই। দৈহিক প্রয়োজন কথাটা ব্যবহার করে ভালোই করেছ। কেননা এই দেহই তোমার চিত্তের পরিপন্থী হয়ে উঠতো; উঠতোই। তখন তুমি বহু-সন্তানপরিবৃতা, সংসার-ভারে নুয়ে পড়েছ, মন তোমার তখন বিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করেছে, দায়িত্বের তোমার আর সীমা নেই—অতীত কালের দিকে ফিরে তাকাবার তোমার না আছে অবকাশ, না বা অভিলাষ। যৌবন যে অবিনশ্বর নয় তার জন্যে সমাজকে দায়ী করলে ঘোরতর অন্যায় হবে। এবং যৌবনকালে যদি তুমি কাউকে পুচ্ছটি উচ্চে তুলে নাচাবার পরামর্শ দিয়ে থাক, পরে তুমিই তা কেটে ফেলবার বিধান দেবে। যাক, লেক এসে গেছে। তোমার কাঁধের সেফ্‌টিপিনটা চাদরে আটকে রইলো; দাঁড়াও, ছাড়িয়ে নি।

—এ ছাড়ালেও ছাড়ানো যাবে না।

লেক থেকে ফিরে এসে অশ্রু দেখলে তার ঘরের কাছে চেয়ার টেনে তিনু বসে আছে। 'এই যে দিদি' বলে তিনু লাফিয়ে উঠে অশ্রুকে একেবারে জড়িয়ে ধরলো। প্রথমটা আনন্দে অভিভূত হতে গিয়ে পরক্ষণেই অশ্রু উঠলো চমকে। তিনুর মুখ তুলে ধরে শুধোল: তোর মাথায় এ কিসের ব্যাণ্ডেজ?

তিনুর মুখ দীপ্ত, দুই চোখে খুশির চাঞ্চল্য, বললে—মোটর য়্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দিদি। তেমন কিছু লাগেনি, ইঞ্চি দুয়েক কেটেছে মাত্র।

অশ্রু ছোট ভাইটির চুলে হাত বুলুতে বুলুতে বললে: কিছু খাবি?

তিনু বললে: খাওয়ার সময় নেই দিদি, আমাকে এখুনি এক বন্ধুর বাড়ি যেতে হবে। বিকেলে কাল জাহাজ ছাড়বে আমাদের। কলম্বো হয়ে যাচ্ছি দিদি। ভাগ্যিস্ তোমার সঙ্গে দেখা হল। এখন যাই?

বলে তিনু নত হয়ে অশ্রুর পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিলো, অশ্রু তাকে একেবারে শিশুটির মতো বুকে টেনে নিলো। বললো—বাবা জানেন?

তিনু হেসে ফেলল। বললে—বাবা? যে-দিন আমাকে বাড়ির বার করে দিলেন সে-দিনই জানতেন পাতালের দিকে পা বাড়াতে আমার আর দেরি নেই। মন্দ কি, পাতালই আবিষ্কার করে আসি না হয়। কালকে খবরের কাগজে নামটা যদি বেরোয়, বাবার অগোচর থাকবে না। হয়তো মনে-মনে আবার অভিশাপ দেবেন।

তিনুর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অশ্রু বললে—বাবা তোকেও তাড়িয়ে দিয়েছেন নাকি?

তিনুর মুখ আনন্দে আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললো—নিশ্চয়। তুমি যে অন্যায় করেছো তার চেয়ে আমার এই সাগরলঙ্ঘন ঘোরতর পাপ। বাবার আদেশকে মান্য করবার মতো বিবেক পেলাম না দিদি। বাবার চেয়েও বড়ো অভিভাবক আছে, সে আমার সত্যোপলব্ধি, আমার মনুষ্যত্ব। সেই প্রথম আমি বিদ্রোহ শিখলাম। বাবাকে আমি দোষ দিতে পারি না। আর আমার সময় নেই। তোমার জন্যে বসে বসে অনেক সময় আমার চলে গেছে। আরেকটু দেরি করলে হয়তো দেখা হত না। যোগাড়-যন্ত্র এখনো অনেক বাকি।

অশ্রু বললে—প্যাসেজ জোটালি কী করে?

—সে জুটে যায় দিদি। আমি যে খালাসী সেজেছি। একবার যেতে পারলেই হল—তারপরে আমাকে পায় কে! সময় নেই দিদি।

অশ্রু নীরবে তিনুর ললাটে চুম্বন করলে, বললে—তোর জন্যে উদ্বেগের আমার অন্ত থাকবে না, তিনু।

আকাশে রঙের মতো তিনুর মুখে হাসি লেগেই আছে। তিনু দরজার দিকে দু'পা এগিয়েছিল, থামলো। বললে—আমার জন্যে বৃথা উদ্বেগ করে

মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করে কিছুই লাভ হবে না। যে-পথে আমি চলেছি, বেগে চলেছি, পিছে তাকিয়ে দেখবার সময় নেই। উদ্বেগ না করে আশীর্বাদ করো। বলে তিনু অন্তর্হিত হলো।

বুকটা খালি হয়ে গেছে। তিনু! কী আশ্চর্য চক্ষু! ঐ চোখ কার ছিলো মনে করতে পারছি না,—স্বপ্ন আর বিদ্যুৎ—শেলির ছিলো হয় তো। সমুদ্র উত্তীর্ণ হবে বলে এত আনন্দ, যেন একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি! ও-ও গৃহছাড়া! 'বাবার দোষ নেই', মহত্ত্ব,—ও ঘর ছেড়ে আকাশকে পেয়েছে—অগাধ, বিস্তীর্ণ! কোথায় গেলো ছুটে? পথে আবার কোনো দুর্ঘটনা না হয়, স্বচ্ছন্দে যেন সাগরে দুলতে পারে। তিনু কত সুন্দর হয়েছে—কী বলিষ্ঠ! ওর চোখের মাঝে বসে মা যেন হাসছেন! আশীর্বাদ করবো বই কি তিনু, সত্যোপলব্ধির জন্যে সক্রেটিস থেকে আজ পর্যন্ত যারা মরেছে তাদের মহৎ দৃষ্টান্ত তোমাকে প্ররোচিত করুক। তুচ্ছ শাসনের কাছে তোমার সত্যকে লজ্জিত করো না,—হোক সে পিতা, হোক সে প্রভু, হোক সে ভগবান! তোমার জন্যে উদ্বেগ করে লাভ নেই—তুমি যদি তোমার সত্যের জন্যে মর-ও, আমি তোমার চিতায় ফুল দিয়ে আসবো। সত্যকে আবিষ্কার করবার জন্যে তুমি সহস্র ভুলের মধ্য দিয়ে যাও, লক্ষ লাঞ্ছনার মধ্যে—সে-গৌরবে তুমি অমর হয়ে থাকবে। তিনু, তিনু, তিনু। তোমার প্রশস্ত উন্নত কপাল, ঘন কুঞ্চিত চুল, বিস্ফারিত বুক, দৃঢ় দীর্ঘ বাহু, ঋজু দেহ যেন ঊর্ধ্বশিখা! চোখে বিপুল সম্ভাবনার স্বপ্ন, চিবুকে তেজস্বিতা, দুই হাতে নিদারুণ প্রতিজ্ঞা! তিনু!

অশ্রু সেকেণ্ড ক্লাশে মেয়েদের কামরাতেই উঠলো। টিকিট শেষ পর্যন্ত লাহোরের না কেটে দিল্লির কেটেছে। গাড়ি ছাড়বে রাত স'দশটায়। মন্দের ভালো—গায়ের ওপর একটা পাতলা চাদর টেনে দিয়ে ঘুমুনো যাবে,—সকাল-বেলা ঝাঝায় পৌছুবার আগে ও হাই তুলছে না। এটার সঙ্গে আবার রেস্টুরাণ্ট কার নেই, থাকলেও একা-একা খাওয়ায় আরাম নেই; ঝাঝা কিংবা কিউল-এ পৌছে প্ল্যাটফর্ম থেকে চার-পয়সা-দামে এক পেয়ালা পান্‌সে চা খেলে ওর জাত যাবে না। একটা বই কিনবে এডগার ওয়ালেস্-এর? এই স্টলে যে মারি স্টোপ্‌সও পাওয়া যায়। ট্রেনে বসে বই পড়ার মতো ন্যাকামি নেই;

তার চেয়ে বাসরঘরে বরের গান গাওয়া বরং সহ্য করা চলে। গাড়িটা ছেড়ে দিলেই একটা নতুন জগতে এসে পড়বে ; গীতায় মৃত্যুর যে ব্যাখ্যা আছে তারই একটা লৌকিক উদাহরণ ! বাথ-রুমে যথেষ্ট জল পাওয়া যাবে তো ? স্নান করতে না পারলে মরেই যাবে অশ্রু। একটা য়্যাংলোইণ্ডিয়ান মেয়ে উঠলো। একা যাচ্ছে বুঝি। ওর সঙ্গে আলাপ করা যাবে—বর্ধমানের বেশি নয় কিন্তু! মেয়েটি মোজা পরেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ পরেছে—বাঁচা গেলো। মাঝের বার্থটা কিন্তু খালি রইলো। রাত্রে শীত করলে ওটায় না হয় উঠে আসবে—তার জন্যে জানালাগুলো ও কিছুতেই তুলে দিতে পারবে না।

—ঘণ্টা দিয়েছে, উঠে পড় অশ্রু। দিলদারনগরে পৌঁছেই চিঠি দিয়ো কিন্তু। আমার আপিসের মর্জি বুঝে এলাহাবাদ যাবার দিন ঠিক করা যাবে। জানলা দিয়ে মুখ বার করে থেকো না যেন। (স্বল্প হাসি)

—আর তুমি সাবধান হয়ে বাড়ি যেয়ো। বাস্-এর জানলা দিয়ে হাত বার করে রেখো না, সেদিন কাগজে পড়লাম কার কনুই গেছে থেঁৎলে। (স্বল্প হাসি)

অশ্রু হাত বাড়িয়ে দিলে ; প্রভাত তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করলো।

অশ্রু। কীট্সের হাত ধরে কোলরিজ তো মৃত্যুর স্পর্শ পেয়েছিলো। আমার হাত ধরে তুমি কী স্পর্শ করছো ? (স্বল্প হাসি)

প্রভাত। মুক্তি। (স্তব্ধতা) ফিরে এসেই আবার ফিরে পাবার মুক্তি।

বিচ্ছেদে গভীর বেদনা আছে,—এমন বেদনা যে, যেন কে হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিচ্ছে—তবু ট্রেন চলে গেলে ট্রেনের ফাঁকা লাইন ছুটোর মতোই মনে জাগে মুক্তি, উপশম ! যেন একটা নিদারুণ উদ্বেগ থেকে বাঁচলাম ; উৎকণ্ঠা গেলো ঘুচে। না আছে দ্বৈত না বা দ্বিধা। বেশ একটা নিশ্চিন্ত অবস্থা,—পীড়াবসানে সামান্য একটু দুর্বলতা মাত্র। যাই বলো, পরিচিত জগতে ঔজ্জ্বল্য নাই থাক, অন্ধকারস্নিগ্ধ একটি জাদু আছে—মনকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। চেনা জায়গায় সহজে হাত-পা নাড়তে পারি, হোঁচট খেতে হয় না,—সে-জায়গার চারপাশে খাদ নেই ! প্রেমের পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের চূড়ায়, স্থান সেখানে এত সংকীর্ণ যে দু'জনকে স্পর্শ না করে দাঁড়ানো যায় না। একটু

এ-দিক ও-দিক হলেই সেই উঁচু চূড়া থেকে নিচে গড়িয়ে পড়তে হবে ; তারপর সে-চোট সয়ে সুস্থ হয়ে ফের নিজের পুরোনো জায়গাটুকুতে আর ফিরে যাওয়া যায় না, জীবনে দেখা দেয় পক্ষাঘাত। ঐ পর্বতচূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তেই পতনের আশঙ্কায় পীড়িত বিপন্ন হয়ে থাকাটা প্রাণের একটা আদর্শ বৃত্তি নয়। তার চেয়ে নিরীহ অনলঙ্কৃত সমতল জায়গাটি বেশি কমনীয়। স্বস্তি ভালো সুখের চেয়ে। আমার চেনা জগতে স্তব্ধতা ; প্রেমের জগৎ প্রগল্‌ভ,—তাই আসে শ্রান্তি। প্রেমের জীবন একটা নিয়মাতিরিক্ত অস্বাভাবিক জীবন। প্রেম ক্ষণস্থায়ী বলেই তার এত প্রশংসা। প্রেম অবিনশ্বর হয়নি বলেই জীবন-ধারণে এত মাধুর্য।

জীবনের প্রেমই অবিনশ্বর।

দিল্‌দারনগর

বন্ধু,

স্টেশনে নেমে দেখলাম স্বয়ং নগেনবাবুই উপস্থিত আছেন। খুব সমারোহ করে অভ্যর্থনা করলেন—এমন বাড়াবাড়ি করতে লাগলেন যে, কুণ্ঠিত হতে হল। অথচ লোকটি বেশ ! ভদ্রলোক বললে সব মিলিয়ে আমাদের মনে যে একটি সৌম্য শান্ত ও বিনয়স্নিগ্ধ চেহারা মনে পড়ে নগেনবাবু তার এক চুল ফারাক নয়। আমার আসার টেলি পেয়ে তিনি যেন হাতের মুঠোয় চাঁদ পেয়েছেন। উপমাটা সেকেলে বলেই কথার আন্তরিকতা নষ্ট হয়েছে ভেবো না। তাঁদের বাড়িতে আমি পদার্পণ করব—এতো বড়ো সৌভাগ্যের বর তিনি পরজন্মেও নাকি চাইতে সাহস করতেন না। লোকটি বেশ অমায়িক ; সম্পর্কের সুবিধে পেয়ে আমার সঙ্গে অসংকোচে আলাপ করতে পারছেন। আমার মন্দ লাগেনি।

এক্কাই আমার পছন্দ হল—দড়ির এক্কা। জিনিসপত্রগুলো আরেকটা এক্কায় বোঝাই হল। নগেনবাবু যত দূর সম্ভব সংকুচিত হয়ে বসলেন, বললেন : হঠাৎ গরিবদের ঘরে ?

বললাম : আশার মধ্যে আনন্দ নেই বরং ক্লান্তি আছে ; যদি আনন্দ থাকে তবে আকস্মিকতায়। এবং সে-আনন্দ উভয়ত।

নগেনবাবু সসম্ভ্রমে বললেন : কিন্তু এই হতচ্ছাড়া দেশ কি তোমার ভালো

লাগবে ? (নগেনবাবু আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করলে ভালো লাগতো না—প্রথমত তিনি বয়সে আমার ঢের বড়ো, দ্বিতীয়ত সম্পর্কের মর্যাদা তাঁকে দেওয়া উচিত।)

বললাম : দেশ দেখতে যে অন্তত এখানে আসিনি সেটা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। এসেছি আপনাদের দেখতে। পুষি-দির সঙ্গে শেষ দেখা প্রায় ন' বছর আগে—যে বার ওর প্রথম ছেলে হয়। পুষি-দিকে দেখবার জন্যে মনটা আইঢাই করছে। ওর সঙ্গে ছেলেবেলাটা আমার কী ফুর্তিতেই যে কেটেছে। এক দিনের একটা মজার গল্প শুনে রাখুন। গল্পটা বলব মনে করেই আগে থেকে এক চোট হেসে নিলাম। যারা হাসির গল্প নিজে গম্ভীর থেকে বলতে পারে না তাদের তুলনা হয় ঠিক সেই জাতীয় কবির সঙ্গে, যারা কবিতা লিখবার অবকাশে অন্যকে ছন্দ বা শব্দবিন্যাস সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। হাসি থামিয়ে গল্পটা ফের বলবার আয়োজন করছি, নগেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে মুখ আমার শুকিয়ে গেলো। স্ত্রীর শৈশবকালের এমন একটা গল্প শোনবার কৌতূহল দমন করে নগেনবাবু তাঁর মুখের চেহারাকে হঠাৎ এমন নিরুৎসাহ করে তুলেছেন দেখে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মুখের সামান্য একটি রেখায় আবহাওয়া গেল বদলে। নগেনবাবু কিছু একটা বলবেন-ই, তার প্রত্যাশায় চুপ করে রইলাম।

স্টেশন থেকে গাড়ি অনেকটা পথ এসে গেছে ; কিন্তু ডেরা তখনো দূরে। কণ্ঠস্বরকে যতদূর সম্ভব পাতলা করবার চেষ্টা করে নগেনবাবু বললেন : আমার তৃতীয় ছেলেটি মৃত্যু-শয্যায়—

শুনে পরম ব্যথায় চমকে উঠলাম। খবরটা যেন তেমন কিছু অসাধারণ নয় এমনি ভাবে নগেনবাবু এই বেদনাদায়ক সংবাদটা আমাকে জানালেন, আমার একটুও ভালো লাগলো না। বরং এতক্ষণ এই ভীষণ খবরটা গোপন করে আমার কৃত্রিম সম্বর্ধনার আয়োজনে তিনি এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন বলে আমার মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। আমার এই হাসি-খুশি আনন্দকোলাহলের মাঝে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া পড়লে পাছে আমি বিরক্ত,—হ্যাঁ, বিরক্ত হই—সেই ভয়ে তিনি এমন একটা খবর প্রকাশ করেন নি। ছেলেকে মৃত্যু-শয্যায় রেখে আমাকে অভিনন্দিত করতে এসেছেন !

বললাম : বলেন কি ? কী অসুখ ? অবস্থা কি খুবই খারাপ ?

আমার গলায় সহানুভূতির আমেজ পেয়ে নগেনবাবুর গলা এবার অনায়াসে ভারি হয়ে উঠলো: ডবল নিমুনিয়া। কাল রাত্রেই যাচ্ছিল; আজকের দিনটুকু আর যাবে না হয়তো। গিয়ে দেখি কি না সন্দেহ।

চিন্তিত হবার কারণ ঘটলো। এক সঙ্গে কত চিন্তা যে মনে ভিড় করে এলো তার ইয়ত্তা নেই। আমার চিন্তার সূত্র অনুসরণ করতে না পেরে নগেনবাবু বললেন: বাড়িতে উঠলে তোমার অনেক অসুবিধে হবে। এমন জায়গা, ডাক-বাংলো পর্যন্ত নেই। বক্সারে যেতে পারো; ডাউন ট্রেন কাছাকাছিই আছে। ফিরবে নাকি?

কঠিন হয়ে বললাম: আপনি পাগল হয়েছেন?

দেখ দেখি আমার সম্বন্ধে লোকের কী অন্যায় ভুল ধারণা! আমি ভালো শাড়ি পরি বলে যেন ধুলোর ওপর বসতে পারবো না। এই নিয়ে তর্ক করে কোনো লাভ হত না; যে-তর্কের মেজর প্রেমিসগুলো প্রমাণসাপেক্ষ নয়, সে-তর্কে আমি সাধারণত চুপ করে থাকতেই ভালোবাসি। উপদেশের চেয়ে উদাহরণ বড়ো—এটা আমার কাছে উপদেশ মাত্র নয়—এটা আমি কায়মনোবাক্যে মানতে চাই। দেখ, মানুষের অন্তর্দৃষ্টি কত কম, তার সব বিচার নির্ভর করে বাইরে মার্কার ওপর। আমার বাবা পুরুষদের বড়ো চুল রাখা দু'চোখে দেখতে পারেন না। অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে বাবার দেখা হলে বাবা তাঁকে যে কী বলে সম্বর্ধনা করতেন ভাবতে আমি শিউরে উঠছি। মানুষের অন্তরের পরিচয় পেতে হলে গুপ্তচরের মতো লুকিয়ে-লুকিয়ে আত্মার অনুধাবন করতে হয়—কার বা তত সময় ও ধৈর্য আছে বলো! একটা সিদ্ধান্তে তাড়াতাড়ি না আসতে পারলে মনের অসাম্য অবস্থাটা আমাদের পীড়া দেয়। তাই তুমি দেখতে পাবে আমাদের দেশের বেশির ভাগ বাঙলা নভেলই এই ভুল-বোঝাকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠেছে। ওটা নেহাৎ একটা শস্তা চালাকি। যেমন ধরো শরৎ চাটুজ্জে। তাঁর যে বইগুলো উৎরেছে সবগুলিতে এই ভুল-বোঝার ঘোর-প্যাচের জটিলতা এত বেশি যে কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে বলে ভালো লাগে। আমরা পরস্পরকে প্রকাশ্যে সন্দেহ করি, করি অবিশ্বাস ও অবহেলা; কিন্তু নিভৃতে বসে একে-অন্যের কথা ভেবে প্রেমবিগলিত হয়ে কাঁদি আর কপাল কুটি—এই দৃশ্য দেখলে আমি পড়তে পড়তে পর্যন্ত উচ্চহাস্য না করে থাকতে পারি না। ভাবি: লোকগুলি কী ভীষণ বোকা। এই জন্যেই দেশ আমাদের

এগোচ্ছে না। সামনা-সামনি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা কয়ে দু' মিনিটে যার মীমাংসা হয় তাকে এমনি করে অনাবশ্যক ঘোরালো করে তোলায় আমাদের আয়ুক্ষয় হয় না? ভুল-ও বুঝবো, ভাল-ও বাসবো, এ কী অত্যাচার! তুমি বলবে এটাই স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি। আমি এটা মানি না; তোমার সেই বৃত্তিকে শাসন করতে হবে। স্পষ্টতা থাকবে না কেন, কেন থাকবে না সাহস? যাচাই করবো না অথচ যা চাই তা না পেলে গাল ফোলাবো—এই 'ছিঁচ-কাঁদুনে নাকে ঘা' স্বভাব আমাদের যাবে কবে? জীবনে যা ঘটে তাই আর্টে ঘটাতে হবে এই সাহিত্যধর্মে যদি তুমি বিশ্বাসবান হওই, তবে তোমাকেও বলি আর্টে এমন অনেক জিনিস real হতে বাধ্য যা জীবন কোনোদিন প্রত্যক্ষই করে নি। যেমন ধরো কথোপকথন। মানো তো?

অতএব, তুমি বুঝতেই পাচ্ছ, এমনি সব আজগুবি চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে বাকি রাস্তাটা নগেনবাবুর সঙ্গে আর কোনো কথা হল না। আরো খানিকটা সময় কাটিয়ে যেখানে এসে এক্কাটা দাঁড়ালো, দেখে বিশ্বাস হচ্ছিলো না,—শুনলাম সেটাই নগেনবাবুর বাসা। আস্তাবলে সহিসদের মাচা করে শুতে দেখেছি, কিন্তু নগেনবাবুর বাসায় মাচারো বালাই নেই। সব সমতল। এত অপরিষ্কার তুমি কল্পনা করতে পারবে না। বীভৎস রস বলে একটা রস আছে, ঐ রস নিয়ে আমাদের দেশে কোনো লেখকই চর্চা করেন না দেখে আমার কষ্ট হয়। একমাত্র করুণ রসই বাঙলা দেশে কাটে—এটা নরম মাটির দোষ। যদি পরকে কাঁদাবে আশা করে লেখায় নিজে খানিকটা কাঁদতে পারো তো বাঙলা দেশে সেই সাহিত্য তোমার সফল রচনা হল। গল্পের ফর্ম বা টেকনিকের জন্যে নয়—কান্নার কাদা থাকলেই তার দাম হবে। দেশের চরিত্রগুলো স্যাঁৎসেঁতে, খট্‌খটে নয়। কিন্তু, সত্যি বলছি, যদি কেউ আন্তরিক অনুভব করে পুষি-দির এই বাসা নিয়ে কবিতা লেখে, খাঁটি বীভৎস রস সে নিশ্চয়ই জমাতে পারবে, এবং সেটা রসসৃষ্টি হিসেবে পিছিয়ে থাকবে না।

ছোট্ট বাসা, তিনটে ঘর—টিনের চাল, ভেতরে একটুখানি উঠোন। তিনটি ঘর ভরে কিলবিল করবার জন্যে বিধাতা যেমন পুষিদির কোলে ছ'টি সন্তান দিয়েছেন তেমনি উঠোন ভরে দিয়েছেন আগাছা। যেখানেই পা দেবে পায়ের ধুলো নিতে কোনো অনুগত ভক্তই সেখানে দাঁড়াবে না, ছুটে পালাবে। যে ঘরটাতে এসে আমি প্রথম দাঁড়ালাম সে-ঘরটার অবিকল বর্ণনা দিতে পারলে

তোমাদের দলীয় অনেক সাহিত্যিককেই আমার তাঁবেদারি করতে হত। মেঝেটা মাটির, তার ওপর একটা মাতুর বিছিয়ে পুষি-দি বসে আছে, কোলে মুমূর্ষু সন্তান,—ছেলেটির বয়স তু' বছর কয়েক মাস হবে; চার পাশে স্তূপীকৃত অপরিচ্ছন্নতা। কতকগুলি ময়লা কাপড়, ময়লা বিছানা (তোলা হয় নি), কতগুলি থালা-বাটি (মাজা হয় নি), কতগুলি অর্ধনগ্ন ছেলে-পিলে (তারস্বরে চেঁচাচ্ছে)। পুষি-দির চেহারা কি রকম ধস্‌কে গেছে, (নগেনবাবু কিন্তু যেমন মস্ত, তেমনি মজবুৎ) ওর দিকে চেয়ে আমার ভারি করুণা হলো। ওকে নিচু হয়ে প্রণাম করে ওর পাশে বসে পড়লাম। পুষি-দির তু' চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুরেখা নেমে এসেছে। ওর ছেলের শরীরে একটু হাত বুলিয়ে বললাম : ডাক্তার দেখে কি বলছে ?

পুষি-দি ছেলের মুখের ওপর নির্নিমেষ দৃষ্টি রেখে বললে : আর ডাক্তার ! দেখছিস না কেমন করছে। বাছাকে আর রাখতে পারলাম না !—পুষি-দির বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

নিজেকে যে কী অসহায় লাগতে লাগলো বুঝে নিয়ো। সেই ঘরের চেহারা দেখে কাকে অভিশাপ দেবো ঠিক করতে পারলাম না। রোদের দিকে তাকানো যায় না, অথচ এত বেলা পর্যন্ত ছেলেপিলেগুলির না হয়েছে স্নান, না বা খাওয়া। সকালবেলা যা কটি মুড়ি খেয়েছিলো তারো জায়গাগুলো এখনো ধোয়া হয়নি। নগেনবাবুর ছোট ভাই-এর বৌ এইখেনেই আছে—সেই তদারক করছে, কিন্তু একা মানুষ পেরে উঠছে না। মেয়েটি আনাড়ি ; ভাসুর বর্তমান বলে ব্রীড়াবনতমুখী—মাথার ওপরে ঘোমটা তার সব সময়েই আনমিত। সংসার সামলানো তার কাজ নয়। পুষি-দি ছেলে কোলে করে তিন দিন ধরে বসে আছে, মমতার খুব বড় নিদর্শন হলেও এটা স্বাস্থ্যকরতার বড়ো লক্ষণ বলে মানতে পারলাম না। কিন্তু পুষি-দিকে সে কথা বলতে যাওয়ার মতো ধৃষ্টতা আর কিছু হতে পারে না। তুঃখের এত নিখুঁত প্রতিচ্ছবি আমি আগে আর কোথাও দেখিনি। মুমূর্ষু ছেলেকে কোলে নিয়ে পুষি-দির শঙ্কাকুল পীড়িত মুখের তুলনা দিতে পারি, আমার হাতে বাঙলা ভাষা আজো তত শক্তিমান হয়ে ওঠেনি। এমন নিদারুণ নিঃসহায়তার ছবি আর নেই।

আমার মতো অপরিচিত আগন্তুককে দেখেই ছেলেমেয়েগুলো কান্না থামিয়ে দম নেবার চেষ্টা করছিল, ওদের চোখে আমার আবির্ভাবটা পরম বিস্ময়কর ;

ওদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আমি মোটেই খাপ খাচ্ছি না বলে ওরা কান্না থামিয়ে আমাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এমন কাঙাল হতচ্ছাড়া চেহারা দেখে আমার বরাবর ঘৃণাই হয়েছে; ছেলেবেলায় তিনুর কানে একবারে পুঁজ হয়েছিল বলে তিনুকে আমি কতদিন ছুঁইনি (ভাবতে পারো—তিনুকে!); কিন্তু ওদের প্রতি কখন যে বুকে স্নেহ সঞ্চিত হয়ে উঠেছে—টের পেলাম না। ওদের আত্মীয় করবার জন্যে ওদের দিকে এগোব ভাবছি এমন সময় পূর্বোক্ত বউটি এসে সেই ঘরে কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়ালো। এতক্ষণে রান্না তার শেষ হয়েছে বুঝি—এবার ছেলেপিলেগুলোর গাত্রমার্জনা হবে। বৌটি আসতেই নগেনবাবু (তিনি এতক্ষণ একটা চেয়ারে অবসন্ন হয়ে বসেছিলেন) তাকে লক্ষ্য করে বললেন: ওদের পরে হবেখন। তুমি আগে অশ্রুর স্নানের বন্দোবস্ত করে দাও। রান্না হয়েছে কিছু? (বৌটি আস্তে মাথাটি একটু নামিয়ে সম্মতিসূচক সঙ্কেত করলে) তা হলে, গরিবের ঘরে যা হয়েছে তাই চারটি বেড়ে দাও ওকে। কলকাতা থেকে আসছে,—নিশ্চয়ই খুব tired, না অশ্রু?

তোমাদের পুরুষদের এই একটা প্রবল দোষ, মেয়েদের হিতসাধনের বেলায় তোমাদের সীমাজ্ঞান থাকে না। নগেনবাবুর এই অতিশয়োক্তি আমার কাছে এত অন্যায্য মনে হল যে, দস্তুরমতো অপমানিত বোধ করলাম। এতগুলি অভুক্ত আর্ত শিশুকে ফেলে আমার কাল্পনিক শ্রান্তি-লাঘবের জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তাঁর এই আতিথেয়তার দৃষ্টান্ত এ-যুগে অচল। অতিথির তৃপ্তির জন্যে কর্ণের যুগে পুত্রহত্যার পুরস্কার মিলতো, অর্থাৎ মরা ছেলে বেঁচে উঠতো ফের; কিন্তু এ-যুগে ছেলে একবার মরলে আর বাঁচে না—তাই অনাবশ্যক আতিথ্যের মূল্য দিয়ে ফতুর হবার ভদ্রতা আমাদের পোষায় কৈ। ও-যুগে এমন কতকগুলো সুবিধে ছিলো যে হিংসে হয়। শিবিরাজা নিজের দেহমাংস অতিথির জন্যে অনায়াসে কাটতে লাগলেন, তাতেও ওজনে তার সমান হল না বলে নিজে তুলাদণ্ডে আরোহণ করতে দ্বিরুক্তি করলেন না—জয়-জয়কার পড়ে গেল, এমন আত্মদান আর দেখা যায় নি; কিন্তু মজা এই যে, অতিথি শুধু-অতিথি নয়, ছদ্মবেশী ইন্দ্র। যখনই এমনি একটা মহৎ অভিনয় হয়েছে—তখুনিই দেখতে পাবে পরীক্ষাকর্তারা আগে থেকেই ছদ্মবেশী হয়ে এসেছেন; নইলে যেন অমন একটা ত্যাগের মর্যাদা হয় না—তাকে পুরস্কৃত করতেই হবে ভেবে দেবতাদের আগে থেকে পরামর্শ চলছিল। সে-যুগে ত্যাগ

বা আতিথেয়তাটাই বড়ো ছিল না, বড়ো ছিল তার পুরস্কারের লোভটা। সে জন্যে সে-যুগের ত্যাগের কথা পড়ে হাত-তালি দিতে হাত ওঠে না। বৃষকেতুকে কর্ণ যখন স্বহস্তে বধ করলে—মানলাম সেটা একটা বড়ো রকমের অতিথি-পরায়ণতা—কিন্তু পেটুক বামুনটা কেন দেবতা হয়ে দেখা দিলো? বৃষকেতু ফের বেঁচে উঠলো বলেই কি কর্ণের আতিথেয়তাটা জোলো হয়ে গেলো না? এই জন্যেই তো সন্দেহ হয় যে, কর্ণও আগে থেকে জানত বৃষকেতু তার নিজের মাংসই খেতে বসবে! আমাদের ত্যাগ ঐ বাজে ঠুনকো ত্যাগের তুলনায় কত মহনীয়—আমরা ঘুণাক্ষরেও আশা করি না যে আমাদের বেলায় নিষ্ঠুর অতিথি প্রেমিক দেবতা হয়ে উঠবেন। যা আমরা হারাই হাসিমুখেই হারাই, ফিরে পাবার লোভ রেখে সে মহান ক্ষতিকে আমরা কলুষিত করি না। এমন কি পরজন্মে এ-ক্ষতির পূরণ হতে পারে এমন একটা সামান্য ইচ্ছাকে পর্যন্ত লালন করতে আমাদের ঘৃণা বোধ হয়! আমাদের ভাগ্যের পরিধানে কোনো ছদ্মবেশ নেই, সে নগ্ন নৃশংস—আমরা জানি সে-ভাগ্য চেহারা বদলে এসে বর দিয়ে আমাদের আত্মদানের অমর্যাদা করবে না। এবং তা জেনেই আমরা আত্মোৎসর্গ করতে অকুণ্ঠিত থাকি।

নগেনবাবুর কথার কোনো প্রতিবাদ না করে আমি পুষি-দির ছেলেমেয়ে-দের নিয়ে পড়লাম। ওরা প্রথমে কেউ ভয় পেলো, কিন্তু আমার বাক্সে যে একটা বিস্কুটের টিন আছে তা বের করে ওদের বন্ধুতা কিনে নিতে আমার দেরি হল না। তুমি বললে বিশ্বাস করবে, আঁচলটা বুকের ওপর বিস্তৃত না রেখে দড়ির মতো পাকিয়ে কোমরে বেঁধে নিলাম, খুলে ফেললাম জুতো; ছেলেমেয়েদের কুয়োর ধারে নিয়ে গিয়ে বাক্স থেকে সাবান বার করে স্নান করাতে বসলাম। বউটি নিজে জল তুলে দিতে এসেছিলো, বললাম: তুমি ততক্ষণ ঘরগুলো নিকোও, আমি এ-সব একাই পারবো। স্নান করতে করতে ছেলেমেয়েদের কলরবের আর বিরাম নেই, কে আগে স্নান করবে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা লেগেছে—তাদের কত দিনকার কত ছোটখাটো ইতিহাস—দুঃখের ও সুখের—টুকরো-টুকরো করে আমাকে শুনতে হল, আমি ওদের রাঙামাসি হয়েও এতদিন বিস্কুটের টিন ও সাবান নিয়ে আসিনি কেন এটা ওদের একটা বড়ো নালিশ। একজনের কথায় বেশিক্ষণ মনোযোগ দিয়ে অকারণ পক্ষপাতিত্ব দেখাবার সাধ্য নেই, বাকি হাতগুলি আমার চিবুক ধরে

টেনে তাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে আছে। স্নান করিয়ে একটা বড়ো থালার চারধারে ওদের বসিয়ে নিজেই ওদের থাইয়ে দিতে লাগলাম। বৌটিই পরিবেষণ করছিলো। আমি যে অন্নবণ্টনব্যাপারে মোটেই সমদর্শী নই—প্রত্যেকের মুখেই এই অভিযোগ। রাত্রে ঠিক আমার পাশটিতে কে শোবে তাই নিয়ে ওরা ঘরোয়া বিবাদ শুরু করে দিলো; ওরা দুষ্টুমি করলেও ওদের মা'র মতো আমি প্রহার করব না এই অভয় পেয়ে ওরা উঠলো লাফিয়ে। থাইয়ে দাইয়ে মিষ্টি করে বললাম: তোমরা এবার চুপটি করে ঘুমোও গে; কাকিমা ঐ বারান্দায় মাদুর পেতে দিয়েছেন। গোলমাল চেঁচামেচি করো না, দেখছ না ভাইটির কেমন অসুখ করেছে। নগেনবাবু বললেন, আমি নাকি স্বর্গের জাদু জানি—সবাই সুড়সুড় করে মাদুরে গিয়ে শুল! শিয়রে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ পাখা করলাম, (আমার পাখা-চালানোও নাকি পক্ষপাতিত্বহীন নয়) ওদের ঘুমুতে দেরি হল না। সব চেয়ে ছোট মেয়েটির বয়েস এগারো মাস; বউটিই তাকে দুধ থাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে।

পুষি-দিকে গিয়ে বললাম: এবার তুমি ওঠ, তিন দিন তোমার স্নান নেই, খাওয়া নেই। ছেলেকে আমার কোলে দাও, তুমি এই ফাঁকে মাথায় একটু জল দিয়ে মুখে দুটো গুঁজে এস গে।

পুষি-দি এমন আবিষ্ট হয়ে আমার দিকে তাকালো যে বি. এ. পাশ করে ও এত কলঙ্কভাগিনী হয়ে আমার এমন একটা কথা বলবার মতো নয়। নাক সিঁটকে বরং বক্সার ফিরে যাচ্ছি বলে সেজে-গুঁজে এক্কায় গিয়ে উঠলেই আমাকে মানাতো। তা ছেড়ে, এ কী রূপ! যে-ছালটির শাড়িটা পরেছিলাম কাদায় আর জলে তা সপসপ করছে; মাথার খোঁপাটার আর ইজ্জত নেই। আমার সম্বন্ধে এরা যতো ধারণা করেছিল তার সঙ্গে মিল রাখতে পারছি না বলে ওদের হতাশ করলাম যা হোক।

পুষি-দি কিছুতেই ছেলে ছেড়ে উঠবে না; যেন এমনি করে ধরে রাখলেই ওকে রাখা যাবে। শেষে অনুনয় করে পায়ে ধরে, শাসিয়ে, ধমকে পুষি-দিকে স্নান করতে পাঠালাম। আর ওর মুমূর্ষু সন্তানটিকে আমিই কোলে নিয়ে বসলাম। এত সন্তর্পণে এত স্নেহে কোনো জিনিস ছুঁয়েছি বলে মনে হল না। নির্মল করতলটি মমতায় কোমল করে ওর কপালের ওপর রাখলাম—জ্বরে পুড়ে

যাচ্ছে। হাত পা ঠাণ্ডা,—নিশ্বাসের জন্যে কসরৎ করে ওর ক্ষীণ কঙ্কাল-কল্প দেহটা বারে বারে সংকুচিত হচ্ছে। ওর মুখের দিকে চেয়ে পৃথিবীর কোনো সুন্দর দৃশ্যের কথাই মনে করতে পারলাম না। কিন্তু পরে যখন কোনোদিন আবার সুন্দর দৃশ্যের মুখোমুখি হব, তখন পুষি-দির এই ছেলের মৃত্যুর দুঃখটা ভুলেও মনে আনবো না। বাস্তবিক আমাদের জীবনে যদি অতীতকাল বলে কিছু দাঁড়িয়ে থাকতো এবং যা আমরা ফেলে এসেছি তা যদি ভুলতে না পারতাম—অর্থাৎ পৃথিবী গোল না হয়ে চৌকোণ ও সমতল যদি হতো—অর্থাৎ কিছু-কিছু অদৃশ্য না থেকে সবই যদি থাকতো উন্মুক্ত, উদ্ঘাটিত—তা হ'লে আমাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া আর গতি ছিলো না।

দেখ, আমরা প্রাণী-হিসাবে কত অসহায়! বিজ্ঞান দিয়ে সব জিনিস আমরা বুঝতে গেছি বলেই আমাদের মুস্কিল আরো বেড়েছে। মৃত্যু বুঝি, কিন্তু মৃত্যুর সার্থকতা বুঝি না। এখেনে আমাদের কোনো প্রতিকার নেই বলে প্রতিবাদ করতে লজ্জা পাই। এতকাল বুদ্ধিমান থেকে মরবার বেলায় আমাদের অজ্ঞানতা চাড়া দিয়ে ওঠে; তখন প্রলাপ বকতে আমাদের সুখ হয়: ভোগ, ভাগ্য, ভগবান! আমরা এখেনে পশুরো অধম হয়ে গেছি। বুঝতে চাই অথচ বুঝতে পারি না বলে আমাদের শোক তীব্রতর হয়ে ওঠে। সহজ নিশ্চিন্ত হতে পারি না। দু'টি দিনের জন্যে এসে এই শরীর নিয়ে এত টানা-হেঁচড়া, এত উদ্বেগ, এত গ্লানি—দন্তশূল থেকে শুরু করে মৃত্যুশেল—তবু আমাদের কবিতা লিখতে হয়, প্রেম না করলে পৃথিবী পবিত্র হয় না! আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, প্রকৃতির রাজ্যে কোনো একটা শৃঙ্খলা নেই, নীতি নেই—ইচ্ছে মতো অর্ডিন্যান্স জারি করেই তার রাজত্ব চলেছে! যৌবন কখন আসবে প্রকৃতি তার একটা সময় নির্ধারিত করে দিয়েছে, মৃত্যুর বেলায় তার এই অব্যবস্থা কেন? বিয়ে করে যৌবন প্রমাণিত করবার আগে আমরা কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে সংসারের দায়িত্ব ও কলুষ থেকে আত্মরক্ষা করে আনন্দ পাই; তেমনি এমন যদি একটা তারিখ থাকতো যার আগে প্রকৃতি মৃত্যুবাণ হানবে না, তা হলে আমরা পৃথিবীর চেহারা দু'দিনে বদল দিতে পারতাম। তুমি হয় তো বলবে আমরা এত স্বল্পায়ু যে, আমরা চিরজীবিনী প্রকৃতির নীতির বিচার কি করে করব? প্রকৃতি কোটি কোটি বৎসর পরেও তাঁর ভুল সংশোধন করলে তাঁর আয়ুর অনুপাতে সেটাকে অতি-বিলম্বিত বলে নিন্দিত করতে

পারবো না। আমরা আমাদের মূর্খতার নানারকম হেতুবাদ বার করে ফেলেছি। নইলে টিঁকতাম কি করে ?

আমি গল্প-লিখিয়ে হিসেবে একজন কাঁচা আর্টিস্ট বলে তোমাকে আগেই বুঝতে দিয়েছি যে পুষি-দির ছেলেটি নেই ; কিন্তু অত সহজে তোমাকে বুঝতে দেওয়ার উদ্দেশ্য আমার ছিলো না। তুমি অনেক মৃত্যু দেখেছ—তোমার দু'টি বোন একসঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে মারা গেছল—মৃত্যুর খবরে তুমি হয় তো আর চঞ্চল হও না, ওটা তোমার কাছে হয় তো বাজার-দরের মতোই একটা বাজে খবর। কিন্তু এমন প্রত্যক্ষ ও পরিষ্কার করে কোনো মৃত্যু আমি দেখিনি, অনুভবও করিনি। আমার জীবনে একমাত্র মার মৃত্যুর বেদনা আছে ; তবে মা যখন মারা যান আমি তখন ময়মনসিংহে বিদ্যাময়ী বোর্ডিং-এ ঘুমুচ্ছি। সে-দিনের কান্নায় আমার তীব্রতা ছিল, কিন্তু মনে হয় প্রাণ ছিলো না। শিশুর মৃত্যুর চেয়ে করুণ কিছু কল্পনা করা যায় বলে ভাবা আমার দুঃসাধ্য।

ঘড়ি থাকলে দেখতে পেতাম স্নান করে খেয়ে নিতে পুষি-দির দু'মিনিটো লাগে নি। এই সামান্য সময়টুকু দূরে রয়েছে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই যমের পেয়াদাগুলো ভিড় করে এসেছে—মাকে দেখেই বোধ হয় সসম্ভ্রমে এবার সরে দাঁড়াবে। পুষি-দির কোলে ছেলে ফিরিয়ে দিয়ে দু'হাতে তাড়াতাড়ি ঘরটা গুছিয়ে ফেললাম। নগেনবাবু ও তাঁর ভাই ইতিমধ্যে আহার সেরে যথাক্রমে ডাক্তার ও শ্মশানবন্ধুর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন।

বালতি তিনেক জল কোন রকমে মাথায় ঢেলে দু'টি মুখে তুলতে বউটির সঙ্গে এক থালায় বসে পড়লাম। সেই অত্যল্প কালের মধ্যে ভাব হয়ে গেলো এবং বি. এ. পাশ করে এসেও ওর বরের বিষয় প্রশ্নাদি করছি দেখে বউটির খুশির আর শেষ রইলো না। বউটির নাম কালিদাসী। ভারি লাজুক, স্নিগ্ধ মেয়েটি। বর ছাড়া আর কোনো কথোপকথনের বিষয় নেই বলে কাজে-কাজেই সেখানেই আমার রসনাকে রসিয়ে নিতে হল ! বর্ণনাটা রূঢ় হলে ক্ষমা করো।

কালিদাসীর বরের নাম খগেন্দ্রনাথ। দেখ, নাম সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটা নতুন নিয়ম করা উচিত। শৈশবাবস্থায় আমাদের মূক অসহায় পেয়ে বাপ-মা যথেচ্ছাচারে আমাদের ওপর নামের এই জুলুম চালাবেন এটা অসহ্য। এবং সেই নামের বোঝা চিরকাল অম্লানমুখে বহন করে আমাদের পিতৃভক্তি সাব্যস্ত করতে হবে। নামের মধ্যে মনস্তত্ত্ব আছে বলে ফ্রয়েড কিছু লিখেছেন

কি না জানি না, তবে খগেনবাবু যে চাকরি-বাকরি না করে বসে বসে দাদার অন্নধ্বংস করছেন তার কারণ ওঁর বাপ-মা ওকে খগু বলে আদর করতেন বলে। আমরা যখন বড়ো হয়ে চিন্তা করতে শিখি তখন আমাদের উপযোগিতা পরীক্ষা করবার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। গোত্র থেকে না-হয় আমাদের ত্রাণ নেই, কিন্তু জোর করে চাপানো এই নামের দাসত্ব আমাদের চিরকাল করতে হবে—এতেই আমাদের দাস-মনোভাবের প্রথম সূচনা।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও খগেনবাবুর কথাটা সেরে নি। লেখাপড়া বিশেষ কিছু করেন নি, ভালো লাগতো না নাকি। ছেলেবেলা থেকে দাদার ছায়ায়ই বর্ধিত হয়েছেন। এ-পর্যন্ত এক পয়সাও রোজগার করেন নি, তবুও তাঁর বিয়ে করায় যে সমাজের পক্ষ থেকে একটা আপত্তি উঠতে পারে তা শোনবার তাঁর ধৈর্য ছিলো না। নির্মলের সমাজনীতি কিন্তু উল্টো রকমের। বেকার হয়েছে বলে তার বিয়ে করার অধিকার লুপ্ত হবে এবং বেকার হয়েছে বলে তার হাত দুটো কাটা যাবে—এ দুটো নিয়মই ওর কাছে সমান বর্বর। নির্মল বলে: খাওয়া যদি তার পাপ না হয়, ঘুমোনো যদি তার পাপ না হয়, বিয়ে করাও তার পাপ হবে না। উত্তরে বলেছিলাম: এই জন্যেই পাপ হবে যে কতগুলি নির্দোষ ছেলে-পিলে মারা যাবে। এর পরে নির্মল যা বলেছিলো তা একান্ত ছেলে-মানুষি। বিষয়বস্তু ছেড়ে তর্ক যদি অবশেষে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তা হলে তাকে বাচালতা ছাড়া আর কি বলবো? বাড়িতে একটা টাইপ-রাইটার আছে, খগেনবাবু রোজ খান চারেক করে আফিসে-আফিসে দরখাস্ত পাঠান, লম্বা হয়ে ঘুমোন, আর গলা ছেড়ে গান ধরেন। কালিদাসীর যে দু'টি ছেলে পেটেই মারা গেছে সে-লজ্জাটিও সে গোপন রাখতে পারলো না! মারা তারা যেতোই; নির্মল হলে বলতো: বড়ো লোকের ছেলেরা বড়ো হয়েও মারা যায়। নির্মলের সঙ্গে এই জন্যে তর্ক করে সুখ হয় না। ঢাল তরোয়াল না নিয়ে যুদ্ধে গিয়ে মুণ্ডটা দিয়ে আসাই ওর মতে প্রকাণ্ড Adventure। ছেলেদের না খেতে দিয়ে না চিকিৎসা করিয়ে মরতে দেওয়ার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। নির্মলের মতে সন্তান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মরলে আপশোষ থাকতো কেন য়্যালোপ্যাথি করালাম না, য়্যালোপ্যাথিতে গেলে আপশোষ থাকতো গলিতে এত বড়ো জলজ্যান্ত একটা কবরেজ ছিল! ও সব ধোঁকা, ওর মধ্যে সত্যই নেই। না খেতে পেয়ে মরাটা নাকি আমাদের

কল্পনার আতিশয্য; খেয়ে পেট ফেঁপেও ঢের লোক মরে। বিয়ে করাটা ওর মতে শুধু সংস্কার নয়—আচরণীয় ধর্ম।

এই খগেনবাবুর সঙ্গে আমার পরে আলাপ হয়েছিলো,—সে-কথা পরে বলা যাবে! এখন পুষি-দির ঘরে ফের গিয়ে বসি। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো, ছেলেপিলেগুলো জেগে উঠে কেউ কান্না ও কেউ কলরব করে বাড়ি মাথায় করবার যোগাড় করছিলো; আমি যে যাইনি তা দেখে আশ্বস্ত হয়ে ওরা মুখগুলিকে এমন নম্র ও কমনীয় করে তুললো যে চুমু না খেয়ে পারলাম না। বিকেলে ওদের খাওয়া বলে কোনো হাঙ্গাম নেই, বাড়ির সামনের মাঠে ওদের ছুটোছুটি করতে পাঠিয়ে দিলাম। ওদের লুকোচুরি খেলায় কতক্ষণের জন্যে আমাকে বুড়ি হতে হল। তোমাকে এত সব কথা খুঁটিয়ে লিখছি তার কারণ আমি পুষি-দির সংসার দুই হাতে নিবিড় করে স্পর্শ করে অন্তরে একটি পরম তৃপ্তি লাভ করেছি—হোক তা মৃত্যু দিয়ে বিক্ষত, দারিদ্র্য দিয়ে মলিন।

এইটুকুন পড়ে তোমার কি মনে হচ্ছে না আমি যদি পুষি-দির অবস্থায় পড়তাম, তো কী করতাম? হয় তো এই রকম করেই মানিয়ে যেতে হতো। এ-ঘরের বাইরে আমি যখন বেরুতে পাবো তখন এই দিনের স্মৃতিটা কী কুৎসিতই যে লাগবে। তবু আজকে পুষি-দির সংকীর্ণ সংসারের সীমায় ক'টি মুহূর্ত আবদ্ধ থেকেই সত্যিই কিন্তু হাঁপিয়ে উঠছি না।

হ্যাঁ, দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেলো। ছেলেটি তখনো ধুক্‌ধুক্ করছে। রুগীর সেই বিভীষিকাময় স্তব্ধতার তুলনা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই; আসন্ন ঘটিকার উপমাটা নেহাৎই অবাস্তব হবে। তারপর এলো কালো রাত্রি। মাঝখানের অনেকটা সময় মুছে দিলাম, কেননা চিঠি তা হলে অত্যন্ত বড়ো হয়ে যাবে। ডাক্তার বলে গিয়েছেন, আজ রাত্রে টিকেও যেতে পারে। পুষি-দিকে বললাম: এবার ওকে আমার কোলে দিয়ে তুমি একটু ঘুমুবার চেষ্টা করো। পুষি-দির আপত্তি আমি শুনবো কেন? ছেলের গায়ের ওপর একখানি হাত রেখে পুষি-দি আমার কোল ঘেঁষে একটু শুল, এবং খানিক বাদেই টের পেলাম সে-হাত শিথিল হয়ে বিছানার ওপর নেতিয়ে পড়েছে; বুঝলাম মৃত্যুকে পারলেও ঘুমকে ঠেকায় পুষি-দির সে-সাধ্য আর এখন নেই। নগেনবাবু বারান্দায় খানিক পাইচারি করে একটা চেয়ারেই বসে বসে ঘুমিয়ে নিচ্ছেন, খগেনবাবু সস্ত্রীক দ্বার রুদ্ধ করে তাঁর ঘরে যথারীতি অধিষ্ঠান করছেন। কোনোদিন

গভীর রাত বিনিদ্র কাটিয়েছি বলে মনে হয় না, কিন্তু মরন্ত ছেলেটিকে কোলে নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে-থাকতে আমার সত্যিই ভারি ভয় করতে লাগলো। মনে হল মৃত্যুর একটা স্পষ্ট মূর্তি আছে, আর সে-মূর্তি মমতাময়ী মা'র মূর্তি নয়। আচ্ছা, বাঙলা সাহিত্যিকেরা মৃত্যুবর্ণনা করতে এত কুণ্ঠিত কেন? সে-তেজ সে-কল্পনা তোমরা কবে লাভ করবে? তোমাদের মধ্যে নাকি একটা প্রবাদ আছে যে গল্পে নায়কের মৃত্যু হলেই সে গল্প জোলো, ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। তোমরা নেহাৎই বাঙালি, ভিক্টর হিউগো-র টুপি ধরবারো তোমাদের যোগ্যতা নেই। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের স্বপক্ষে এমন আরেকটা যুক্তি দেন যে, আমার হাসি পায়। তাঁরা বলেন: সংসারে মৃত্যু তো আছেই, সাহিত্যে তাকে খুঁচিয়ে লাভ কী? সুখের ছবি এঁকে জীবনটাকে একটু রঙিন করে নেওয়া যাক। এর জবাবে যদি বলি: পৃথিবীতে ঢের লোকই তো বেশ স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকে, তাদের নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি করলেই বা কোন মোক্ষলাভ ঘটবে, তা হলে আমার এ-যুক্তিটা একই জাতের হবে নিশ্চয়। যা ঘটেছে তা বলতে আমরা সর্বদা লুকিয়ে বেড়াই কেন? ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে কেন আমাদের এত ভয়? আজ নগেনবাবু যদি মরতেন, তবে পুষি-দির সংসারে এই মৃত্যুটা কি একটা মহাকাব্যের কথাবস্তু হতে পারতো না? তোমাদের হাতে এমন বিষয়বস্তু পড়লে তোমরা নিশ্চয়ই আগ্রহ দেখাতে না। একটা প্রেমের প্লট পেলেই তোমাদের কলমে সুড়সুড়ি ধরে।

খোকাকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে থাকতে আমার মনে হল—এ আমারই ছেলে, আমারই জঠরে ওর জন্ম, আজ আমিই ওকে হারাতে বসেছি। ভাবতেই শরীরের সবগুলি শিরা-উপশিরা টনটন করে উঠলো। না না না—প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আর কি—আমি সন্তান চাইনে, অকারণ মৃত্যুর বিরুদ্ধে আমি এই দম্ভ প্রচার করতে চাই। যৌবনোচ্ছ্বাস হতেই মেয়েরা শুনেছি নাকি মাতৃত্বের অভিলাষিণী হয়ে ওঠে—ওটা যদি সত্যি হয়, তবে ওটাকে যৌবনাবস্থার অন্যান্য কু-অভ্যাসের মতই শাসন ও চিকিৎসা করা উচিত। তুমি মনে করো না (করছ না অবশ্যি) যে, আমি আমার মতগুলিকে অন্যের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দিতে চাই, আমি তত বড়ো অন্ধ অত্যাচারী নই। হ্যাঁ, আমি নিজের কথাই বলছি, নিজের কথা বলতেই আমি ভালোবাসি। যে-দুঃখ নিজে পাবো সেই দুঃখে ভাগ বসাবার জন্যে আরো কতগুলি অনাথ ও আতুর

শিশুদের আমন্ত্রণ করব আমি ততটা বদান্য নই। ধরো আজ যদি আমি একটি গরিব কেরানিকে বিয়ে করি (মোটে ষাট টাকা মাইনে) ও সন্তানধারণ করবার তাগিদে আমার যদি ইস্কুলের চাকরি না থাকে, তবে সেই সন্তান কি আমার পক্ষে পাপ—হ্যাঁ, পাপ হবে না? আমি উত্তর দিচ্ছি: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাপ হবে; কেননা ষাট টাকায় আমার সন্তানের উপযুক্ত ভরণপোষণ হবে না। অতএব সে-ক্ষেত্রে আগন্তুক সন্তানকে প্রতারিত করাই হবে সমীচীন। বিয়েই বা কেন করতে যাওয়া? সন্তানকে বৈধ করবার জন্যেই তো বিয়ে। সংসারকে সংকীর্ণ করে দেবার জন্যে যেখানে সন্তানের অনধিকার প্রবেশের স্থবিধে নেই, সেখানে আর বাধা কিসের? আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হলে বরং সে-বিষয়ে ভাবা যেতে পারে। সন্তানকে ভরণ-পোষণ করবার সঙ্গতি নেই বলে গরিব কেরানিটির সঙ্গে বিয়ের আগে প্রেম করা যাবে না এটা একটা বর্বর প্রথা। বড্ডো বাজে বকছি, না?

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম খোকা যাই-যাই করে উঠেছে। এবারে যাবে। ঘরে যে-লণ্ঠনটি জ্বলছে সেটা নিতান্তই অক্ষম মনে হল। ঐ টুকুন আলোতে মৃত্যুকে নির্ণয় করা যাবে না। ডাকলাম: পুষি-দি! কে তার উত্তর দেবে? পুষি-দি ঘুমে গা ঢেলে দিয়েছে। আবার ডাকলাম, হাত ধরে নেড়ে দিলাম, চিৎকার করে উঠলাম—পুষি-দি আরেকটু ভালো হয়ে পা মেলে শুল। এত দিন-রাত প্রতীক্ষা করে ও এমন একটা দৃশ্য দেখতে পাবে না? এবার এমন চেঁচিয়ে উঠলাম যে বিধাতারো কানে তালা লাগলো হয়তো। (তুমি তখন কী করছিলে?) নগেনবাবু লাফ দিয়ে উঠলেন। বললাম: খোকা কেমন করছে, বোধ হয় নেই। দীনতা ও সাংসারিক ক্রটি ঢাকবার জন্যে যে-নগেনবাবু নিজের ছেলের আসন্ন মৃত্যুর খবর দিতে আমার কাছে প্রথম সংকোচ দেখিয়েছিলেন, তিনি এখন সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করে এমন একটি আর্তনাদ করে উঠলেন যে পুষি-দির কথা ছেড়ে দাও, মনে হল মরা খোকাও বোধ হয় নড়ে উঠেছে। পুষি-দি এবার জাগলো।

আমি এখেনেই থামি, কি বল? আর বেশি লিখবো না, পরের ব্যাপারটা তোমাকে ভেবে নিতে দিলাম। সবিস্তারে বলে তোমার কল্পনাকে খণ্ডিত করতে চাইনে। পারো যদি, তোমার ভবিষ্যৎ কোনো উপন্যাসে একটা শিশু-মৃত্যুর হুবহু বর্ণনা দিয়ো। আমি লিখে ফেললে তুমি plagiarise করতে পারো।

সে-ঘরে তিষ্ঠোয় কার সাধ্য ? বাইরে বেরিয়ে এলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে যে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবো সে-কথাও ভুলে যেতে হলো। এখন ধীরে-ধীরে বেশ লিখতে পারছি বটে, কিন্তু তখন নিজের নিশ্বাসপতন সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলাম ; সত্যি। আয়ুর ভিখারি এই শিশুটির মৃত্যুতে কার উপকার হল জানি না, আমি কিন্তু একটা পরম শিক্ষা পেয়ে গেলাম, বন্ধু। আমাদের আয়ু এত স্বল্প বলেই জীবনকে আমরা এমন ভীরুর মতো আঁকড়ে ধরতে চাই। ভীরু বলেই আমাদের ভালোবাসায় মাধুর্য আছে। (এই কথাটা একান্তরূপে নীরস ও বিস্বাদ হলেও আমার বারে বারে আওড়াতে ভালো লাগে) 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'—কবিতা লেখবার কোনো বয়সেই আমি এই ভীষণ লাইনটা লিখতাম না। না মরলে এ জীবন আমাদের কাছে একটা মূর্তিমান অভিশাপ হয়ে থাকতো। তখন শোপেনহাওয়ারের মতো আমরা আত্মহত্যার গুণকীর্তন করতাম। হারাবো বলেই ভালোবাসায় বল পাই, তেমনি মরব বলেই জীবনের শত কৃত্রিমতার মধ্যে আনন্দ ও সৌন্দর্য আবিষ্কার করবার জন্যে আমরা মত্ত হয়ে উঠি। ক্রিকেট খেলোয়াড় এক সময়ে আউট হবে বলেই সে-খেলায় সে রস পায় ; একেবারেই আউট হবার কথা যদি তার না থাকতো তবে সে ব্যাট দিয়ে স্ট্যাম্পগুলোকে চুরমার করে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতো নিশ্চয়ই।

আমি কাল এলাহাবাদ যাচ্ছি। তুমি এসো। শরীর বেশ ভালো আছে। ইতি।

পুনশ্চ : খগেনবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার কথাটা বলা হল না—কথা দিয়ে কথা রাখতে পারি না এ আমার একটা দুর্বলতা। ওটা শোনবার জন্যে তুমি কৌতূহলী না হলেই ভালো করবে।

এলাহাবাদে নির্মলকে টেলি করা হয়েছিলো, তবু স্টেশনে তাকে না থাকতে দেখে অশ্রুর দস্তুরমতো রাগ হলো। ভাবলো, দূর ছাই, একটা হোটেলে গিয়ে ওঠা যাক—পেছনে গাইডরা কার্ড নিয়ে ফিরি করতে শুরু করেছে। একটা হোটেল নিয়ে দরাদরি করছে এমন সময় একটি প্রিয়দর্শন ছেলে কাছে এসে স্মিতমুখে শুধালো : আপনিই শ্রীমতী অশ্রু দেবী ?

ছেলেটির বয়স অশ্রুর চেয়ে ছোট, এবং অধিক মাত্রায় শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করবার তাগিদে সে শ্রীমতীটিও উহ্য রাখলো না। অশ্রু হেসে বললে—হ্যাঁ, আর তুমি ?

—আমি শ্রীনির্মল গুপ্তের ভাই, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর ঠাকুরপো। আসুন আমার সঙ্গে, গাড়ি তৈরি আছে। এই বলে বিমল (ছেলেটির নাম ;—ভাই-দের নাম মিলিয়ে রাখার প্রথাটা এতদিনে উঠে যাওয়া উচিত) হোটেলের গাইডটাকে এক কড়া ধমক দিয়ে অশ্রুকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে এলো।

গাড়িতে উঠেই অশ্রু বললে—তোমার দাদা এখানে আছেন ?

বিমল ড্রাইভারের পাশে বসে ছিলো ; ঘাড় ফিরিয়ে বললে—না।

—কোথায় গেছেন ?

—এলাহাবাদটা তাঁকে স্যুট করছে না। ছুটি নিয়ে বেরিয়েছেন। কোথায় গেছেন ঠিক বলতে পারি না। বৌদিও জানেন বলে মনে হচ্ছে না। স্বল্প একটু হেসে বিমল ফের বললে—এখানে কদিন আছেন তো ?

অশ্রু বিমনা হয়ে পড়েছিলো। বললে—কেন বল দেখি ?

বিমল একটু লজ্জিত হয়ে বললে—এমনি। অবশ্যি এখানে থাকবার বিশেষ কোনো আকর্ষণ নেই। খস্‌রুবাগ বা ভরদ্বাজ আশ্রম দেখার চেয়ে তুটো গাছ দেখায় বিস্ময় বেশি। তবে—

অশ্রু। থামলে কেন ?

বিমল। তবে যমুনার ওপর নৌকা নিয়ে বেড়ানোর মতো সুখ স্বর্গে গিয়েও কল্পনা করতে পারবো না। অবিশ্যি একা-একা নয়।

কথা শুনে অশ্রু বিমলের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য হল। বিমলের বয়েস বড় জোর সতেরো হবে, মুখে টাটকা ফুলের একটা সজীবতা আছে, ঠোঁটের ওপর থেকে চিবুক পর্যন্ত ভারি সুন্দর, একটি তিল থেকে আরো খুলেছে। মুখ নাকি মনের মুকুর—অশ্রু বিমলের মুখে তার মনের লেখা যেন এক নিমিষে পড়ে নিলে। বললে—বেশ, আমাকে বেড়িয়ে এনো একদিন।

বিমল নেহাৎ ছেলেমানুষ, আনন্দের আতিশয্যে গাড়ির মধ্যেই লাফিয়ে উঠলো। বললো—সে অত্যন্ত চমৎকার হবে। পরশু কলকাতা থেকে বীণারাও এসেছে ; আপনি যদি যান তবে বীণাকেও নেওয়া যাবে, নিশ্চয়ই। আজই চলুন, কেমন ? প্রয়াগ পর্যন্ত গিয়ে আমাদের দরকার নেই, আমরা তো জল

ছুঁয়ে তরে যেতে চাই না, কি বলুন ? আমরা এখনো দাঁত দিয়ে চিবিয়ে মাংস খাই। আমি লক্ষ্য করেছি অশ্রুদি, যে, ক'দিন থেকে আজকাল চাঁদ উঠছে। এমন একটা gala night আজ কাটবে যে—

অশ্রু কথাটাকে একটু বাঁকা করে বললে—কে এই বীণা ?

এবারে বিমল আর ঘাড় ফেরালো না। যেন কলেজের বিষয় গল্প করছে (বিমল ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে) এমনি শুকনো গলায় সে এইটুকুন মাত্র বললে—ও আমাদের পাড়ার ডাক্তার বাবুর ভাইঝি, ছুটিতে এসেছে এখানে।

আর কিছু প্রশ্ন করবার আগেই মোটরটা বাড়ির ফটকের কাছে দাঁড়ালো। অশ্রু গাড়ি থেকে নেমেই সটান বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। পর্দা সরিয়ে বিমল ততক্ষণে সোফার-এর সাহায্যে মোট-ঘাটগুলি নামাচ্ছে।

পর্দা সরাতেই দেখা গেলো—ইন্দিরা। এই ইন্দিরা ? অশ্রু ঠোঁট দুটো ইঞ্চি দেড়েক ফাঁক করে রইলো! ইন্দিরা, না নির্মলের ধর্মপত্নী !

এইখেনে আবার ছবি আঁকা দরকার। এইবারে গগন ঠাকুরের ডাক পড়বে —কেন না নির্মলের ধর্মপত্নী অন্তঃসত্ত্বা। একটা ব্যঙ্গচিত্র না হলে আর মানাবে না। হ্যাঁ, ব্যঙ্গচিত্রই। প্রতিটি রেখায় শ্লেষ, প্রতিটি টানে কৌতুক। যে-দেহ ছিলো ভাণ্ড, এখন তা হয়েছে ভাঁড়,—অমৃতলতা হয়েছে বৃক্ষকাণ্ড। ইন্দিরার এই শারীরিক ও মানসিক অধঃপতনের জন্যে অশ্রু তৈরি ছিলো না। ইন্দিরা যে এত শিগগিরই বাজে হয়ে যাবে তা জানলে ও যমুনার সবগুলো নৌকোকে ডুবতে অভিশাপ দিয়ে ফের চুপি-চুপি আরেকটা মেয়ে-ইস্কুলে গিয়ে টিচারি নিতো। এ-দাসত্বের ছবি দেখে ওর মন হাঁপিয়ে উঠছে,—মেয়েদের এই বন্দীদশা ঘোচাবার জন্য কবে আবার নতুন করে এলিজাবেথ ফ্রাই-র আবির্ভাব হবে ?

ইন্দিরা এগিয়ে এসে অশ্রুর একখানি হাত ধরে কাছে টেনে আনলো। অতি কাতর স্বরে বললে—ভারি কুৎসিত হয়ে গেছি।

ইন্দিরার ডায়রি থেকে :

ইন্দিরা ডায়রিতে তারিখ দেয় না, সামান্য দুয়েকটি বানান ভুল করে। খুব সরু নিব-এ বেশ ধরে ধরে লেখে ; মনে হয় যা লিখেছে তার চেয়ে চিন্তা করেছে

বেশি। কেন না ভাষায় ওর না আছে বেগ, না বা ফেনা। হাতের লেখাটি সরু বলে মনে হয় ওর মনটি কোমল ও করুণ। চিন্তা ও করতে পারে বটে, কিন্তু তার ফলে ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারে নি। মানে, ব্যক্তিত্বের অর্থ ওর কাছে আত্ম-প্রকাশ নয়। চিন্তায় ওর স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু তার প্রকাশে আছে কুণ্ঠা; আলস্য বললে আরো ঠিক হবে!

অঙ্কপাত করে ও ওর নিজের মনের ইতিহাস নিয়েছে এই ডায়রিতে; চুপ করে বসে বসে ভাবলে চিন্তা হত অসংলগ্ন, বিষয় হত অবান্তর—মনের চেহারার রেখাটিও চোখে পড়তো না। নিভৃত মুহূর্তে ও ওর গৃহকোণটিতে বসে মনের সঙ্গে মুখচন্দ্রিকা করেছে, সে-স্বপ্নকে ভাষায় মূর্তি না দিয়ে ওর স্বস্তি ছিলো না। এমনি করে কত সময় যে অপব্যয় করেছে তার হিসেব নেই—দুটো উল বুনলে তার চেয়ে বেশি কাজ দিতো—অন্তত এই ছিল ওর বাড়ির লোকের মত। রূপকথায় সোনার কাঠির কথা শুনেছিলো—সে বোধ হয় মানুষের হাতের কলম—যে-কলম মনের মৌনভঙ্গ করে। ডায়রি লেখাটা ইন্দিরার কাছে ন্যাকামি মনে হত না (যদিও আসলে ওটা ন্যাকামি)—মনে হত অন্তর্যামীর সঙ্গে একটি গোপন সাক্ষাৎকার; তার মধ্যে মুক্তির স্বাদ আছে। মুহূর্তটি ছোট, কিন্তু মুক্তি আকাশ-বিস্তীর্ণ।

ডায়রিতে কেন তারিখ দেয় না, জিগগেস করলে ইন্দিরা হয়তো বলতো: আমি তো জীবনের ঘটনাগুলি কুড়িয়ে-কুড়িয়ে গুছিয়ে রাখছি না যে তার পারম্পর্য না রাখলে ইতিহাস তার বন্ধনী হারাবে, আমি লিখছি আমার আত্মার রূপকথা; ছাপালে তা জনসাধারণের উপকারে আসবে না। কেননা এ আমার একান্ত নিজের, যেমন আমার চুল বাঁধবার রীতিটা অন্যের অননুকরণীয়। ডায়রি লেখাটা আমার মনের একটা বিশেষ ও পৃথক প্রতিষ্ঠা, ওটা একটা সাবেক ও মামুলি ইয়ার-বুক নয়।

ইন্দিরার কথা এ-পর্যন্ত অনুধাবন করে আমাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি প্রশ্ন করে: তা তো বুঝলাম; কিন্তু এত সব চোখা-চোখা মত পোষণ করেও তুমি তা পালন করতে পারলে না, এর কারণ কি? এর উত্তরে ইন্দিরা কী বলবে আমরা আন্দাজ করতে পারছি না; তবে সায়ন্তন দিগন্তরেখার মতো ওর চোখ নিশ্চয়ই বাষ্পাকুল হয়ে উঠবে, এবং আমরা তাকে স্বচ্ছন্দে ক্ষমা করতে পারবো। শুধু ক্ষমা করতে পারবো না, ইন্দিরা আমাদের মনে একটু

দোলা দেবে। কখনো-কখনো মনে হবে ভীরু হয়ে ইন্দিরা ভালোই করেছে, কেননা মনের গলি-ঘুঁজিতে বেড়াবার যার ছাড়পত্র আছে সে শুধু বিবেক, পাড়ার পাঁচ জন নয়। বাইরে সে-মন উদ্ঘাটিত হলেই পাড়ার পাঁচ জনের পাচন-বড়ি-প্রয়োগের প্রয়োজন হত। এই প্রকাশকুণ্ঠতাটিই ইন্দিরার গুণ হয়েও বড়ো দোষ। অন্তত অশ্রু তাই ভাবলে। ওর মতে ওজস্বিনী ভাষার চেয়ে একটা উলঙ্গ ভাব অনেক শক্তিশালী। পালিত হওয়ার চেয়ে প্রচারিত হওয়াতেই তার সার্থকতা।

মোটামুটি ইন্দিরার ডায়রির সমালোচনা এইটুকু। বানান ভুল নিয়ে ঠাট্টা করা আর ওর মুখরুচির প্রশংসা করা সমান নিরর্থক। আমরা কটু কথা বলতে পারি না এমন নয়, তবে সমালোচনাকে নৈর্ব্যক্তিক করার পক্ষপাতী আমরা নই—অন্তত ইন্দিরার সম্বন্ধে। কেন না—সে-কথা পরেই হবে'খন।

মা বকেন গৃহকর্মে আমার মন নেই; মাসিকসওদার হিসেব রাখতে গিয়ে সামান্য যোগ করতে ভুল করেছি—আমার উপায় কী হবে? কলেজে মেয়েরা রাজনীতি করছে, তাদের কোলাহলে গলা সেধে মেলাতে পারি না; সবাই বলে: ছুয়ো! কিছু হবে না আমাকে দিয়ে। বাবা একটা খুব ভালো বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজে এনেছেন, কিন্তু আমি এমন বেরসিক মেয়ে, সে খবরটা পেয়ে আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজের মুখও দেখলুম না একটিবার। সত্যিই, আমি এত নিস্পৃহ কেন হলুম? জীবনে এমন কোনো ঘা খাইনি যে জীবনকে ঘানি বলে সস্তা দুঃখবাদ করব। মোটমাট, কেন জানি না ভালো লাগে না। ভালো লাগে না। কারণটা খুঁজতে হবে।

মনকে স্পষ্ট জিগ্‌গেস করলুম: কী চাই? মন অনবরত চোখ ঠারে, জবাব দেয় না। কিন্তু জবাব আমার পেতেই হবে। আমার বয়সী মেয়েরা চায় কী? প্রেমিক স্বামী, সুশৃঙ্খল সংসার, নীরোগ সন্তান? আমার মনে হয় বিস্বাদ, অ-শ্লীল [টীকা: শব্দটা প্রচলিতার্থে নয়]; আহত কেঁচোর মতো শরীরটা সংকুচিত হয়ে আসে। কর্ম চাই? কী কাজ করবো? মেয়েদের অবরোধমুক্ত, দৃপ্ত, স্বাতন্ত্র্যশালিনী করবার জন্যে মশাল হাতে নিয়ে সমুদ্রাম্বরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবো? না ভাই, পারবো না! যে পারো সৌন্দর্যের

চিত্রদীপ জ্বালিয়ো, আমি প্রশংসা করবো। জীবনে আদর্শপূজা করতে আমার ভয় করে, যজ্ঞ পণ্ড হবে বলে নয়, সমিধ-ই আমি সংগ্রহ করতে পারবো না; ক্লান্ত হয়ে পড়বো। প্রেম চাই? পাওয়া যাবে না এমন প্রেম? কী হবে তা দিয়ে? মিছিমিছি তবে স্নায়ুগুলোকে খাটিয়ে ক্লিষ্ট করে লাভ কী? বেশ পাওয়া যাবে এমন প্রেম! তবে প্রেম আর রইলো কোথায়?

যা আমার কাছে আছে তাই নিয়ে আমি বেশ আছি। [টীকা: কয়েক লাইন আগেই লেখা হয়েছে: 'ভালো লাগে না।' এই থেকে আমরা ইন্দিরার অস্থিরচিত্ততা অনুমান করতে পারি। ওর যে ভালো লাগে না সেই হয়তো ওর বেশ থাকা।] কী আমার আছে জিগগেস করবে? গভীর করে উত্তর দেব: আমার কর্মহীন নীরব নিঃসঙ্গতা! সেই আমার জীবনের উদার শান্তি। আমি পৃথিবীর কোনো কাজে আসবো না, সামান্য একটা ওয়াড় সেলাই করলুম না কোনো-দিন—এই প্রশংসাপত্র দিয়ে বিধাতা কেন আমাকে এত অপ্রাকৃতিক করলেন আমার এ-প্রশ্নেরো কোনো জবাবদিহি নেই। সুপ্রচুর অবকাশ পেয়েছি—চৈত্রমধ্যাহ্নের আকাশের মতো অবারিত। কিন্তু সুখ এই যে, হাতে কোনো কাজ নেই। বাবার গরম জামা-কাপড়গুলো রৌদ্রে দেবার কথা ছিলো, প্রতিনিধিরূপে কালিন্দীকে প্রেরণ করলুম। [টীকা: ছন্দ দেখে অনুমান হচ্ছে কালিন্দী ইন্দিরার ছোট বোন।] কালিন্দী বেশ বাধ্য মেয়ে, কোমরে আঁচলটাকে রাশীকৃত করে ঘর-দোর নিয়ে ঘেমে উঠেছে; আটপৌরে ডুরে শাড়িটিতে ওকে কী যে মানিয়েছে বললে ওর আত্ম-তৃপ্তির আর সীমা থাকছে না। কালিন্দী আমার নয়নরঞ্জিকা! [টীকা: কালিন্দী সম্বন্ধে ওর বাগবাহুল্যের অর্থ এই যে, ও ছিলো বলেই ইন্দিরা বেঁচে গেছে, নইলে এই নীরব নিঃসঙ্গতা ওকে আর ভোগ করতে হত না। আফিসের জামা-কাপড় রৌদ্রে না দিয়ে রাখলে ওর মা যে ওকে আদর করে পিঠে খেতে দিতেন অতো বড়ো দুরাশা না করাই ভালো।]

আমি এই কর্মহীন নীরব নিঃসঙ্গতার উপাসিকা—এই আমার গৌরব। সংসারের সেবায় আমার স্থান নেই, পরোপকার আমার ব্রত নয়—এই আমার অসাধারণত্ব। গাল দিতে চাও দিয়ো, কিন্তু যদি বলি এই নিঃসঙ্গতাটিই আমার আধ্যাত্মিকতা, বলবে: তোমার মুখে কথাটা মানায় না, ইন্দিরা! না মানাক, ক্ষতি নেই, কিন্তু এই নিঃসঙ্গতা নিয়ে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী ঘিরে আমি মনে-

মনে যে একটি নীড় নির্মাণ করেছি তার কথা বলেও তোমাদের লাভ নেই। [টীকা : কেন না সে-নীড়ে আর কারু নিমন্ত্রণ হবে না।] প্রকৃতির সঙ্গে এমন একটা হৃদয়যোগকে তোমরা নিশ্চয়ই বিদ্রূপ করবে, বলবে : অলস বিলাসিতা মাত্র। আমি তা গ্রাহ্য করি না। সূর্যোদয়ের আগে চোখ চেয়ে যে-জগৎকে আমি আবিষ্কার করে মুগ্ধ হই, ঘুমেও সেই জগতের বহুবর্ণতা আমার হৃদয়ে লেগে থাকে। যাই তোমরা বলো, আমার চিত্তের আরতি এই প্রকৃতিকে নিয়ে। আমার অনুভূতি অত্যন্ত গভীর বলেই আমি কবি হতে পারলুম না।

আমি যে কত সুন্দর তা তোমরা কেউ কল্পনা করতে পারবে না। কালিদাসের কাব্যে ত্রিদশবধূর রূপবর্ণনায় যারা মুগ্ধ হয়েছে তাদের আমি প্রথমেই বাতিল করে দিচ্ছি। আমার অঙ্গে তরলিকা সুরশৈবলিনীর লাবণ্য —এ কথা কে না জানে? সে-বিশেষণটাকে আমি গ্রাহ্যই করিনে! কবিরা আমার সঙ্গে অরণ্যচন্দ্রিকার তুলনা দেবেন—ভঙ্গুর উপমা। জানো, আমি এই বিশ্বপ্রকৃতি; মানবীর মূর্তিতে বিধাতার অন্তরছায়া! পায়ের নিচে মাটি আমার কঠিন, বায়ু ঘন, নিঃশ্বাসগ্রহণ একটা কঠোর শাস্তি মাত্র। শারীর বিজ্ঞানের অধীন আছি বলে আমার কখনো-কখনো নিজের ওপর অবজ্ঞা আসে, আমাকে মৃত্যুর অনুযাত্রিণী হতে হবে ভেবে আমার হাসি পায়, সৌরজগতে আবার একদিন পথ হারিয়ে ফেলব বলে একটা আনন্দময় আতঙ্ক উপভোগ করি। সে কবে? [টীকা : উল্লিখিত কথাগুলি থেকে ইন্দিরার চরিত্রের আরেকটু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে,—ইন্দিরা নিজের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সজ্ঞান, বলা যেতে পারে স্বার্থপর।]

কর্মবাহুল্যে মানুষ কত কুশ্রী হয়ে পড়েছে,—পৃথিবী-ব্যাপী এবার ধর্মঘট হোক। আজ সমস্ত বিকেল ধরে কী সুকোমল ধারাঙ্কুর ঝরছে। খোলা বারান্দায় বসে চুলগুলো ছড়িয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা গান গাইলুম; আকাশ কান পেতে শুনলো, মুগ্ধ হয়ে গেলো। গানটি যেন আমাকে অমর্ত-লোকের পারে নিয়ে এসেছে। এই জন্যেই তো রবীন্দ্রনাথকে আমি কবিশ্রেষ্ঠ বলে সম্বর্ধিত করি। [টীকা : সাহিত্যকে সুমধুর করতে হলে জীবন থেকে তাকে দূরে সরিয়ে আনতে হবে—এই কৌশল রবীন্দ্রনাথের জানা আছে বলেই তিনি শিল্পীশ্রেষ্ঠ। ইন্দিরা রুশ সাহিত্য পড়েছে বলে মনে হয় না, তা হলে গোগল-এর হতাশা বা ডস্টয়ভস্কির অবিশ্বাসকে ক্ষমা করতে পারতো না।]

প্রেমের চেয়ে যে-আর্ট বড়ো আমি সেই আর্টের উপাসিকা। বাহ্যিক প্রকাশ থেকে নিষ্কর্ষিত করে আর্টের যে একটি অবাস্তব রূপ আছে আমি তাকে কায়মনে ভালোবেসেছি। বাহ্যাড়ম্বরের আতিশয্যে মানুষ এই সহজ আনন্দ-বোধটি হারিয়ে ফেলেছে—তোমাদের চিত্তদারিদ্র্য আর সওয়া যায় না। আমি এই বিরল, দুর্লভ গুণটির অনুশীলন করব। সকলের মতো সীমা-লাঞ্ছিত সংসারের পঙ্কিল আবর্তে তার সমাধি দেব না! এই আমার জীবনের সংজ্ঞা ও সার্থকতা।

আমি বাজে, বিলাসী, ভাবুক। [টীকা: কথাগুলি সমার্থসূচক।] আমাকে করুণা করবে, তোমাদের অসীম দয়া—কিন্তু আমার এই ভাববিদ্যুৎ দিয়ে সমস্ত বায়ুমণ্ডলকে পরিপূর্ণ, পরিব্যাপ্ত করে রাখবো, কেউ না কেউ প্রভাবিত হবেই। তোমরা বলশালী হও, আমি হব সুন্দর। [টীকা: ইন্দিরার মতটা আধুনিক নয় মনে হচ্ছে। বলের মধ্যে যে-সৌন্দর্য আছে সেটা প্রখর ও বর্বর ; ওর মতে শিল্প-সৌন্দর্য হচ্ছে দুর্বল, নিরীহ, ভঙ্গপ্রবণ—এবং সেইটেই হচ্ছে জীবনের রূপময়তা।]

কালিন্দীর পেটের মধ্যে ফোড়া হয়েছে,—দাঁতের ত্রুটির জন্যে। সাহেব ডাক্তার এসেছিলো, বললে, অজ্ঞান করে কেটে ফেলতে হবে। বাবা দারুণ ভড়কে গেছেন ; সহজে সারানো যায় কি না, সেই ভেবে হোমিয়োপ্যাথির শরণাপন্ন হয়েছেন—কালিন্দীর যন্ত্রণার দিনগুলি বেড়ে গেছে।

মাঝরাতে ঘুম ছেড়ে ধড়ফড় করে জেগে উঠলুম—পাশের ঘরে কালিন্দী চিৎকার করছে। ভয়ে বেদনায় শরীর কেঁপে উঠতে লাগলো। মনে হল মিথ্যা এই প্রকৃতির শুভময় সৌন্দর্যপ্রেরণা—এর অন্তরের কুশ্রীতা আমি ধরে ফেলেছি। প্রলয়পয়োধির তরঙ্গ-আঘাতে যে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে, ফুলের পাপড়িতে শিশির-পড়ার শব্দ শুনে সে আর মুগ্ধ হয় না! মৃত্যুকে তবু ক্ষমা করা যায়, কেন না সেটা একটা পরমরমণীয় মোহময় বিস্মৃতি মাত্র—ভারি রোমান্টিক,—কিন্তু এই খণ্ডিত লাঞ্ছিত বিপর্যস্ত জীবনের মতো জঘন্যতা আর কোথায় আছে? এই সৃষ্টিটা বিধাতার বীভৎস রসের পরাকাষ্ঠা। [টীকা: ইন্দিরাকে অনুধাবন করা কঠিন মনে হচ্ছে, ওর ভাবের সঙ্গতি পাওয়া যাচ্ছে কি ?]

কিন্তু এই জীবনে মর্ত্যাতীত সৌন্দর্যের সাধনা করবো সমস্ত অন্তর দিয়ে এই উপলব্ধিটি আমি লাভ করেছিলুম ; কালিন্দীর চিৎকারে আমার সে-ধ্যান ভেঙে যেতে বসেছে। ভাবলুম এই স্থূল ইন্দ্রিয়সর্বস্ব দেহটাই হচ্ছে সৌন্দর্য-

সাধনার বাধা,—আমি যদি সহসা একদিন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হই, অথচ আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা না হয়! যদি একটা অনিবার্য দুর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ, আকার-ভ্রষ্টা হয়ে পড়ি! এই মাংসল মৃন্ময় শরীর নিয়ে আমরা কী করে সুন্দর হবার স্বপ্ন দেখতে পারি! এমন একটা গ্লানি নিরন্তর আমাদের সইতে হচ্ছে বলে আমার লজ্জার আর সীমা থাকে না। শারীরিক প্রক্রিয়াগুলো কী নিদারুণ রূপে স্থূল, এর সামান্য ব্যতিক্রমের শাস্তি জঘন্যরূপে সুপ্রত্যক্ষ। [টীকা : সন্তানধারণযোগ্যা রমণী না হয়ে এই অনুভূতি নিয়ে একটা দীর্ঘায়ু ফুল হলেই বোধহয় ইন্দিরাকে মানাতো ভালো। তবু দেহ সম্বন্ধে ওর এই লোকাতীত ধারণাটা আধুনিক কালে শুধু যে অপক্ক তাই নয়, দস্তুরমতো অভব্য। কেন না এই দেহগঠন যদি উপযুক্ত সাধনার বলে ভাস্কর্যের সীমায় উপনীত হয়, তবে তার চেয়ে অধিকতর সৌন্দর্য কল্পনা করা দুরূহ, এমন কি দেহের এই বৈধ স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলোও অভিজাত। স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য সমপদবাচ্য; রোগ যেমন আছে তেমন তার চিকিৎসাও আছে। ইন্দিরা এ-যুগে পেছিয়ে পড়েছে; ওকে সক্রেটিসের ভগ্নীরূপে পেলে আমরা খুশি হতাম।]

কালিন্দীর শিয়রে বসে ওর কপালে হাত রাখলুম। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে [টীকা : ইন্দিরা দেখছি রিয়ালিস্টিক হবার চেষ্টা করছে।] বললে : দিদি, আর পারি না। পরে একটা বেদনাহীন মুহূর্তে ফের বললে : বিজ্ঞান এখনো যথেষ্ট উন্নত হয় নি। আমরা আরো দু'শতাব্দী পরে এসে কেন জন্মালুম না? দু' শতাব্দী পরে ক্রমবিবর্তনে এই পৃথিবী আরো সহজ হয়ে উঠবে, না? তোমার কী মনে হয়? [টীকা : এ ধরনের কথা শুনে আমরা স্বচ্ছন্দে আন্দাজ করতে পারছি কালিন্দী সাবালিকা হয়ে উঠেছে—আইনের অর্থে তো বটেই, বুদ্ধির অর্থে। অর্থাৎ, মনে হচ্ছে, সে হার্বার্ট স্পেনসার পড়েছে, যদিও স্পেনসারের মত উলটো—ক্রম-বিবর্তনের ফল যে নিছক জটিলতা এ-ই তিনি বিশ্বাস করেন।] হঠাৎ ব্যথার আরেকটা চাড় উঠলো, কালিন্দীর মুখ নীল বিবর্ণ, হাত-পা শিথিল হিম হয়ে এল। চিৎকারটা যেখানে বাঙ্ময় হয়ে উঠলো, শুনতে পেলুম করুণস্বরে আমার কাছে এক গ্লাস বিষ চাইছে। মরলে পরে নরক আছে কি না জানি না, কিন্তু ক্যানসার নেই। [টীকা : পেটে ফোড়া আর ক্যানসার হওয়া এক নয়।]

আমার চোখের সামনে বিলীয়মান অন্ধকার,—কালিন্দী একটু ঘুমিয়ে পড়েছে হয় তো, চুপ করে আছে। বাইরে বেরিয়ে এলুম, সৃষ্টির সেই অস্পষ্টতার মধ্যে আমার সামান্য অস্তিত্বটুকু যে কী ভালো লাগলো কেমন করে বোঝাই। মনে হল মৃত্যু মিথ্যা—এই যে নিশ্বাস নিতে পারছি সুস্থ সুন্দর দেহে —এর চেয়ে বিলাস আর কী আছে! বেশি দিন না-ই বা বাঁচলুম, কিন্তু যত দিন আছি তত দিন যেন অত্যন্তমাত্রায় বেঁচে যেতে পারি, এই প্রার্থনা।

কালিন্দী আবার চিৎকার করে উঠেছে। ওর আর্তনাদ শোনবার জন্যে আর দাঁড়ালুম না, ধীরে ধীরে বাগানে চলে এলুম। [টীকা : এই ভোরে ওর বাগানে চলে আসাটি আমাদের ভালোই লাগলো ; ওকে আমরা স্বার্থপর বা স্নেহবিমুখ বলে নিন্দা করলে সেটা ন্যায়ানুগত হবে না। ওর সৌন্দর্যবোধটি আমাদের মনোজ্ঞ হয়েছে।]

টের পেলুম রমাপতি আমার আত্মীয় হয়! কিন্তু এ-বিষয়ে সজ্ঞান হওয়ার আর অর্থ নেই। কেন না রমাপতি যেদিন এসেছিলো কপালে তথাকথিত আত্মীয়তার নিদর্শন এঁকে আসে নি, এসেছিলো একান্তরূপে পুরুষ হয়ে—যদি উপমা দিতে হয় বলি, একটা নৈর্ব্যক্তিক জ্যোতিষ্মান আবির্ভাবের মতো। এখন, ফিরে যাও, বললেই মন শোনে কৈ? [টীকা : রমাপতি ইন্দিরার কি রকম আত্মীয় হয়, ডায়রিতে তা লুকিয়ে রাখাটাকে নিশ্চয়ই ভীরুতা বলবো। রমাপতি মামা না কাকা, দাদা না আর-কিছু জানা উচিত ছিলো। 'তথাকথিত' কথাটি প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ কৃত্রিম সম্পর্কটার স্বভাবসিদ্ধ এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে তার সৃষ্ট ব্যবধানগুলিকে রক্ষা করে চলে ; তাই রমাপতি আত্মীয় হয়েও ইন্দিরার এমন স্নেহ বা হৃদ্যতার অধিকারী হয়েছে যা সম্পর্কের অতিরিক্ত, তার সীমার বহির্ভূত। শিশুকাল থেকে যে-সাহচর্য নরনারীর হয়ে থাকে সেটায় রহস্য-বিলোপ ঘটে বলেই আত্মীয়তাটা টিকে থাকে, তাই পৃথিবীতে সহোদর ভায়ে-বোনে প্রেম বড়ো একটা দেখা যায় না, যদিও *Sanine* সে-সংস্কারো ভেঙেছে। রমাপতি যদি ছেলেবেলায় ইন্দিরার সঙ্গে খুব মেলামেশা করত তা হলে হয়ত রমাপতিকে দাদা বা মামা বা কাকা বা আর কিছু ডেকে-ডেকে ইন্দিরার মন ও রসনা অভ্যস্ত হয়ে পড়তো ; আত্মীয়তার প্রাচীর ভাঙতো না বোধ হয়। কিন্তু রমাপতিকে এখন কাকা বা মামা বা দাদা বা আর-কিছু বলে রসনা ডাকবে কেন, মনই বা কি করে সায় দেবে?]

রমাপতির প্রতি আমার এই অনুভূতিটির কি সংজ্ঞা দেব ভেবে উঠতে পারি না। বাঙলা ভাষায় শব্দসম্পদ এতো কম যে ঠিক atmosphere-যুক্ত একটা প্রতিশব্দ পাবে না। প্রেম কথাটার না আছে অর্থ, না বা ইঙ্গিত; তার চেয়ে স্নেহ কথাটায় সংকেতময়তা বেশি আছে। কিন্তু ঐটুকু কথায় কুলোবে না কিছুতেই। বন্ধুতা, মিথুনাসক্তি? কথাগুলি অত্যন্ত রূঢ় বলেই যে বরখাস্ত করছি তা নয়, কথাগুলির অর্থ সত্যিই অসম্পূর্ণ; আমার এই অনুভূতিটি সত্যিই অনিরূপণীয়! [টীকা: অনুভূতিটির না পেলেও atmosphere কথাটার বাঙলা প্রতিশব্দ পাওয়া দুষ্কর হত না।]

কেন রমাপতিকে ভালবাসি [টীকা: এইখানে ভালবাসি কথাটা ক্রিয়া, অনুভূতি বা বিশেষ্য নয়, তাই গ্রাহ্য।] এই প্রশ্ন করে সদুত্তর পাচ্ছি না। রমাপতির রূপ নেই, বিত্ত নেই,—মুখশ্রী নেহাৎ সাধারণ, স্বাস্থ্যগৌরবেও কুলীন নয়—সায়ান্স কলেজ থেকে রিসার্চ করবার জন্যে সামান্য একটা বৃত্তি পায় মাত্র। [টীকা: বোঝা যাচ্ছে সেই সূত্রেই রমাপতি কলকাতায় এসেছে পড়াশুনা করতে। বিজ্ঞান-বিষয়ে গভীর গবেষণা করতে গিয়ে যে একটি চারুবর্ধনা আত্মীয়ার প্রতি অলস দৃষ্টিতে তাকানো যাবে না এমন আত্মসংযমের প্রমাণ দিতে স্বয়ং সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরো লজ্জিত হতেন।] কিন্তু ওর একটি ভীষণ গুণ আছে,—তা হচ্ছে ওর অনন্যনিষ্ঠ পাঠাসক্তি। ওর ছোট ঘরটিতে বসে সমস্ত দিন (কলেজের সময়টুকু ছাড়া) যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করে কি-এক অভূতপূর্ব আবিষ্কারের আশায় কলকব্জার ওপর ঝুঁকে থাকে। এই অখণ্ড মনোযোগ বা অন্যান্য জিনিসের [টীকা: ইন্দিরা স্বয়ং?] প্রতি ওর এই ঔদাসীন্য ও অবহেলা দেখে রাগ হয়, কিন্তু রাগতে পারি না। [টীকা; কি করেই বা পারবে? রমাপতিকে যে ওর ভালো লাগবে এতে আর সন্দেহ কি? ও অলস কর্ম বিমুখ—রমাপতির একনিষ্ঠ কর্মপরায়ণতা। ইন্দিরা মৃদুস্বভাব অবাঙ্মুখী, আর রমাপতির দেহে যেমন দৃঢ়তা, বচনে তেমনি সুস্পষ্ট তেজ। প্রীতির মূলেই বৈষম্য,—যত গভীর, প্রীতিও তদনুপাতে প্রগাঢ়। রমাপতি যদি তার ল্যাবরটরিতে দিন-রাত মাথা গুঁজে পড়ে না থাকতো, মাঠে বসে যদি বাঁশি বাজাতো বা ইজি-চেয়ারে গা ছড়িয়ে বসে বিড়ি ফুঁকতো তা হলে ইন্দিরার পক্ষে তার সংজ্ঞানির্ণয় করতে বেগ পেতে হতো না—অর্থাৎ শুদ্ধভাষায় তাকে বলতো ন্যাকামি।]

রমাপতি আমার আত্মীয়, ওর সঙ্গে সামান্য কথা-অনুরাগ সম্ভোগ করতেও আমার বাধা আছে এ-কথা আজ বললেই বা শুনি কি করে? টের পেলুম, ইদানি আমাদের দু'জনের ওপর সংসারের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির ছায়া পড়েছে। [টীকা : ইদানি কথাটি লক্ষ্য করবার। মনে হচ্ছে, প্রথমত এদের পরস্পরের সান্নিধ্য নিবিড়তর হয়ে উঠেছিলো এই আত্মীয়তারই ছাড়পত্রে। নর-নারীর একটা শারীরিক নৈকট্য ঘটারও যেখানে সুবিধে নেই সেখানে,—হোক না কৃত্রিম, হোক না মূল্যহীন—এই আত্মীয়তার ওজুহাতকে নিন্দা করাটা ঠিক হবে না। সেই কৃত্রিম আত্মীয়তাটা ইদানি সত্য ও সুগভীর হয়ে উঠতে চাইছে বলে সংসার বা তথা সমাজের সহ্য হচ্ছে না।] মন বিমুখ হয়ে রইলো ; যেটা অন্যায় বলে বুঝছি—সেটাকে শাসন করবার জন্যে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ করব মনের মধ্যে সেই শক্তি খুঁজে পেলুম না কেন? বুঝলুম, রমাপতির কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এমন কোনো অন্তরায়কে আমি কখনো কল্যাণকর বলে স্বীকার করবো না, কিন্তু এ নিয়ে যে সহানুভূতিহীন সংসারের সঙ্গে একটা ক্ষমাহীন সংগ্রাম করবো সেটাও আমার কাছে অবিনয় মনে হল। অন্য মেয়ে হলে কি করত জানি না, আমি আমার ঘরে ফিরে এসে নির্জনে কাঁদতে বসলুম। [টীকা ঃ গোঁয়ার ওথেলো (স্ত্রীর বুকে) ছুরি বসিয়ে অদৃশ্য হলে ঝি এসে মুমূর্ষু ডেসডেমোনাকে জিগগেস করলে, কে এই সর্বনাশ করেছে? শ্রীমতী ডেসডেমোনা মরলো বলেই গলে গিয়ে তার মিথ্যা কথাকে বললাম—'স্বর্গীয় মিথ্যাবাদ।' এই মিথ্যাবাদিনী ভীরু ডেসডেমোনাই গোঁয়ার ওথেলোকে বিয়ে করবার জন্যে বাপের সঙ্গে বাক্যের লড়াই করতে কসুর করে নি। এইখানটাতে বাঙালি মেয়ের সঙ্গে তার কুটুম্বিতা নেই। ইন্দিরা ঘরে গিয়ে যে কাণ্ডটা করে বসলো সেটা প্রাক্-গান্ধি-যুগের বাঙালি মেয়ের প্রকৃষ্ট চরিত্র-নমুনা।]

রমাপতিকে আমি বিয়ে করবো এমন একটা স্থূল নীচ অশ্লীল ইচ্ছা পোষণ করতে আমার শরীর-মন কণ্টকিত হয়ে উঠলো। [টীকা : ইচ্ছাটা নীচ মনে হবার কারণ এই নয় যে, রমাপতির সঙ্গে ওর ক্ষীণ রক্তসম্পর্ক আছে ; কারণ, ও বিয়ে-ব্যাপারটাকেই ঐ সব বিশেষণে আখ্যাত করে থাকে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চটবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত চিন্তা বা ধারণার স্বাধীনতার আমরা পক্ষপাতী।] অথচ রমাপতিকে আমার চিরকালের জন্য ছেড়ে থাকতে হবে, সমাজের এই অনুশাসন মেনে নিলেই যে, একটা কীর্তি করা হবে এ-কথাও

মানতে পারিনে। রমাপতির সঙ্গে [টীকা : ইন্দিরা রমাপতির পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার করতে চায় না, ঐ নামটি বারে বারে লিখতে ওর ভালো লাগে বোধ হয়।] এ-বিষয় নিয়ে একটা পরিষ্কার কথা বলা চলে না ? মা গো, কি লজ্জা ! নিজেকে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করে দিতে আমি মরে গেলেও পারবো না ; কাঙালপনাকে আমি ঘৃণা করি।

কিন্তু আমি তো যাচ্ঞা করতে চাই না, আমি চাই ওর সঙ্গে এমন একটা আলোচনা করতে যেটা বুদ্ধি দিয়ে আয়ত্ত করা যাবে এবং যেটার সাহায্যে বর্তমান সমস্যার সমাধান হবে। যেন এত সহজেই এ-সমস্যার মীমাংসা হয় ; অসীম সময় এ সন্ধিকে টিকতে দেবে কেন ? তবু রমাপতির ঘরের দিকে অগ্রসর হলুম। দরজা ভেজানো ছিলো, ঠেলা দিয়ে ঢুকে পড়েও ওর ধ্যান ভাঙতে পারলুম না। দোরের দিকে পিঠ করে বসে আছে—সামনে টেবিলের উপর মাথাটা আনমিত। টেবিলের এক কোণে একটা মোমবাতি জ্বলছে—এই রমাপতির চুল ধরল বলে—রমাপতির ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর নোয়ানো ঘাড়টা স্পর্শ করতে ভারি ইচ্ছে হল, কিন্তু ইচ্ছেটাকে দমন করলুম। দৈহিক সংস্পর্শের আবিলতা দিয়ে আত্মাকে কুণ্ঠিত করতে চাই নে। খুব কাছে এসে দাঁড়ালুম ; তবু রমাপতির মুখ তুলে চাইবার নাম নেই। [টীকা : রমাপতি যে বিশ্বামিত্রের চেয়ে বড়ো সাধক এ-সত্যটা সহজেই প্রতিপাদিত হল।]

এক ঝলক হাওয়ায় দুর্বল দীপশিখাটা নিবে গেলো এবং দেশলাই খুঁজতে গিয়ে রমাপতি হঠাৎ আমার ডান হাতটা ধরে ফেললে। অন্ধকারে রমাপতির মুখ দেখা গেলো না বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ওর সমস্ত অস্তিত্বটুকু যেন সঙ্গীতময় হয়ে উঠেছে। [টীকা ঃ ইন্দিরার রচনার অপরাপর ত্রুটির মধ্যে একটা বড়ো ত্রুটি এই যে, ও মোটেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলে না। এইখানে রমাপতি ওকে দেখে কি-কি কথা বললে, জানলে আমরা খুশি হতাম।] ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিলুম, হাতের স্পর্শ অবশেষে হয় তো অধরের স্পৃহা হয়ে উঠবে, এবং অধর থেকে নধরের, তা ছাড়া এই অন্ধকারটি উপন্যাসের মতো মধুর বটে, কিন্তু মোম-বাতিটা ফের না জ্বাললে অন্ধকারেই এই এঁদো কুৎসিত সংসারটা মুখ ভেঙচাবে। দেয়ালের প্রত্যেকখানি ইট সহস্রচক্ষু ইন্দ্রের মতো পাপীয়ান।

আলো জ্বালানো হল, সান্নিধ্যটিও নিভৃত হয়ে উঠেছে, কিন্তু কোনো কথাই বলতে পারলুম না। যেন রাত করে এতো সব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাথা

না থামালে এ-রাত আর পোহাত না। হঠাৎ বারান্দায় একটা শব্দ হতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে হেসে বললুম: চলি এবার, বাইরে গুপ্তচররা পদচারণ করছে। রমাপতি কিছু বললে না, একটু তাকিয়ে হেসে মুখ নীচু করে কাজে মন দিলে।

কেলেঙ্কারির আর সীমা রইলো না। আমাকে নিয়ে রমাপতির দুর্নাম এতো বেড়ে উঠেছে যে, রমাপতি বাবার মুখের ওপরেই সটান বলে বসলো: ইন্দিরাকে আমি বিয়ে করবো; এবং রমাপতির প্রার্থনাটা যে অযৌক্তিক নয় তার পক্ষে আইনস্বীকৃত নানা প্রথার নজির দেখাতে লাগলো। লাভ হ'ল এই, বাবাও রমাপতির মুখের ওপর স্বচ্ছন্দে বলে বসলেন: আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। রমাপতি তার ট্রাঙ্ক গুছোতে বসলো।

রমাপতি সোজা আমার ঘরে এসে হাজির; বললে, আমাকে তার অনুসরণ করতে হবে। বললে: এ-সব নিয়মের দাসত্ব যদি আমাদেরো করতে হয়, তবে আমাদের নিগ্রো হয়ে জন্মানোই উচিত ছিলো। বিয়েতে অনুষ্ঠানটাই বড়ো নয় ইন্দিরা, বড়ো হচ্ছে তার মনস্তত্ত্ব। আমি আর তুমি cousin কি নই সেটা আমাদের অন্তরের দিক থেকে একেবারেই সমস্যা নয়। তুমি এসো আমার সঙ্গে চলে। তুমি যে আমাকে ভালোবাসো এতে আমি সন্দেহ করি না, কিন্তু নিষ্প্রাণ জড়পদার্থের মতো বসে বসে অন্যায় অত্যাচার সইতে হবে এ আমি সইতে পারি না। এসো তুমি। যদি তোমাকে কেউ রক্ষিতা বলে, সে ভাষার অপপ্রয়োগ করবে মাত্র। [টীকা: রমাপতির কথায় ওদের সামাজিক সম্পর্কের ইতিহাসটুকু পাওয়া গেলো। এবারো আমরা চটে উঠতে পারতাম, কিন্তু রোগ সারানোর চেয়ে রোগ যাতে না হয় তারই জন্য সতর্ক থাকা ভালো বটে, কিন্তু রোগ যদি একবার হয়ই, তবে রোগীকে সেই উপদেশ দেওয়ার চেয়ে চিকিৎসা করাই সদ্বিবেচনার কাজ হবে।]

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেলো। রমাপতি হঠাৎ এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো কেন? নিরাকুল কণ্ঠে বললুম: বিয়েটাকেই তুমি প্রীতির একটা চরম পরিণতি বলে বিশ্বাস কর কেন? ওর সমগ্র রূপটি যখন চোখের সামনে তুলে ধরি তখন ঘৃণায় আমার আত্মা অশুচি হয়ে ওঠে। তোমাকে আমি সেই গ্লানির মাঝে দেখতে চাইনে, রমাপতি। [টীকা: রমাপতির নামটা উচ্চারণ করে ইন্দিরা সাহসের পরিচয় দিয়েছে।] দুটো শরীরকে একত্র রেখে যে নূতন একটা

ব্যাধি-সৃষ্টি হয়, তাকে তুমি যতই সম্মান দাও না কেন, আমি তার অমর্যাদা করি। তোমাকে অভয় দিলুম রমাপতি, এ-দেহ আমার নিজের—অতৃপ্ত আত্মা তোমার। [টীকা: লিখতে বসে কথাগুলিকে ইন্দিরা নাটকীয় করে তুলেছে—কেননা সাধারণত অভিধান সামনে রেখে সে কথা কয় না; তাই সন্দেহ হচ্ছে রমাপতিকে দাদা না বলার জন্যে যে খানিক আগে ওকে তারিফ করেছিলাম সেটা ভুলও হতে পারে। ওটা বোধ হয় নেপথ্যের সাহস—প্রত্যক্ষ রঙ্গমঞ্চের নয়।]

এততেও রমাপতি সম্পূর্ণ সুখী হল না; বললে: তোমার দেহের ওপর যে আমার খুব লোভ আছে তা মনে কোরো না, ইন্দিরা। আমি কখনোই এতো বড়ো অমানুষ হব না যে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাবি খাটাতে যাবো। তুমি সংসারে সন্ন্যাসিনী থেকো—আমার আপত্তি নেই; কিন্তু মনে রেখো, আমার সংসারে। তবু তুমি আমার সঙ্গে এসো ইন্দিরা। বেশ, এই এক্‌স্‌পেরিমেণ্টটাই করা যাবে—তা ছাড়া এই একটা বর্বর রীতিকে সংশোধন করা চাই। বিজ্ঞান আমাদের সহায়।

বললুম: আমাকে ভাববার সময় দাও, রাত্রে এসো।

রমাপতি ধীরে বললে: তোমাকে আমার চাই, আমার কর্মের অনুপ্রেরণা রূপে—তোমাকে কাছে না পেলে আমার তপস্যা নিস্তেজ হয়ে পড়বে, ইন্দিরা। [টীকা: মেয়েমানুষ যে কখনো পুরুষের সাধনার সহায়ক হতে পারে এই প্রথম শুনলাম। এক্‌স্‌পেরিমেণ্টটা নতুন বটে।]

সময় চাইলুম বটে, কিন্তু ভেবে নিতে আমার এক মিনিটেরো বেশি লাগলো না। রমাপতির সঙ্গে আমি যাবো না; না। তার কারণ খুব সহজ; প্রথমত বিবাহের স্থূলতা আমার সুরুচিসম্পন্ন সৌন্দর্যবোধকে পীড়িত করবে; তা ছাড়া দিবারাত্র রমাপতির সান্নিধ্যে থেকে আমি যে তপস্বিনী থাকতে পারবো নমনীয় স্নায়ুগুলোর ওপর আমার তত বিশ্বাস নেই। আর বিজ্ঞানের জারিজুরি কতক্ষণ টিকবে কে বলতে পারে? প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে বিজ্ঞান পারবে? ব্যাপারটাকে তাই আমি সর্বান্তঃকরণে উপেক্ষা করলুম। কিন্তু এর চেয়েও যে-কারণটা সত্য সেটা আমি প্রকাশ করছি। সেটা হচ্ছে এই—[টীকা: এই পর্যন্ত লিখে হঠাৎ ইন্দিরা থেমে গেছে। কর্মান্তরে যেতে হয়েছিলো হয়তো।]

কথ্য বাঙলা ভাষা যে কী জোরালো বাবার মুখের গাল খেয়ে হৃদয়ঙ্গম করলুম। কী যে আমাকে না বললেন ভেবে পাইনে ; কান দুটো অত গরম না করে যদি কান পেতে শুনতুম তো আমার শব্দসংগ্রহের তালিকাটা বেড়ে যেতো। মজা এই, একটি কথারো আমি প্রতিবাদ করলুম না ; প্রতিবাদ যে করা যায় না তা নয়—করলুম না কারণ কোলাহলকে আমি বরদাস্ত করতে পারি নে, তা মনকে যে শুধু বিক্ষিপ্ত করে তা নয়, কলুষিত করে। অধোবদনে চুপ করে সবগুলি গালই হজম করলুম,—জানলা দিয়ে যতগুলি শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়-আত্মীয়া একটা রোমহর্ষণ লড়াই দেখবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদেরকে বঞ্চিত করতে হল।

আমি পারিবারিক শান্তি নষ্ট করতে চাই নে। আমার ভেতরে এমন উদ্বৃত্ত শক্তি নেই যে সমস্ত অশান্তি-অত্যাচার অতিক্রম করে তৃপ্তির স্বাদ পেতে পারি। তা ছাড়া, পরিবার-পরিজনকে ক্ষুণ্ণ করলে তার যে একটা নিশ্চিত প্রতিক্রিয়া হবে রমাপতির সাহায্য না নিয়েও এ সামান্য তথ্যটুকু বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে। নিজের সুখের জন্যে আর সবাইকে বিমুখ করে তুলব এতো বড়ো দুঃসাহস আমার নেই। আমি সত্যিই আত্মবঞ্চনা করছি না, আমার ভীরুতাকে সমর্থন করতে যাওয়ায় আমার দরকার কি ? আমি যে ভীরু, পরনির্ভরশীল সে-কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। আমি রমাপতিকে ভালোবাসি, রমাপতির জন্যে শকুন্তলার মতো তপস্যা আমাকে খুব মানাবে—তার জন্যে আমি শুভকামনার দীপ জেলে প্রতীক্ষা করে থাকবো, এ-জন্মে না হয়, অমৃততীর্থে। [টীকা : পরজন্মে বিশ্বাস করাটা ভাব-প্রবণ বাঙালি-মেয়ের বিশেষত্ব। তবু ইন্দিরাকে একটু স্বতন্ত্র বলতে হবে, কেননা পরজন্মে সে আবার এই পৃথিবীতেই আসতে চায় নি।] সংসারের আর সবাই যেটাকে একান্ত অপ্রার্থিত বলে ছুঁড়ে ফেলতে চায়, ধুলায় লুণ্ঠিত হয়ে সেই বস্তুটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলেই খুব বড়ো একটা কিছু লাভ করতে পারবো বলে তো আমার মনে হয় না। তার চেয়ে এই নির্জনে গভীর বিচ্ছেদবেদনায় এই আমার বিপুলতর মহত্তর উপলব্ধি, রমাপতি। সহজ হবার সাধনাই বড়ো সাধনা, সামঞ্জস্যই আমার বড়ো কাম্য। [টীকা : অলিখিত অংশটুকুর বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল যা হোক।]

জানলার ধারে চেয়ার টেনে বসে ছিলুম, জানলার পরপারে বারান্দায়

রমাপতির আবির্ভাব হল; একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলুম বোধ হয়, রমাপতির স্বর শুনে শিউরে উঠলুম। রমাপতি বললে: চলে এসো ইন্দিরা, রাস্তায় নামলেই ট্যাক্সি পাবো। বেশি দেরি কোরো না। আমার চোখের সামনে দিয়ে অলক্ষিত বিরাট পৃথিবী যেন বায়স্কোপের ছবির ফিতের মতো ঘুরে যেতে লাগলো, আকাশ দুলে উঠেছে। তবু প্রাণপণ চেষ্টা করে বললুম: না। রমাপতি কি যেন ফের বললে, শুনতে পেলুম না, কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। এবার জানলাটাকে আরো ঘেঁষে রমাপতি কাতরকণ্ঠে কি যেন আবার বলছে, কঠিন হয়ে জানলা ধীরে বন্ধ করে দিলুম। [টীকা: রমাপতির কাতর কণ্ঠে বলবার জন্যেই নিশ্চয়। সে যদি খুব পরুষবচন প্রয়োগ করতে পারতো, তবে এই কৃত্রিম অবরোধ আর বেশিক্ষণ রক্ষা করা ইন্দিরার সাধ্য ছিলো না, কেননা তার চোখে আকাশ দুলে উঠেছিলো, পৃথিবীও উঠেছিল টলে। রমাপতি তার জীবনের পরমতম মুহূর্তটি এমন অবহেলায় হারিয়ে ফেললো সামান্য accent ভুল করে! রমাপতি তার নাম বদলে নিক—রমাপদ!]

মা গো, কী মুক্তিই আমি ভোগ করছি! রমাপতি চলে গেছে অপমানিত হয়ে,—যেন বেঁচে গেছি! এই পারিবারিক শান্তিতেই আমার পরমার্থ! বাক্যযন্ত্রণা যে কী যন্ত্রণা যে না সয়েছে তার পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। বাবা-মা'র ধারালো জিভ দুটো একটু জুড়িয়েছে,—কাকিমাদের অভদ্র ইঙ্গিত করা এবার বুঝি ক্ষান্ত হ'ল। খুব ঠেসে পড়ছি—ইংরেজি সাহিত্য নয়, ইকনমিক্স্; ইকনমিক্স্ যদিও আমার সাবজেক্ট নয়। পড়ছি মনকে বাধ্য করতে, কঠোর নিয়ম প্রতিপালনে অভ্যস্ত করতে। সকলের কাছ থেকে সরে গিয়ে কোণটিতে বসে আমার ঘরের মধ্যে আকাশকে অনেক ছোট করে এনেছি। গিয়ে অবধি রমাপতি একখানিও চিঠি লেখেনি। [টীকা: ডায়রিটি ছোট; মনে হচ্ছে ইন্দিরা এখনো তার বিচ্ছেদের অশ্রু-সমুদ্র পেরিয়ে আসেনি।]

বেশ ছিলুম, চুপচাপ, প্রায় আত্মসর্বস্ব হয়ে। ইকনমিক্স্টা অঙ্কের মতোই শুকনো, তাই এখন পলিটিক্স-এ [টীকা: পলিটিক্স-পাঠে] মন দিয়েছি। রমাপতি এখন প্রায় একটা সুস্বপ্নের সুখকর স্মৃতির মতো অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। ওর ঠিকানা জানিনে বলে মনে উদ্বেগের বদলে শান্তিই বিরাজ করছে! বেশ ছিলুম, ভেবেছিলুম, একটা আয়ত্তাতীত দুর্লভ আদর্শের মতো রমাপতি চিরকাল আমার নাগালের বাইরে অধিষ্ঠান করবে [টীকা: এক কথা পুনঃ-

পুনঃ বলাটা ভাষাসৌষ্ঠবের পরিচয় নয়! 'আয়ত্তাতীত', 'দুর্লভ', 'নাগালের বাইরে' এই বিশেষণাধিক্যের প্রয়োজন ছিলো না।] আর আমি একদিন কালিন্দীর মতই অপার ব্যর্থতায় ডুবে যাব। [টীকা: বোঝা গেলো কালিন্দী আর নেই। কিসে মারা গেলো ও? গ্লবিউল খেয়ে, না, অস্ত্র করাতে গিয়ে? 'অপার ব্যর্থতা' কিন্তু কালিন্দীর বেলায় ভিন্নার্থ-সূচক। অকাল মৃত্যুই কালিন্দীর ব্যর্থতা। প্রসঙ্গক্রমে ইন্দিরার মতটা এখানে একটু আধুনিক হয়েছে।]

সংসারের আবিল আবর্ত থেকে নিজেকে সন্তর্পণে সরিয়ে রেখেছিলুম, হঠাৎ আবার কোলাহল উঠলো। বাবা এততেও আমার জন্যে নিশ্চিন্ত হন নি; কোথা থেকে একটি পাত্র জুটিয়ে এনেছেন, সে আমাকে পছন্দ করতে শিগগিরই একদিন সশরীরে আবির্ভূত হবে; যদি আমি তার সংসার-সুখবিধায়িনী বলে মনোনীত হই তবে আসন্ন শ্রাবণেই আমাকে দাসী হতে হবে। নির্ভুল বিধান! কিন্তু জিহ্বাকে এবার আর শাসন করতে পারলুম না; বিদ্যুদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলুম: না। এ-সব ক্ষেত্রে যুক্তিবহুল দীর্ঘ বক্তৃতা করায় আমি অভ্যস্ত নই—ঐ একটি শব্দই স্থিরলক্ষ্য মৃত্যুবাণের মতো বাবা-মা'র কল্পনার প্রাসাদ একেবারে ভূমিসাৎ করে দিলো। [টীকা: না বলার সঙ্গে ইন্দিরার গ্রীবা-ভঙ্গিও অর্থটাকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করেছে। কেননা প্রত্যেকটি বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে কম-বেশি যে-সব অঙ্গ-সঞ্চালন হয়, সেই ভঙ্গিগুলিই অর্থের সম্পূর্ণতা দান করে।] মুহূর্তমধ্যে আমার মাথার ওপর ঝড় ভেঙে পড়লো—সেই কোলাহলে কান পাতে কার সাধ্য। অকারণে বাবা আবার বেচারা রমাপতিকে লক্ষ্য করে গর্জাতে লেগে গেছেন, মা'র বিষোদ্গার বিরাম মানছে না, কাকিমাদের অভদ্র ইঙ্গিত শুরু হয়েছে। কাকাদের একটা বন্দুক ছিলো, রতু কাকা [টীকা: নাম বোধহয় রতন কিংবা রতিপ্রসন্ন!] সেইটে নিয়ে রমাপতির মুণ্ডচ্ছেদ করতে [টীকা: বন্দুকে মুণ্ডচ্ছেদ হয় না] এখুনিই বেরিয়ে পড়লো বুঝি। প্রতি মুহূর্তে জীবন দুর্বহ হয়ে উঠতে লাগলো। অপ্রকাশ্যে যে অপবাদ চলেছে তার জ্বালা আমাকে দগ্ধ করে দিচ্ছে। [টীকা: রমাপতির সঙ্গে 'তথাকথিত' আত্মীয়তাটার জন্যেই এমন একটা পৈশাচিক গোলমাল হচ্ছে।]

হাঁপিয়ে উঠলুম, কিন্তু কিছু যে একটা করব তার পথ পেলুম না। যদি

বাইরে বেরিয়ে যাই, কতদূর গিয়েই হয় তো হঠকারিতার জন্যে অনুতাপ করবো। অনুতাপ আমি করতে পারবো না, [টীকা : যেন ইন্দিরা ততখানি ভীরু নয়।] মরে গেলেও নয় ; যা আমি করবো তার ফলভোগ করবার জন্যে প্রস্তুত থাকবো। তাই আবার সংসারে শান্তি আনবার জন্যে রাজি হয়ে গেলুম। আমার আত্মবলি ইফিজেনিয়ার চেয়ে কম কিসে ?

সকালবেলা ভাবী বর এসেছিলেন আমাকে দেখতে ; ভালো করে দেখাবার জন্যে কাকিমাদের নির্দেশ মতো রঙিন শাড়ি পরলুম, আয়নায় দাঁড়িয়ে মুখে ঠেসে স্নো ঘষতেও ছাড়লুম না। আমার দেহটা যে এত প্রখররূপে অভিব্যক্ত আজ টের পেয়ে আমার লজ্জার আর সীমা রইলো না। অনাবৃত হাতের তালু দুটোকে পর্যন্ত কুৎসিত মনে হতে লাগলো। মনে হল একটা হিংস্র মাংসলোলুপ পশুর সামনে অগ্রসর হচ্ছি।

ভদ্রলোকটি প্রথমেই সাফাই গাইলেন ছোটকাকাকে লক্ষ্য করে : আমাদের দেশে মেয়ে-দেখার এই প্রথাটা সাজ্ঘাতিক রকম বর্বর ; কিন্তু এ ছাড়া উপায়ো নেই কিছু, কেননা স্বাধীনভাবে মেলা-মেশাটা এখনো ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত হয়নি। অগত্যা এই পথেরই শরণ নিতে হচ্ছে। তা ছাড়া মিশতে পারলেই যে মিলতে পারা যাবে তার মানে নেই, কেননা হৃদ্যতা ও বিয়ে সমান স্তরের জিনিস নয়। কাকারা ঘাড় নেড়ে সায় দিতে লাগলেন।

ভদ্রলোক সামান্য দু'য়েকটি যা প্রশ্ন করলেন সোফায় বসে ঘাড় হেঁট করে ঠিক-ঠিক জবাব দিলুম, একটা গান শুনিয়ে দিলুম পর্যন্ত। বলা বাহুল্য আমার চেহারাটা তাঁর মনে ধরেছে।

এখন কী করবো বলতে পারো, রমাপতি ? আমি এখন আগাগোড়া একটা মাটির ঢেলা, একটা কামময় মাংসপিণ্ড। আমার মন কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে, দেহ ভরে আমাকে কলুষ বহন করতে হবে। সৌন্দর্যের অমরাবতী থেকে আমি নির্বাসিত হলুম ; দূরে দাঁড়িয়ে তুমি আমার এ পঙ্কিল অপমৃত্যু দেখো না।

শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্রে পা দিয়েছি, রমাপতি। তুমি কোথায় ?

কী লোভী এই পুরুষ ! প্রণয়োপাসনা করে চিত্তজয় করবার প্রতীক্ষাটুকু পর্যন্ত তার সয় না, কর্কশ বাহু বিস্তার করে দেয়। অমানুষিক ঘৃণায় সরে গিয়ে নিজের নারীত্ব রক্ষা করি, অম্লান রাখি।

স্বামীর সন্দিগ্ধ হবার কারণ ঘটলো। আমার প্রাগ্-বিবাহযুগের কি-একটা শ্রুতিমধুর কলঙ্ক-কথা তাঁরো কর্ণগোচর হয়েছিলো, তিনি মনে-মনে সেটাকে অতিরঞ্জিত করতে বসলেন। আমার এই ঔদাসীন্য এই অন্যমনস্কতা সবই যে রমাপতির বিচ্ছেদব্যথার পরিণাম এমন একটা নিষ্ঠুর কথা আমার সামনে বলতে স্বামী সংকোচ করলেন না। [টীকা : ইন্দিরা বেশ রীতি-মাফিক হয়ে উঠেছে, স্বামীর নাম লেখনীর মুখে আনছে না পর্যন্ত।] স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, সে-মুখ ঘৃণায় কুটিল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। সংগ্রামে আবার হলাহল উঠলো।

খবরটা ও-সংসারেও ছড়িয়ে পড়লো, স্বামীর বন্ধুমহলেও। বাবা ফের তর্জন-গর্জন শুরু করলেন, মা কান্নাকাটি, কাকাদের মর্চে-পড়া বন্দুক আবার তেল মেখে ঝকঝক করে উঠলো। প্রবাসী রমাপতির লাঞ্ছনার কথা ভেবে আমার দুঃখের আর শেষ রইলো না।

বিক্রীত মনে রমাপতিকে ডেকে এনে তাকে অপমান করবো আমি রমাপতিকে অত ছোট মন নিয়ে ভালোবাসি নি। আমার পৃথিবীতে আর তার পদরেখা পড়বে না, বিস্মরণের কূলে তার চিতা রচনা করেছি। আমার এই ঔদাসীন্যের মূলে রমাপতির বিচ্ছেদ নয়, এই নিরর্থক দেহসর্বস্ব বিবাহ। অথচ এই যোয়ালই আমাকে বইতে হবে, মুক্তি আমি পাব না, পেতেও চাই নে। একটা উদ্যত কুশ্রীতা থেকে আত্মরক্ষা করছি মাত্র। কিন্তু ঝড়ের ফণা লেলিহান হয়ে উঠেছে।

আমি যে আমার স্বামীকে খুব ভালোবাসি তার একটা লৌকিক প্রমাণ না দেখাতে পারলে রমাপতির লাঞ্ছনা ও অপমান সমাপ্ত হবে না। অতএব উৎসুক স্বামীর কাছে অপ্রতিরোধে আত্মদান করলুম। সে-গভীর পরাজয় সে-অনপনেয় দাসত্বের লজ্জা আমাকে মুখ বুজে সইতে হচ্ছে। আমার দেহ রাহুস্পৃষ্ট চন্দ্রের মতো অপবিত্র হয়ে উঠলো ; সে-রাতে কত যে কাঁদলুম বলতে পারি নে।

স্বামী প্রসন্ন হয়ে উঠছেন ; আমি ভাল করে ককেট্রি আরম্ভ করেছি। এ লজ্জা আমার ঘুচবে কবে ? রমাপতি, এই মর্যাদাহীন আত্মবিক্রয়ের গ্লানি আমি সইতে পারছি না।

কয়েক মাস যেতেই টের পেলুম আমার শরীরটা অসমঞ্জস হয়ে উঠছে। ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে দেরি হল না। ছি ছি, পরাজয়ের শেষ কলঙ্ক-

কালিমায় আমার সর্বাঙ্গ লিপ্ত হয়ে গেলো। এখন মরতেই শুধু বাকি আছে। ছি ছি ছি—ঘৃণাটা তবু সম্যক প্রকাশ করতে পারছি না। এই অবাঞ্ছিত সন্তানধারণে গর্ব কোথায়, কিসের আনন্দ? যে-মিলনের পারস্পরিক সমন্বয় ছিল না, সেটা তো দৌরাত্মেরই নামান্তর বলতে হবে। তবু স্বামী খুশি হয়েছেন, পঞ্চামৃতের দিন ঠিক করে শাশুড়ি পাঁচ ঝাঁক উলু দিয়ে উঠলেন, লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইলুম। দৌহিত্রের জন্মসম্ভাবনার সংবাদ পেয়ে এক লেফাফায় মা-বাবা আনন্দ-অভিনন্দন পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে কাকিমারাও খেলো রসিকতা করে পাঠিয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া যে কী গর্হিত কী বীভৎস ভাবতে পারিনে। সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করলুম, অথচ স্বামীর কাছ থেকে সতীত্ব রক্ষা করতে পারলুম না।

আমার সেই সোনার দেহ! নরদুর্লভ সৌন্দর্যের উপাসনা করবো এই ছিলো আমার অভিলাষ, নিজের আত্মাকে পবিত্র, দেহকে পরিচ্ছন্ন, দৃষ্টিকে জ্যোতিষ্মান করবো এই পণ করে ভালোবেসেছিলুম; কিন্তু আমার যে কী অধঃস্খলন ঘটেছে তা আমি ছাড়া আর কে বুঝবে? আমার আত্মা কুণ্ঠিত, দেহ কলুষিত, দৃষ্টি কামাচ্ছন্ন! আমি এখন একটা যন্ত্র মাত্র। [টীকা; ইন্দিরাকে মোটামুটি আমরা ক্ষমা করলাম। সে রমাপতিকে বিয়ে করে অসামাজিক অন্যায়াচরণ করে নি, দস্তুরমতো গোত্রান্তরিত হয়ে বিয়ে করেছে, এবং আদর্শ স্ত্রীর মতো এক বৎসর না পেরতেই সন্তানের জননী হতে চলেছে। সমাজ ও আইন মনের অপ্রকাশ্য তত্ত্বাদি নিয়ে মাথা ঘামায় না, বাইরের ক্রিয়া নিয়েই তাদের কারবার। তাই সমাজ ও আইনের বিচারে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বেকসুর খালাস পেলেন।]

ডায়রি-পড়া সাঙ্গ করে অশ্রু হাই তুললো। ইন্দিরা ঘরের কাজে মন দিয়েছে। অশ্রু একবার চোখ ভরে ইন্দিরাকে দেখে নিলো। চোখে চোখে তাকিয়ে থেকে সত্যি করে দেখা হয় না; চোখের দৃষ্টি অনন্যলক্ষ্য হয়ে ওঠে বলে দেখাটা হয় সংকীর্ণ। কিন্তু যাকে দেখা যায় সে যদি চোখ ফিরিয়ে অন্যমনস্ক, উদাসীন থাকে, তবেই তাকে সম্পূর্ণ ও অসীম করে দেখা হয়। মানুষের 'আত্মার পরিচয় চোখের তারায় বা মুখ-মুকুরে—এ-মতটা বিকল্পেও সত্যি নয়।

মানুষের আত্মার পরিচয় একমাত্র তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে—গ্রীবা-সঞ্চালনে, কখনো-কখনো বা ডান হাতটি বাড়িয়ে দেওয়ায়। তাই ইন্দিরা যে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে একটা ময়লা নেকড়া দিয়ে আলমারির কাঁচ সাফ করছে—শুধু ঐ পেছন-ফিরে-দাঁড়িয়ে থাকাটুকুর মধ্যেই তার অসীম বেদনার ছায়া পড়লো। নেহাৎ যে আনাড়ি সে-ও ইন্দিরার এই আলস্যমন্থর অবস্থান-ভঙ্গিটি দেখে ঠিক ঠাহর করে নিতে পারবে যে, সে এত শ্রান্ত যে, স্থূল বৃন্তবন্ধন ছেড়ে একটি ক্ষীণ বিলীয়মান সুগন্ধ হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারলেই বুঝি সে বাঁচে, সে এত ব্যর্থ যে চাঁদ অস্ত গেলে নিশীথ-রাত্রির নদীর যা অবস্থা, তারো ঠিক তাই। অশ্রু তাড়াতাড়ি খাতাটা মুড়ে রেখে ইন্দিরার খোঁপার ওপর ধীরে হাত রাখলো।

ব্যথা অশ্রু বোধ করতে পারে বটে, কিন্তু ঘেঁটে ঘেঁটে তাকে ফেনাতে তার লজ্জা হয়। তাই সোজা মুখের ওপর সে বলে বসলো : তোমার স্টাইলটি চমৎকার, ইন্দু। স্টাইলই নাকি ব্যক্তি—তারো চেয়ে বড়ো সত্য—হাতের লেখাটাই ব্যক্তিত্বের বড়ো সার্টিফিকেট। বার্নার্ড শ'র লেখা পড়েই মনে হবে যে তাঁর হাতের লেখা বিচ্ছিরি ; তোমার হাতের লেখা দেখে নিশ্চয়ই মনে হবে যে, তোমার অনুভূতিগুলি মানুষের রক্তের চেয়েও গাঢ়, সমাহিত দুঃখের চেয়েও গভীর। তোমার কথারই আমি পুনরুক্তি করছি : তুমি অত বেশি গভীর হয়েছ বলেই কবি হতে পারলে না। তবু তুমি বেঁচে গেছ। তুমি লেখ।

কথাটায় অশ্রু এতো জোর দিয়ে বসলো যে ইন্দিরা উঠলো চম্‌কে।

—হ্যাঁ, তুমি লেখ। সেই তোমার বিশীর্ণ জীবনের বসন্ত হয়ে উঠুক ; শকুন্তলার তপস্যা যেমন প্রেমের, তোমার তপস্যা হোক তেমনি গভীর আত্ম-বিবৃতির। নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করা চাই—উলঙ্গ উজ্জ্বল উদার! কারু প্রকাশ কর্মে, কারু বা কর্মহীন আত্মোপলব্ধিতে। কেউ হাতে নেয় লাঙল, কেউ বা অস্ত্র, কেউ বা কলম। তুমি কলম নাও ইন্দিরা।

ইন্দিরা হাসলো। বললো—পাগল আর কাকে বলে? বিধাতা আমাদের হাতে আঙুল দিয়েছেন কলম বা তুলি ধরতে নয়, আলমারির কাঁচ সাফ করতে। আজ যদি কলম ধরে আঙুলের অপব্যবহার করি, তা হলে লক্ষ্মীর শাপে ঘরের কলসীর জল আমার শুকিয়ে যাবে। কতো আমার কাজ এখনো পড়ে আছে, জানো? যে আসছে তার জন্যে কাঁথা সেলাই করতে হবে, ঝিনুক ধরে দুধ খাওয়াবার অভ্যাস করতে হবে, তার অসুখ করলে ডাক্তারের জন্যে জ্বরের

তালিকা তৈরি করে রাখতে হবে। তা ছাড়া আমার আর কিছুই লেখবার নেই, অশ্রু। এককালে লিখেছিলুম, কারণ রমাপতির কাছে জবাবদিহি না দিয়ে আমি পার পেতুম না। রমাপতি কাছে ছিলো না বটে, কিন্তু সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে ছিলো। এমন আমি বন্দিনী, শুধু সংসারে নয় অশ্রু, আমার দেহের কারাগারে।

অশ্রু জিগগেস না করে পারলো না : রমাপতি কোথায় এখন ?

ইন্দিরার মুখের ভাবের একটুও পরিবর্তন হ'ল না। তেমনি বললো—জানি না। তার খোঁজ করতে আমার স্পৃহাও নেই। আমার এত উদ্বৃত্ত শক্তি নেই অশ্রু যে, রমাপতিকে মনে-মনে চিরস্মরণীয় রেখে দু'বেলার দৈহিক কর্তব্যগুলোকে সুসম্পন্ন করতে পারবো। সঙ্ঘর্ষ বাধিয়ে তা সহ্য করবার মত আমার মেরুদণ্ড বলশালী নয়। তাই রমাপতিকে আমি হারিয়ে যেতে দিয়েছি। ছেলেবেলার মা'র কোলে শুয়ে গাছের পাতার ফাঁকে যে-আকাশ দেখা যায় সে-আকাশকেও পরে মনে হয় ধুলো দিয়ে তৈরি। আমি রমাপতিকে ভুলতে পেরেছি বলেই তাকে ভালোবেসেছিলুম বলে আর অনুতাপ করি না।

এ-উত্তরে অশ্রু খুশি হবে কেন ? তাই ফের জিগগেস করলো : কিন্তু যা তুমি দেহে-মনে একান্তরূপে বিশ্বাস করেছিলে তার থেকে এতো সহজে তুমি ভ্রষ্ট হলে কেন ? আমি হ'লে—রমাপতির সঙ্গে না হোক, নিজে একা বেরিয়ে পড়তাম।

ইন্দিরার মুখে আবার সেই ম্লান হাসি। বললো—আর আমি একটিও কথা না কয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে নীচু হয়ে প্রণামের ভঙ্গিতে ঘাতকের খড়্গ আহ্বান করলুম, অশ্রু। আমি না বলতে পারি কথা, না পারি করতে প্রতিকার। আজ মৃত্যু যদি আসে, আমি এমন দুর্বল যে, একেবারো বলবো না হয় তো : না, আমি মরতে চাই না। আমি ধীরে দু' বাহু প্রসারিত করে দেব ! কিন্তু বলো, কেরোসিন ঢেলে দেশলাইয়ের কাঠি ধরাও, ভয়ে আমার আগে থেকেই বাথ-রুমে ঢুকে দু'ঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে হবে। মরবো ভাবলে আমার ভারি তৃপ্তি লাগে, কিন্তু রোগের যন্ত্রণায় আমাকে অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকতে হবে ভাবলে আমার না পায় খিদে, না থাকে ঘুম।

ইন্দিরার কতকগুলি রুক্ষ চুল হাতে নিয়ে অশ্রু বললো—কিন্তু চেহারার এ কী ছিরি করে রেখেছো ? মরবে কি করে ? এ-রূপ দেখে যে যমেরো রুচি হবেনা।

ইন্দিরার স্বর শুকনো, কঠিন হয়ে উঠলো : যে-যমের রুচিতে আমার দেহ এ-রূপ ধরেছে তার থেকে ত্রাণ পেলেও যে আমি বাঁচি। কিন্তু অত কথায় কাজ নেই অশ্রু, খানিক আগে বিমল এসে খবর দিয়ে গেলো রাত্রের গাড়িতে কর্তা আসছেন।

অশ্রু উৎফুল্ল হবার ভান করলো : তাই নাকি ? তা হ'লে তৈরি হতে হয়।

—তৈরি ! কেন ?

—বাঃ, একটা বাক্‌যুদ্ধ হবে না ?

—বাক্‌যুদ্ধ কেন ?

—তোমার এই দুরবস্থা কেন করলো ? তার কি অধিকার ছিলো ?

ইন্দিরা এবার হেসে ফেললে। বললো : দুরবস্থা তুমি কাকে বলছ ? এই আমার ইহজীবনের লক্ষ্য, নারীজীবনের পরমার্থ যে ! আমার স্বামী আমাকে আদর্শ গৃহিণীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর প্রতি আমার এত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে তাঁর প্রতি একটিও নির্দয় উক্তি আমি সইবো না।

অশ্রু হেসে বললো : শুনে খুশি হলাম। কিন্তু প্রভাতের কোনো খবর আসছে না কেন বুঝতে পারছি না। ও এলে দিব্যি লাক্ষ্ণৌর দিকে ভেসে পড়তাম।

—আমার স্বামীর সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ না করেই ?

—তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার নিজের লাভের জন্যে লড়াই করার আর কোনোই তো দরকার নেই। তোমার মতো আমি এমন সর্বস্ব দিয়ে লাভ করতে চাই নি বলেই ত তাকে আমি ছেড়েছি। তুমি তোমার স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে থাকো, আমি এমন মারাত্মক সুখ চাইনে, ইন্দিরা।

অশ্রু সরে যাচ্ছিলো, ইন্দিরা তার আঁচলটা ধরে ফেললো। বললো—তুমি এখানে আছ জানলে আমার স্বামী নিশ্চয়ই এক বিঘৎ হাঁ করে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠবেন। জান তো, তোমার প্রতি তিনি তত ভক্তিমান নন যে, গ্রীকদের মতো কোনো সংবাদ জিজ্ঞাসা না করেই পাদ্য-অর্ঘ নিয়ে অতিথিকে সম্বর্ধনা করবেন ! সত্যিই, তৈরি থাকো, অশ্রু।

অশ্রু খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললো—এ তুমি নিশ্চয়ই স্বামীর প্রতি নির্দয় ভাষা প্রয়োগ করছ। তুমি আজো তত বড় সতী হয়ে উঠতে পারো নি। দাঁড়াও, প্রভাতকে একটা চিঠি লিখে আসছি ফের। আরো কথা আছে।

ধীরে ধীরে বিকেল হয়ে এলো। আটটা বাজতেই নির্মলের ট্রেন এলাহাবাদ পৌছুবে। বাড়িতে আসতে কতটুকুই বা পথ! ধরা যাক পাঁচ মিনিট—সঙ্গে মাল-পত্র থাকবে না বলে হেঁটে আসবারই সম্ভাবনা। আরো ঘণ্টা তিনেক বাকি আছে দেখছি। অশ্রু এতো সময় করবে কী? হঠাৎ মনে পড়লো বীণা ও বিমলের সঙ্গে তার আজ যমুনায় বেড়াতে যাবার কথা আছে। ফিরতে যদি রাত বেশি হয়ে যায়? তার চেয়ে প্রভাতকে একটা লম্বা চিঠি লেখা যাক। কেন যে এতদিন ও চুপ করে থেকে চিন্তিত করছে—

দরজায় টোকা পড়লো। বিমল বললো—তৈরি, অশ্রু-দি? বীণা এসেছে।

দরজা খুলে অশ্রু বেরিয়ে এলো। শুক্‌নো মুখে বললো—বিচ্ছিরি মাথা ধরেছে, তোমরা দু'টিতেই বেড়িয়ে এসো। আমাকে আরেক দিন নিয়ে যেয়ো।

অশ্রু-দির সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনায় দারুণ খুশি হয়ে বিমল আর বাগবিস্তার না করে চলে গেলো। দাদা আসছেন, তাই ঘর-দোর ফিটফাট করে রাখতে বৌদি তো ব্যস্তই থাকবেন। তা ছাড়া বুড়ো বয়সে বৌদির নৌকোয় বেড়াবার সখ নেই। বৌদি যে অশ্রু-দির সমবয়সী, এ-কথা কেউ শপথ করে বললেও বিমল বিশ্বাস করতো না; কেন না বিয়ে করলেই লোকে বুড়ো হয় কি না ঠিক নেই, তবে লোকে বুড়ো হলেই বুঝি বিয়ে করে। তবু, বৌদিও সঙ্গে যাবেন বলে বীণার অভিভাবকদের মত নেওয়া হয়েছে বলে, তাঁকেও একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার। বীণা জানুক, নেহাৎ ভগবান সদয় বলেই বৌদিও মুখ ফেরাবেন।

—যমুনায় বেড়াতে যাবে বৌদি? ফোর্ট থেকে ব্রিজ।

—দূর পাগলা!—বৌদি ঝামটা দিয়ে উঠলেন।

বিমল বীণার মুখের দিকে চেয়ে এমন একটু হাসলো যে, সেই আনন্দের রঙ বীণারো সারা দেহে বিকীর্ণ হয়ে পড়লো।

অশ্রু জানলা দিয়ে দেখতে পেলো বীণা আর বিমল টাঙায় গিয়ে উঠলো—কোচোয়ানের পেছনে—পাশাপাশি। দু'জনেই নীরব, স্পর্শ-বিরহিত। বসবার জায়গায় বীণা নিজের শাড়িটাকে পর্যন্ত বিস্তৃত হতে দেয় নি, নিজের চতুর্দিকে সংকুচিত করে রেখেছে—পাছে তার সামান্য একটু ছোঁয়া লেগে এই নির্বচন গভীরতার তপোভঙ্গ হয়। বিমল উদাসীন, যেন নিষ্ক্রিয় অসহযোগ আন্দোলনের নেতা! বীণা যে তার কাছে আছে, ঘিরে আছে নির্নিরীক্ষ্য বায়ুমণ্ডলীর মতো

—এ-টুকু সে না দেখে ও না ছুঁয়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করেছে। কথা বলাটা অবান্তর, ছোঁয়াটা ছন্দপতন। বিমলের এই সেই বয়েস যখন মাধুরীকে ভালোবেসে গল্পে মাধুরীর সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথনচ্ছলে মাধু বলে ডাকতে সাধ হয়। এই সেই বয়েস যখন বীণা যমুনার জলের ওপর নৌকোয় উঠে হঠাৎ ঠিক ঠাহর করতে পারবে না—কোন্‌টা বেশি সুন্দর, ইলিশ-মাছের আঁশের মতো চিকচিকে জ্যোৎস্না-ধোয়া জল, এই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা, না, বিমলের মুখ। ব্যস্ততা নেই, প্রকাশ-প্রাচুর্য নেই, প্রশ্ন নেই, উত্তর নেই, লক্ষ্যাভিমুখী সন্ধান নেই—শুধু নিজের অনুভূতিতে নিজেই নির্বাসিত। এই সেই বয়েস! টাঙা যতোক্ষণ না অদৃশ্য হল অশ্রু জানলা ছেড়ে উঠলো না। খানিকক্ষণ এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে অশ্রু অবশেষে বাথ-রুমে গিয়ে ঢুকলো গাত্রমার্জনা করতে। বিকেলে স্নান করাটা তার একটা দৈনন্দিন বিলাসিতা। ইন্দিরার মতো শরীর নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলতে বসেনি। যে যৌবন বাইরের খোলস মাত্র তা খসে গেলে ওর দুঃখ নেই, কিন্তু যৌবনকে অতিক্রম করেও তার স্বাস্থ্য যেন এমনি দৃপ্ত থাকে। ও শুধু হৃদয়ানুভূতি দিয়ে নয়, দেহের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে আকাশ ও জীবনের আনন্দ পান করতে চায়। ওর এই দেহ মনকে আঘাত থেকে রক্ষা করবে, ম্লান হতে দেবে না—প্রাণকে বৃহত্তর উপলব্ধির দিকে নিত্যকাল উন্মুখ, ধাবমান রাখবে—ওর এই স্বাস্থ্যই দেহকে কলুষিত হতে দেবে না। অশ্রু স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করে কাপড় ছাড়তে লাগলো। বাথ-রুমের উঁচু জানলা দিয়ে পড়ন্ত রৌদ্রের সোনার একটা টুকরো গামলার ওপরে পড়ে ঝিকমিক্ করছে। অশ্রু Donneএর ভক্ত—তাঁর অনেক লাইন তার মুখে-মুখে। এখন সে এই তিনটি লাইন আবৃত্তি করছে:

Full nakedness! All joys are due to thee:
As souls unbodied, bodies unclothed must be
To taste whole joys.

রাত বেশি হয় নি। কিন্তু নিঝুম ঘুমন্ত পাড়াটার দিকে তাকালে মনে হয় ভোর হতে বুঝি আর দেরি নেই। অশ্রু সাদাসিধে একখানি শাড়ি পরলো; বিকেলের বাঁধা চুলগুলি খুলে ফেলে পিঠের থেকে দু'ভাগ করে বুকের ওপর মেলে রাখলো। রূপোর একটা ঝুমকো ফুল খোঁপায় গুঁজলে তাকে মানায় বটে, কিন্তু তাতে নেহাৎই চপলমতি কলেজের মেয়ে বলে মনে হয়। তাই সে

ইন্দিরার বাগান থেকে একটি রজনীগন্ধার কলি ছিঁড়ে এনে খোলা চুলের মধ্যে আলগোছে আটকে নিয়েছে।

ইন্দিরা তোলা-উনুনে লুচি ভাজছে—স্বামী-সেবায় তার বেশ হাত খোলে। স্বামীর আহার যোগাতে সে কার্পণ্য করবে এতটা অনুদার সে নয়। তাই রাতের জন্যে সেজে থাকতেও সে ভোলেনি! সতীত্বের একজিবিশানে ইন্দিরাকে গোল্ড মেডেল দেওয়া উচিত। ক্যাপিট্যালিস্ট স্বামীর সুবিধের জন্যে সে নিজেকে সতী বানিয়ে বসেছে।

সোনার অবসর! অশ্রু তাড়াতাড়ি নয়—খুব আস্তে, সংস্কৃত করে বললে—মন্থর পদক্ষেপে নির্মলের ঘরে এসে প্রবেশ করলো। নির্মলের ঘরটা একটু বাইরের দিকে—একটা বারান্দা না পেরোলে সে-ঘরের নাগাল পাওয়া যায় না। সেই বারান্দাতেই ইন্দিরা একটা কাঠের টুলে আয়েস করে বসে স্বামী-আপ্যায়নের যোগাড় করছিলো। অশ্রুকে সে দেখে ফেললো। জানতো বটে নির্মলের সঙ্গে অশ্রুর আজ রাতেই দেখা-করার জোর তাগিদ পড়েছে; খবরটা ইন্দিরার কাছে তার সন্তানধারণের চেতনার মতো মারাত্মক নয়। অশ্রু যেমন মেয়ে—এবং তার সঙ্গে ওর যতটা ঘনিষ্ঠতা, তাতে তার গায়ে-পড়ে আলাপ করার ব্যাখ্যায় সে নির্লজ্জ বলে অভিহিত হ'ত না। তবু অশ্রুকে আজ যেন ওর কেমনতরো লাগলো। অশ্রুর মধ্যে আজ সবচেয়ে অত্যুগ্ররূপে প্রখর হচ্ছে এই—ও মোটেই আজ সাজ করেনি, নিতান্তই খেলো একটি শাড়ি, মোটা একটা শাদা ব্লাউজ—এবং চুলের আড়ালে সুশুভ্র একটি রজনীগন্ধার কোরক—রমাপতির প্রতি ওর কিশোরকালের প্রথম প্রেমের সলজ্জ অনুভূতির মতো। রজনীগন্ধা দেখে হঠাৎ রমাপতিকে মনে পড়লো বলে ইন্দিরার কাছে অশ্রুর এই নিরলঙ্কার চেহারা সন্দেহের কুয়াশায় কেমন-যেন ঝাপসা হয়ে উঠলো। ইচ্ছা হল অশ্রুর আবির্ভাবের আগেই সে গিয়ে তার স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে রক্ষা করে।

বিয়ের আগে নির্মলের সঙ্গে অশ্রুর যে একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছিলো সেটা ইন্দিরা আগে অস্পষ্ট করে জানলেও অশ্রু এমন মুখচোরা বা লাজুক নয় যে, শতকরা নিরানব্বুই জন বাঙালি মেয়ের মতো মূঢ় আত্ম-সমর্থনের চেষ্টায় তা ফিকে বা ফাঁকা করে তুলবে। বরং সে এমন স্পষ্ট ও প্রখর যে, রঙ ছড়িয়ে ব্যাপারটাকে বিচিত্র করে বর্ণনা করে সে নিজের চরিত্রকে শ্লাঘ্য বলেই সপ্রমাণ

করতে চেষ্টা পেয়েছে। অন্যের কাছে যেটা হ'ত জঘন্য সেটা অশ্রুর কাছে নিতান্তই নগণ্য, বরং উল্টো করে স্কুলপাঠ্য রচনার ভাষায় সেটা তার আত্মোপলব্ধির সোপানস্বরূপ! নির্মল যে তাকে দুই হাতে ঘৃণায় ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো সে-কথা গম্ভীর হয়ে বলতে সে মনে বেশ জোর পায়, এবং যে-তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো তারই দুয়ারে অবতীর্ণ হয়ে সে নতুন করে বন্ধুতা প্রার্থনা করে! ব্যাপারটার মধ্যে স্বাভাবিকতা কিছুই নেই—প্রস্তাব শুনে ইন্দিরা হেসেছিলো মাত্র, কিন্তু বাস্তবে অশ্রুর এই উদ্যোগ দেখে তাকে আশীর্বাদ করতে ওর হাত উঠলো না। বরং যে-লোক একদিন একটি মেয়ের এত সব অসদাচার ও অবরতার বিরুদ্ধে নিজের পুরুষত্বকে দুর্দাম রেখেছিলো সেই তার স্বামী, এ-কথা জেনে ইন্দিরার গৌরবের আর সীমা রইলো না। স্বামীর কাছে সে সশরীরে নিজেকে বলি দিয়েছে মাত্র—এই চেতনাটাকেই সে হঠাৎ আজ রূপান্তরিত করে নিল: স্বামীর চরিতার্থতার জন্য সে সাধ্বী ও পতিব্রতার মতো নিজেকে স্বেচ্ছায় ও সপ্রেমে উৎসর্গ করেছে। দেহের যতো সব বাঁধা-বিধান আছে তার থেকে একচুলও তার বিচ্যুতি ঘটেনি;—মন একটা বাজে বিলাসিতা, তাকে বেশি দিন পুষিয়ে রাখার খরচ পোষায় না। অতএব—

মৃত রমাপতি, তুমি মৃত। তোমার ছায়া আমরা দেখেছিলাম ইন্দিরার মন-মুকুরে—সে-আয়না চৌচির হল। তোমার মূর্তিও তাই বিখণ্ডিত—এই অবমাননা তুমি সয়ো না। তোমাকে আমরা সময়ের নদীতে বিসর্জন দিলাম। তুমি এখন কোথায় আছ, সামান্য কোনো ইস্কুল-মাস্টারি করবার অবকাশে ইন্দিরার মতোই অপ্রয়োজনে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছ কি না—সেই সব অবান্তর বিষয়ের খোঁজ করে তোমার লৌকিক অস্তিত্ব প্রমাণ করা একেবারেই বৃথা, রমাপতি। আমাদের রমাপতি আজ মরলো—সেই রমাপতি সূর্যের আলোতে বেশি কাল স্বপ্রকাশ থাকে না, সেই রমাপতি অনবধানে নারীর জীবনে একবার মাত্র পদার্পণ করে।

ইন্দিরার আজ বিধবা-বেশ। দেখবে এস। সীমন্তে সিন্দুর—শৃঙ্গারভূষণ; পায়ে আল্‌তা, দু'হাত-ভরে তার আভরণ। পরনে মারহাঠি গরদের শাড়ি, ব্লাউজ-পিস্‌টা দিব্যি খাপ খেয়েছে—বাহু দু'টি লীলা-বলয়িত; দুই চোখে ভাবী মাতৃত্বের মধুরতা! তুমি তার এ বিধবা-বেশ দেখো না। তোমার কাছে সে গণতোষিণী।

ইন্দিরার এতক্ষণে ঠাহর হল অশ্রুর এই আকস্মিক আবির্ভাবের পেছনে একটা গূঢ় অর্থ আছে। সহসা কলেজের বন্ধুর প্রতি তার এই অনুরাগের কোনই মানে হয় না, এর সঙ্গে আরেকটি উত্তেজনা ছিল। সেটা যে কার প্রতি, দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা একটু কামড়ে ইন্দিরা ঠিক ধরতে পেরেছে। অবশ্যি অশ্রুও সেটা সোজাসুজি খুলে বলেছিলো—কোথাও তার বাধে নি। সে নাকি দেশভ্রমণে বেরিয়েছে; মাঝ-পথে থেমে সে তার অন্যতম শিকারের জন্যে কয়েকদিন ওৎ পেতে থাকবে—তারপর দু'জনে একসঙ্গে লাহোরের দিকে ভেসে পড়বার আগে সে ইতিমধ্যে একা নির্মলের সঙ্গে মরা প্রেমটাকে একটু ঝালিয়ে নেবে মাত্র। দেহসুখ-কাঙাল স্বামীর প্রতি ইন্দিরার স্নেহ জ্যাম্-এর মতন ঘন ছিল না বলে অশ্রুর প্রোগ্রামটা তার কাছে গোড়াতে মনঃপূত হয় নি, এমন বলা যায় না। মেয়ে যেমন বেহায়া—ইন্দিরা এখন রীতিমত বর্বর ভাষায় ভাবতে পারছে—তার পক্ষে এই দুর্নীতিটা অশোভন নয়। কিন্তু সে যখন স্বভাবের ব্যতিক্রমে একেবারে তপস্বিনীর বেশ পরে নিঃশব্দে অতিমন্থর পা ফেলে-ফেলে স্বামীর ঘরের দরজার পর্দাটা সরালো, তখন নিমেষে ইন্দিরার চোখে সমস্ত ঘর-বাড়ি যেন ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো। এটা কেন যে তার সইলো না বলা কঠিন। শুধু যে সে অশ্রুর আচরণ মার্জনা করলো না তাই নয়, স্বামীর প্রতি তার প্রতিদিন এই অবহেলাকেও সে ক্ষমা করতে পারলো না। সামান্য লুচি ভাজতে ভাজতে হঠাৎ কোথা থেকে তার এত মমতা উথলে উঠলো যে শুধু স্বামী নয়, অনিচ্ছাধৃত ভাবী সন্তানকে পর্যন্ত তার রমণীয় লাগছে। কি জানি কি ভেবে ইন্দিরা চট্ করে দাঁড়িয়ে পড়লো, নিজের দিকে বার কয়েক চোখ বুলিয়ে নিলো—সত্যিই সে সুন্দরী, এবং সে-সৌন্দর্য সে মা হবে বলে।

এটা সত্যিই ভারি আশ্চর্য। কিন্তু মেয়েমানুষের পক্ষে আশ্চর্য আর কী আছে! তারা রঙ-বদ্‌লানো সন্ধ্যাকাশ। তাদের মনের ঘড়ির কাঁটা চলতে বন্ধ হলে দম দেবার জন্য তাদের আর ব্যস্ততা থাকে না। একটা ধরা-বাঁধা সীমার মধ্যে নিজেকে কোনোরকমে খাপ খাওয়াতে পারলেই তারা বাঁচে। যতোক্ষণ পর্যন্ত এমনি থামতে না পারে ততদিন তাদের যত-সব ফ্যাশান: কেউ বলে ভালোবাসি, কেউ বলে বিয়ে না করে পি-এইচ. ডি. হবে।

বস্তুত ইন্দিরার এই মনোভাবের ব্যাখ্যাও একটা নিশ্চয় আছে। পুরুষ নারীকে যেমন করে চায় তাকেও ঠিক তেমনি ভাবেই ধরা দিতে হয়। যেখানে

মেয়েরা নিজের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব দেখাতে গিয়েছে সেখানেই তার এমন একটা রোগ হয়েছে যেটাকে শুদ্ধ করে বললে বলতে হয় হিস্টিরিয়া। তাই কোনো কোনো পুরুষের কাছে নারী দেবী—কল্পনা-কায়া; যেমন নারীতৃপ্ত সন্তান-পরিবৃত দান্তের কাছে বিয়াত্রিচে ছিল! কারু কাছে সে পিশাচী—নারীর তখন পিশাচী না হয়ে উপায় ছিল না, পুরুষ তাকে তেমনি করে চেয়েছে। কেউ চায় মেয়ের মাঝে একটা হাবা-গোবা ছেলেমান্‌ষি ভাব, মেয়ে তাই অবিকল নকল করে সংসারের চোখে সাফল্যের সার্টিফিকেট নেয়; কারু কাছে নারী শুধু একজোড়া জঘন, কারু কাছে বা মূর্তিমতী অস্পৃশ্যতা। একটা প্যাটার্ন না পেলে তার মুক্তি নেই—যে-রকমেই হোক একটা প্যাটার্ন-মাফিক্ জীবন না পেলে সে হয় অকারণে পিকেটিং করবে, নয় ধুয়ো ধরবে বিয়ে করবো না। তরল জল রাখবার জন্যে পাত্র চাই। জলের কি রঙ আছে? পাত্রের রঙ তার রঙ। মেয়ের কি নাম আছে? একমাত্র নমুনা-ই তার নাম।

ইন্দিরা একবার ভাবলো পর্দা সরিয়ে ও-ও ঢুকে পড়বে কি না। স্বামী বাড়ি পৌচেছেন প্রায় আধঘণ্টা হল, কিন্তু এরি মধ্যে অশ্রু কেমন তৈরি হয়ে নিয়েছে। আর ও না গেলো ছুটে কুশল প্রশ্ন করতে, না করলো একটা প্রণাম। নরকেও ওর জায়গা হবে না।

অশ্রু পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলো নির্মল চাকরের হাতের ওপর ডান পা-টা তুলে দিয়ে জুতোর ফিতে খোলাচ্ছে। ঘরে আলো যথেষ্ট ছিল না। এমনি স্তিমিত ফিকে আলোর সঙ্গে একটি ম্লানমুখী মেয়ের বোধ করি একটা নিকট সাদৃশ্য আছে—নির্মল তো প্রথমটা থমকে গেলো। তবু মুখখানিকে যেন ভারি চেনা-চেনা লাগছে, ভুরুর হাল্‌কা টানটি যেন তুলি দিয়া আঁকা, লঘু গতিতে সামান্য দ্রুত চলার অনায়াস ভঙ্গিটি যেন নিজের নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে ছন্দ-মেলানো। চাকরের হাত থেকে পা-টা সরিয়ে নিয়ে নির্মল লাফিয়ে উঠলো: তুমি, অশ্রু? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? তুমি এখানে? এলে কবে?

অশ্রু ধীরে বললো—তোমার কাছে আজ এলাম। এইমাত্র। কী জানি, বোধ হয় স্বপ্ন হয়েই।

নির্মলের এখন এ-সব অবান্তর কথায় কান দেবার সময় নেই। সে চাপা

খুশিতে মুখটা লাল করে বললে—হঠাৎ তুমি এত কাছে? আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না।

আঁচলের তলা থেকে শুভ্র হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে অশ্রু বললো—আমাকে ছুঁয়ে দেখ, আমি শরীরী, বেশ স্থূল, নিরাকারা কল্পনা নই।

নির্মল হেঁচকা-টানে শূ-জুটো টেনে ফেলে সোজা দাঁড়িয়ে পড়লো: এই মাত্র আসছি, জামাকাপড়গুলো এখনো ছাড়া হয় নি। একটু দাঁড়াও।

—বসি। বলে অশ্রু একটা চেয়ারে বসলো। বললে—আরো একটু দেরি করে আসতে পারতাম বটে, কিন্তু দেরি করার মতো ধৈর্য আমার শেখা হল না। তুমি আজ আসবে বলে বিকেলে স্নান করলাম, চুলগুলি পিঠের ওপর প্রসারিত করে রাখলাম। বাগান থেকে এই পরিচ্ছন্ন ফুলটি তুলে এনেছি। অশ্রু চুলগুলির গ্রন্থি থেকে রজনীগন্ধার ছোট্ট কুঁড়িটি আলগা করে আনলো: যেন বঞ্চিত তাপসী ফুলটি! নির্বাককুণ্ঠিত। আমার মতো প্রগল্‌ভতা ওর নয়। কিন্তু যাই বলো, ওরই মতো মনটা এমন লঘু ও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে কী বলব? তুমি কেমন আছ?

—আমাদের আবার থাকাথাকি! দাঁড়াও, বাথ-রুম থেকে চট করে মুখ হাত-পা ধুয়ে আসি। তুমি যে এসেছ ইন্দিরা জানে তো?

—মানে, আমি আজ এসেছি নাকি? ইন্দিরা জেনে বুড়ো হয়েছে।

—বেশ, ভালো কথা। তুমি এসেছ, আমার কী যে ভালো লাগছে। আমি একটুও আশা করি নি কিন্তু। আচ্ছা। এই বলে নির্মল পর্দা ঠেলে পাশের স্নানের ঘরে চলে গেলো।

অশ্রু একা। সমস্ত ঘরে ধূসর সন্ধ্যাছায়া। মিলনশেষের প্রথম ক্লান্তির মতো ঘন। এটি বুঝি নির্মলের বসবার ঘর। ভারি ফিটফাট, বাহুল্যবর্জিত। ছত্রিশ ইঞ্চির ছোট একটা সেক্রেটারিয়েট টেবল, পিঠের আধখানা পর্যন্ত তোলা ছোট একটি ঘোরা-চেয়ার, টেবলের ওপরে দু' তিনখানা মোটা-মোটা অঙ্কের বই, অঙ্কের কাগজ-পত্র। দেয়ালের তাকে ব্রঞ্জের একটা বড়ো মূর্তি—মুণ্ডহীন। অন্ধকারে ঝাপসা। মূর্তিটা প্রশস্ত, দুর্দ্ধর্ষ। আবছায়ায় এইটুকু তার আভাস। এতো বড়ো ঘরে নির্মল নিজের জন্যে এইটুকু স্থান মাত্র অধিকার করে আছে—চারিপাশের শূন্যতাটা যেন কর্ম দিয়ে ঠাসা; সেই শূন্যতাটা আলস্যাবকাশের প্রকাশ নয়। ঘর থেকে অধিবাসী সম্বন্ধে ধারণা হয়, যেমন সংসর্গ থেকে

বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা চরিত্র বিচার করে। এক পলকে এ ঘর দেখে কে না বলবে যে নির্মলের মনে ভাবাকুলতার কণামাত্র কুয়াশা নেই, তার মন ফাল্গুনের রৌদ্রের মতো খটখটে, ছুরির ফলার মতো প্রখর। তেজস্বী ঋজু উজ্জ্বল! সারা ঘরের আবহাওয়ায় একটা নিবিড় তেজোময়তা আছে। সেটা অশ্রু যেন স্পর্শ করতে পারে। একটা দুর্নমনীয় কাঠিন্যের তেজ, কিন্তু সে-নিষ্ঠুরতার মাঝে কোথায় যেন একটি অন্তর্লীন মাধুর্য!

বড়ো একটা টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে মাথার চুলগুলি মুছতে মুছতে নির্মল ঘরে ফিরে এলো। আঁচলের খুঁটে সমস্ত বুক ঢাকা পড়ে নি, স্ফীত স্ফার বক্ষ —প্রেয়সীর যোগ্য উপাধান। পা দুটি নগ্ন, সিক্ত অঙ্গ থেকে সদ্যস্নানের শান্ত গন্ধ আসছে। স্নান করবার পর পুরুষকে যে এমন জ্যোতিঃস্নিগ্ধ ও সুন্দর লাগে এটা অশ্রুর জানা ছিল না। সে চেয়ারটাতে স্থির হয়ে বসে রইলো।

খানিকটা লাইম্-জুস্ চুলের মধ্যে রগ্‌ড়ে নিয়ে নির্মল হেসে বললো— প্রসাধনটা তোমার সামনেই সেরে ফেলি। কি বল? আমার এই বর্বর বেশ দেখে তুমি আহত হয়ো না। বলে লুঙ্গির মতো খাটো করে পরা কাপড়টার প্রতি সে ইঙ্গিত করলো।

অশ্রু প্রশ্ন করে বস্‌লো: আমি আসবো এমন আশা একটুও করনি কেন?

প্রশ্নটা শুনে নির্মল থামলো; জিজ্ঞাসায় একটু যেন অনুযোগের অনুনয় আছে। হেসে বললে—আমি পৃথিবীতে আশাই কিছু কম করি, অশ্রু। তা পূর্ণ হবে না বলে নয়, আশা করবার মধ্যে চিত্তের ক্ষণিক অব্যবস্থা ঘটে। অযথা অতখানি শক্তি ব্যয় করতে ইচ্ছে হয় না।

অশ্রু চোখ নামিয়ে বললে—কিন্তু চোখের জানলা দিয়ে মন যদি বারে-বারে উঁকি মারতে থাকে তখন চোখ বুজলেই অবাধ্য মনকে শাসন করা হয় না। তোমার মনে আমার আসন নেই বলেই তোমার আশাও নেই।

ততক্ষণে নির্মল জামাটা গায়ে দিয়েছে। অতিরিক্ত চেয়ারটিতে বসে সে স্বচ্ছ হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে তুললো: যাকে বর্জন করেছি তাকে আহ্বান করবার ভাষা থাকে না। যদি বলো, আশাও ছিল না। কিন্তু আমার কাছে ফের ফিরে আসবার তোমার কি কোনো প্রয়োজন ঘটেছে?

সন্ধ্যায় স্নায়ুগুলো অত্যন্ত স্নিগ্ধ হয়েছে বলেই অশ্রুর কথায় তীক্ষ্ণতা নেই। সে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর পা দুটো একটু ঘসে বললে—তোমার যেমন আকাঙ্ক্ষা

নেই আমারো তেমনি প্রয়োজন ঘটে না। ইচ্ছাই আমার বাহন—সরস্বতীর যেমন হাঁস।

—লক্ষ্মীর যেমন প্যাচা। নির্মল একটা সহজ রসিকতা সংবরণ করতে পারলে না : তোমার ইচ্ছাটা পেচক জাতীয়-ই।

অশ্রু চোখ তুলে বললে—তুমি আমাকে আজো অপমান করবে নাকি?

নির্মল অস্থির হয়ে উঠলো : ছি ছি, না না, সে কী কথা, সে-কথা নয়। আমার কথাগুলোই অমনি বুনো। তুমি আজ আমার অতিথি—তোমাকে অপমান করব কী? ছি! ওটা একটা ছেলেমানুষি করলাম মাত্র। এত বুদ্ধি রেখে এ-কথাটি বোঝ না?

বোঝে, কিন্তু তবু কথার স্বরে কোথায় যেন বিদ্রূপের খোঁচা আছে। অশ্রু বললে—বর্জন আমিও তোমাকে করেছি; সে-গৌরবের ভার তুমি একা নিলে চলবে কেন? কিন্তু বর্জন করেছি বলেই তোমাকে বিস্মৃতিতে বিসর্জন দিতে হবে আমার বন্ধুতা এতটা অনুদার নয়। বুঝলে?

নির্মল নড়ে বসলো; টিনের ছোট বাক্স খুলে একটা ইজিপশিয়ান সিগারেট ধরালো। বললো,—তা'হলে আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু আজো যদি জমাট নিরেট অশ্রু নির্ঝরবন্যার মত উদ্বেল হয়ে উঠতো, তা, হ'লে আমার আর পার ছিল না; আশার চেয়ে সে-ভয়ই আমার বেশি ছিল। যাক, আমিও এখন মুক্তকণ্ঠে একটু কবিত্ব করি। জানো, অশ্রু, জীবনে দু'টি জিনিস ফিরে আসে না : এক, মৃত শৈশব, আর প্রথমা প্রিয়া।

কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ করে অশ্রু শুধোল : আমি কি তোমার প্রথমা প্রিয়া?

একটু ঘাবড়ে গিয়ে নির্মল বললে—তুমি অমন সোজা করে প্রশ্ন কর কেন? এ তোমার মারাত্মক দোষ। আমি এখন এ-প্রশ্নের কি উত্তর দেব? একটা সিগারেট খাবে তো খাও।

—না, এখন খাবো না। অশ্রুর স্বর ভারি ঘোলাটে!

নির্মল বললে—চুল সিঙল্‌ড করনি? বড়ো চুল রাখাটা তো সেকেলে, কালিদাসি আমলের।

অশ্রুর উত্তরো নির্মম : পুরুষের মনোহরণ করতে দীর্ঘ চুল আমাদের দেশে এখনো প্রশস্ত। ইউরোপে যদি কোনো দিন যাই এবং কোনো প্যারিসিয়ান যদি আমার গায়ের এই শ্যামল রঙ দেখে মুগ্ধ হয়ে আমাকে প্রার্থনা করে, আমি

তাকে খুশি করতে তখন না-হয় চুল ও পোষাক খর্ব করে ফেলবো। আমার সময় আছে।

—হ্যাঁ, আছে। কিন্তু একবার চুল ঘাড়ের তলায় এনে ছেঁটে ফেললে দেশে ফিরে তাকে ফের গজিয়ে আবার কোনো বেচারা বাঙালি যুবককে মুগ্ধ করতেই যা সময় লাগবে। তা, বেশ! প্রভাতকে ছেড়ে প্যারিসে যাবার মতলব আছে নাকি?

—আছে বৈ কি। প্রভাতো সঙ্গে যেতে পারে।

—প্রভাত যাবে? প্যাসেজ জোটাবে কোত্থেকে? অল্প টাকার কেরানির এত মুরোদ! অবশ্যি, প্রভাত যদি যথেষ্ট পণ নিয়ে কোনো বাঙালি মেয়ের কুলরক্ষা করে! তখন তার বউ তাকে তোমার সঙ্গে যেতে দেবে কেন?

অশ্রু খিট্‌খিট্‌ করে উঠলো: সে-ভাবনা তোমার না করলেও চলবে। কিন্তু আমি যা প্রশ্ন করছি তার উত্তর দাও। তুমি আমাকে কোনোদিন ভালোবেসেছিলে?

নির্মলের মুখে সেই ক্ষণস্থায়ী হাসি—যে-হাসি মুখকে প্রসন্ন করে না, অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে একটা কঠিন দৃঢ়তা রেখে যায়: এ-প্রশ্নের একটা উচ্চারিত উত্তর আছে নাকি? তুমি কিছুই অনুভব করতে পারো নি?

অশ্রু স্পষ্ট করে বললো—আমি অনুভবে বিশ্বাস করি না, আমি উচ্চারণ চাই।

—এই জন্যেই তোমার সঙ্গে আমার মিললো না। তুমি কর্মে প্রবল, প্রতিজ্ঞায় প্রখর হতে পার, প্রকাশে তোমার একটা অপরিমিত উদ্বেগ থাকতে পারে, কিন্তু যখন ভাবি অনুভব তোমার ফিকে, তরল—তখন তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করতে পারি না, অশ্রু। এই আমার স্পষ্ট উত্তর।

অশ্রু খানিকক্ষণের জন্য কোনো কথা কইলো না। নির্মল ফের বললে—আচ্ছা, সত্যি করে তুমি কাউকে ভালোবেসেছ? তুমি প্রভাতকে কি এত ভালোবাস যে তার প্রেম না পেলে তুমি এই প্রকাণ্ড পৃথিবীতে একেবারে একাকিনী হয়ে যাবে? তোমার অন্তরে বৈধব্যের সেই বৈরাগ্যবোধ আছে? তোমার হয়ে আমিই উত্তর দিচ্ছি: নেই। যে-প্রেমে একপ্রবণতা আছে, যার অনুভবে মানুষ বিরহের অন্ধকার থেকে বিশাল আকাশের সৃষ্টি করে—সেই প্রেম তোমার আছে? কতগুলি ফাঁকা কথার মূলধনে এ জীবন নিয়ে জুয়ো খেলতে বসো না।

অশ্রু হেসে বললে—বেশ কবিতা করছিলে, কিন্তু শেষ দিকে ওয়ার্ডসোয়ার্থের মত ঐ নীতিবচনটুকু না আওড়ালেই আমি হাততালি দিয়ে উঠতাম। কিন্তু আমার কথা আমিই বলবো। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি আমাকে তোমার জীবনের অসতর্ক কোনো মুহূর্তে একটুও ভালোবাসনি?

নির্মল বললে—ঐ চার অক্ষরের শব্দটা আমার কাছে আগাগোড়া গ্রীক্। ওটার সংজ্ঞা নেই।

—কেন, উচ্চারিত উত্তর নাই বা দিলে, গাঢ় করে অনুভবও করোনি কোনোদিন?

—বোধ হয়, না। আমি ভালোবাসা বুঝি না, ওটা যৌবনের একটা রঙিন বিকার মাত্র। তাই সে-বিকারকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করবার জন্যেই আমি বিবাহের পক্ষপাতী। দৈহিক কামনাকে সুন্দর ও সংযত করতে পারলেই তা প্রেম এবং সে-প্রেমে সংসার ব্যবস্থিত হয় বলেই তা সমাজের নামান্তর। সমাজকে আঘাত করতে গেলেই যে-শক্তি প্রয়োগ করতে হয়, নেহাৎ সহজ অঙ্কের নিয়মানুসারে সেই আঘাত নিজের ওপর ফিরে আসে—প্রেমের শান্তি তাতে ব্যাহত হয়। তাই সমাজকে লঙ্ঘন করতে গেলে প্রেমেরো স্খলন ঘটে; তখন সেটা মনে হয় উৎপাত—প্রণিপাত নয়। তখন তার নিপাত হলেই বাঁচা যায়। নিউটন গতি সম্বন্ধে যে-থিওরি করেছিলেন, গোড়ায় তাঁর hypothesis ছিল হয় তো নরনারীর অসামাজিক প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতির দৃষ্টান্তটা। কিন্তু বড়ো বড়ো জিনিস নিয়ে তর্ক করতে গেলে খিদে আমার আরো বেড়ে যাবে। ইন্দিরাকে ডাকি।

অশ্রু বাধা দিলো: ডাকবে'খন। কিন্তু অসামাজিক প্রেমে যে প্রেমের আয়ুক্ষয় হয় এমন একটা মত স্থির করলে তো আমাকে দেখে, আমার সংস্পর্শে এসে, তাই না?

—হয় তো হবে। বিবাহের অতিরিক্ত কোনো প্রেমে আমার বিশ্বাস নেই। প্রেমকে বিবাহের সীমার মধ্যে বিস্তারিত না করলে সেটাকে আমার কাছে ব্যভিচারের মতোই দৃষ্টিকটু লাগে।

অশ্রু ডান হাতটা তুলে বললে—আচ্ছা, আচ্ছা। কিন্তু আমার প্রেমটা তো তোমার এই সিদ্ধান্তের পক্ষে একটা পরীক্ষা ছিল? আমার সঙ্গে দু'দিন না মিশলে তো আর তুমি এমন ভুঁইফোঁড় পাদ্রি হতে পারতে না?

—না।

অশ্রু এতক্ষণে একটা কথা পেলো : আমারো তাই সে-পরীক্ষা ; আমিও তাই জীবনে লাখো লাখো বার পরীক্ষা করছি ; হয় তো প্রত্যেক বারই হারবো, কিন্তু তাতে আমার শক্তিক্ষয় হবে না, বরং সংকল্পের সঙ্গে সকল শঙ্কা দূর হয়ে যাবে। আমি কাকে প্রেম দিয়ে কৃতার্থ হব সে-বিচার পাড়ার পাঁচ জনকে করতে দিলে আমার অস্তিত্বের মর্যাদা থাকে কোথায় ? সে-বিচার আমিই করবো—বহুতর পরীক্ষার মধ্যে, বহুতর অকৃতকার্যতার মধ্যে। বুঝেছ ?

—বুঝলুম। কিন্তু তোমার অন্ধ বিচারেই যে পরিপূর্ণতম সুফল হবে তার কোনো গ্যারান্টি আছে ?

অশ্রু বললে—তবু সে-বিচার আমার বিচার। মিল্‌টন্‌কে তুমি অন্ধ বলবে কিন্তু অন্ধ চোখেই তিনি হারানো প্যারাডাইজ খুঁজে পেয়েছিলেন।

—তোমার উৎপ্রেক্ষাকে আমি উপেক্ষা করি। প্রেম একটা কায়াহীন মাদকতা মাত্র—

কথা কেড়ে নিয়ে অশ্রু বললে—তাই প্রেমকে লোকে বলে অতীন্দ্রিয়। আমি অবিশ্যি বলি শরীরী সুর।

—কিন্তু প্রেম যেখানে পরীক্ষাসাপেক্ষ সেখানেই সে লোভী, সেখানেই তার অন্তহীন কদর্যতা। আমি অত কথা বুঝি না অশ্রু, একটা উল্কার জীবন কামনীয় নয়।

—কিন্তু উল্লাসের। তার সর্বনাশটা দেখবার মতো।

—কিন্তু সেই সর্বনাশ জীবনে স্বীকার করে নেবার মতো তোমার ধৈর্যশীল বৈরাগ্য আছে ?

—সেটা আর বৈরাগ্য নয় বন্ধু, সেটা অবসান।

এমনি সময় ইন্দিরা প্রবেশ করলো খাবার নিয়ে। ডিস্‌টা টেব্‌লের ওপর রেখে সে নির্মলের পা ঘেঁষে মেঝের ওপর বসে পড়লো। এই যাচিত সান্নিধ্যের নতুন একটা অর্থ নির্মলের কাছে হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অশ্রুর একবার বলতে ইচ্ছা হয়েছিলো : আচ্ছা তুমিই তোমার স্ত্রী-র পূর্ব ইতিহাস জানো ? কিন্তু মনের চিন্তাটা জিভের ডগায় এসে মুখর হবার আগেই নির্মল বললে—এই দেখ ইন্দুকে। বিয়ের আগে এক অসামাজিক প্রেমের নেশায় মাতোয়ারা হয়েছিলো। সেটা নেহাৎই মিথ্যা, অবাস্তব। এমন অবাস্তব রঙিন স্বপ্ন হয়তো

প্রত্যেক যুবক-যুবতীরই দেখতে হয়। না, ইন্দু? নির্মল হো-হো করে হেসে উঠলো।

অশ্রুর দু'কান রাঙা হয়ে উঠলো। বললে—শিগগির এর প্রতিবাদ কর, ইন্দিরা। রমাপতির প্রতি তোমার প্রেম মিথ্যা, অবাস্তব? এ অবমাননা তুমি সইবে?

উঠে সুইচটা টেনে আলো জেলে নির্মল বললে—এ-ঘরে ইন্দিরার স্বামী উপস্থিত আছেন এ-কথা তুমি ভুলে যেয়ো না, অশ্রু। ইন্দিরা তাঁর পাতিব্রত্যের অবমাননা করবেন না।

ইন্দিরাকে চুপ করে থাকতে দেখে অশ্রু মুহূর্তে ঘেমে উঠলো। বললে—তুমি ইন্দিরাকে তার অটল প্রেমের সিংহাসন থেকে ভ্রষ্ট করে তাকে একটা মহান রাজ্য থেকে বিচ্যুত করেছ। তুমি তার কী ক্ষতি করেছ তার পরিমাণ স্বার্থান্ধ পুরুষ হয়ে তুমি বুঝবে না।

নির্মল ফের চেয়ারে বসে স্নিগ্ধস্বরে বললে—তুমি যদি ইন্দিরার এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু না হতে, আর আমার সঙ্গেও যদি তোমার কোনো ব্যাপার না ঘটতো, তা হলে আমি সোজা বলে বসতাম : তোমার সঙ্গে আমি আমার স্ত্রীর ক্ষতি-বিচার করতে চাইনে, অশ্রু। কিন্তু এর উত্তর ইন্দিরাই দেবেন। তোমার আমি কি ক্ষতি করেছি, ইন্দু?

ইন্দিরা স্বামীর পায়ের আরো কাছে ঘেঁষে এসে বললে—আমার আবার কী ক্ষতি করবে?

—কী ক্ষতি করবে! অশ্রু দীপ্ত হয়ে উঠলো : ইন্দিরা নেহাৎই ভীরু ও দুর্বল বলে বাক্যে বা ব্যবহারে অস্ফুটতম প্রতিবাদও করতে পারলো না। স্বচ্ছন্দে সমাজের যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিলো। তুমি তার যে-অপমৃত্যু ঘটিয়েছ, তার যে-মহান ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নষ্ট করেছ—সমাজ যদি তার বিচারের ভার নিত—

—তা হলে আমার ফাঁসি হ'ত! এই বলতে চাও, অশ্রু? কিন্তু আমার তিরোধানে তুমি সত্যিই কি সুখী হতে, ইন্দু?

ইন্দু নিরীহ ইঁদুরের মতো চোখ লুকোল।

অশ্রু বললে—এর তুলনায় ঢের বেশি সুখী হত। তার সৌন্দর্য তার শিল্পানুরাগ তার কবিস্বপ্ন তোমার বিবাহের কয়েদখানায় দীর্ঘদিনের উপবাসে

শুকিয়ে গেছে। তোমার এই তুচ্ছ প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়ে সে স্বর্গ খোয়াতো না, বরং অমরত্ব লাভ করতো। পড়নি তার ডায়েরি?

নির্মল আশ্চর্য হ'ল: ডায়েরি? আমি মানুষের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় চাইনে। নেপথ্যের ইন্দিরার প্রতি আমার চোরাদৃষ্টি নেই, অশ্রু। কিন্তু (ইন্দিরার প্রতি) এ-সব কী বলছে?

ইন্দিরা হেসে বললে—ও একটা পাগলি। যা মুখে আসে তাই বলে।

অশ্রু থামবে না: ও এই নিরানন্দ বিবাহজীবন চায় নি, সন্তান চায় নি, তোমাকে চায় নি।

—পাগলি! নির্মল আবার হো হো করে হেসে উঠলো: চায় নি? ইন্দিরার শরীরের প্রতিটি রক্তকণা চায়। নারীর প্রেমে যদি কোনদিন কোনো মাহাত্ম্য থাকে তবে সে মা হবে বলে, পুরুষের মনোহারিণী হবে বলে নয়।

ইন্দিরা সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তার সর্বাঙ্গে কোথা থেকে সৌন্দর্যের ঢল নেমেছে। সে তীক্ষ্ণ স্বরে বললে—তোমার এই সব কী হচ্ছে, অশ্রু? ভদ্র সমাজে সৌজন্যের সীমা মেনে চলবে না, নাকি?

অশ্রু পরিষ্কার গলায় বললে—আর বেশি ভদ্র হয়ে কাজ নেই, ইন্দিরা। ঢের হয়েছে। অন্তরে যাকে সত্য ও সর্বস্ব বলে স্বীকার করেছ সামান্য শরীরের ভয়ে তাকে অমর্যাদা করো না। শরীর তো তোমার কাছে দু' মুঠো ছাই—এইবার জীবনে পরম সুযোগ এসেছে—যা তুমি চাও না, তা তুমি নেবে না, না, কক্‌খনো নয়।

নির্মল হঠাৎ ইন্দিরাকে নিজের কাছে ধীরে টেনে আনলো, তার ঈষন্নমিত পিঠটি নির্মলের কাঁধের কাছে এসে নির্ভর পেলো। ইন্দিরার আলুলিত চুলের ওপর ধীরে একখানি হাত রেখে নির্মল বললে—কী তুমি চাও না, ইন্দু? আমাকে?—তারপর ম্লান একটু হেসে অশ্রুর দিকে সঘৃণ দৃষ্টি ফেলে বললে—কী যে কে চায় না, বুঝে ওঠা বড় মুশকিল। চাই না বলে হাত সরিয়ে নিতে-নিতে যে-টুকু পেয়ে বসি সেও আমাদের সকল চাওয়ার অতীত হয়ে দেখা দেয়। হয় তো ইন্দু আমাকে কোনোদিন চায় নি, কিন্তু আজ? ও-কথা মুখেও এনো না, অশ্রু। কে কখন কী চায় কেউ বলতে পারে না।

স্বামীর এ-উত্তরটা বড্ড মোলায়েম হল, ইন্দিরার তা মনঃপূত হ'ল না। তার ইচ্ছা হচ্ছিল লৌকিক বিনয়ের সীমা লঙ্ঘন করেই তিনি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে

অশ্রুকে ক্ষতবিক্ষত করে দেন। তাই সে ক্ষতিপূরণ করলে: তোমার মতো সবার আর মৃগী-রোগ হয় নি, অশ্রু। উচ্ছৃঙ্খলতাই জীবন নয়, সে একটা নিদারুণ কালিমা! এক কথায় সেই অসতীত্ব।

অশ্রু বললে—প্রেমহীন দেহদানের চেয়ে সে মহৎ। আমাদের এমনি অন্ধ দৃষ্টি যে জীবনচাঞ্চল্যকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলে আমরা তৃপ্তি পাই। প্রেমের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারবো, কিন্তু পরীক্ষা করতে গেলেই যত গোল বাধে। ভুল করলে ইন্দিরা, আজকের এই ক্ষণস্থায়ী সন্ধ্যাকালটাই তোমার জীবনের শেষ সত্য নয়। এই অলস কর্মবিমুখ স্বামীসম্ভোগকাতর জীবনই তোমার স্বর্গ ছিল না, এর চেয়েও বিস্তৃত স্বর্গের তপস্যা করবে বলে বিধাতা তোমাকে দেহ ভরে রূপ দিয়েছিলেন, বুক ভরে অতৃপ্তি।

—আর পেট ভরে ক্ষুধা। নির্মল হেসে উঠলো: এ অবান্তর বিষয় নিয়ে তর্ক আর আমাকে পোষাবে না, অশ্রু। আমার দারুণ খিদে পেয়েছে। তুমিও একটুও সাহায্য কর না? আশা করি এখনো এত প্রাচীন হওনি যে পুরুষের সামনে খাবার জন্যে দাঁত বের করতে কুণ্ঠিত হবে।

—প্রাচীন?

—নিশ্চয়ই। নইলে বিয়ে করে সুস্থ সংযত পরিমিত জীবন-যাপনের আদর্শটাই তো অতি-আধুনিক। তোমার ও-মতটা তো এ-শতাব্দীর প্রথম দশকের। কুড়ি বছর আগেকার।

—আমি ঐ পেঁপেটা খাবো বটে, কিন্তু সেটা তোমার মতে সায় দিচ্ছি বলে নয় কিন্তু। তুমিও একটু নাও, ইন্দিরা।

খাওয়ার মধ্যে দিয়ে ঘরের আবহাওয়াটা তরল হয়ে উঠলো।

বলা নেই কওয়া নেই নির্মল হঠাৎ এক টুকরো নাসপাতি ইন্দিরার মুখের কাছে তুলে ধরলো। জিনিসটা ইন্দিরার কাছে নতুন, একেবারে অপ্রত্যাশিত! এতগুলি দিন-রাত্রির স্মৃতিপটে স্বামীর এমন একটি ভঙ্গির রেখাপাত হয় নি কখনো। আরেকটু হলে ঐ আঙুল দু'টি অধর দিয়ে ছুঁয়ে ইন্দিরা প্রথমস্পৃষ্টা কুমারীর মতো রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো হয় তো। স্বামী যেন তাঁর ঐ দু'টি আঙুলে করে স্বর্গের সমস্ত সুধা তুলে ধরেছেন!

নাসপাতির টুকরোটি ইন্দিরা শব্দ করে চিবোতে লাগলো। নির্মল বললে—তোমার পরীক্ষার জটিলতা প্রণিধান করতে পারি তেমন অণুবীক্ষণ

আমার নেই। সে আমার ত্রুটি হয় তো, মানলুম। কিন্তু কোনো পরীক্ষারই পরিণাম নেই, কোনো প্রেমই সংসারে প্রামাণ্য নয়। মাঝের থেকে কপালে ঘটে অশেষ দুর্গতি, নিত্য পদস্খলনের দুঃসহ কলঙ্ক।

অশ্রু মুখ গোমরা করে বললে,—মানুষের অভিধানে শব্দের অপপ্রয়োগ ঘটে থাকে, নির্মলবাবু। পরিণামের চেয়ে পরীক্ষা বড়ো, যেমন প্রাপ্তির চেয়ে অতৃপ্তি, সমাধানের চেয়ে অনুধাবন।

ইন্দিরাকে নির্মল আরো কাছে টেনে আনলো। তার স্বর গদ্‌গদ হয়ে উঠেছে: সন্ধান বুঝি না, অশ্রু, বুঝি সন্ধি; শ্রান্ত পরীক্ষার চেয়ে প্রতীক্ষাহীন শান্তিই আমাদের বেশি কামনীয়। এই পরিপূর্ণ প্রগাঢ় বিশ্রামের মধ্যে কী যে প্রয়াসহীন বিরতির মাদকতা রয়েছে তা তুমি বুঝবে না। আমি বুঝেছি বলেই কথাটা খুলে বলতে গিয়ে আরো ঘোরালো করে তুললুম। নিয়ত সন্ধানের নিষ্ফল অধৈর্যে স্নায়ুমণ্ডলীকে অকারণে উত্তেজিত করতে হয় না, অতৃপ্তির বিষবাষ্পে চিত্ত কলুষিত হয় না, নির্জল মেঘের মতো মন লঘু হয়ে উড়তে থাকে। দম্পতির সংকীর্ণ শয্যার দু' প্রান্ত থেকে দু'টি বিপুল জগতের জন্ম হতে থাকে—এক ধরিত্রী, অন্য স্বর্গ। মধ্যে মাত্র আকাশের ব্যবধান। ধরিত্রী হচ্ছে পুরুষ—স্বর্গ নারী; আর আকাশ হচ্ছে দুয়ের মধ্যেকার বিস্তীর্ণ প্রেম!

ঠোঁট দুটো কুঁচকে অশ্রু বললো—হাতি!

বলেই আচম্বিত ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলো।

ঘরের সমস্ত শূন্যতা নিমেষের মধ্যে ইন্দিরাকে গ্রাস করলে। সে-নিস্তব্ধতা যেন কঠিন পাথর দিয়ে তৈরি। এর পর স্বামীর সঙ্গে যে সে কী ব্যবহার করবে, কী করলে যে এমন চমৎকার সন্ধ্যাটার সঙ্গে একটা সুরসঙ্গতি থাকে সে প্রথমে বুঝে উঠতে পারলো না। এতোখানি অবকাশ পেয়ে সে যেন একেবারে হাঁপিয়ে উঠলো। স্বামীর মুখের দিকে সে অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে একবার তাকালো—কিন্তু সে-মুখ নিরেট স্থূল, উদাসীন। খানিক আগে যে-মুখে সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা ছিল, সহসা তা যেন দুপুরের রোদের মতো রুক্ষ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ তিনি যে কেন ইন্দিরার সান্নিধ্য বিস্মৃত হয়ে টেবলের উপরকার একটা মোটা বই নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বোঝা কঠিন। পেটের মধ্যে নাসপাতির টুকরোটা এখনো হজম হয় নি।

মাথা তুলে নির্মল বললো—জানলাটা বন্ধ করে দাও দিকিন, ঠাণ্ডা আসছে।

ভয়ে ভয়ে ইন্দিরা বললে—হাসনুহানার ঝাড় থেকে কেমন গন্ধ আসছিলো।

একটু বিরক্ত হয়ে নির্মল বললে—গন্ধ শুঁকতে হলে বন্ধুকে বাইরে নিয়ে বেড়াও গে।

এর পর হয় তো ইন্দিরা আর দাঁড়াতো না; কিন্তু নির্মল আবার ডাকলে: দেখছ না ব্র্যাকেট থেকে আমার টাই-শুদ্ধু কলারটা পড়ে গিয়েছে; চোখে দেখতে পাও না? তুলে রাখ।

ইন্দিরা তুলে রাখলো।

নির্মল ফের বললে—রাত্রে আমার স্যুপটা তৈরি করে রেখো। আর শোন, রামসেবককে বলে কিছু চুরুট আনিয়ে দাও তো। সিগারেট আর খাবো না। দোকানটা যেন চিনে যায়। আর—হ্যাঁ, তোমার এই বন্ধুটি কবে এসেছে, কেন এসেছে, কবে যাবে?

ইন্দিরা তিক্তস্বরে বললে—বন্ধু তো সে তোমারো। জিজ্ঞাসা করলেই পারতে।

—পারতুম হয় তো। কিন্তু তোমাকে কিছু বলে নি? একটা সাধারণ ব্যাখ্যাও তার নেই?

—না।

ইন্দিরা চলে যাচ্ছিলো।

—আচ্ছা, তুমি তো ডায়েরি লেখ। আমাকে কিছু বল নি কেন?

ইন্দিরা বললে—সাহিত্যে সব জিনিস যেমন লিখতে হয় না, তেমনি স্বামীকেও সব কথা বলতে নেই!

—কিন্তু ইঙ্গিতেই হচ্ছে আর্টের নিশানা। আমি সে ইঙ্গিত আজ পেলুম, ইন্দু।

আবার ইন্দু! ইন্দিরা কুণ্ঠিত হয়ে শুধোল: কিসের?

—তুমি আমাকে চাও না, ভালোবাস না।

চোখ, মুখভাব, দেহের সমস্ত অটল ভঙ্গি দিয়ে ইন্দিরা স্থির কণ্ঠে বললে—মিথ্যা কথা।

অভিমানের স্বরে নির্মল বললে—আর এখন ডায়েরি লেখার প্রয়োজন নেই কি না, তাই ঠিক আজকের দিনটিতেই যে আমাদের বিবাহিত জীবনের একটি বৎসর পূর্ণ হ'ল তা তুমি স্বচ্ছন্দে ভুলে আছ। অথচ, আজকের দিনটি যাতে না হারাই তারি জন্যে আমি লাক্ষ্ণৌ থেকে সাত-তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি।

—তাই নাকি? ক্যালেণ্ডারটার দিকে চেয়ে দেখলো—সত্যিই তো। আজকের তারিখ। ইন্দিরা এতোক্ষণ এই কথাটিই ভুলে ছিল কি করে? সে হয় তো তক্ষুনি স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে সজ্ঞানে চুম্বনভিক্ষা করতো, কিন্তু নির্মলের মুখ আবার নিরেট স্থূল হয়ে উঠেছে। ইন্দিরা এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কী করবে ভেবে পেল না।

ইন্দিরা তবু আশা হারায় নি। আজ যে তাদের বিবাহের বার্ষিকী, এ-সংবাদটি স্বামী মনে রেখে ইন্দিরাকে আকাশে তুলে দিয়েছেন। অথচ এই স্বামীর প্রতিই বিমুখ ও বিদ্রোহী হবার জন্যে অশ্রুর দিক থেকে তার ওপর এমন জোর তাগিদ এসেছিলো। ইন্দিরা যে তার তর্জনীটা উদ্ধত করে নি সে তার স্ত্রী-জীবনের পরম সৌভাগ্য। সে এতোদিনে বাঁচলো বোধ হয়।

ইন্দু! নামকে সংক্ষিপ্ত ও হ্রস্ব-উকারান্ত করার মধুর আর্টটা বাঙালি রচনা করেছে ভালোবাসতে গিয়ে। যেন ঐ হ্রস্বতার আড়ালটুকুতে একটা অসীম ইশারা—যেন সবটুকু বলা হল না বলেই যা বলবার তার চেয়ে ঢের বেশি বুঝিয়ে দিলে; ঠিক কবিতার অর্থের মত। শব্দে নেই, ছন্দে নেই, ভাববিন্যাসে নেই, ভাষা-প্রসাধনে নেই—কোথায় যে আছে ধরা কঠিন, কিন্তু আছে যে, সেটা জলের মত সোজা। যার নাম সত্যি-সত্যিই ইন্দিরা—কাকারা যাকে ইন্দ্রি বলতেন—তাকে ইন্দু বলে ডাকার মাধুর্য যে অক্ষরসন্নিবেশে নয়, উচ্চারণভঙ্গিতে নয়, তা বেশ বোঝা যায়; কিন্তু ঐ ছোট ডাকটিতে ভীরু বুক যে রসরোমাঞ্চে শীতল হয়ে আসে তারো মতো সত্য আর নেই কিছু।

বিয়ের পর এক বছর পূর্ণ হল বটে—কিন্তু স্বামী তাকে সম্বোধনে কৃপণতা করতে গিয়ে কোনোদিন এমন অজস্র হয়ে ওঠেন নি। এ যদি জনসাধারণের নেপথ্যে কামকেলির নিভৃত রঙ্গমঞ্চে উচ্চারিত হত তা হলে ইন্দিরা তাকে আমোল দিতো না; কিন্তু এ আর উচ্চারণ নয়, ঘোষণা। নির্জন নিরালায় নয়—তৃতীয় ব্যক্তির সমুখে—এই তৃতীয় ব্যক্তিটিই প্রেমিক-প্রেমিকার নিকষ-পাথর। এ তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায়ই এর বিচার, এর মূল্যধারণ—এ তৃতীয় ব্যক্তিই সমাজ, সংস্কার, মনস্তত্ত্ব। এ আর কেউ নয়—স্বয়ং অশ্রু, যার কাছে বিবাহ অর্থ শুধু বি-পূর্বক বহ্-ধাতু ঘঞ্; সমাজ অর্থ জীবনীশক্তির শ্মশান-ভস্ম।

ভালোই হল—অশ্রুরই মুখের উপর সে বলে আসতে পেরেছে—স্বামীই তার জীবন-সঞ্জীবনী ; সে যে আজো বিধবা নয় এই তার ত্রিলোক-পতিত্বের চেয়ে বড় সৌভাগ্য। আজ ঐ সামান্য একটি সম্বোধনের বাতায়ন দিয়ে বহুবিস্তৃত আকাশের মুক্তি তাকে ঘিরেছে। সে স্বামীর জন্যেই দেহধারণ করেছিলো, এ জ্ঞান তার নশ্বর দেহটাকে উষার হাতের স্বর্ণ-বীণা করে তুললো। স্বামীর পূজায় এ-দেহকে সে ধুপের মতো দগ্ধ করবে—এর চেয়ে সার্থকতাময় আত্ম-সমর্পণের গরিমা মেয়ে হয়ে সে ভাবতে পারে না। স্বামীই তার দেহ, তার দেশ, তার দেবতা।

তুমি বিদ্রূপ করছ, রমাপতি। কিন্তু যে-প্রেমে বন্ধন নেই, সন্তান-জননের প্রয়োজন নেই, নব জীবনের মাঝে নিজেকে সম্প্রসারণ নেই, সে-প্রেম মদ খাবার কাচের বাসন মাত্র। মদ ফুরোলে বাসন যায় ভেঙে। ক্ষুধার্ত সময়ের একটি মাত্র সুদীর্ঘ চুমুকে তোমার সে-মদ ফুরিয়ে গেছে। মদে আছে মত্ততা, সুধায় আছে স্বাদ! মদে আছে রোগ, সুধায় আছে রুচি। তোমার সে-আদর্শ হাটে বিকোত না বলেই মর্চে পড়ে অব্যবহৃত অবস্থায় ক্ষয় হয়ে যেত রমাপতি, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে তুমি হতে অসুস্থ, আমি হতুম কুৎসিত। সে আর তপস্যা না হয়ে হত খালি তাপ—আলোক থাকতো না বলে তৃপ্তিও থাকতো না। সুর কেটে গেলে রেশ থাকতো না ; শ্বাস ফেলতুম বটে, কিন্তু আশ্বাস কই!

তার চেয়ে ইন্দিরা এখন স্বামীর জন্যে সযত্নে বিছানা পাতুক। অশ্রু পোড়ার-মুখিটা বেজায় বেড়েছে—নিতান্ত বেহায়া বলেই না তার স্বামীর কাছে এমন একটা খেলো নাটুকেপনা করতে সাহস পেলো। ওর কপালে আছে গভীর দুঃখ। ব্যবসা করতে বসে যে ছিনিমিনি খেলে তাকে হতেই হবে দেউলে। ধারে মাল বিকোয় না। মূলধন উড়িয়ে যে জুয়া খেলতে বসে তার মূল্যও সে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু একদিন ও ঘা খাবে, একদিন ও শান্ত হবে, একদিন ওর সোনার স্বপ্ন প্রথম প্রেমের মোহের মতই বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাবে দেখো। সেই দিনটি পর্যন্ত ইন্দিরা যেন বাঁচে!

দু'মিনিটে ইন্দিরা স্বামীর বিছানা ও নিজের মন গুছিয়ে নিলো। প্রথম জীবনে ভালোবাসার সে যে-স্বাদ পেয়েছিলো সে শুধু স্বামী-প্রেম চাখবার একটা আপাত-পরীক্ষা মাত্র। আজ মনে হল রমাপতি গৌণ, নির্মল গৌণ—বড় তার স্বামী ; যে তাকে বিধি অনুসারে সন্তানের জননী হতে দেবে, যার

অন্নপ্রাশনে পাড়ার পাঁচজনকে ডাকলে তাঁরা পাত পাড়তে কুণ্ঠিত হবেন না। দর্পণে ইন্দিরা আবার নিজের ছায়া দেখলো—প্রথম যৌবনে রমাপতির সংসর্গে এসেও সে এতো বড়ো সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেনি। সে ভাবী মা, পরাধীন ভারতবর্ষের আসন্ন স্বাধীনতা, ঋষিকণ্ঠের আদিম সূক্তি! তার পীবর বুক, স্থূল উদর, ভাবাকুল চোখ, ভার-মন্থর দেহ—সব কিছুই তার চোখে নবীনতর আবির্ভাব!

চাকরকে ডেকে অশ্রুর খাবার তার ঘরে পৌঁছে দিতে বলে ইন্দিরা বই নিয়ে পড়তে বসলো। বইয়ে মন দেয় কার সাধ্য। কিন্তু আজ আর বাইরে পাইচারি করবার মানে হয় না। সে আজকের রাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সমস্তগুলি মুহূর্তের তলানি পর্যন্ত পান করবে। রমাপতির যে-দিন বাইরে থেকে এসে ইন্দিরার বন্ধ জানলায় টোকা দেবার কথা, সে-দিনো সে এমন স্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষা করেনি। আজ না আছে সংশয়, না বা সমস্যা। আজকের প্রতীক্ষার ফলটা অবশ্যম্ভাবী জানা সত্ত্বেও কেন জানি রহস্যময়। প্রথম রাত্রির বধূর মতো একটি রোমাঞ্চময় আশঙ্কানুভূতি, একটি সুখস্বনিবিড় তন্দ্রাচ্ছন্নতা। অথচ কতো সহজ। নিশ্বাস ফেলবার মতো অনায়াস।

স্বামী হাত-মুখ ধুচ্ছেন—এইবার শুতে আসবেন। স্বামীর এই শুতে আসাটা ইন্দিরার মনে হত একটা নির্মম দস্যুতা, পরস্বাপহরণের ছদ্মবেশ। কিন্তু আজ মনে হল মালিনীর কুঞ্জে মালাকার আসছে—বরবেশে চোর। শয্যা যূপকাষ্ঠ নয়, সুখতীর্থ! ইন্দিরার দেহ বলি নয়, নৈবেদ্য।

ইন্দিরা বুঝেছে—কেন তার এই স্বাভাবিকতা, এই দৃঢ় সংযত সুস্থতা। তার স্বামীর তুলনায় সে কত ছোট, কত নীচে পড়ে। সেই বরং এতদিন নিজের ইচ্ছাকে দমন করে রেখে নিজেকে মিথ্যে করে উপক্রুতা ভেবেছে; স্বামীর কর্তব্যে সে তার নিজের কামনা-মাধুর্যকে সঞ্চারিত করে নি বলে অপরাধী সে নিজেই। তার ইচ্ছা এতো দিন সীতার মত নির্বাসিত ছিলো—রমাপতির আদেশে। অনুরোধ নয়, আদেশে। তার জন্যে তার স্বামী দায়ী নয়। ওষুধ রোচক না হলেই রেচক নয় প্রমাণিত হয় না। সে মূর্খ, হীন, একচক্ষু—সম্পূর্ণ অন্ধ হওয়ার চাইতেও তা immoral। তার স্বামী বীর, তপস্বী—দুর্যোধন তাঁর উপযুক্ত বিশেষণ।

সত্যি কথা বলতে কি, নির্মল যে অশ্রু-তে গলে পড়ে নি, আজো তাকে

মুঠোর মধ্যে নিয়ে বাষ্পাকারে উড়িয়ে দিলো—স্বামী-পূজার প্রথম পাঠ পেলো সে এই উদাহরণে। স্বামী তাকে নিয়ে দীর্ঘ ত্রিপদীতে কাব্য না করুন, স্ত্রীর প্রতি অমর্যাদার ঘৃণায়ই যে তিনি পরনারীর প্রেমকে সদর্পে লাঞ্ছিত করেছেন এ-গর্ব ইন্দ্রাণীরো ছিলো না। শুধু প্রত্যাখ্যান বা লাঞ্ছনাই নয়, উল্টে স্ত্রীর প্রতি সহজ কর্তব্যবোধ তার সম্পর্ককে এমন বড়ো বলে স্বীকার করা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মতোই মহিমাব্যঞ্জক—অথচ তার মত ভাবপ্রবণ নয়। স্থির বুদ্ধি দিয়ে প্রণোদিত, সহজ আত্মীয়তার দায়িত্বে দৃঢ়ীভূত সে-বিশ্বাস। অশ্রুর মুখ কালো হয়ে গেছে—নির্মল তার তারা। হোক দূর তবু অবিচল, হোক ক্ষীণপ্রভ তবু চিরস্থায়ী। নির্মল ভোগী কালিদাসের প্রবাসী নায়ক—যে বিরহ বোধ করে অন্তঃপুরচারিণী প্রিয়তমা স্ত্রী-র জন্য, যে তার পরিণীতা, প্র-ণীতা নয়।

নির্মল ঘরে ঢুকলো। অবাক—সমস্ত ঘরটি পরিপাটি ফিটফাট। তার দৃষ্টি সচরাচর এতো সূক্ষ্ম নয়—তবু ঘরটিকে ঘিরে যে একটি শুচি-স্মিতি রয়েছে তা তাকে আকৃষ্ট করলো। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে অযথা বাক্যব্যয় করা তার অভ্যাস নয়। দীর্ঘদিনের শান্তির পর সে এখন ঘুমুবে। ইন্দিরা রাত্রে খায়নি—আশা করেছিলো স্বামী একবার জিজ্ঞাসা করবেন : খেয়েছ ? ও বলবে, না। তার পর উনি কি বলেন তাই শোনবার জন্যে ও কান পেতে থাকবে।

কিন্তু কান পেতে ইন্দিরা শুনতে পেলো স্বামী ইতিমধ্যেই ঠোঁট দুটো সামান্য একটু ফাঁক করে গাঢ়স্বরে নাক ডাকাচ্ছেন। স্বামী যে শুতে এসে নাক ডাকান এ মর্মান্তিক সত্য কথাটাই সে এতক্ষণ ভুলে ছিলো। সংক্ষিপ্ত করে ইন্দু বলে ডাকার রস এই শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের ঘায়ে মিলিয়ে যায়-যায়। কিন্তু,—এ কী ছেলেমানষি। ইন্দিরা নিজের মনেই হাসলো।

কিন্তু আজকের রাতটি যদি সে এমনি করে হারিয়ে যেতে দেয়, তা হলে তার দাবী থাকে কী ? এমন রাত কি যখন তখন আসে ! এতোগুলি দিনরাত্রি নিষ্ফল প্রেমের পসরা বয়ে তবে এমন একটি সুখসমৃদ্ধ শান্তিময় রাত্রির সন্ধান মেলে। মরুভূমিতে কতো চোখের জল ফেলে তবে এমন মরূদ্যান চোখে পড়ে। লাভটাই তো বড়ো নয়, বড়ো হচ্ছে উপলব্ধি। তাই ইন্দিরা আজ স্বেচ্ছায় স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হবে।

ইন্দিরা বইটা মুড়ে রেখে ধীরে স্বামীর বিছানার ধারে এসে বসলো। আকাশে বুঝি সামান্য মেঘ করেছে—হাস্নুহানার ঝাড়টা গন্ধে গদ্‌গদ। সমস্ত

পৃথিবীময় একটি বচনহীন স্তব্ধ নিরাকুলতা। ইন্দিরা ধীরে নির্মলের চুলগুলিতে হাত বুলুতে লাগ্‌লো।

নির্মলের পাতলা ঘুম—জেগে উঠলো। অস্বাভাবিক হয় তো, বা শ্রী-হীন! বললে—ঘুমুতে যাওনি যে।

ইন্দিরা বললে,—এমনি। ঘুম আসে না। তুমি ঘুমোও, আমি চুপ করে এমনি বসে থাকি।

নির্মলের স্বর কটু : না। পাশে বসে থাকলে আমার ঘুম হয় না। সমস্তটা দিন ট্রেনের ধকলে যারপরনাই নাকাল হতে হয়েছে।

ইন্দিরা তবু ওঠে না ; পা দুটি দুমড়ে বিছানার ওপর উঠে বসে।

নির্মল বিরক্ত হয়ে বললে : এ কি ? তোমার খাটে গিয়ে শোও গে। বেশি রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে যে।

ইন্দিরা আরো একটু সরে এসে বললে—হবে না।

—হবে না মানে ? না, যাও। ঘুম না আসে, টেবলে বসে ডায়রি লেখ গে যাও। আমার থেকে তোমার যতো-কিছু ক্ষতি হয়েছে সে-সব দুঃখ তোমার রমাপতির কাছে নিবেদন কর গে। বলে নির্মল পাশ ফিরলো।

ইন্দিরা আবার ভুল করলে। উচিত ছিলো অভিনয় করা, কেন না তাকে গভীর করে অনুভব করে তার সত্যাবিষ্কার করবে ইন্দিরার পক্ষে এতটা ইতিহাস নির্মলের সংসারে জমে ওঠেনি। তাই তার উচিত ছিলো উচ্ছ্বাসের বশবর্তিনী হয়ে স্বামীকে জাদু করা ; প্রণামে চুম্বনে মিনতিতে শপথে মিথ্যা-বাদিতায় প্রতিবাদে একেবারে একটা মেলোড্রামার মহলা দেওয়া। সে তা না করে বরং স্বামীর গা ঘেঁষে আরো একটু সরে এলো মাত্র। কিন্তু নির্মল সহসা স্ত্রীর স্পর্শ থেকে সংকুচিত হয়ে বললে—যাও, যাও, এখানে নয়—

নির্মল উঠে বসলো। রাগে ইন্দিরার নিচের ঠোঁটটি বৃষ্টি-লাগা ফুলের পাপড়ির মতো ফুলে ফুলে উঠছে। তবু বললে—তুমি অশ্রুর কথা সব বিশ্বাস কর নাকি ?

নির্মল রুখে উঠলো : আমি কারু কথায় কিছু বিশ্বাস করে কাজ করি না। যেমন অশ্রু তেমনি তার বন্ধু। দু'টিই এক-গোয়ালের। যাও, আমাকে আর বিরক্ত করো না।

ইন্দিরা তবু ওঠে না। মৃদুস্বরে বললে—যখন কিছু শুনলে-ই তখন সবটাই শোনো। পথের বিচার না করে প্রাপ্তির বিচার করলে তোমাকে বুদ্ধিমান বলবো।

—তোমার কাছ থেকে বুদ্ধিমত্তার সার্টিফিকেট নেবার জন্যে আমি রাত জাগতে চাই না। দয়া করে তোমার স্পর্শ থেকে আমাকে মুক্তি দাও, রক্ষা কর।

ইন্দিরা এক সেকেণ্ড স্তব্ধ হয়ে রইলো। তবু বলতে হল: আ।ার স্পর্শ কি এতই অশুচি?

—নিশ্চয়। তুমি বিবাহিত হয়েও অন্যাকাঙ্ক্ষিনী। সামাজিক সামঞ্জস্যে তুমি একটা উৎপাত।

—মিথ্যা কথা। ইন্দিরা খাট ছেড়ে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো।

—তবে নিয়ে এস তোমার ডায়রি। যে-নারী দেহ ও মন ভাগাভাগি করে ব্যবসা করে, তাকেও দ্বিচারিণী বলেই আমি ঘৃণা করি। যাকে মন দিলে তাকেই যখন দেহ দাও নি, তখন যাকে দেহ দিলে তাকেও মন দিলে না কেন?

ইন্দিরা বললে—তুমি আমার মন চেয়েছিলে?

—মন আমি চাই নি, কেননা ওটা আমার পাওনা; দেহের মতোই আমার ক্রীত সম্পত্তি।

—মিথ্যা কথা।

—হোক মিথ্যা কথা। দয়া করে এখন আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়। আমাকে ঘুমুতে দাও, কালকে আবার আমার বেরুতে হবে।

—কিন্তু ডায়রিটা পড়-ই না। পূর্ব ইতিহাস খালি আমারই নয়, তোমারো ছিলো। তুমি যেমন তাকে অতিক্রম করেছ, আমিও তেমনি তাকে পথ চলতে খুইয়ে এসেছি। অতীতের প্রতি যেটুকু আমার অস্পষ্ট মোহ আছে সেটা শুধু আমার কাব্যানুভূতির প্রবলতা মাত্র। তোমার মন পাইনি বলেই অতীতকে নূতনতর করে সৃষ্টি করে আমার মনের ক্ষুধা মেটাতে হয়েছে—

—রক্ষা কর, মনস্তত্ত্বের আমানুষিক বিদ্যে আমার নেই। কিন্তু তুমি আমাকে সত্যিই স্বীকার কর?

—স্বীকার না করে উপায় কি? সেই স্বীকারের চিহ্ন আমার সর্বাঙ্গে।

—স্বীকারই কর, ভালো তো আর বাসো না?

—তুমি বাসো?

নির্মল স্পষ্টস্বরে বললে—না। আমাদের যাত্রাটা সমানতালে শুরু হয় নি।

আমি বিয়ে করেছি বিয়েকেই বড়ো করে প্রতিষ্ঠিত করতে, তুমি বিয়ে করেছ সংসার-সংগ্রামে হেরে গিয়ে। আমার কাছে বিয়ে সংস্কার, তোমার কাছে সংহার। এ-যাত্রায় আবার ত্র্যহস্পর্শ আছে—সন্তান। এখেনে খালি স্বীকার-শপথেরই কথা ওঠে—ভালোবাসা বলে একটা ভূতও এখানে ছায়া ফেলে না।

ইন্দিরার স্বর গাঢ় : তবে ?

—তবে! মীমাংসা, একটা সোজা সিদ্ধান্ত চাই। আমরা পরস্পরের প্রয়োজনসাধক—দেহপ্রসাধন। সেই পরিচয়েই আমাদের সত্যিকারের আত্মীয়তা। কই, তোমার ডায়রি দেখি ? বলে নির্মল উঠে আলমারি খুলে একটা মোটা খাতা বার করে স্বধোল : এটা ?

কয়েক পৃষ্ঠা উলটে যেতেই বুঝতে তার আর দেরি হল না। দু'হাত দিয়ে খাতাটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো।

ইন্দিরাকে যেন কে চাবুক মারলে। আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো : এ-কী !

—নির্লজ্জতারো একটা সীমা থাকতে হয়। বলে খাতার ছেঁড়া টুকরো-গুলো নির্মল জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলো।

ইন্দিরা আর টুঁ-টি করলো না। ধীরে নিজের খাটে গিয়ে বসলো। তবু একবার বলতে ইচ্ছা হল হয় তো : খাতা ছিঁড়ে ফেললেই মনটাকে মুছে ফেলা যায় না। কিন্তু বলে লাভ নাই। স্বামীর সঙ্গে মীমাংসা একটা করতেই হবে। সেইটেই তার সাধনা। লাগুক দীর্ঘ দিন, সে প্রতীক্ষা করে থাকবে।

নির্মল বললো—অশ্রুকে বলো সে যেন শিগগিরই এখান থেকে সরে পড়ে। তার সংসর্গ অন্তঃপুরের শুচিতার পক্ষে অনুকূল নয়।

ইন্দিরা বললো—বলবো।

—আর রমাপতিকে বলো সে মরেছে।

ইন্দিরা অল্প একটু হেসে বললো—বহুকাল। সে এমন মরেছে যে, তার একটি কণাও সমস্ত পৃথিবীর ধুলো ঘেঁটে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নির্মল সরে এসে বললো—মনে রেখো তুমি আমার স্ত্রী, আমার সন্তানের জননী, আমার অধিকৃত্তা, বশম্বদা।

ইন্দিরা দীর্ঘাকুল চক্ষু মেলে বললে—সেই সত্যই আমি লাভ করেছিলুম আজ। সেই সত্যই আমার সীমন্তের সিন্দুরের মতো আমার জীবনে উজ্জ্বল হোক। বলে ইন্দিরা দু হাতে নির্মলের ডান হাতটা চেপে ধরলো।

পালা হল সাঙ্গ। প্রদীপও নিভলো। আবার নির্মলের নাকডাকা শুরু হয়েছে। ইন্দিরাও শুলো। খানিক্ষণ ঘুম এলো না বটে। অল্প অল্প করে মেঘ ডাকছে। দূরে কোন গাছের পাতায় পাতলা একটু হাওয়ার কান্না। জানলার বাইরে জমাট অন্ধকার। গলা পর্যন্ত চাদরটা টেনে নিয়ে ইন্দিরা বাঁ-কাৎ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

তার মন হালকা হয়ে গেছে—আজকের এই রাতটা পুইয়ে গেলেই সে বাঁচে। ডায়রিটা নেই, অশ্রুকে কাল সে চলে যেতে বলবে—হ্যাঁ বলবেই তো—তারপর সে, তার স্বামী—আর তার সোনার ভবিষ্যৎ। হ্যাঁ, সে বাঁচবে বৈ কি।

এক ঘুম পরে অশ্রু জেগে দেখলো বৃষ্টি হচ্ছে। দেশলাইটা জ্বেলে শিয়রে টাইম্-পিস্-এ দেখলো পাঁচটা বাজে—বৃষ্টি বলে আলো ফুটছে না। আর ঘুমোয় না। জানলাগুলো মেলে দিয়ে সে চেয়ারে পিঠ রেখে পা ছড়িয়ে দিলো। তার মাথায় কি-যেন একটা ভাবনা ঢুকেছে। কিন্তু কোনো ভাবনাই অশ্রু তলিয়ে দেখতে শেখেনি। তবু মনে কে যেন তাকে একটা নাড়া দিয়েছে। সে কি প্রভাতকে সত্যিই এতো ভালোবাসে যে তাকে না পেলে ভাঙ-খোর শিবের মতো সমস্ত ভুবন চষে ফিরবে? সত্যি কথা বলতে কি, এ পাওয়া-শব্দটা নিয়েই অশ্রুর যতো তর্ক, যতো গরমিল। নিয়ম-কানুন দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে যে-পাওয়া সে তো একটা শিকারীর পাওয়া—যেমন চিড়িয়াখানায় বাঘ, কয়েদ-খানায় কয়েদি। পাওয়ার বেলায় যদি দায়ের কথা ওঠে, তবে বিদায়, বন্ধু, বিদায়! পাওয়ার মধ্যে চাই মুক্তি, ফিরে-পাওয়ার সম্ভাবনা। সে-অর্থে নির্মলকেও অশ্রু হারায়নি। দেহ দিয়ে পাওয়াটাই যদি বড়ো, তবে গরম জলে এঁটো মুখ কুলকুচো করে খেয়ে ফেলাও স্বাস্থ্য। এই পাওয়াটাকে কায়েমি করতে গিয়েই বিয়ে হয়েছে ব্যাধি, আইন নিয়ে আয়ান ঘোষই ফুঁসতে থাকেন, রাই আর কানাই গেছে নিধুবনে। দেহ দিয়ে পাওয়ার কথাই যদি ধরো, তবে দেহের স্বাস্থ্যটাও বিচার কোরো। রাত কতটা জাগলে বদহজম হবে, ক' সিঁড়ি ভাঙলে হার্টে ধরবে কাঁপুনি, হিমে কতক্ষণ খোলা গায়ে থাকলে হবে প্লুরিসি, আয়ের দিক থেকে ক'টি সন্তান হবে কামনীয়। প্রভাত বে-হাত হলেই ভেউ-ভেউ করে কেঁদে-ককিয়ে কোনো স্বর্গ লাভ হবে নাকি? বৈধব্যটাই নারী-

জীবনের কৌস্তভমণি! বিধবা হয়েছে বলে শারীরিক প্রক্রিয়া তার কিছুই বাদ পড়ে না, অর্থাৎ যেগুলো তার স্বয়ং-সাধ্য। সন্তানের সুস্থ ও স্বাভাবিক কামনাটাই তার পক্ষে কলুষ। এমন দিনো ছিল যখন মেয়ের বিয়ে না দাও, সমাজ উঠবে নাক সিঁটকে; বিধবা বানাও, সমাজের মুখ বন্ধ। অশ্রুর আশ্রয় খালি প্রভাতের বাড়ির রোয়াকটুকুতেই নয়, সেটুকু কেন্দ্র করে সমস্ত বসুন্ধরা। সে-আশ্রয় থেকে সে যদি বঞ্চিত হয়, তবে, তাই বলে নিজেকেও সে বঞ্চিত করবে না। তার মন তখনো পিয়াসী, দেহ উন্মুখ। সে স্বপ্তি চায় বটে, কিন্তু স্বপ্ন চায় না।

গভীরতাই হৃদয়ের সব কথা নয়; তার চাই বিস্তৃতি, তার চাই ব্যাপকতা। সমুদ্র গভীর বলেই সুন্দর নয়, প্রসারিত বলে। আকাশ মহনীয় তার নিরুত্তর রহস্যময়তায় নয়, তার অনন্ত অবকাশে! মরুভূমি তো প্রকৃতির নিরানন্দ বৈরাগ্যের ছবি, কিন্তু একটি শস্যঋদ্ধ ভূমিখণ্ড তার চেয়ে বেশি সুন্দর। সৌন্দর্যের অর্থ যদি কিছু থাকে তবে তার প্রয়োজনেই। কবির কাছে তা গ্রাহ্য না হোক, কিন্তু ভালোবেসে সংসারি করা আর কবিত্ব করা এক কথা নয়।

প্রেমের মূল্য বিরহে নয় বিহারে, বৈরাগ্যে নয় রাগের দু'রকম অর্থে—রঙ্ আর প্রীতি। তবে খালি প্রেমে খালি-পেট ভরে না বলেই একটু হিসেব চাই—সেইটেকেই যদি বড়ো করে বলি, নীতিশাস্ত্রে তার অতিস্তুতি চলবে। সেইটেই সংযম। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে নয়, দেহতত্ত্বের দিক থেকেই তার কীর্তন হওয়া উচিত। কেননা সংযমেই থাকে সম্ভোগের স্বাদ, জীবনের ছন্দোবদ্ধতা। দেহ যাদের কাছে অশ্লীল, প্রেম ও পরমায়ুও তাদের কাছে মূল্যহীন। কিন্তু অশ্রুর কাছে দেহ হচ্ছে তীর্থ, গিরিস্খলিতা তটিনীর মতো তার চঞ্চল রূপপ্রবাহ—তাই তার চাই অপরিমেয় প্রেম, চাই তার অনবসায়ী আয়ু। এবং এর জন্যেই সংযম শুধু সৌখিন বিলাস নয়, ব্যায়াম—তাতে ক্ষুধায় আসে ধার, দেহে আসে আভা।

দু'মিনিটে অশ্রু মন ঠিক করে নিলো। নির্মলের সঙ্গে দেখা করে তার লাভ হল এই, লাহোরের দিকে আর এগোনো গেল না। তাকে আবার ফিরতে হবে। কলকাতায়ই, ফিরতি-মেল্-এ। প্রভাতের কিছু একটা হয়েছে। আজকে যদি তার কোনো চিঠি বা টেলি না আসে, তবে বুঝতে হবে বেরোবার আগে তার পাঁজি দেখা উচিত ছিলো। আর এখেনে বসে-বসে জিরোবারই বা

কী আছে আর ? ইন্দিরাকে তো সে এক ধাক্কা মেরে সীতা-সাবিত্রীর বেঞ্চিতে তুলে দিয়েছে ! এ তার একটা কীর্তি নয়। সে না হলে ইন্দিরা একা মই বেয়ে স্বর্গে উঠতে পারতো না ; যাতে পড়ে না যায় সেই জন্যে তলায় থেকে তার ভার রক্ষা করতো কে ?

'স্বামী তার কোনো ক্ষতিই করে নি।' অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে নিষ্ঠা ভেঙেছে, সন্তানকে অদূরবর্তী রেখে কাব্যানুরাগের মুখে দিয়েছে ছাই, দেহবীণাকে করেছে ভাঙা কুলো। নিজের ক্ষত ভুললো বলেই হয়তো সে ক্ষতি ভুলেছে। ইন্দিরা বাঁচলো। জীবনের বাকি ক'টা দিন ছেলের জন্যে কাঁথা সেলাই করে ও ধোবার হিসেব ঠিক মতো রেখে যেতে পারলেই সে উৎরে গেলো। তার মরার পর নির্মল যদি একটা ইন্দিরা-নারী-মঙ্গল-সমিতি খাড়া করে চাঁদার খাতা নিয়ে বার হয় তখন ইন্দিরার জীবনী নিয়ে স্তুতিবচনের আর অন্ত থাকবে না, নির্মলের কীর্তিটাও হবে তাজমহলের সঙ্গে তুলনীয় !

চা নিয়ে চাকর এলো না, এলো ইন্দিরা নিজে।

কথা পাড়া মুশকিল। তবু বলতে হল অশ্রুর : তোমার চাকরকে একবার পোস্টাফিসে পাঠাবো, একটা তার করবে। প্রভাতের খবর না পেয়ে ভারি চিন্তা হচ্ছে। যতদিন লোকটা আছে হাতের পাঁচও তারই প্রাপ্য। কি বল ?

ইন্দিরা বললে—ডেকে দিচ্ছি। কিন্তু আটটার আগে ডাক-ঘর খোলে না।

চায়ে চুমুক দিয়ে অশ্রু বললে—তারপর ? চোখে তার দুষ্টু হাসি : রাত্রে বেশ ঘুম হল ?

ইন্দিরাও হেসে বললে—আমার অনিদ্রা বলে কোনো উপদ্রব নেই। আমি না কবি না বা প্রেমিনী।

—কিন্তু প্রেতিনীদের রাত্রে ঘুম আসে না, যেমন আমি।

চট করে আর কি বলা যায় তাই ভাবছিলো। হঠাৎ যেন দু'য়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান নেমেছে। ইন্দিরার বিশ্বাস অশ্রুই ওকে আরেকটু হলে পথে বসিয়েছিলো, অশ্রুর বিশ্বাস তার অতটুকুন এগোতেই ইন্দিরা এ-জন্মের মতো পেলো রেহাই। ভূমিকম্পে বাড়ি যখন পড়লো না, তখন দেয়ালে যে-টুকু সামান্য চিড় ধরেছে তা মেরামত করে নিতে সময় লাগবে না। এ-বাড়িতে ইন্দিরার কুলুবে ঠিক।

টোস্ট চিবোতে চিবোতে অশ্রু একটা বইয়ে হঠাৎ মনোনিবেশ করলে।

ইন্দিরা বললে—যাই। তুমি পড়। উনি সকালে আবার কোথায় বেরোবেন, ওর জন্যে খাবার তৈরি করি গে।

শেষের কথাটা ইন্দিরা অমন জোর করে না বলে গেলেও পারতো। কারু জন্যে সকালে উঠে খাবার তৈরি করাটা বেবিল্‌ন-এর শূন্যোদ্যানের মতো তেমন কিছু নয়। ঘটা করে বলতে হয় বলো, স্বামীকে না ভালোবেসেও পুজো করলাম। পুষি-দিদিও তার স্বামীর জন্যে এমন-সব তপশ্চারণ করে যে, সতীত্বের গুণগ্রাম তাতে বেড়ে গেছে। তার সঙ্গে দশটা ইন্দিরা কুড়ি হাতে পেরে উঠবে না। কিন্তু পুষি-দি পুষি-দি, ইন্দিরা ইন্দিরা। এইটুকুনই তফাৎ। পুষি-দির মনে স্বামীত্বের সমস্যা নেই, তাই তার কাছে ওর আত্মদান আত্মহত্যা নয়। ইন্দিরা তার ঢের পেছনে। আঁচলে আগুন চাপা দিয়ে সে তার মোমের ঘর সামলে চলেছে। তাতেই বা কম কৃতিত্ব কিসে? সে যে অসহায়। তাই বলো, অসহায়—যেমন ডেস্‌ডেমোনা; তাই তার মিথ্যা কথাটাও ঐশ্বরিক!

চাকরকে আর পোস্টাপিসে পাঠাতে হলো না। তার আগেই এলো সকালবেলাকার ডাক। অশ্রুর নামে একটা খাম আছে। প্রভাতের লেখা। অশ্রু খুলে ফেললো :

অশ্রু,

ছুটি পাওয়া গেল না। মার অসুখ সত্ত্বেও না। বৌয়ের অসুখ শুনলে ছুটি মিলতো হয় তো, কিন্তু বৌ কৈ? তাই এ-যাত্রায় আমি রইলাম পিছে। তুমি এখন কী করবে? যাবে না ফিরবে? না থামবে? আমাকে জানিয়ো।

কলকাতার রূপ দেখবে এসো—পুজোর কলকাতা! একটি প্রখরভাষিণী রক্ষশ্রী নগরী। আমি অগত্যা তার প্রেমে পড়লাম।

প্রভাত

ভালোই হ'ল। অশ্রু যেন এমনি একটা খবরের জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলো। তক্ষুনি টাইম্‌-টেবল খুলে দেখলো বিকেলের আগে ফিরতি-ট্রেনের সুবিধা নেই। চাকরকে সে নিজেই ডাকলো। এলো ইন্দিরা। অশ্রু বললে—চাকরটাকে ডাক তো। তার একটা করতেই হচ্ছে।

—কোথায়? কেন?

—প্রভাতকে স্টেশনে থাকতে।

—তুমি আজই যাচ্ছ নাকি ?

—আজই।

—লাহোর কি হল ?

—মানচিত্র থেকে সরে পড়েছে।

—কলকাতায় যাবার এত তাড়া ?

হেসে অশ্রু বললে—আমার বিয়েটা পাকাপাকি করতে।

ইন্দিরার মুখ গম্ভীর : পাকাপাকির আর বাকি কি ?

—একটু বাকি আছে বৈকি। তোমার মতন যদিও শিগগির পাকছি না। যাক, জিনিস-পত্র গুছিয়ে ফেলতে হয়। বলে, অশ্রু চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত পা ছড়িয়ে একটা হাই তুললো।

ইন্দিরা বলল—একেবারে আজই যেতে হবে ?

—তোমার সাধ খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবার সময় নেই। যা হোক, মনে খুব সুখ নিয়ে যাচ্ছি ইন্দিরা, তুমি স্বামী পেয়ে এতদিনে সুখী হয়েছ। মানে, হচ্ছ। মানুষ বদলাবে না, এটা বাড়াবাড়ি—বদলানো মানেই বৃদ্ধি। রমাপতি চিরকাল ভূত হয়ে কাঁধ জুড়ে থাকবে—ভবিষ্যৎকে এমন সংকীর্ণ করে রাখার পক্ষপাতিত্ব আমার নেই। তুমি তোমার খ্যাতি ও ঐশ্বর্য নিয়ে মহত্তর হও। ভাষায় বেশ মুন্সিয়ানা হচ্ছে, না ? বলে, অশ্রু তার ব্যাগ গুছোতে বসলো। মুখে তার গুন্‌গুনানো চলেছে। এটা নাড়ে ওটা ফেলে এটা খোলে ওটা গুটোয়।

ইন্দিরা বললে—সত্যি তাই, অশ্রু। যে-পরিবর্তন জীবনে স্বীকার করলাম তাকে যেন কায়মনে অভিনন্দিত করতে পারি। সত্যি তাই।

অশ্রুও পুনরুক্তি করলো : সত্যি তাই। যেখানে শেষ সেইখানেই শুরু। জীবনের চাকা খালি ঘুরে চলেছে। সাধু ইন্দিরা, সাধু।

নির্মলকে সকালের ট্রেনে নাইনি যেতে হয়েছিলো। ফিরলো সন্ধ্যার একটু আগে। বারান্দা দিয়ে নিজের ঘরে আসতে সে অশ্রুর ঘরের দিকে চোখ না ফেলে থাকতে পারলো না। দরজাটা বন্ধ। বাইরে থেকে শেকল।

ইন্দিরা কালকের মতোই জলচৌকিতে বসে স্টোভে লুচি ভাজছে। নির্মল কাছে এসে শুধোল : অশ্রু ?

—বিকেলের ট্রেনে কলকাতায় চলে গেলো।

—গেলো ?

নির্মলের প্রশ্নের স্বরে বিস্ময় আর হতাশা! কেন গেলো—প্রশ্নটা যেন সমীচীন হতো না। টাই-পিন্‌টা নাড়তে নাড়তে পরদা সরিয়ে সে ঘরে ঢুকলো।

ঘরটা যেন কেমন স্যাঁতসেঁতে। কেমন যেন খালি-খালি। ঐ চেয়ারটায় যেন কি ছিল! যেন বড়ো বেশি স্তব্ধ। দেয়ালগুলো অতিমাত্রায় স্থির। টেব্‌লের ওপরকার বইগুলো বোবা। বাগানে রজনীগন্ধার একটি কলিরো ঘুম ভাঙেনি।

বাথ-রুম্‌ থেকে স্নান সেরে ঘরে এসে দেখলো সামনে ইন্দিরা—টেব্‌লের ওপর খাবারের ডিস, চায়ের কাপ গুছিয়ে রাখছে; চুল আঁচড়ালো, জামাটা গায়ে দিলো, সিগারেট্‌ ধরালো। এখ্‌নিই তাকে খাবার খেতে হবে। খাবার খেয়ে বই-খাতা-ম্যাগাজিন্‌গুলো নিয়ে বসতে হবে। সবই ঠিকঠাক্‌। চুপচাপ তেমনি।

না।

দু' পা হেঁটে ফিরে সে ইন্দিরার দিকে তাকালো। ইন্দিরা আজ দারুণ সেজেছে—তবু বোকার মতো যে খোলা-চুলে গিঁট বেঁধে রজনীগন্ধার কলি আটকায়নি, নির্মলের সৌভাগ্য। ইন্দিরা যেন মূর্তিমতী শান্তি, কিন্তু শান্তির মাঝে কি শ্রান্তি থাকে না? ইন্দিরা মূর্তিমতী দিৎসা, কিন্তু দানের অকৃপণ ইচ্ছার মাঝে কি দারিদ্র্য নেই?

চেয়ারে বসে নির্মল শুধোল : হঠাৎ চলে গেলো? তুমি বুঝি কিছু বলেছিলে?

—আমি আবার কী বলতে যাবো?

—তবু এত সাত-তাড়াতাড়ি পাড়ি মারলো?

—সকালের ডাকে কি-এক চিঠি এলো, অমনিই দে-ছুট।

—যাবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে গেলো না?

একটু স্তব্ধতা! নির্মল রাশীকৃত খাবার ফেলে ছোট একটি আপেলের টুকরো দাঁতে কাটলো।

—কেন চলে যাচ্ছে কিছু বলে গেলো না? ওদের তো একত্র হয়ে আরো আপ-এ যাবার কথা শুনেছিলাম। কিছু জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

—আমার এমন কী গরজ পড়েছে?

নির্মল বিরক্ত হল : বা, তোমার বন্ধু, তোমার বাড়িতে অতিথি। কেন হঠাৎ চলে যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করতে হয় না ?

নিচের ঠোঁটটা উল্‌টে ইন্দিরা বললে—ছাই বন্ধু। অমন মেয়ের সংস্পর্শ থেকে সরে থাকা উচিত।

কিন্তু এমন কথায়ো স্বামী আশ্বস্ত হলেন না : সরে থাকা উচিত মানে ? এমন একটি মেয়ে তুমি আর কোথাও দেখেছ ? বিংশ শতাব্দীর মৈত্রেয়ী। যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্ ?

কথার স্বরটা বিদ্রূপের হয় তো, কে জানে, প্রত্যুত্তরে ইন্দিরা জোরে হেসে উঠলো। হাসিটা কৃত্রিম, কর্কশ।

চায়ে চুমুক দিয়ে নির্মল বললে—রাস্তার জন্যে খাবার তৈরি করে দিয়েছ তো ?

—রাস্তায় খাবার খাওয়াটা তো বর্বর প্রথা।

—হোক, দিতে চেয়েছিলে ?

—না।

—স্টেশনে তুলে দেবার জন্যে সঙ্গে বিমলকে পাঠিয়েছিলে ?

—বিমল কোথায় ! গেছে খেলতে।

—কিন্তু রামসেবক তো ছিল।

—ঘরে তখন কতো কাজ।

—কাজ মানে ?

—কাজ মানে কাজ। এবার ইন্দিরার চটবার পালা : এতো যখন দরদ তখন নিজে এসে ব্যাগটা গাড়িতে তুলে দিলেই তো পারতে। এইটুকু পথ তো স্টেশন। হেঁটেই চলে গেলো।

—হেঁটেই চলে গেলো ? একটা টাঙা পর্যন্ত ডাকিয়ে দাও নি ? খাবারের ডিস্‌টা ঠেলে দিয়ে নির্মল দস্তুরমতো গালাগাল করলে : বর্বর আর কাকে বলে ? এতটুকু সৌজন্য তোমার নেই ?

কটু স্বর হয় তো ইন্দিরার মুখ দিয়েও বেরোত, কিন্তু সে সংযম অভ্যাস করছে। এখানে আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে তার পা টলবে—তাড়াতাড়ি সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

হঠাৎ নির্মলের মর্মমূল ধরে কে নাড়া দিল—অশ্রু তবে কেন এসেছিল—কেন ? সে নিজে অবশ্যি তার স্বামিত্বের আসনে অটল থেকে অশ্রুকে হটিয়ে

দিয়েছে। তার মধ্যে বাহাদুরি কী, কিন্তু অশ্রু যে এসেছিল, আসতে পেরেছিল —তার মধ্যেই বাহাদুরি। সে তো ভয় পেয়ে ধার্মিক সেজেছিল, কিন্তু অশ্রু তো ভয় পায়নি, ধার্মিক সাজেনি—তবে ওর ভালোবাসা কি আজো বেঁচে আছে? জানলার বাইরে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল নির্মল। তার বিবাহের বাইরে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা কি আর বেঁচে নেই?

ইন্দিরা ঢুকলো এসে শোবার ঘরে। ধপাস করে দরজা বন্ধ করলে। ছি ছি, সে আবার ঘটা করে তার পাতিব্রত্যের বিজ্ঞাপন দিতে বেরিয়েছিলো! ইন্দিরা এক ঝট্‌কায় তার শাড়ির আঁচলটা বিস্রস্ত করলে, খোলা চুলগুলো উস্কখুস্ক করে দিলে। এ-অবস্থায় কাঁদলে বুঝি ইন্দিরাকে মানাতো। কিন্তু সে তার খাটের ওপর শুয়ে পড়ে শূন্য চোখে সিলিঙ দেখতে লাগলো।

কিন্তু হাল যখন সে একবার ধরেছে তখন সহজে তার মুঠি সে আলগা করবে না, শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে থাকবে। নৌকো যদি ডোবে ডুববে, কিন্তু চরম দুর্ঘটনার দিনে সে বলে যেতে পারবে যে, সমানে সে হাল ধরে ছিলো। না, তার অভিমান করবার মানে হয় না। অভিমান করে কী-ই বা সে করবে? বেরিয়ে পড়বে? কার সঙ্গে! হঠাৎ শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের অন্নদাদিদির কথা মনে করে সে একটু হাসলো। শরৎচন্দ্র ভারি চালাক—সাহসও দেখাবেন, সমাজকেও চটাবেন না—এই তাঁর সাহিত্য-রচনার শস্তা কৌশল। অন্নদাদিদি ঘর ছাড়লেন, কিন্তু যার সঙ্গে পথে নামলেন সে মুসলমান সাপুড়ে নয়, সে তাঁর স্বামী! জীবানন্দ নারী-মাংসের লোভে চণ্ডীগড়ের ভৈরবীকে ঘরে পুরলে, কিন্তু সেই হল তার অলকা—লোকের খুঁৎখুঁৎ করবার কারণ ঘুচলো। অচলা সুরেশের সঙ্গে ঘর ছাড়লো, কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়—সুরেশ তাকে একটা কায়দা করে লুফে নিলো ট্রেনের কামরায়। শরৎচন্দ্র ব্যক্তিত্বের দিকে না তাকিয়ে সমাজের মুখ চেয়েছেন খালি। শুধু এক কিরণময়ী। সে স্বেচ্ছায় উপেনের হাতে নিজেকে উপহার দিতে চেয়েছিলো, প্রত্যাখ্যাত হয়ে তার ছোট ভাইকে নিয়ে রেঙ্গুনের জাহাজের বন্ধ কামরায় ঝড় তুললে। কিন্তু অনুদার সমাজতান্ত্রিক শরৎচন্দ্রের হাতে পড়ে সে হল পাগল, সে হল ব্যাধি-বিজ্ঞানের একটা খেলো নিদর্শন মাত্র।

বেরুবার পথ ইন্দিরার বন্ধ—একটি ঘুলঘুলিও কোথাও নেই! পেটে তার

ছেলে। ইব্‌সেনের নোরা ছেলে-মেয়ে, পুতুল পূজা—সব-কিছু ফেলেই পথে পা দিলো কিন্তু। দিক, নরোয়ে আর বাঙলা দেশ এক নয়—যেমন কাছাকাছি নয় ইব্‌সেন ও শরৎচন্দ্র। এমন কেউ নেই যে যার সঙ্গে বেরুলে দৈনিক খবরের কাগজগুলো খেঁকাবে না। যদি ধরা যেতো রমাপতিই তার স্বামী, নির্মলের কাছে সে বন্দিনী—রাবণের কাননে সীতার মতো—সে এই পাপপুরী ত্যাগ করে স্বামী-অভিসারিণী হল, তা হলে হয় তো সমাজ খুশি হয়, শরৎচন্দ্র খুশি হন। কিন্তু রমাপতিই যে তার স্বামী এ-কথা সমাজকে বোঝাবে কে? অতএব তা থাক। সমাজের সঙ্গে বিরোধ ঘটাতে ইন্দিরা বসেনি, তার সে উদ্বৃত্ত সামর্থ্য নেই, নেই বা সে তেজ। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যেই সে নিজেকে ছেঁটে-কেটে খাটো করে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আত্মহত্যা! আবার সেই বাধা। পেটে তার ছেলে। তা ছাড়া আত্মহত্যা করলেই কি জ্বালা জুড়োয় নাকি? মৃত্যু সম্বন্ধে এমন একটা মিথ্যা কল্পনায় কত লোক সেখানে গিয়ে দেউলে হল কে তার হিসেব রাখে? তা ছাড়া নিজের হাতে নিজেকে মারবার মধ্যে যে একটা প্রচণ্ড বীভৎসতা আছে তার কুশ্রীতা দুর্বিষহ। সে-কথা ভাবলেও তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র কুঁকড়ে আসে। আত্মহত্যাই যদি সে করতে পেতো তা হলে এ-অভিনয়ের এত সাজ-সরঞ্জাম করতে গিয়েছিলো সে কি ভেবে? সে সংসার-স্রোতে গা ভাসাবে। এখনো আশায় সে ফতুর হয়নি।

অতএব এখন তার খাটের ওপর শুয়ে-শুয়ে অলস চিত্তবিনোদনের অবসর নেই। শাশুড়ি সেই যে কাশীতে গেছেন কবে ফিরবেন কেউ জানে না। সংসার এখন ওর হাতের তালুতে, উপুড় করলেই উলটে পড়ে। ঠাকুরটাকে রান্না দেখিয়ে দিতে হবে। কালকের পুনর্জীবন-লাভকে উৎসব-রমণীয় করবার জন্যে সে আজকে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলো। এ-উৎসব অশ্রুকে বাদ দিয়েই। উৎসব সমাধা না করবার কোনো মানে নেই। পাড়ার কয়েকটি মহিলাকে সে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে। তারা এখুনি এসে পড়বে। মিলি আনবে তার এস্রাজ, বীণার বৌদি অংশুমালা বাজাবেন অর্গ্যান। ইন্দিরা অর্গ্যানটা কত দিন ছোঁয়নি। এখন ওঠা যাক, ন্যাকামো ঢের হয়েছে। যার প্রতিকার নেই তার প্রতিবাদ করবার লজ্জাটা আরো অমানুষিক। এখন না উঠলে নিমন্ত্রিতাদের উপযুক্ত বরণ করা হবে না।

আলো জ্বালিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ইন্দিরা চুল আর আঁচল ঠিক

করতে বসলো। অশ্রু নির্মলের চোখে কুজ্ঝটিকার জাল বুনে গেছে। কিন্তু রমাপতি যেন তার শ্মশানশয্যা থেকে উঠে না আসে। রমাপতিই অনাহূত, অবাঞ্ছনীয়—অশ্রুর জন্য খোলা দুয়ার, মুক্ত আতিথেয়তা।

বড় দুঃখে ইন্দিরার মনে পড়লো পাগল হয়ে নীট্‌শে পাগল ষ্ট্রিণ্ডবার্গকে কি চিঠি লিখেছিলেন :

আমি একটি দিন ঠিক করেছি। সে-দিন ইউরোপের সমস্ত রাজা উপস্থিত হবেন। আমি তাঁদের মারতে আদেশ দেব।

বিদায়। আবার আমাদের দেখা হবে।

কিন্তু এক শর্ত। আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ করতে হবে।

নীটশে সীজার্

পাগল ষ্ট্রিণ্ডবার্গ উত্তর দিলেন :

ইতিমধ্যে এস উন্মত্ত আনন্দ করে নি। বিদায়।

তোমার ষ্ট্রিণ্ড্‌বার্গ

সবোত্তম ও সর্বোচ্চ বিধাতা

নীট্‌শের উত্তর :

যথেষ্ট। চাই শুধু বিবাহচ্ছেদ।

'The Crucified'

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে-হতে বারোটা।

নির্মলের সঙ্গে ইন্দিরার নিভৃতে দেখা হল বারান্দাতেই। নির্মল শোবার ঘরে না ঢুকে বসবার ঘরের দিকে মুখ করেছে। ইন্দিরা বললে—রাত অনেক হল।

নির্মল বললে—জানি।

—শুতে যাবে না?

—যাবো। এখনো আরো কয়েকটা কাজ সেরে ফেলতে হবে। কিন্তু আজকে হঠাৎ এত ঘটা কিসের?

—এসো শোবার ঘরে, বলছি।

—এখেনে বললে রাতের অন্ধকার ঘনতর হয়ে উঠবে না।

ইন্দিরা জীবনে আরেকটি সুযোগ হারালো। নির্মল যদি ঘরে আসতো, তা হলে দৃষ্টিকোণ ছোট হয়ে উঠতো বলে তার অভিনয়োচ্ছ্বাস বেমানান হত না। পতিভক্তি নাটকের পঞ্চাঙ্কের অবশ্যম্ভাবী শেষদৃশ্যটির সে এতক্ষণ মহলা দিয়েছে।

কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আকাশ ও আকাশের তারা দেখা যায় সেখানে এতো বড়ো একটা ব্যঙ্গভূয়িষ্ঠ নাটক করতে হাত-পা তার একটুও নড়তে চাইলো না। তবু এখানে দাঁড়িয়েই তাকে বলতে হল: কাল তোমাকে পরিপূর্ণ করে গ্রহণ করেছি, নিজেকে দানও করেছি মনের মত করে পরিপূর্ণ আত্মপ্রসাদে। এই জন্যেই আজকের এই উৎসব। ভেবেছিলুম ঘরে এলে তোমাকে আরো ভালো করে বুঝিয়ে বলবো। কথা দিয়ে সব জিনিস প্রাঞ্জল করা যায় না।

নির্মল এ-কথার ধার দিয়েও গেলো না। বললে—এমন একটা উৎসব করবে অথচ বিকেল বেলায়ই অশ্রুকে বিদায় করলে? অন্তত আজকের রাতটার জন্যে তাকে তুমি ধরে রাখতে পারলে না?

ইন্দিরার হৃৎপিণ্ডে কে যেন হাতুড়ি চালালো: আমি তাকে ধরে রাখবো কি করে? সে যেমন জেদি মেয়ে তাকে ঠেকায় কার সাধ্য!

—তুমি নিশ্চয়ই তাকে কটু কথা বলেছ।

—আমি বলতে যাবো কোন্ লজ্জায়? কাল রাত্রে অপমান তুমি তার কম করেছ নাকি?

—আমি করেছি অপমান? তুমি বললেই হল?

—হ্যাঁ, আমি বললেই হল। বিবাহিত ভদ্রলোকের লুকোনো মনোবৃত্তি টের পেয়ে সে লজ্জায় মুখ ঢেকে সম্ভ্রম বাঁচিয়েছে।

—কি বললে?

ইন্দিরার সকল প্রতিজ্ঞা গেলো ভেসে: ঠিকই বললুম। তোমার চরিত্রগর্ব আত্মম্ভরিতার ভান মাত্র। এ-লজ্জা খালি আমার নয়, অশ্রুর মতো মেয়েরো। বলে, ইন্দিরা তাড়াতাড়ি তার নিজের ঘরে এসে দুয়ার বন্ধ করে দিলো।

এবার স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে প্রভাত। এলাহাবাদে গিয়ে মিলিত হওয়ার চেয়ে অশ্রুর ফিরে আসার মধ্যে চমৎকারিত্ব বেশি আছে, কেননা শেষেরটা অপ্রত্যাশিত। যা কিছু চাওয়ার বাইরে তার পাওয়ার মধ্যে একটু চমক থাকে—কবিতায় আনকোরা ও অব্যবহিত-পূর্ব মিল পেলে মানেটা আরো ধারালো হয়ে ওঠে। বায়রনের Don Juan-এর চমকপ্রদকতা কতকটা সেই কারণে। বিষয়বস্তুটা খেলো, খোলসটাতেই তার জৌলুস। মানুষের

সভ্যতাটাও তাই। লৌকিক ব্যবহারে সে বিলাস চায়, জীবনে নয়। কাজের মানুষ তারাই যারা আর্টিস্ট-হিসেবে নিতান্ত খাটো ; তারা আত্মপ্রকাশ করে সৃষ্টিতে নয়, পরাধিকারে অকারণ হস্তক্ষেপ করে। প্রেম বা বন্ধুতা নিয়ে তাদের তৃপ্তি নেই, না বা More-এর Utopia-য়, তাদের চাই শক্তি-প্রসার, তারা চায় পরের চরকায় নিজেরা তেল যোগাবে। তারা রাজ্য গড়ে, শান্তি ভাঙে— সত্য না চেয়ে চায় নিরাপত্তি। পুলিশকে কে সভ্য বলবে? তবু তারাই হল সভ্যতার বাহন। একনিয়মের বশবর্তিতার অর্থই সভ্যতা। তুমি তোমার শিরদাঁড়া খাড়া করে উঁচু হয়ে দাঁড়াও, লিলিপুটের দেশের লোকেরা মই বেয়ে তোমার ঘাড়ে চেপে কান মলতে চাইবে। বলবে : সভ্য হতে চাও তো পিঠ কুঁজো করে আমাদের সঙ্গে মাথা মেলাও। তুমি যেখানে সৃষ্টি করবে সেইখানেই তুমি সভ্য নও, তুমি যখন সে-সৃষ্টির গুণ গ্রহণ করবে তখনই তুমি সভ্য। সত্যের নবাবির্ভাবের দিনে যদি আহত হয়ে আঁৎকে ওঠ, বুঝতে হবে তোমার বিচার-বুদ্ধিতে মর্চে ধরেছে। 'সীতা' শুনে কান্না পায় বলেই শিশির ভাদুড়ি বড় অভিনেতা, এ-উক্তিটা সভ্যতার পরিচয় নয়, বা সীতা-সম্বন্ধে 'ঘরে বাইরে'তে সন্দীপের উক্তিটা মোলায়েম নয় বলেই তাকে গালি পাড়াটাও বর্বরতা। পরকে মেনে নেবার sense of humour-টাই হ'ল সভ্যতার মাপকাঠি। 'চরিত্রহীনে'র উপেন চরিত্রগর্বে এতো হীন ও কাপুরুষ যে সতীশের ঘরে সামান্য একটা শাড়ি শুকোচ্ছে দেখেই সে পিট্টান দিলো। এমন একটা মেরুদণ্ডহীন মূর্খকেই কি না শরৎচন্দ্র সতীশের foil বলে দাঁড় করিয়েছেন। নিজের নিজের মানসিক ও বুদ্ধিগত অকর্মণ্যতাকেই নিরীহ মানুষ বড়ো করে তার নাম রাখে নীতি, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার। বালক ডিজরেইলির জু হয়ে কম লাঞ্ছনা হয় নি—রাস্তায় বেরোল সে হল্‌দে পায়জামার লাল কুর্তা এঁটে। অতএব সে ইতর। শবদেহ সমাজে ব্যাধির সৃষ্টি করে, কিন্তু শবদেহ কেটে-কুটে ছিঁড়ে-ফেড়ে তার সদ্গতি না করলে ব্যাধি-নির্ণয়ই চলতো না। সাপ আমাদের দংশন করে বলেই তা কুৎসিত, কিন্তু প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে ওর চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই—তা ছাড়া ওর বিষে নাকি পচা ঘায়ের ওষুধ হয়।

আমি আছি—এর চেয়ে বড়ো জ্ঞানাবিষ্কার মানুষের আর কী হতে পারে? শুধু জীবনে নয়—জীবনের অনুকৃতি যে সাহিত্য—তার মাঝেও মানুষের কায়দা-কানুনের বাঁধা গৎ আছে। সেই গৎএ সুর মিলিয়ে ভাষাযোজনা করতে হবে।

উপন্যাস লিখতে বসেও সেই এক নিয়ম ; চাই একটা সুসম্পূর্ণ প্লট, কথোপকথনের প্যাঁচ, একটা অতি-প্রত্যাশিত আকস্মিকতা। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর 'গোরা'য় বিনয়ের বাড়ির সামনে পরেশবাবুর গাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে প্রথম আলাপের সূত্রপাত করলেন,—লাবণ্য ও অমিতের মোটরে একটা সজ্ঘর্ষ লাগছিল আরেকটু হলে। এগুলি অত্যন্ত মামুলি প্রথা, আমাদের অভ্যস্ত পাঠকের তা মুখস্থ হয়ে আছে। ছাঁচে ফেলে চরিত্রকে একটা নমুনায় রূপান্তরিত করতে হবে, স্বপ্রধান ও সীমাবদ্ধ একটা ব্যক্তি করতে নয়। গল্প হলেই চাই তার ঘটনা, চাই তাব সমাপ্তি, কবিতা হলেই চাই তার একটা বোধ্যতা। দূরের তারাকে আমার চোখে যদি হলদে লাগে, অন্ধকারকে লাগে যদি নীল, তবুও আমাকে লিখতে হবে শাদা তারা, কালো আঁধার। যদি বলো লুভার্-এ Phedias-দেবীদের মুণ্ডহীন মূর্তিগুলির সৌন্দর্য তাদের গঠনগৌরবে বা ভঙ্গি-সুষমায় নয়, তাদের মুণ্ডহীনতায়, তবে সমসাময়িক সমালোচনাও হবে চামুণ্ডা। লোকের মুখ চেয়ে সত্য আমার কাছে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে না, এ সত্য কথা বোঝাই কাকে ? বস্তুতান্ত্রিকতা এককালে সাহিত্যরচনার ফ্যাশান ছিলো—যেমন ধরো জোলা, আরো আগে যেমন ধরো জেইন অস্টিন। কিন্তু হুবহু বলতে গিয়ে বহু বর্ণনাতেই ব্যক্তির সত্য পরিচয় ধরা পড়ে না, তা হলে 'পথের পাচালি'ও একটা উঁচু-দরের নভেল হত। আগে নিয়ম ছিলো : বিষয় ও ব্যক্তি নির্বাচন করো ; এখন নিয়ম হোক : কিছুই অনির্বাচিত রেখো না। ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম থিয়োরেম নিয়েও কবিতা হয়, গ্রাম্য গৃহস্থবধূর বর্ণচ্ছটাহীন সোজা সাধারণ জীবন নিয়েও বারো খণ্ডে উপন্যাস হতে পারে। মানুষের সত্যিকার জীবন তার জীবনের ব্যবহারে নয়, জীবনের অন্তঃশীল অবচেতনায়। তুমি চাঁদ দেখে কি ভাব সেইটেই তোমার জীবনে সত্য, তুমি চাঁদ দেখে হাত বাড়িয়ে তাকে ডাক কি না সেইটে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। শেহভ এ-কথা বুঝেছিলেন ; তাই তাঁর নাটকে চিন্তাই হচ্ছে ক্রিয়া, দ্যোতনাই হচ্ছে সম্পাদিত ক্রিয়ার চেয়ে বড়ো সত্য।

উপন্যাসকে আমরা ব্যবহারিক জীবনের একটা প্রতিফলন করে তাতে রঙ্ চড়াতে চাই ; নায়ককে করতে চাই বীর, অনন্ত মহনীয়—হয় তার ভয়াবহ সচ্চরিত্রতায়, নয় দুর্দম বলিষ্ঠতায়, নয় বা তার জঘন্য হীনবৃত্তিতে, যাতে সে লোকের ঘৃণা কুড়োবে, নয় বা সহানুভূতি। হয় প্রতাপ, নয় গোরা—বা কিরণময়ী

বা দেবদাস। এমন লোক খুঁজি না যে মুদির দোকানে দু' বেলা হিসেব রাখে, তামাক খায় আর তাস খেলে। এমন লোক খুঁজি না যার জীবনে দুর্ঘটনা নেই, সম্ভাবনা নেই। একঘেয়েমিই যে জীবনের প্রতিপাদ্য সত্য, সাহিত্য তা বিস্মৃত হয়েছে। ঔপন্যাসিকদের বিশ্বাস করে নেপোলিয়নকে আমরা চিরকাল বলদৃপ্ত বীরপুরুষ বলেই পুজো করে সুখ পেতুম, কিন্তু লুড্উইগের কাছে নেপোলিয়নের জীবনের কবিত্বটাই বড়ো বলে দেখা দেয় নি। নেপোলিয়ন যে খালি যুদ্ধ জয় করে নি, ভালোও বেসেছে, এ সত্য কথাটা আমাদের কাছে এতো দিন লুকোনো ছিলো। আঁদ্রে মরোয়া শেলিকে দেখলেন প্রমিথিউস্ আন্‌বাউণ্ড বলে নয় : ফ্রান্সে ওয়ার্ডসোয়ার্থের নাকি একটি জারজ শিশু ছিলো। গান্ধি যে এককালে চামড়ার মানুষ ছিলেন ভারতবর্ষের ভবিষ্যত বংশধরেরা হয় তো তা ভুলে যাবে। মুসোলিনি যে এককালে ভিক্ষা করতো একথা ক'টা লোক মনে রেখেছে ?

তুমি যা তুমি তাই—তুমি ঘুরে-ঘুরে বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে না পার, সোজাই চলে যেয়ো, পরের হাত ধরে নিরাপদ হবার জন্যে তবু বেঁকো না। তুমি যা তুমি তাই। তুমি তোমার নিজের নায়ক হও। কি তোমার করা উচিত—তার চেয়ে কি তুমি কর, তাতেই আমাদের বেশি অনুরাগ, বেশি কৌতূহল। পরের জুতোয় পা ঢুকিয়ে তুমি চলবার বেগ হারিয়ো না, পরের আদর্শ তোমার পক্ষে আত্মঘাতী। তুমি নিজে যা তুমি তাই : জীবন যেমনি ভাবে আসে তেমনি করে নিলেই তুমি অবিনশ্বর।

ট্রেন লেট হয় নি—প্রভাতই আগে এসেছে। ভাগ্যিস আজ রবিবার, রোদ উঠে গেলেও কেরানিরা এখনো ওঠে নি—আজ সকালে তাদের নিদ্রোৎসব চলেছে। আপিস যেতে হবে না—এটার স্বাদ অশ্রুর আসার চেয়েও মিষ্টি। এঞ্জিনটা প্লাটফর্মে এত জোরে প্রবেশ করলে, যেন তার যে এখানে থামতে হবে তা তার মনেই নেই একেবারে। অশ্রু নেমে এলো, মাথার চুল রুক্ষ, চোখ দুটি ঘুমো-ঘুমো, এঞ্জিনের কয়লায় জামা-কাপড়গুলি অপরিচ্ছন্ন। সজ্জা সম্বন্ধে অশ্রুর এ-অমনোযোগটি প্রভাতকে স্পর্শ করলো—অন্তত মুখটাও সে ধোয়নি। চেহারাটির মধ্যে মধুর একটি মালিন্য আছে। প্রভাতকে দেখতে পেয়েই অশ্রু একটু হাসলো—হাসিটিও তীক্ষ্ন নয়, কেমন-যেন একটু চাপা, ফ্যাকাসে। যেন আর চটুলতা নয়, অন্তরময়তার সূক্ষ্ম একটি ইসারা। প্রভাত গেলো এগিয়ে।

ট্যাক্সিতে উঠে বাঁচা গেলো। অশ্রু বললে—ভালোই হল ফিরে এসে। বলে তার একখানি হাত প্রভাতের কোলের ওপর রাখলো।

প্রভাত হাতের উপর হাত রেখে বললে—কোথায় যাবে এখন ?

অশ্রু অবাক : বা রে, কোথায় আবার যাবো ? বাড়ি !

বিস্ময় প্রভাতেরো কম নয় : বাড়ি ! সেখানে তো তোমার দুয়ার বন্ধ।

—সে-বাড়ির কথা কে বলেছে ? তোমার বাড়ি কি ঝড়ে উড়ে গেছে নাকি ?

—আমার বাড়ি !

অশ্রু অভিমান করতে জানে : ও ! জানতাম না যে, আমি তোমার পর, আমাকে তুমি দূরে সরিয়ে রাখতে চাও।

অশ্রুর এ কি অভাবনীয় পরিবর্তন ! চোখ দু'টিতে গভীর মৌন, মুখচ্ছায়ায় একটি অস্পষ্ট কাকুতি ! প্রভাত তাকে নিজের আরো কাছে ঘন করে আকর্ষণ করলে। ক্ষণেকের জন্যে যেন হিসেবে সবগুলি অঙ্ক মিলিয়ে গেলো, সকল লজিক্‌কে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেখা দিলো ম্যাজিক। বললে—নিশ্চয়ই যাবে, আমার মা তোমারও মা।

ক্ষণতরে ঘনতার বিস্ফোরণ ঘটল একটি পরিপূর্ণ চুম্বনে।

প্রভাতের পশ্চাদ্বর্তিনী একটি অপরিচিতা মেয়ে দেখে মা প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেন। বুঝে নিতে দেরি হ'ল না এই-ই অশ্রু, যার জগদ্ব্যাপিনী খ্যাতি—সম্প্রতি যিনি তাঁর ছেলের পশ্চাদ্ধাবন করছেন। তাঁর ছেলেকে এ-মেয়ের যে কেন পছন্দ হ'ল বলা কঠিন—উল্টো প্রশ্নটা তাঁর মনে ঘেঁষতেই পারলো না, কেননা, প্রথম দেখাতেই তিনি ঠিক ধরে নিতে পেরেছেন যে, বয়সে অশ্রু তাঁর ছেলেকে ছাপিয়ে গেছে। যদিও অশ্রুর বয়স তেইশ, মার কাছে মনে হচ্ছিলো তেত্রিশ। বেশ ঢ্যাঙা, স্বাস্থ্যবতী। বাহু দু'টি সুডৌল, আঙুল ক'টি সুঁচলো। চোখ দু'টি গভীর। মুখে নানান্ রকম খুঁত, কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন যেন ঢলঢলে।

কিন্তু কিছু একটা ভেবে নেবার আগেই অশ্রু মায়ের পায়ের কাছে উবু হয়ে প্রণাম করলো—সভক্তি প্রণাম। মা ওর খোঁপার ওপর হাত রেখে

আশীর্বাদ না করে পারলেন না। দুই চোখে স্নিগ্ধ নম্রতা নিয়ে সে বললে—আমাকে তুমি চিনতে পাচ্ছ না, মা? আমি অশ্রু।

—খুব চিনেছি, মা। এসো ভেতরে। ট্রেনে খুব কষ্ট হয়েছে বুঝি?

হেসে অশ্রু বললে—কষ্ট আমার কিছুতেই তেমন হয় না। আমি তেমন-দরের মেয়ে নই মা, যে, আত্মকর্তৃত্বে চলা-ফেরা করবো অথচ বাস-এ কিংবা ট্রামে উঠে কোনো পুরুষের জায়গা ছেড়ে দেবার আশায় কাঙালের মতো দাঁড়িয়ে থাকবো। সে যদি জায়গা ছেড়ে দেয়-ও আমি তাতে বসি না। আমি সেধে অপমানিত হতে চাই নে। দিলদারনগরে এমনি কাণ্ড ঘটেছিল, মা। গাড়িটা একদম ঠাসা। মেয়েছেলে দেখে একটি ছোকরা ভদ্রলোক জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কী আপ্যায়িতই না করতে লাগলেন। কিন্তু আমি তাঁর ঐ অকৃপণ বদান্যতা নিই কি করে? আমি বড্ড বেশি বাজে বকি, না? আমাকে তুমি যে কী ভাবছ কে জানে! তোমার সমস্ত কাজ যে এখনো পড়ে আছে। তরকারি কুটছিলে? ও কি, বিছানা এখনো তোল নি? অশ্রু বিছানাটা তুলতে ব্যস্ত হল।

মা বাধা দিয়ে বললেন—তুমি এসব করছ কি? এখন একটু জিরোও। চান করবে? না, এখন না-হয় মুখহাত ধুয়ে একটু বোস, আমি তোমাকে চা করে দিচ্ছি।

অশ্রু একেবারে আকাশ থেকে পড়লো: তুমি চা করে দেবে কি মা? আমি কি তোমার তেমন মেয়ে নাকি? আমি এখনো এত শিক্ষিত হই নি মা, যে চা বানানো, ঘর ঝাঁট দেয়া, তরকারি কোটা বা বাসন-মাজায় একেবারে ফেল্ করে যাবো। তুমি যদি আমার জন্যে অকারণে ব্যস্ত হও, তা হ'লে বুঝবো তুমি আমাকে মেয়ের মতো স্নেহ দাও নি। আগে চানটাই আমি সেরে নি। (প্রভাতকে) তুমি ততক্ষণ একটু দাঁড়াও, এসে আমি চা করছি।

অশ্রুর প্রতি মা'র মন বরাবরই বিমুখ ছিল। কিন্তু নদী এখন উজোন! তিনি ভাবতেন আজকালকার পড়িয়ে মেয়ে, নয়কে হয় করাই ওদের ব্যবসা। সরু লিকলিকে চেহারা, রঙ্ ফ্যাকাসে, পিঠ কুঁজো, মেজাজ টেড়া, কথাবার্তা চিবোনো-চিবোনো—এমনি ধরনের একটা আজব চেহারা তাঁর মনে চিরকাল ধরা ছিল। কিন্তু অশ্রু শ্রীমতী, দেহ ভরে তার স্থির স্বাস্থ্য, শাড়ি পরার ভঙ্গিটি সাধারণ বলেই সুষমান্বিত, দুই হাতে অজস্র শুশ্রূষা, কথায় সৌজন্য।

মেয়েটি বেশ। এর নামে অনেক কলঙ্ক-কথনই দিগ্বিদিকে প্রচলিত ছিল, বাপের বাড়ির দরজা তার বন্ধ হয়েছে। কিন্তু প্রতিজ্ঞার কী তেজ থাকলে চক্ষুর দৃষ্টি এমন গভীর ও স্নেহার্দ্র হতে পারে মা যেন তা এক নিমেষে বুঝে ফেললেন। হয়তো অবাধ্য, কিন্তু এমন মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়ে বাপ তাঁর মুখে ভাত তুলছেন কিসের ক্ষুধায়? সব কথা তাঁর জানতে হবে।

মা'র ঘরের কাজে অশ্রু তার হাত বাড়ালো। তরকারি কুটলো, ঘর ঝাঁট দিলো, কাপড় কুঁচোলো, দেয়ালের ঝুল সাফ করলো। এ যেন তার নিজের বাড়ি। মেথরানি উঠোন সাফ করতে এলে নিজ হাতে জল ঢাললো, বালতি-ভরা জলে চায়ের বাসন ডুবিয়ে নিজে ধুতে বসলো, নীচেকার পেরেক-অভাবে দেওয়ালে যে দেবদেবীর ফটোগুলির ফাঁসি হচ্ছিল, সেগুলিকে প্রকৃতিস্থ করলো। বললো—আমি আজ রাঁধবো, মা। নতুন যুগের ধুয়ো উঠেছে যে মিউনিসিপ্যালিটি রেঁধে বাড়ি-বাড়ি ভাত-তরকারি বিলি করে বেড়াবে—বাঙলা দেশে আমার-তোমার মতো মেয়ে থাকতে তা আমরা হতে দেব না। আমরা পাঁচ আঙুলে পঞ্চ ব্যঞ্জন তৈরি করে পাঁচজনকে তৃপ্ত করবো বলেই মেয়ে-মানুষের জন্ম নিয়েছি, মা। বলে অশ্রু হাসলো।

মা বললেন—আমিই পারবো মা, তুমি যে অতিথি।

—মা'র ঘরে মেয়ে অতিথি হয়ে আসে না, মা। পাঁজির যে-তিথিতেই আসুক, সে মেয়ে। উনুন ধরানো আছে, আমি ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে দিই। প্রভাত ততক্ষণ বাজার করে ফিরুন। তুমি আমিষ ঘেঁটে চান করে আবার গিয়ে নিজের উনুন ধরাবে, সে হবে না—আজকে থেকে তোমার ছুটি।

—রোজই তো আমার সেই পালা।

—এবার থেকে রোজই তুমি মাছের রান্নাঘর থেকে পালাবে।

—কিন্তু আগে তুমি কিছু খেয়ে নাও।

—খেয়ে নেবো বৈ কি। খাওয়া-সম্পর্কেও আমি লেডি হতে পারলাম না। তবে চায়ের কেতলিটাই আগে চাপাই। ততক্ষণে প্রভাত নিশ্চয়ই ফিরবেন। কি বলো?

—এই তো বাজার। দু' মিনিটে এসে যাবে।

দশ মিনিটে প্রভাত ফিরলো। প্রতিদিনকার মতো প্রভাত নিজ হাতে বাজার করে নয়, মুটের মাথায় করে। বাজারের বহর দেখে অশ্রুর চক্ষু স্থির:

তুমি এ করেছো কী? মাংস? মুড়ো? এক হাঁড়ি রসগোল্লা? ছি ছি! করেছো কী? তুমি যে দেখছি বড্ড সেকেলে। ভেবেছিলাম আজ শুধু খাবো শুকতো, শাকভাজা। ভিটামিন।

মাকে অশ্রু ঘেঁষতেই দেবে না: এ-ঘরের এলাকা থেকে তোমার নির্বাসন। নুন আর ঝালের একটু এদিক-ওদিক হলে দ্রৌপদী আর আত্ম-হত্যা করবেন না। সব আমি নিজের হাতে করবো। মাছের মুণ্ডচ্ছেদ করবো, ছাগশিশুকে টুকরো টুকরো। ওদের পূর্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তপ্তকটাহে ওদের ভর্জন করবো।

প্রভাত বললো: আর আমি?

—তোমাকে বয়কট!

অশ্রু তার করতলে এই ক্ষুদ্রায়তন সংসারটিকে কেড়ে নিয়েছে। সে এমন একটা চঞ্চললাবণ্যনির্ঝর। পদে পদে তার ব্যস্ততা, কথায় কথায় কোলাহল। ভিজে খোঁপাটাও এঁটে থাকে না, আঁচলটাও অবাধ্য।

হলুদ বার করে দাও নি তো মা? ফোড়ন কৈ? মাছ কিছু স'াংলে রাখবো নাকি? নাটু মাংস খায় না? আর আমিই এমন কী violent! প্রসাদং কণিকামাত্রং। আতিথ্যও তাই শাকান্নে। কতদিনে যে দেশ সভ্য হবে। মাগো, খাওয়াটা কি নোংরা! এর চেয়ে ইউলিসিস-এর লোটাস-ল্যাণ্ড-এ গিয়ে ঘুমুলে হ'ত ভালো। পোষাক আর খাওয়া নিয়ে এ দেশের রীতিনীতিগুলো এত স্থূল কেন? চরিত্র সম্বন্ধে যেমন বাঁধা গৎ, এদের সম্বন্ধেও তাই। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এক-একটা আলাদা জলবায়ু। এই যাঃ! কিছু হয় নি মা, মাংসের ঢাকাটা পড়ে গেল। না না, হাত-পা পোড়াবো কি? প্রেমও সেই জলবায়ু। বসন্তের পরেই বর্ষা—বর্ষার পরেই আবার সেই জলহারা মেঘ। ঘি কোথায় মা? ছোট এলাচ?

ছোট উঠোন, কলতলার আঙিনাটি ছোট, একটা পাথরের ঢিবি খুঁড়ে ছোট একটি গহ্বরে তুলসীর অঙ্কুর। নোনা-ধরা দেয়ালে দুধয়ালার খড়ি-কাটা হিসেব, একধারে মা'র হাতে ঘুঁটে দেয়া। গলির মধ্যে বাড়ি—তবু আশ্রমোপবন। উঠোনে দাঁড়িয়ে উপরে তাকাও—সংকীর্ণ এক টুকরো আকাশ, চোখে অত অল্প বলেই কল্পনায় সত্যি করে অসীম। 'চোখ বড় করলেই আর বড়ো করে দেখা হয় না।'

—তোমার হ'ল মা ? আমার তো প্রায় সারা। আর শুধু এই চাটনিটা। এবার স্নান করতে যেতে পার হে পেটুকরাম। নাটু, স্নান করেছ ?

—করেছি, বৌদি।

—বৌদি কি রে ? অশ্রু খিলখিল করে হেসে উঠলো।

হঠাৎ এক সময় অন্তরালে প্রভাতকে অশ্রু জিগগেস করলে—তুমি বুঝি নাটুকে শিখিয়ে দিয়েছ ?

প্রভাত অবাক : কি ? কখন ?

—আমাকে বৌদি বলে ডাকতে ?

—না তো। মা বলেছেন হয় তো।

—মা ?

অশ্রু রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে চাটনি ঘন করতে বসলো।

প্রভাত বললো : জিনিসপত্রগুলি এখানে গুছিয়ে রাখো আগে। পরে তুমিও আমাদের সঙ্গে বসে যাও। তুলবো আর খাবো।

মা-ও সায় দিলেন : বারোটা বেজে গেছে। তুমিও বসে পড় অশ্রু।

অশ্রুর তাতে আপত্তি আছে : দু' ভাইকে আগে খাওয়াই। পরে আমার পালা। আবার যখন তোমার মত দায়িত্ব হবে মা, তখন সব্বাইর শেষে।

এক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে প্রভাত বললে—অতিশয়োক্তি ধরো না, অশ্রু। সত্যিই বলছি, সুপার্ব।

অশ্রু বললে—আমাকে তুমি তেমনি বোকা মেয়ে ঠাওরেছ নাকি যে, পরের মুখের ঝাল খেয়ে আমি রসাস্বাদ করবো ? আগে নিজে না গিল্‌লে কোনো গালই গ্রাহ্য করবো না। আরো একটু দেব নাকি ?

—ভালো হয়েছে বলেই বেশি খেতে হবে নাকি ? খালি গুণ করলেই গুণবৃদ্ধি হয় না। পরিমাণ একটা প্রমাণই নয়।

—তাই নাকি ? তবে আমিও এই সঙ্গে বসে যাচ্ছি, মা।

দেয়ালে পিঠ রেখে মা তৃপ্ত চোখে এদের খাওয়া দেখতে লাগলেন।

কী সুন্দর ঘন চুল ! খোঁপাটা ঘাড়ের কাছে ভেঙে পড়ে কাঁধ বেয়ে বাহুর কাছে নেমে এসেছে। বাহু দু'টিও নিটোল, লীলাবলয়িত ! বসবার ভঙ্গিটিতে

রুক্ষতা নেই। খাবার গ্রাসগুলি পরিমিত, হাতের আঙুলগুলি কৃশাগ্র, পায়ের পাতা দু'টি পদ্মপাতা। এর চোখে মুখে আসনে ভাষণে হাস্যে লাস্যে কোথাও এতটুকু বেসুরো লাগে না। যেন ঝর্ণার জল, সমীরমর্মর! এর প্রতি মা নিরাসক্ত থাকেন কি করে?

নিন্দুকের মুখে ছাই পড়ুক, এর হাতে মা সোনার শাঁখা দেবেন। প্রভাত যদি একে পেয়ে কৃতার্থ হয় তবে কী হবে তাঁর অর্থে, কী হবে তাঁর কুলগরিমায়? প্রভাতের সুখের বিনিময়ে মা'র কাছে কোনো কবির কোনো স্বর্গই বিকোবে না। অবিশ্যি পুত্রবধূরূপে যে-রকম মেয়ের চেহারা ও গুণপনা নিয়ে তিনি কল্পনা-বিলাস করতেন তার সঙ্গে অশ্রুর নখাগ্র পর্যন্ত অমিল: সে-মেয়ে হবে রূপে আলোকলতা, গুণে লজ্জাবতী। রূপে পৌর্ণমাসী, স্বভাবে ভোরবেলাকার নদী-কিনারের জলটুকুর মতো টলটলে। তার মাঝে শ্যামল গ্রাম্যতা, প্রখর প্রগল্‌ভতা নয়। গিলটি নয়, সোনা। কিন্তু সোনারই বা যাচাই হয় কিসে? আগুনে পুড়ে খাদ বেরুতে কতক্ষণ? তার চেয়ে এই ভালো, ছেলে তাঁর কল্পনার আয়তনের সঙ্গে প্রাপ্তির সামঞ্জস্য ঘটাতে পারলেই সোনায় সোহাগা।

তবু কোথায় যেন বাধে। বয়সে হয় তো। এই নৈকট্যটাই মা'র চোখে কটু লাগে। কেমন-যেন তার মাঝে একটা লালসার অসহিষ্ণুতা আছে, যেন একটা বিসদৃশ বিলাস। দু'টো বয়সের মধ্যেই প্রতীক্ষার আর অবসর নেই, একটা প্রখর উন্মুখতা। সেইটেই যেন বড় বেশি স্পষ্ট; এবং এত বেশি স্পষ্ট বলে যেন সে-ব্যাকুলতায় সৌরভ নেই, আছে একটা রূঢ় স্বাদ—আনন্দ নয়, আহ্লাদ। কিন্তু এ কি মা'র গোঁড়ামি নয়? মা'র সংজ্ঞানুযায়ী প্রভাতের যোগ্য বধূ করতে চেয়ে বিধাতা তো অনায়াসেই অশ্রুকে তিন চার বৎসর পিছিয়ে রাখতে পারতেন—বয়স বেশি হওয়া তো অশ্রুর একটা স্বেচ্ছাকৃত ফ্যাশান নয়। যদি বলো, সে একটা দুরতিক্রম্য দুর্ঘটনা মাত্র। কিশোরী অশ্রুকেই তো এককালে বয়স্থা হতে হয়েছে। তাই বিবাহের অনতিকাল পরেই যদি অশ্রু সন্তানবতী হয় তার মধ্যে রূঢ়তা কোথায়? এটুকু উদার না হলে চলবে কেন?

মেয়েটি যা হোক পছন্দের। কাজ-কর্মে চতুর, কথায়-বার্তায় চটুল—কিন্তু এ-চটুলতায় বিভ্রম নেই, বেশ সহজ সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত। আধুনিক মেয়ের কৃত্রিমতাই তার কুশ্রীতা। হাড়ের তলায় কোথায় যে তার হৃদয়, সার্জারি করে

তার সন্ধান মেলে না। এক বাণ্ডিল হাড় আর এক প্যাকেট মুর্শিদাবাদ সিল্ক এই তো আধুনিক শিক্ষিত মেয়ের রূপ। অশ্রুকে কাছে পেয়ে তিনি চশমার কাঁচ বদলাবেন। হয় তো তা নয়। কেটি মিত্তিরের নিকেল-করা গালের ওপর দিয়েও হয় তো চোখের জলের ধারা নামে। হয় তো পুঁথি-কেতাব মুখস্থ করবার ফাঁকে-ফাঁকে কদাচিৎ তারা নিজের মনটাকে বইয়ের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে না রেখে আপনার কাছেই অজ্ঞাতে গভীর ও আন্তরিক হয়ে ওঠে। ভণ্ডামির খোলস খসে গিয়ে হয় তো কখনো কখনো তারা নিজের দারিদ্র্য ধরে ফেলে। সেই দারিদ্র্যই তাদের পূর্ণতা, সেই আত্মোৎসর্গ তাদেরই আত্মার স্বর্গ।

না, অশ্রু তাঁর ভুল ভাঙলো। সেবায় গৃহসজ্জায় কর্মনৈপুণ্যে বিনয়-বাক্যে নম্র শ্রীতে সে মা'র চোখে একটা অপরূপ বিস্ময়! বয়েস তার বেশি, আচরণে সে বিদ্রোহিণী, স্বাধীনকর্ত্রী, গৃহসংসারের বন্ধনচ্যুতা—এ-সব নিতান্তই খুঁটিনাটি ত্রুটি। বড়ো পরিচয় প্রভাতকে সে ভালোবাসে, গরীব জেনেও ভালোবাসে। মা হয়ে তিনি যদি তা না বোঝেন তবে আকাশের সূর্য অস্তাচলে যাক। বচনে তার প্রকাশ হয় না, না বা ব্যবহারে—কথার নেপথ্যে যেটুকু স্তব্ধতা, ব্যবহারের অন্তরালে যেটুকু রুদ্ধ ব্যাকুলতা সেইটুকুতেই তার পরিচয়। কোথা দিয়ে কি কথা উঠবে মা তাতে কান দেবেন না। সংসারে সমাজে কোথাও যদি কিছু সংঘর্ষ ঘটে, তবে তার দায়িত্ব তাদেরই, যাদের সংস্পর্শে এই সংঘর্ষের শুরু হল। মিলন যদি তাদের, মীমাংসাও তাদেরই। প্রেম যদি এটুকু পরীক্ষা না সয়, তবে তার আগুন খালি দগ্ধই করবে, শুচি করবে না। না, মা'র এই খুঁৎখুঁতে স্বভাবের জন্যে দায়ী তাঁর চিরাচরিত প্রথা, বাঁধা-ধরা সংস্কার। যা সংস্কৃত হবে না তা আবার সংস্কার কি করে? যা সহ্য করে না তার মধ্যে সত্য কই?

অশ্রুর ব্যবহারে ও স্বভাবে একটা কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আছে। কথায় এমন একটা দৃঢ়োপলব্ধির তেজ আছে যে, তার কাছে সমস্ত প্রতিবাদ যেন একটা খেলো বিবাদের মত শোনায়। সমস্ত বিশ্বাসের মূল নড়ে ওঠে। অথচ এমন সহজ, এমন নিষ্ঠুর। এই নির্দয়তাই তার সততা। এমন ঔজ্জ্বল্য যার চরিত্রে, তাকে মন্দ বলতে নিজেরই মা'র সন্দেহ হয়।

ঘর-দোর দেয়াল-মেঝে ছাদ-উঠোন সমস্ত অশ্রু ফিটফাট করে ফেললো। বারণ করো, মানবে না; অথচ তার এ অতি-অন্তরঙ্গতায় কোথায়ো যেন সামান্য

কৃত্রিমতা নেই। এখন বিকেল হয়ে আসছে ; ছাদের ওপর নাটুকে নিয়ে অশ্রু কথার খেলা করছে। ধামার ভেতর ঘুঁটে গুনে রাখতে রাখতে মা তাই শুনছেন :

—মাথার ওপরে আকাশ, তাতে তারা ফুটছে। তারা কি রকম বলো না ?

অশ্রু নাটুর আঙুল তুলে নিজের চোখ স্পর্শ করালো : এই রকম।

নাটু বললো : আমি প্রায় দেখতে পাচ্ছি। চাঁদ উঠবে না আজ ?

—আরেকটু রাত হলে উঠবে।

—চাঁদ ? কি রকম বলো না ?

অশ্রু অধর স্পর্শ করালো : এমনি তুকতুকে, বাঁকা, হাসি-হাসি। তুমি একবার হাসো, সেই তো আকাশের চাঁদ।

নাটু হাসতেই অশ্রু তাকে জড়িয়ে ধরলো : মেঘ দেখবে নাটু ?

নাটু দু'হাতে অশ্রুর কতগুলি চুল তুলে বললে—ঠিক বুঝতে পারছি, বৌদি। এমনি ঘন, এমনি নরম, না ?

—এমনি ঘন, এমনি নরম—আকাশময় ছড়িয়ে থাকে। তারপর বৃষ্টি।

—হ্যাঁ, মা যেমন শিয়রে বসে আমার কপালের ওপর চোখের জল ফেলেন না ? আচ্ছা বৌদি—

অশ্রু বাধা দিলো : বৌদি নয়, নাটু। খালি দিদি।

—না, না, বৌদি। মা বললেন, তুমি আমার বৌদি এসেছ। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রঙ্, তারার মতো চোখ চিকচিক করছে, মেঘের মতো নরম চুল। আমি তোমাকে পেয়ে সব কিছু দেখতে পাচ্ছি। চাঁপা ফুল, তারা, মেঘ, তাজমহল, ইডেন্‌গার্ডেন, মনুমেণ্ট, চৌরঙ্গি—সমস্ত। তুমি আমার বৌদি না হয়েই পারো না। দিদি আমার একজন আছেন, তিনি থাকেন সি. পি.-তে, তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন না।

—আমি তোমার দিদি হয়েই থেকে যাবো, নাটু।

—বা, তা কি হয় ? তোমার সঙ্গে দাদার বিয়ে হবে, সানাই বাজবে, চাটনি মেখে পাঁপর খাবো, নতুন জামা পরবো—আমাকে তোমার বিয়েতে কি দেবে শুনি ? বাঃ, আমাকে আবার কি দেবে ? আমিই তো তোমাকে দেব। আচ্ছা, আমার স্মেলিং সল্টের শিশিটা,—তার চেয়ে লুকিয়ে তোমাকে দাদার সেই ওয়াটারপ্রুফটা এনে দেবো, বৌদি, বুঝলে ?

—আর দিদি হলে বুঝি কিছু দেবে না ?

—তা হ'লে কম দেবো,—জমানো ডাক-টিকিটগুলো শুধু। ভুল হয় নি একটুও—হল্যাণ্ডের পর্যন্ত টিকিট আছে। দাদা সব বেছে দিয়েছেন। ভুল হলে দাদাই কান-মলা খাবেন। আমার কি, আমি তো দেখতেই পাই না।

—তবে তোমার ডাক-টিকিটগুলিই নেবো, নাটু।

—তার মধ্যে গোটা তিরিশ ও-বাড়ির বিশুটা চুরি করে নিয়েছে। তুমি যদি পারো ওর থেকে আদায় করে নিয়ো, বৌদি।

অশ্রু হেসে বল্ললে—বা, আমি যে তোমার দিদি হয়ে গেলাম।

—ছাই, ডাক-টিকিটগুলো ছাই। তার চেয়ে দাদার ওয়াটার-প্রুফটা ঢের বেশি টেঁকসই। আমি কতো দিন বৃষ্টির সময় সেটা গায়ে দিয়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। সে যে কী মজা, তুমি তা ভাবতেই পারো না। বুঝলে, বাইরেটা সব ভিজে যাচ্ছে, ভেতরের জামা কাপড় যেমনি ঠিক তেমনি। তুমি দেখ নি? তোমার নেই তো? তুমি কাউকে কিছু বোল না, আমি ঠিক তোমাকে এনে দেবো দেখো। ঘর-দোর সব আমার মুখস্থ। আজ রাত্রে যদি বৃষ্টি নামে, তুমি ওটা পরে উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ো,—সে যে কী মজা—দেখো, দাদাকে যেন বলে দিয়ো না।

—কিন্তু ডাক-টিকিটই যে ভালো ছিল—কতো রাজার কতো রকম মুখের ছাপ। কেউ হাঁদা, কেউ উটের মতো, কেউ বা একটা বন-বেড়াল।

মুখ ম্লান করে নিচের ঠোঁট উলটিয়ে নাটু বললে—সে-সব আমি কবে ছিঁড়ে ফেলেছি। বেশ, মাকে গিয়ে জিগ্‌গেস করো না। আমার বাক্সে তো আর চাবি নেই, বেশ নিজেই দেখে এসো না। উটও চিনি না, প্যাঁচাও চিনি না।

মা বললেন—নিচে এসো অশ্রু, চুল বেঁধে দি।

তবু কথাটা মা সোজাসুজি পাড়তে পারলেন না। বললেন—বাপের বাড়ি যাবে না একবার?

স্পষ্ট করে অশ্রু উত্তর দিলো: না।

—সে কি মা? তিনি তোমার বাবা—

—হোন। যিনি আমাকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছেন, পা স্পর্শ করে তাঁকে অপমানিত করতে চাইনে।

—কিন্তু তুমিই তো সেদিন নিজে ইচ্ছে করে বেরিয়ে এসেছিলে।

—ভাগ্যিস বেরিয়ে এসেছিলাম, মা। নইলে এতদিনে হয় তো সমস্ত

প্রেরণার সঙ্গে আত্মপ্রসারের প্রেরণাও খুইয়ে ফেলতাম। আমার সে গভীর সত্যসন্ধানের চেষ্টাকে বাবা-কাকারা মর্যাদা দেবেন আশা করিনি, কিন্তু তাঁদের নীতিসংহিতা অনুসারে অন্যায় যদি একবার করেইছিলাম তবে, এক কণা ক্ষমাও আমি পাবো না—অতটা হীন আমি নই, মা।

মা কুণ্ঠিত হয়ে বললেন—শুনেছি তোমার পরের আচরণগুলিও তাঁদের মনঃপূত হয় নি, চিরকালই তুমি তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছ।

হেসে স্বচ্ছ স্বরে অশ্রু বললে—বিরুদ্ধাচরণ সব-সময়েই প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু করতে হয়। বাবার কথা শুনতাম, বিবেকের বিদ্রোহী হতে হত। সব জিনিসই সব মানুষের সয় না, মা। বিকেলে স্নান করলে অনেকের হয় সর্দি, কারুর কারুর দাঁড়ায় নিমোনিয়া। কিন্তু বিকেলে স্নান না করলে আমার হয় না হজম। আমাদের বিলু রোজ একটা পর্যন্ত রাত জাগে স্ট্রিক্‌নিন না খেয়ে, ঘড়িতে দশটা বাজলেই আমাকে যেন কে মরফিয়া খাওয়ায়। মাদ্রাজি মেয়েরা দেয় কাছা, ছেলেরা পরে লুঙ্গি। যার যেমন ধাত, তেমনি তার ধৃতি।

—কিন্তু বাবার বাড়ি তুমি যাবেই না?

—সে-বড়াই দেবী-আদি-দেবী পার্বতীরো শোভা পায় না। যেতে আমি যে-মুহূর্তে পারি, তবে সসম্মানে; হাঁটু আমি দোমড়াতে পারবো না। যাকে সত্য বলে করায়ত্ত করেছি, করজোড় করতে গেলেই তা সংকুচিত হয়ে আসবে। বাড়িতে আমার দু'টি আকর্ষণ ছিলো—মা আর তিনু। আমার মৃতবৎসা মায়ের আমরাই দু'টি সন্তান সশরীরে আঁতুড়-ঘর ছেড়ে গৃহবাসের যোগ্য হয়েছিলাম—আর সবার আট-কড়ায়েই দম আটকেছে। সন্তানের ঋণ শোধ করতে মা ফতুর হলেন—দল বেঁধে এলো কাকিমারা। তোমাদের গ্রাম্যগৃহস্থকন্যার আদর্শ-রূপিণীরা। তিনু গেল জলের ওপরে, আর আমি জলে। বাবার বাড়ি কি করতেই বা যাবো? শুনছি বাবা নাকি কোন সন্ন্যাসীর চেলা হয়ে দেশপর্যটন করছেন। কাকারা এক-একটি কাক। রক্ষে করো, মা।

মা বিনুনিতে ফাঁস দিতে দিতে শুধোলেন: তুমি তা হলে এখন কি করবে?

—যা করছিলাম। মাস্টারি। কাজের মধ্যে দুই—হাই-তোলা আর পরীক্ষার কাগজ-দেখা। তবে মাস্টারিতেও কায়েমি কাহিল হতে চলেছে। কি করবো, কিছু কি ঠিক বলা যায়, মা? তুমিই বলো না, কি করা যায়?

এইবার অনায়াসে কথাটা মা পাড়তে পারতেন, কিন্তু প্রভাত বেরোবার

পোষাক পরে এসে বললে—তোমার যে এখন চুল বাঁধাই হয় নি। যাই বলো, মেয়েরা যতোই কেন না দম্ভ করুক, বেশবিন্যাস-ব্যাপারে তারা চিরটা কাল পুরুষের থেকে পিছিয়ে থাকবে। তবু মেয়েদের কতো কম ঝক্কি। একটা পেটিকোট, আর দুটো-তিনটে সেফটিপিন-এর তো ব্যাপার। পুরুষের কত মাল-মশলা। হাতে ঘড়ি বাঁধা, মনিব্যাগে পয়সা-নেওয়া, রুমালটা সাফ আছে কি না, দেশলাইটা কোথায় ফেললো—কতো তার হিসেব, কতো তার ফ্যাসাদ। বলি, বেরোবে না ?

অশ্রু হেসে বললো—পাগল ! এমন মাকে ছেড়ে কোথায় বেরোব ?

প্রভাত একাই বেড়াতে বেরোল। অশ্রু বলল—আমি যদি এখানে কয়েক দিন থাকি, আমাকে তাড়িয়ে দেবে না তো মা ? আমাকে সবাই যতো খারাপ ভাবে আমি ততো খারাপ সত্যিই হয় তো নই। দেবে না মা থাকতে ?

—নিশ্চয়, এখানেই থাকবে বৈ কি। এখানে যদি তোমার আশ্রয় না হয় তা হলে সে যে তোমার বড় দুর্যোগ, মা। কয়েক দিন কেন—আমরণ, অশ্রু।

ইঙ্গিতটা এর চেয়ে আর কি স্পষ্ট হবে। অশ্রু উঠলো শিউরে। কিন্তু মুখ দিয়ে তাড়াতাড়ি কোনো কথা এলো না। চুল বাঁধা সাঙ্গ করে উঠে দাঁড়াতেই তার মনে হ'ল এ-সংসারের সমস্ত মাধুর্য যেন নিঃশেষে শুষে গেছে। এখন বেরিয়ে পড়লেই তো চুকে যায়। কিন্তু বেরিয়ে পড়ার মধ্যেই বীরত্ব নেই। ছাদের রেলিঙে ধরে দাঁড়িয়ে অশ্রু মোটর গাড়ির নম্বর দেখতে লাগলো। কিন্তু দৃশ্যজগতের বাইরে মন আবার কখন অন্ধকারে ডুব মারে, সেখানে অপরিচয়ের পরিধিহীন সমুদ্র তাকে ডাক পাঠিয়েছে ! কোথায় এবার সে যাবে, জীবনে আবার তার ফেরবার আশ্রয় কোথায় ? সে কি শুধু মৃত্যু ? এই প্রাণ-স্বাদের অভিযানে কি কোনো গভীরতম তৃপ্তিতে তার কামনার সমাধি হবে না ?

সন্ধ্যা হতেই প্রভাত ফিরেছে। দুপুরেই তার ঘর অশ্রু গুছিয়ে রেখেছিল। দরজা খুলতেই চোখে লাগলো ধাঁধা। আলো জ্বালা হয় নি—তার বিছানার ওপর অশ্রু শুয়ে। প্রভাতকে ঢুকতে দেখেও অশ্রু উঠে বসলো না, মলিন মেঘজ্যোতির মত বিছানার সঙ্গেই মিশে রইলো। প্রভাত ক্যাণ্ডালটা জ্বালালো। বললো : শরীর খারাপ হয়েছে নাকি ?

অশ্রু শুয়ে শুয়েই বললো : মা কিছুতেই রাত্রে রাঁধতে দিলেন না। হাতে

আর কোনো কাজ নেই—তুমি কখন ফেরো, তাই শুয়ে আছি। তোমার নতুন উপন্যাসের কিছুটা পড়ে শোনাও, তাই খানিক শুনি না-হয়।

কথার স্থরে কেমন-যেন একটা করুণ ক্লান্তির আভাস। প্রভাত বিস্মিত হল। তাড়াতাড়ি তার গা ঘেঁষে বসে বললো : নিশ্চয়ই তোমার মন ভালো নেই, কি হয়েছে আমায় বলো।

অশ্রু উঠে বসে বললো : তুমি পাগল হয়েছ। মন আমার কাছে ব্যাধি নয় যে তার দ্বারা আক্রান্ত হব। আছি আমি ভালোই, কিন্তু এর পর কি করা যায় তাই ভাবছি।

প্রভাত জিজ্ঞেস করলো : কিসের পর ?

—এলাহাবাদ থেকে কলকাতা আসার পর।

—এলাহাবাদের জন্যে কষ্ট হচ্ছে ?

—একটু একটু—নির্মলের জন্যে।

প্রভাত বললো : তা আর আশ্চর্য কি।

—আশ্চর্য নিশ্চয়ই। মানুষ যে-আদর্শই ধরুক তার অপ্রাপ্তি ঘটে বলেই তার ট্র্যাজিডি নয়। সে-আদর্শকে সে আঁকড়েই থাকবে এইটেই তার অধঃ-পতন। আদর্শকে বড়ো রাখতে গিয়ে নিজেকে ছোট করার মতো অবনতি আর কি হতে পারে ?

প্রভাত বিছানার ওপর সরে বসলো : কথাটা খোলসা করে বলো।

—নির্মল বিবাহকে জীবন-যৌবনের পরমৈশ্বর্য বলে ধরে নিয়েছিল ; ইন্দিরাকে আন্তরিকতা দিলো, কিন্তু অন্তর দিতে পারলো না। সেইটেই তার খর্বতা। আদর্শকে ছোট রেখে নিজেকে মহীয়ান করা ভালো, নিজেকে কালো করে আদর্শকে অদৃশ্য রাখাটা বাহবার নয়। ইন্দিরাকে সে বিয়ে করেছে—এইখানেই তার কর্তব্যের শেষ ; পরিশিষ্ট যেটুকু তার আছে তা নিতান্ত স্থূল। প্রেমহীন দেহভোগ আর গণিকাবৃত্তিতে তফাৎ কোথায় ? তাই আগাগোড়া মনে হয় এমন সতীত্ব একটা সস্তা জলুস মাত্র ; মন সায় দেয় না।

—কিন্তু ইন্দিরা ?

—তার কথা সবিস্তারে বলে তোমার নারীজাতির প্রতি ফ্যাশানেবল বিমুখতাকে প্রশ্রয় দেবো না। ইন্দিরাকে আমি ক্ষমা করি, তাকে বিচার করবার সহজ মানদণ্ড পাই। সে ব্যক্তিত্বের চেয়ে সমাজকে বড়ো করে দেখে, বেগের

উচ্ছৃঙ্খলতার চেয়ে জড়তার অবসাদ,—বিস্তারের চেয়ে সংকীর্ণতা, চাঞ্চল্যের চেয়ে সামঞ্জস্য ! তাকে অনায়াসে বোঝা যায়, শ্রদ্ধাও করা যায়। রমাপতির প্রতি—

প্রভাত বাধা দিয়ে বললে—তোমার এ-সমস্ত স্বগতোক্তির কোনো মানেই আমি বুঝতে পারবো না, যতক্ষণ না তুমি বুঝিয়ে বলো ইন্দিরার সঙ্গে রমাপতির সম্পর্কটার মধ্যে শব্দগত কোনো অর্থানুকূল্য আছে কি না।

একটু হেসে সংক্ষেপে অশ্রু কুশীলববর্ণনা সেরে নিলো।

—রমাপতির প্রতি ইন্দিরার প্রেমের মধ্যে ঔজ্জল্য না হোক, প্রবলতা আছে। এবং এই প্রবলতাই তাকে হয় তো একদিন পবিত্র করে তুলতো। কিন্তু নির্মলের ঔদাসীন্য ও নিস্তেজতাই এর বাধা। তবু তার চেষ্টার সীমা নেই। প্রেম পাওয়াটা দেব-দুর্লভ, কিন্তু পেয়ে গেলে অতি সস্তা অতি বাজে—তার পাওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যেই মহত্ব। নির্মল যদি নিরুত্তর না থাকতো, যদি তার কামনায় থাকতো কবিত্ব, প্রয়োজনসাধনে থাকতো প্রযোজনার প্রসাধন, তা হ'লে ইন্দিরার জীবন শকুন্তলারই মতো হয় তো সার্থক হ'ত। কিন্তু এ-বিষয়ে নির্মলের নির্মমতার মার্জনা নেই। আমাদের দেশের বিয়েতে এ-বিষয়ে বরবধুর একটা অত্যুগ্র অসহিষ্ণুতা থাকে। স্বভাবে মেয়েরা নিষ্ক্রিয় বলে দোষটা বেশির ভাগ পুরুষেরই। পাওয়াটাকেই প্রাধান্য দিয়ে চাওয়াটাকে আর ধন্য করবার জন্য দেরি করে না। নির্মল সেই ভুলই করেছিল, ভেবেছিল সেই ভুলই তার সংসার-সমুদ্রের ভেলা। ইন্দিরাকে সে হয় তো চাইতোও, কিন্তু ইন্দিরা অন্যার্থে রমা, ও তার দক্ষিণ দিকে একটি পতি থেকেই তাকে পতিত করেছে। সেই ট্র্যাজিডিটা ইন্দিরার যতো না ততো নির্মলের। এর যে কোথায় গিয়ে সমাধান হবে সে-চিন্তা আমাকে দোলা দিয়েছে। তা ছাড়া নির্মলের মাঝে সহনশীলতাই আছে, উদারতা নেই। যে-যুগে আঠারো বছর আগে মেয়ের বিয়ে হয় না, তার জীবনে সামান্যতম দুর্ঘটনাটিও ঘটবে না, মাটির নিচে পচে পচে সে খালি স্বামীর ভোগেই ওল্ড ওয়াইন হবে—এমন একটা ক্ষমাহীন মনোভাব অসহ্য। ইন্দিরাকে মুক্তি না দিক, শ্রদ্ধা দেওয়া উচিত ছিল। যৌবনকে সে স্পন্দিত রেখেছে, কল্পনাকে সৃষ্টিশীল। চিরাচরণ যে একটা মহত্বই নয় এ-কথা আমরা বুঝবো কবে ? সাময়িকতা, সংযম আর স্বাস্থ্যই হচ্ছে জীবনের মূল্যধারক। সংযমটা স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলেই মহৎ, সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলেই সুন্দর। কিন্তু ও-সব কথা যাক ; কি নিয়ে বইটা লিখছ ?

অশ্রুকে প্রভাত ধীরে স্পর্শ করলো, ঠিক বাহুর কাছটিতে : ও-কথাও থাক।

—না, তবু বলো! শুনতে আমার বেশ লাগবে। তুমি যে খালি কেরানি এ কথা ভাবলে আমার হাঁপ ধরে, তুমি সাহিত্যিক—আমি তাতে মুক্তি পাই, প্রভাত। মানুষের পরিচয় কি করে তাতে নয়, কি সে হয়। এবং হওয়ার মূলেই তার সৃষ্টিপ্রয়াস। যে নিজেকে সৃষ্টি করে না তাকে আমি মানুষ বলি না। সে-হিসেবে কেরানিও কবি হতে পারে বৈ কি।

—আমাদের দেশে কেরানির গুণ-নির্দেশ অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু কোনো বড়ো বিষয় নিয়েই তোমার সঙ্গে আজ আর তর্কালোচনা করতে সাধ হচ্ছে না। আমরা দু'জনে মিলে এই যে মুহূর্ত ক'টি রচনা করেছি তার তুলনায় কোনো উপন্যাসই বাস্তব নয়, অশ্রু।

অশ্রুর কোনো সাড়া মিললো না দেখে প্রভাতকে সেই কথাই পাড়তে হ'ল : উপন্যাসটা পলিটিক্যাল। কোনো cult নিয়ে নয়, আমাদের এতো বৎসরের জাতীয় সংগ্রামের একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস। যৌবনারম্ভ থেকে বার্ধক্যোত্তীর্ণ নায়কের একটা ধারাবাহিক ভাববিবর্তন। মোটামুটি সেইটেই থীম। যা লেখা হয়েছে তাতে চাখবার মতো হয় নি। কিন্তু ভাবছি কথাগুলোকে অত্যন্ত পারস্পরিক ও ব্যক্তিগত করে তুলি। কি বলো?

ঘন হয়ে সরে এসে অশ্রু বললে—বলো।

প্রভাত প্রশ্ন করলো : ফিরতে তোমাকে এক দিন হতই—আমারই ঘরে, আমারই শয্যায়, নয় কি?

অল্প একটু হেসে অশ্রু বললে—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে তো তাই মনে হবে। তুমি আমার কত বড়ো বন্ধু তা আমার হৃদয় যেমন জানে দেহকে তত জানতে দিতে চাইনে। ভয় করে। তবু মা আমার এখানে থাকবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করেছেন, নাটু আমাকে তোমার ওয়াটার-প্রুফ উপহার দিতে চাইছে, দিদি হলে খালি ডাক-টিকিটগুলি—তাও নাকি সব নেই, বিশুই সাবড়েছে। তোমাদের ঠিকে-ঝি পর্যন্ত বললো : এ বৌ আনলে মা, কপালে সিঁদুর দাওনি? আমি তো হেসেই খুন। মা বললেন : শিগগিরই হবে, লক্ষ্মী যখন এলেন তখন তাঁকে আমরা বেঁধে রাখলাম। নেপথ্য থেকে শুনে আমি হাসি।

প্রভাত বললে—সম্পর্ককে সহজ করে না দেখালে সমাজের সায় মেলে না, ঐ ঠিকে-ঝিটি পর্যন্ত সমাজের প্রতিনিধি।

—তাই তো দায়। ছুটির ক'টা দিন তো আমার এখানেই কাটাতে হবে। হোটেলে বেশি দিন থাকলে আমার মনি-ব্যাগটি পটল তুলবেন। তোমার সঙ্গে কয়েকদিন থাকতে আমার ভারি ভালো লাগবে—উষা থেকে সন্ধ্যা, আবার পরিপূর্ণ রাত্রি। রাত্রিটা অবিশ্যি মা'র বিছানায়।

—কিন্তু ছুটির ক'টা দিন মাত্র?

—ও হরি! তুমিও আমাকে কায়েমি করতে চাও নাকি?

প্রভাত অশ্রুর হাতের ওপর হাত বুলুতে বুলুতে বললো—যদি অমন হালকা করে না বলো, তো বলি, চাই অশ্রু।

খানিক্ষণের জন্য অশ্রু স্তব্ধ হয়ে রইলো, বোধ হয় চোখের পাতাটিও নড়লো না। ধীরে গদ্গদগাম্ভীর্যে বললে—আমি একদিন বিবাহের সভা থেকে পালিয়ে এসে তোমারই দুয়ারে কড়া নেড়েছিলাম। তোমার দুই চোখ অশ্রুমথিত, দেহ অবসন্ন। সেদিন তোমার ঘরে এসেছিলাম হঠকারী বিদ্রোহিণীর বেশে, আজ এসেছি স্থিতধী তপস্বিনীর বেশে। অন্তত আমার তাই মনে হচ্ছে! সেদিন যে বেরিয়ে এসেছিলাম আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে মাত্র, তোমাকেই বিবাহ করতে নয়।

প্রভাত স্নিগ্ধ স্বরে বললো—সে আমি জানতাম। কিন্তু সেদিনের বন্ধুতা কি নিভৃত নৈকট্যের জন্য তৃষিত হয়ে ওঠে নি?

—হয় তো উঠেছে, কিন্তু স্থায়িত্বই কি প্রেমের বড়ো পরিচয়, তার প্রচুরতা কি কিছু নয়? তুমি কি মনে কর দুটো দেহ একসঙ্গে বেঁধে দিলেই কি প্রাণ একত্র হল? আনন্দ হল সহজ?

—কিন্তু প্রাণ যখন একত্র হয়, তখন দেহের আর পার্থক্য কোথায়? দেহ সম্বন্ধে তোমার এত ভয় কিসের? পৃথিবীতে দেহের মতো ঐশ্বর্য আর কোথায় আছে—বিধাতার আদিম কীর্তিস্তম্ভ।

অশ্রু প্রভাতের কাঁধের ওপর দেহ প্রায় হেলালো। বললে—কবিতায় দেহ মন্দির, মানি; কিন্তু বিজ্ঞানে দেহ মিউজিয়ম। দেহ সম্বন্ধে আমি নিদারুণ পৌত্তলিক। কিন্তু প্রয়োজনের নিয়মে একে বাঁধতে গেলেই এক রাতে সে এঁটো-কাঁটা ফেলবার সামান্য একটা উঠোন; শ্যামলতাই যদি পৃথিবী হত তা হলে মানুষ আর ভূমিকম্পের ভয়ে কম্পমান থাকতো না। রঙ বা লাবণ্যটাই দেহের সব নয়—ওটা পৃথিবীর শ্যামলতার সামিল। অন্তরালে এর কতো স্নায়ু

কতো শিরা কতো প্রক্রিয়া কতো কারুকার্য। বিশ্বাসঘাতক দেহকে আমি ভীষণ ভয় করি। যখন সে বিশ্বাসঘাতক, তখনই সে ছন্দোহীন, কদর্য।

প্রভাত অশ্রুর হাত দিয়ে নিজের কণ্ঠে জড়ালো : সবই আমি বুঝি, অশ্রু। কিন্তু এমন অন্তরঙ্গতা এমন প্রেমকে কি আমরা উপবাসী করে রাখবো? তাইতেই কি জীবনের শ্রী ফিরবে?

অশ্রু বললে—উপবাসটা শক্তির পক্ষে মাদকদ্রব্য। তোমাকে Donne-এর কথাই একটু বলি তা হলে। সেদিন কি-একটা বইয়ে তাঁর জীবনের একটা টুকরো চোখে পড়েছিল। বাপের অমতে ভালোবেসে জেনে-শুনে তিনি বিয়ে করলেন। কাকার আপিসে কাজ করতেন, এ বিদ্রোহাচরণের ফলে তাঁর চাকরিটি গেলো। শোনা গেলো বিয়েটা আইনে বাধে, তাই তাঁর হল জেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দু'বচ্ছর রইলেন এক দূরসম্পর্কীয় ভাইয়ের গলগ্রহ হয়ে। দু'বচ্ছরে দু'টি সন্তান হ'ল। পরের বছরে আরেকটির সম্ভাবনা। স্ত্রী যখন প্রসববেদনায় মুহ্যমান, Donne তখন ঘরে বসে কবিতা লিখছেন: যদি এখন মরি, তোমার কাছে এই প্রার্থনাই জানাই ভগবান, জন্মজন্মান্তরে যেন স্ত্রীর সঙ্গে আর দেখা না হয়। একটার পর একটা ছেলে হয়, আর মরে—Donne-এর কবর দেবার পর্যন্ত পয়সা নেই। তাঁর Biathanatos পড়েছ? তাতে তিনি আত্মহত্যার গুণগান করেছেন,—এই দেহ তাঁর বন্দীশালা; দরজার চাবি তো তাঁরই হাতে। কিন্তু কবিতাই তাঁকে রক্ষা করেছিল। বারোটি সন্তান প্রসব করে Donne-এর স্ত্রী প্রসবযন্ত্রণা থেকে ত্রাণ পেলেন; সাতটি সন্তান বেঁচে ছিল, তাদের Donne প্রতিজ্ঞা করালেন কখনো যেন তারা বিয়ে না করে। ইতিহাসে অবিশ্যি তাদের কথা কিছু লেখা নেই। এখনো শেষ হয়নি সবটা। স্ত্রীর মৃত্যুর পর Donne-এর জীবনে আরেকটি নারীর অভ্যুদয় হ'ল—Anne More। স্ত্রী হয়ে এলো না বলেই বাকি কয়েকটা দিন Donne কবিতা লিখতে পেরেছিলেন।

প্রভাত বললে—সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের একটা নিদারুণ উদাহরণ খাড়া করে আমাদের কেউ শাসাতে এলে আমরা ব্যঙ্গ করবো। আমাদের ছন্দজ্ঞান আছে, বিজ্ঞান আমাদের হাতের মুঠোয়।

—জানি, কিন্তু মূল ইঙ্গিতটা দু' শ' বছর পরেও ম্লান হয় নি। তা হলে তখন তুমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেরানিই হয়ে থাকবে, কবির আকাশ তখন

উবে গেছে। আর তোমার এতো বছরের ভারতমুক্তিসাধনার ইতিহাস মুদির দোকানের হিসেব হয়ে উঠেছে। উদর তখন একটি বড়ো সমস্যা। তুমি মাইনে পাও নব্বুই, আমি এক শ' পঞ্চাশ—তাও জলপাইগুড়িতে। কলকাতায় এলে আমার পঞ্চাশ টাকা জুটিয়ে নিতেও প্রাণান্ত হবে। যা সামান্য জমিয়েছিলাম তা ফুরিয়ে যাবে দু' নিশ্বাসে। টাকার সংস্থান না করে কোনো ব্যবসাই উৎরোয় না, বিয়েটা তো পুরোপুরি একটা ব্যবসাই।

—কিন্তু খালি আরাম পেতে হবে এ তোমার একচোখোমি, অশ্রু।

—আরাম না পেলে অভিরাম থাকা যায় না, বন্ধু। দুঃখে-দুর্দিনে সমবেদনার গান বাজারে কাটে বটে, কিন্তু এদিকে সংসারে যে মাথা কাটা যায়; তা লুকোবে কি করে? আরাম চাই বৈ কি। ও বিবাহ-hygienics-এর একটা মূল নীতি। তার চেয়ে আমি থাকি জলপাইগুড়িতে, তুমি থাকো কলকাতায় ছোট সংসারি নিয়ে—মা আর নাটু। আমার কাছে তোমার অবারিত নিমন্ত্রণ, তোমার কাছে আমার। মাঝখানে সমস্ত পথ উন্মুক্ত, সমস্ত আকাশ আশীর্বাদময়। তুমি যদি এতে মুখ ভার করো, তবে বুঝবো তুমি খালি আমাকেই চেয়েছিলে, অশ্রুকে চাওনি। যদি স্থায়িত্বের কথা তোল, বলি, আমিই এক দিন ফুরোব, অশ্রু অবিনাশী। তুমি চুপ করে থেকো না, আমার খারাপ লাগে তাতে।

অশ্রুর মুখখানি প্রভাত নিজের মুখের কাছে সরিয়ে আনলো। পরিপূর্ণ ওষ্ঠপুটে নিবিড় চুম্বন করতে করতে সে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল: "I cannot show my love except through carnal things."

কাটলো দু' মিনিট। অশ্রু নিজেকে সম্বৃত করে বললো—বিয়ে করায় অনেক সদ্‌গুণ ও সুবিধে হয় তো আছে, কিন্তু আমার-তোমার বেলায় তা আবর্জনা। আমাদের জীবনে তার মার্জনা নেই। তোমাকে পেয়ে আমি একদিন নবাবিষ্কারের সমস্ত প্রেরণা খুইয়ে বসবো, আমার হাতে সে-অপমৃত্যু তুমি সয়ো না। কখন আবার আমাকে তোমার সুসমাপ্ত, নিঃশেষসুধা মনে হবে সে-দিনের অপমান সইতে আমি তিলে-তিলে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলবো না। কখন আমাদের সকল ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে। এই বেশ, এই ভালো। তুমি আর আমি। আমরা আছি, আমরা আছি—এর চেয়ে বড়ো পরিচয় আমাদের নেই।

অশ্রু প্রভাতের চুলগুলিতে হাত বুলুতে লাগলো। হঠাৎ জামার তলা দিয়ে

প্রভাতের গলার নীচে হাত ঘন করে রেখে বললে—তোমার মনে আরো বুঝি সন্দেহ আছে ?

অশ্রুর চুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে প্রভাত বললে—কিসের সন্দেহ ? তোমার constancy-র, একচারিতার ? আসা-যাওয়ার জন্যে দুয়ার যদি খুলেই না রাখি অশ্রু, তা হলে আমাদের প্রেমের আর গর্ব কি নিয়ে। যদি একদিন এলে, তেমনি যদি যেতে চাও একদিন যাবে। দায়হীন বিদায়ের দিনে আবার তোমাকে নিমন্ত্রণ করে রাখবো। স্বাধীনতায় যদি প্রেম স্থায়ী না হয়, তবে শ্মশানে বসে তার কঙ্কাল পুজোর অন্ধতাকে আমরা ক্ষমা করব কি করে ? সে-সন্দেহ আমার নেই, অশ্রু। তোমাকে যদি পাবার গর্ব করে থাকি, হারাবার গর্বও আমারই।

আবেশে অশ্রু প্রভাতের কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। জানলা দিয়ে রাস্তার গ্যাসের আলোটি রোয়াক ডিঙিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে, আজকের রাতের সেই আলোটি চাঁদের আলোকেও হার মানায়।

মশারির ধার গুঁজতে গুঁজতে মা বললেন—তোমার বাবাকে জানানো দরকার, না, অশ্রু ?

অশ্রু শুয়ে পড়েছে। পাশ ফিরে বললে—কিসের জন্য, মা ?

কথাটা মা সরাসরি পাড়লেন না : যাই বলো, সমাজের চোখে তিনিই তো তোমার ন্যায্য অভিভাবক। তাঁকে ডিঙিয়ে চলাটা কি তোমার ঠিক হবে ?

উদ্বিগ্ন হয়ে অশ্রু বললে—কথাটা পরিষ্কার করে খুলে বললে উত্তর দেওয়া সহজ হত, মা।

মা লণ্ঠনটা নিবোলেন। বললেন—ধরো, তোমার বিয়ের খবরটা কি তাঁকে দেওয়া উচিত নয় ?

কথা শুনে অশ্রুর ঘাবড়াবার কথা। মা এবার খোলা সড়কে নেমে এসেছেন, গলি-ঘুঁজিতে লুকোচুরি তাঁর আর সইবে না। তবু অশ্রু কণ্ঠস্বর গম্ভীর না করেই বললে—তাঁকে খবর দেওয়াটা একেবারে বাজেখরচ। তাঁর হয়তো ধারণা আমি এতো দিনে একেবারে মরে গেছি। তাঁকে বিরক্ত করে লাভ নেই, মা।

—তবু, তুমি তো তাঁরই মেয়ে। তিনি যখন বর্তমান, তখন তাঁকে একবার জিগগেস করা উচিত বৈ কি।

—উচিত নয়, মা। আমি যদি বিয়ে করি দময়ন্তীর মতো প্রকাশ্য সভায় মাল্যদান করেই বিয়ে করবো। আর বিয়ে যদি কোনোদিন ভাঙে, তখন সে-সমস্যা আমাকেই মানিয়ে নিতে হবে। সে-দুর্দিনে, যাকে ত্যাগ করেছি তার থেকে খোরপোশের জন্যে আদালতের তাগাদা আমি স্বীকার করবো না, বাবার অন্নও সে-দিন অরুচিকর। ভাগ্যের বিধান মেনে নিতেও যদি আমি একা মা, সেই ভাগ্যকে নির্মাণ করতেও আমি একাই পারবো। কিন্তু হঠাৎ আমার বিয়ের ভাবনায় এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন বলো দিকি?

অশ্রুর একখানি হাত মা হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে বললেন—আসছে অগ্রহায়ণে প্রভাতের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো, মা।

অশ্রু ঢোঁক গিললো। পর মুহূর্তেই পরিষ্কার গলায় বললে—অগ্রহায়ণ? সে অনেক দেরি, মা। ততক্ষণ আমরা ঘুমুই।

—তবু তোমার বাবা-কাকাদের মত না পেলে মন যে ভারি খুঁৎখুঁৎ করে।

—তার চেয়ে, আমার মত আছে কি না সেইটেই বড়ো জিজ্ঞাস্য। আমার মত থাকে, তা হলেই সমস্ত উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্ব থেমে যাবে, মা। আমি তো আর বিপণির পণ্য নই যে বাবা-কাকারা দর হাঁকবেন। কিন্তু আমি সে-কথা বলছি না—বলছি—

কথা কেড়ে নিয়ে মা বললেন—তোমার মত? মায়ের চোখের সামনে কিছুই আর লুকিয়ে থাকে না। আমার প্রভাতের ওপর তোমার কী যে মায়া সে আমি স্বচক্ষে না দেখলে হয় তো বিশ্বাস করতাম না।

—তা হয় তো করতে না, কিন্তু বিয়ে আমাকে করতেই হবে এমন একটা মারাত্মক সর্বনাশের কথাও কি মা'র চোখে পড়ল না? পাছে তোমার প্রভাতের ওপর মায়া মরে যায় মা, সেই ভয়েই আমি পিছিয়ে রইলাম।

অশ্রুর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ করুণালেশহীন দৃঢ়তার আভাস পেয়ে মা বিস্মিত হলেন: সে কি কথা, অশ্রু?

অশ্রু স্নিগ্ধস্বরে বললে—বিয়েটা সান্নিধ্যের একটা কদর্য আতিশয্য, মা; এতো সব ছন্দের কারুকার্য বজায় রাখতে হয় যে প্রাণবস্তুটিই বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। সে-ভাবহীন কবিতা নিয়ে কোনো কল্পনাস্বর্গেই আর ছাড়পত্র পাওয়া

যায় না, প্রাচীরাবদ্ধ সংসারের সংকীর্ণ উঠোনটুকুর মধ্যেই তার ইতি। লাভ করাটাই বড়ো কথা মা, লোভ করা নয়।

মা বললেন—তুমি তা হ'লে বিয়ে করতে চাও না?

—সম্প্রতি আমি প্রস্তুত নই বলেই যে কোনোদিনই বিয়ে করতে চাইবো না, জীবন-ভবিষ্যতের ওপর আমার তেমনি অনাস্থা নেই। তবে এ-কথাটা আমাকে বলতে দাও যে, বিয়েটাই মেয়েমানুষের সব-কিছু নয়, মা। মৃত্যুর মতোই সে একটা অবশ্যম্ভাবী শারীরাবস্থা নয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নির্দেশানুসারে বিয়েটা এককালে বহুকীর্তিত হয়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞান এখন অনেক পুরোনো তথ্যই বাতিল করে দিয়েছে। প্রয়োজনের দিক থেকে বিয়েটা তো অকিঞ্চিৎকরই, ধর্মের দিক থেকেও তুচ্ছ। পরত্র নিয়ে আমাদের আর ভাবনা নেই মা, যত ভাবি ইহের জন্যে। সেই আমাদের বড়ো ধর্ম, সেইখানে আমাদের অর্থ হলেই মোক্ষলাভ। কথাটা তোমাকে খুলে বললাম, মা।

খুলে বললে কি হবে, মা সেই যে মুখ ফেরালেন একটিও আর কথা কইলেন না। মুহূর্তে তাঁর মন আবার বিষিয়ে উঠতে লাগলো। পর দিন ভোরবেলা প্রভাতের ঘরে ঢুকে মা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘুম থেকে উঠে প্রভাত ব্যায়াম সেরে তখন বোধহয় খাতা-কলম নিয়ে বসছিল, মা'র অনিদ্রাতপ্ত চোখ-মুখের রুক্ষতা দেখে সে যেন আকাশ থেকে পড়লো। কিছু একটা ভেবে নেবার আগেই মা শুধোলেন: তোরা বিয়ে করবি না?

প্রভাত এখনো নিশ্চিন্ত হ'তে পারে নি। ঢোঁক গিলে বললে—এই সন্দেহটা এমন কি ঘোরালো যে, এত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছ? অশ্রু কিছু বলেছে বুঝি?

মা একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠলেন: সাধে কি অমন মেয়ের বাপের বাড়িতে স্থান হয় না? অনাসৃষ্টির চূড়ান্ত। বিয়ে হবে না, অথচ এই আপনা-আপনি, এই মাখামাখির মানে কি?

প্রভাত বললে—কথাটা শুনতেই হয় তো খারাপ মা, কিন্তু মানেটা তো তুমিই জানো। অশ্রু তেমন মেয়ে নয়, যাকে নিয়ে সংসারের সুবিধে বাড়ে। কিন্তু হৃদ্যতার বেলায় ও অপরাজেয়। নর-নারীর সমস্ত হৃদ্যতাকেই বিয়েতে পর্যবসিত করতে হবে এমন নিয়ম চালাতে গেলে তোমাদের জাতিভেদ আর বাঁচে না। বিয়েটা দাবার চালের মতো স্থির মস্তিষ্কে ভাববার কথা, মা। রুগ্ন যে, সে বিয়ে করে সেবা পেতে, সংসারে মন যার উড়ু-উড়ু সে চায় খাঁচা, দোজবরে চায়

অভ্যাস-রক্ষা। কিন্তু যেখানে এমন কিছু লজ্জা ঢাকবার হাঙ্গামা নেই, সেখানে বিয়ে না করাটাই স্বাস্থ্য, মা।

মা চটে বললেন—আমি অত-শত বুঝি না প্রভাত, অগ্রহায়ণেই আমি তোর বিয়ে দেবো কৃষ্ণদয়ালবাবুর মেয়ের সঙ্গে। অশ্রু যাবে কবে বাড়ি ছেড়ে?

প্রভাত বললে—থাক না, আমার বিয়ের নেমন্তন্নটাই খেয়ে যাবে না-হয়।

রাতের পর রাত কাটে। এ-সংসারের সকাল-সন্ধ্যার রূপ যেন বদলে গেছে; রৌদ্রে ঝরছে সোনার কণা, জ্যোৎস্নায় মুক্তোর কুচো। যে-বয়সে লক্ষ্মী ছিল চঞ্চলা, মনোরথপ্রিয়তমা, সেই যেন এ-সংসারে এসে বাসা নিয়েছে, কিন্তু বাঁধন তার বড়ো আলগা। মা'র দুই হাত অলস—অশ্রুই দিনে-রাত্রে দু' হাতে ছোট সংসারটাকে নিয়ে সাজাচ্ছে, তার সাজ খুলছে। এই আচরণটাই তার সুশ্রী হ'ত যদি তার মাঝে থাকতো সহজাধিকারের সম্পর্ক; তা নয় বলেই মা'র কাছে তা অমিতাচার। আইনের ওপর যে-দাবি প্রতিষ্ঠিত নয় তার বাদী না হয়ে মা পারবেন কেন? তিনি দস্তুরমতো ঘৃণায় নাসাকুঞ্চন করলেন।

অশ্রুর দেখাদেখি প্রভাতো আজকাল পাঁচটায় শয্যা ছাড়ে; সদ্য-জল-দেওয়া রাস্তার ওপর দিয়ে দু'জনে বেড়াতে বেরোয়। সারা রাস্তা অসাড়, আকাশের শুকতারাটি তখনো নির্নিমেষ। দূরের রাস্তায় গ্যাস দু'একটা করে নিবছে, বাস একটা দেখা যায়। কোনোদিন যায় মাঠে, কোনোদিন অলি-গলিতে। জ্যোতির্জগৎ থেকে শুরু করে জন্মনিরোধ পর্যন্ত কোনো বাক্যালাপই ওদের মধ্যে নিষিদ্ধ নয়। ব্যাস ও বাৎস্যায়ন দু'জনকেই ওরা কম-বেশি প্রাধান্য দেয়। রোদ উঠতে না উঠতেই ফিরে আসে। প্রভাত তার মোটা খাতা নিয়ে বসে কলমের কালি ঝাড়ে, অশ্রু নিজের ঘরে গিয়ে বই পড়ে, রাশি-রাশি চিঠি লেখে, তারপর সংসার নিয়ে মেতে ওঠে: ঝাঁটপাট, বাসনমাজা-তক। সংসারকে ও কবিতার মতো সৃষ্টি করতে চায়—মিল চাই, ছন্দ চাই, এমন কি যতি-চিহ্নও বাদ দেবে না। দুপুরটা ফাঁকা, প্রভাত চলে যায় আপিসে; অশ্রু না-ঘুমিয়ে, চরকা না-ঘুরিয়ে ছবি আঁকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দেখে ওরো ছবি আঁকতে শখ গেছে। সেই জন্য cubism সম্বন্ধে বই কেনে। কোনোদিন মাকে জানিয়ে একাই বেরিয়ে পড়ে, নারী-মঙ্গল-সমিতিতে নয়, বা আর কোনো মহৎ প্রতিষ্ঠানে

নয়—বেরিয়ে পড়ে টহল দিতে, কখনো-কখনো পরিচিত বা অর্ধ-পরিচিত মেয়ে-মহলে গিয়ে আড্ডা দিতে। পাশের বাড়ির একটা বউয়ের নাগাল পেয়ে ও গলির এ-প্রান্ত থেকে শুরু করে পাড়ার অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। হাতের তাস কেড়ে রেখে মেয়ে-মহলে ও বাক্যের তুফান চালায়, বই পড়তে দেয়, গান গায়, ছবি দেখায়। ওর মিত্রের সংখ্যা মাত্রা হারালো। এক দিন কি অদম্য কৌতূহলে ও দুপুরবেলায় একটা গণিকালয়ে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু সে-কথা থাক।

—কেন থাকবে? বল না! প্রভাত আপত্তি করলে।

—রাস্তাটার যে জাত নেই জানতাম না, কিন্তু সেদিন ভাল করে জেনেছি বলেই মনে হচ্ছে ওর ভোল ফেরাতে হবে। মেয়েটির নাম সুরভি। কথায়-কথায় জানলাম লেখাপড়া শিখতে বড় আগ্রহ। যদি এখানে কিছুদিন থেকে যাই, ওকে ঠিক আমি মানুষ করবো। মূক পর্যন্ত পড়তে পারলো, কিন্তু মুক্তি-কথাটা মুখ দিয়ে আর বেরুলো না। দেখি, কি করা যায়। একটা প্ল্যান ঠিক করে ফেলতে হবে।

বিকেলে দু'জনে আবার বেরোয়। বেরোবার আগে অশ্রু ব্যায়াম করে। অবশ্যি ব্রাহ্মানুমোদিত পোষাকে। এবার যায় বেশির ভাগ টকিতে, কখনো-কখনো হাসপাতাল দেখতে, কখনো বা চীনে হোটেলে। রাত্রে ফিরে এসে ঘণ্টা তিনেক প্রভাতের ঘরে নানারকম তর্ক চালায়। স্বর সপ্তগ্রামে উত্তীর্ণ হয়। উদ্বেল দুধের ফেনায় ফুঁয়ের মতো এক পক্ষের একটি অতর্কিত চুম্বনে তর্কের ঝাঁজ নিমিষে জুড়িয়ে আসে। সেই সাধারণত অধর এনে যুক্ত করে যার যুক্তি ফুরোয়। রাত্রে অশ্রু প্রায়ই উপোস করে। মাঝরাতে প্রভাতকে শুইয়ে কপালে চুমু খেয়ে হাতের পাতায় খানিকক্ষণের জন্যে হাত রেখে ক্ষীণায়মান দিবাবসানের মতো অশ্রু ধীরে অপসৃত হয়। মার কাছে শুতে আসে। ইদানি মা আর হাঁ-হুঁ কিছুই করেন না। এর পর কি হবে ভাবতে ভাবতে অশ্রু ঘুম যায়।

মা'র আর সইলো না। অবশ্যি একটা রাগারাগি মাতামাতি করলে কোনোই সুরাহা হবে না, বরং তাল কাটবে। বেশি মোচড় দিতে গেলে ঘড়ির স্প্রিংই যাবে আলগা হয়ে। কাশীর অন্নপূর্ণা পুজোয় ওঁর চলনদার জুটেছে। পোটলাপুঁটলি বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে মা নাটুর হাত ধরে বললেন—যাই।

প্রভাত হাঁ-না করেনি, খবরটা তার কাছে পুরোনো। মা'র ধর্ম-লিপ্সাই

যে তাঁকে টেনেছে শাদা বুদ্ধিতে সে তাই বুঝেছে, কিন্তু অশ্রুর লাগলো খটকা। সে বললে—আমাদের একলা ফেলে যাচ্ছ কি, মা?

মা বললেন—তোমরা একাই তো থাকতে চাও।

অশ্রু প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে মেঝের দিকে তাকালো। দারা না হয়েই সে মাতা-পুত্র বিদীর্ণ করলো নাকি? কিন্তু এই অবারিত উন্মুক্ততার মধ্যে সে তার বন্ধুতাকে কতো কাল জিইয়ে রাখবে? সে বললে—তার চেয়ে আমিই চলে যাই না কেন, মা?

মা বুঝলেন অশ্রুর কোথায় বেজেছে। তাড়াতাড়ি তার মাথায় হাত রেখে বললেন—ছি মা, তুমি যাবে কি? এই ঘর-সংসার তোমার হাতে সমর্পণ করে যাচ্ছি। যদি সময় পাও, একদিন বুঝবে মা, এর ভাণ্ডারে রসের আর থৈ নেই! সে-দিনটি যেন তোমার জীবনে আসে। তোমাকে এর চেয়ে বড়ো আর কী আশীর্বাদ করবো?

চলনদার ব্যস্ত হয়ে হাঁক পাড়লো।

মা বললেন—যাই। এমন একটা সুযোগ খোয়ালে ধর্মের কাছে আমার মুখ থাকবে না। একদিন আবার এই সংসার ছেড়ে ধর্মের জন্যে আকুল হয়ে উঠতে হবে অশ্রু। আমি কিছুরই বিশ্বাস হারাইনি। সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে গিয়ে তোমার যে শিক্ষা হবে তাতেই হয় তো তোমার ভবিষ্যৎ তুমি দেখে নিতে পারবে। আমি মেয়েমানুষকে চিনি, মা।

অশ্রু নীরবে একটু হাসলো। নাটুর চুলগুলিতে হাত বুলুতে লাগলো। নাটু বললো—তুমি আমাদের সঙ্গেই চল না, বৌদি।

অশ্রু তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললো—মা যেতে দিলেন কৈ? আমি চলে গেলে সংসার কে দেখবে?

অন্তরাল গেলো ঘুচে। সকাল হতে নিশীথ। যেখানে অবসর সেখানেও অবকাশ নেই। শারীরিক নৈকট্যের যেখানে অভাব সেখানেও শারীর-চেতনাই প্রখর। অশ্রু হাঁপিয়ে উঠলো।

আপিস থেকে ফিরে এসে প্রভাত আজকাল আর অশ্রুকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয় না। দু'জনে মিলে রাঁধে, গল্প করে, ঠাট্টা খুনসুড়ি, খুঁটিনাটি ঝগড়া,

ছু'য়েকটি চিমটি, কয়েকটি চুমু। রাত আসে ঘনিয়ে। তখন তারা পরস্পরের কাছে অসহায়, নীরবে পরস্পরের কাছে অভয় প্রার্থনা করে। ছু'জনেই বোঝে একটু সরে বসতে হবে। অগত্যা রাজনীতি নিয়ে কথা চালাতে হয়। মুশকিল এই, ছু' জনেরই মতে গরমিল নেই। তারপর অন্য কথা পাড়া দরকার। অশ্রু এ হিসাবে খুব মৌলিক। ও ব্যবসা করবে; তারই প্ল্যান ফাঁদে। ইস্কুল-মাস্টারি ঘৃণ্য কাজ। প্রভাতো তার এই হাড়-ঝরানো চাকরিটায় ইস্তফা দিক। অন্যান্য সব বাস্তব সমস্যা। পয়সা না হলে বিয়েটাই অপয়া। যাকে বিয়ে করো তাকে ভালোবেসো, কিন্তু যাকে ভালোবাসো তাকে বিয়ে করো না। কর্তব্যে সে আবিল, দায়িত্বে সে বাধাগ্রস্ত। জুনোর চোখ তখন অন্ধ, সাইথেরার নিশ্বাসে তখন দুর্গন্ধ।

পরস্পরের মাঝে এতোটা ব্যবধান রেখে ওরা এখন বসে যাতে হাত বাড়িয়ে হাতের নাগাল পাওয়া যায় মাত্র; এই স্পর্শটুকু দিয়েই ওরা পরস্পরের দেহের প্রতি প্রণতি জানায়। একটুখানি দূরে সরে গিয়ে ওরা এখন যেন গভীর হয়ে উঠছে, অজস্র চাঞ্চল্যের ওপর নেমেছে ভাবের গাঢ় মন্থরতা, ব্যাকুল প্রকাশকে বাধা দিচ্ছে অনুভূতির অবিচল তন্ময়তা! অশ্রুর সজ্জা-প্রসাধনে এখন আর কৃত্রিম প্রয়াস নেই, মুখখানা সামান্য একটু মলিন দেখায় বলেই লাবণ্যের আর অবধি মেলে না। প্রভাত এখন প্রশান্ত সমুদ্র, তার ওপরকার সৌম্য অনন্ত-বিস্তীর্ণ আকাশ হচ্ছে অশ্রু। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, আকাশ তামসী!

প্রভাত বলে: কিন্তু সীতার প্রতি রাবণের প্রেম রামায়ণে তুচ্ছ হলেও পৃথিবীতে তুচ্ছ হয় নি। প্রেম অর্থ যদি দুঃখের তপস্যা হয়, passion-ই তা হলে প্রেম। হেলেনের প্রতি প্যারিসের কিংবা ফ্রান্সেস্কার প্রতি প্যাওলোর প্রেম আমার-তোমার ঈর্ষার জিনিস, অশ্রু। তোমার Donne-এর কথাই নাও না:

Love's mysteries in souls do grow,
But yet the body is his book.

শরীর একটা ঐশ্বর্য, যদি বলো তাজমহলের চেয়েও কীর্তিময়। প্রাকৃত ভাষায় যাকে বলো এর অশ্লীলতা, তাই তার সম্পদ, তার উজ্জ্বলতা। সম্ভোগহীন সংযম ও কামনাহীন তপস্যা দুটোরই কোনো অর্থ নেই।

অশ্রু হেসে বলে: দেহের স্তবগান করতে আমি আরো বাস্তব ভাষা প্রয়োগ

করে থাকি। কিন্তু প্রেমকে শরীরের সহজ সুবিধায় রূপান্তরিত করবার সময় তার পরমায়ুর সম্বন্ধে চিন্তা হয়। সে সুবিধা টিকিয়ে রাখবার জন্যেই টাকা চাই। যতো দিন তা না হয় তত দিন আমিও হেরিক-এর একটা stanza আওড়াই :

> A sister (in the stead
> Of wife) about I'll lead ;
> Which I will keep embraced,
> And kiss, and yet be chaste.

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলে। রাস্তার গোলমাল ক্রমে-ক্রমে মিলিয়ে এলো। দু'জনের মুখের কথা ফুরোয়। যখন পরস্পরের গাঢ় নিশ্বাস শোনা যায় তখনই সে ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা। সাবধান! অশ্রু উঠে পড়ে। বলে : শুতে যাই।

প্রভাত বলে : আমারো ঘুম পাচ্ছে।

আলাদা দুই ঘরে শুয়ে কারুরই ঘুম আসে না। খানিকক্ষণ ধরে এই ঘুম-না-আসাটুকু স্নায়ুতে একটা মাদক শিহরন তোলে। আবার কখন এক সময় যে তারা ঘুমিয়ে পড়ে খেয়ালই থাকে না। ভোরবেলা জেগে উঠে ওরা ভাবে : একটি অসহিষ্ণু রাত্রি আমরা জয় করেছি। হয় তো এও আবার ভাবে : পূর্ণাঙ্গ পরিতৃপ্তির যূপে এই কামনাকে বলি দিতে না পারলে প্রেমের তপস্যার সিদ্ধি কোথায়? কে জানে শুধু তপস্যাই হয়তো তপস্যার সিদ্ধি।

শুধু আকাঙ্ক্ষাই আকাঙ্ক্ষার ফল।

রবিবারের দুপুর। দশটা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কলকাতার দুপুর বেলাকার বৃষ্টিতে একটি অনতিগাঢ় তন্দ্রাচ্ছন্ন মাদকতা আছে। গলিটা জনহীন, ইলেকট্রিক পোস্টের দাঁড়ের ওপর বসে কাক পাখা ঝাড়ছে। ঘরের দুটো জানলা বন্ধ, পুব দিকেরটা অর্ধেক খোলা। জলের ছাঁট আসছে বটে, কিন্তু বিছানা পর্যন্ত না। দেয়ালে পাশাপাশি দুটো বালিশ রেখে তাতে পিঠ দিয়ে অশ্রু আর প্রভাত কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে বসে আছে। পা চারটে সম্মুখে প্রসারিত, হাঁটু অবধি একটা গায়ের কাপড় দিয়ে ঢাকা। দু'জনে চুপ করে একটা বই পড়ছে—একটা নিষিদ্ধ বই। মনোযোগ অশ্রুরই বেশি। প্রভাত তখন

অর্ধ-জাগরণে প্রায় নিস্পন্দ। চিত্রকর মুরিলো যেমন সর্বদা এক কুমারীর স্বপ্নে বিভোর থাকতেন তেমনি বিভোর প্রভাত হঠাৎ অশ্রুকে নিজের কাছে আকর্ষণ করলো ; অশ্রু বাধা দিলো না। বইটা শেষ হতে আর দশ মিনিট। তারপর আবার আরেকটা নতুন কিছু ভাবতে হবে। হাতের কাছে যদি কিছু না জোটে তবে বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়বার বায়না ধরে নিতান্ত অবাধ্যপনা করবে সংকল্প করেই অশ্রু প্রভাতকে চুমু খেতে দিলে। রোয়াকের ওপর হঠাৎ ডাক-পিওনের আবির্ভাব না হলে চুমু বোধ হয় কর্কশ হয়ে উঠতো। দু'টোর ডাক এলো। পিওন জানলার ফাঁক দিয়ে খামে-মোড়া একটা ভারি চিঠি মেঝের ওপর ফেলে দিলো। অশ্রু তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে আনলো কুড়িয়ে। কা'র এ চিঠি? ইন্দিরার!

প্রভাত বললো: পড়ো তো চিঠিটা! আমার উপন্যাসের উপাদান হতে পারে।

অশ্রু দূরে বসে পড়তে লাগলো :

অশ্রু,

তুমি আমাকে—

বলেই একটু থামলে। বললে—ইন্দিরা কোনোকালে চিঠি লেখে না, তাই শঙ্কিত হচ্ছি, প্রভাত। তা ছাড়া চিঠির আয়তনটাও শীর্ণ নয়। হস্তাক্ষরটাও দু'রকম। দ্বিতীয়টা হচ্ছে পুরুষের।—তোমার উপন্যাসটা কি ডিটেক্‌টিভ নাকি?

আবার আরম্ভ হল :

অশ্রু,

তুমি আমাকে যে আশীর্বাদ করে এসেছিলে তা আর ফললো না। [টীকা : আমি তো অতো বড়ো সতী নই।] আমি স্বামী-পুত্র নিয়ে পরমার্থ খুঁজে পেলুম না। কিন্তু নারীর পরমার্থ যে সেখানেই লুকোনো ছিলো এ সত্য-প্রতীতি আমার হয়েও হলো না। কায়মনে আমি স্বামীর প্রেমহীন ব্যভিচারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলুম, কিন্তু অতৃপ্তির মরুভূমি পেরিয়ে যেখানে এসে বুঝলুম সে আমার পলাতকা মরীচিকা, তখন মরতে আমার আর বাকি নেই। খুলেই বলতে হবে, অশ্রু। আজ জ্বর একটু কম বলেই লেখবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সর্বদেহ বিষাক্ত হয়ে গেছে—কবির ভাষায় নয়, ডাক্তারি কথায়। বাঁচবো আর না।

তবু জীবনে আমি মরতে চাই নি। রমাপতিকে ভুলতে পারবো না, নারী হয়ে এমন অসম্ভব কল্পনা-প্রবণতা আমার ছিলো না। তাকে আমি স্বচ্ছন্দে

ভুলেছিলুম। সে-ভোলার মধ্যে আমার আনন্দ ছিলো। তাকে আমি হৃদয় দিয়ে শুরু করেছিলুম, হৃদয় আমার ক্ষয় হয়ে গেছে। [টীকা : আমাদের হৃদয় কিন্তু এতো সহজে ক্ষয় হয় না। আমাদের হৃদয় সিন্ধুর মতো বিস্ফারিত, বিস্তারিত। একজন বালতি করে জল নিয়ে গেলেই সমুদ্র ডোবা হয়ে যায় না] স্বামী আমার দেহের দুয়ারে এসে দৈন্য জানালেন। আমি অন্নপূর্ণা। শিবকে সন্ন্যাসী হতে দিলুম না। হৃদয় থেকে দেহ—পূর্বরাগে এই হচ্ছে পূর্বাপর সম্বন্ধ ; বিবাহে হচ্ছে দেহ থেকে হৃদয়। সে-প্রতীক্ষার ধৈর্য আমার ছিল বলেই আত্মহত্যা করি নি। আমি ভীরু যতোখানি সত্য, তার চেয়ে বড়ো সত্য আমি সহিষ্ণু। নইলে এই কদর্য দিনরাত্রিযাপনের বীভৎসতা থেকে মৃত্যু আমার কাছে অধিকতর বিসদৃশ ছিলো না, অশ্রু।

মনে হয়, স্বামীকে আমি ভালোবাসতে পারতুম। ভালোবেসেও ছিলুম হয় তো। স্বামী সংজ্ঞাটার ওপর সত্যিই আমার মোহ জন্মেছিল। যেদিন প্রসব বেদনা শুরু হ'ল, উনি [টীকা : অতিপ্রণয়ে সর্বনাম।] শিয়রে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। সেইদিনই দেহে মনে এই কথাই বিশ্বাস করেছিলুম অশ্রু, এর চেয়ে বড়ো সাফল্য বড়ো কৃতিত্ব নারীর স্বর্গে-মর্তে কোথাও কিছু আর নেই। আমি নাথবতী এর চেয়ে বড়ো পরিচয় আমি সন্তানবতী। সন্তানেই আমার স্বামীর পরিচয়। মনে হল ব্যক্তিবিশেষ গৌণ, সন্তানই আমার সন্ধান ছিলো। এর জন্যে দেহপাত করে সুখ আছে। আকাশের কোলে সূর্যোদয়ের চেয়ে জ্যোতির্ময়, যুগান্ধকারের পরে নব প্রতিভার নবীন প্রদীপ্তি। আমি মূর্খ ছিলুম বলেই এতো দিন দেহের এই উৎসবকে সম্মান করিনি, কিন্তু সেদিনের সম্ভাবনার স্বপ্নে আমি মেরির চেয়েও গৌরবগর্বিতা ছিলুম।

ছেলেবেলায় সেই যে বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবীর কথা পড়েছিলুম সে আমার মনে কোথায় যেন দাগ ফেলেছিলো। ভগবতী দেবীই আমার কাছে মা'র আদর্শ ছিলেন। আমি মনে-মনে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলুম। কিন্তু ঈশ্বর আমার সদয় হলেন না।

তিন দিন তিন রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে মৃত পুত্র প্রসব করলুম, অশ্রু। আমার জীবনে এত বড়ো ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার সমস্ত আকাশ শূন্য হয়ে গেলো। খালি ধুলো আর আবর্জনা। কর্দমের সমস্ত আবিলতা ঘেঁটে যে-পথ উদ্ধার করতে চেয়েছিলুম তার কাঁটাই আমাকে বিঁধে রইলো। মনে

হল আমি কতো কুৎসিত, স্বামী কতো রূঢ়! মনে হল আমরা ছুটো যন্ত্র, কর্কশ, স্থূল, সুষমাহীন। যা ছিলো "pulse of the machine" তাই গেলো হারিয়ে। ভাবলুম বাঁচবার আর মানে কী?

ডাক্তার ভয় দেখালো। নিজেও বুঝি এ আমার অন্যায় আবদার—বাঁচা আমার হবে না। তবু আমার দুঃখ নেই। আত্মহত্যা যদি একটা experiment হয়, জীবন তারো চেয়ে বড়ো পরখ, অশ্রু। আমি আরেকবার পরখ করবো। আবার কাদা ঘাঁটবো, কাঁটা দল্‌বো, মরু ডিঙোবো। মরীচিকা নয়, জল চাই; সেই জলই আমার কাছে নামান্তরে জীবন। সন্তান আমার চাই। সেই আমার আসন, আমার আশ্রয়, আমার মহিমা। এর চেয়ে দেহের আর কী বড়ো কবিতা হতে পারে ভাবতে পারি না। বিবাহকীর্তনে ভল্‌টেয়ারের সঙ্গে না মিলি ক্ষতি নেই, কিন্তু এ-সম্পদ অর্জনে পরাঙ্মুখ থাকবার মধ্যে অহংকার দেখতে পাইনে। আমি যাতে বাঁচি, দিনে-রাত্রে ভগবানের কাছে এইই খালি প্রার্থনা করছি। তুমিও অশ্রু, প্রার্থনা করো।

না না, এর পরে বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা বেখাপ হবে। অশ্রু পৃষ্ঠা উল্টোল:

বৌদির ও-চিঠিটা আর ডাকে দেওয়া হয় নি। টেবিল গুছোতে গিয়ে চিঠিটা আজ নজরে পড়লো। বৌদির লেখা সযত্নে গুছিয়ে রাখবার ইচ্ছা ছিলো বলে ওটা পড়তে হল, দেখলুম চিঠি—অশ্রুদিকে লেখা। ভাবলুম, আর একটা লাইন জুড়ে না দিলে চিঠিটা অসম্পূর্ণ থাকবে।

কাল সন্ধ্যায় বৌদি মারা গেছেন। ইতি। বিমল

আজকে অশ্রুর শেষ রাত্রি। মানে, কাল সে কলকাতা ছাড়বে। এ-সত্য অবশ্যি সে দিনের বেলায় জানতে পায়নি। পাবে—রাত আরেকটু গভীর হোক্।

এ-অঞ্চলটায় মশা কম বলেই তো মনে হয়—মার মতো অশ্রু মশারি খাটায় না। জানলা খোলা থাকে, দোরটা ভেজানো। আলো নিবেছে। অশ্রু ঘুমিয়ে। ঘুম অশ্রুর পাতলা নয়। তাই কে একজন যে তার শিয়রে বসে কপাল ও

কানের কাছের চুলগুলিতে আঙুল বুলুচ্ছে সে তা টের পায় নি। কিন্তু সেই হাত যখন গ্রীবা উত্তীর্ণ হয়ে বুকের সমীপবর্তী হয়েছে তখন সে চোখ খুললো। বুঝলো, প্রভাত।

বুঝতে অশ্রুর দেরি হল না। সান্নিধ্যের অপচয় হয়েছে। নিভৃতির সীমারেখা লঙ্ঘন করেছে প্রভাত। কিন্তু প্রেম অর্থ যেমন আত্মদান তেমনি আবার শাসন। প্রতীক্ষাটা হচ্ছে প্রস্তুত হওয়া। প্রস্তুত আজো কেউ হয় নি। অশ্রু এক মুহূর্ত কি ভেবে মাথাটা প্রভাতের কোলের ওপর ধীরে তুলে দিলো। সকল উগ্রতা উপশান্ত হল বুঝি। প্রভাত তার চোখে চুমু খেলো।

অশ্রু বললে—এসে অবধি আমার এস্রাজটা থলের মধ্যেই বন্দী হয়ে আছে —তাও তক্তপোষের তলায়। তাই আজ একটু বাজাই। বার করো না।

ইঙ্গিতটা ব্যক্ত। তবু প্রভাত বললে—গান তুমি কাল গেয়ো।

অশ্রু উঠে বসলো ; হেসে বললে : গান তা হলে আমি কালই গাইব। কাল আমি জলপাইগুড়ি চলে যাব, প্রভাত। আমার বিচ্ছেদেই হবে তোমার গান। বলে উঠে বসে এবার সে প্রভাতের মাথাটা নিজের কোলের ওপর টেনে আনলো। তার মুখে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে—পৃথিবীতে আজো এমন কবিতা লেখা হয় নি বন্ধু, যে আবৃত্তি করে তোমার চোখে স্বপ্ন এনে দি।

প্রভাত বললো : কাল সত্যিই চলে যাবে ?

—তোমার কষ্ট হবে খুব ?

—হবে ; তবু—

—কি তবু ?

—তবু তুমি থাকো এ কথা জোর করে বলি কি করে ? আমার এ হত-কুচ্ছিত বাড়ি-ঘর, এ হতকুচ্ছিত চাকরি—

—তবু এ নিয়েও, এ সত্ত্বেও তোমার দুর্ধর্ষ শক্তি—সে তুমি তোমার শরীরে-মনে সর্বক্ষণ অনুভব কর না ? অশ্রু আদরে আরো একটু উদার হল।

—সে তো ভালবাসার শক্তি। মাথা তুলে উঠে বসল প্রভাত।

—হ্যাঁ, সেই শক্তিতে তুমি এই নির্জনতাকে পর্যন্ত পরাভূত করলে। মা কি রকম বিপন্ন করে ফেলে গিয়েছিলেন আমাদের ! ভেবেছিলেন এর থেকেই বুঝি আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে। বিয়ে আর সকলের জন্যে হোক, আমাদের জন্যে নয়। আমরা বিবাহের চেয়ে বড় !

—সে শুধু তোমার কৌশলে, তোমার কারুকলায়। নইলে আমি তো ছন্দ পতন করে ফেলেছিলাম!

—না, সমস্তই সেই শক্তির গুণ। তারি জন্যে তুমি অন্ধ হতে পারনি, হিংস্র হতে পারনি—

—হ্যাঁ, সেই শক্তিতেই তোমাকে আমি ছেড়ে দেব।

—ছেড়ে দেবে কি গো, শুধু দূরে রাখবে।

—হ্যাঁ, শুধু দূরে রাখা। নিকটই ভয়ের। দূরই আশার। নিকট দুর্বল করে, দূর অক্ষয় করে রাখে। তুমি দূরেই তোমার কাজে চলে যাও।

—আর তুমি?

—আমি ততদিন আমার উপন্যাসটা শেষ করে ফেলি। কিন্তু, প্রভাত উদ্বেল হয়ে উঠল: তাই বলে তুমি কি আর ফিরে আসবে না?

তাকে ধীরে সরিয়ে শান্তস্বরে অশ্রু বললে,—এ উপন্যাস তো শেষ হবার নয়, যখনই ডাকবে তখনই ফিরে আসব। উপন্যাস কেবলই বেড়ে যাবে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, পর্বের পর পর্ব।

দার্জিলিঙ মেল ছাড়লো রাত্রে। প্রভাত প্ল্যাটফর্মে—অশ্রু একটা সেকেণ্ড-ক্লাশ কামরার জানলা ধরে বাইরের দিকে চেয়ে।

কারু মুখে কোনো কথা নেই।

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা দিয়েছে। প্রভাত তাড়াতাড়ি জানলার কাছে সরে এসে বললে—আবার কবে ফিরবে?

অশ্রু হাত বাড়িয়ে প্রভাতের হাত স্পর্শ করলো: বলেছি তো, যখনই ডাকবে তখনই ফিরব। একবার আমি ডেকেছিলাম, এবার তুমি ডেকো।

একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী

১

'হ্যাঁ গো, কেন এলে মরতে এ পথে? এ ধারের পথই দূর, অনেক ব্যাঁক। বাবাঃ বালি কি তাত তেতেছে! পা পুড়ে গেল! ও হেমা মাসী, আর যেন জেবনে এ পথে হাটিস নে। ওরে বাবা! দৌড়ে-দৌড়ে চল—'

'ওলো ভালখাগি, পা শক্ত হবে। তোর কি আঙা চরণ? তাই চেহারে বসে থাকবি? আর পাঙ্খার বাতাস খাবি? একটুকু পথ আর যেতে পারবি না? চল ঐ গাছতালাতে সমাই মিলে একটু বসব, তার পর ধীরে-স্থস্থে ছেমায়-ছেমায় যাব। আর কতক্ষণ চোখ বুজে দে ছুট—'

হাট থেকে ঝাঁকা-মাথায় বাড়ি ফিরছে মেয়েরা। এক পাড়ার এক দল। হেমাঙ্গিনী সব চেয়ে বড় আর সব চেয়ে ছোট কুড়ানি। কুড়ানি আগে-আগে ছোটে, হেমাঙ্গিনী চলে ঢিকোতে ঢিকোতে।

কেনই বা ছুটবে না কুড়ানি? পাতলা, ছিপছিপে গড়ন, বয়স কুড়ির এখনো চার-পাঁচ বছর বাকি। তার চরণ না রাঙা হোক, চলনটুকু রাঙা।

তিন মাইলের পথ ঐ স্বজনতলার হাট। মাঝপথে নদী পড়ে। নদী পেরিয়ে বাগান। আর বাগান পেরিয়ে সামান্য কয়েক বিঘে জমির মাথায়ই এদের বাড়ি।

গা-হাত-পা-মেলা প্রকাণ্ড জাম গাছ। ফলেছে যেন মেঘ করে আছে।

উপর-ডাল থেকে কে হঠাৎ ডেকে উঠল: 'ও মাসী, জাম খেয়ে যা—'

কে গাছে কে জানে। তবু হেমাঙ্গিনী দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল: 'ওরে বাবা, পাড়, পাড়! ঢের করে পাড়। যাই—যাচ্ছি আমরা। বাবা! রোদে চিনচিন করছে।'

কুড়ানি আগেই গেছে গাছের তলায়। পাতার আড়ালে কোথায় কে লোক, ঘাড় তুলে এদিক-সেদিক তাকিয়েও খুঁজে পাচ্ছে না।

'ওগো, এই ধারে এস।' উপর থেকে আবার কথা এল: 'গাছতলায় বোস। গা-টা জুড়োও। দুটো পাকা জাম খেয়ে মন ঠাণ্ডা করো।'

লোকের তবু দেখা নেই।

কুড়ানি ঘাড় বেঁকিয়ে উপরে তাকিয়ে ছড়া কাটল :

জিভ শুকিয়ে জরজর
গুপীনাথ, ফলার করো।

উপর-ডাল থেকে অমনি কে চাপান দিলে :

জিভের উপর পড়লে জাম
জিভ অমনি কালো শ্যাম।

লোকটা কী ফিচেল রে বাবা!

'এই দেখ, সরে যাও। গায়ে জাম পড়বে, কাপড়ে দাগ লাগবে। আমার কিন্তু দোষ নাই।'

মুচকে হেসে কুড়ানি আবার উপরে তাকাল। আর অমনি দড়বড়িয়ে তার উপর জাম পড়তে লাগল।

কুড়ানি হাসে, নিচু হয়ে কুড়োয় আর দু'একটা মুখে পোরে।

'আঁচল মেল—' নিচু ডালে নেমে এসেছে গাছের লোকটা।

কেন কে জানে, আঁচল পাতল কুড়ানি। তিন-চার থোকা জাম ঝুপ করে অমনি পড়ল সেই আঁচলে।

'ওরে ও কেশোর! আচ্ছা সময়—তুইও ঠিক হয়ে ছিলি। পাড়, পাড়, দুটো বেশি করে পাড়।' হেমাঙ্গিনীর দল চলে এসেছে গাছের নিচে। 'ও আক্কুসী, খেতে নেগেছিস? কই রে, আমাদের দুটো নড়িয়ে দে—'

হেমাঙ্গিনীর দল বসল গতর ছড়িয়ে।

'আজ বেপাড়ায় কেন মাসী? এ তো তোদের পাড়ায় যাবার পথ লয়।'

'ওরে বাবা, দুষ্কের কথা বলব কারে। যত গাঁয়ের লোক থাতায়-থাতায় আসছে, একটো বিড়ি খাবার জো নাই। তাই বুলি, চো, এই ধারে একটু ঘুরেই চো। ওরে! গাছে জাম কত রে! দে, দে, দুটো নড়িয়ে দে। আঃ, রস কত রে! বেশ সময়ে বেশ কাজ।'

ঢের হয়েছে। আই নেমে আই।

এক-ডাল এক-ডাল করে আস্তে-আস্তে নেমে এল কেশর। নিচের দিকে চোখ সজাগ রেখে। যেন নেমে আসাটা কত বড় হুঁসিয়ারির কাজ।

নেমে আসতেই হেমাঙ্গিনীর পাশ ঘেঁসে বসল গিয়ে কুড়ানি। আর বসল একেবারে বিমুখ হয়ে।

'ত্থাখ্‌ হেমা মাসী, এমন দোপর বেলায় নদীর এ ধারে আসতে নাই।'

'ক্যানে?'

'এই সব ধারে ভূত থাকে।'

হেমা মাসী উত্তর না দিয়ে জাম খেতে লাগল।

'হ্যাঁ গো, জ্যান্ত ভূত। ঐ দেখছিস না শ্মশান, ঐখানে সব মড়া পোড়ায়। আমি ছোঁড়াগুলোকে গরু ঘিরতে বলে এই ধারে এসে পড়েছি। নিজ্জন জায়গা, গা ছমছম করে।'

'গাছটার জাম কিন্তু খুব ভাল।' হেমা মাসী ও-সব কথা কানেও তোলে না।

'কই, দে একটা বিড়ি।' কেশর হাত বাড়ায়: 'বৌটা কাদের মাসী?'

'ক্যানে, চিনিস নে? ন্যাকা!'

'কি করে চিনব?'

'ক্যানে, হরাং-এর বৌ লয়? ও আমার কি হবে—' মনে-মনে হিসেব করতে লাগল হেমাঙ্গিনী। সম্পর্কের খেই ছাড়াতে না পেরে বললে, 'হ্যাঁ রে, তোদের পাড়া আর আমাদের পাড়া তফাৎ কত?'

'নদীর এ-ধার আর ও-ধার।'

'হ্যাঁ রে, তু যে অবাক কল্লি। ত্থাখ লো ত্থাখ, কেশরার কাণ্ড ত্থাখ—'

'তোদের পাড়া আর আমাদের পাড়া অনেক দূর।' কেশর বললে অন্যমনার মত: 'আবার অনেক কাছে। এই ত্থাখ, যখন বান মরে যায় তখন হয় কাঁদর, কাছে, আর যখন বান বাড়ে তখন হয় নদী, তখন কত দূর হয় বল দিকি? আমি ডাক্তারবাবুর বাড়ি থাকি, কালে-কস্মিনে এক-আধ বার যাই। কি করে সকলকে চিনব?'

'তা বটে বাবা, তা বটে। তোমার য-আসা খুবই কম। এই ত্থাখ না কেনে, তু তো ছেলেমানুষ, তত দূর জানিস নে বোধ হয়—তুর মা আমার সোদর পিসির বিটি—পর-পত্যাশা লয়। গাছটার মাইরি জাম কিন্তু বেশ ভাল।' হেমাঙ্গিনী জাম খেতে লাগল।

'ওরে হেমা, চল, আর আরামে কাজ নাই। বাড়ি গিয়ে আঁদতে হবে।'

মেয়েরা আবার পথ ধরল।

কুড়ানি ফাঁকে-ফারাকে থাকছে না, বুড়িদের গায়ের সঙ্গে লেপটে-লেপটে থাকছে। ভর-দুপুরে তাকে ভূতের ভয়ে ধরেছে বুঝি।

গলা ছেড়ে গান ধরল কেশর—

আমার মন কেড়ে পালিয়ে

গেলে ভালো তো হবে না।

ভালো তো হবে না—

ওহে ভালো তো হবে না—

কুড়ানি আপন মনে পথ চলে, কিন্তু পায়ে হোঁচট লাগে। হাওয়াতে গায়ের কাপড় টেনে ধরে।

অনেক দূর গিয়ে ফিরে তাকাল একবার। গাছের আড়ালে নজর চলল না।

২

ময়লা চিট-ধরা কাঁথা গায়ে দিয়ে উঠানের রোদে পড়ে আছে হোরাং। ঘণ্টা তিনেক আগে জর এসেছে হু-হু করে, হয়তো আধ ঘণ্টাটাক পরেই আবার ছেড়ে যাবে।

তা হলেই আজকের মত ছুটি। আজকের মত ভালো থাকা।

তারপর কাল। কালকের কথা কাল দেখা যাবে।

দাওয়ার এক কোণে হেঁসেল। কুড়ানি সেই যে ঘরে ঢুকেছে আর বেরোয় না। হেঁসেল খটখট করে।

'কি গো, আঁদবে না আজ ?' হোরাং একবার কাৎরে উঠল।

'দাঁড়াও গো দাঁড়াও। সব দিন সমারি দেহ সমান থাকে না। আমার গা-মাথা ঘুচ্চে—'

হোরাং চুপ করে গেল। জরটা বুঝি ছেড়ে যাচ্ছে। ঘাম দিয়েছে কুলকুল করে।

তবু কুড়ানি বেরোয় না। দেয়ালে পিঠ রেখে চুপ করে বসে থাকে।

'তবে চাট্টি মুড়ি দে খাই—' হোরাং উঠে এল দাওয়ার উপর।

'মুড়ি নেই।'

'এই তো সে দিন ভাজলি—'

'খরচ হয় না ? পিতি দিন ছু' খোরা করে যে সেবা করছ তাতে ক'দিন চলে শুনি ?'

জ্বরটা ছেড়ে গেলেই ভীষণ খিদে পায়। যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড খাওয়া যায় এক গেরাসে। আর তখন খাবার না পেলে মেজাজ ত্যাড়া হয়ে ওঠে।

'যা না, মালো-বাড়ি থেকে ধার করে আন।'

'মালো-বাড়িতে কি দাদন দিয়ে থুয়েছ যে রোজ-রোজ ধার করে আনব? কাজের বেলায় নাই ভোজনে দেড়া। ধার করতে হয় তুমি কর গে।'

সমস্ত ঘরে জানলা নেই একটা। তবু মাঠের মধ্যে যে হাঁটা-পথ সে পায়ে-পায়ে ফেলে এসেছে তাই যেন একবার বোজা চোখে খুঁজে বেড়ায়।

'একটু আগুন পেলেও না হয় তামাক খেতাম—'

বড় বাজল এসে কথাটা।

ঝটকা মেরে উঠে পড়ল কুড়ানি। শরীরের আদর-আরাম নেই, আবার এখুনি উনুন কোলে নিয়ে বসতে হবে। তোমার কি। খালি মুখ-সাপট। তাই মাঠও তোমার ঠকঠকে। যার মুখ ফলে তার খ্যাত ফলে না।

'তরকারিতে নুন দাওনি না কি? অম্বলে নুন দেখি খুব বেশি। ব্যাপার কি? ওদে তোমার মাথা খারাপ হয়েছিল না কি?' হোরাং খায় অথচ আপত্তি করে।

'বলবার ভাবনা কি। আমার দেহ তো আর দেহ লয়। পুড়ে গেলেই বা কি, ভেসে গেলেই বা কি। কাল থেকে নিজে আন্না করে খেয়ো।'

'বাবা, একটা কথা বুলতে পারব না তুকে।' হাত তুলে বসে রইল হোরাং।

'আমার আসতে দেরি হল, কই, কেউ চাপাতে পারেনি? মা কই আজো এলো না! বাবা! বিটির বাড়ি অমনি সবারি!' ঝটকা মেরে ঘুরে দাঁড়াল কুড়ানি: 'লাও, খাবা তো খাও, আমি শুয়ে পড়ব। আমার গা-মাথা ঘুচ্চে—'

ঘুম আসে না, শুধু ছটফট করে। সত্যিই কি অসুখ হল না কি? হোরাং কতবার শুধাল, ও বৌ, ও বৌ! বৌ সে-কথা কানেও তুলল না। একবার শুধু বললে, 'আমার গায়ে হাত দাও। ধর। দেখ তো, জ্বর এল না কি?'

গা তো নিটুট ঠাণ্ডা। জ্বর কই!

৩

'কাকি ঠাকরুন।'

'কে গা ?'

'আমি কেশরের মা, কেশরের ভাত লিতে এয়েছি।'

ডাক্তার-গিন্নি মোটা মানুষ, নদপদ করে চলে। ভেতরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললে, 'কেনে, কি হল কেশরের ?'

'কেশর আমার গরু চরিয়ে এসে প্যাট ব্যথা করছে বলে শুয়ে পড়েছে। আর আপনাদের বাড়ি আসতে পাল্লে না। কি হলো কে জানে। ডাক্তার-বাবু তো বুঝি বাড়িতে নাই।'

'না, শহরে গেছে। এক বেলার একটু কি অসুখ, একেবারে ডাক্তারের খোঁজ! তোর ছেলের দেখছি যে নবাবী চালের কথা।'

'না মা, তার জন্যে লয়। বেশি বাড়াবাড়ি হলে আপনারাই তো দেখবেন-শুনবেন। আমি এসেছিলাম আমাদের ধানের খুব টানাটানি হচ্ছে। আমাদের ধানটা কবে পাব ? ডাক্তারবাবু থাকলে একবার শোদাতেম।'

'যা, যা, হবে এখন ধান। কেশরাকে কাল সকাল বেলা পাঠিয়ে দিস। ও বাড়ি না থাকলে সব অচল হয়ে ওঠে। ছোট রাখালটা তো আর সব গরুর যত্ন নিতে পারবে না! বুঝলি ? আমার বরাতি কাজ একটা এখনো বাকি আছে। কত দিন থেকে বলছি।'

ভাত নিয়ে চলে যাচ্ছিল কেশরের মা, ডাক্তার-গিন্নি আবার ডাকল। বললে, 'এবার কেশরের বিয়ের জোগাড় গ্যাখ। অসময়ে এমন কাজ-কামাই ভালো নয়। যোগ-সময় হলে বিয়ে দিয়ে দে ঝট করে।'

কেশরের মা বাঁ-হাতে আঁচল হাটকে চোখ মুছল। বললে, 'আমি কি আর বিয়ে দিতে পারব মা ? মাতা-ছাতা নাই। ঘর থেকে দু' পয়সা বার কত্তে পারব না। আপনাদের দুয়োর ধরে পড়ে আছি। আপনাদের দয়ায়ই এই আকাল তরলাম। কেশরের বাপ মরে থেকে কি কষ্টই হল মা—'

একবার যখন শুরু করেছে তখন থামবে না শিগগির!

ডাক্তার-গিন্নি এক কথায় থামিয়ে দিলে। 'যা বাছা যা, আমি ওর বে-তে কিছু দেব। ডাক্তারবাবুকে ধরবি, বুঝলি ? বলবি একখানা গয়না দিতে হবে। বলে এক গাল হেসে সে হাত ঘুরাল। ঝলসে উঠল নতুন-কেনা চপটলতা চুড়ি।

কেশরের ভাত ক'টি কেশরের মা-ই সাবাড় করল। কেশর শুধু বলে, জল দাও, জল খাব।

রাত ঝমঝম করছে! গাছের পাতা, মাঠের ঘাস পর্যন্ত ঘুমিয়ে। কেশরের ঘুম নাই। কেবল যুক্তি আঁটছে কি কৌশলে তার দেখা পাব, দুটো কথা কয়ে জীবন জুড়াব! হা আশা! হা নেশা! কেন ছুঁড়িকে দেখলাম! কেন দু'-চারটে কথা বলতে গেলাম! হায় ভগবান, মানুষের মধ্যে কি মমতার সোঁত ঢেলে দিয়েছ! নইলে কেন এমন হয়? কোত্থেকে আসে এই মমতা? কে বলবে? কে আমায় উপায় করে দেবে? একবার কি হেমা মাসীকে বলব?

না, ছি—এ কি বলা যায় মুখ ফুটে? রাত তো আর পো-তে চায় না। রাত পোলে নদী পার হয়ে যাব না কি কুড়ুর পাড়া?

'মা, জল ঢালা আছে? দাও তো একটু খাই।'

'রাত তো আর পেভাত হয় না। কাক-কোকিল কি সব উড়ে গেছে?' ঘুমের মধ্যে মা বলে উঠল।

'কই মা, জল কই?'

'এ্যাঁ! কি বুলছিস রে কেশর? জল খাবি? আমার বাবা একটু কালনিদ্দিরে এয়েছিল। ঐ ছ্যাখ, দেয়াল ধারে ঘটে আছে, খা। পিদিম জ্বালব?'

'জ্বালো মা, জ্বালো। পিদিমের আলোয় যদি ঘুম আসে।'

'কি হচে তোর বোল দিকিন?'

'কি হবে মা? জ্বর-জ্বালা তো বুঝতে পারছি না। শুধু বুকটা ধস-ধস করছে।'

মা পিদিম জ্বালালো।

'আমার হুঁকো-কলকেটা কোথায় একটু সরিয়ে দাও তো। জল-তামাক খেয়ে যদি একটু ঘুম আসে।'

ঘুম নাই। চিন্তায় হৃদয় বোঝাই। দেখা করতে যাব কি যাব না! দেখা করতে পাব কি পাব না! শুধু একটু চোখের দেখায় কি দোষ আছে?

কাক-কোকিল রা কেড়েছে এতক্ষণে। কেশর ধড়মুড়িয়ে উঠল। রেল-গাড়িতে সিটি দিয়েছে বুঝি। বুঝি এখুনি ছেড়ে দেবে।

'মনিব-বাড়ি চললাম মা।'

'হ্যাঁ রে, এখন কি আত্রি পেভাত হয়েছে? ঝাড়ে-ঝোড়ে এখনো আত আছে। ওরে, আর একটু থেকে যা—'

হাওয়ার আগে ছুটল কেশর। ডোঙা নেই ধারে-পারে, কাপড়-জামা মাথায় বেঁধে কাঁদর পার হয়ে গেল।

এপারে এসে আবার ঠিকঠাক হল। ভিজে গা শুকিয়ে গেল।

ঢুকল কুড়ুর পাড়া। হোরাং-এর বাড়ি কোনটা?

পাড়ার মেয়েরা সংসারের কাজে লেগেছে। কেউ মাড়ুলি দিচ্ছে, কেউ ঝাঁট দিচ্ছে আঙনা। কেউ বা বালতি হাতে চলেছে গোড়ের ঘাটে।

'কে তুমি?' কুড়ানির হাত থেকে পড়ে গেল বালতি।

'আমি সেই জাম গাছের ভূত।' কেশর তৃপ্তির হাসি হাসল: 'ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে পেলাম কাছে। কি, উতোর দাও।'

ভয়ে পাঁশুটে হয়ে গেল কুড়ানি। বললে, 'ওগো, পালাও, পালাও!'

'ভয় নেই। আমি ঘাড় ভাঙবো না, ঘাড়ে চাপবো!'

'কি পাগলের মত বকে তার ঠিক নাই, পালাও। আমার স্বামী উঠবে এখুনি। পাড়ার লোকে দেখে ফেলবে। পালাও।'

'শুধু একটা কথা বল। একটা কথা। তা হলেই চলে যাই।'

'কি?'

'ভরা-নদীতে সাঁতার দিতে পারবে?'

এক মুহূর্ত এদিক-ওদিক তাকাল কুড়ানি। বললে, 'তুমি যদি পার আমিও পারব। জীবনের ভয় করব না।'

তার পর গলা নামিয়ে বললে তাড়াতাড়ি: 'যেমন গম্ভীরে এসেছ তেমনি গম্ভীরে চলে যাও। কেউ দেখে ফেলবে।'

৪

আশে-পাশের গাঁ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসছে। সন্দেহপুর গ্রামে রথের মেলা। সং বেরুবে অনেকগুলি। বেজায় ধুমধাম।

দোকান-পসার মন্দ আসেনি। তেলে-ভাজা, সপ-মাদুর, দিশি কামারের দা-বঁটি, বাঁশি, পুতুল, কাঠের খেলনা। দেব-দেবীর ছবি। খাবারের দোকান এসেছে শহর থেকে।

লালচে ধুলো উড়ছে চারদিকে। সর সর—ঐ পুতনো রাক্ষসীর সং বেরিয়েছে!

কি কদাকার মূর্তি রে বাবা। কেষ্ট ঠাকুরের পুতুল বুকে লাগিয়ে চীৎকার করতে-করতে ছুটে আসছে! কি বিকট টুঁটি একখানা।

বা, কেষ্ট ঠাকুরের দংশন, যন্ত্রণাটা কেমন ধারা—দেখতে হবে তো!

সর সর সর—ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল। মেয়েদের গোলের মধ্যে মেয়েরা দলা পাকিয়ে গেল। মজা পাবে কি ভয় পাবে বুঝতে পেল না।

পুতনো এল ছুতনো করে
এখন প্রাণ বাঁচাবে কিসের জোরে।

এধার-ওধার ঘুরছে আর চেঁচাচ্ছে রাক্কুসী :

বিষের জ্বালায় গেলাম মরে .
এখন প্রাণ বাঁচাবে কিসের জোরে।

বলতে-বলতে রাক্কুসী পড়-তো-পড় একেবারে মেয়েদের গোলের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

'সর সর, পালা! কাণ্ড দেখ দিকিন।'

'মরণ নাই? ওপরে এসে পড়েছে।'

বেছে-বেছে কোন একটা মেয়ের মাথায় চাপড় মেরে বসল রাক্কুসী।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল মেয়েটা : 'দূর হতভাগা! তিদ্দুষে! জকা!' বলতে-বলতে ভিড়ের চাপে পড়ে গেল মেয়েটি।

হৈ-হৈ কাণ্ড!

রাক্কুসী এক লাফে পালিয়ে গেল মুলুক ছেড়ে।

'ও আর কেউ লয় লো—ও কেশরা খালভরা। গেদে মদ ঠুকেছেন, দিগ-বিদিগ নাই।' বলাবলি করতে লাগল মেয়েরা : 'বাবা! ওপরে এসে পড়েছে। থাকত বাঁশ, বসিয়ে দিতাম।'

এই লাও, কালী বেরিয়েছে এবার।

'ওগো, আমার নাকের আপেল কই? এ্যাঁ! কি হবে গো?' গায়ের ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে কেঁদে উঠল কুড়ানি।

কি সর্বনাশ! আশে-পাশের মেয়েরা নড়ে-চড়ে উঠল। পড়ে-ঝরে গেছে বোধ হয়।

'না লো না। ঐ যে রাক্কুসী তোর মাথায় চাপড় মারলে তখুনিই সেটা টেনে লিয়েছে নিশ্চয়।' ফোড়ন দিলে নাথু কেওটের বউ, এককড়ি।

'তু অত লপ-লপ করে বলবি নে।' চোখ পাকিয়ে ঝিকিয়ে উঠল কুড়ানি : 'আমার মাথায় আবার চাপড় মারলে কখন! এই তো দেখলাম এখুনি গায়ের

ওপর। এখুনি পড়ে গেল আঁচল ঝাড়তে। ওগো, তোমরা খুঁজে দাও গো—তোমাদের পায়ে পড়ছি।'

সকলে খুঁজতে লাগল। এককড়ি পর্যন্ত।

কালী বেরিয়েছে, কালী ছ্যাখ কেনে। এক দিকে কালী, আরেক দিকে কৃষ্ণ। আবার গান ধরেছে সং ঠাকুর।

আমি কালা কালী জানি না
ভিন্ন কিছুই দেখি না
যে শ্যাম সেই শ্যামা—
আর তো কিছুই বুঝি না।

কে দেখে ও-সব। বসে-বসে ঘুরে-ঘুরে এপাশ-ওপাশ খুঁজছে কুড়ানি।

'কি মুস্কিলে পড়লাম! বাড়িতে কি বলবে বল দিনি।'

এককড়ির মনটা ভিজে উঠল। বললে, 'বা, তুর কি দোষ! গায়ে পড়ে ডাকাতি করে কেউ যদি ছিনিয়ে লেয় তুই কি কত্তে পারিস? সাপের লেখা বাঘের দেখা। বাঘ অমনি না বলে-কয়েই এসে পড়ে।'

'তোর ঢং থো। বুকে যেন কে ঢেঁকি কুটছে।'

'কেনে, হারিয়ে গেছে বুলবি। আবার কিনে দেবে। অত কি!'

'কিন্তুক সোনা হারানো তো পাপ।'

'আর মন হারানো?'

৫

'তুমি অত সকাল-সকাল ফিরলে যে মেলা থেকে?'

'শরীরে বেজুত ধরেছে। জ্বরটা আজ আর লরম পড়লে না।' হোরাং বললে ধুঁকতে-ধুঁকতে।

কুড়ানি হাঁপ ছাড়ল। রাতে আর হোরাং হাঁটবে-উঠবে না, গোঁজ হয়ে শুয়ে থাকবে। পিদিমের আলো এখন আড়াল করে রেখে খানিক বাদে হাতের থাবড়ায় নিবিয়ে দিতে পারবে। মুখের উপর আলো পড়তে দেবে না।

মুখের উপর আলো পড়লে কি! মুখটা কেমন অচেনা-অচেনা লাগবে! মনে হবে কি যেন নেই। চাঁদের যে কলঙ্কটুকু শোভা তাই যেন মুছে গিয়েছে।

'শুনলাম মেলায় নাকিনি ডাকাত পড়েছিল ?'

'ডাকাত ?' কুড়ানির বুকের ভেতরটা আঁক করে উঠল।

'মেয়েদের গোলের মধ্যে ঢুকে নাকিনি কার গা থেকে গয়না কেড়ে লিয়েছে।'

'যত সব গাঁজা-গুলির গল্প! কি হয়, আর কি রটে! সেই যে গো, নাথু জেলের পরিবার—এককড়ি, তার নাকের আপেলটা হারিয়ে গেছে। তাও হারিয়ে গেছে কি না ঠিক নাই। একবার বলে, ছিল নাকে, আবার বলে ছিল না—বাড়িতেই আছে প্যাটরার মধ্যে—'

'এই ?' একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে নিশ্চিন্ত হল হোরাং। পাশ ফিরল।

বিশ্বাস করেছে। যদি ধরা পড়ত কুড়ানি, আর যদি বলত, এককড়িকে একটা রাতের জন্যে ধার দিয়েছি তা হলেও হয়ত বিশ্বাস করত। কিংবা যদি বলত, তার মা'র কাছে আছে তা হলেও নালিশ করত না।

আশ্চর্য, তার তো কোনো ঘাট নেই, তবু বলতে-কইতে ঠেকছে কেন ? যে চোর, যে হতচ্ছাড়া, তাকে চোর আর হতচ্ছাড়া বলতে দুঃখু কি ?

অথচ সোয়াস্তিও নেই এক কড়া। যা বলবে তাই মেনে নেবে, তবু কেন এমন ভয়-ভয় করছে ? হিয়ের মধ্যে কেন আগুন জ্বলছে কুলকাঠের ?

আঁধারে শুতে এসে কুড়ানি বললে, 'শুনছ ?'

'শুনছি। ঘুম নাই।'

'আমার মা'র খুব অসুখ। বাবা খবর পাঠিয়েছে। লোকটার সঙ্গে মেলায় আমার দেখা।'

'কে লোক ?' কোনো আটা নেই হোরাং-এর।

'আমাদের গাঁয়ের লোচন কুনাই। ছোট ছেলে গো ছোট ছেলে। সটান আসছিল এ কড়ে, মেলাখেলা দেখে ঢুকে পড়ল। আমাকে দেখে হেঁকে বললে, কুড়ান দিদি, তোর মার খুব জ্বর—জ্বরে একেবারে বেমার—'

সাড়া নেই ধারা নেই, চুপ করে পড়ে আছে হোরাং।

'আমি কাল যাব বাপের বাড়ি। মাকে না দেখে থাকতে লারব।'

বেশ কথা। তপ্ত অঙ্গ শীতল হয় শুনে। মা এখনো বোনের বাড়ি থেকে ফিরল না। হোরাং-এর দেহের এই তো হাল। হর-দিন মুনিষ খাটতে পারে না। রোজগারপাতি কাহিল। তার উপর বউ চললেন বাপের বাড়ি। তার মানে, নিজের পিণ্ডি নিজে চটকাও। নিজের ভাতেই বেগুনপোড়া দাও।

'বেশি দেরি করব না, ঝট করে চলে আসব। কি, রা কাড়ছ না কেনে ?'

'বেশ তো, যাবে।' হোরাং পাশ ফিরল : 'পাখা তো নাই যে উড়ে পালাবে ফুড়ুৎ করে। রাতটা আগে পোক।'

'না গো, ভোর রাতেই রওনা হব। পাখা নেই পা তো আছে। ভয় নাই কুনু, সঙ্গে হেমা মাসীকে লিয়ে যাব।'

না, ভয় কি। হোরাং-এর ভয় কি। যে পাখি ছুট দেয় সে পাখি কি পোষ মানে ?

বা, মায়ের অসুখে মেয়ে যাবে না ? মেয়ের অসুখে তার মা যায়নি ? তা ছাড়া অদেষ্টে পালকি-গাড়ি যখন করেনি তখন গা-গতরের উপরই তো ভরসা রাখতে হবে। গড়ন-পিটন ভাল আছে কুড়ানির। জ্বরে ঝুরো-ঝুরো করেনি তাকে। তরতরে জলের মত ঠিক চলে যেতে পারবে। সঙ্গে যদি হেমা মাসী থাকে চুলের ডগাটি কেউ ছুঁতে পাবে না।

না, ভয় কি। ছেলেমানুষ, মার অসুখ শুনে তাড়াতাড়ি তো করবেই। যাক, দু'দিন হেসে-খেলে আসুক। ক্ষেমা-ঘেন্না করে হোরাং পারবে'খন দুটো ফুটিয়ে নিতে। জ্বর যদি বেশি চাপে, না হয় দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকবে।

জ্বরটা বুঝি ছেড়ে গেল হোরাং-এর। ঘামের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এল।

কিন্তু এত নিশ্চিন্ত হয়েও কুড়ানির ঘুম নেই কেন ?

রোগও নেই, বালাইও নেই, তবু কেন সে ছটফট করছে ? তার দোরের ছিটকিনি নিটুট আছে, ঘরের একটা বাঁশ-খুঁটিও তার নড়েনি, তবে তার ভয় কিসের ?

অনেকগুলো মিথ্যে কথা বলেছে, তাই ?

সংসারি-গৃহস্থি করতে হলে অমন দু'চারটে কথা বলতেই হয় ইদিক-সিদিক। তাকে মিথ্যে কথা বলে না।

৬

'এই সময় একটু সময় আছে বাবুদিদি। আপনার সেই বরাতি কাজটা—'

'এখন সময় হয়েছে শালো ? মুনিব-গিন্নি তেড়ে এলেন : আজ কত দিন থেকে খোসামুদি করছি, ওরে কেশোর, যা রে—শালোর কাজই ফুরোয়না—'

'চাষের কাজ এক রকম সারা! কেবল কালকের দিন আক ক'টা বাঁধতে পারলেই খালাস। যদি বলেন তো কাল-পোরশুর মধ্যেই যেতে পারব।'

'কালই যা। আমি চিঠি লিখে রাখব।'

'তিন-চার দিন ছুটি দিতে হবে কিন্তুক।' চোখের খুশি ছিটকে পড়ল কেশরের।

'কেনে, মতলবখানা কি?'

'দূরের পথ তো। গাঁ-ঘরও ঘুরে আসব এই ফাঁকে।' বলেই তাড়াতাড়ি কথা পালটাল কেশর: 'আচ্ছা বাবুদিদি, কোন পথটা সুবিধের হবে বলুন দিনি! সোনার ডিহির কাঁদরটা পার হওয়া কঠিন ঠেলা। সব সময় নৌকো-ডোঙা থাকে না। আসলপুরের ভেতর দিয়ে গেলে অনেকটা ঘুর হয়—'

'আমি রাস্তার কি জানি রে শালো? আমি গাঁয়ের পেসিডেন?'

হোঁচটটা সামলে নিল কেশর। 'যা হয় তাই হবে। জয় গুরু বলে চলে যাব। মরা কোয়োর আবার চড়কের ভয়!' বলেই আবার এক পা ফিরল: 'হ্যাঁ, আমার সেই টাকা ক'টা বাবুদিদি—'

'কেনে, টাকা দিয়ে কি করবি?'

'ধার শুধব।'

'কত ধার?'

'এই গোটা কুড়ি।'

'বলিস কি ভেষণ কথা? কার ঠেঁয়ে ধার? তোর মা জানে?'

'ঠিক ধার লয়।' থতমত খেল কেশর: 'এই এক জনকে দিতে হবে। তার বড় ঠেকা। খাজনার দায়ে জমি লাটে চড়েছে।'

'আমার সঙ্গে চালাকি? পরের জমি লাটে উঠুক তোর তাতে কি? কি হয়েছে লুকোস নে বলছি।'

কেশর আরো একটা মিথ্যে কথা বলল: 'আসল কথা কি, জমি ধরব এক-খানা। কাঠা দশেক। দোফসলী জমি। তারই জন্যে আগাম বায়না দিতে হবে।'

'সোজা কথা খোলামেলা না বলে তা-না-না-না করছিস কেনে? আমি তোর টাকার তবিলদার, আর আমারই সঙ্গে লুকোচুরি?'

'নিজে জমি লিলে নিজেই নিজেরটা চষা-খোঁড়া করব তো! তখন তো এই বাড়ির চাকরি ছাড়তে হবে! যদি তাই শুনে রাগ করেন—'

'উহু, হল না। ঐ এক-টুকরো জমির জন্যে এমন খোর-পোশাকের চাকরি ছাড়ে কেউ? ও জমি থেকে পাবি কি নিট? অমনি লাগিয়ে দিবি কাউকে।'

'নিজের জমি নিজে চাষ করব না? ইস্তকনাগাদ পরের বাড়ি চাকর খাটব?'

'ও শালো! তোমার তলে-তলে এত সোঁত। ভাতে হাত ভাল লাগছে না বুঝি, ছাইয়ের গাদায় হাত দিতে চাও? বলি তোর মা জানে?'

'মা মেয়েমানুষ, জমির মোকদ্দমা সে কি বোঝে?'

'তুই বুঝিস! বল শালো, জমিদার কে? কোথায় জমি, কোন মৌজা? দাগ-খতেন কত? স্বত্ব কি? নিরিখ কত খাজনার?'

কেশরের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। মুখে আর কথা ফোটে না।

'সত্যি কথা কি, বল আমাকে গোপে-চুপে।' ডাক্তার-গিন্নি চোখে-মুখে শাসনের ঝলক আনলেন: 'কোনো খিটকেল বাধিয়েছিস বুঝি?'

কেশরের মাথায় কি বুদ্ধি এল, এক গল্প বানিয়ে ফেললে। স্পষ্ট মনে হল বাবুদিদির মুখে তেমনি গল্প শোনার ঝোঁক।

'সমাজে জরিমানা ধরেছে আমার।'

'জরিমানা? তোর মা থাকতে তোর জরিমানা? কেনে, কি করেছিস?'

'একটা মেয়ের সঙ্গে পেনয় হয়েছে বাবুদিদি।' ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে কেশর মাটি খুঁটতে লাগল।

'কে মেয়ে? কাদের মেয়ে? আইবুড়ো না বেধবা? বয়েস কত? কড়ে রাঁড়ী বুঝি কেউ?'

'না, সোয়ামী আছে। সোয়ামীটা ভেড়ুয়া। আগুন তুলে তামাক সেজে দিত আমাকে। কত চলা-বলা, কত ওঠা-বসা—'

ডাক্তার-গিন্নি রসান দিতে লাগল। গল্পের জিলিপি চাপাল কেশর।

আসল কথায় আসে না। কেবল আগড়ম-বাগড়ম।

'মেয়েটার সঙ্গে কি হল?' ডাক্তার-গিন্নি দাবড়ি মেরে উঠলেন।

'কিছুই হয়নি বাবুদিদি। এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি। এই একটু এসরাতে কথা হয়েছে। আর ফাঁকে-ফুঁকে কথনু একটু ঠাট্টা-ঠুট্টি—'

'তার পর?'

'কি চোখে কি দেখে ফেলল কে জানে, বৌটার সোয়ামী সমাজে গিয়ে লাগান-ভজান দিলে। নানান কেচ্ছা করলে আমার নামে।'

'শেষে হল কি ?'

'মিটিং হল। আমার আগুন-কলকে হুঁকো-পুরুত বন্ধ—'

'তোর কেন ?' ডাক্তার-গিন্নি ঝাঁজিয়ে উঠল: 'ঐ বৌটাও তো সমান দোষে দুষী। ও কেন পতিত-রহিত হবে না ?'

'বৌটার কি দোষ ? দোষ তো ঐ ভেড়ুয়ার। ও কেন নিজের পরিবারকে শাঁসতে পারল না ? শাঁসতে পারবি না তো দড়ি লম্বা করে দিস কেন ? দড়ি লম্বা দিস তো আবার আঁধারে ফাঁস লাগাস কেন ? খেতে দিয়ে পাতা কেড়ে নেবার মানে কি ?'

'ঠিকই তো। ওদেরই তো শাস্তি হওয়া উচিত ছিল।'

'ওরা যে আগে নালিশ করলে তাই ওরা রেয়াৎ পেলে। ঘুস যে দেয় আর ঘুস যে নেয় দু'জনেই এক কাঠরার আসামী। কিন্তু, এমন মজা, যে তাক বুঝে আগে গিয়ে নালিশ করতে পারবে, সেই ছাড়ান পেয়ে যাবে, দুষী হবে অন্ত জন। এ-ও তেমনি। আমি যদি গিয়ে বলতাম, ঐ ভেড়ুয়া উয়ার পরিবারকে দিয়ে ঘেরে-ঘেরে ঘিরে ফেলতে চায় আমাকে, তা হলে সমাজের রাগ ওর ওপর গিয়ে পড়ত। ওরা থাকতে ঠেকো হয়ে। কার হল পাপ আর কার হল মোক্ষন !' কেশর কাতরভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে। কাহিনী কোথায় শেষ করবে বুঝে উঠতে পারলনা।

'নাপিত বন্ধ হয়নি ?'

'নাপিত হয়নি আমাদের এখনো। আমার চুল মা কেটে দেয়।'

কেশরের মাথার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ডাক্তার-গিন্নি। বললে, 'এত বড় কাণ্ড, তোর মা তো কিছুই বললে না আমাকে !'

'মাকে জানতে দিইনি। পতিত-রহিত হলে পাছে গাঁ-ঘরে ডঙ্কার পড়ে যায় তাই ওটাকে ঠেকিয়েছি। শুধু জরিমানা করল—দু'সনজে পাকা ভোজ, তার সঙ্গে পাকা মদ—কুড়ি টাকা লাগনা। সেই টাকাটাই চাই বাবুদিদি।' কেশরের চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

'তা দিচ্ছি। তোর আমানতী টাকা তোর শ্রাদ্ধে-বিয়েতে লাগবে বলেই ছিল। তা না হয় প্রাশ্চিত্তিতেই যাক। কিন্তু বন্ধুতার লোককে ছেড়ে দিতে পারবি ? মনটা ছোঁক-ছোঁক করবে না ? হু-হু করবে না বুকের মধ্যে ?'

কেশর মিটিমিটি হাসতে লাগল।

'ঐ ভেড়ুয়াটি কে ? নাম বল। আমি লাগিয়ে-পটিয়ে বউ ছাড়ান নি ওর কাছে থেকে। তার পর তুই ওকে সাঙা কর।'

'আপনি পাগল হয়েছেন বাবুদিদি ? যে মেয়ে সোয়ামী থাকতে অন্য লোকের সঙ্গে পেনয় করে সে তো ঢেমনি। তাকে সাঙা করতে যাব কেনে ? বিয়ে করি তো, চৌকস খাঁটি মেয়ে বিয়ে করব। ভোজ জরিমানা দিয়ে নাক-কান-মলা খাব—পর-গোয়ালে আর জাবনা খেতে যাব না।'

বাবা, কত পাঁয়তারা ভেজে টাকা ক'টা বের করা গেল ! খুব পাপ হল, না ? মুনিব-গিন্নির কাছে এতগুলি মিথ্যে কথা বলা ?

মিথ্যে কথা না বললে কুড়ানির নাকে নতুন আপেল হবে কি দিয়ে ?

৭

'দেখছিস ভাসানি—'

'কি ?'

'ঐ যে নদী—ঐ নদী পার হয়ে বরাব্বর দখিন দিক যাবি। দখিন দিকে যেয়ে আর একটা কাঁদর। কাঁদর পার হবি। কাঁদর পার হয়ে আর পারাপার নাই। তার পর ঐ রাস্তায় বরাব্বর সন্দেপুর—আমার শ্বশুরবাড়ির গাঁ। এবার কালীপুজোর সময় যাবি। বুললি ?'

'কালীপুজোয় বুঝি খুব ধুমধাম ?'

'খুব। রং-বেরঙের সং বেরোয়। ভারি মজার সং—' বলতে বলতে কুড়ানির গা-গতর থমথম করে উঠল।

হঠাৎ নজর পড়ল দখিন দিগন্তের দিকে।

'হ্যাঁ রে ভাসানি, ঐ একটা কে লোক আসছে না ?'

রাঙা মাটির কলসী কাঁখে করে দু'বোন পুকুরে জল নিতে এসেছে। তাল-বোনা পুকুর। সেই পশ্চিম ধার দিয়েই রাস্তা। ভরাভর্তি বেলায় সমস্ত গাঁ-মাঠ ধু-ধু করছে।

'হ্যাঁ দিদি, একটা লোকই তো বটে।'

'গায়ে হাপসার্ট, না রে ?' কুড়ানি এক-পা এক-পা করে নিজেরো অজান্তে এগিয়ে গেল খানিকটা।

'মাথায় নীল গামছা, হাতে পোঁটলা—'

'থমকে-থমকে দাঁড়াচ্ছে, না রে?' স্রোতের জলে যেন পা পড়েছে কুড়ানির। টান দিয়েছে আঁচলে।

হ্যাঁ, সেই-ই তো। কেশরই তো বটে। এমন বিঘটনও হয় না কি পৃথিবীতে?

উঁচু গলায় ডাকব না কি? দোষ কি? এখানকার কেউ চেনে না, কেউ জানে না। নিমনিস্থি এখন মাঠ-ঘাট। আর জানলে-চিনলেই বা কি? আঁতের লোক চলে যাবে সুমুখ দিয়ে, আমি আঁধলার মত পড়ে থাকব? যাই, আর একটু এগিয়ে যাই। গলা ঝাড়া দিয়ে হাঁক দিই।

বুকের মধ্যে ঢেঁকি কুটো না। ধয্য ধর। পরের বাড়ির বউ তুমি। ইচ্ছে করলেই ড্যাঙডেঙিয়ে চলে যেতে পার না। তোমার এখন বুঝ-সুঝের বয়স হয়েছে, রীত-নীত মানো তুমি। আচম্বা লণ্ডভণ্ড ঘটাতে পার না।

না গো, সন্তপ্পনে এগুচ্ছি। ঠাহর রাখছি চার দিকে।

ওগো, ওধারে পথ নাই। এই দিকে এস। এই দিকে। ভাল পথ দেখিয়ে দেব।

মেঘ চাইতেই জল! কেশর থ হয়ে দাঁড়াল।

এই তো সেই কুড়ানি—ঢেঁস্কেলে মাণিক কুড়িয়ে পাওয়া। সাজ-সজ্জে নেই অথচ সোনার পিতিমে।

সঙ্গে ঐ হাস্যমুখীটি কে? যেন এক ঢালাইয়ের কাজ। এক হাতের কারিগরি।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল কেশর।

'যা হোক ভাই তুমি মানুষ বটো। কবে এখানে এসেছ, একটু বলে আসতে হয় না? তক্কে-তক্কে সন্ধান জানলাম, বাপের বাড়ি এয়েছ। কোন পাড়ায় তোমাদের ঘর?'

'চলো, ঘরকে চলো।' উথল হয়ে বললে কুড়ানি। চোখে চাপা হাসির ঝিলিক দিলে।

'না, আমি এখন সোনার ডিহি চলেছি।'

'সেখানে মেলা-খেলা আছে বুঝি? সং সেজে বুঝি খুব কেড়ামাতন করবে?'

''না গো, আর সং সাজব না। মনে রং ধরলে কি আর সং সাজা যায়?'

'জানো, সেই থেকে গায়ে আমার ব্যথা লেগে আছে। শরীরে কি বল বেঁধেছ বল দিনি। কি ডাকাবুকো রে বাবা!'

'কেনে, মনে একটুও লাগেনি সেই ব্যথার ছোঁয়াচ? আগুনে দগ্ধে যাচ্ছ না একটুও? দাঁড়াও, বোঝাটা একটু নামাই। একটা বিড়ি ধরাই। গামছা দিয়ে হাওয়া করি।'

'চলো, বাড়ি দিয়ে চলো। কিছু জলটল খেয়ে যাও।'

'জলখাবার আমার সঙ্গেই আছে। সোনার ডিহি যাচ্ছি ডাক্তার-গিন্নির বরাতি কাজে, কুটুম্বিতেয়। মনের ঝোঁকে এসে পড়লাম এই ধারে—আর ভগবানের কি দয়া, গাঁয়ে না ঢুকতেই তোমার দেখা পেয়ে গেলাম। ক'দিন আছ এখানে?'

'ক'দিন আর! কাল-পরশুই ফিরে যাব। রোগা-ভোগা স্বামী ফেলে কদ্দিন বসে থাকা যায়?'

'তবে আসাই বা কেন ঢং করে?'

'না এসে উপায় কি! তারপার ডাকাত পড়ে নাকের আপেল কেড়ে নিয়েছে এ তো আর বলতে পারি না। যে শুনবে সেই ভাববে, একাবেঁকা। এবার বাপের বাড়ি থেকে ফিরে গিয়ে বলতে পারব মা'র কাছে রেখে এসেছি।'

'ডাকাত বলবে কেনে? বলবে জাম গাছের ভূত।'

বলে কিশোর জামার পকেট থেকে কাগজে মোড়া কি একটা বের করলে। বললে, 'দেখ দিকি, এই তোমার সেই হারানিধি কি না—'

'ওমা, তার চেয়ে যে অনেক ভাল, অনেক সুন্দর! ওমা, ই পেলে কুথা?'

'ভূতের কাণ্ড, তুমি-আমি কি বুঝব? এস এগিয়ে, পরিয়ে দিই।'

'না, না—' এগিয়ে আসতে-আসতে পিছিয়ে গেল কুড়ানি: 'পরের সোনা নিয়ো না কানে, কেড়ে লেবে হেঁচকা টানে। চলো ঘরে চলো। পিছিয়ে যেতে যেতে কুড়ানি আবার এগিয়ে এল। খপ করে কেশরের হাত ধরে ফেললে।

কুড়ানির হাতের মধ্যে কাগজের মোড়কটা গুঁজে দিল কেশর। বললে, 'নাও গো, হারানো ধন ফেলতে নাই।'

'হারানো ধন কি আমার ঐ নাকের আপেল?' আঁচলের খুঁটে কুড়ানি বাঁধল সেই কাগজের পুঁটলিটা। বললে, 'চলো মাইরি। বাড়ি চলো। কিছু

ভয় নেই। তোমার ওই জলখাবার ক'টা আমি খাব। তুমি আমাদের বাড়ির জলখাবার খাবে। চলো, ও কি, ও পুঁটলি আবার খুলছ কেনে?'

'ওগো, মায়ের জন্যে কটা সরু চাল লিয়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম ফেরবার সময় বাড়ি দিয়ে ফিরব। তা আর হবে না। ফেরবার সময় এ পথ দিয়েই ফের ঘুরতে হবে।' কেশরের চোখে হাসির ঝিলিক খেলল: 'তখন যাব তোমাদের বাড়ি।'

'আর ই চাল?'

'ই থাক তোমার কাছে। যখন গাঁয়ে ফিরবে তখন এক দিন দিয়ে এসো গে আমার মা'র কাছে।'

'ওমা, আমি যাব কি, ওরা তো আমাকে চেনে না কেউ—'

'ওরা না চেনে, তুমি তো চিনে রাখো। আমি তোমার ঘর-বাড়ি চিনে রাখছি, তুমি আমার ঘর-বাড়ি চিনে রাখবে না? সমান-সমান না হলে এক খেয়ার জল হব কি করে?'

'ওরে ভাসানি, শোন তো বোন। চো, ই পুঁটলিটা লিয়ে চো তো। ঐ দেখছ বাড়ি, চিনে থাকা ভালো। বেশ, এখন যদি নাই যাও, ফিরে এসো গা। রাত্তিরে এখানে থাকবে। আমি খাবার ঠিক করে রাখব। যদি না আস ভাল হবে না। আমার মরা-মুখ দেখবে। মাথার দিব্বি লাগে। হ্যাঁ, আর শোনো, এলে পরে একটি খুব গোপনের কথা বলব। মানুষ চেনা যাবে। দেখা যাবে পাণের টান। চো লা ভাসানি, জল লিয়ে বাড়ি যাই। মা এতক্ষণ ভাবছে। ওষুদ দিতে হবে। এই দেখ, মনে থাকে যেন, তুমি না এলে আমি খাব না। ঐ দেখ আমাদের বাড়ি, ঐ বড় নিম গাছ। যাও, পরাণ যা চায় তা যেন অমান্যি কোরো না। ঠিক এসো কিন্তু। তোমার ধম্ম তোমার ঠাঁই।'

৮

কই, এখনো এলো না। বেলা শেষ হল। সুজ্জি ডুবতে দেরি নাই। ঐ পথে কত লোক আসছে, সে তো কই আসে না। বোধ হয় আসবে না। আসতে ভয় করছে। পরের বাড়ি কেউ যদি কিছু বলে! কে কি বলবে? বাড়িতে বাবা আর মা আর ভাসানি। বলাবলি কিসের! শশুরবাড়ির

গাঁয়ের লোক, জাত-জ্ঞাতের সামিল। কেন আসবে না? বাধাটা কি! ইথানকার লোকেরা কিছু বলবে? কেউ কি তাকে চেনে, না, জানে? অত ভয় কিসের? মানষের বাড়িতে আত্ম-কুটুম আসে না? ভাবী-সাবী থাকতে নাই কারুর? খেতে বসে খেতে পারলাম না। ছিঃ, এমন মানুষ, একটা কথা রাখে না! দরদ বোঝে না। সুযোগ বোঝে না। ছাই মন আমার। পরের লেগে ভেবে-ভেবে শরীর মাটি। 'চেয়ে চেয়ে চোখের ক্ষয়, পর ভরসা কিছুই নয়।'

যাই বাড়ি যাই। আন্ধারে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?

দু'পা যায় আবার দু'পা ফেরে। থেকে থেকে পেছন দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে। জ্ঞানও নেই, ঘেন্নাও নেই, মরণ আর কাকে বলে! ছি!

কতক্ষণ পরে গলাঝাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল বাইরে। কে যেন পথ দেখিয়ে দিল: 'এধারে লয়, ওই ধারে। পাকুড় গাছ লয় নিম গাছ।'

কুড়ানি ছুটে এল বাড়ির ভেতর থেকে: 'কে ডাকছে গো? কে গো?'

'ওগো, আমার বাড়ি সন্দেপুর—'

'ওমা, তাই না কি? কোনো খবর আছে না কি গো—'

হুঁসফাঁস করে কুড়ানির কাছেই হাজির হল কেশর।

'এসো, এসো। আঁধারে চেয়ে-চেয়ে চোখ ঠিকরে গেল! বাড়ি চিনতে পারনি, কেমন?'

বলতে-বলতে আঙনের উপর নিয়ে এল কুড়ানি। কাঁধ থেকে পিঠের উপর দিয়ে আঁচল টানলে।

ঘরের দাওয়ায় বসে কুড়ানির বাপ অনন্ত তামাক খাচ্ছে চোখ বুজে। কুড়ানির সঙ্গে-সঙ্গে একটা লোক ঢুকছে বাড়ির মধ্যে, ব্যাপার কি! কে জানে কি ব্যাপার—তুমি যেমন তামাক খাচ্ছ, তেমনি তামাক খাও। চোখ মেলতে হবে না। বুড়ি তো ঘরের মধ্যে ধুঁকছে জ্বরের ঘোরে, তুমিও তামাকের নেশায় বুঁদ হয়ে থাক। কলির ভর-সনজে এখন।

'এসো কেনে, লজ্জা কিসের? জাত-গিঁয়াতের বাড়ি।' বলে বাপের দিকে মুখ ফেরাল কুড়ানি: 'আমাদের গাঁয়ে আমাদেরই লোক। এ-পাড়া আর ও-পাড়া—মাঝে একটা কাঁদর—'

'বোসো বাবা বোসো! লাও, হুঁকো লাও।' অনন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল: 'কোথা থেকে আসছ বাবা?'

'আজ্ঞে, মনিবের কাজে সোনারডিহি গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরতে রাত হবে তাই ভাবলাম আমাদের গাঁয়ের কুটুম হোরাং-এর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উঠি। হোরাং তো আমাদেরই এক গাঁয়ের লোক। এ-পাড়া আর ও-পাড়া—'

মাঝখানের কাঁদরটুকু বাদ দিয়ে দিল। কুড়ানির কালো চোখের হাসির ছটা অন্ধকারেই যেন টের পেল কেশর।

'তা বেশ করেছ বাবা, বেশ করেছ। কুটুম লোকের ছেলে, আসবে বৈ কি, একশো বার আসবে! অমত-আপত্তি করবে না। রাত্রিটা থেকে সকাল বেলায় চলে যাবে।'

কালো চোখের ঝলকানিটা আবার যেন মনের অন্ধকারে দেখতে পেল কেশর।

'এই দেখ বাবা, বাড়িতে সব অসুখ-বেসুখ। যোগ্য ছেলে নাই। বুড়ো বয়সে কত খাটব। চাষ-বাস আছে। কোনো রকমে সংসার চলে। বাড়িতে আমার ভারী হিসেবী লোক, তাই টিকে আছি টিমটিম করে। আবার দেখ, ছোট মেয়েটার বিয়ের জোগাড় দেখতে হবে—'

মুখের কথা কেড়ে নিল কুড়ানি। বললে, 'বাবা, ভাসানির বিয়ে আমাদের ঐখানেই দেবে গো। দুই বোনে এক জায়গায় থাকব। এক খবরে সব হবে।'

'তাই হবে বাবা, তাই হবে। সমাই মেলে দেখে-শুনে দাও কেনে। হাঁ গো, তোমার মায়ের জ্বর ছেড়েছে?'

'আজ যেন জ্বরটা ছেড়েছে বলে মনে হয়।' কুড়ানি হেঁসেলের দিকে যেতে যেতে বললে, 'হা বাবা? ভাত খেয়ে নাও কেনে।'

'হাঁ গো, সব রোগারুগির ঘর, দিয়ে দাও।'

কেশর কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। তার কি ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন?

দু'খানাই জায়গা করেছে, ভাত বেড়েছে দুই থালায়।

সারা দিন ভাত খায়নি কেশর। প্রবল খাটনি গেছে। কিন্তু শুধু পেট পূরে ভাত খেয়েই কি তার তৃপ্তি হবে?

কুড়ানি-ভাসানির মা যোগমায়া বা যগ দাসী দোর-গোড়ায় এসে বসল টলতে টলতে। বললে, 'খাও বাবা খাও। গরিবের ঘর, কিই বা আছে, তাই দেবো। দশ-বারোটি লঙ্ঘন হল। শরীলে বল মাত্র নাই—'

কত রান্না! কলাইয়ের গুঁড়ো, তিল-আমড়া, খরচা মাছ—

'কুটুম লোকের ছেলে, যত্ন-আত্তি করার আছে কি! তুমি জামাইকে গিয়ে বোলো, এখন কুড়ানি দশ-বারো দিন যাবে না। আমি একটু সুস্থ হলে পরে যাবে।'

'বলব, বলব। এখানে না থাকলে চলবে কি করে? তার তো মা-ই আছে, মা এখন চলে এলেই পারে মেয়ের বাড়ি থেকে। অত কি!'

বোধ হয় এখানে থাকলেই কাছাকাছি আসতে পারা যাবে কুড়ানির। এখানেই যেন কুড়ানিকে ভালো মানায়। এটাই তার ঠিক জায়গা। যেখানকার যা! যখনকার যেমন!

তালাই পেতে দাওয়ায় শুতে দিয়েছে কেশরকে। ঘরের মধ্যে আর সবাই। ঠিক দরজার কাছে অনন্ত। দরজা খোলা। পূবের বাতাস আসছে ঝাপটা দিয়ে। যতক্ষণ বাতাস ততক্ষণ মশা নেই। তার পর একবার ঘুমিয়ে পড়তে পারলে মশাকে আর কে কেয়ার করে।

খাওয়ার পর এবার বোধ হয় ঘুমের সন্তোষ।

কিন্তু ঘুম আসে কই? রাত গম্ভীর হয়ে এল। শেয়াল-কুকুরের রা নেই, বাতাসও বন্ধ হয়ে এল। তবু এতটুকু পা-টিপে-আসার শব্দ নেই, নেই চাপা-গলার আওয়াজ। ঘুমের মধ্যে শরীর একেকবার ডুব খায়, আবার তখুনি চেতনার চড়ার ওপর এসে ঠেকে। কই সেই গোপন কথা!

রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল।

'চললাম গো—' কেশর দাওয়া থেকে নেমে পড়ল ঝটকা দিয়ে।

'আরেক দিন থেকে যাও না।' বলল অনন্ত।

যগ দাসী ধুয়ো ধরল: 'হ্যাঁ বাবা, থাক না। কুটুম লোকের ছেলে—'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে কুড়ানি।

বেশ তো থাকো না। থাকা করে থাকো না। কাঁটার শয্যেতে শয়ন করতে আর রাজি নই। তার চোখের চাউনিতে যেন সেই লিখন।

মিথ্যে কথা। এক রাত্রির কড়ার, তা এমনি করে মাটি হত না তা হলে!

'থাকবার উপায় নাই, মা। পরের চাকর!'

আগুন পেরিয়ে ফাঁকায় আসতেই কুড়ানি ছুটে এসে পাশে দাঁড়াল কেশরের।

'গোপন কথা বলবে বলেছিলে—বেশ, বললে যা হোক।' কেশর খোঁটা দিল।

'সেই কথাই তো বলতে এলাম—'

'কি কথা ?'

'তোমাকে আমি খুব আপন করতে চাই।'

কেশর থমকে দাঁড়াল।

'কি রকম আপন ? শুধু কথায় ?'

'না গো না। কাজে।'

'কি রকম কাজ ?'

কুড়ানি হাসির লহর তুলল : 'আমার বোন ভাসানির সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চাই। করবে ?'

কুড়ানির একটা হাত থপ করে ধরে ফেলল কেশর : 'তুমি বিয়ে কর কেনে !'

হাত আলগোছে ছাড়িয়ে নিল কুড়ানি। বললে, 'আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে।'

'আমারও হয়ে গেছে।'

'ওমা, কার সঙ্গে ?'

'তোমার সঙ্গে।'

'পোড়ামুখো ! আমার সঙ্গে বিয়ে হলো। সকাল বেলায় !' হাসির আবার লহর তুলল কুড়ানি : 'এক মুর্গি কি দু'বার জবাই হয় ?'

৯

'হা গো, ঘর-সংসার বলে মন দাও না—এখনো উড়ো পাখি। আজ পেরায় এক কুড়ি দিন পার হল, বাড়ি ঢুকলে।'

হাটের থেকে ফিরে এসেছে নারায়ণী—নর-দাসী, হোরাঙের মা। ফিরেই দেখে বাড়িতে বউ।

'আমাদের অসুখ হলে কে কয় দিন দেখে বলো দিকিনি। আমি নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, কে এঁদে-ভেজে দেয় বল তো ? কলিকালের বৌ-ঝি, কিছু বুলবার জো নাই। আমার যেই দুঃখ-কে-সেই।'

'নিজের বাপ-মাকে দেখতে যাব না ?' কুড়ানি ফোঁস করে উঠল।

'আহা-হা, তা যাবে বৈ কি। নিজের মা-বাপ ! তা তোমার মায়ের বেশ নরম পড়েছে তো ?'

'কি করে পড়বে! কে তালাস-তদবির করে! যুগ্যি ছেলে নাই।
জামাই করেছে এমন এক জন—'

'হোরাং আমার কাজ নিয়ে কতু যেতে পারে না। রোগা-ভোগা মানুষ—
দুখ-মেহনত করে খায়! সে আর পাঁচ জনের মত লয়। কি করবে বল,
সব কপালের নেকন। তা তুমি এলে কখন? ভাত খেয়েচ?'

'আপনি আসুন ডুব দিয়ে। রাঁধব এবার।'

'আমি কারু আঁদা ভাতে পিত্যাশা করি না। দাও, ঘড়াটা দাও দিকিন,
ডুব দিয়ে আসি। আজ হাট থেকে আসতে বেলা গিয়েছে।'

মুনিষ খেটে বাড়ি ফিরেছে হোরাং। হা-ক্লান্ত হয়ে।

দেখলে হেঁসেলে রান্না করছে বউ। নজরে পড়ল তার ময়লা শাড়ির চওড়া
পাড়টা। ঝুলে-পড়া চুলের কটা গুছি। কানে এল তার বাসন-কোসনের
টুং-টাং শব্দ। নড়া-চড়ার খসখস। মনটা খুশি হয়ে উঠল।

'হা গো, এলে কেনে? থাকলেই হতো। দরকার কি।'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে গা-পা ছড়িয়ে বসল হোরাং। একটা বিড়ি ধরাল।

'ভালো মজার লোক কিন্তু। আমি ভাবলাম বুঝি আর আসবেই না।'

'কেন, বিয়ে ছেড়ে দিয়েছ? না, খুলে নিয়েছ হাতের লোহা?' খুন্তি-হাতে
ঝামটা মেরে উঠল কুড়ানি।

'কেনে, ছাড়াবিড়া হয়ে গেলে বুঝি খুব ভালো হয়, লয়? মনের মত বুঝি
লাগর জুটেছে?'

'জুটবে না কেনে? রূপ-যৈবন থাকলেই জোটে। আর লাগর জোটাতে হলে
জোটাব কি তোমার এই সব ছোটলোক চাষা? কুরু-কুনাই কাহার-কেওট?
বড়লোক চাকরে বাবুর আদরিণী হব, থাকব পাকা কোঠাবাড়িতে। কত
ঘরে ষোল আনা গিন্নির পিঁড়ি পাতা আমার।'

একবার তেরছা চোখে তাকাল হোরাং। বললে, 'তাই ভালো। ষোল
আনা গিন্নিই ভালো। গোপ্ত অঙ ভালো লয়।'

'খেতে দিতে পারে না, পরতে দিতে পারে না, কাণা-খোঁড়া কুঁড়ে-বুড়োর
ঘরে সোমত্থ বয়সের মেয়ে পচে-ধসে মরবে, তাই না?'

'যতই ঢেকে কর পাপ, পাপ মানে না আপন বাপ। বুঝলে? এক সময়
না এক সময় ঠিক বেরিয়ে পড়বেন। তাই বলি—'

'যার যা মন বলো।' হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল কুড়ানি : 'মা-বাপের অসুখ-বেসুখ বলে কেউ তো জগতে দেখে না! জগতে কেউ তো বিয়ের পর যায় না বাপের বাড়ি! আমিই শুধু ছিষ্টিছাড়া!'

হকচকিয়ে উঠল হোরাং। 'হাঁ হাঁ, আছে কে কেমন? অসুখ কার?'

'আমি ছিলাম বলে মা জেবন পেয়েছে। তিন বার করে ওষুদ দিতে হয়েছে। চোদ্দ-পনেরোটা লজ্যনা। হাড়-পাঁজর ঝুর-ঝুর করছে। সহজ কথা, বলতে চাও?'

হোরাং অপ্রস্তুতের মত তাকিয়ে রইল। বললে, 'সত্যি, তাই না কি?'

'জামাই হয়ে কই একবারও তো খোঁজ-খবর লিলে না। তা বুঝি লিতে নাই! পরের মা তো, মলো আর থাকলো! দরদের জিনিস হলে দেখে।'

'সত্যি, অল্যায় হয়ে গেছে তো। শুনেছিলাম বটে অসুখ, কিন্তু এত বেপদ তা তো বুঝিনি। বাড়ি আর মাঠ এই লিয়ে শুধু তাঁত-বোনাবুনি করছি—ফুরসুৎ কুথা? তার উপর দু-দু'বার জ্বর হল ইরি মধ্যে—'

মন-মেজাজ খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে হোরাঙের। রাগের চেয়ে আপশোষের ভাবটাই বেশি। কুড়ানি যে কৃপা করে বাড়ি ফিরে-এসেছে এই তার ঢের। বলে, ঢের খাবে তো অল্প চষো। বেশি খুঁড়তে-ধসতে গেলে সব রস চটে যাবে। এই বেলা ভাব করো। অল্প-অল্প রাগের সঙ্গেই রঙটা ভালো জমে।

'যাক, এখন ভালো হয়েছে তো? বাঁচলাম। সাধের কাজল হারিয়ে গেছল আমার, আবার ফিরে পেলাম চোখের কোলে। একটু হাসো কেনে বউ।'

'মরণ দশা।' বলে ফিক করে হেসে ফেলল কুড়ানি।

এই ভালোবাসার হাওয়া চলল সন্ধে-রাত পর্যন্ত।

'এই দেখ, মা নাকের আপেলটা নতুন করে গড়িয়ে দিয়েছে।'

'মা দিলে না বাবা দিলে! দেখি। আগেকার চেয়ে বড় লাগছে। কত দাম?'

'দামের খবর কে রাখে? টাকা তো এখনো দেয়নি, দফায় দফায় দেবে। সোনাটা পাকা সোনা, না? খারাপ লয়। তুমি কই এবার এক জোড়া কানপাশা গড়িয়ে দাও দেখি।' ছলকে উঠল কুড়ানি।

হোরাং হঠাৎ চুপসে গেল। বললে, 'পেটে ভাত নাই ধম্মের উপোস।' কতক্ষণ থম হয়ে থাকার পর গলায় ঝাঁজ মিশিয়ে বললে, 'মায়ের থেকে গয়না না লিয়ে শাড়ি লিলেই পারতে! পরনে মোটে তো ঐ একখানা আস্ত শাড়ি, আর সব ত্যানা। আষ্টাঙে নাই, পাষ্টাঙে নাই, কানে দু'টো পাশা!'

মুখিয়ে উঠল কুড়ানি : 'কেনে, তুমি আছ কি করতে ? তুমি শাড়ি-কাপড় কিনে দিতে পার না ? তুমি সোয়ামি না ভাগাড়ের মড়া ?'

হোরাং জানে তার অক্ষমতার কথা। তবু এ যেন সহ্য করবার নয়। আপেল তো নাকে একখানা ছিলই। ওর উপর আবার খোদকারি করার দরকার কি। মেয়েকে কিছু দিতে চাস, হাতে পয়সা এসে থাকে, গা-ঢাকবার জন্যে একখানা আস্ত-মস্ত শাড়ি কিনে দে। নব যৌবনের উপযোগী নব বস্ত্র।

'কত সাধের একটি বিটি, চুল নাই তাই দড়ির ঝুঁটি।' হোরাং মুখ বেঁকাল, মুখের সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত : 'গয়না দিয়েছেন! কোমরে কাপড় নাই গায়ে গয়না! শির নাই তার শিরঃপীড়া।'

পয়সা হলে তবে সোনা-রুপো কিনতে পারো, কাপড় পাবে কোথায় ? কোন বাজারে ? কোন মুল্লুকে ?

কথাটা সত্যি। কত মাস পর এই হোরাং সেদিন তার নিজের জন্যে একখানা কাপড় কিনতে পেয়েছিল। তাও লাল ইঞ্চি পাড়, ন'হাত। ঠিক হয়তো বেটাছেলের উপযুক্ত নয়। তা, উপায় কি! অত বাছ-বিচার পরখ-দরখের সময় নেই। যা পাও তাই কিনে নাও। খানিকটা দীঘ-পাশ হলেই যথেষ্ট, পাড় দিয়ে কি হবে ?

সেদিন মুখ টিপে হেসেছিল কুড়ানি। বলেছিল. 'ঘোমটা দাও, হেঁসেলে ঢুকে কাজ-কাম পাটকাম করো।'

হোরাংও হেসেছিল। বলেছিল, 'পাড় দিয়ে আমি কি করব, আমার নদী দিয়ে কথা! বউয়ের রূপ-যৌবন দিয়ে কি হবে, তার ভালবাসাটুকুই যথেষ্ট।'

এই সেই ভালোবাসা! মা যদি মেয়েকে কিছু দিতেই চেয়েছিল, মেয়ে তবে তেমন দ্রব্য নিলে না কেন যাতে সত্যি সংসারের উপকার হয়, সোয়ামীর সাশ্রয় হয়! যা আছে তার উপর আবার চেকনাই দিয়ে লাভ কি।

কি বুদ্ধি! 'জয়-কালে ক্ষয় নাই।' হাতে যার সোনা আছে তার সব আছে। এই সোনা থেকেই ধান-চাল। তোমার কি আছে শুনি ? 'ধনের মধ্যে ধন, তিন মোড়া শন।' এক পোয়া চালের ভাত ছ'মাস খাও আর মেজেয় মাছ মারো! বাপের জন্মে সোনা দেখছ কখনো ?

দেখিনি, কিন্তু তোমার মাও দেখেনি। এ দেখেছে—হ্যাঁ, বুঝি না বুঝি কিছু। শালোর কম্বল মাথার দিকে বাড়ে। আচ্ছা দেখে লোব!

'লিও দেখে লিও। দেখব কত মুরোদ। যে সোনা পরবার সে ঠিক পরবে। যে খায় চিনি তার চিনি জোগান চিন্তামণি।'

কথা মিথ্যা নয়। হোরাং কি দিতে পেরেছে কুড়ানিকে? কিন্তু কেমন মানাত না জানি তাকে গয়না-শাড়িতে! অন্তরে ভালোবাসা বাইরে সাজ-সজ্জে —সে মেয়ের মহিমের কি অন্ত আছে! কত সামান্য অথচ কত বেশি! তেমন কেন হয় না? কেন অবস্থাটা একটু ভালো করা যায় না? কেন হাত দিয়ে ঠেলে ফেলা যায় না এই অভাবের হাতিটাকে? কাজের মধ্যে চাষ আর রোগের মধ্যে কাশ! কেন হোরাং চাকরে-বাবু হতে পারল না? কেন জন্ম নিল এই হাজা-মজার দলে, কোন পাপে?

ঘুমের গড়ানে কুড়ানি কখন পিছলে এসেছে হোরাং-এর গা ঘেঁষে। বলছে, 'সোনার দোষ-তুটি ধরতে নাই। ধম্মের ঘরে অধিক রাতে আজকাল আর ভাত হয় না, সোনার ঘরে হয়। বুঝলে?'

১০

মজলিস বসেছে কালীতলায়। চাষী কুনাইপাড়ার মাঝখানে এ কালীতলা।

মায়ের স্থানটি বাঁধানো। মস্ত বড় একটা পাকুড় গাছ ঘিরে আছে জায়গাটাকে। ঠাণ্ডা ছায়া করা। পাতাটি কিন্তু পড়ে নেই। সব নিকোনো-চুকোনো। পাড়ার মেয়েরা তদবির করে দু'বেলা।

মন্দিরটি কিন্তু ভাঙা। দরজা-কপাট নেই, জায়গায়-জায়গায় দেয়াল ধসে পড়েছে। ছাদ ফুটো, জল পড়ে জায়গায়-জায়গায়। এ সব কেউ বড় দেখে না। যে দেখে সে মাকেই দেখে। ভয়ংকরী মূর্তি কিন্তু বড় স্নেহময়ী।

কালীপুজোর আগখানে সভা বসেছে। কে কত চাঁদা দেবে এ বছর। এবার কবিগান হবে কি না। জ্ঞাতি সম্বন্ধে কোনো রহিত-পতিত আছে কি না। গত বছরের চাঁদা এখনো কার কার বাকি আছে?

'ওহে কত্তারা, গত বছরের জমাখরচ কি?' হৃদয় কুনাই হাঁক দিল: 'কিছু টাকা তো জমা ছিল। তা আছে তো? শ্যাম মুদির মেয়ে কুনীর জরিমানার টাকা কে আদায় করেছে? সরকারি ধান আদায়ের ভার কার হাতে? কে কে ফাঁকি দিলে? সব কথা পাড়ো! চুপচাপ বসে থাকলে কী হবে? আমার

বলতে গেলে দোষ হয়! গেলবার ঢুলির টাকা মেটাতে অত দেরি হয়েছিল কেনে?'

নিমাই কুনাই এগিয়ে এল: 'খুড়ো তো অনেক পশন্ন কল্লে। উত্তরটা আমিই দিই। এটা একটা সৎকাজের ভার। দশ সকলে যখন আমচরণের হ্যা আছ তখন সেই বলুক কেনে কি সব গোড়াকার খবর।'

রামচরণ রাগ করে উঠল। বললে, 'সে টাকা-পয়সা যে খাবে তার শূল হবে, সে নিব্বংশ হবে, নিব্বুনেদ হবে, মা কালী তার মহা বেহাদি দেবেন। এই ছাখ, বহু কুনাই সব কাগজে-কলমে লেখে থুয়েছে। শ্যাম মুদির টাকা আজো আদায় হয়নি। মজুত টাকার মধ্যে আমার কাছে দশ আর বহুবল্লভের কাছে সাত আর আমাদের পাড়ার হেমা কুঁদলির কাছে সাড়ে-চার—আর তো কই দেখি না। এবারকার চাঁদা এখন যা হয়—'

'জায়গাটা বালি-সিমেণ্ট করতে হবে, দরজা-কপাট মেরামত করতে হবে।' বহুবল্লভ হিসেব খতাতে বসল: 'একে একে ধর কেনে সব। কবিগান পঞ্চাশ টাকার কম হবে না—তার পর পিতিমে খরচ, পুজোর খরচ, মেরাপ বাঁধা, আলো ভাড়া করা—আগে আয় দেখ, তার পর ব্যাবোস্তা। হ্যাঁ, ও-পাড়ার কেশর কোতা? তার কাছে গেল বছরের ধান আদায়ের ভার ছিল। তার থেকে হিসেব লাও। সব একসঙ্গে না জুটলে কি করে কথা হয়!'

একে-একে আরো লোক এসে বসতে লাগল। প্রণাম করে হোরাংও এসে বসল এক ধারে চুপ করে।

'কেশরাকে ধরে নিয়ে আয়—'

'এর আবার ধরাধরি কি। এই তো আমি এইখেনে। আমার মুখস্ত হিসেব।' কেশর উঠে দাঁড়াল। বললে, 'ধান আদায় আর তিন লম্বর বাকি। এক লম্বর ঐ হোরাং—'

'আমি মাপ চাই মজলিসের কাছে।' হোরাং উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করলে: 'আমার জমি-জায়গা নাই, পরের মাঠে আমি সামান্য কিরষানি করি। খাইদ ধান যা পাই তাইতে খোরাক হয় না—'

'গেল বছর বর্গাভাগে চষেছিল জমি—ধান মজুত আছে ঘরের মধ্যে।' কেশর লাফিয়ে উঠল।

'মিথ্যে কথা।'

'থানাতল্লাসি করব—দশ জনে সাক্ষী।' কেশর বললে ঘুরে-ঘুরে : 'ঘরের মধ্যে থেকে বের করে আনব সোনার ধান।'

হ্যাঁ বাবা, মাপ-রেয়াৎ নেই, সবাইকে দিতে হবে সাধ্যমত। ছোট-বড় সবাই আমরা এক মায়ের সন্তান—গাঁয়ে জাতের মধ্যে এই একখানাই আমাদের বুনো কালী। ও-সব হবে-হচ্ছে দেব-দিচ্ছি আর চলবে না। সম্বৎসর টাল-বাহানা করেছ, এবার যার যা বাকি সব এক মুন্তে ফেলে দাও। গত বছরের টাকা আমরা আজকের মজলিসেই আদায় চাই। কি গো আম দাদা! হাঁ হাঁ, রাত পোলেই খরচ, তা আর বলতে! টাকা আদায় না হলে কোনো কিছু করা যাবে না। ছড়াদার ঢুলিদার সব বায়না করতে হবে। লতুন বছরের চাঁদার ফর্দি ধর এবার। ওরে কেশর, কালকের মধ্যে বাকি ধান ক'টা উশুল করতে হবে। রেহাই-রেয়াৎ নাই। আর ডাক্তারবাবুকে বলে ডেলাইটটা ঠিক করে নাও। পরশু রাত্রেই মায়ের পুজো। পরের রেতে অমাবস্তে থাকবে না। বুঝলে হে সব—

ফর্দি ধরা হল মুখে-মুখে। রামচরণের উপর টাকা আদায়ের ভার, কেশরের উপর ধান-আদায়ের। অন্তত গেল বছরের ধানটা চাই। যাদের ধান নাই তারা অন্য ভাবে শোধ দিক। কাটান-ছিড়ান নাই কিছুতেই।

সব আদায় চাই কালকের মধ্যে। আজকের মত সব বাড়ি চল হে। মা কালীর নামে সব একবার হরি-হরি বল।

সবাই চলে গেল যে যার দিকে। শুধু কেশর গেল না। মন্দিরের দুয়ারে চুপ করে বসে রইল।

মন্দিরের পিছনে আকাঠ-আগাছার জঙ্গল। আর তার পর একটু ফাঁক দিয়েই হোরাং-এর বাড়ি। রাত ভার হয়ে আসছে। পাড়ার মধ্যে কারু আর সাড়া-শব্দ নাই। কোথাও আলো নাই ছিটে-ফোঁটা। শুধু মাথার উপরে ক'টা তারার ঝকমকি। কি বাহার দিয়েছে আকাশখানা! কালো মলমলের গায়ে কে যেন চুমকি টেঁকে দিয়েছে!

বোধ হয় সের দশ-পনেরো বরাদ্দ হোরাং-এর। কোনো দিন তেমন তাগাদাও করেনি। এক বার বোধ হয় গাঁয়ের তেরাস্তার মোড়ে দেখা হয়েছিল, সেই গেল মাঘ মাসে। কালীতলার ধানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল কেশর। হোরাং খোসামোদ করে বলেছিল, দু-পাচ দিন পরে ভেন্ন হবে না। ভাগের

জমির ধান সব এখনো মাড়া হয়নি ভাই। তার পর সেই দু-পাঁচ দিন আর কাটল না। পাকে-প্রকারে আর দেখাই হয়নি কেশরের সঙ্গে।

মোট কথা, বিষয়টা কেশরেরই আর মনে ছিল না। বিষয়টা অমন কিছু নয় যা মনে করে রাখতে হবে। নিজে গায়ে পড়ে বাড়িতে গিয়ে ডাক-হাঁক করতে হবে, বা গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিতে হবে দশের সামনে। বেশি কিছু হয়, নিজের থেকে পূরণ করে দেবে না হয়। ভারি তো দশ পনেরো সের ধান!

না, পাওয়া বন্ধ ছেড়ে দেয়া হবে না। আর, এ কার পাওনা? কেশরের নিজের পাওনা নয়। মা-কালীর পাওনা। এর আর ছাড়ছুড় নাই। এর তামাদি হয় না কোনো দিন। মা-কালীকে যে বিমুখ করে তার সুখ হয় না জীবনে।

কিন্তু কোথা থেকে দেবে? গেল-বছরের মত এবার ভাগ-পত্তন পায়নি হোরাং। লোকটা বড় রোগা-ভোগা, কেউ গা পেতে তাই নির্ভর করতে চায় না। অধর্ম করে না হোক, অসুখ-বিসুখের জন্যেই চাষে কামাই দেবে। তাই এবার 'খাইদ' ধানের বদলে কিরষানিতে লেগেছে। ধান কেটে মাড়া-মলা শেষ হলে পর পাবে সে তার 'খাইদ' বা খোরাকির ধান। তার উপর এবার দেবতা জল দেয়নি। ভাদ্র মাসে পোঁতা ধান কাঠি হয়ে যাবে। এক কাঠিতে এক শিষ। থোপা ধরবে না। মহাজনের সঙ্গে কাজিয়া ঝগড়া লেগে যাবে। শেষে না দেওয়ানিতে গিয়ে পড়ে। ফৌজদারির চেয়ে আদালতে বেশি ভয়!

তোমার তার জন্যে অত ভাবনা কিসের বাপু! 'পরের ভাতে পেট নষ্ট!' মজুত ধান আছে বাড়িতে, নইলে চলছে কিসে? আনাজপাতির ক্ষেত আছে বাড়ির কোলে, হাটবারে বেচতে যায় শাশুড়ি-বউ। করাকন্মার সংসার, খেটে-খুটে খেয়ে আছে দস্তুরমতো। তার জন্যে অত দরদ কিসের? মা-কালীর কড়ারী ধান না দিয়ে তাকে আর পার পেতে হবে না।

দেবে গো, দেবে। কিন্তু তুমি বসে আছ কোন তালে? পাড়ার সকলে যখন গেল তখন তাদের সঙ্গে গেলে না কেন? এখন ভরা রাতে কাঁদর পেরোবে কি করে?

নদী-নালা ভয় করি না। সাঁতরে পার হয়ে যাব।

কিন্তু এখানে বসে এ কোন চিন্তার নদীতে সাঁতার কাটছ?

মা কালীর কাছে নির্জনে নিবেদন করতে এসেছি। সব নিঃঝুম হয়ে না এলে মনে যে জোর আসে না।

'মা! হে মা কালী। তোমার মূর্ত্তি তো গঠন হল। তোমার পূজা হবে। তুমি আমাদের কী মঙ্গল কর মা! তোমার দয়া কই? দয়ামহী! তুমি কারু মনের বাসনা পূর্ণ কর, মা? কারু ডাক তোমার অন্তরে পৌছয়? একটা পাখিরও সাড়া নাই, রাত্রি ঝন ঝন করছে। যদি এই নিঃসাড়ের মধ্যে আমার কথাটা তোমার কানে যায়! যায় না, যাবেও না। তবে আমি কিসের আশায় তোমার দুয়ারে বসে আছি? এই সংসার তোমার কথায় চলছে, মা, কিন্তু সে কি কখনো আমার কথায় চলবে? আমার যেমন মন পুড়ছে তার কি তা পোড়ে? যদি পাপ হয়ে থাকে মা, পাপটি খণ্ডে দিও। তাকে পাই না-পাই, শুধু এইটুকু করো মা, তারও যেন মন পোড়ে। বনের আগুন সবাই দেখে, মনের আগুন কেউ দেখে না—'

১১

'এই দ্যাখো, মানুষ মাত্রেই অল্পবিস্তর জ্ঞানবুদ্ধি আছে। কে কি ভাবে চলে তা ঠিক বুঝতে পারা যায়।'

'কেনে, আমার বেচালটা কি দেখলে শুনি?' কুড়ানি ফোঁস করে উঠল।

'না, তোমার কথা বুলছি না। ঐ ও-পড়ার কেশরার কথা বলছি। তুমি আবার ওর সঙ্গে তোমার বুনের বিয়ে দেবে বলে মেতে উঠেছ! ও-সব মাতামাতি আমি ভালবাসি না। দুনিয়াতে আর পাত্র নাই? দিনরাত কেবল কেশর আর কেশর।' হোরাং হাত বেঁকিয়ে মুখ ভেঙচিয়ে উঠল।

'কেনে, করেছে কি কিশোর? তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছে?'

'বিয়ে হবে তো তোমার বুনের সঙ্গে, তবে আমার বাড়ির সামনে ঘুর-ঘুর করছে কেনে?'

'বোঝ না, কেনে! তোমাকে ধরতে পাচ্ছে না বলেই ঘুর-ঘুর করছে। পালিয়ে না বেড়িয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াও, ধানটা দিয়ে দাও, আর ঘুর-ঘুর করবে না। সটান চলে যাবে।'

ধান দেবে! ধান কোত্থেকে দেবে শুনি? কায়েমী জমি-জমা কিছু নেই। হাল-গরু নেই। গত বছর ভাগে জমি পেয়েছিল কিছু, ফলন ভাল হয়নি বলে এ বছর ছাড়িয়ে নিয়েছে। এ বছর দুটো লাঙলে দুটো মুনিব খাটছে।

খোরাকি বা 'খাইদ' ধান সাড়ে চার বিশ। তা সব পূরণ করে দেবে ধান কেটে-বেড়িয়ে মলন করে দেবার পর। তার এখন কি! গৃহস্থ তো এখন থেকেই গড়িমসি শুরু করে দিয়েছে, আগাম ধান ছাড়তে চাচ্ছে না। বলছে, বর্ষণ ভাল হয়নি এ বছর, চাষ হয়নি সুচারু। আগে ধান পাকুক, দেখি কতটা হয়, তা-পরেতে তোর পূরণ হবে। শোন কথা! বর্ষা এবার কম হল বলে হোরাং ছিঁচে দিয়েছিল নিজের খরচে, কত কষ্ট করে, অথচ ছেঁচার খরচ গৃহস্থের দেবার কথা, কামার-ছুতার সমান-সমান। তবু সব খরচ নিজে চালিয়ে নেবার পরও খোরাকির ধান মিলছে না আগাম। গৃহস্থ বলছে, জমিতে জল লাগেনি, মাঠ এবার ধানের ভারে থম-থম করবে না। তবু দেখি, পাকুক আগে, কাটা-মাড়া হোক, দেখি কেমন আবাদ করেছিস, তা-পরেতে হিসেব হবে। একবার বিচারটা দেখ। তার উপরে সাধের পাওনাদার জুটেছে। ধার নেই কর্জ নেই, গায়ে-পড়া পাওনাদার। খাবার ধান নেই তো নবিছির ধান! বুঝলি বউ, এ আচোটে খুঁড়ে-ধুসে জল ঢেলে কিচ্ছু হবে না—হোরাং নিজের কপাল দেখাল—জমির মায়া ছাড়তে হবে, জমি ধরতে পারব না কোনো দিন, কল-কারখানায় চলে যাব।

'তার আগে যেমন করে হোক মা-কালীর মানত ধান দিয়ে যেও। দেবতা-গোঁসাই নিয়ে খেলা কোরো না!' মুখ গম্ভীর করলে কুড়ানি।

'খাওয়াবেন না, নিজে খাবেন, মা-কালীর এ কেমন রীতকরণ! অতান্তরে ফেলেছেন কেনে তবে? খাবেন যদি কুদিষ্টি সরিয়ে নিন—'

'তাই তো বলি,' কুড়ানি চোখে হাসির ঝিলিক আনল: 'আমার বুনের সঙ্গে কেশরের বিয়ের তদবির করো, সুদিষ্টি পড়ে যাবে, চার দিকে বইবে সুবাতাস! বাইরের পাওনাদার তখন ঘরের কুটুম হয়ে যাবে। তুমি তখন শত্তুর নও গো, ভায়রা—'

খেপে উঠল হোরাং: 'ও শালোর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ চলবে না আমার—'

'তা হলে ধান কটা হয়তো কাটান যেত। নিজেই জুটিয়ে-পাটিয়ে এনে দিত যাহোক করে।'

'দরকার নাই ওর দয়া চেয়ে। অদেষ্টের লীলে-লেখন যা আছে তা হবে। শালো এমন হারামজাদা, সভার মাঝখানে বলে বসল হোরাং-এর ধান বাকি। আচ্ছা, আমার দিন আসবে, দেখে লোব ওর কত বেক্কম।'

'না, তার চেয়ে মেয়েটার সদ্গতি কর ওর হাতে। মেয়েটা সেয়ানা হল, কখন অজলে-অখালে পা দেয় ঠিক নাই।'

চোখের তারায় ঘুরন দিয়ে ঘাড়ঝাড়া দিয়ে রুখে দাঁড়াল হোরাং। বললে, "উসব বায়না ছেড়ে দাও। উ শালার নাম করতে পাবে না বুলে দিচ্ছি—'

'কেনে, কেশর তোমার কি সব্বনাশটা কল্লে ভাই—' হঠাৎ বাইরে থেকে কেশর বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। যেন কাছাকাছিই ছিল কোথাও আড়ি পেতে। সর্বক্ষণই ঘুরছে বুঝি এমনি আড়ালে-বিড়ালে।

মুখে মিষ্টি হাসি, গলার স্বরে মোলায়েম আত্মীয়তা।

কিন্তু হোরাং-এর অন্য রকম চেহারা। কোমরে দু'হাত রেখে তেরিয়ার মত ভঙ্গি করে বললে, 'হা শালো, আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিস কেনে?'

প্রথমটা হঠাৎ ঘাবড়ে গেল কেশর। দেখল কুড়ানি আলগোছে কখন গা-ঢাকা দিয়েছে। নেই কোথাও আত্মীয়তার নামগন্ধ।

দেখতে-দেখতে কেশরের মুখ-চোখ কঠিন হয়ে উঠল। বললে, 'কেনে ঢুকেছি জানিস না?'

'কেনে ঢুকেছিস? আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন? তুই আমার মহাজন, না জমিদার? আমি তোরটা খাই, না, তোরটা ধারি?'

'জানিস না কারটা খাস, কারটা ধারিস?'

'সে মা-কালীর জিনিস মা-কালী বুঝবে। তুই কেনে আমার বাড়ি ঢুকবি? চোর কোথাকার! বেরো!'

'মুখে লাগাম দিয়ে কথা বল। আমি চোর? গেল বছর ভাগের জমির ধান বেড়িয়ে ক' পন থ্যাড় বেশি আনলি? সাধে কি আর জমি ছাড়িয়ে লিয়েছে? সাধে কি আর ছুটান মুনিষ খাটছিস? আমি চোর? আর ওঁর ধম্মজ্ঞান কি টনটনে। মা'র দুয়োরের ধান ফাঁকি দিচ্ছেন—'

'একশো বার চোর! না বলে-কয়ে বাড়ির ভেতর যে ঢোকে সে চোর, তার গুষ্টি চোর! সব দেখা আছে আমার! যা, বেশি বুজরুকি করিস নে—' ভালোয়-ভালোয় কেটে পড় বুলছি—

'আমি ধান আদায় করে যাব।'

'কি, জোর দেখাচ্ছিস না কি? ও জোর আমাকে দেখাস নে। এ তোর বোলানের দলে বয়েলি করা লয়। তোর ঐ জোরকে হোরাং ক্যারায় না,

বুললি ? কিসের তেজ দেখাস ? যা, আমার বাড়ি থেকে যা বলছি। নেকাল যা। নইলে ঠেঙিয়ে সোমান করে দেব।'

'শরীলে খুব বল বেঁধেছিস দেখছি। আয় কেনে, মার কেনে দেখি ? এই আরো ভালো করে তোর বাড়ি এলাম।' কেশর ঘরের দিকে আরো ক' পা এগিয়ে এল : 'দেখেই যাই কত দূর গড়ায় !'

'শালো, বাঁদির বাচ্চা ! আরো আসছিস এগিয়ে ? দে তো রে লাঠিখান।' দৌড়ে ঘরের মধ্যে থেকে এক গাছি লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল হোরাং।

'তবে রে—' বেড়ার একটা গোঁজ তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়াল কেশর : 'আও শূয়োরকে বাচ্চা। ধর লাঠি। আজ যদি পাড়ার লোক এক হয়ে লাঠি ধরে তা হলেও কেশর পেছু হটবে না। দিই মাথা ফাটিয়ে।'

দু'জনেই তাল ঠুকে রুখে দাঁড়াল।

কোত্থেকে কুড়ানি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জনের মাঝখানে। দু'জনকে ঠেলে দিলে দু'দিকে। খালি গা, কেশরের বুকের উপর কুড়ানির হাত পড়ল। কিন্তু কেমন যেন অনুনয়ের হাত নয়, ঠেলে ফেলার হাত। হোরাংকে সরিয়ে নিলে নিজের দিকে আর কেশরকে স্পষ্ট গলা ধাক্কা দিয়ে দূর করে দিলে। সঙ্গে গালাগালের গর্জানি : 'বাড়ি চড়ে মার করতে এসেছে ! মদ-মাতালির আর জায়গা পাওনি ? মায়ের দোরে তুটি হয় তো, আমাদের হবে। তোদের কি রে হতভাগা ? নিলেজো—বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকেছে ! গঙ্গাজলে ! ববভুলে !'

পাড়ার লোক জমতে লাগল ক্রমে ক্রমে।

হেঁটমুখে বেরিয়ে এল কেশর।

ব্যাপার কি ?

কেশর কোন কথা বলে না। সে জানে, ধর্ম তার দিকে, তবু কথা বলে না।

শুধু বাইরের এক জন টিপ্পনি ঝাড়ে : 'যে যা চায় সে তাই পায় না হে, তাই পায় না। কপালে নাইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি।'

১২

জয় মা-কালী মঙ্গলদায়িনী—

সম্বিৎবাবু চাষীপাড়ায় কবি শুনতে এসেছেন।

আসুন, আসুন। ওরে মোড়া এনে দে, টুল এনে দে। সিগারেট কোথা? কী ভাগ্য আমাদের! আপনার পায়ের ধুলো এই গরিবের আসরে!

দূর শহরে কাঁকরের নতুন কল খুলেছেন সরিৎবাবু। নতুন টাকায় জমকে উঠেছেন। ধুমুল দিয়েছেন চার দিকে, আমার কলে খাটবি আয়, দুখ-মেহনৎ কম, আয়-আদায় বেশি। হ্যাঁ, স্ত্রী-পুরুষে চলে আয়, থাকা করে থাকবি কুলি-গ্যাঙের লাইনে। দু' জনে খাটবি, ডবল রোজগার। কাপড়-জামা পরতে পাবি গা ঢেকে। নেশা করতে পাবি ইচ্ছেমত। ফুর্তির লহর ছোটাবি। মাঠের খাটনিতে হাড়-পাঁজর আর ঝুরঝুরে হবে না।

তা ছাড়া ডাক্তার পাবি মাগনা। ম্যালোয়ার দূর হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, থাকা করে থাকবি। চলে আয় স্ত্রী-পুরুষে। কে আছিস নগদা মুনিষ, কে আছিস মাঠ-ছুট দিনমজুর।

কবিগান শুনতে এসেছেন সরিৎবাবু কিন্তু চোখ তাঁর মেয়েদের গোলের দিকে। ঘেরা-ঢাকা কিছু নেই, সব বসেছে জড়-পুঁটুলি হয়ে। কলে খাটবার মত কার আছে আঁটুনি-বাঁধুনি তাই একটু দেখছেন হয়তো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে।

শহর থেকে বন্ধু এসেছিল সঙ্গে। কবিগানের মজলিসে সে এল না। বারো রাজপুতের তের হাঁড়ি—ওখানে কি ভদ্দরলোকে যায়?

কিন্তু যখন তোমার চাষার দরকার, মজুরের দরকার, চালবারুই-দেয়াল-বারুইয়ের দরকার, দরকার যখন টাটকা আনাজ-পাতির, তরি-তরকারির—

সে কথা আলাদা। তোমার দরকার তুমি দেখ।

বড্ড গুমসা ধরেছে। জল আসবে লাগছে।

কই হে, একটা পাখা নিয়ে আয়। বাবুকে হাওয়া দে।

বাঁশের ডাঁটওয়ালা তালপাতার পাখা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কে হাওয়া করতে লাগল পিছনে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ একটা মেয়ের মুখের উপর সরিতের চোখ আটকে পড়ল। বেশ তো দেখতে। মুখের ধাঁচা ভারি সুন্দর। আলোর মুখ ঘুরুলেই নাকের আপেলটি ঝিলিক মেরে উঠছে। নিখুঁত ছবিটি। সায়রকুড়ের পদ্মফুল। শাপভ্রষ্টা।

'ও বৌটি কার রে?' ঝাপসা গলায় পাখাদারকে জিগগেস করলেন সরিৎবাবু।

পাখাদারের চোখও ঐ থোঁটাতেই বাঁধা। তাই প্রশ্ন করাটা সহজ হল।

'ও তো হোরাংএর বউ।'

'কে হোরাং ?'

'এই এ-পাড়ার এক মুনিষ। আগে চাষা ছিল এখন কিরষান হয়েছে। তার মানে জমি-জায়গা নেই, যখন যে ডাকে খাটনি দেয়, লাঙল বয়, নিড়েন-কুটেন করে। মানুষও সহজ-সুস্থ লয়। চিরকেলে রোগ, দেহটাকে কোনো রকমে ঠেকো দিয়ে রেখেছে।'

গলার স্বরে দরদ নেই বরং যেন ঝাঁজ মেশানো।

'কেন, জমি-জিরাত খোয়াল কিসে ?'

'খোয়াবে না ? একে রোগ, তায় বেজায় কুঁড়ে। তার উপরে চোর এক নম্বর। না খেটে ভাগ মারার চেষ্টা। দাদন নিয়ে অস্বীকার করার ফিকির। বেলেল্লা বদমাস।'

'কিন্তু বউটি তো খাসা। তার উপরে নাকের ঐ আপেলটিতে যেন আরো খুলেছে। অবস্থা ভাল নয় ঠিক বলিসনি। গায়ে তবে সোনা আছে কি করে ?'

'ও সব রঙ-রসের বেপার। বাইরে থেকেই দেখতে অমন ঠাণ্ডা ছিরি-ছাঁদ, আসলে একটি ঘাগী শয়তান। 'দিনে বউ কোয়ো দেখে ডরায়, রেতে বউ গাছে গাছে বেড়ায়।' ধুরন্ধর মেয়ে বটে। 'দুর্ধর্ষী'।'

'পাওয়া যায় ?' আরো গভীরে গলা নামালেন সরিৎ বাবু।

'ঠিকমত ধরতে পারলে পাওয়া যায় বৈ কি।'

'বলিস কি, আসবে ?'

'যাচা ভাত আর কাচা কাপড় ছাড়বার মত ও মেয়ে লয় মশাই।'

কটা লোক এদিক পানে ঘাড় ফিরিয়েছে। মাছ গেঁথে খেলবার সময় ডোর না ছিঁড়ে যায়। সরিৎবাবু উঁচু গলায় বললেন, 'যদি আসতে চায় আসতে পারে স্বচ্ছন্দে। মেয়ে-পুরুষ দু'য়ের জন্যেই কাজ পড়ে আছে। রোজগার অনেক বেশি। বেশ তো, বলিস, পাঠিয়ে দিস, অনায়াসে কাজ পাবে। আমার কিসের কারখানা জানিস তো ? লোকে বলে, কাঁকরের। আসলে পাথরকুচির। লোকে বলে ঐ কাঁকর না কি চালে মেশানো হয়। বাজে কথা। ঐ পাথরকুচি লাগে রাস্তা তৈরি করতে। বুঝলি ? সবাইকে বলে দিস।'

'আপনার হুজুর আজব কারখানা।'

এক বিন্দু মেঘ নেই আকাশে। কুচকুচে কালো আকাশে খুদি-খুদি তারা মিট-মিট করছে।

'বৃষ্টি আসবে লাগছে।' সরিৎবাবু তাকালেন আকাশের দিকে। মুহূর্তে নিজেকে সংশোধন করলেন : 'বেজায় গরম পড়েছে। এক ফোঁটা হাওয়া নেই।' আবার সংশোধন করবার জন্যে তাকালেন পিছনের দিকে। পাখাদারকে বললেন, 'আয় একটু আমার সঙ্গে।'

আকাঠা-আগাছা জঙ্গলের দিকে যে পথ সেই পথের মুখে দাঁড়ালেন সরিৎ-বাবু। বললেন, 'কি করে পাওয়া যায় বল দেখি। বুদ্ধি দে।'

'এ তো সোজা কথা। শ্যাম মুদির মেয়ে কুনীকে পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে। পয়সা পেলে নাকবেঁধা পশুর মত ওকে যাই বলবেন ও তাই করবে।'

'তোর নাম কি ?'

'আমার নাম কেশর। আমাকে খুঁজতে হবে না। কুনীকে ঠিক পাঠিয়ে দেব।'

কেশরের পিঠে ফুলো চাপড় মারলেন সরিৎবাবু। কাজের আঞ্জামের জন্যে টাকা দিলেন দশটা। বললেন, 'এক দিনে না হয় দশ দিনে। শুধু দাঁড় টেনে যেতে হবে, ঝাঁ করে পাড়ি জমে যাবে এক সময়।'

'অত কিছু লয়'। ঘেন্না-মেশানো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কেশর বললে, 'এক টানেই ধরে যাবে কলকে।'

১৩

'হা হে বিয়ান ! বলি, কত কথাই হল, সেকথাটা একবার বললে হয় না ?'

'মানুষ কাজে ব্যস্ত। জুৎ হয়ে বসুক, তার পর বুলছি। তায় আবার কি !'

হোরাং-এর মা নর-দাসী আর কুড়ানির মা যগ-দাসী কেশরের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। কয়েক দমক কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আসল কথাই পাড়া হয়নি।

'ও কেশরের মা। তাই বুলছি, ঘুরে বেড়াছো, একবার বসো কেনে।' নর-দাসী হাঁক দিল : 'আমার বিয়ান যে তনছট করছে।'

কেশরের মা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বললে, 'ও আমার কপাল ! মানুষের বাড়ি এসেছ, উঠোন চচ্চড়ি কেনে ? আমি একটু জলখাবার জোগাড় করছি।

যাই ভাই, একটুকুন ধয্য ধর! গুড়ের জালায় পিঁপড়ে পড়েছে, তাই কানি বাঁধছি।' বলতে বলতে নেমে এল উঠোনে। বললে, 'ঘরে চারটি মা-লক্ষ্মী আছেন, তা ইঁদুরের বড় উপরদপ।'

'তা ইঁদুর কত কি লষ্ট করবে! ভগবানের দয়ায় কেশর তোমার চারটি জোগাড় করছে। তোমার ভাবনা কি!' নর-দাসী ভরা গলায় বললে।

সপের উপর একধারে কেশরের মাও বসল। বললে, 'তা ছাড়া ঘরের তিন চার বিঘে আছে, আর আমি ভাই বসে থাকি নে। যখন যেমন পাই তাই নিয়ে হাটে যাই। কিছু না পেলে এক পেছে ঘসি নিয়েই যাই।'

'তোমার এখন উঠতি সংসার। মণ্ডল-মাতব্বর ছেলে—' নর-দাসী টিপ্পনী কাটল।

'দু' বছর যে কষ্ট গেল।' বলতে লাগল কেশরের মা: 'এই দেখ, পাপমুখে বলতে পারছি নে, গেল বার চিক্কেত্তর করতে পেরাই তিন কুড়ি টাকা খরচ হয়েছে। এবারটা যদি সুস্থ হতে পারি তবে দশ জনার চরণ একবার ধরব। কেশর বলে, এখন দু' চার বছর বিয়ে থা করব না। আমি বলি বাবা, যা ভাল হয় তাই করবি, তায় আবার কি। তা ডাক্তারবাবুরা আমার কেশরকে যথেষ্ট ভালবাসে, কেশর আমার যা করে তাতেই সই। দন্তে-ওষ্ঠে কিছু বলে না। তা এবারে গিন্নি আমাকে ববলে, তা জানো হোরাং-এর মা, ওরে, এবার কেশরের বিয়ে দিবি, আমরা একখান সোনার গহনা দেব। টাকাও অনেকগুলি পাব এক থোকে—পেরাই পাচ কুড়ি। আমার গায়েরও দু'চারখানা রাং-চুটকি আছে —একেবারে নাথাকা লয়। তা কি বুলচ—এই দেখ ভাই, কথা না লতা, বলতে বলতে আসল কাজ বাদ পড়ছে। ও ভাই আগে জল খাও।' কেশরের মা উঠি উঠি করে বসে রইল।

হোরাং-এর মা বললে, 'ওগো, আমার বিয়ান বুলছে ওর ছোট বিটি ভাসানির সঙ্গে কেশরের বিয়ে দিতে। জানো? তাই আমাকে সঙ্গে করে এসেছে।'

'তা তোমরা পাচ জনা আছ, যা ভাল হয় তাই করবে। আমি তো সে মেয়েটি কখুনু দেখিনি। দেখতে শুনতে কেমন বটে? বেশ সাজন্ত হবে তো?'

'কনে ভাল। আমার বৌমার চেয়ে নাক-মুখের ঢোল অনেক ভাল। এগারো-বারো বছর হবে, কি বল হে বিয়ান?'

যগ-দাসী নিশ্বাস ছাড়ল। বললে, 'তা কি আর বলতে পারি ভাই? নিজের

ছেলের গল্প কি আর নিজে সাজে ? পাঁচ জনায় দেখবে, তবে বলবে। আমার বড় বিটি কুড়ানির খুব মন এইখানে বিয়ে দিতে। বলে এক খবর হবে, আপদ-বিপদে হামরাই হয়ে দাঁড়াব। আমারও মন তাই। তবে ভাই আমরা তো গরিব। স্বামীটি আর তেমন খাটতে পারে না। হাল একখানা আছে, বলদ জোড়াও বুড়ো, খাটিয়ে লয়। কোনো রকমে চলে। যদি ক্ষেমা-ঘেন্না করে লাও তো হবে।'

'তা এ বাপু বিধির বেপার, আমি বুললেই কি হয় ? কলিকালের ছেলেপিলে সব, পছন্দ-অপছন্দ আছে। ছেলের মন হলেই হবে।'

'ছেলেটি ঘর আসে কখন ?'

এতক্ষণে নিশ্বাস ছাড়ল কেশরের মা। এতক্ষণ সৌভাগ্যের কথা বলছিল এবার বেরিয়ে এল বিষাদের সুর।

'ছেলের আমার কি হয়েছে কিছু বুঝছি না। ডাক্তারবাবুর বাড়িতেও যায় না হররোজ। তারা খোঁজ লিতে লোক পাঠায়। এদিকে ঘরেও আসে না সবদিন। যে দিন বা আসে ভাল করে খায় না, ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমায় না। কেমন বাউণ্ডুলে চেহারা। জিগগেস করলে কিছু বলে না। অনেক সাধ-সাধনার পর বলে, বাড়ির চাকরি করব না, শহরে কাঁকরের কারখানায় মজুরি খাটতে যাব।'

'বুঝলে না ? যে বয়সের যা। যেমন শুয়োর তেমনি খেটে। বিয়ে দিয়ে দাও।' নর-দাসী চোখ বেঁকিয়ে ঘাড় নাড়লে।

'আন চিত্ত রাধার মন, শাকে বালি পায়েসে নুন। বিয়ে দিয়ে দাও।' সায় দিল যগ-দাসী : 'যেমন বেহাদি তেমনি চিকিচ্ছে।'

১৪

'সন্ধ্যে বেলায় অতিথ এলো গো। হরিবোল !'

তুলসীতলায় বাতি দেখিয়ে ঘরের মধ্যে এসে কুড়ানি প্রণাম করছে, মানুষের গলায় আওয়াজ পেয়ে বাইরে এল।

'আরে কুনী দিদি ! আই ভাই, আই ! কি ভাগ্যি আমার ! বোসো ভাই বোসো, এই চাটাইয়ে বোসো !'

দাওয়ায় চাটাই বিছিয়ে দিল কুড়ানি।

কুনী বসে ঘরের মধ্যে তাকিয়ে গলা লম্বা করে জিগ্‌গেস করলে : 'শুয়ে কে ?'

'মা। দুপুর রোদে হাট থেকে এসে শরীর খারাপ করেছে, তাই ঘুমিয়ে আছে। তা ভাই কুনীদিদি, কি মনে করে ভাই ?'

'কেনে, ভয় লাগছে না কি লো ?'

'তোমাকে আমার ভয় কি ? কোনো দিন তো আস না—'

'এলাম একবার বেড়াতে। অনেক কাজ, বহুৎ দরকার, ঢের কথা আছে।' বলে কুনী এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

গা ছমছম করে উঠল কুড়ানির।

'ভগমান মেয়েমানুষ গড়ে কেনে ? আর যদি গড়লেই তাহলে রূপ-যৌবন দেয় কেনে ? শুধু পাপের শাস্তি ভোগ করতে ভারতে আসা।'

কুড়ানির আবার রূপ-যৌবন আছে না কি ? সব আখার ছাই।

'কী লেখন মেয়েমানুষের ! মনের কথা মনেই রাখতে হবে, দুনিয়ার কোনো নোককে বলা হবে না—'

তবে কি কুড়ানির মনের কথা পাড়ার পাঁচ জনে জানতে পেরেছে ? এত করে গোঁজা দিয়ে মনের ফাঁক-ফোকর বন্ধ করে দেবার পরেও কান্নার আওয়াজ শোনা যায় ? শুনতে পেয়েছে এরা ?

'সুন্দরী হয়ে জন্মেছিস কেনে ? আগুন যে ছাইচাপা থাকে না।'

কুনীর হাত আঁকড়ে ধরল কুড়ানি। বললে 'কুনীদিদি, তোর কথাগুলি আমি ভাল বুঝতে পারছি না। ব্যাপার কি বল দেখি ? সত্যি কথা বলবি, কিছু গোপন করবি নে—'

'বলি, বিড়ি-বাঁধা ছেড়ে দিলি কেন ? বাড়িতে বসে থেকে দু পয়সা হত।'

'বিড়ির ব্যবসা ছাড়লেম ভদ্দরনোকের অত্যাচারে। বিড়ি ঘরে নাই, তবুও গাহেক। ব্যাপার দেখে বন্ধ করে দিয়েছি।'

'মেয়েমানুষ যত অন্দরে ভরা থাকে ততই ভাল। বাইরের হাওয়া গায়ে লাগলে গা কেমন ছমছম করে। ছোটলোকদেরই মরণ। তাদের তো আর আবরু থাকে না। লোকেরও সাহস খুব হয়। ভাবে ওদের আর মানসম্মান কি !'

'বাড়ি হতে আমি কোথাও যাই না, কেবল ঘাট আর বাড়ি—তাও কত ভয়ে-ভয়ে থাকি। বাজপাখিকে পায়রাগুলো যেমন ভয় করে—'

'তা কেন বলিস। হাটে যাস, বাপের বাড়ি যাস—'

'সে কালে-কস্মিনে। হাটে যেয়েছি মা যখন মেয়ের বাড়িতে ছেল—তাও লিত্যি লয়।'

'মার থানে যাস। গান শুনিস।'

'মার মন্দিরে যাব না? যাই তো এই কালি-ঝুলি মেখে। গয়না নেই, ভাল কাপড় তো নেই-ই। এই একখানা মোটে কাপড়, যা পরে আছি; তাও, সেদ্দ করে পরিষ্কার করি না। চিমটি কাটলে ময়লা ওঠে।'

'তুই যে সারকুড়ের পদ্মফুল।'

'তোমার মুণ্ডু। ব্যাপারখানা কি খুলে-খেলে বল দিনি।'

'ব্যাপারও ঐ মুণ্ডু।' কুনী আরো ঘেঁসটে এল। ফিসফিসিয়ে বললো, 'হোরাং কোথা? এখুনি আবার আসবে না কি?'

'না। সে তো আজ বাড়িতে নাই। মনিব-বাড়িতে ধান আনতে গেছে। খোরাকির ধান নাই।'

'ওটা একটা ভূত। শোন।' কুনী কুড়ানির একখানা হাত ধরল: 'বাবুপাড়ার সরিৎবাবুকে চিনিস? মস্ত লোক, কাঁকরের পেকাণ্ড কারখানা খুলেছে—কাল গিয়েছিল কবি শুনতে—'

'হবে। তার আমি কি জানি!'

'সে মুদমিই আমাকে বলে, আমি কিন্তু কথা গা-গোছ করি না। কাল ভাই আমাকে দশ টাকা দিয়ে বামুনের ছেলে জোড় হাত করে বলেছে। তাই তোর কাছে আসা। আজি থাক তো ছাথ।'

নিশ্চিন্ত হল কুড়ানি। এ তেমন কিছু ঘোরালো-প্যাচালো নয়। এ তার নিজের এক্তারের মধ্যে। হাঁ-না—এ দুয়েরই মালিক সে নিজে। এ বাইরের ব্যাপার। মনের ব্যাপার নয়। মনের ব্যাপারেই যত ঝঞ্চাট। হাঁ-না কিছু বোঝা যায় না, বলা যায় না। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ দিশপাশ নাই। কখনো ঠাণ্ডা, কখনো কুলকাঠের আগুন। যে ডালে বসে, সে ডালই কাটে। কখনো বা শুষ্ক মূল ছেড়ে পাতায় জল ঢালে। যে পাখি ছুট দেয় তারই পিছু ধাওয়া করে। তার না পাওয়া যায় ঠাঁই, না পাওয়া যায় ঠিকানা।

কুড়ানি দেখল, গায়ে তার হাত পড়লেও তার মনের দুয়ারের আগড় তেমনি অটুট আছে।

গায়ে হাত? হ্যাঁ, তার স্বামীর হাত। দুর্বল মানুষ হলেও সেদিন তাকে

মারতে কসুর করেনি। কেন মেরেছিল কে জানে? আর কুড়ানিই বা সে মার সহ্য করেছিল কেন নিঝুমের মত, কে বলবে?

অনেক দুঃখ ছিল হোরাং-এর। নিজের খাবার সংস্থান তো নেই-ই, মার দুয়ারের মানত ধান ক'টাও দিতে পারে না। শুধু দুঃখ নয়, লজ্জা। আর সেই লজ্জা তাকে যে দিচ্ছে তাকেই কি না তার স্ত্রী আপন করতে চায় বোনের বিয়ে দিয়ে! তারই জন্যে খোসামুদি!

এ আবার আরেক রকম প্রসঙ্গ। কিন্তু মনের নাগাল পাবে কোথায়? পাঁকাল মাছটি হয়ে আছি। পাঁকের মাঝে বাস করছি কিন্তু গায়ে নাই পাঁকের ছোঁয়াচ। ঘ্রাণ থাকে তো দেখবে, ফুলের বাস উঠছে। বুনো পাতার আড়ালে মিষ্টি ফুল।

'তোকে কিছুই করতে হবে না। সব চাকরে করবে। যা চাবি তাই পাবি। জোত, জমা, শাড়ি, গয়না, লগদ টাকা, কোলকাতায় গিয়ে থাকবি। রানির মত থাকবি। সম্পত্তি আগে তোর নামে লিখে-পড়ে রেজেস্টারি করে দিতে আজি আছে—'

কুড়ানি ফাঁপরে পড়ে আমতা-আমতা করতে লাগল: 'সে হল গে বামুন, আর আমরা হলাম কুরুর! এ কি কখনো হয়?'

'খুব হয়। কত হচ্ছে গাঁ-ঘরে। উঁচু জাতের ব্যাপারে অধর্ম নাই। অধর্ম হচ্ছে নিচে নামলে। এই ছাখ কেনে—'

'তুমি কি যে বল তার ঠিক নাই। আমার এই দেশ-গাঁ বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যাব? দুনিয়ায় টাকাই কি সব?'

কুনী বললে, 'টাকাই সব বোন, টাকাই সব।' বলে দুলে দুলে ছড়া কাটল:

'কড়িতে ইষ্টি কড়িতে মিষ্টি
কড়িতে মেলে হরি,
অঘটন ঘটে, সব দেশে রটে,
কড়িই আঁধার লড়ি।'

'ঠিক হ'ল না কুনী দিদি, কড়িই গলায় দড়ি।' কুড়ানি মুখ আঁধার করে রইল।

'বেশ তো, গাঁ-ঘর ছাড়তে না চাস এখানেই থাক কেনে। গোপ্ত অঙের খেলা চালা। আমি আছি, ধরা পড়বি না। হোরাং যদি বুঝতে পারে বুঝবে। সে অবুঝের সোয়ামী হবে না।'

কুড়ানি হাত ছাড়িয়ে নিল। বললে, 'তুমি যা বুলছ তা অঙ নয়,-কাদা। আমি ওসবের মধ্যে নাই। খাটব খাব, মন পাতিয়ে সংসার করব। তোমার সেই এঁটোথেকোর বেটাকে গিয়ে বোলো, তুনিয়ায় মেলাই আছে, তাদের দিকে নজর দিক, আমি লয়। আমি দোকান খুলে বসিনি। আমি টুসকির মাল নই।'

কুড়ানি উঠে দাঁড়াল ঝপ করে।

কুনী বুঝল এখানে কোন ফল হবে না। শুধু পাথরে কোপ মারা। বললে, "আমার ভাই দোষ নাই। বড় লোক—ধরেছে, তার মানের খাতিরে বলতে হল।'

'তোমার আর দোষ কি। বরঞ্চ ভালই হল। সাবধান হব।'

'আমার দোষ ভাই ধরিসনি।' কুনীও উঠে দাঁড়াল: 'আমি বুঝিয়ে বলে আসব বাবুকে। এ আপনার ঠুনকো জিনিস লয়, এ একেবারে খাঁটি সোনা—'

'ঠাট্টা করছ কুনী দিদি?'

'ছি, ঠাট্টা কেনে। নিজের থেকে অঙ হয় সে আলাদা কথা, যেচে কেনে বেচে দেব নিজেকে? তার টাকা আমি ফিরিয়ে দেব। জোড় হাত কচ্ছি ভাই, মনে কিছু করিস নে। নিজে দোষী সেই ভাল। পরকে দোষী করা ভাল লয়। যাই ভাই, রাত হচ্ছে—'

১৫

ডাক্তারবাবুর একখানা ভাঙা জমিতে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে কেশর। তুখানা জমি থুয়ে দূরে দাঁড়িয়ে কে তাকে ডাকছে: 'ওগো! শুনচ!'

কেশর শুনছে না।

'কাজ তো খুব করছ। এদিকে শোনো কেনে একবার!'

এক কিত্তে জমি পার হয়ে আলের উপর দাঁড়াল কুড়ানি: '[illegible]বে থেকে আবার কান-কালা হয়েছ! ওগো ও কালা মানুষটি! শো[illegible]া! আচ্ছা লোক বটে। লাগিয়ে টাটক বাজি, বসে বসে রঙ্গ দেখি। শুধু কালা লয়, বোকা। বুঝলে না, মালিকের মন না জোগালে কি আর ভালবাসা যায়?'

নিজেরো অলক্ষ্যে ঘাড় ফেরাল কেশর। কোদাল রেখে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'এখানে এ মাঠের মধ্যে তুমি কি করে এলে? কে সন্ধান দিলে? কেনে, আমার কাছে আবার কেনে এসেছ?'

'তবে ঐ কাঁকরের কারখানার বাঁশবুকো বামুনের কাছে যাবো, না ?'

কে যেন গালে চড় মারল কেশরের। তাকাল কুড়ানির দিকে। জল-জল করছে তার চোখ দুটো। ময়লা শাড়ি আর ময়লা গায়ের রঙ, তবু মনে হয় আগুনের খাপরার মত দপদপে।

'দরকার হলেই মানুষ মানুষের খোঁজ করে। এসো একটু, সরেই এসো। কেউ গিলে খাবে না।'

এতটুকু ভয় নেই। সাবধান নেই।

'এত দিন আমাদের দিকে যাওনি কেনে ? দেখিনি কেনে চাঁদমুখ ?'

'যাব কি মার খেতে ?' কেশর ঝামটা দিয়ে উঠল।

'আহা, কি মার তুমি খেয়েছ শুনি ? হাড়গোড় একেবারে চোর্ণ হয়ে যেয়েছে, না ? তোমার সঙ্গে পারত ঐ রোগা মানুষটা ? এক ঘায়েই খুন হয়ে যেত। বেশ হত আমার। এক জন যেত মরে,আরেক জন জেহেলে। বেশ হত।'

'কিন্তু গালাগালটাও তো কম খাইনি।'

'এখন কিছু বুলছি না-হয় মিঠে বুলি—পিরিতের ডাক— !'

'ঐ গাছটাকে বলো গে।'

'তুমি কিছু বোঝ না, বুঝবেও না। তুমি যদি তখন অত রোক করে না যেতে তা হলে অত দূর হত না। স্বামীর মান বজায় রাখতে আমি শুধু ছল করেছি। আমার চোখের কোণে তুমি দেখনি সে ইসারা ? গালাগালের ফাঁকে দেখনি আমার দপ্কানি ? তুমি আবার যদি যেতে, আবার তোমাকে গালাগাল দিতাম, আবার তোমাকে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে দিতাম। তবু একটু দেখতাম তোমাকে, ছুঁতাম তোমাকে।'

'আর তোমার স্বামী আমার নামে ফৌজদারি করত !'

'করত করত ! তা বলে তুমি তোমার পাওনা ধান ছেড়ে দেবে কেনে ? একবার যখন রোক করেছ তখন ঠিক আদায় করে ছাড়বে।'

'ও ধান আমি নিজের থেকে দিয়ে দিয়েছি হোরাং-এর হয়ে।'

'জানতাম তুমি দেবে।'

'হ্যাঁ, সব শোধবোধ করে দিয়েছি। শেষ করে দিয়েছি। পর কখনো হয় না আপন, কেবল দু'দিন লাচন-ভাচন। বেশ হল, মনের ময়লা ধুয়ে গেল।' কেশর আবার কোদাল চালাতে লাগল।

'জগতে সবারি মন তো সমান হয় না। মন মানে না তীর্থি করা, মিছেমিছি ঘোরা-ফেরা। একটা উপকার যদি করেছ আরেকটা কর।' কুড়ানি আল ছেড়ে জমির উপর নেমে এল।

'কি ?' আবার উঠে দাঁড়াল কেশর।

'শাশুড়ির আর ওর জর ! আমি এখন কি করি ? ডাক্তারবাবুকে বলে একটু ওষুধ এনে দাও। বিকার আছে জরের সঙ্গে।'

এতক্ষণে নজরে পড়ল কুড়ানির হাতে একটি খালি শিশি। যেন শুধু এক জনের জন্যেই তার ওষুধ দরকার !

'শিশি রেখে যাও। বুলব ডাক্তারবাবুকে।'

'আর ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এস আমাদের বাড়ি। ওর পেটে ফাঁপ হয়েছে। সুবিধের মনে হল না।'

'বুলবো।'

'তুমিও যেও।'

'কেনে, ফৌজদারি করতে না কি ? ঢের শিক্ষা হয়েছে আমার। আমি আর যাব না।'

এক মুহূর্ত কাঠ হয়ে রইল কুড়ানি। বললে, 'তুমি এখন সরে পড়তে চাও, না ? মাঝ-দরিয়ায় ভাসিয়ে না, পারী এবার চলে যা। ভালো ! বেশ ! চমৎকার ভালবাসা ! আগে বুঝি নাই যে পিরিতের এমনি ধারা—'

'আগে কে বুঝেছে ? যাও, কাজ করতে দাও। মাথার কাপড় খুলে পড়েছে, তুলে দাও।'

'দেব না তুলে। আমি মাথার কাপড় ইচ্ছে করে ফেলেছি। আমি আর কাউকে ভয় করি না।' কুড়ানির চোখে জল দাঁড়িয়ে গেল : 'যে যত ভয় করে তাকেই তত চেপে ধরে। নরমকেই সবাই ধরম দেখায়।'

'তাই না কি ? চোখে পানি দেখি লেগেই আছে। কি দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেব ? ডুমুরপাতা দিয়ে দেব না কি ?' কেশর আবার কোদাল ধরল। বললে, 'দাঁড়িও না আর। লোকে দেখলে কি বুলবে। এবার বাড়ি যাও।'

'তুমিও যাবে বলো এক দিন। কাল ! পরশু !'

'এই অসুখের মধ্যে ?' কোদাল ছেড়ে দিল কেশর।

'এই অসুখের মধ্যেই তো ভাল। মারামারি হবে না। শরীরে আর এক তিল বল নাই। কালীর কাছে পাপ, এ ব্যামো কি সারবে? আর কি উঠতে পাবে কোনোদিন? তাই ভয়েরই বা কি, বাধাই বা কোনখানে?'

তার মানে, হোরাং খ্যান্ত হলে কুড়ানি সাঙা করবে কেশরকে! কিন্তু যদি সেরে ওঠে হোরাং?

হঠাৎ কুড়ানির একটা হাত খপ করে ধরে ফেলল কেশর। টান মেরে বলল, 'আমার সঙ্গে যাবে? হ্যাঁ, এক্ষুনি। এই এক কাপড়ে। এই ঢালা মাঠ ভেঙে। যাবে?'

'কোথায়?' খালি শিশিটা বুকের কাছে আঁকড়ে রইল কুড়ানি।

'যে দিকে চোখ যায়।'

'সে আবার কোথায়! জায়গার নাম নাই?'

'সে অনেক দূর। নাম নাই।'

'বাড়িতে যে উগী, উগী ফেলে কি যেতে পারি? কঠিন অবস্থা। কখন কি হয় না-হয় তার কিছু ঠিক নাই—'

তা তো ঠিকই। তবু কেশর হাত ছাড়ল না। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। দুপুরের রোদে ক'টা গরু শুধু ঘাস খাচ্ছে চরে-চরে।

'হাত ছাড়ো। লোকে দেখলে কি ভাববে বলো দিনি।' অন্য হাতে কুড়ানি মাথার উপর কাপড় তুলে দিলে।

হাত ছেড়ে দিল তক্ষুনি।

কেশরের পায়ের কাছে শিশিটা রেখেই কুড়ানি পথ ধরল। একবার শুধু বললে, 'তুমি এক দিন যেও কিন্তু ইরি মধ্যে। জানবে, এই সুসময়। কালীর দেওয়া রোহাদি, এর যে নিস্তার আছে এমন মনে হয় না। তবু ডাক্তারবাবুকে লিয়ে যেও। তোমার মনিব, তুমি বললেই টাকা লেবে না। তুমি তো ফিরেও তাকাও না, আমার কি টাকাকড়ি কিছু আছে? যদি তুমি বলো তো নাকের আপেলটা বিক্রি করে দি। কেমন?'

১৬

'বাবুদিদি।'

'কে রে? কেশর? কখন দেখি কখন দেখি না। কি হল তোর? আমাদের ছেড়ে দিলি?'

'আপনারা আমার আপ্তজন, আপনাদের কি ছাড়তে পারি? সেই ব্যাপারটায় খুব লটাপটি খেয়ে যাচ্ছি—তাই কাজ-কামে ঠিকমত আসতে পারছি না।' কেশর মাথা নামাল।

'ডাক্তারবাবু তো তোর উপর খাপ্পা হয়ে আছে। বলেছে তোকে আর রাখবে না, ছাড়িয়ে দেবে।'

'তাই তো তাঁর চরণ ধরতে এসেছি বাবুদিদি। চাকরি যাক কিন্তু চরণ যেন না যায়।'

'কিন্তু হয়েছে কি? কি লটাপটি খাচ্ছিস?' ডাক্তার-গিন্নির গলা নরম হয়ে এল: 'এমন মনমরা হয়ে আছিস কেনে?'

'ক'টা টাকা চাই বাবুদিদি।'

'তোর টাকা তুই লিবি তাতে আবার অত দাঁতে কুটো করা কেনে? মাকে বুঝি জানতে দিবি নে? তোর মাইনের টাকা, তাতে মায়ের কি। কেনে, টাকা কেনে, কত টাকা?'

'তিরিশ টাকার কম লয়। দেখেছি হিসেব করে!'

'অত? কেনে? মেলে-খেলে বল সব আমাকে। লুকোছাপা করিস নে। ঐ মেয়েটাকে লিয়ে পালাবি বুঝি? দেশান্তরী হবি?'

'না, পালাবার আর দরকার হবে না।'

হতাশায় যেন ভেঙে পড়ল ডাক্তার-গিন্নি: 'কেনে, হ'ল কি? অঙের খেলা ভেস্তে গেল? লাচুনী মেয়ে আর কোথাও লাগর ধরলে?'

'না। মেয়েটার ঐ তেড়ুয়া স্বামী খ্যান্ত হয়েছে।'

'মরে গেছে? সাবড়ে গেছে?' খুশির ঢেউয়ে উথলে উঠল ডাক্তার-গিন্নি: 'তবে তো তোর মজা রে—ভরা নদীর জোয়ার। হা রে শালো, মজা না? এবার সাঙা করতে পারবি না?'

কেশর চুপ করে রইল।

'কি রে আকাট, আ কাড়িস না কেনে? এখন তো আর ভোজ-জরিমানা নেই, কাজিয়া-কোন্দল নেই। এখন তো নিশ্চিন্ত হয়ে সাঙা করতে পারবি।'

'তা হয়তো পারব।'

'তবে ? মুখ নামিয়ে আছিস কেনে ? মনে ফুর্তি নাই কেনে ?'

'না, ফুর্তি আছে বৈ কি। তবু ইর চেয়েও বেশি সুখ ছিল বাবুদিদি। সোয়ামী মরে যাবার পর সাঙা— ই তো মুদমিই হলছে গাঁয়ে-ঘরে। ই তো ভাত ঠাণ্ডা করে কালা করে খাওয়া। উবোজ্জলন্ত তো আর খেতে পেলাম না। সোয়ামী বেঁচে থাকতে-থাকতে তো আর আমার সঙ্গে যেতে পারল না বিয়াশে। ই তো বিয়ে ফুরিয়ে বাজনা, কিস্তি ফুরিয়ে খাজনা।'

'হা রে শালো, জাতনাশা।' ডাক্তার-গিন্নি কৃত্রিম রোষে হাত তুলল মারতে: 'ভাত পায় না ভাতার চায়, তার উপরে গয়না চায়! অমনি যে পাচ্ছিস কালীর দয়ায় তাই ঢের, তা না, যত সব ইয়ে—' ডাক্তার-গিন্নি আবার একটা হুমকি দিল: 'ছুঁচ চলে না বেঁটু চালায়!'

'তা ঠিক। এক ভাবে না এক ভাবে হোক পেলেই হল।'

'ইর মধ্যে আর দু'ভাব নেই। বউ নিয়ে ঘর বাঁধবার কথা, তিথ্যি করার কথা লয়। তা টাকা দিয়ে কি করবি ?'

'অনেক খরচ। সেই ভেড়ুয়ার আগে শ্রাদ্ধশান্তি করতে হবে। জাত-গিঁয়াত খাওয়াতে হবে। তার পরে সাঙার জোগাড়জান্তি। মেয়েটার একখানা বেশি দু'খানা শাড়ি নাই—'

'নিশ্চয়। খরচ আছে বৈ কি। তা তোর মা জানে ?'

'জানবে বৈ কি। কিন্তু মার মন কি উঠবে ইতে ?'

'কেন উঠবে না ? আমি তার মত করিয়ে দেব। এ কি চাট্টিখানি কথা ?' ডাক্তার-গিন্নি গদ্গদ হয়ে উঠল: 'ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে মিলন হতে পারা কি কম ভাগ্যি ? এ পেরায় ভক্তের ভগবান পাবার মত। এ কি সকলের অদেষ্টে জোটে ? তুই যদি তা পাস তোর মা তাতে বাদ সাধবে কেন ? তোর মা কি তোর শত্তুর ? তোকে তোর মা পেটে ধরেনি ?'

ডাক্তার-গিন্নি টাকা দিল তিরিশটা। বললে, 'আর বেশি রইল না। তা ঘরে এখন লক্ষ্মী আসবে, টাকা-পয়সার অভাব হবে না। দিন ঠিক হলে তোর মাকে পাঠিয়ে দিস, নতুন শাড়ি দেব, পারি তো ছোটখাট গয়না দেব একখানা। আর শোন, এক দিন দেখিয়ে যাস মেয়েটাকে। দেখব তোর পছন্দ।'

টাকা নিয়ে বেরিয়ে এল কেশর। ডাক্তারবাবু কোথায় ? ডাক্তারবাবু বৈঠকখানায় বসে পাশা খেলছেন।

ঝাঁপিয়ে পড়ে কেশর তাঁর পা জড়িয়ে ধরল।

প্রথমটা আঁৎকে উঠেছিলেন, পরে দেখলেন কেশর। পা গুটিয়ে নিয়ে বললেন, 'উঁহু, হবে না, তোকে আমি আর রাখব না। থেকে-থেকে অমন কামাই করা পোষাবে না এখানে। তুই বাড়িতেও থাকিস না নিয়মমত। তুই বকে যাচ্ছিস— আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়াস।'

'আমার নিজের জন্যে বলছি না বাবু। আমাদের গাঁয়ের পচি পাড়ায় এক জনের বড় অসুখ। তাকে একবারটি আপনি দেখতে যাবেন।'

ডাক্তারবাবু ধাতস্থ হলেন। 'কার অসুখ?'

'হোরাং। হোরাং কুকুর। জ্বর বোধ হয় সান্নিপাতিক। তার মারও অসুখ— আমোশা।'

'তাতে তোর কি মাথাব্যথা?' ডাক্তারবাবু ধমকে উঠলেন।

'আমাকে পাঠিয়ে দিলে আপনাকে নিয়ে যেতে।'

'আট টাকা লাগবে আগাম।'

'টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে আমার সঙ্গে।' ট্যাঁকের থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করলে কেশর।

'বেশ, কাল সকালে যাব।'

'না, বাবু, আজকেই যেতে হবে। খুব কান্নাকাটি করছে। অবস্থা ভাল নয়।'

'এখন রওনা হলে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। নদী পড়বে না কি? ঘোড়া পার করা যাবে? এখন যেতে হলে বারো টাকা।'

'তাই দেব।' ট্যাঁকে আবার হাত রাখল কেশর: 'শুধু একটা নিয়ম রক্ষা। মরার আগে একবার ডাক্তার দেখানো। নিজের মনকে চোখ ঠারা। আসলে বাঁচবে না কেউ।'

'কে হয় তোর হোরাং?'

'কেউ নয়। অমনি জাতের লোক। বন্ধু।'

১৭

ছোট কাহি ঘরটাতে শুয়ে নরদাসী পেটের যন্ত্রণায় কুঁ-কুঁ করছে। আর এদিকের কোঠা ঘরে জ্বরের ঘোরে চেঁচাচ্ছে হোরাং।

'ওমা আর বাঁচি না। ও বাবা কি করব। আমি বনে বসে চেঁচাচ্ছি।' আমাকে বাঘে খেয়ে যাক। আমার কেও নাই। একা মানুষ তু'-তু'টো উগী নিয়ে পড়েছে। কোন দিক সামলাবে? কখন ডাক্তার আসবে? ডাক্তার এলেই বা করবে কি! এ বেহাদ্দি মা-কালী দিয়েছেন। এ একেবারে নেপাট করে ছাড়বে। আমি আর বাঁচব না। আমাকে বাঁচাও। মা-কালীর ধান শোধ হয়ে গিয়েছে বুলছ? কে শোধ কল্লে? কেশর? ডাক্তার আনতে গেছে কে? সেই কেশর? এত ভাল? এত আত্ম? ওর ঋণ আমি শোধ করব কি করে?'

দিন-রাত্রির মধ্যে একটু অবসর নেই কুড়ানির যে একটু বসে চিন্তা করে। কিন্তু এখন এক ফাঁকে কেশরের নামটা পাড়তে পেরে মনটা হালকা হয়ে গেল। আরো আরাম লাগল যখন হোরাং ও-নামে আগুন হয়ে উঠল না। গা পেতে মেনে নিলে।

ঠ্যালায় পড়লে ন্যালারও জল খেতে হয়। তাই কেশর এখন খুব ভাল লোক। আত্মজন!

যেমন মন্তন্না তেমনি যন্তন্না। সহজে মেনে নিলেই তো হয়। গরিব যে, অক্ষম যে, তার পক্ষে আড়বুঝ হলে চলবে কেন? এই যে লোকটা এত খাটনি দিচ্ছে, খেসারৎ দিচ্ছে, কিসের লোভে? একটু আসতে-যেতে দিলে ক্ষতি কি? হলই বা না একটু বন্ধুতার লোক, করুকই না একটু বসু-উঠু? কি এমন মা-ভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? এত যে করছে সে একটু পেতিদান পাবে না?

ডাক্তারবাবু ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন। ওষুধের বাক্স মাথায় কেশর।

'ঘোড়াটা বাঁধ।'

'আজ্ঞে বাঁধছি, আপনি নামুন।' কেশর হাঁক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল: 'ওরে কে আছিস একটা মোড়া এনে দে।'

আশ-পাশের অনেক বাড়ির লোক জড় হতে লাগল। ব্যাপার কি হে? একটু কি অসুখ করেছে, একেবারে যে ঘোড়ায়-চড়া ডাক্তার। বলি, কথাটা কি? কথা আর কি, ডাক্তারবাবুর চাকর ঐ কেশরের কেরামতি। কিন্তু, কেনে, কেনে তার এই হামখোদাই? আর কেনে! বোঝো না? যার ক্ষেত তার শস্য। যার লাঠি তার মাটি।

কিন্তু ডাক্তারবাবু ভিজিট লেবেন না? ছেড়ে দেবেন? চাকরের এত খাতির? কে জানে! জাঁতা জানে আর পিষুনী জানে।

'না হে, কথাটা ডাক্তারবাবুর কানে তোলা হক এ সময়। হাতের কাছে পেয়ে ছেড়ে দেয়া ঠিত হবে না। ভূতেশ কুনাই তো দেখেছে স্বচক্ষে। সে সাক্ষীপ্রমাণ দিতে পারবে। কি রে ভূতেশ? দিনে-দুপুরে মাঠের মধ্যে ঘোমটা ফেলে—কি রে সেই ঘটনাটা? হ্যাঁ বাবা, কেছা লয়, সত্যি ঘটনা। চর্মচক্ষুতে দেখা।'

'দরকার নাই। নিজের চাকরের দোষ বিশ্বাস করবে না। উলটে মন্দ ভাববে আমাদের। হ্যাঁ বাবা, সবসে চুপ ভাল। ছাখো শোনো বোলো না, রাঁধো বাড়ো খেয়ো না। নিজেরাই জোট বাঁধো, পতিত-রহিত করো।'

ডাক্তারবাবু রুগী দেখে বেরুলেন গলায় রবারের নল ঝুলিয়ে।

'উগী কেমন দেখলেন?' সবাই গোল হয়ে দাঁড়াল।

'ছোকরাটির ব্যারামই শক্ত হয়েছে। বুড়িরও ভরসা কম। আরো আগে ওষুধ দিতে হত।'

'বাঁচবে তো?'

'যদি কপালজোর হয়, ওষুধ ধরে তো বাঁচতে পারে। এখন বিশেষ তদবির দরকার। টাকা-পয়সা খরচ করতে হবে। দু'চার টাকায় হবে না। এদের আছে কে?'

'এজ্ঞে আমরাই আছি। আমরাই ইদের জাত-গিঁয়াত, পাড়া-পড়শি। আমাদেরই সব করতে-কম্মাতে হবে। চাঁদা তুলতে হবে ঘর-ঘর। তবে দেখছেন তো, আমরা সব গরিব মানুষ, আপনাদেরই জমি চষে আমরা খাই—'

'ব্যায়রামটি তো গরিব নয়। ওষুধের দাম যে খুব চড়া—বাজার যে বড় কঠিন হয়েছে আজকাল। ঠিকমত ওষুধ না পড়লে ছোকরাটা যে টেঁসে যাবে।'

বাড়ির ভিতর থেকে হঠাৎ কান্নার রোল উঠল: 'ওগো আমার সব যাক, দুঃখু নাই। আমার স্বামীকে বাঁচাও। লোকে যে যা বলবে বলুক, তোমার পায়ে ধরছি। তুমিই আমার সব। তুমি ডাক্তারবাবুকে একটু বলে-কয়ে দাও। পাড়ার লোক সব আমাদের শত্তুর। তুমি ছাড়া আর কেউ নাই। আমি সমাজ মানি না, আমার স্বামীকে বাঁচাও। দেখ না কেমন করছে।

আমার এ বেপদে কে করে ? কে দেখে ? ওগো হেমা মাসী, আমার মাকে এনে দে মা —'

কেশর এসে ঘোড়া খুলে দিল। বাক্স মাথায় করে ফিরে চলল ডাক্তারের সঙ্গে।

নদী পেরোবার পর ডাক্তার বললে, 'তুই এবার ফিরে যা।'

'বাড়ি ?'

'বাড়ি ফিরবি না যে তা আমি জানি। শোন, রাত জেগে কঠিন সেবা করতে হবে। সেবার কমতি হলেই আর বাঁচানো যাবে না। আমার ফি না-হয় কমিয়ে নেব, কিন্তু ওষুধ ? অত টাকা পাবি কোত্থেকে ?'

বুকটা ভরে গেল কেশরের। না, বাঁচুক, বাঁচুক, জীবন ফিরে পাক হোরাং, কুড়ানি খুশি হোক —সারা পথ আসতে-আসতে মনে-মনে বলতে লাগল বার-বার। এক জন জীবন পাবে আরেক জন খুশি হবে —এটাই যেন কত বড় সুখ !

কেশরকে ফিরে আসতে দেখল বুঝি কেউ-কেউ। এক জন বললে চেঁচিয়ে, 'লোহায়-লোহায় জোড় লাগে গো কামার মিনসেই পর।'

১৮

কিসের অসুখ ! এদিকে জ্ঞানখানা টনটনে।

রাত জমাট হয়ে আসছে। কই এখন রোগ বৃদ্ধি পাবে, তা নয়, স্পষ্ট থরথরে গলায় হোরাং জিগগেস করলে, 'কেশর কুথা ?'

'এই আছে বাইরে বসে। কখন কোন কাজে লাগে —'

'না, অনেক কষ্ট দিয়েছ ওকে। ওকে এখন ছুটি দাও। ও বাড়ি যাক।'

'বুলছি।'

'আর কুনীকে খবর দিয়েছ ? সে এসে থাকবে'খন তোমার কাছে।'

'খবর দিয়েছি।'

'শোনো, কিছু খেতে দিয়েছ কেশরকে ?'

'কি দোব ? ঘরে কিছু নাই।'

'মাহা বিপদ। হুঁকো কলকে তো আছে, একটু তামাক দাও কেনে।'

কাহি ঘরের খুঁটিতে পিঠ দিয়ে আচ্ছন্নের মত বসে ছিল কেশর। পিছনে দাঁড়িয়ে তার মাথা-ভরা চুলের মধ্যে কুড়ানি তার দুই হাত ডুবিয়ে দিলে। মাথাটা লুটিয়ে পড়ল তার কোলের কাছে।

কুড়ানি বললে, 'এবারে বাড়ি যাও।'

'বাড়ি যাব? ডাক্তারবাবু বলে গেলেন বাড়ি যাস নে। রাত জেগে পাহারা দে।'

'কিন্তু ও বললে বাড়ি চলে যেতে।' কুড়ানি হোরাং-এর ঘরের দিকে ইঙ্গিত করলে: 'ওর অনেক যন্ত্রন্নার মাঝে আরেক যন্ত্রন্না বাড়িয়ে কাজ নাই।'

'তবে উঠি।' কেশর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল: 'তোমার কাছে কে থাকবে?'

'কুনীদিদি আসবে বলেছে। কাল হেমা মাসী যাবে মাকে আনতে।'

'বেশ, আমাকে তবে আর দরকার নাই।'

'তোমাকে দরকার নাই? তবে বল আকাশের দেনমণিকে দরকার নাই। কিশোর, তুমি পুরুষ মানুষ, অল্লে তুমি তাই বুঝতে চাও না। তুমি একবার আমার এই অন্তরটা দেখবে?' বুকের মধ্যিখান থেকে কাপড়টা সরাতে লাগল কুড়ানি।

'অন্তর কি দেখা যায়?'

'যায়। যদি, যে দেখবে তার অন্তর থাকে। কেশর, তোমাকে শুধু এই গায়ের বস্ত্রটাই দিতে পারিনি। নইলে সব দিয়েছি মন-প্রাণ, চিন্তা-ভাবনা, আশা-ভরসা —সব।'

'মুখের কথা।' কেশর চলে গেল অন্ধকারে।

ফুলে-ফুলে অনেকক্ষণ কাঁদলে কুড়ানি।

দেখলে, কুনী এসে দাঁড়িয়েছে আঙিনায়।

'কেমন আছে হোরাং? আর মাসী?'

'ভালো নয়।'

'তাই আগুতেই কাঁদছিস কেনে? এখনো তো সময় আছে। সময় থাকতে বাঁধ বাঁধা ভালো।'

না, কাঁদবার কি হয়েছে? স্বামী তার ভাল হবে ঠিক। সে অধর্ম করেনি,

পাপ-পথে পা দেয়নি। শত ঝড়-তুফানেও সে ঠিক আছে। কান্না মুছে উঠে দাঁড়াল কুড়ানি।

'হ্যাঁ রে, সত্যি?' কুনী তাকে গায়ের কাছে টেনে আনল।

'কি সত্যি?'

'তোর নামে যে কলঙ্ক রটে গেল। পাড়ায় যে সব জ্ঞাতের ডাক হয়ে গেল।'

'কেনে, সেই কেশরের লেগে তো?'

'হ্যাঁ, সেই ছোঁড়া আসে নাকি তোর কাছে? কবে থেকে? কুথা? সব খুলে বল আমার কাছে। আমি তোর আপনার নোক।'

'কি আর বুলব কুনীদিদি। যত গর্জে তত বর্ষে না। তবে যা রটে তা কিছু বটে। জ্ঞাত-মজলিস তো ভাল-মন্দ বিচার করে না, নরমকে শুধু ধরম দেখায়।'

'কদ্দুর গড়িয়েছে বল দিকি? হোরাং জানে?'

'গড়াবার জিনিস লয় এ কুনীদিদি। থির আছি। এ হিয়ের তাপ কি কেউ জানে না বোঝে?'

'আমাকে বল খুলে-খেলে। দায়ের কাছে পেট লুকোস নে।'

'কেশরের সঙ্গে আমি থাকিনি। তাকে ভালবাসি। তাকে বোনের বিয়ে দেব বলে আপন করতে চাই। তা সে শোনে না তা কি আমার দোষ? এর জন্যে যদি পতিত হই তো হব। এ গাঁয়ে আর থাকব না। চলে যাব ভিন গাঁয়ে —'

'কেশর কি বলে?'

'পুরুষ মানুষ আবার কি বলে! তা কুনীদিদি, যদি থেকেই থাকি কেশরের সঙ্গে, আপন জাত তো বটে। তোমার ঐ বামুন বজ্জাতের মত জাতবেজাত তো লয়। তবে তসকিরটা কি? পতিত করবে! বেশ! যদি জরিমানা দিই তা'হলেই আবার সব দোষ খণ্ডে যাবে। হায় রে টাকা!'

'বলিনি সেদিন, কড়িতে ইষ্টি কড়িতে মিষ্টি —'

'পতিত করে কি করবে বলো দিদি? তোমার বেলায় কি করেছিল?'

'উঃ, ত্যাশলারা কি আমাকে কম জ্বলন দিয়েছে। এই ঘর-বাড়ি আসবে না, ভোজে-কাজে খাবে না, আগুন-পানি দেবে না। অন্য বাড়ি যেতেও দেবে না, ডেকে শুধুবেও না মরে গেলে।'

'আবার জরিমানা দিলে শাস্তি তো?'

'পাঁচিশ টাকা লেবে তবে চলতে দেবে। আমার ঠেঁয়ে দু'তিন বার জরিমানা লিয়েছে তবে ছেড়েছে। তা মোড়ল আমার লোক ভাল। টাকার জোগাড়-জান্তিও আছে মন্দ লয়। দু'চার খানা গয়নাগাটি দিয়েছে, দু'বিঘে জোলান জমি করে দিয়েছে ধানের। এখন তো খোলা ভাটি —আসে থাকে যায়, কোনো কথা নাই। পেথম ঠোঁকে একটু কষ্ট হয়, তার পর আর ভয় নাই। সমাজের মুখের উপর তুড়ি মারতে হলে টাকা-পয়সা চাই। তা কেশর আনছে কিছু জোগাড় করে?'

'যা আনছে তা দিয়ে আগে সোয়ামীর চিকিচ্ছে করতে হবে তো? মাথার উপরে কি একটা বেপদ কুনীদিদি? সঙ্গে-সঙ্গে শাউড়িও শক্ত কাহিল। এদিকে খোরাকির ধান নাই, চাল দিয়ে জল পড়ে। ঘর বাঁধি না মন বাঁধি? কিশোরের আমার সাধ্য কি? কিশোর আমার কয় দিক সামলাবে? তার উপরে যদি জরিমানা হয় —ঐ মা ডাকছে কুনীদিদি। চলো।'

একটু আড়ালে গিয়ে কুড়ানি চোখের উপর আঁচল চাপা দিল।

১৯

সন্ধেবেলা হেমাঙ্গিনী এসে হাজির।

'আসতে আসতে সন্দে হল। তোর মা কুথা রে ভাসানি?'

'এসো গো মাসি এসো। মা ঘাটে গেছে। এই দেখ এই সপে বোস। তা বাড়ির সব কেমন আছে?'

'ভালো সব নাই মা। পাড়াশুদ্ধ, সব জর-জ্বালা। আমার আসবার জো নাই। গা-গতরে বেদনা —'

'এসো গো এসো বিয়েন, কি মনে করে?' ঘাটের থেকে এল যগ-দাসী।

'যত তাল আমার মাথার উপর দিয়ে। আমি বলে কোথায় পড়ে থাকি তার ঠিক নাই, তবু বেপদকালে হেমা ছাড়া আর কারুর টিকি দেখা যায় না।'

'কি হয়েছে?'

'তোমাকে লিয়ে যেতে এসেছি। তোমার মেয়ে পাঠায়েছে আমাকে।'

'কেনে?'

'হোরাং-এর শক্ত অসুখ। তার মাও পড়েছে ভারী হাতে। ঘোর বেপদে

আঁধার দেখছে কুড়ানি। কেঁদে কেঁদে মিন্থতি করছে, আমার মাকে ডেকে দে, আমার মা ছাড়া কেউ নাই।'

যগ-দাসী কাঁখের কলসীটা পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল। বললে, 'কেনে মেয়ে আমার চলে আসতে পারে না আমার কাছে? ওটা ও কিসের সোয়ামী? বছরের মধ্যে তের মাস কেবল ভোগে! এক পয়সা কামাতে পারে না। চাষী ছিল, জমি-জমা খুইয়ে এখন মুনিষ হয়েছে! ওটাকে ও ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে পারে না?'

হেমা মাসী বললে, 'ওমা, সে কি কথা? এখন আবার ছাড়াছাড়ি কি?'

'লিশ্চয়। এখনই তো ছাড়াছাড়ি। পরনে একখানার বেশি শাড়ি নাই, গায়ে গয়না ঠেকায়নি একখানা, এক বেলাও খেতে পায় না পেট ভরে। ও ভাতারের ভাতে কে হাত দিতে যাবে। তার উপরে না কি সন্দ করে, মারে। ভাত দেবার ভাতার লয় কিল মারবার গোঁসাই। সন্দ করিস তো, ছাড়বিড় করে দে বিয়ে। আর ভাতার যদি না ছাড় দেয়, তুই, বিটি, ভাত খাব না বলে চলে আয় ছেড়ে-ছুঁড়ে। আমি তোকে উপযুক্ত লোকের কাছে সাঙা দেব।'

'তোমার মেয়ের কথায় আমি এসেছি। মায়ায় পড়ে এসেছি। সাত-পাঁচ অত জানি না কিছু।'

'খুব জানো। তোমাদের গাঁয়ে আর কুটুম্বিতে করতে যাব না। এই শেষ। মেয়েকে যদি একবার হাত করতে পারি তবে দেখাব একবার ও জাতনাশাকে। ও ভেবেছে কি? আমার মেয়ে কি পরের বাড়িতে চাকরানি হবে? দোরে-দোরে দুখ-ভিখ করবে?'

'বেশ তো চলো কেনে, মেয়েকে লিয়ে আসবে।'

'ওর লিজের বুঝ-সুঝ নাই, ও চলে আসতে পারে না লিজের থেকে? কিসের মজায় মজে আছে সেখানে? ওর কি সান নাই শরীলে? ও কি ম্যাড়া?'

'তুমি মিছিমিছি আগ করছ বিয়েন, যত বড় শত্তুর হোক এ ভরা অসুখের সময় কেউ চলে আসতে পারে?'

'খুব পারে। ও বাঁশচাপা এবার খ্যান্ত হোক। মেয়ে আমার এমনিতেও বেধবা অমনিতেও বেধবা।'

উত্তেজনার ঝোঁকে কখন কাছে বসে পড়েছিল যগ-দাসী, হেমাঙ্গিনী তার

পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বললে, 'আতথানটা কিন্তু আমি থাকব ইখানে।'

'তা থাকবে বৈ কি।' গলার স্বর নামিয়ে ফেলল যগ-দাসী।

নিশ্চিন্ত হল হেমাঙ্গিনী। গলার স্বরে দরদ ঢেলে বললে, 'এ আগাআগির জিনিস লয় বিয়েন, শলা-পরামশ্যের জিনিস। আমি বলি কি, জামাই দেখবার নাম করে তুমি চলো মেয়েবাড়ি। জামাই যদি খ্যান্ত হয় তো হল। আর না-হয় তো তানা-নানা করে মেয়ে নিয়ে আস। মেয়ে নিয়ে এসে আটকাও। বল, যাবে না, ও-ভাতারের ভাত খাবে না। বিটি তোমার ছেলেমানুষ, তত পাকা লয়।'

'আর বলো কেনে। মুরুব্বিকে পাঠিয়েছিলাম একবার আনতে। বলে পাঠাল মেয়ে, সোয়ামীর ওজগার-পাতি নাই এখন লিজে কাজ ধরতে হবে। হয় বিড়ি বাঁধব, লয় ধান কুটব। মেয়েটা নিজ্জস বোকা। তেমন চালাক মেয়ে হলে স্বামীর থেকে ছাড় নিয়ে আসত, খুলিয়ে লিত হাতের নোয়া।' কানের কাছে মুখ নিয়ে এল যগ-দাসী : 'এ বয়সের মেয়েরা তু একটা অঘটন-বিঘটনও তো করে। করে বিয়ে ছাড়বিড় করিয়ে নেয়। তা এ মেয়ের জ্ঞানও নেই, ঘেন্নাও নেই —'

'তবু তুমি চলো। এ যোক্তি-পরামশ্যর কথা। হাঁকিয়ে-চেঁচিয়ে বলবার মত লয়। মেয়েকে কাছে বসিয়ে মন্তর পড়াবার মত।'

'তুমি তাকে গিয়ে তাই পড়িয়ে দিও। আমার নড়বার জো নাই। এই দেখ, মুরুব্বিটি বাড়ি নাই। গরু-বাছুর-ঘরকন্না এই সেয়ানা মেয়ে কাকে দিয়ে যাই বলো তো?' বলেই ভাসানির উদ্দেশে হাঁক পাড়ল : 'খেঁসারি ক'টা ভেঙেছিস? সানি দিয়েছিস বলদকে?' বলে আবার হেমাঙ্গিনীকে লক্ষ্য করলে : 'এ মেয়েটা কি দাঁড়ায় কে জানে? আজকালকার মেয়েগুলো যেন ক্রেমে-ক্রেমেই বোকা হয়ে যাচ্ছে। মনের সাধ রইল মনে ধান বুনলাম বেনাবনে। আমাদের বয়সকালে —'

'চাপা দাও বিয়েন চাপা দাও।' হেমাঙ্গিনী নিশ্বাস ছাড়ল। বললে, 'আমি তা হলে খামোকাই এলাম!'

'খামোকা কেনে? তুমি আমার বাড়ি ধুলোপায়ে হেঁটে এসেছ, আমি মাথায় কল্লেম। আমার যেমন হয় খুশি মনে খাও, থাকো।'

'তা আতখানাটা শুধু থেকে সকাল বেলা চি-হরি চি-তুগগা বলে আমি চলে যাব। আমার কি ? শির নাই তার শিরঃপীড়া। কিন্তু মেয়ে-জামাই কেউ যদি কাউকে না ছাড়ে তবে তো বড় বেপদের কথা।'

২০

হোরাং সেরে উঠে পথ্য পাবার দু'দিন পর নর-দাসী মারা গেল।

মায়ের সৎকাজ হয় কেমন করে? বুড়ো মানুষ, গঙ্গা না দিলে লোকে বলবে কি ? কিন্তু টাকা কোথা ? হোরাং-এর শরীরে সামর্থ্য কোথা ?

হেমা মাসী বললে, 'বাবা, দুর্বল শরীল, কেঁদো না। জাত-গিঁয়াত পাঁচ জন আছে, ভয় কি, উদ্ধার করে দেবে।'

'উদ্ধার তো হবে,টাকার ব্যাবোস্তা কই ?' অসহায়ের মত বলে উঠল কুড়ানি : 'অসুখ বেসুখে সব্বসান্তি। ছিল কিশোর তাই রক্ষে। কিশোর না লাগলে বাঁচাতেই পারতাম না। কিন্তু একটা লোক বারে বারে কত দিতে পারে ?'

কথাটায় ভুল নাই। হোরাং স্বীকার করে, বোঝে হাড়ে-নাড়ে। কৃতজ্ঞতার তার শেষ নেই। কিন্তু লোকটার দেবার তো একটা শেষ থাকবে।

কেন যে এত দিচ্ছে, মনকে চোখ ঠেরে জিগগেসও করে না একবার। জিগগেস করে না, কেন না, না দিলে উপায় কি ? দায় উদ্ধার হয় কি করে ?

কিন্তু একটা কথা জিগগেস না করে পারে কই ? এ সব ঋণ কি শোধ করতে হবে না হোরাংকে ?

'পাড়ায় তো সবাই আপন-আপন কাজে ব্যস্ত। কাকেই বা পাব! এমনি একটিও লোক নেই যে উবকার করে। ও-বাড়ির কুনীর বাবাকে ডাকাতে পাঠিয়েছি। এক জন কি হবে? হা গো, বসে কাঁদলে আর চলবে না। কি যুক্তি করছ তাই করো।'

কুড়ানি ছটফট করতে লাগল: 'আমি মেয়েমানুষ, কি করবো বলো দিকিনি —এঁ্যা। পাড়ায় কেউ নেই আমাদিকিন অক্ষে করে।'

কেশর ঘুরে এলো পাড়া থেকে। বললে, 'পাড়ার কেউ আসবে না। কারুর রা-বোল নেই। মাহা তসকির হয়ে গেছে না কি, পঁচিশ টাকা জাত-দণ্ডি লাগবে।'

'কেনে, কি আমাদের অন্যায় হয়েছে যে এমন বিধেন হবে?' তেলে-বেগুনে জলে উঠল কুড়ানি : 'কুনী যে কুনী, তার বেলায় দশ টাকায় মিটল। আমাদের বুঝি মাতা-ছাতা নাই বলে যার যা মনে আসে তাই করবে? একটা বিচার নাই?'

'তার উপরে পতিত-রহিত করেছে না কি। মড়া তো ছোঁবেই না, ছান্দ-কিরিয়ায়ও আসবে না কেউ।'

কুড়ানি সর্বাঙ্গে কাঠ হয়ে রইল।

কি অপরাধ সে করেছে যার জন্যে তার এই শাস্তি? আর শাস্তিই যদি তার হল, অপরাধ সে করলে না কেন?

'ভেবে কোনো ফায়সালা হবে না। আমি রাখাল-বাগাল নিয়ে এসেছি—আমার দলের লোক। আমরাই কাকীকে ঠিক গঙ্গায় দিয়ে আসব।'

কুড়ানির পাথরজাঁতা বুকটা হালকা হয়ে গেল। সে জানত কেশর ঠিক তাকে বাঁচিয়ে দেবে। বাঁচিয়ে দেবে সমস্ত লজ্জা, সমস্ত অপমান থেকে।

হোরাং কেশরের দু'হাত জড়িয়ে ধরল। বলল, 'বড় কঠিনে পড়েছি। তুই ছাড়া কেউ নাই এই বেপদ থেকে অক্ষা করে। টাকার জোগাড় কি করে হল?'

'সে আর তোকে ভাবতে হবে না। তুই আগুন দিতে পারবি?'

'শরীল যে দুব্বল, চলতে পারব না।'

'তবে তোর বউই মুখে আগুন দিক। ওগো ওঠ কেনে। ভাবলে মা-গঙ্গা তরা দেবে? একটা ব্যাবোস্তা তো যাহোক করেছি।'

'হেমা মাসী সঙ্গে যাক।' হোরাং বলবে না ভেবেছিল তবু বলে ফেললে।

'ও বাবা, গঙ্গা অবধি না কি?' আঁৎকে উঠল হেমাঙ্গিনী।

'না না, শ্মশানখোলা পর্যন্ত।' হোরাং বললে, 'তুমি আবার ফিরবে তো বাড়িতে! সেই সঙ্গে —'

শ্মশানখোলা নদীর পারে, গঙ্গা সেখান থেকে পাকা দশ মাইল। যারা গঙ্গায় দেবে তারা শ্মশানখোলায় মুখাগ্নি করিয়ে নেয় —সবাই কি আর হাঁটতে পারে এত পথ? তা ছাড়া কুড়ানি তো মেয়েছেলে!

দুপুর গড়িয়ে গেছে। নির্জন হয়ে এসেছে গেঁয়ো পথ। নালার জলে সবুজ কঞ্চির ছিপ ফেলে কে একটা ছেলে মাছ ধরছে। আর গান গাইছে :

'পিরিতি উড়ে গেল,
সাঁঝবেলাকার ঝড়িতে,
আলগা করে বেঁধেছিনু,
বাঁধি নাই তো দড়িতে।'

হেমা মাসী পিছিয়ে পড়েছে —কেশর-কুড়ানি চোখ তাকাতাকি করলে।

কুড়ানি বললে, 'গান-টান আর গাও ?'

'পেরানে রং-তামাসা থাকলে তো গাইব।'

'কেনে, বেথা-বেদনা থাকলেও তো নোকে গায়।'

'সে গান এখনো শিখিনি।' কেশর একটু ঘেঁসাঘেঁসি করে বললে, 'তুমি গঙ্গা পয্যন্ত হাঁটতে পারো ? একা ভাল লাগে না। একা লদী বিশ কোশ। পারো হাঁটতে ?'

'খুব পারি। তুমি সঙ্গে থাকবে আমার ভয় কি ? তোমার পায়ে-পায়ে ঠিক চলে যাব। আবার ফিরব কখুন ?'

'আর ফিরব না। মড়া খালাস করে দিয়ে দু'জনে চলে যাব কলকাতা।'

এক লহমা ভেবে দেখল না। কুড়ানি হেসে ফেলে বললে, 'সে কি কথা। বাড়িতে দু'দিন মোটে পথ্য পেয়েছে। আমি ফিরে না গেলে তাকে এঁদে-ভেজে দেবে কে ?' পরে ফোড়ন দিলে : 'আমাকে যখন এমনি কাঁধে করে নিয়ে গঙ্গায় দিয়ে আসবে, তখন আর তুমি ফিরে এসো না। চলে যেও বম ভোলানাথ হয়ে।'

কথাটা কানে গেছে হেমাঙ্গিনীর। সে পিচ কেটে বললে, 'কত কলা জানিস তুই। ষোলর উপর আরো দুই।'

মুখাগ্নি হয়ে গেলে পর ফিরতি-মুখে কুড়ানি বললে, 'গঙ্গা পয্যন্ত ঠিক যেও কিন্তু, দারকা নদীতে ফেলে দিয়ে এস না। এসে বোলো কি কল্লে। আমি পথ চেয়ে থাকব।'

হেমাঙ্গিনী বললে, 'চল কেনে, তুর মার কাছে এখে আসি।'

'বাড়িতে তুমি কি কথা দিয়ে এসেছ ?' কুড়ানি চোখ-মুখ গম্ভীর করল : 'কথা দিলে কথার খেলাপ করতে নাই।'

আগুন তুলে তামাক সেজে দিলে হোরাং। বললে, 'খা।'

কেশর বললে, 'ইচ্ছে করছে না।'

'কেনে?'

'শরীল ভাল নাই। রেতে একটু করে বুঝি জ্বর হয়। মুখ একেবারে যেন ভাকুচ নিম।'

'না, ও কিছু লয়। কড়া তামাক এক ছিলিম খেলে ঠিক সেরে যাবে।'

'তবে দে, তুই ধরিয়ে দে।'

ধরিয়ে দিল হোরাং। কেশর টানতে লাগল।

হোরাং বললে, 'আমার লেগে তু এ পর্যান্ত কত টাকা খরচ কল্লি কেশর? ক' কুড়ি?'

'কে হিসেব করে!'

'কিন্তু সব টাকা তুই জলে ফেলেছিস —'

কেশর চমকে হোরাং-এর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

'আমার শোধ করার আর পথ আখিসনি। কি করে দিই তোর টাকা! আমার কি আছে?'

'এক ভাবে না এক ভাবে শোধ করা যাবে এক সময়। ব্যস্ত কি।' কেশর কথাটা চাপা দিতে চাইল।

'না। তার চেয়ে কিছু সেলামি দিয়ে একখানা পাকাপাকি জমি ধরিয়ে দিতে পাত্তিস তা'লে কাজের কাজ হত। জমায় বন্দোবস্ত লিতে পারলে দাঁড়াবার ঠাঁই হত একটা। আর নিজের বলে কায়েমী জমি পেলে বুক পেড়ে চাষ করতাম, পলেন মাটিতে সোনা ফলাতাম। তোর এত কষ্টের টাকা শোধ দিতাম এক মুস্তে।' হোরাং-এর নিশ্বাসটা ধোঁয়া ছাড়বার পরও খানিকটা জের টানল: 'তা না, লগদা মুনিষ খাটছি পরের জমিতে। পরের চাকর হয়ে আছি। সব সময়েই পয়সার টানা। চলতির কাল আর কখনু আসবে না।'

'আগে জেবন, পরে জমি।' কেশর বললে।

'তা বটে। জেবন না পেলে সব মিথ্যে। তা বটে। তু আমার জেবন ফিরিয়ে দিয়েছিস বটে, কিন্তু একখানা জমি পাইয়ে দিবি ভাই? ভাগ-বর্গা লয়, খাজনার জমি?'

'আমার আর টাকা কই ?'

'তা তো ঠিকই।' হোরাং ঢোঁক গিলল: 'তবু যদি পাকা করে একখানা জমি ধরিয়ে দিতে পাত্তিস ভাই, আমি লতুন মাতনে খাটতাম। তোর ধার আমি মিটিয়ে দিতাম সুদে-আসলে। লইলে, দেখছিস তো, ঘরে খোরাকির ধান নাই। বউ পরের বাড়িতে ধান ভানছে। দশে আমাকে ছি করছে। টাকা আর তোর নাই তা জানি —তবু —'

কেশর চুপ করে রইল।

হয়তো ভাবতে লাগল কি করে জমি ধরবার টাকা ধরা যায়।

অনেকক্ষণ এসেছে কেশর। এমনি প্রায়ই আসে। হোরাং-এর কথাতেই আসে। এসে তামাক-টামাক খায়, গল্পগাছা করে চলে যায়। এটা-ওটা কুড়ানির সঙ্গে কথা কয়, হোরাং-এর সামনেতেই কয়, হবু সম্পর্কের খাতিরে দু'চারটে শুকনো ফষ্টি-নষ্টিও করে। এটুকুতে হোরাং আপত্তি করে না, আপত্তি করার আর জোরও নাই। এতখানি যে উপকার করেছে তার প্রতি এতটা নেকমহারামি করতে তার মন কিষকিষ করে। সে অবুঝ হতে পারে না।

কিন্তু, আজ, এই ঝিকিমিকি বেলায় হোরাং-এর মনে হ'ল, ওরা যেন আরো একটু কাছাকাছি এসে কথা বলতে চায়। এতক্ষণ ওরা একটা মামুলি কথাও কিছু বলেনি। ঘরের মধ্যে কুড়ানি খুসখুস করেছে আর কেশর মাথা নিচু করে বসে উঠোনের মাটিতে কাঠি দিয়ে দাগ কেটেছে। কি যেন কথা বলতে চায় ওরা। কথাই তো কইবে, কো'ক না যা মন চায়, যাতে মন খুশি হয়। এটুকু না দিলে চলবে কেন? হয়তো কুড়ানি জমির কথাই বলবে। আর কেশর বলবে, তুমি যখন বুলছ তখন দেখি চেষ্টা করে।

গোপে-চুপে এক-আধটু কথা বললে কি হয়!

হোরাং বললে, 'যাই, কুবের মুচির ছেলে সুবল কাঁকরের কারখানায় কাজ করতে গিয়েছিল। এসেছে নাকিনি ছুটি লিয়ে। যাই, ওর কাছে শহরের হালচালের গপ্প শুনে আসি গে। তুই ততক্ষণ তামাক খা। লতুন করে সাজ। আমি আসছি এখুনি।'

কুবের মুচির বাড়ি বিঘে দুই তফাৎ। এখুনি চোখের নিমিষেই ঘুরে আসতে পারবে হোরাং।

হোরাং চলে যেতেই কেশর ঘরের মধ্যে ঢুকে কুড়ানির একখানা হাত

চেপে ধরল। বললে, 'চলো, এখান থেকে আমরা পালাই। এখুনি। এই ফাঁকে।'

'কোথায় পালাব? এই ঘর-বাড়ি ছেড়ে যাব কোন চুলোয়?' কুড়ানির মুখে মিঠিমিঠি হাসি।

'জানি না। তবে এইখানে নয়। এখানে আর টিকতে পাচ্ছি না। দম আটকে আসছে।'

'যেখানে যাবে সেখানেও এমনি দম আটকে আসবে।'

'মিথ্যে কথা।' সামনের দিকে হাত টান দিল কেশর।

'এক সোয়ামীর ঘর ছেড়ে যে মেয়ে পালিয়ে এসেছে সে আবার তোমার ঘর ছেড়ে কখন পালিয়ে যায় সেই ভয়ে তোমার দম আটকে আসবে। শান্তি পাবে না, সুখ পাবে না।' বলতে বলতে আস্তে-আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিল কুড়ানি। বললে, 'হোরাংকে যেমন কুরে কুরে খাচ্ছে, তোমাকেও তেমনি কুরে-কুরে খাবে।'

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় কুড়ানির মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল কেশর। বলল, 'সব তোমার মুখের কথা। তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না।'

'বাসি না? সব মুখের কথা?' দু' চোখ টলটল করে উঠল কুড়ানির: 'বেশ, তুমি কাল এসো। ভর সনজে বেলায় এসো। স্বামীকে আমি পাঠিয়ে দেব বাইরে। বুলব, ঠিক বুলব তোমাকে। মুখের কথা!'

হোরাং কি কুবেরের বাড়ি পর্যন্ত যায়নি? কাছাকাছিই ওৎ পেতে ছিল? না, সঙ্গে তার কেশরের মা। আধা পথে দেখা হয়ে গিয়েছে।

'এক লম্কার পথ, হাঁটতে পারি না, তবু এসেছি। কই সে হতভাগা কই? এখানে তুই কি ফোঁসে পড়ে আছিস? কে তোকে বিষমন্তর দিলে? সোনার মনিব ছেড়ে দিলি, ঘর-সংসারে মন নাই। নিত্যি বাড়ি-ঘর যাস না, এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াস। আমাকে গলা টিপে মার। মেরে তু আজা হ। কাকী ঠাকরুনের কাছে তোর পাঁচ কুড়ি টাকা জমা ছিল, সব টাকা তুই লিয়ে এসেছিস। কাকে দিছিস কি করিছিস মা-গঙ্গাই জানে। শুধু তাই? তার পর আবার তু জমি বাঁধা থুয়ে টাকা লিয়েছিস। এমন দুষমন তুমি, এমন কাল মুদ্দয় তুমি—এ্যাঁ! এরি লেগে তোকে পেটে ধরেছিলাম। তুমি মার বাগে

ফিরে চাও না। আমি গোবর-ঘসি কুড়িয়ে কত কষ্টে তোকে মানুষ করেছি, তার এই পিতিফল!'

কেশর বাইরে বেরিয়ে খানিকক্ষণ থম্বার মত দাঁড়িয়ে রইল। পরে মার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'চলো মা, বাড়ি যাই। এখানে আর মুখ করো না।'

'মুখ করব না? তোমার উপর আমার এমন আগ উঠছে যে কি আর বুলবো? তুমি অধঃপাতে যেতে বসেছ। পরের ফোঁসে তোমার যা মনে হচে তাই করছ। তুমি আমার সাজানো ঘর ছারকার কত্তে নেগেছ। আগে তুমি ভাল ছিলে, এখন দিন-দিন খুব বজ্জাত হচো। চলো, বাড়ি চলো, মোড়ল-পারামানিকদের ডাকাই—তোমার ভালরূপ শাসন হক। আমাকে কাঁদালে তোমার ভাল কখুন হবে না, আগুনে দগুধে যাবে—'

সাহস করে বাইরে বেরিয়ে এসে কুড়ানি চ্যাটাই দিল।

'থাক, আর ভালোমানসি করতে হবে না। ভেবেছ তোমার বুনের সঙ্গে আমার কেশরের বে দেবে? তা কখুন হবে না। তোমাদের বংশ ভাল লয়। তোমরা নীচ জাত। লোকে অন্য রকম বলা-ক করছে, নানান কেছা রটাচ্ছে। বলছে, বুনের বিয়ের নাম করে নিজেই গেরাস করছ। গোপ্ত অঙে অস বেশি! জাত-গিঁয়াত পতিত-রহিত করে দিয়েছে, তবু তোর জ্ঞান নাই। আমার গিঁয়াতরা কোপ মারবার মুখে—তারা মা-মনসার উপরে আরেক কাটি ধুনোর ধুয়ো। বলছে—কে এক মাগী বশ করেছে কেশরকে। আরে রেখে দাও বশ-ফস, মারের আগে ভূত লাচে। মেরে গন্ধব্ব ছুটিয়ে দেব।' বলতে বলতে হোরাং-এর দিকে ঘুরে দাঁড়াল কেশরের মা: 'তুমি বাপু কি করতে আছ? শাঁসতে পার না পরিবারকে? টুটি টিপে ধরে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে পারো না আড়ার সঙ্গে?'

যাঁহা মুস্কিল তাঁহাই আসান। এ যেন শাপে বর হল কেশরের। এ অপমানের পর কুড়ানি আর নিশ্চয়ই ঘর-বাড়ির মায়ায় আটকা থাকবে না। এবার নিশ্চয়ই পথ নেবে কেশরের সঙ্গে।

ভয়ে-ভয়ে তাকাল কুড়ানির মুখের দিকে। সে মুখে এতটুকু ছায়া নাই, ভয় নাই,—মুখখানি হাসি-হাসি। বড় হাস্যময়ী মেয়ে। আর হোরাং? হোরাং গুম হয়ে বসে কলকে-নেবা হুঁকোতে টান মেরে-মেরে মুখে গাঁজলা তুলছে। শব্দ নাই সান নাই, লজ্জা নাই ঘেন্না নাই—এ কেমনতরো লোক!

সবাই বলছে, বউকে তুই ছেড়ে দে।

কেনে ছাড়ব? হোরাং মনে মনে বিচার করতে বসে: কেনে ছাড়ব? ও কি করেছে? সবাই বলে, ও অসৎ, ও খারাপ। কিন্তু কেও কি দেখেছে? এঁ্যা? আন্দাজী বললেই হল! দুব্বলের বউ কি না, কলঙ্ক একটা রটিয়ে দিলেই হল। নিজেদের ঘরে-ঘরে কি! 'বড় বড় রথী, তারা গেল কতি!' আমার জনের জোরজার নাই, টাকার জোটপাট নাই, তাই এই জোর-জুলুম! বউ খারাপ, ধরতে পারলি কেউ? চোর ধরবে বলে পাড়ার লোকেরা বাড়ির এরেঘেরে পাহারা দিলে কত রাত, টহলদার চৌকিদার লাগাল, দিনের বেলায়ও কত উঁকি-ঝুঁকি, কত আড়ি-পাতা, ধরতে পারলি চোর? জেতের ধরন যাবে কোথা? লোকও ছোট, মনও ছোট। যে খায় আমানি তার ঢেঁকুর উঠবে তেমনি। তাই বলে সে পরের কথায় মিথ্যেমিথ্যি মাগকে ছেড়ে দেবে? নিজের থেকে মুখ পোড়াবে তার? নাম খারাপ করে দেবে?

কুড়ানি কেশরকে ভালবাসে। সে তা ঠিক বোঝে হিয়ের মধ্যে। আর, কেশর তো কুড়ানির জন্যে সব্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে। যাতে কুড়ানির স্বামী হোরাং পর্যন্ত বেঁচে উঠতে পারে। যাতে সে থিত-ভিত ফিরে পায়!

মন থাকে তো যা, রোচে-পোচে তো খা। ইয়ের কী করবে হোরাং? মনের ভালবাসা সে কি করে বন্ধ করবে? মারধোর করে ছাড়াছাড়ি করে দিলে কি রঙের দাগ উঠে যাবে মনের থেকে? আর, মারধোর করবেই বা কেন, কিসের লেগে? অন্যায় তো কেউ করেনি, একটা খারাপ ইসারা বা মাতালী ঠাট্টাঠুট্টি পর্যন্ত লয়। আর যে কেশর তার জন্যে এত করল, বুক দিয়ে পড়ল এসে বেপদের সময়, তাকে সে অকারণে অপরাধী করবে? ভরা কলি বলে কি এতটুকুও ধম্ম নাই? এতটুকুও ক্ষমা নাই? যে এখন তার আঁতের লোক, বন্ধুতার লোক, তাকে সে বিনা দোষে দুষী করবে? মুখে চুন-কালি মাখাবে?

কানের কাছে রাত-দিন লাগান-ভজান কোরো না। জলজ্যান্ত প্রমাণ দাও। তবেই একটা বিহিত করি।

বা, বেশ, তবে এমনি করেই দিন যাবে? ঘরে আলো জ্বালাবে বউ, বন্ধু আসবে তামাক খেতে, আর হোরাং আগুন তুলে-তুলে তামাক সেজে দেবে বন্ধুকে?

সত্যিই, কি করবে হোরাং? ছাড়বেও না, ধরবেও না, কি করবে তবে? সমাজ তাকে পতিত-রহিত করেছে, মায়ের নামে দু'খানা সে পাতা তুলতে পারল না! সমাজ ভাঙে তো নোয় না। জরিমানা দিয়ে জাতে ওঠ, রা-বোল চলাবলা ফিরিয়ে আনো! কিন্তু জরিমানা লিয়ে কি ভালবাসা খণ্ডাতে পারিস? বালির বাঁধ দিয়ে কি নদী ঠেকানো যায়? সবাই হোরাংকেই ছি-ছি করছে। কিন্তু কি করবে হোরাং? যাকে দশে করে ছি, তার জীবনে কাজ কি! হোরাং এ গাঁ থেকে চলে যাবে। সে কাউকে ছাড়বে না, ধরবে না, সেই সবার থেকে ছাড়ান নেবে। রইল কুড়ানি, রইল জাত-গিঁয়াত, রইল তার ভাঙা-পড়া বাড়ি-ঘর—সে চলে যাবে বিশ্বাশ-বিভুঁয়ে।

সত্যি-সত্যিই যখন কেশরকে ভালবাসিস তখন ছাড়বিড় করে একদিন চলে যা না হাত ধরে, লতুন গাঁয়ে গিয়ে ঘর বাঁধ। আর তোকেই বলি কেশর, এতই যখন তোর গায়ের জোর, টাকার জোর, তখন মেয়েটাকে লিয়ে যেতে পারিস না বেপাত্তা করে! ক'দিন না হয় খুঁজব-খাঁজব, কোথাও কোন উদ্দিশ পাব না। এক দিকে মন হায়-হায় করলেও অন্য দিকে খুশি হবে। আমার আর দোষ ধরবে না কেউ, বলবে বউটাই খারাপ, বন্ধুটাই নেমকহারাম।

তা, যখন তোরা কিছুই করবি না, তখন আমিই নিষ্পত্তি করি, আমিই চলে যাই। আমি চলে গেলে যদি তোরা মিলতে পারিস মনের মতন করে! বাড়ি-ঘর রইল, যতদিন সুবিধা-সুরাহা না হয়, তত দিন এখানেই থাক, শেষে মাকে ভজিয়ে-পটিয়ে লতুন বউ লিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে হাজির হ। গাঁয়ে-ঘরে খিটকেল বেশি হয়, ভিন গাঁয়ে চলে যা। চলে যা কলকাতায়। কেউ তোকে রুখবে না। তোদের সুখে বাদী হবে না কেউ।

হোরাং চলে যাবে কাঁকরের কারখানায় কাজ করতে। চাষা ছিল মজুর হবে। চাষার অনেক মান, তার জমি থাকে স্ত্রী থাকে—মজুর অনেক নিচু। নিচু হয়েছে বলেই মজুর হতে হবে। উপায় কি! সুবল বলে, আয়-আদায় ভাল, ঝঞ্ঝাট কম, নায়েব-গোমস্তা নাই, বৃষ্টির খামখেয়াল নাই। তার উপর নিজের দেশের লোক বলে সরিৎবাবু তাদের খুব ভাল নজরে দেখেছেন। লোকও গিয়েছে বিস্তর। মেয়েছেলেও আছে মন্দ নয়। যে চায়, তারই চাকরি।

সন্ধে হয়-হয়।

কুড়ানি বললে, 'ধানের তাগাদায় যাবে না আরেক বার ?'

'বলে, ধান পাকুক, কাটা হলে পরে পাবি কিছু।'

'তা বললে কি করে চলবে ? ধান না দিক টাকা দিক। তুমি যাও।'

'না, আমি ও-বাগে যাব না। আমি স্থবলদের কাছে যাব।'

'তাই যাও। যে কোনো এক জায়গায় যাও। একটা কিছু জোগাড়জাস্তি কর।'

হোরাং উঠে চলে গেল বাইরে। স্থবলের কাছ থেকে সব খবর জানা হয়েছে, শুধু কোথায় কোন ট্রেনে চড়ে যেতে হয় সেইটেই জানা হয়নি। সেইটে জানা দরকার।

আলো জ্বালাল না কুডানি। সাঁঝের প্রথম অন্ধকার থমথম করতে লাগল।

কোন ফাঁকে কোথা দিয়ে টুক করে ঢুকে পড়ল কেশর।

দাঁড়াল কুড়ানির মুখোমুখি।

কুড়ানি তার ডান হাতটা কেশরের বুকের উপর রাখল আর কেশরের ডান হাতটা রাখল নিজের বুকের উপর। বললে, 'আমার এ-মন তোমার, তোমার ও-মন আমার। সব চেয়ে বড় দব্য তোমাকে দিলাম, তোমার ঠেঁয়ে নিলামও সব চেয়ে বড় দব্য। কি, রাজি ?'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল কেশর। অন্ধকারে কুড়ানির চোখ জ্বল-জ্বল করছে। কেশর বললে, 'রাজি।'

'শোনো।' আরো ঘন হয়ে এল কুড়ানি: 'তোমাকে আগেও বলেছি আজও বলি, গায়ের বস্ত্র তোমাকে দিতে পারি না। এ বস্ত্র নোংরা, ছেঁড়া। তোমাকে আমি আমার মন দিচ্ছি, সোনার মত খাঁটি, সোনার মত স্থন্দর। তুমিও আমাকে তোমার মন দাও। আমার যখন মন পোড়ে তোমারও মন পুড়ুক। তোমার মনে যখন স্থখ, আমার মনে তখন শান্তি। কি, খুশি ?'

'খুশি।'

কেশর এই প্রার্থনাই বুঝি সেদিন করেছিল কালীর কাছে!

হঠাৎ সে বলে উঠল: 'এই কথা তুমি মা-কালীর দুয়োরে বলতে পারো ?'

'কোন কথা ?'

'যে তোমার মন আমার, আমার জন্যে তোমার মন পোড়ে ?'

'একশো বার পারি। হাজার বার পারি।'

'বেশ কাল অমাবস্থে। কাল রাতে যখন তোমার সুবিধে এলো তুমি মা-কালীর থানে! আমি সারারাত সেখানে পড়ে থাকব। মার কাছে তুমি শপথ করে বলবে। সেই শপথটুকুই আমার শান্তি। আমার সারা জেবনের সুখ।'

'বলব। তুমি যেও, ঠিক যেও।' কুড়ানি হাত নামিয়ে নিল। সরে গিয়ে বলল, 'নামুতে যাও। আলো জ্বালাই।'

২৩

মার থানে পাকুড় গাছের নিচে গায়ে-মাথায় কাপড় জড়িয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে কেশর। বেশ শীত পড়ে গিয়েছে। তা পড়ুক। কেশর ঠাঁইনাড়া হবে না। সমস্ত রাত হিমে পড়ে থাকবে বাইরে। দেখবে, সে কথা রাখে কিনা। আসে কি না শপথ করতে।

অন্ধকার অমাবস্থে রাত ছমছম করছে। শিউরে শিউরে উঠছে। একটা পাতার শব্দ নেই, পাখির পাখার ঝটাপট নেই। এই পাকুড় গাছে বসে হুতোম ডাকত একটা। সেটাও আজ চুপ। সবাই যেন কিসের অপেক্ষা করছে।

আবোল-তাবোল ভাবছে বসে কেশর। ঢুলুনির মধ্যে থেকে চমকে-চমকে উঠছে।

আচ্ছা, পাকুড় গাছ এত বড় হয় কি করে? ওর বীজ তো খুব ছোট। এক গাছের বীজ এত তেজী, আবার অন্য গাছের বীজে গাছ তো হিলহিলে। বৈশাখ মাসে এ গাছের গোড়ায় লোকে জল দেয় কেন? কে জানে! ওঃ বাবা, এ গাছটা একবারে এক কাঠা জায়গা ঘিরেছে। ডালগুলো যেন এক একটা মোটা গাছের গদি। পরডালাগুলিতেও যেন হাতকে-মোড়া তক্তা হয়। আচ্ছা, কেউ এই গাছের পাতাগুলি গুনতে পারে? আচ্ছা ভগবানের কাজ। যা ছিষ্টি করেছে তার সংখ্যা করা যায় না। আর, কেমন দেখ, সব গাছপালার পাতার রং সবুজ। কত রকমের যে গাছপালা আছে তার সংখ্যা নাই। কোনো গাছে ফল ধরে আবার কোনোটা ধরে না। কারো ফল খাওয়া যায়, আবার কোনো ফল বিষ, তেতো। ভগবান বসে বসে কত ছিষ্টিই করেছে।

বলিহারি যাই। পাতার উপরে ঐ আকাশের দিকে চেয়ে দেখ না। ফুটকি-ফুটকি কত তারা ঝকঝক করছে। যত শীত পড়বে ততই আকাশ ঝলমল করবে। কত তারা তার লেখাজোখা নেই। 'এক থাল গুপারি, গুনতে নারে বেপারী।' গোনে কার সাধ্যি?

হোরাং-এর ঘুম আসছে না। ছটফট করছে। কাল সকাল বেলা চলে যাবে সে কাঁকরের কারখানায়। কি করে যেতে হয় হাট-হদ্দ জেনে নিয়েছে সব। বাস-এ করে যেতে হবে প্রথমটা রেল-ইষ্টিশন পর্যন্ত। যেখান থেকে বাস ছাড়ে সেখানে গিয়ে সে সটান উঠতে পারবে না, এত ভিড়! সে ছোটলোক, তাকে উঠতেই দেবে না ভদ্দর লোকেরা। তাকে তাই উজিয়ে যেতে হবে মাইল খানেক কি তারো কিছু বেশি। গোটা কয়েক সিট মাঝ-রাস্তার প্যাসেঞ্জারের জন্যে রিজার্ভ আছে এই ওজুহাতে বাসের খানিকটা জায়গা ফাঁকা রাখে কণ্ডাক্টর। সেসব জায়গা এসব অপারগদের দিয়ে ভরতি করানো হয়—খেসারতও নেয় দেড় গুণ। উপায় নেই, নইলে বাস-এ জায়গা পাওয়া তার ইহজন্মে ঘটবে না। রোগা মানুষ, অত পথ হাঁটতে গেলে হেদিয়ে পড়বে। বাস-এ বাইশ মাইল গিয়ে তবে ইষ্টিশন। সেখানে পৌছে ধবলহাটির ট্রেন ধরবে দুপুরে। পৌছুবে সেই পরদিন সকালে। ইষ্টিশানের হাতা পেরিয়েই একটু দূরে কাঁকরের কারখানা।

সুবল বলে দিয়েছে কারখানায় পৌছেই একেবারে সরিৎবাবুর খোঁজ করবি। ভিড়-ভাড় ঠেলে সটান দাঁড়াবি গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে। গড় হয়ে প্রণাম করে বলবি, আমি সন্দেপুরের লোক। ব্যস, কথা নেই। অমনি কাজ পেয়ে যাবি। আস্তানা পেয়ে যাবি। তুই তো একা যাচ্ছিস। থাকবি তাই আর সবার সঙ্গে চালা ঘরে। যারা দোকা যায় তারা আলাদা কুঠুরি পায়।

হাতে-পায়ে ধরে সুবলের কাছ থেকে পথ-খরচের ক'টা টাকা ধার নিয়েছে হোরাং। বলেছে চাকরি পেয়ে প্রথম মাসের মাইনে থেকেই নির্ঘাৎ শোধ করে দেবে। তার চাকরি পাওয়া এত ঠিক যে শেষ পর্যন্ত সুবল না দিয়ে পারল না। কুড়ানির কাছে কেশরের দরুন ক'টা টাকা এখনো হয়তো আছে। আছে নাকের সেই আপেলটি। কিন্তু তা সে কি করে চেয়ে নেবে? চেয়ে নিলে চলবেই বা কেন? প্রথম ক'টা দিন খাবে কী কুড়ানি। মনটা ঠিক ধাতে আনতে ক'টা দিন একটু সময় লাগবে তো!

ঘুমুচ্ছে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে! মাথা-ভরা কালো চুলে ঘুমন্ত মুখখানা অন্ধকারেও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে হোরাং। কাল ওর কি সুখের দিন, কি ফাঁকার দিন, তারই হয়তো এখন ও স্বপ্ন দেখছে। তাই ওর মুখখানা এত হাসি-হাসি! কাল সকালে উঠেই দেখতে পাবে, আর কোনো তার বাধা-বিপদ নাই, সব মাঠ-ময়দান ফর্সা হয়ে গেছে। সে আনন্দটাই হোরাং অনুভব করতে চায় তার ঘুমের মধ্যে। কিন্তু ঘুম আসে না।

ভাগ্যের লিখন আর গোপথে মরণ। কে জানে, কারখানা যাওয়াই ভাল হবে কি না। আর ভালমন্দ! মরণ থাকলে হবে, উপায় কি। তার তো একটা স্বাধীন রোজকারের পথ মিলুক। কুড়ানিও পাক তার স্বাধীনতা। নিপরোয়া হয়ে করুক ওর মন যা চায়। ওর মন যা ভালবাসে।

একেক বার ঝিমিয়ে পড়ে আবার মশার কামড়ে জেগে ওঠে কেশর। কই, কুড়ানি তো এখনো এল না। রাত কত হল তার আর কিছু খেয়াল চলে না —দশ দিক এমন থমথম করছে। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছে একদম। কিংবা স্রেফ ধোঁকা দিয়েছে।

আরো কতক্ষণ পরে কে জানে, হঠাৎ যেন খসখস শব্দ হল। পাতার খসখস নয়, শাড়ির খসখস। ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল বুঝি কেশর। চকা হরিণের মতো সে উঠে দাঁড়াল। সত্যিই তো, সামনে কুড়ানি।

কেশর চাপা-গলায় বললে, 'এসো, এসো এই মার দুয়োরে এসো।'

কুড়ানি তাড়াতাড়ি দুয়ারে উঠে পড়ল। ভয়ে-ভয়ে আস্তে-আস্তে বললে, 'দেখ ঠিক এসেছি। এতক্ষণে ঘুমুল, তাই দেরি হল ছুটি পেতে। এই শীতে একা চুপটি করে বসে আছ? তোমার কি মরব-বাঁচব জ্ঞান নাই?'

'কুড়ানি, এমন দিন বুঝি আর পাব না। চলো মার মন্দিরের ভিতরে চলো। দরজা-কপাট নেই মন্দিরে। চলো, মন্দিরে ঢুকে মার পা ছুঁয়ে —'

'না, না, মন্দিরে নয়। এই বাইরে থেকেই বলি যা বলবার।'

'না, মন্দিরে ঢুকে মার পা ছুঁয়ে বলতে হবে। কেনে, সাহস হচ্ছে না কেনে? এইবারই বোঝা যাচ্ছে কোনটা সত্য কথা, আর কোনটা মুখের কথা!'

'তুমি কি পাগল হয়েছ? দু বেলা মাছ-ভাত খাওয়া আকাচা বেছনা কাপড়ে মন্দিরে ঢুকে মার চরণ ছোঁব?'

'আমি ঠিক বলছি।' কেশর চাপা অথচ জোরালো গলায় বললে, 'দেরি কোরো না। তৈরি হও। মনে ভক্তি আনো। শুভক্ষণ পার হয়ে যেছে—'

'আমি ভাই পারব না। ছি, তুমি যে কি মানুষ আমি বুঝতে পারছি না। আমাদের বেছনায় শোওয়া কাপড় —তুমি ঠিক পাগল হয়েছ।'

'পাগল এখনো হইনি, বোধ হয় হব। বেশ, এই কাপড়ে মাকে ছুঁতে না চাও, কাপড় ছেড়ে ফেল —'

'তুমি কি বুলছ! তোমার মাথার ঠিক নাই।'

'ঠিক বুলছি। আমিও ফেলে দিলাম ছুঁড়ে। চেয়ে দেখ আমাদের মারও কোনো কাপড় নেই লজ্জা নেই —চেয়ে দেখ এই অমাবস্যের রাত। এসো, ঢোকো মন্দিরে, মার পা ছোঁও। হ্যাঁ, মনে ভক্তি আনো। মন্তর বলো, মা, আমাদের পূজার সামগ্রী কিছুই নাই। মন্ত্র, ভক্তি, বিধি, আচার আমরা কিছুই জানি না। দয়ামহী, আমরা তোমার অবোধ সন্তান। আমাদের সম্বল কেবল চোখের জল, হিয়ের তাপ। চোখের জলে তোর আঙা পা দু'টি ধুয়ে দেব জীবন-ভোর। আর কিছুই নাই মা —সব, এমন কি গায়ের বসনখানা পর্যন্ত তোকে নিবেদন করে দিয়েছি। বলো, ঝিমিয়ে পড়ছ কেনে, বলো, — আশীর্বাদ করো মা, আমাদের ভালোবাসা যেন মরণ-কাল পয্যন্ত স্থায়ী হয়। বেশ, এইবার পূজা শেষ হ'ল —এইবার বলো সেই শপথের কথা —'

'এ হেই —এ —' চৌকিদার হাঁক ছাড়ল লম্বা গলায়।

ধুড়মুড়িয়ে উঠল কুড়ানি। চোখ কপালে তুলে গলা কাঠ করে বললে, 'ওগো সব্বনাশ! চৌকিদার বনে বেরিয়েছে। কোন দিকে কেমন করে পালাব?' তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিল কুড়ানি: 'কি হবে? যদি ধরা পড়ে যাই?'

'দাঁড়াও, আরেকটা হাঁক দিক।' কেশরও কাপড় পরলে: 'তা-পরে বনের মধ্যে দিয়ে চলে যাও। ফাঁকা হাঁটা-পথ না ধরে হেমা মাসীর বাড়ির পাশ দিয়ে ঝোপে-ঝাড়ে গা ঢেকে-ঢেকে চলে যাও! কোনো ভয় নাই।'

না, কোনো ভয় নাই। সারাক্ষণ কেবল মা-কালীর নাম করেছে। পথের কাঁটা-খোঁচা, কোনো কিছুর দিকে তার লক্ষ্য নেই। কতক্ষণে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে স্বামীর পাশটিতে গিয়ে সে শুতে পাবে।

ঠিকঠাক দরজা ঠেলে কুড়ানি ঘরে ঢুকল। ঠিকঠাক শুয়ে পড়ল তার স্বামীর পাশটিতে। হোরাং ঘুমে বিভোর। মা-কালী বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

শুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল কুড়ানি।

কিন্তু সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে এ সে কি দেখছে? হোরাং এ কি দেখছে? তার পরনে তার সেই শাড়ি কই? এ সে কাপ ধুতি পরে আছে?

আরো জলজ্যান্ত প্রমাণ চাই হোরাং-এর?

কুড়ানি কি করবে এক মুহূর্ত সে ভেবে পেল না। ঘর ছেড়ে তক্ষুনি পালিয়ে না গিয়ে হোরাং-এর দিকেই সে এগিয়ে গেল। বনের গরু যেমন বাঘের দিকে যায়।

হোরাং কুড়ানির একটা নিস্পন্দ হাত তার হাতের মধ্যে টেনে নিল। বললে, 'তুই এখানে আর মুখ দেখাবি কি করে? আমার সঙ্গে তুই যাবি?'

'যাব।' কোথায়, জিগগেস করবার ফাঁক খুঁজল না কুড়ানি।

'আমি আজই, এখুনি, যাচ্ছিলাম। যাচ্ছিলাম কাঁকরের কারখানায় কাজ করতে। যাবি তু?'

'যাব। কাঁকরের কারখানায় তো মেয়ে-পুরুষ দুজনেই কাজ করে।'

'তবে তাই চো। তোর কাপড়টা আমাকে দে, আমারটা তুই লে। আমার এটার ইঞ্চিপাড় আছে, তোকে ঠিক মানিয়ে যাবে। ভাগ্যিস তখন ইঞ্চিপাড় দেখে কিনেছিলাম, তাই এখুন কাজে লাগল। বাস-এর রাস্তা হাঁটতে হবে তো? লে, মানিয়ে যাবে ঠিক। কেউ ধরতে পারবে না।'

হোরাং-এর ইঞ্চিপাড় ধুতিটা কুড়ানির গায়ের সঙ্গে মিশে গেল।

'যাবি তো, সামান্য কিছু যা আছে বাঁধাবুঁধি করে লে। চো, লিয়েই যাই। মাগ মাথার পাগ, তাকে ফেলতে নাই। দেখি কপাল ফেরে কি না। কোথায় চললে গোপাল? না, সঙ্গে চলল কপাল। কপাল ভালই হবে, কি বলিস? সরিৎবাবুর সঙ্গে সটান গিয়ে দেখা করব। দেশের লোক শুনলে বাবু খুব খাতির করে। খাতির না করলেই বা কি? আমাদের দুজনের এক-মন থাকলে কেউ রুখতে পারবে না—কি বলিস?'

কুড়ানি বললে, 'লিশ্চয়। এক-মন হলে সমুদ্র শুকায়।'